Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা মেডিকেল কলেজঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৯৪৭-১৯৭১)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রাণা রাজ্জাক

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক

ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ

অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

পিএইচ.ডি. গবেষক

চাঁদ সুলতানা কাওছার

ইতিহাস বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

পূর্ববাংলার উঁচু স্তরের প্রথম পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজের যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৬ সালের ১লা জুলাই। ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রায় ১১১ বছর পর এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঔপনিবেশিক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে অনেক মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও পূর্ববাংলায় কোনো মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নানা কারণে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হতে বিলম্ব হলেও প্রধানত অর্থনৈতিক ও সরকারি নীতিনির্ধারকদের সিদ্ধান্তহীনতার কারনে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। ১৯২৯ সালে নবাবপুরের ধনাঢ্য ব্যক্তি জগমোহন পাল এর অনুদানের ওপর ভিত্তি করে এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । পূর্ববাংলার সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও জনসাধারণের জোরালো দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এবং ১৯৪৩ সালে গঠিত 'হেলথ সার্ভে এন্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি' বা 'ভোর কমিটি'র সুপারিশের ভিত্তিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়ের ওপর গবেষণা মূলত একটি প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চা। প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে এই অঞ্চলের জনসাধারণের রোগ, চিকিৎসা, সমাজ ও অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়ের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, একাডেমিক উন্নয়ন ও বিকাশ, মেডিকেল কলেজে শিক্ষাদান পদ্ধতি, মেডিকেল কলেজটিকে বিশ্বমানসম্মত ও যুগোপযোগী করে তোলার জন্য যুগের চাহিদার সাথে সাথে নানা পন্থা গ্রহণ, প্রশাসনিক পরিবর্তন কিভাবে কলেজের মান উন্নত ও স্বীকৃতি পেতে সহায়তা করেছিল, সে সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া এই অঞ্চলের নারীদের মেডিকেল কলেজে ভর্তি, সমাজ ও পরিবারের ভূমিকা, তাদের জ্ঞান আহরণ ও সেবা এবং মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। চিকিৎসাশিক্ষার মতো কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি অধ্যয়নে মনযোগী হতে হয়, কারণ এর বাইরে অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করা কঠিন। তা সত্ত্বেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা স্থানীয় ও জাতীয় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। উল্লিখিত এই বিষয়গুলো অভিসন্দর্ভে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি **চাঁদ সুলতানা কাওছার**, পিএইচ.ডি. রেজি নং- ১৪২/২০১৬-১৭, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, আমার পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য দাখিলকৃত 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৯৪৭-১৯৭১)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোনো অংশ, কোনো ডিগ্রি অথবা প্রকাশনার জন্য কোথাও দাখিল করিনি।

জুন ২০২১

গবেষক

চাঁদ সুলতানা কাওছার
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করছি যে, **চাঁদ সুলতানা কাওছার,** আমাদের তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য ‘ঢাকা মেডিকেল কলেজ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৯৪৭-১৯৭১)’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করেছেন।

এই অভিসন্দর্ভটি তিনি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে, কোনো ডিগ্রি/ডিপ্লোমার জন্য উপস্থাপন বা কোনো পুস্তক/জার্নালে প্রকাশ করেননি। তাঁর এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

জুন ২০২১

যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত) শরীফ উদ্দিন আহমেদ
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক রাণা রাজ্জাক
ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা	
ভূমিকা	১
প্রথম অধ্যায় : ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	২১
দ্বিতীয় অধ্যায় : ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাথমিক অগ্রযাত্রা ও উন্নয়ন ১-৭-১৯৪৬ – ১৫-৮-১৯৪৭	৯৩
তৃতীয় অধ্যায় : ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও বিকাশ, ১৫-৮-১৯৪৭ – ৩১-১২-১৯৭১	১১২
চতুর্থ অধ্যায় : ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রমের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও বিকাশ, ১৫-৮-১৯৪৭ – ৩১-১২-১৯৭১	১৮২
পঞ্চম অধ্যায় : ঢাকা মেডিকেল কলেজের নারী চিকিৎসক: জ্ঞান আহরণ ও সেবা	২৫৭
ষষ্ঠ অধ্যায় : ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবদান	৩০৭
উপসংহার	৩৮৪
পরিশিষ্ট	৩৯১
গ্রন্থপঞ্জি	৫০০
ছবি	৫২১

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্ধারণে আমার শ্রদ্ধেয় সম্মানীত যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন আহমেদ স্যার আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনিই প্রথম আমাকে এই বিষয়ের ওপর গবেষণা করার জন্য পরামর্শ ও উৎসাহ দেন। তাঁর পরামর্শের ভিত্তিতেই আমি বিষয়টির ওপর গবেষণা করতে আগ্রহী হই। বাংলাদেশে এই বিষয়ের ওপর ইতিপূর্বে কোনো গবেষণা হয়নি। এই কারণে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন আহমেদ এর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর এই পরামর্শ আমাকে গবেষণার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা এবং এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। আমি আনন্দিত এমন একটি বিষয়ের ওপর গবেষণা করতে পেরে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের কাছে আরো কৃতজ্ঞ আরকাইভসের উৎস ব্যবহারের ওপর আমাকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য। গবেষণা কাজের জন্য আমাকে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ছাড়াও কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরি, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আরকাইভস, জেনারেল লাইব্রেরি (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা) থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তিনি আমাকে পরামর্শ দেন। এসব তথ্য উপাত্ত ব্যতীত আমার গবেষণার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তার এই মূল্যবান পরামর্শের জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। উপরন্তু পৃথিবীব্যাপী করোনাকালীন মহাদূর্যোগের মধ্যে তিনি অভিসন্দর্ভ রচনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, যা আমার গবেষণার কাজকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয়, সম্মানীত তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক রাণা রাজ্জাক এর কাছে। একটা মানসম্মত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ লেখার দিক নির্দেশনা তিনি আমাকে দিয়েছেন। তাঁর মতো দায়িত্বশীল শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করতে পেরে আমি গর্বিত। আমার শিক্ষা জীবনে যতটুকু অজানা ছিল তা আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ আমার অভিসন্দর্ভ রচনার কাজকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করেছে। তিনি আমার গবেষণার কাজের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং কাজটি যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয় সেজন্য সব সময় আমাকে তাগিদ দিয়েছেন। আমি আমার সম্মানীত, শ্রদ্ধেয় দুইজন তত্ত্বাবধায়কের কাছে চিরঋনী।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক রতন লাল চক্রবর্তী এর কাছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুম, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল রুম ও বাংলাদেশ ফর্মস এন্ড পাবলিকেশন অফিস থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের পরামর্শ দেন। আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক আহমেদ আব্দুল্লাহ জামাল'কে। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক এম.এ কাউসার এবং সহযোগী অধ্যাপক মিলটন কুমার দেব এর মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিশু বিশেষজ্ঞ (সার্জারি) অধ্যাপক ডা. আব্দুল হানিফ (টাবলু) এর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিকিৎসকদের সাথে তিনিই আমাকে পরিচয় করে দিয়েছেন। এই ঋণ অপূরনীয়। আমি আরো কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই জাতীয় অধ্যাপক স্ত্রী বিশেষজ্ঞ ডা. শাহলা খাতুন, শিশু

বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. নাজমুন নাহার, ডা. সারওয়ার আলী, প্রয়াত ডা. সার্জারি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মীর্জা মাজহারুল ইসলাম, প্রয়াত ডা. সাঈদ হায়দার, ডা. কাজী মিসবাহুন নাহার তামান্না, অধ্যাপক ডা. মনোয়ারা বেগম (এনাটমিস্ট) এবং ডা. হুমায়রা বশীর। কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রেজিস্ট্রার শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. কুন্তল বিশ্বাসকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি আমাকে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ওপর লেখা ডা. শঙ্করকুমার নাথ এর গ্রন্থ এবং *175 Years Medical College Bengal* গ্রন্থটির সন্ধান দেন। এই দুইটি গ্রন্থ থেকে আমার গবেষণার সহায়ক অনেক মূল্যবান তথ্য উপাত্ত পেয়েছি।

বাংলাদেশ রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারি পূর্ণাত্মা মহারাজ, নিহার মহারাজ এবং জালাল আহমেদ (অতিরিক্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়) এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশনে আমার থাকার ব্যাপারে এবং কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন থেকে কলকাতার বিভিন্ন লাইব্রেরি এবং পশ্চিমবঙ্গ স্টেট আরকাইভসে গবেষণার কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশের ব্যবস্থা করে দেন। কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশনের তপন মহারাজ, জেনারেল লাইব্রেরির কর্মকর্তা, কর্মচারী, ন্যাশনাল লাইব্রেরির সুপ্রিয় সিনহা, পশ্চিমবঙ্গ স্টেট আরকাইভসের শর্মিষ্ঠা দিদি এবং এই প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কলকাতায় অবস্থানকালে আমার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গবেষণা সংক্রান্ত নানা তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে তাঁরা সর্বাত্মাক সহাযোগিতা করেছেন। তাদের সহযোগিতা ছাড়া তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা কঠিন ও সময় সাপেক্ষ হয়ে যেত।

আমি আরো ধন্যবাদ জানাতে চাই বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির রেয়ার সেকশন, রিপোগ্রাফি বিভাগ, জার্নাল সেকশন, সংবাদপত্র পত্রিকা সেকশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড রুম, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল রুমের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরির কর্মকর্তা, কর্মচারী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরির কর্মচারী কৃষ্ণ দাদা, কলকাতা মেডিকেল কলেজের এক্স-স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন এর কর্মকর্তা, কর্মচারীদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি।

আমি আমার ছোট বোন ইসরাত জাহান (সিনিয়র এসিস্ট্যান্ট জজ) এর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন সময়ে কিছু বিখ্যাত বিদেশি জার্নাল থেকে মূল্যবান প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এসব গ্রন্থ এবং জার্নাল আমার অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে।

এ ছাড়া আমি কৃতজ্ঞ আন্টি হামিদা বানু, ড. আজিজুল হক খান, সহকর্মী ফাহমিদা হক, নীলাদ্রী চ্যাটার্জী এবং ড. রতন সিদ্দিকী এর কাছে। সহকর্মী ফাহমিদা হক এর মাধ্যমে অধ্যাপক আফজালুন্নেসা বাবার সম্পর্কে জানতে পারি। ড. রতন সিদ্দিকী একটি মূল্যবান গ্রন্থের সন্ধান দেন। তার এই গ্রন্থ থেকে তৎকালীন সময়ের পুরান ঢাকা এবং দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে পারি।

আমার নানা মরহুম ডা. আবদুল আজিজ খান এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি শৈশব থেকে আমাকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর কিছু মূল্যবান উপদেশ আমাকে এই পর্যন্ত আসতে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমার বাবা মরহুম এম.এ কুদ্দুস এর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর অনুপ্রেরনা ও উৎসাহ ছাড়া এই পর্যন্ত আসা সম্ভব হতো না। অসময়ে পৃথিবী থেকে চলে গেলেও তাঁর পরামর্শ ও আদর্শে আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। ভালো কিছু করার ক্ষেত্রে আমি সবসময় আমার বাবাকে স্মরণ করি।

আমি যার কাছে চিরঋণী, যার ঋণ কখনো শোধ করা যাবে না এবং যার সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া আমার গবেষণার কাজ কখনও সম্পন্ন হতো না, তিনি হলেন আমার মা জাহানারা খানম। পরিবারের বড় সন্তান হলেও তিনি আমাকে সবসময় পারিবারিক কাজ থেকে দূরে রেখেছেন। আমার গবেষণার কাজ যাতে বাধাগ্রস্থ না হয় সে জন্য তিনি সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। মায়ের এই সমর্থন ছাড়া আমার পক্ষে এই পর্যন্ত আসা সম্ভব হতো না। তিনি আমার শ্রদ্ধেয় বাবা ও নানার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করেছেন। প্রিয় এই দুইজন অভিভাবক পৃথিবী থেকে চলে গেলে আমার মা একা সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। এজন্য আমি আমার স্নেহময়ী মায়ের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

সবশেষে আমি মহান স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিশ্বজুড়ে করোনাকালীন মহাদুর্যোগের সময় আমাকে নিরাপদ ও সুস্থ রাখার জন্য।

চাঁদ সুলতানা কাওছার
পিএইচ.ডি. গবেষক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

BAG	: Bachelor of Agriculture
BFPO	: Bangladesh Forms and Publication Office
BDS	: Bachelor of Dental Surgery
BMA	: Bangladesh Medical Association
BMC	: Bangladesh Medical College
BMR	: Basal Metabolic Rate
BMS	: Bengal Medical Service
BGS	: Bengal General Service
BSMMU	: Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University
BPBEC	: Bengal Provincial Banking Enquiry Commission
CPI	: Communist Party of India
DO	: Diploma in Ophthalmology
DCH	: Diploma in Child Health
DCTD	: Diploma in Chest & Tuberculosis Diseases
DCP	: Diploma in Clinical Pathology
DD	: Diploma in Dermatology
DORB	: Discharge on Risk Bond
DLO	: Diploma in Laryngology & Otology
DMRD	: Diploma in Medical Radio Diagnosis
DMRT	: Diploma in Medical Radio Therapy.
DMC	: Dhaka Medical College
DURR	: Dhaka University Record Room
DUL	: Dhaka University Library
DTMH	: Diploma in Tropical Medicine & Hygiene
DPI	: Director of Public Health
ECG	: Electrocardiography
ER	: Emergency Room
EPMS	: East Pakistan General Service
ECR	: Executive Council Room
GBMC	: Graduate of Bengal Medical College
IPGMR	: Institute of Post Graduate Medicine Research
IERL	: Institute of Education and Research Library

Dhaka University Institutional Repository

ICDDRB	: International Centre for Diarrhoeal Disease Research of Bangladesh
IMC	: International Medical College
IMS	: Indian Medical Service
LMS	: Licentiate Medicine and Surgery
LMF	: Licentiate Medical Faculty
MLA	: Member of the Legislative Assembly
MO	: Master of Obstetrics
MMF	: Membership Medical Faculty
MBBS	: Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery
MOD	: Medical Out Patients Department
MOHF	: Ministry of Health and Family Planning
NMI	: Native Medical Institution
OD	: Out Door
OPD	: Out Patients Department
PCSIR	: The Pakistan Council of Scientific and Industrial Research
PMRC	: Pakistan Medical Research Council
PG	: Post Graduate
PSC	: Public Service Commission
RKMIC	: The Ramakrishna Mission Institute of Culture
SOD	: Surgical Out Patients Department
SG	: Surgeon General
VLMS	: Vernacular Licentiate Medicine and Surgery

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়ের ওপর গবেষণা একটি প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চা। প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তথা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, এর কাজ, বিকাশ এবং লক্ষ্য অর্জনের কার্যকর উপায় ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও ব্যর্থতার বৈধ বিবরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তা যদি হয় একটি বিশেষ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাহলে তা গবেষণার বিশেষ গুরত্ব বহন করে। এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশে গবেষণা হয়নি বললেই চলে। একটি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নত জাতি, রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নত চিকিৎসক শ্রেণি গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখে এবং দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা, রোগ, চিকিৎসা, চিকিৎসাশিক্ষার মান, চিকিৎসার মান, প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে কারা পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা, ইত্যাদি বিষয়সহ প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ইতিহাস তুলে ধরাই হলো আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। ঢাকা মেডিকেল কলেজ তেমনি একটি চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষা কলেজ। সুস্থ জাতি মানে উন্নত জাতি এবং উন্নত জাতি মানে উন্নত রাষ্ট্র। এই প্রতিষ্ঠান থেকে যথাযথ শিক্ষালাভ করে চিকিৎসকগণ জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত ও উন্নত চিকিৎসা সেবা দিতে পারবে, সে কারণে এটা প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সাথে এই মেডিকেল কলেজ ছিল তৎকালীন ঔপনিবেশিক ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তথা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের আধিপত্যের ফসল।

ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) ক্ষমতা ও জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করেন। এটা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ নিয়ন্ত্রণের একটি রূপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার মধ্যে যে পারস্পারিক সম্পর্ক রয়েছে, তা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসবিদগণ জোরালোভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন।[১] বিজ্ঞানকে ক্ষমতা থেকে আলাদা করা যায় না। জ্ঞান যেমন হয় তাত্ত্বিক, তেমনি হয় ব্যবহারিক। তাত্ত্বিক জ্ঞান গ্রন্থের বিভিন্ন পাঠ থেকে অর্জন করা হয়। ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। ব্রিটিশ শাসন আমলে ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও চিকিৎসাশিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ফুকো'র ক্ষমতা ও জ্ঞান বিশেষভাবে কার্যকর। ফুকো চিকিৎসাকে প্রকৃতিগত নিয়মনীতির একটি অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যা ইউরোপীয় জ্ঞানদীপ্ত যুগের সময় থেকে ঔপনিবেশিক এবং অন্যান্য আধুনিক সমাজকে দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রদর্শন করে। এ ক্ষেত্রে যুক্তি দেওয়া হয় যে, চিকিৎসকরা এসব রীতিনীতি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[২] এতে করে একদিকে যেমন অতিপ্রাকৃতের ওপর বিশ্বাস কমেছে অন্যদিকে বিজ্ঞানভিত্তিক রীতিনীতির ওপর বিশ্বাস জন্মেছে।[৩] উল্লিখিত বিষয়টি ফুকো তাঁর *'দ্য বার্থ অব দ্য ক্লিনিক'* গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, ১৭৬০-১৮১০ এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়। এ সময়কালেই জন্মলাভ করে ক্লিনিক্যাল কাজ বা পর্যবেক্ষণ, যা পূর্বের চিকিৎসাবিজ্ঞানে দেখা যায় না। জীবন ও মৃত্যু চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে। রোগকে আর পাপ বা শয়তানের কাজ বলে ব্যাখ্যা না করে পরীক্ষা নিরীক্ষা নির্ভর জ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা প্রচলন শুরু হয়। যেখানে ময়না তদন্ত বা মৃতদেহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা একটা সাধারণ নিয়মনীতির অংশে পরিণত হয়। তার মতে, চিকিৎসা জ্ঞানে মৃত্যু বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে জীবিত ব্যক্তি চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক বিরাট ভিত্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৪]

এর প্রভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। এর ফলে এনাটমিক্যাল এবং ক্লিনিক্যাল অনুশাসনের জন্ম হয়। ফুকোর মতে, শরীরবিদ্যা বা চিকিৎসার এ ক্ষেত্রে নতুন কিছু ধ্যানধারণার জন্ম হয়, তা হলো চিকিৎসকের স্থিরদৃষ্টি এবং তার কাজ (প্রাকটিস)।[৫] চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান তথা হাসপাতালের মাধ্যমে চিকিৎসক এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা চর্চা শুরু করে। এই ক্ষমতা চিকিৎসকের অন্তর্দৃষ্টির ক্ষমতা, স্থিরদৃষ্টির ক্ষমতা, যা ব্যবহার করে দেহের অতি ক্ষুদ্র অংশ পর্যবেক্ষণ এবং সমগ্র দেহের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো কোন রীতিনীতির আলোকে কাজ করে, তা ব্যাখা করেন। চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্ক তৈরির মধ্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়, যেখানে রোগী চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। চিকিৎসক হাসপাতালে বা ক্লিনিকে রোগীকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রতঙ্গ তাঁর পর্যবেক্ষণের আওতায় চলে আসে এবং দেহের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করেন।[৬] এটা এক ধরনের ক্ষমতা, যা শরীর জ্ঞানের ভিত্তিতে সৃষ্টি এবং এই প্রক্রিয়ায় রোগীর আত্মা এবং দেহ উভয় চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। চিকিৎসক তাঁর অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে হাসপাতাল, ক্লিনিক তথা গোটা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে। চিকিৎসকের অর্জিত জ্ঞান একটি শক্তি বা সমাজকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। ফুকোর মতে, চিকিৎসাবিজ্ঞান মানববিদ্যা বিকাশের ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রেখেছে।[৭]

এই ধারণা থেকেই ডেভিড আরনল্ড (১৯৯৩) *Colonizing the Body : State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth - Century India* গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থের নামকরণে তিনি যুক্তি দেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ভারতীয়দের দেহ ও মনের ওপর ক্রমবর্ধমানহারে প্রভাব ফেলে। এটা তাদের চিন্তা, অনুভূতি এবং আকাঙ্খাতে বিস্তার লাভ করে। তিনি ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে পাশ্চাত্য চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে মেডিকেল প্রাপ্ত রীতিনীতির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতাকে ইঙ্গিত করেছেন। এসব রীতিনীতির একটি হলো পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিধি, যা ছড়িয়ে পড়ে। আরনল্ড এর লেখায় দেখা যায় যে, অনেক ভারতীয় পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যবিধি গ্রহণ করতে শুরু করে এবং দেশীয় রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা সমালোচিত হতে শুরু করে।[৮] তিনি (আরনল্ড) দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন যে,

> Even those, like M.K. Gandhi who were ostensibly critical of Western medicine, came to think of India in medical terms, as a "body politic" which had become "weak" and diseased' and unable to resist infection from 'foreign bodies'. As Bhiku Parekh puts it, Gandhi had, in effect, appointed himself as India's "national physician".[৯]

ডেভিড আরনল্ড তাঁর গ্রন্থে ঔপনিবেশিক ভারতের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমে রাষ্ট্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা উপনিবেশ স্থাপনকারী ও উপনিবেশে বসবাসকারীদের মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। তিনি তিনটি প্রধান মহামারীজনিত রোগ যেমন, কলেরা, বসন্ত, প্লেগের ওপর পাশ্চাত্য চিকিৎসার হস্তক্ষেপের প্রভাব বিশ্লেষণ করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসা ভারতে কেবলমাত্র পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অর্পিত হয়নি, বরং স্থানীয় ও ভারতীয়দের চাহিদা বা প্রয়োজন অনুসারে প্রবর্তিত হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসার এই বিস্তারকে শরীরের কেন্দ্রীয়কতা দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার আধিপত্যকে বুঝিয়েছেন এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা কিভাবে ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রভাবিত ও সন্নিবদ্ধ করে তা দেখানোর চেষ্টা করেন।[১০]

ফুকোর জ্ঞান ও ক্ষমতা তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পশ্চাতে প্রধান কারণ এদেশে ইংরেজ রাজ্যকে বজায় রাখা। ইংরেজ সরকারকে এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে অসংখ্য সৈন্য রাখতে হতো। এর ফলে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহে অনেক সৈন্য হতাহত

হতো এবং সুচিকিৎসার অভাবে অনেকে প্রাণ হারাতো। চিকিৎসকের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ কোনো হাসপাতাল ছিল না। সে সময় (১৭০৫-১৭০৭) তথা অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আনুমানিক ১২০০ জন ইংরেজ কলকাতা শহরে বসবাস করত। মাত্র এক বছরের মধ্যে ৪৬০ জন ইংরেজ মারা যায়।[১১] এ সময় শহরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল। এমতাবস্থায় ইংরেজ সরকার একটি হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা তীব্র অনুভব করে। তাই ১৭০৭ সালে কলকাতার গ্যাস্টিন প্লেসে ইংরেজ সরকার নিজেদের জন্যই প্রথম 'জেনারেল হাসপাতাল' গড়ে তোলেন। এই হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা বেশির ভাগ সৈন্যই মারা যেত। সমসাময়িক নাবিক আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন *A New Account of the East Indies, Being the Observations and Remarks* 1688-1723 গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> The company has a pretty good hospital at Calcutta, where many go in to undergo the penance of physick *[Sic]*, but few come out to give an Account of its Operations.[১২]

১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করলে হাসপাতালটির ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। এ সময় সাময়িকভাবে কাজ চালানোর জন্য একটি অস্থায়ী হাসপাতাল নির্মাণ করে। ঐতিহাসিক সি. আর. উইলসন এই হাসপাতালকে কলকাতার দ্বিতীয় হাসপাতাল হিসেবে অভিহিত করেন।[১৩] ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের পর কলকাতার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সারাবছর নানারোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যেত। এ সময় ডাক্তার এডওয়ার্ড ইভস এর রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, তখন স্কার্ভি, যকৃত, প্লীহার রোগ, নানাবিধ পেটের রোগ, বাত, জ্বর, সর্দি ও যৌনরোগ প্রভৃতি রোগে মানুষ আক্রান্ত হতো। এক বছরে ১১৪০ জন রোগীর ১৫৩ জন মারা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আগত ইংরেজদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন থেকে ৭৫ জন এদেশে মারা যেত।[১৪]

এরূপ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি বড় স্থায়ী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। রেভারেন্ড জন জ্যাকারিয়া কিয়েরন্যানডার (১৭১০-১৭৯৯) এর কাছ থেকে ইংরেজ সরকার চৌরঙ্গীর বিশাল বাগান বাড়ি কিনে সেখানে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল গড়ে তোলেন। হাসপাতালটি সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয়দের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রধান অংশ ছিল সৈন্য। দেশীয়দের এখানে চিকিৎসা করার কোনো অধিকার ছিল না। হাসপাতালের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর ও বাতাস চলাচলে উপযোগী এবং শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল। চার্লস লুসিংটন উল্লেখ করেন যে,

> The situation of the hospital is airy and healthy and it is sufficiently far from the city without being inconveniently distant from Fort William, the soldiers from which are its principal inmates.[১৫]

এরপর ১৭৮৭ সালে সরকার টিকাকরণের জন্য দমদমে একটি হাসপাতাল তৈরি করেন। এ বছর ১০১ জন এবং ১৭৮৮ সালে ৭২ জনের টিকা দেওয়া হয়।[১৬] ১৭৮৯ সালে কলকাতায় পুলিশদের জন্য আরেকটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হাসপাতালে প্রথমদিকে দুইজন কবিরাজ চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন। পরে ১৮০২ সালে ইউরোপীয়ান সার্জন কাজ শুরু করেন। এই হাসপাতাল প্রসঙ্গে সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়,

> It was used from an early period for the purpose of affording relief to the houseless sick poor picked up in the streets and as a hospital for the sick of the Town Police.[১৭]

এই যাবত যতগুলো হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলোতে দেশীয়দের চিকিৎসা পাবার কোনো অধিকার ছিল না। ফলে এদেশের মানুষের অসুস্থতা, দুর্ঘটনাজনিত কারণে অঙ্গহানি হলে তারা চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু বরণ করত। এই সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করলে এবং এরূপ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মেডিকেল বোর্ডের সদস্য রবার্ট উইলসন এর প্রস্তাব অনুসারে ১৭৯২ সালে কলকাতায় 'ন্যাটিভ হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে। একই বছরের আগস্ট মাসে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়,

> কলকাতায় বসবাসকারী দেশীয় মানুষেরা বিশেষত, শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের লোকেরা ক্রমশই দুর্ঘটনায় সম্মুখীন হন। কিন্তু এ দেশের চিকিৎসকদের শল্য, ভেষজ বা ব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকায় আহত শ্রমজীবীদের যথাযথ চিকিৎসা হইত না। ফলে তাহারা সারাজীবন পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকিত অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এমতাবস্থায় শ্রমজীবীদের জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন করা প্রয়োজন। এই জন্য সরকারি চেষ্টার সঙ্গে বেসরকারি আর্থিক সহায়তা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১৮]

১৭৯৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্যক্তিগত কলুটোলার ফৌজদারি কলকারখানার ভাড়া করা বাড়িতে 'ন্যাটিভ হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৬ সালে হাসপাতালটিকে ধর্মতলা স্ট্রিটে স্থানান্তরিত করা হয়। রেভারেন্ড জেমস লঙ এই হাসাপাতাল প্রসঙ্গে বলেন,

> The Native Hospital owes its origin to the suggestion of the Rev. John Owen, a chaplain; the plan was proposed in 1793, when the Marquis Cornwallis granted it 600 Rs. per month; the private subscriptions amounted to 54,000 Rs. Lord Cornwallis gave 3000 Rs., each Membr of Council 4500 Rs, The Nawab Vizier gave 3000 Rs. It was established at first in the Chitpur-road, and opened September the 1st, 1794; but in 1798 the managers purchased ground in 'the open and airy road of Dharmatala.[১৯]

১৮০২ সালের শেষদিকে বসন্ত ও কলেরা রোগের মহামারী প্রতিরোধ করার জন্য ন্যাটিভ হাসপাতালে টিকা দেওয়া শুরু করে। প্রথম দিকে এই টিকা নিয়ে জনসমাজে অসন্তোষ দেখা দিলে তা দূর করার জন্য সংবাদপত্রে বাংলা ও হিন্দি ভাষাতে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। মানুষের ভয় দূর করা এবং টিকা নেওয়ার জন্য দেশীয় ব্যক্তিদের দিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়।[২০] এর ফলে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে পূর্ববাংলার ঢাকাসহ মুর্শিদাবাদ, কলকাতার গরানহাটা ও কলিঙ্গায় শাখা খোলা হয়। এই টিকাকরণ ব্যবস্থায়ই ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি ভারতীয়দের আকৃষ্ট করে। ডেভিড আরনল্ড তাঁর 'Smallpox and Colonial Medicine' এবং মৃদুলা রমানা তাঁর 'Indian Response to Western Medicine: Vaccination in the City of Bombay in the Nineteenth Century' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন,

> State-funded programmes for vaccination against smallpox also gradually displaced the indigenous practice of variolation.[২১]

এরপর দ্য স্কুল ফর ন্যাটিভ ডক্টরর্স (১৮২২) বা ন্যাটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশন (১৮২৪ সালে পরিবর্তিত নাম), কলকাতা সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪), কলকাতা মাদ্রাসায় (১৭৮১) চিকিৎসা ক্লাশ শুরু হয়। এগুলোর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজের জন্ম হয় কারণ দেশীয় চিকিৎসাশিক্ষা বিজ্ঞানভিত্তিক না হওয়ায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আলেকজান্ডার ডাফ এর মতে, 'আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কিছুই নাই। ইংরেজি ভাষায় ইউরোপীয়দের মতো শিক্ষাদান করাই সর্বতোভাবে উচিত।'[২২] ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল ও পরিবর্তিত হয়েছিল

Dhaka University Institutional Repository

বলে মনে করা হয় যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক রীতিনীতি ও ভারতীয় চিকিৎসকদের বিধি বহির্ভূত ও ঘরোয়া চিকিৎসা উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদকে মেনে নেয়।[২৩] এই সংশয়বাদের একটি দিক হলো এনাটমি ও ফিজিওলজির ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ধারণার মধ্যে বিভেদের ফল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ন্যাটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশনে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ না করে প্রাণি ব্যবচ্ছেদ করা হতো। এটা তৎকালীন চিকিৎসা ব্যবস্থার একটা বড় ক্রটি। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ ছাড়া চিকিৎসাশিক্ষা অসম্পূর্ণ। এর ফলে মানবদেহের অঙ্গ প্রতঙ্গ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানা সম্ভব না। তাই ন্যাটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশন বন্ধ করে দেওয়ার ফলে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে ঔপনিবেশিক সরকার তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা তুলে নেয়। বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে, যা ইউরোপীয় তথা বিশ্বমানের চিকিৎসাশিক্ষার সমমানের। ফুকোর 'জ্ঞান ও ক্ষমতা' তত্ত্ব অনুসারে এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাশিক্ষাকে গ্রহণ করে এর বাস্তব রূপ দেন এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত। তিনি বাংলার নবজাগরণের একজন পথিকৃত। তিনি প্রথম মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ (১৮৩৬) করে ঔপনিবেশিক ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার মানদণ্ড পৃথিবীর মানদণ্ডের সমমর্যাদায় নিয়ে যান।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষায় পারদর্শী একদল চিকিৎসক শ্রেণি গড়ে তোলাই ছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজের উদ্দেশ্য। তারা ইউরোপীয় সেনা, নাবিক, ইউরোপীয়ান ও দেশীয়দের উন্নত চিকিৎসা সেবা দিয়ে সাম্রাজ্যকে রোগ মুক্ত ও সাম্রাজ্যের জনসাধারণকে নিরাপদ, সুস্থ রাখবে। এর ফলে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বে সুশৃঙ্খল থাকবে। ধীরে ধীরে এদেশের জনসাধারণের পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রতি আগ্রহ বাড়ে এবং অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তানদের এই কলেজে ভর্তি করতে শুরু করেন। এমনকি বাংলার অনেক বৈদ্য (চিকিৎসক) সন্তান দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র তথা আয়ুর্বেদশাস্ত্র ছেড়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে ভর্তি হতে শুরু করে।

এটা স্পষ্ট হয় যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসার সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব এবং ব্রিটিশ শাসনের নিয়মনীতি কিছুটা হলেও সংস্কারমুক্ত বা অসাম্প্রদায়িক ছিল।[২৪] এই চিকিৎসা ব্যবস্থার ফলে ঔপনিবেশিক ভারতের হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে সব ধর্মাবলম্বীর মানুষ সুফল ভোগ করে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রভাবে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ভারতে দেশীয় চিকিৎসার পরিবর্তে নতুন চিকিৎসা ব্যবসা শুরু হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও চিকিৎসাশিক্ষা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে পূর্বের মহামারী রোগ যথা কলেরা, বসন্ত, প্লেগ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যু, শিশু মৃত্যু ইত্যাদির হার অনেকটা কমে আসে। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষের জনগণও এই চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থা আয়ুর্বেদ ও তৎপরবর্তীকালে ইউনানি বিজ্ঞানভিত্তিক না হওয়ায় ক্রটিপূর্ণ ছিল। মুসলমান রাজত্বের ইসলামের আবির্ভাব ও প্রাধান্যের ফলে ভারতবর্ষের প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থা বা আর্য়ুবেদ চিকিৎসা পদ্ধতি অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোগল সম্রাট বাবরের আমল হতে ইউনানি চিকিৎসকগণ ও গ্রন্থরচয়িতাগণ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট অংশগুলো গ্রহণ করে ইউনানির চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং সমাজে ইউনানি চিকিৎসার নামে বহুলাংশে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করে। পরবর্তীতে ইউনানি ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির মিলনে তিব্বি বা ইউনিতিব চিকিৎসার উদ্ভব হয়। ইংরেজ শাসনকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (১৭৫৭-১৮৫৮) ও ব্রিটিশ রাজ্যের শাসনকাল (১৮৫৮-১৯৪৭) পর্যন্ত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ব্যাপক অবনতি হয়। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচার ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রসারের ফলে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির উচ্ছেদ কাজ শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকার চলচিত্র, পুস্তক, প্রকাশনা, পত্রপত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির ভিত সুদৃঢ় করেন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রচারাভিযান শুরু করেন। ১৮১৮ সালে *'বৈদ্য নিন্দা'*, ১৮১৯ সালে রামকমল সেন এর *'ঔষধ সার সংগ্রহ'*, ১৮২৬ সালে কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ডাক্তার ব্রিটন রচিত *'ওলাওঠা বিবরণ'* *'Vocabulary of Medical Terms'* গ্রন্থ, ১৮৫৪ সালে অধ্যাপক পি. কুমার এর বাংলা ভাষায় *'ঔষধ ব্যবহারক'* গ্রন্থ, একই বছর এস.সি. কর্মকারের *'ঔষধ প্রস্তুত বিদ্যা'*, রোজারিও এন্ড কোম্পানি এর *'Bachelor's Medical Guide'*, ১৮৫৭ সালে শিবচন্দ্র দেব এর *'শিশুপালন'* ১৮৬২ সালে গৌরীনাথ সেন এর *'শারীরিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান'* ১৮৬৪ সালে রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এর *'স্বাস্থ্যরক্ষা'*, ১৮৬৮ সালে ডা. যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এর *'শরীর পালন'* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া ১৮৬৬ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিষয়ক প্রথম সাময়িক পত্রিকা *'চিকিৎসক'* প্রকাশিত হয়।[২৫] এসব গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির উত্তরোত্তর প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

এসব প্রচার ও প্রসারের ফলে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ওপর চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মেডিকেল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সমগ্র ভারতবর্ষে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও মাঝে মাঝে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতো। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা টিকে থাকেনি। মার্ক হ্যারিসন বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন,

> This point is further underlined by the fact that Indians of 'modernising' nationalist or leftlist outlook often used progress in medicine and sanitation as a stick to beat the British. High levels of disease, they argued, were an index of imperial neglect.[২৬]

ইংরেজ সরকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য, সাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ন ও সাম্রাজ্যের জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা প্রবর্তন করে। অর্থাৎ তারা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্বারা এদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। অনেকটা ফুকো'র জ্ঞান ও ক্ষমতা তত্ত্বের মতো। ফুকো'র মতে, যেখানে ক্ষমতা, সেখানেই প্রতিরোধ (where there is power, there is resistance)। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা ও শিক্ষা বিধিবদ্ধভাবে প্রবর্তন করতে গিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যে তীব্র বির্তকের সৃষ্টি হয়। সেই বির্তকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের জয় হয়। দেশীয় চিকিৎসাশিক্ষায় এনাটমি ও শল্য চিকিৎসার অনুপস্থিতি ছিল। বলা হয় যে, প্রাচীন শল্য, শালাকা ও প্রসুতিতন্ত্রের পরিবর্তে এ্যালোপেথিক সার্জারি, ই.এন.টি. এবং গাইনোকোলজি বিদ্যার চর্চা ও চিকিৎসার প্রচলন হওয়ায় প্রাচীন আয়ুর্বেদের অবনতি চরম সীমায় উপনীত হয়।[২৭]

উপরন্তু কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত ধর্মীয় কুসংস্কার উপেক্ষা করে প্রথম মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যে কোনো অজুহাতে সাধারণ মানুষকে সমাজচ্যুত করত। তাঁর সম্মানার্থেই হোক বা হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নতুন একটা দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ব্রিটিশ সরকার তোপধ্বনি দ্বারা সেই খবর জনগনকে জানান। অন্যদিকে মধুসূদন গুপ্ত প্রমাণ করেন যে, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বৈদ্যদের শব ব্যবচ্ছেদ করার অধিকার আছে।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ রাখার প্রয়োজনে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন করলেও এর পেছনে কিছুটা হলেও সামাজিক, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা কাজ করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমগ্র ভারতবর্ষের সকল স্তরের জনসাধারনের কাছে এর চিকিৎসাশিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। ফলে প্রথম দিকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে উচ্চবংশীয় পরিবারের সন্তানদের এই কলেজে ভর্তির নিয়ম থাকলেও পরবর্তীতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই মেডিকেল কলেজের পাশ করা ছাত্রদের দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের চিকিৎসকের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। তাই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও বেশ কিছুসংখ্যক মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু পূর্ববাংলায় কোনো মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় নানারকম বাধা আসলেও পূর্ববাংলার জনগণ স্বইচ্ছায় এই অঞ্চলে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দাবি জানায়। তারা ইতিমধ্যে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা ও চিকিৎসাশিক্ষার মান সর্ম্পকে অবগত ছিলেন। এই অঞ্চলের ছাত্ররা কলকাতায় চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণের জন্য যেত। এই ছাত্রদের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। ফলে পূর্ববাংলার ছাত্ররা এই চিকিৎসাশিক্ষা এবং এখানকার জনগণ উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত ছিল।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পূর্ববাংলায় কোনো মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। আর্থিক সংকট ও তৎকালীন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অবশেষে ১৯৪৩ সালে ভারত সরকার স্যার জোসেফ উইলিয়াম ভোর এর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৬ সালের ১ জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজের যাত্রা শুরু হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এমন এক সময়ে এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে, যখন তারা তাদের ক্ষমতা ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেনি, বরং তারা পূর্ববাংলার জনগণের দাবিদাওয়া ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। মেডিকেল কলেজটি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পূর্ববাংলার জনসাধারণ বিশেষ করে দেশীয় চিকিৎসকগণ বা কবিরাজগন কোনো প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেনি। সরকারি নথিপত্র, তৎকালীন সময়ের পত্রপত্রিকা, প্রতিবেদন, বই-পুস্তকে এমন কোনো ঘটনা বা প্রতিরোধের নজির পাওয়া যায়নি। উপরন্তু পূর্ববাংলার রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করেছেন। পূর্ববাংলার জনগণ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাশিক্ষাকে স্বাগত জানায়। ফলে ব্রিটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তর করলেও তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা জ্ঞানের আধিপত্য এখনও টিকে রয়েছে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ওপর পর্যালোচনার জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো ১৯৪৭-১৯৭১। এই সময়কাল নির্ধারণের অনেক তাৎপর্য রয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয় এবং ১৯৭১ সালে বর্তমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর পুরো কার্যক্রম শুরু হয় দেশ বিভাগের পরে। এ সময় মেডিকেল কলেজের মধ্যেও ভাঙ্গাগড়ার কাজ চলতে থাকে। বিশেষ করে দেশ বিভাগের পর মেডিকেল কলেজের অনেক হিন্দু শিক্ষক, ছাত্র, কর্মকতা, কর্মচারী ভারত চলে যায় এবং ভারতের বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে পূর্ববাংলার শিক্ষক, চিকিৎসক, ছাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজে চলে আসেন। তারা

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা মেডিকেল কলেজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। এর ফলে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে আধুনিক উঁচু স্তরের পাশ্চাত্য চিকিৎসার গোড়াপত্তন হয়। এই অঞ্চলের উন্নত চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক ধরনের নবজাগরণ বলা চলে, যা পূর্বে এই অঞ্চলে ছিল না। অথচ এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গঠনমূলক ও ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা অত্যন্ত সীমিত, বরং ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা নেই বললেই চলে। এই কলেজ তৎকালীন পূর্ববাংলার বা পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং বর্তমানে তা অব্যাহত রয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা নিয়ে কোনো গবেষণা না হলেও গত দুই দশক ধরে দক্ষিণ এশিয়া ও ব্রিটিশ ইতিহাসবিদগণ ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বিশ্বময় পটি, চিত্তব্রত পালিত, শ্রীলতা চ্যাটার্জী, অপরাজিতা ধর, পুনাম বালা, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, মাধুরি শর্মা, পার্থ দত্ত, সঞ্চারি দত্ত, অচিন্ত কুমার দত্ত, প্রজিত বিহারি মুখার্জী, মৃদুলা রমনা প্রমুখ এবং ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ডেভিড আরনল্ড, মার্ক হ্যারিসন প্রমুখ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও রোগ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন।

চিত্তব্রত পালিত ও অপরাজিতা ধর সম্পাদিত (২০১৯) *Medical History of India: Discipline, Disease, Death* গ্রন্থে ১৯ জন গবেষকের ১৯ টি বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ রয়েছে। নিম্নে তাদের প্রবন্ধের বিষয়গুলো,

১. ইথনো চিকিৎসাশিক্ষা। এই প্রবন্ধে দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার বৃহত্তম নৃগোষ্ঠী সাঁওতালদের চিকিৎসা দর্শনের ওপর গবেষণা করা হয়।

২. জল চিকিৎসার গুনাগুন — প্রাকৃতিক উপায়ে রোগ নিরাময়ের অংশ হিসেবে জল চিকিৎসার গুনাবলীর ওপর গবেষণা করা হয়েছে। এটা অতীতকাল থেকে ভারত উপমহাদেশের নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল।

৩. সাধারণ মানুষকে মানসিক ও শারীরিকভাবে চিকিৎসায় সুফী মুবারক শাহ গাজীর কার্যক্রম ও ভূমিকা, চিকিৎসা পদ্ধতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, মানব সমাজে এর প্রভাব সর্ম্পকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. মহেন্দ্রলাল সরকারের মাধ্যমে হোমিওপ্যাথির উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসার ইতিহাস বিশেষ করে বাংলার সাথে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এবং বিশ্ব চিকিৎসায় চাইনিজ চিকিৎসার অবদান যাচাই বাছাই ও কার্যকারিতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৬. উনবিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা ও সাম্রাজ্য — রোগ চিকিৎসার ইতিহাস বোঝাতে গিয়ে ইংরেজ কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা উপনিবেশিকরণ প্রক্রিয়ার একটি উপায় বলে উল্লেখ করা হয়। চিকিৎসা ব্যবস্থা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এককভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটি একটি সামাজিক শ্রেনি ও বিস্তীর্ন এলাকার মধ্যে স্থান করে নেয়।

৭. উনবিংশ শতাব্দীতে বোম্বেতে কলেরা ও এর প্রতিরোধ তুলে ধরা হয়। এ সময় ভারতবর্ষে কলেরা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে গুরুত্ব পায়।

৮. ম্যালেরিয়া জ্বর এর আবিষ্কার এবং ঔপনিবেশিক বাংলায় এর ব্যাপক প্রকোপ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ম্যালেরিয়া জ্বরের ঔষধ হিসেবে চিনচোনা (Chinchona) গাছের আবিষ্কার, এর সুফল এবং গাছ উদ্ভাবনের ইতিহাস পাওয়া যায়।

৯. ১৯৩৬ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রনে রকফেলার ফাউন্ডেশনের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে লেখা হয়।

১০. ব্রিটিশ ফার্মাসিউটিক্যাল শিক্ষার সূচনা এবং ফার্মাসির ঐতিহাসিক ভিত্তির সন্ধান, প্রাচীন ভারতে ঔষধের ব্যবহার, ব্রিটিশদের দ্বারা ব্রিটিশ ভারতে ফার্মাসিউটিক্যালের সূচনা এবং ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এর সামাজিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের তথ্য পাওয়া যায়।

১১. ব্রিটিশ মহিলা এডিথ ব্রাউন এর জীবন ও কর্ম–পাশ্চাত্য জ্ঞান ভারতীয় সমাজের অবহেলিত নারীদের অবস্থা, তাদের ভগ্ন স্বাস্থ্য ও নারীদের অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

১২. বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ঔপনিবেশিক বাংলার মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের সমস্যা নিয়ে লেখা হয়।

১৩. ঔপনিবেশিক বাংলাসহ বিশ্বজুড়ে গুটিবসন্তের প্রকোপ এবং দেশীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪. বোম্বে ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে আলোকবর্তিকা নারী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল এর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কার।

১৫. ঔপনিবেশিক রাঢ় বাংলায় তিনটি হাসপাতালের বিষয়ে দেশীয়দের উদ্যোগ ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি, বিশেষ করে বাকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় তিনটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সরকারের অবদান সামান্য হলেও ব্যক্তি ও বেসরকারি পর্যায়ের ব্যাপক প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬. কলকাতার পৌর প্রশাসন ও জনস্বাস্থ্য বিকাশে কলকাতা কর্পোরেশনের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্যবহুল প্রবন্ধ লেখা হয়েছে।

১৭. পূর্ববাংলার ঢাকায় মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠায় রবার্ট মিটফোর্ড এর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৮. ভারতীয় গণতন্ত্রের মতাদর্শগত কাঠামোর উন্নত অবস্থা বোঝার জন্য ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর ভারতের উভয় সময়ের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৯. ভারতের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি, ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্যবিধি পুনর্বিবেচনা (১৯৫০ - ২০০০) নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করার হয়েছে যে, চিকিৎসার ইতিহাসের যেমন সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি এর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। বেশির ভাগ গবেষকই ফুকোর লেখা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, পাশ্চাত্যের আধুনিক, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা জ্ঞানের মাধ্যমে উপনিবেশে বসবাসকারী জনসাধারনের ওপর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আরোপ করেন। ডেভিড আরনল্ড, মার্ক হ্যারিসন, দিপক কুমার, চিত্তব্রত পালিত এবং অন্যান্য গবেষক উল্লেখ করেন যে, ভারতে ঔপনিবেশিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পেছনে সামরিক বিস্তারের সাথে সাথে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। তাই ড্যানিয়েল আর. হেডরিক (Daniel R. Headrick) পাশ্চাত্য চিকিৎসাকে সাম্রাজ্যের একটি হাতিয়ার (Tools of Empire) হিসেবে উল্লেখ করেন।[২৯]

মার্ক হ্যারিসন, বিশ্বময় পটি সম্পাদিত (২০০৮) *The Social History of Health and Medicine in Colonial India* গ্রন্থে ঔপনিবেশিক ভারতের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়গুলোকে এমন স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভারতের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা বিষয় তথা জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, মানসিক অসুস্থতা এবং ঔপনিবেশিকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে। এই গ্রন্থেরই প্রথম অধ্যায়ে 'ঔপনিবেশিক ভারতের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সামাজিক ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে তাঁরা সময়ের সাথে সাথে পাশ্চাত্য ও দেশীয় উভয় চিকিৎসা পদ্ধতি স্থানীয় (ভারতীয়) ও আঞ্চলিক পরিবর্তন এবং ভারতীয় সমাজের রীতিনীতির মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতিতে নতুন প্রবনতার চিত্র ফুটিয়ে তোলেন।[৩০]

ডেভিড আরনল্ড (২০০০) এর *The New Cambridge History of India : Science, Technology and Medicine in Colonial India* গ্রন্থে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং চিকিৎসার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। যার মাধ্যমে তৎকালীন ঔপনিবেশিক আমলের ভারতবর্ষ সর্ম্পকে জানা যায়। এটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পর্যন্ত একটি বিস্তৃত ও বিশ্লেষণমূলক জরিপ। ভারতে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাচেতনা বিকাশের সাথে মিল রেখে চিকিৎসা, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ওপর বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এবং আধুনিক ভারত গঠনে পাশ্চাত্যের হস্তক্ষেপের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এই গ্রন্থে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মধ্যে সর্ম্পক, কোম্পানির অধীনে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও চিকিৎসার সূচনা, প্রকৃতি, রাষ্ট্রীয় বৈজ্ঞানিক পেশা তৈরি, সাম্রাজ্যিক বিজ্ঞান এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের উত্থান, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা গবেষণার প্রভাব এবং জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানের দ্বন্দ্বের ওপর আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থ থেকে আধুনিক ভারত সর্ম্পকে জানা যায়।[৩১]

শ্রীলতা চ্যাটার্জী (২০১৭) এর *Western Medicine and Colonial Society: Hospitals of Calcutta* 1757–1860 গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে সাথে এর চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রকৃতি ও সর্ম্পক দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলের শুরুর দিকে বিভিন্ন ধরনের হাসপাতাল তথা ইউরোপীয়ান এবং দেশীয়দের জন্য হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, মানসিক হাসপাতালের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এগুলো ঔপনিবেশিক পরিবেশে বিকশিত হয়েছে তারপরও এগুলো প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, গঠনগত বৈশিষ্ট্য এবং কার্যক্রমের দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। তাই ঔপনিবেশিক আমলের পাশ্চাত্য চিকিৎসার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা সর্ম্পকে ধারনা লাভ করতে হলে শহুরে সমাজের সংস্কৃতি ও আচরণগত নিদর্শনগুলো দ্বারা হাসপাতাল ও স্বাস্থসেবার প্রতিষ্ঠানিক ইতিহাস তুলে ধরেন। এভাবে সামাজিক ইতিহাসে চিকিৎসার ইতিহাস মিশ্রিত হয়ে এর বিস্তারের মাত্রাকে বৃদ্ধি করে।[৩২]

মার্ক হ্যারিসন ও বিশ্বময় পটি সম্পাদিত (2001) *Health, Medicine and Empire: Perspectives on Colonial India* গ্রন্থে ঔপনিবেশিক ভারতের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ সময়ের চিকিৎসার সামাজিক ইতিহাসের সাথে যুক্ত এমন কিছু বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটিতে পর্তুগিজদের আগমনের শুরু থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত চারটি ধাপে ভারতীয়দের দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে ইউরোপীয়দের সর্ম্পক, চিকিৎসা পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে প্রাচ্য পুনর্জাগরণ, ঔপনিবেশিক ভারতে ধর্মযাজকদের কৌশল হিসেবে চিকিৎসার উদ্ভব, ঔপনিবেশিক ভারতের দুইটি মানসিক আশ্রম ও একটি কুষ্ঠ আশ্রমের সাথে ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা, ভারতীয় জনসাধারণের ঔপনিবেশিক

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার, কুষ্ঠ আশ্রম স্থাপন এবং আশ্রয় প্রাপ্ত রোগীদের অসন্তোষ, এর প্রকৃতি, কুষ্ঠ রোগের ধারণা সর্ম্পকে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য, অভিজাত ও ধর্মযাজকদের পৃষ্ঠপোষকতা, আশ্রমে বর্ণপ্রথার উপস্থিতি, বসন্ত রোগ নিয়ন্ত্রণ, ইউরোপীয় প্রযুক্তি ভারতীয়দের উদ্ভাবন, ঔপনিবেশিক ভারতে টিকা দেওয়ার প্রযুক্তিগত দিক, ভারতীয় সমাজের সাথে ঔপনিবেশিক চিকিৎসার মিথস্ক্রিয়া, কলেরা ও প্লেগ রোগ সৃষ্টিকারী দুইটি তীর্থস্থান উড়িষ্যার পুরী এবং মহারাষ্ট্রের পান্ধারপুর মেলায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, মেলা উপলক্ষ্যে দেশীয় এবং ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্য অথবা প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিক্রিয়া, মিথস্ক্রিয়া, রাজের (Raj) অধীনে ভারতীয় ঔষধ শিল্পের বিকাশ (১৮২০-১৯২০), দেশীয় (ভারতীয়) উদ্যোগ ও উৎপাদনের ধারণার সাথে উপনিবেশবাদের মিথস্ক্রিয়া আধুনিক চিকিৎসার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য ইউনানি নিয়ে ডাক্তারদের সাথে বিতর্কের সৃষ্টির ওপর বিস্তৃত বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত, গ্রন্থটিতে ভারতীয়দের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এবং ঔপনিবেশিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে ভারতীয়দের মিথস্ক্রিয়া নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[৩৩]

ডা. শঙ্করকুমার নাথ (২০১৯) এর *'কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত'* গ্রন্থে কলকাতা মেডিকেল কলেজের উদ্ভব, বিকাশ এবং এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক মধুসূদন গুপ্তের অবদান রয়েছে। বিশেষ করে তিনিই প্রথম মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাশিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের (শব ব্যবচ্ছেদ) যাত্রা শুরু করেন। তিনি ভারতের চিকিৎসাশিক্ষার মান বিশ্বমানের পর্যায়ে নিয়ে যান। তিনি দেশের মানুষের কাছে সুচিকিৎসক, মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের কাছে আদর্শ, পরিশ্রমী, জ্ঞানী, জনপ্রিয় শিক্ষক এবং মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে চিকিৎসাশিক্ষার আলোকবর্তিকা ধরে এগিয়ে চলা একজন অগ্রপথিক ছিলেন। তাই ডা. শঙ্করকুমার নাথ তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তার কাজে ছিল ব্যাপকতা, গভীরতা, আত্মমগ্নতা, ইংরেজ চিকিৎসকদের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে মেডিকেল প্রাকটিস করা ছিল এক ধরনের একক চ্যালেঞ্জ।'[৩৪] এই গ্রন্থে ১৮৩৫-১৮৫৬ সাল পর্যন্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজের ইতিহাস এবং মধুসূদন গুপ্তের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরিউল্লিখিত গ্রন্থগুলোতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তথা রোগ, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এসব নিয়ন্ত্রণে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, উদ্যোগ ও ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থগুলো থেকে এটা বোঝা যায় যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট প্রতিরোধ, তর্কবিতর্কের সম্মুখীন হয়েছে। সেই বাধাবিপত্তিকে মোকাবিলা করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জয় হয়েছে। এর পেছনে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য প্রধান হলেও অসাম্প্রদায়িক বা সংস্কারমুক্ত চিন্তাচেতনা এবং মানবিকতা কাজ করেছে। ফলে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও চিকিৎসাশিক্ষাকে সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধারণ গ্রহণ করে। প্রথম দিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করে বরং দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিকে বজায় রাখার চেষ্টা করলে শেষ পর্যন্ত তা প্রত্যাহার করেন। দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসার সাথে টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। এই ব্যাপারে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রেজিস্ট্রার, শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. কুন্তল বিশ্বাস বলেন, 'আয়ুর্বেদ চিকিৎসার যতটুকু বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল ততটুকু নেওয়া হয়েছে। আয়ুর্বেদের বৈজ্ঞানিক চর্চা নেই।'[৩৫]

যাহোক ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র উপনিবেশের ওপর জ্ঞানের আধিপত্য দিয়ে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসাকে প্রতিষ্ঠা করে। এ ক্ষেত্রে ফুকোর জ্ঞান ও ক্ষমতা তত্ত্বের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত

গ্রন্থের গবেষকগণ ফুকোর লেখা দ্বারা প্রভাবিত। তবে উল্লিখিত গ্রন্থগুলোতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হলেও পূর্ববাংলার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা করা হয়নি। বিশেষ করে পূর্ববাংলায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষার মেডিকেল কলেজ 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ' নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও ইতিহাসভিত্তিক কোনো গবেষণা হয়নি। তবে বাংলাদেশের ইতিহাসবিদ ও গবেষক শরীফ উদ্দিন আহমেদ (২০০৭) *'মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল : ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৮৫৮-১৯৪৭)'* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তৎকালীন পূর্ববাংলার প্রথম পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান মিটফোর্ড হাসপাতাল এবং প্রথম চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর এই গবেষণা মূলত একটি প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চা। তিনি এই দুটো প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে এই অঞ্চলের জনমানুষের রোগ, চিকিৎসা ও সমাজের চিত্র তুলে ধরেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠান দুইটির উদ্ভব, বিকাশ, প্রভাব এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। তাছাড়া এই অঞ্চলের পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে বিজ্ঞানভিত্তিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণের ইতিহাস তুলে ধরেন। প্রতিষ্ঠান দুইটি পূর্ববাংলার স্বাস্থ্যবিষয়ক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক বিপ্লব। এটা এই অঞ্চলের সমাজ ও জনজীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি উদ্যোগ সামান্য হলেও তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির প্রচেষ্টা ছিল সন্দেহাতীত। উপরি-উক্ত বিষয়সহ তিনি যেসব বিষয় গ্রন্থটিতে বর্ণনা করেন তা হলো মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় রবার্ট মিটফোর্ড এর অবদান, হাসপাতালের বিকাশ, চিকিৎসা ও সেবার উন্নয়ন, ঢাকা মেডিকেল স্কুলের প্রতিষ্ঠা, বিকাশ, স্কুলের পঠন পাঠন, সিলেবাস, ক্লাস, ল্যাবরেটরি, পূর্ববাংলার নারীদের চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণ, স্কুলের সফলতা, স্কুলটির উপমহাদেশীয় পর্যায়ে উত্তোরণের ইতিহাস, স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও জীবনমুখী করে তোলার জন্য ছাত্রদেরকে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের রীতির প্রচলন, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাকেন্দ্র সংক্রান্ত সমস্যা, মেডিকেল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক এবং ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে কলেজে রূপান্তরের চেষ্টা।[৩৬] এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ফুটে ওঠে, তা হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও চিকিৎসাশিক্ষা প্রবর্তনে রক্ষণশীল সমাজের একটা অংশ এবং প্রাচ্যবাদীদের বাধার সম্মুখীন হলেও পূর্ববাংলায় এই দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনে কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি, বরং এগুলো প্রতিষ্ঠা হলে পূর্ববাংলার জনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হয়। বস্তুত, পূর্ববাংলার জনসাধারণ ও সুশীল সমাজ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সাদরে গ্রহণ করেন, কারণ তারা এই জ্ঞানের সুফল সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ, ইতিহাসভিত্তিক বিশ্লেষণমূলক গবেষণা গ্রন্থ নেই বললেই চলে। তবে কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেগুলো অনেকটা স্মৃতিচারণমূলক, আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলোতে কলেজের প্রাক্তন ছাত্ররা তাদের ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ক্ষেত্রে কলেজের শুরুর দিকের ছাত্রদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে গ্রন্থগুলো রচনা করা হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে ১৯৪৯ ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র আহমদ রফিক (২০০৩) এর *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ ১৯৪৭-১৯৭১*। তিনি এই গ্রন্থে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্রবাস 'মেডিকেল ব্যারাক' ও ব্যারাকবাসী ছাত্রদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করেন। সেই সঙ্গে চিকিৎসাশিক্ষা বহির্ভূত জীবনাচরণের কাহিনীও গ্রন্থভুক্ত করেন। লেখক স্বয়ং

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সময়ের ছাত্র হওয়ায় ছাত্রদের জীবনকাহিনীগুলো অতিরঞ্জিত নয় বলে উল্লেখ করেন, বরং এর মূলভিত্তি ছাত্রদের কর্মতৎপরতার বাস্তব ঘটনা এবং কলেজের প্রথম দশকের ছাত্রদের পাঠবহির্ভূত জীবনের ঘটনাবলী। ঢাকা মেডিকেল কলেজের মতো কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু সংখ্যক ছাত্রের সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি রাজনীতি চর্চার প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। গ্রন্থের লেখক প্রত্যক্ষভাবে এসব ছাত্রদের সংস্পর্শে থাকায় এই ব্যাপারে উল্লেখ করেন যে, কারো কারোর জন্য তা হয়ে ওঠে ছিল 'অবসেশন'।[৩৭] এই গ্রন্থে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক বা চিকিৎসকদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা নিতান্তই ঘটনা সূত্রের অনিবার্য টানে।[৩৮] প্রকৃতপক্ষে মেডিকেল কলেজের ব্যারাকবাসী ছাত্রদের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন, ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলন, গণআন্দোলন, নিজেদের দাবিদাওয়া, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে মেডিকেল কলেজ ছাত্র, শিক্ষক ও চিকিৎসকদের নানামাত্রিক সংশ্লিষ্টতার কথা বর্ণনা করেন। উপরন্তু গ্রন্থের লেখক প্রত্যক্ষভাবে কিছু আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকায় এবং তিনি তাঁর বন্ধু, সহপাঠী, তৎকালীন প্রাক্তন ছাত্রদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে তুলনামূলকভাবে যাচাই বাছাইয়ের ভিত্তিতে গ্রন্থটি রচনা করেন। ফলে তাঁর এই গ্রন্থটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইতিহাস জানার জন্য খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটিকে মুদ্রিত, প্রকাশিত অন্যতম উৎস বলা যায়।

ডা. মনিলাল আইচ লিটু ও এম. আর. মাহবুব (২০১৮) এর *ঢাকা মেডিকেল কলেজ: সেবা সংগ্রাম ঐতিহ্য* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের পরবর্তী সময়ের ঘটনাবলী সীমিত ও আংশিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে অনেক বিষয়ই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে গ্রন্থটিতে কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের কিছু দুর্লভ ছবি এবং সাক্ষাৎকার রয়েছে। এটি গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। অন্যান্য তথ্য উপাত্তের সহায়তা নেওয়া হলেও গ্রন্থটি অনেকাংশে মৌখিক উৎস নির্ভর।

তসলিমা কবির ও এম. আর. মাহবুব সম্পাদিত (২০১৩) *শল্যচিকিৎসক ও ভাষাসৈনিক অধ্যাপক এম. কবির উদ্দিন আহমদ* নামে এই গ্রন্থে মেডিকেল কলেজের ১৯৫০ ব্যাচের ছাত্র অধ্যাপক কবির উদ্দিন আহমেদ এর জীবন, কর্ম, রাজনীতি, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যাপক আফজালুন্নেসা এবং এম. আর. মাহবুব সম্পাদিত (২০১৩) *প্রথম শহীদ মিনারের স্থপতি ডা. বদরুল আলম স্মারকগ্রন্থ*। এই গ্রন্থে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র বদরুল আলম এর জীবন, কর্ম, শিশু বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর সফলতা, ভাষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা এবং প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

সারওয়ার আলী (২০১০) এর *পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ* গ্রন্থটি একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের বামপন্থী ছাত্র হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক জীবন ও কর্ম, মেডিকেল কলেজের সমস্যা সমাধানে তাঁর অবদান, ষাটের দশকের আন্দোলনে অংশগ্রহণ, মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করার পর চাকুরিজীবন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্ব প্রতিনিধিদের সমর্থন আদায়ের জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সফর, পঁচাত্তর পরবর্তীকালে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিবর্তন, একজন সংগঠক হিসেবে 'ছায়ানট', মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং 'বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি' এবং 'বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন' এ তাঁর ভূমিকাসহ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকের কার্যক্রম, ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও বিকাশ, এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি উদ্যোগ বা বেসরকারি প্রচেষ্টা ও সরকার কর্তৃক চেষ্টা, নারী চিকিৎসকদের অবদান, কলেজের পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এক আইনের মাধ্যমে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১) ও কলকাতা সংস্কৃত কলেজে (১৮২৪) চিকিৎসা ক্লাস নেওয়া বন্ধ করে দেন। এ সময় থেকে পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও পূর্ববাংলায় কোনো মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববাংলায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হলেও বিদ্যমান ন্যাটিভ হাসপাতাল (১৮০৩), মিটফোর্ড হাসপাতাল (১৮৫৮), ঢাকা মেডিকেল স্কুল (১৮৭৫) নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল (১৮৯২) এবং ২২টি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। এসব প্রতিষ্ঠান পূর্ববাংলার জনগণের সব ধরনের চিকিৎসার চাহিদা মেটাতে পারছিল না। উপরন্তু কলকাতায় গিয়ে উন্নত চিকিৎসা নেওয়া সবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই পূর্ববাংলার জনগণ ১৯১২ সালে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবির সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। এই ব্যাপারে ১৯১৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি এবং ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট প্রদান করেন। উভয় রিপোর্টেই ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবিকে বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব করে। এ ক্ষেত্রে এই সংকট পূরণে ব্যক্তি উদ্যোগের ভূমিকা ছিল অসামান্য। ১৯২৯ সালে ঢাকার নবাবপুরের ধনাঢ্য জগমোহন পাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ দান করার কারণে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা বাস্তবায়নে যে প্রতিবন্ধকতা ছিল তা দূর হয়ে যায়। তবে তাঁর দানকৃত অর্থের পরিমাণ সামান্য হলেও এই অর্থকে কাজে লাগিয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালো প্রচেষ্টা চালান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ আবারও বিলম্বিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৯৪৩ সালে ব্রিটিশ ভারতের ঔপনিবেশিক সরকার সমগ্র ভারতবর্ষের জনস্বাস্থ্য ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য 'হেলথ সার্ভে এন্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি' বা ভোর কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৬ সালের ১ জুলাই এই মেডিকেল কলেজের যাত্রা শুরু হয়। এই অধ্যায়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে নিজেদের জন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন থেকে শুরু করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমগ্র ভারতে জনসাধারণের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের গবেষণা কাজের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস (NAB) থেকে মেডিকেল বিভাগ, জনস্বাস্থ্য বিভাগের সরকারি কার্যবিবরণী *'এ' প্রসেডিংস*, *'বি' প্রসেডিংস*, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আরকাইভস (WBSA) থেকে বাংলা সরকারের জেনারেল ডিপার্টমেন্ট (এডুকেশন), এডুকেশন বিভাগ, অর্থ বিভাগ এর *'এ'* এবং *'বি' প্রসেডিংস*, সরকারি রিপোর্ট, এসেম্বলি প্রসেডিংস, *ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ষিক বিবরণী*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড রুম (DURR) থেকে *'ডি গ্রুপ'* এর ফাইল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির রেয়ার রেকশন থেকে বার্ষিক বিবরণী, দুর্লভ গ্রন্থ ও পত্রিকা *(ঢাকা প্রকাশ)*, জেনারেল লাইব্রেরি, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোর্ল পার্ক, কলকাতা) থেকে ঔপনিবেশিক আমলের চিকিৎসা

ও রোগের ওপর মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি (DMCL) থেকে বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও গ্রন্থ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল রুমে (ECR) সংরক্ষিত নথিপত্র, রেকর্ড এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রেকর্ডরুম ও লাইব্রেরি থেকে মূল্যবান তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাথমিক অগ্রযাত্রা ও উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে দেশ বিভাগ পর্যন্ত মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। শুরুর দিকে মেডিকেল কলেজের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কঠিন ছিল। তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং ব্রিটিশ শাসকের ভারত উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা স্থানীয় রাজনীতিবিদদের কাছে হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে সমাজে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে। এরূপ অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়া দিয়ে তার কার্যক্রম শুরু করে। ভর্তি প্রক্রিয়ায় নানারকম সমস্যার সৃষ্টি, নারী আসনে পূর্ববাংলার কোনো ছাত্রী ভর্তি না হওয়ায় সেই আসনগুলো সাধারণ (হিন্দু+খ্রিস্টান+বৌদ্ধ), মুসলমান, তপশিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্টন, ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে পত্রিকায় গুজব ছড়ানো, ছাত্রদের বাসস্থানের সংকট, শিক্ষক, প্রিন্সিপালের বাসভবনের অভাব, ডাইসেকশন হলের অভাব ইত্যাদি বিষয় এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়টি আলোচনা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস (NAB) এর মেডিকেল বিভাগের *'বি' প্রসেডিংস*, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল রিপোর্ট (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ক্যালেন্ডার, *ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ষিক বিবরণী*, দৈনিক পত্রিকা, ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সংক্রান্ত ম্যাগাজিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুমের (DURR) *'ডি গ্রুপ'* এর ফাইল, এই মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের (১৯৪৬-৪৭) ছাত্র অধ্যাপক ডা. মীর্জা মাজহারুল ইসলাম (১৯২৭-২০২০) এর সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি দিয়ে বিভাগগুলো সজ্জিতকরণ, বিশেষ করে এনাটমি বিভাগের সম্প্রসারণ, ডাইসেকশন হল নির্মাণ, জাদুঘর নির্মাণ, অন্যান্য বিভাগ তথা ফার্মাকোলজি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিষ্ট্রি, ফরেনসিক মেডিসিন, মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স, অফথালমোলজি, চর্ম, যৌন, নাক, কান, গলা বিভাগ, অবসটেট্রিক ও গাইনোকোলজি, ক্লিনিক্যাল বিভাগ, প্যাথলজি বিভাগ, দন্ত বিভাগ ইত্যাদি বিভাগের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার মান ও চিকিৎসা সেবা যে বিশ্বমানসম্মত তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে গবেষণা কাজের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস (NAB) থেকে মেডিকেল বিভাগ ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ থেকে সরকারি কার্যবিবরণী *'এ' প্রসেডিংস*, *'বি' প্রসেডিংস*, *ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ষিক বিবরণী* (১৯৪৬-১৯৫২), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী* (১৯৪৭-৭১), *এসেম্বলি প্রসেডিংস*, সরকারি রিপোর্ট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংক্রান্ত ম্যাগাজিন, বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রিকা, সাক্ষাৎকার থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মেডিকেল কলেজের অবকাঠামোগত কাজের সম্প্রসারণ, হোস্টেল নির্মাণ, লাইব্রেরি ও গবেষণাগার নির্মাণ, সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স চালু, পরীক্ষা পদ্ধতি ও ফলাফল, বৃত্তি, উচ্চতর প্রশিক্ষণ, শিক্ষক

নিয়োগ পদ্ধতি এবং মেডিকেল কলেজের অধ্যাদেশ এর সংযোজন, পরিবর্তন, সংশোধন ও স্বীকৃতিসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কাজের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে উল্লিখিত উৎস থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের নারী চিকিৎসকদের জ্ঞান আহরণ ও সেবা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষার প্রভাব এবং পারিবারিক সচেতনতার কারণে পূর্ববাংলার নারীদের চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণ, কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভর্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকে বিপুল সংখ্যক নারী শিক্ষার্থী ভর্তি, এর কারণ, বিভিন্ন বর্ষে পাশ করা নারী চিকিৎসকদের সংখ্যা, এর প্রভাব এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও প্রখ্যাত কয়েকজন নারী চিকিৎসকের জীবন ও কর্ম এবং তাদের অবদান সম্পর্কে বিস্তৃত আকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অধ্যায়টির বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস (NAB) এর হেলথ এন্ড লোকাল সেলফ গভর্ণমেন্ট বিভাগ থেকে *'বি' প্রসেডিংস*, *এসেম্বলি প্রসেডিংস*, *ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বার্ষিক বিবরণী*, *ঢাকা মেডিকেল কলেজ এলামনাই ডাইরেক্টরি*, ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি (DMCL) থেকে সংগৃহীত ম্যাগাজিন, সরকারি রিপোর্ট বিশেষ করে *হেলথ সার্ভে এন্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি*, দৈনিক পত্রিকা, বিদেশি জার্নাল, জেনারেল লাইব্রেরি (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার) থেকে সংগৃহীত মূল্যবান গ্রন্থ, প্রখ্যাত নারী চিকিৎসক নাজমুন নাহার (শিশু বিশেষজ্ঞ) জাতীয় অধ্যাপক শাহলা খাতুনসহ (গাইনোকোলজিস্ট) অন্যান্যদের সাক্ষাৎকার থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উঁচু স্তরের চিকিৎসক শ্রেণি হিসেবে সমাজে তাদের প্রভাব, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হিসেবে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, এর প্রভাব, ভাষা আন্দোলন, ষাটের দশকের আন্দোলন, নিজস্ব দাবিদাওয়া আদায়ের আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র, শিক্ষক ও চিকিৎসকদের অবদানের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি আলোচনা করার ক্ষেত্রে *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*, বিভিন্ন সংবাদপত্র যেমন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক আজাদ*, *ঢাকা প্রকাশ*, *সাপ্তাহিক সৈনিক*, সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র আহমদ রফিক রচিত *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ* ও সারওয়ার আলী রচিত *পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ* গ্রন্থ দুইটি বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে, কারণ গ্রন্থের রচিয়তাগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কলেজের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন।

সবশেষে গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফল এবং সুপারিশমালা উপসংহারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে উঁচু স্তরের আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার তথা পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এবং সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতিতে যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে সে বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবেই সমসাময়িককালের মূল দলিল দস্তাবেজের ওপর ভিত্তি করে পুনর্গঠন করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ের সময়ের ওপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধরনের সরকারি বেসরকারি উৎস থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের

অপ্রকাশিত সরকারি কার্যবিবরণী, প্রতিবেদন, মুদ্রিত সরকারি কার্যবিবরণী (*এসেম্বলি প্রসেডিংস*), মুদ্রিত প্রতিবেদন, *গেজেট, গেজেটিয়ার, সেন্সাস,* দুর্লভ সংবাদপত্র ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে গবেষণাকালে খোঁজাখুজির পরেও কিছু দলিল দস্তাবেজ পাওয়া যায়নি, কেননা এগুলো ভালোভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি অথবা কোনো স্থানে সুশৃঙ্খলভাবে রাখা হয়নি।

অভিসন্দর্ভের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার অধিকার (Directorate of State Archives, West Bengal, Higher Education Department) এ সংরক্ষিত এডুকেশন বিভাগ, মেডিকেল বিভাগ ও জেনারেল বিভাগ থেকে অপ্রকাশিত সরকারি কার্যবিবরণী, কলকাতার আলীপুরে অবস্থিত ন্যাশনাল লাইব্রেরির ভাষা ভবন থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন গ্রন্থ ও এনেক্স ভবন থেকে মুদ্রিত সরকারি প্রতিবেদন, গেজেট, এ্যাক্ট, ঔপনিবেশিক সময়কালের দুর্লভ গ্রন্থ এবং জেনারেল লাইব্রেরি (রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোর্ল পার্ক, কলকাতা) থেকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর গুরুত্বপূর্ণ দুর্লভ গ্রন্থ, গেজেট, গেজেটিয়ার, বিদেশি জার্নাল, পত্রিকা এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসহ মূল্যবান তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস (NAB) এ সংরক্ষিত মেডিকেল, এডুকেশন, পাবলিক হেলথ এবং হেলথ এন্ড লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট বিভাগ থেকে অপ্রকাশিত সরকারি কার্যবিবরণী, মুদ্রিত সরকারি কার্যবিবরণী, *প্রতিবেদন, সেন্সাস, ঢাকা গেজেটিয়ার, ঢাকা গেজেট, কলকাতা গেজেট*, বিভিন্ন এ্যাক্ট, দৈনিক পত্রিকা ইত্যাদি থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকারি বেসরকারি উৎস ছাড়াও স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং সমকালীন অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায়, যা সরকারি নথিপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সম্পূরক হিসেবে অবদান রেখেছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুম (DURR) ও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল রুমে (ECR) এই মেডিকেল কলেজের তৎকালীন সময়ের পঠন পাঠন, সিলেবাস, ডিন নির্বাচন, ভর্তি প্রক্রিয়া ও পরীক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ন দলিল পত্র সংরক্ষিত রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত *'ডি গ্রুপ'* ফাইলের অপ্রকাশিত কার্যবিবরণী, মুদ্রিত কার্যবিবরণী, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট, রেগুলেশন, অর্ডিন্যান্স, ক্যালেন্ডার থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

অন্যদিকে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল রুমে (ECR) সংরক্ষিত *এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল প্রসেডিংস এ* এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মিটিংয়ে মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা নথিবদ্ধ আকারে সংরক্ষিত রয়েছে। এসব নথিপত্র থেকেও মূল্যবান তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির (DUL) রেয়ার সেকশনে সংরক্ষিত মুদ্রিত সরকারি কার্যবিবরণী, বিভিন্ন সরকারি প্রতিবেদন, *গেজেট, গেজেটিয়ার*, দুর্লভ সাপ্তাহিক, মাসিক, দৈনিক পত্রিকা *(ঢাকা প্রকাশ)*, গবেষণার আলোচ্য সময়কালের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, বিভিন্ন জার্নাল, ক্যালেন্ডার, সেন্সাস, দুর্লভ গ্রন্থ, আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ভাষা আন্দোলন বিষয়ক গ্রন্থ, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ প্রভৃতি থেকে মূল্যবান তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট (IERL) এর গ্রন্থাগার থেকে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ, বিভিন্ন সরকারি কার্যবিবরণী, *দ্য পাকিস্তান কোড*, *বাংলাদেশ কোড* থেকে সংগৃহীত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আলোচ্য অভিসন্দর্ভের বিষয় বিশ্লেষণে সহায়তা করেছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরিতে (DMCL) সংরক্ষিত কলেজ ম্যাগাজিন, মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকগণ রচিত গ্রন্থ, *এলামনাই ডাইরেক্টরি*, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন গ্রন্থ, বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা, চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি'র গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ, এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত অন্যান্য জার্নাল থেকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ফর্মস এন্ড পাবলিকেশন অফিস (BFPO) এ সংরক্ষিত বিভিন্ন *বার্ষিক বিবরণী*, *এসেম্বলি প্রসেডিংস*, *সেন্সাস*, অর্ডিন্যান্স, এ্যাক্ট, *পূর্ব পাকিস্তান জেলা গেজেটিয়ার* থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, যা অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যাপক সহায়তা করেছে। নানা জায়গা থেকে তথ্য উপাত্ত একত্র করে গবেষণা পূর্ণাঙ্গ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস (NAB), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার অধিকার (পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড রুম (DURR) থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ পরিপূর্ণ করতে ব্যাপক সাহায্য করেছে। অভিসন্দর্ভটি যথাসাধ্যভাবে বস্তুনিষ্ঠ করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। অভিসন্দর্ভে যে সেকল রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে সেগুলোয় প্রাপ্তিস্থান যথাযথভাবে উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে বাংলা বা ইংরেজি গ্রন্থ, পত্রিকা থেকে বেশকিছু পাঠ্য অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাই সমস্ত বাংলা বা ইংরেজি উদ্ধৃতিতে মূল বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। অভিসন্দর্ভে মূল দলিলপত্র বা নথিপত্রের কিছু ইংরেজি টেক্সট অংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিছু বঙ্গানুবাদ বাংলা ভাবানুবাদ বা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেগুলো অনুবাদ করলে মূল ভাবটা ব্যাহত হতে পারে বলে মনে হয়েছে, সেখানে মূল ইংরেজি টেক্সট অংশই রাখা হয়েছে। এ ছাড়া ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে প্রচলিত মুদ্রাকে রুপি বলা হতো এবং সমকালীন নথিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, প্রতিবেদনে মুদ্রাকে রুপি নামে ব্যাখ্যা করা হতো। তাই অভিসন্দর্ভে রুপি ব্যবহার করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা বানান নীতি অনুসারে বাংলা একাডেমির বাংলা বানান অভিধান অনুসরণ করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. Biswamoy Pati, Mark Harrison (ed.), *Health, Medicine and Empire: Perspectives on Colonial India,* Orient Longman, 2001, pp. 18-19.

২. Chittabrata Palit, Aparajita Dhar (ed.), *Medical History of India: Discipline, Disease, Death,* Kunal Books New Delhi, India 2019, p. 1.

৩. Biswamoy Pati, Mark Harrison (ed.), *পূর্বোক্ত,* pp. 18-19.

৪. Michel Foucault, *The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception,* Vintage Books, New York 1994, pp. 68-98.

৫. আবুল হোসাইন আহমেদ ভূঁইয়া, 'মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) জীবন ও দর্শন, *কালি ও কলম,* চতুর্থ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, শ্রাবন ১৪১৪, জুলাই ২০০৭, পৃ. ৫৮।

৬. *ঐ*

৭. *ঐ*

৮. Biswamoy Pati, Mark Harrison (ed), *পূর্বোক্ত,* p. 19.

৯. David Arnold, *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-Century India,* University of California Press, 1993, pp. 285-286.

১০. *ঐ*

১১. ড. নীরদ বরণ পাল, *উনবিংশ ও বিংশ শতকে বঙ্গদেশে আর্য়ুবেদ চর্চা,* সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, ৩৮ বিধানসরণী ২০১১, কলকাতা, ৭০০, পৃ. ৪৫.

১২. Alexander Hamilton, *A New Account of the East Indies, Being the Observations and Remarks 1688-1723,* Vol. II, King's Printing House, Edinburgh, MDCCXXVII (1727), p.11.

১৩. *The Indian Medical Gazette,* January, 1903, p. 2.

১৪. ড. নীরদ বরণ পাল, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৬।

১৫. Charles Lushington, *The History, Design and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions,* The Hindustanee Press, Calcutta, 1824, PP. 291-292.

১৬. W. S. Seton Karr, *Selections from Calcutta Gazette, Eighty years ago,* Calcutta, 1864, p. 254, উদ্ধৃত, ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন* গুপ্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ, ২০১৭, পৃ. ষোল।

১৭. ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ষোলো।

১৮. ড. নীরদ বরণ পাল, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৬।

১৯. *The Calcutta Review,* Vol. XVIII, July-Dec, 1852, p. 290.

২০. ড. নীরদ বরণ পাল, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪৬।

২১. A. J. Qaisar and S.P. Verma (ed.), *Arts and Culture: Endeavours in Interpretation,* Abhinav, New Delhi, 1996, 67-77, উদ্ধৃত, Mark Harrison and Biswamay Pati, *Health, Medicine and Empire: Perspectives on Colonial India,* 2001, p. 10.

২২. পুর্নচন্দ্র দে, 'কলিকাতা মেডিকেল কলেজ', *বঙ্গশ্রী* পৃ. ২১০, উদ্ধৃত, ড. নীরদ বরণ পাল, *উনবিংশ ও বিংশ শতকে বঙ্গদেশে আর্য়ুবেদ চর্চা,* ২০১১, পৃ. ৪৪।

২৩. Mark Harrison, 'Tropical Medicine in Nineteenth - Century India', *The British Journal for the History of Science,* No. 25, 1992, pp. 299-318.

২৪. Biswamay Pati and Mark Harrison (Edit), *পূর্বোক্ত,* p. 19.

২৫. ড. নীরদ বরণ পাল, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫৩।

২৬. Mark Harrison, "Towards a Sanitary Utopia? Professional Visions and Public Health in India, 1880-1914", *South Asia Research,* No. 10, 1990, pp. 19-96. উদ্ধৃত, Biswamay Pati (ed.), *Health, Medicine and Empire: Perspectives on Colonial India,* 2001, p. 19.

২৭. 'আয়ুর্বেদের কথা', *মাতৃমন্দির*, পৃ. ৩৮২ উদ্ধৃত ড. নীরদ বরণ পাল, *উনবিংশ ও বিংশ শতকে বঙ্গদেশে আর্য়ুবেদ চর্চা*, সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, পৃ. ৫৭।

২৮. ড. নীরদ বরণ পাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪।

২৯. Daniel Headrick, *The Tools of Empire, Technology and European Imperialism in the Nineteenth - Century,* Oxford University Press, 1981, উদ্ধৃত, Chittabrata Palit, Aparajita Dhar (ed.), *Medical History of India,* p. 1.

৩০. Chittabrata Palit, Aparajita Dhar (ed.), *পূর্বোক্ত*, p. 2.

৩১. David Arnold, *The New Cambridge History of India: Science, Technology and Medicine in Colonial India,* Part.III, Vol. 5, Cambridge University Press, 2000, p. First page.

৩২. Srilata Chatterjee, *Western Medicine and Colonial India: Hosptials of Calcutta,* c. 1757-1860, Primus Books, New Delhi, 2017. p. 19.

৩৩. Biswamoy Pati, Mark Harrison (ed.), *Health, Medicine and Empire,* Orient Longman, 2001, pp. 18-19.

৩৪. ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. সতেরো।

৩৫. সাক্ষাৎকার, ডা. কুন্তল বিশ্বাস (শিশু বিশেষজ্ঞ), রেজিস্ট্রার, কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, তাং ২০/১২/২০১৯।

৩৬. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল: ইতিহাস ও ঐতিহ্য ১৮৫৮-১৯৪৭*, একাডেমি প্রেস এন্ড পাবলিশার্স, ঢাকা ২০০৭, পৃ. ১৩-১৪।

৩৭. আহমদ রফিক, *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ* ১৯৪৭-১৯৭১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৩।

৩৮. *ঐ*

প্রথম অধ্যায়

ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৮৪৯ সালে জার্মানির বিখ্যাত চিকিৎসক, প্যাথলজিস্ট, নৃতাত্ত্বিকবিদ, রুডল্ফ লুডভিগ কার্ল ভার্চো (Rudolf Ludwing Carl Virchow 1821-1902) লিখেন, 'Medicine is a social science and politics is medicine on a large scale.'[১] তাঁর মতে, চিকিৎসকরা হলেন স্বভাবগতভাবে গরিবদের এটর্নি। তিনি চিকিৎসাশিক্ষার সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি উচ্চমানের যত্নশীল ও প্রাতিষ্ঠানিক পেশা। অন্যদিকে ব্রিটিশ চিকিৎসক, চিকিৎসা বিষয়ক ইতিহাসবিদ থমাস ম্যাককাউন (Thomas Mckeown 1912-1988) সামাজিক চিকিৎসাকে দুই ভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ব্যাপক অর্থে সামাজিক চিকিৎসা মানবিক ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ এবং জনসাধারণের নিজেদের আকাঙ্খা, ইচ্ছা ও সার্থ সংশ্লিষ্ট। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় তথা রোগীর চিকিৎসাসেবা, রোগ প্রতিরোধ, মেডিকেল সার্ভিসের প্রশাসন এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। অন্যদিকে সংকীর্ণ অর্থে সমাজের স্বাস্থ্য সেবা বা চিকিৎসাশিক্ষার প্রয়োজীয়নতা এবং মানব শরীরের রোগ সংক্রান্ত শিক্ষাকে বোঝায়।[২]

ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় রূপ, কেননা এই প্রতিষ্ঠানটির স্থাপনার পিছনে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টা রয়েছে। ১৯৪৬ সালের ১লা জুলাই প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের প্রথম পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষা সংক্রান্ত কলেজ। এই মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৯২১) প্রায় ২৫ বছর পর এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উঁচু মানের চিকিৎসাশিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। পূর্ববাংলার প্রথম মেডিকেল কলেজ হিসেবে 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ' প্রতিষ্ঠার একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। এই মেডিকেল কলেজটি যে হঠাৎ করে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি বর্তমান অধ্যায়ে এই প্রেক্ষাপট নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা

মানুষ তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রোগমুক্তির উপায় হিসেবে বিভিন্ন পদ্ধতি নিজের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে। প্রকৃতির মধ্য থেকেই চিকিৎসার উপকরণ ও রোগের কারণ উদ্ভাবন করে। ভারতে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রচলন ছয় হাজার বছর আগে থেকে।[৩] আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের অন্তর্গত চিকিৎসাশাস্ত্র। এই বেদে বিভিন্ন মন্ত্রে ও স্তোত্রে শরীরস্থান, শরীরবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ রয়েছে। বৈদিকযুগে এই চিকিৎসাশাস্ত্র অথর্ববেদ থেকে আলাদাভাবে আয়ুর্বেদ নামে প্রচলিত ছিল। ঋকবেদে বর্ণিত 'ত্রিধাতু শব্দের ব্যবহারের দ্বারা আয়ুর্বেদের ত্রিদোষ তত্ত্বের (বায়ু, পিত্ত, কফ) পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানী হেনরি ই সিগরিস্ট (Henry E Sigerist 1891-1957) বলেন, ভারতবর্ষে বৈদিক ভেষজ কয়েক শতাব্দী ধরে উন্নতি লাভ করে। তারপর এর নাম দেওয়া হয় আয়ুর্বেদ। এই ভেষজ (গাছগাছড়া থেকে তৈরি ঔষধ) কেবলমাত্র রোগমুক্তিই করে না বরং স্বাস্থ্যোন্নতি ও রোগ প্রতিকার করে।[৪] সুতরাং যে শাস্ত্র পাঠে মানুষ ও অন্যান্য মনুষ্যতর প্রাণি ও উদ্ভিদ জ্বরা ও ব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ করে তাকে আয়ুর্বেদ বলে। এটি মূলত হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্র। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ভারতীয় মনীষীদের যুগ যুগান্তরের সাধানার ফল। এই পদ্ধতিতে যারা চিকিৎসা করে তাদেরকে ভিষক, বৈদ্য, কবিরাজ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে

প্রাচীন ও সুসংবদ্ধ চিকিৎসাবিদ্যা হিসেবে পরিচিত।[৫] হাজার হাজার বছর ধরে এই আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতেই ভারতের অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা হয়েছে। এদেশে ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতিও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। গ্রিক ও আরববাসীদের মিশ্রিত চিকিৎসা পদ্ধতিকে ইউনানি চিকিৎসা বলা হয়। মুসলমানদের আগমনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে এই চিকিৎসা পদ্ধতি আসে। আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে যুগোপযোগী হতে থাকে। আয়ুর্বেদ এবং ইউনানি পদ্ধতি আধুনিকীকরণের অভাবে পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির কাছে টিকে থাকতে পারেনি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও জাতি ব্যবসা-বানিজ্য, ভূ-খন্ড দখল করার জন্য সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে। এজন্য তাদেরকে যেমন মূল ভূখন্ডের অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করে বাঁচতে হয়েছে, তেমনি জানা-অজানা অনেক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়েছে। তাই ইউরোপীয়রা পৃথিবী ভ্রমণের সময় জাহাজে দুইজন গুরত্বপূর্ণ মানুষকে সঙ্গে রাখতেন। এদের মধ্যে একজন হলেন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী, যিনি চাঁদ, সূর্য, তারার গতিবিধি হিসেব করে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবেন, অন্যজন হলেন চিকিৎসক, যিনি জাহাজের দলের মানুষদের রোগব্যাধি থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।[৬]

১৪৯৮ সালে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম পর্তুগিজরা উপনিবেশ স্থাপন ও ব্যবসা-বানিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারত উপমহাদেশে আসে। তারা ১৫১০ সালে ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত গোয়াতে একটি রয়েল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে।[৭] এরপর ১৫৯৬ সালে ওলন্দাজ, ১৬০০ সালে ইংরেজ, ১৬১৬ সালে ভেনেসিয়ান, এবং ১৬৪০ সালে ফরাসিরা ভারতে আসে। এই ইউরোপীয়দের মাধ্যমেই ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও চিকিৎসাবিদ্যার উত্থান হয়েছে এবং কালক্রমে তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই ব্যাপারে ইংরেজদের অবদান অসামান্য। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ও প্রশাসক এবং কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক (Job Charnock 1630-1693) আসার পর কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলে উন্নয়ন ঘটতে থাকে। সেই উন্নয়নে ইংরেজদের সাথে দেশীয়রাও অংশ নেয়। দলে দলে যেমন ইংরেজরা কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস শুরু করে, তেমনি এদেশীয়গণও এসব অঞ্চলে ভিড় করতে থাকে। এর ফলে একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে অন্যদিকে রোগব্যাধিও বাড়তে থাকে। ইংরেজরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা, ব্যবসা-বানিজ্য ও অধিকৃত অঞ্চলে টিকে থাকার উদ্দেশ্যে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার জন্য হাসপাতাল গড়ে তোলেন কারণ সে সময় বিনা চিকিৎসায় অনেকেই মৃত্যুবরণ করত। পাশ্চাত্যে যখন চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন আবিষ্কার চলছিল, ভারতে তখন চিকিৎসার ক্ষেত্রে পুরানো ধ্যানধারনা, কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। তাছাড়া ভূখন্ড দখল করতে প্রয়োজন অসংখ্য সৈন্যসামন্ত। ইংরেজ শাসকগণকেও তাদের অধিকৃত ভূমির সীমানা বৃদ্ধি করার জন্য ক্রমশ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয়েছিল। অধিকাংশ ইংরেজ সৈন্যরা এদেশের আবহাওয়া, জলবায়ু, খাদ্যাভাস ইত্যাদির সাথে মানিয়ে নিতে অসুবিধা বোধ করত। এর ফলে তাদের অসুখ বিসুখ লেগে থাকত এবং বিপুল সংখ্যক সৈন্য মৃত্যুবরণ করত। ১৭০৭ সালে শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের চিকিৎসার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিল প্রেসিডেন্সি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে। তবে বাংলা প্রেসিডন্সির আগে মাদ্রাজ (১৬৬৪) এবং বোম্বেতে (১৬৭০) হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়।[৮]

ইতিমধ্যে ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দিওয়ানি লাভ করার মাধ্যমে ভারতের এই অঞ্চলগুলো শাসন করার ক্ষমতা লাভ করে। দিওয়ানি লাভের পর থেকে ক্রমবর্ধমানহারে প্রশাসনিক বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ (১৭৩২-১৭৯২)

এর 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' এবং ১৭৮৪ সালের উইলিয়াম পিট (১৭৫৯-১৮০৬) এর 'ইন্ডিয়া এ্যাক্ট' পাশ হবার পর থেকে ব্রিটিশ সরকারের ভারতের প্রশাসনের সাথে দীর্ঘ সম্পৃক্ততা বেড়ে যায়। প্রাথমিকভাবে ভারতীয় বিষয়গুলো বোর্ড অব কমিশনারের মাধ্যমে পরিচালিত হতো।[৯] ১৭৯০-৯৩ সালে গর্ভনর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ (১৭৮৬-১৭৯৩) এই অঞ্চলের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনতন্ত্র রচনা করেন, যা 'কর্নওয়ালিশ কোড' নামে পরিচিত। এই কোডে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয় যে, 'দেশের সার্বভৌম কর্তা ইংরেজ'।[১০] এ সময় নবাবকে তাঁর নিজামত বা প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সরকারের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ থেকে দেশীয়দের বঞ্চিত করা হয়। সমস্ত প্রশাসন ইউরোপীয়দের হাতে ন্যস্ত করা হয়। সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে তারা কোনো আইন প্রণয়ন না করলেও সরকারি দলিলপত্রে কোম্পানি নিজেদেরকে সার্বভৌম অধিপতি বলে গণ্য করে। ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক যে সার্বভৌমত্বের ঘোষণা করা হয়, তা ভারতের রাজনীতিতে নতুন কোনো উপাদান সংযোজন করেনি। অর্ধশতাব্দী যাবত কোম্পানি যে সার্বভৌমত্ব ভোগ করে আসছিল, তারই আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয় এই ঘোষণায়।[১১] অর্থাৎ ১৭৬৫-১৮১৩ সাল ছিল কোম্পানির সার্বভৌমত্ব তথা রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের কাল। ইতিহাসবিদ ও গবেষক সিরাজুল ইসলাম উল্লেখ করেন যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপন করতে গিয়ে যে পন্থা অবলম্বন করে, সে একই পন্থায় এশিয়ার অন্যান্য দেশ, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ প্রথম অগ্রগামী দল হিসেবে অনুপ্রবেশ করে ব্যবসায়ী ও ধর্মযাজকগণ, পরে আসে সশস্ত্র বাহিনী। ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করা আধুনিক উপনিবেশবাদের একটি কৌশল।[১২]

প্রকৃতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিকদের মতে, বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয়দের এই আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। এটা থেকে Climatic Determinism বা জলবায়ুগত তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই তত্ত্বকে জনপ্রিয় করে তোলে ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু (Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brede et de Montesquieu 1689-1755), প্রকৃতিবিদ, মহাবিশ্বতত্ত্ববিদ কোঁত দ্য বুফোঁ (George Louis Leclerc Comte de Buffon 1707-1788) এবং অন্যান্যরা। তাদের লেখার মধ্য দিয়ে জলবায়ুর ধারনার বিষয়টি ফুটে ওঠে। তাদের মতে, জলবায়ু মানব স্বাস্থ্য, প্রকৃতি ও রাজনৈতিক ভিত্তির গঠনতন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলে।[১৩] ভারতের বিভিন্ন অংশে তথা স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলগুলোতে পৃথক পৃথক জলবায়ু বিরাজ করে। ইউরোপীয়রা গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের জলবায়ু ও রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয় কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের পৃথক জলবায়ুতে শাসন করার দক্ষতা অর্জন করায় এই ধারণার জন্ম। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে ব্রিটিশদের আঞ্চলিক সম্প্রাসারণে স্থানীয় শাসক ও সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিদের প্রতিরোধ করতে সম্মুখীন হয়। এ ক্ষেত্রে পরিবেশগত প্রভাবের ধারণার জনপ্রিয়তা থেকে শারীরিক গঠনতন্ত্রের ধারণাটি আরো বেশি গুরুত্ব পায়।[১৪] তবে জলবায়ু তত্ত্বকে অতিক্রম করে Biological Determinism তত্ত্ব, যার ধারকগণ সামাজিক ডারউইনবাদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এই দল যুক্তি প্রদর্শন করে যে, উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের ইউরোপের বাইরের ওপর আধিপত্য বিস্তারের প্রধান কারণ তারা শারীরিকভাবে শক্তিশালী ছিল। এই কারণেই প্রাকৃতিক বিশ্বে তারা 'যোগ্যতমের উর্দ্ধতন' (Survival of the Fittest) মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।[১৫]

শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য শুধু পরিবেশ বড় ভূমিকা রাখে না। পরিবেশ ও শরীরকে নিরাপদ ও সুস্থ রাখার জন্য এর পাশাপাশি আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষা দরকার। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে যে রেঁনেসার উত্থান ঘটে, এর প্রভাব জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে পড়ে যার ব্যতিক্রম ঘটেনি চিকিৎসাশিক্ষার ক্ষেত্রেও। মুসলিম মনীষীদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের স্বর্ণযুগ নবম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। এ সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে আলী ইবনে শাহ আত তাবেরি (৮০৮-৮৬১), আল রাজ্বি (৮৬২-৯২৫) আবু আলী আল হুসাইন ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭), আবুল কাশিম আল জাহরাওয়ি (৯৬৩-১০১৩), আলাউদ্দিন ইবনে আল নাফিস (১২১০-১২৭৭), আবু আর রায়হান আল বেরুনি (৯৭৫-১০৪৮) প্রমুখ। এ ছাড়া আরো অনেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে মৌলিক গবেষণায় অবদান রাখেন। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে মুসলমানদের ক্ষমতা হারানোর পাশাপাশি চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন তথা সবকিছু থেকে আধিপত্য কমতে থাকে। পরবর্তীতে রেঁনেসা যুগের আবিষ্কৃত নতুন নতুন সমুদ্রপথ ইউরোপীয়দের ভারত, আফ্রিকা ও আমেরিকার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে এবং তাদের আধিপত্য বৃদ্ধি করে। ফলশ্রুতিতে ইউরোপীয়দের ভারত উপমহাদেশে আগমন ঘটে এবং তাদের উদ্যোগে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূচনা হয়।

ইংরেজরা ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিকতার প্রথম যুগে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। তারা নিজেদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৭৬৩ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিস (বি.এম.এস.) প্রতিষ্ঠা করে।[১৬] কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রম বৃদ্ধির সাথে সাথে ভারতে ব্রিটিশ সার্জনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভির্স (১৭৬৩) স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতে কোনো বিধি সম্মত মেডিকেল সার্ভিস ছিল না।[১৭] এই প্রতিষ্ঠান চিকিৎসকদের পদোন্নতি, বেতনভাতা সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে নির্ধারণ করে। এরপর বোম্বে, মাদ্রাজ এবং ১৭৭৫ সালে ভারতের প্রত্যেকটি প্রেসিডিন্সিতে ইউরোপীয় হাসপাতাল পরিচালনার জন্য পৃথক পৃথক মেডিকেল সার্ভিস গঠন করা হয়।[১৮] সে সময় ভারতে আধিপত্য বিস্তারের নিশ্চয়তা হিসেবে সামরিক শক্তির ওপর অধিক নির্ভর হওয়ায় মেডিকেল সার্ভির্সগুলো সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৯] পরবর্তীতে ১৩৩ বছর পর বাংলা, মাদ্রাজ, ও বোম্বাই মেডিকেল সার্ভির্সকে একত্রিত করে ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস গঠন করা হয়।[২০] এ সময় ভারতের সকল মেডিকেল অফিসার ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভির্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় সামরিক ও বেসামরিক হাসপাতালগুলো এই আই.এম.এস. অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত হতো। আই.এম.এস. এর প্রত্যেক অফিসারকে চাকুরিতে প্রবেশের সময় সামরিক দায়িত্বে নিযুক্ত করা হতো এবং সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের পূর্বে দুইবছর অবশ্যই এই (সামরিক) দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকতো। সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা ছিল এবং তা তরুনদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল। ষোড়শ ও স্বপ্তদশ শতাব্দীতে লন্ডনের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া চিকিৎসা পেশার অবস্থান উঁচু ছিল না এবং কোম্পানির মেরিন সার্ভিস স্বাভাবিকভাবেই সেরা ব্যক্তিদের আকর্ষন করেনি।[২১] আই.এম.এস. অফিসারদের যুদ্ধ অথবা মহামারীর সময় ছাড়া তাদের কাজ সাধারণত কঠিন ছিল না এবং তাদের বেতন বেসামরিক অফিসারদের চেয়ে কিছুটা বেশি ছিল কারণ মেডিকেল অফিসারকে রেজিমেন্টের একজন অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হতো। তারা অন্য অফিসার হলেও পুরোপুরি রেজিমেন্টের বাইরের আলাদা কোনো বিভাগের সদস্য ছিল না।[২২] এসব ব্রিটিশ মেডিকেল ডাক্তাররা কোম্পানির জাহাজ ও সেনাবাহিনীতে কাজ করত। ১৭০৮ থেকে ১৮১২ সাল পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দীতে

কোম্পানি প্রায় ৭০০ জাহাজ ভারতে পাঠায়।[২৩] শুরু থেকে জাহাজের নাবিকদের জন্য চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু চিকিৎসকদের পক্ষে জাহাজে বসে সব রকমের চিকিৎসা করা সম্ভব ছিল না। প্রথমে তাঁরা তাদের সৈনিক ও নাবিকদের জন্য হাসপাতাল স্থাপন করে। প্রাথমিক অবস্থায় সামরিক হাসপাতালগুলো সেনা ব্যারাকের পাশে অস্থায়ীভাবে নির্মাণ করা হয়।

মধ্য অষ্টাদশ দশকে কোম্পানির সম্প্রসারণ নীতির ফলে ভারতীয় শাসক ও ফরাসিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে। এ সময়ের যুদ্ধগুলো ভারতের ইউরোপীয় হাসপাতালগুলোতে সার্জনদের সহায়তা করার জন্য সহকারী ও সৈন্যদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শুরু থেকে কোম্পানি ভারতীয় এবং কখনও কখনও ইউরোপীয় সৈন্যদেরকে কম্পাউন্ডার, ড্রেসার এবং এপোথেকারি হিসেবে নিয়োগ দেয়। এ সময় পর্যন্ত কোম্পানি কোনো নিয়মিত বাহিনী নিযুক্ত করেনি, তবে ইংরেজ ও ফরাসি কোম্পানির মধ্যে ১৭৫০-১৭৫৪ এবং ১৭৫৬-১৭৬৩ সালের সংঘটিত যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ভারতে স্থায়ীভাবে সামরিক বাহিনী ও সামরিক চিকিৎসাসেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।[২৪]

রাজনৈতিক বিজয় ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কারণে এবং রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে নতুন নতুন হাসপাতাল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়, বিশেষ করে সৈনিকদের অবস্থানগুলিতে। ১৭৬৮ সালে সুইডিশ জন জাকারিয়া কিয়ারন্যানডার (John Zachariah Kiernander 1710-1799) এর ভবানীপুরের বাড়িতে হাসপাতাল স্থাপিত হয়। এই হাসপাতালে ইউরোপীয়ান সৈনিক, কোম্পানির লোক, জাহাজ কর্মীদের চিকিৎসা হতো। ১৭৮৯ সালে কলকাতা পুলিশ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হাসপাতালে শহরের পুলিশদের চিকিৎসা হতো। এ ছাড়া পথেঘাটে পড়ে থাকা নিরাশ্রয় অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা হতো।[২৫] দেশের জনসাধারণ অসুস্থ হলে তাদের আধুনিক চিকিৎসা পাবার কোনো অধিকার ছিল না। ইংরেজ সরকার তাদের দায়িত্বও নেয়নি। স্বভাবতই তাদের দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে হতো। পরবর্তীতে ১৭৯২ সালে দেশীয় গরিব জনসাধারণের জন্য কলকাতায় একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। একই বছরের ১৮ অক্টোবর এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয় এবং ১লা নভেম্বর এই উপলক্ষ্যে একটি সভায় কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, প্রথম, ভারতীয়দের জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা, দ্বিতীয়, এজন্য প্রয়োজণীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সমান সংখ্যক ইউরোপীয় ও কলকাতার স্থানীয়দের নিয়োগ করা এবং তৃতীয়, একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় চাঁদা তোলার জন্য একটি কমিটি গঠন করা। এই প্রসঙ্গে লে.কর্নেল ক্র্যাফোর্ড (Lt. Colonel Crawford) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> Government granted a subsidy of Rs.600 a month, on 6th July, 1793. Twelve Governors were appointed. The first hospital was opened in a house in the Chitpur Road, subsequently a house in Dharamatola was bought and opened as a hospital on 1st Sept 1794.[২৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তথা ১৭৯৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সরকারি ও জনসাধারণের দানে সর্বসাধারণের চিকিৎসার জন্য ন্যাটিভ হাসপাতাল স্থাপিত হয়।[২৭] ১৭৯৪-১৮০৬ সাল পর্যন্ত তথা ১২ বছরের এই হাসপাতালের চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীদের পরিসংখ্যান নিম্নের তালিকায় পাওয়া যায়,

বছর	অভ্যন্তরীন রোগী	বহির্রোগী	টিকাকরণ	মোট
১৭৯৪-৯৫	১১৫	১০১		২১৬
১৭৯৫-৯৬	১৯৯	২২১		৪২০
১৭৯৬-৯৭	২১৮	২৬৭		৪৯৫
১৭৯৭-৯৮	১৮৮	৪২৮		৬১৬
১৭৯৮-৯৯	২০২	৪৭১		৬৭৩
১৭৯৯-১৮০০	২০১	৬২৪		৮২৫
১৮০০-১৮০১	২৩২	১৭৯২		২০২৪
১৮০১-১৮০২	২২২	২২২৩		২৪৪৫
১৮০২-১৮০৩	১৯৮	৩৬৮১	১০৭০	৪৯৪৯
১৮০৩-১৮০৪	২১৮	৪৪৪৩	১৪৬১	৬১২২
১৮০৪-১৮০৫	২২৬	২৭৫৫	১৩৪৭	৪৩২৮
১৮০৫-১৮০৬	২২০	২৮৭৪	১২৮৬	৪৩৮০

উৎস: Lt. Colonel Crawford, *A History of the India Medical Service* 1600-1914 p. 425

উপরি-উক্ত পরিসংখ্যান আধুনিক ধারনার কাছে ছোট মনে হলেও ধীরে ধীরে এর বৃদ্ধি দেখায়। বিশেষ করে ১৮০০-১৮০১ সালের পূর্বের বছরের তুলনায় বহির্রোগীদের সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায় এবং ১৮০৪-১৮০৫ সালে ৪০% হ্রাস পায়।

রোগীদের চিকিৎসার জন্য উল্লিখিত এসব হাসপাতাল ব্যাপক চেষ্টা চালালেও চিকিৎসকের সংখ্যা অপ্রতুল ছিল কারণ ইংরেজ চিকিৎসকের সংখ্যা এদেশে খুব বেশি ছিল না। যে কজন চিকিৎসক বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন, তারা বিপুল সংখ্যক রোগীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। ফলে অনেকে চিকিৎসা পেতেন না বা চিকিৎসা বিভ্রাটে পড়তেন। আশ্চার্য হলেও সত্যি যে, ইংরেজ সরকার দেশীয়দের শাসনকার্যের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ থেকে বঞ্চিত করলেও চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব দিতে শুরু করে। এর সাথে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টি জড়িত ছিল। সরকারিভাবে না হলেও ন্যাটিভ হাসপাতালে দেশীয়দের চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এই দেশীয় চিকিৎসকরাই বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা করবার সুযোগ পান। 'Vernacular Education for Bengal' শীর্ষক এক লেখা থেকে জানা যায়,

> Previous to 1807, from fifty to one hundred native doctors used to attend the native hospital to study the practice there, and introduce it among their countrymen - one of them got so rich as to drive in his carriage.[২৮]

এসব দেশীয় চিকিৎসকরা সৈনিকদের চিকিৎসা করতেন, আবার সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসা করার সুযোগ পেতেন। তাদের মাসিক বেতন ছিল ১৫ রুপি। এরা রোগীদের ব্যান্ডেজ, ড্রেসিং এবং ঔষধ প্রয়োগ করার ওপর যতই শিখুক না কেন চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের ওপর আস্থা রাখা যেত না। কলকাতার মেডিকেল বোর্ডের সদস্যগণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, দেশীয় চিকিৎসকগণ যতক্ষণ ইংরেজ চিকিৎসকদের সঙ্গে কাজ করতেন, ততক্ষণ কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু যখনই এরা স্বাধীনভাবে রোগীর চিকিৎসা করতেন, তখন মানুষের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি ঘটেছে। বস্তুত, তাঁরা ইংরেজ চিকিৎসকের সহকারী হিসেবে কাজ করতেন।

কাজ এবং দায়িত্বের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় দেশি সহকারী নিয়োজিত করা হয়। তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না। পূর্ববাংলায় এই সহকারীদের ডাকা হতো 'কাল-ডাক্তার' এবং বোম্বেতে ডাকা হতো 'কাল সহকারী বা এপোথেকারি'।[২৯] পরবর্তীকালে এরা সবাই 'দেশি ডাক্তার' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৭৬০ এর দশকে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে সহকারীদের সাবঅর্ডিনেট মেডিকেল সার্ভির্সের (এস.এম.এস.) অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অন্যান্য প্রেসিডেন্সিতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।[৩০] দেশি ডাক্তারদের প্রয়োজন অপরিহার্য মনে করে এটি করা হয় এবং এটি তৃতীয় শ্রেণির চাকরি হিসেবে বিবেচিত হয়।[৩১] তাদেরকে বেতন ভাতা ও পদোন্নতি পরীক্ষা তথা সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে দেওয়া হতো, যা এই অধ্যায়ের পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৩২] ১৭৬৭ সাল থেকে এদেরকে দেশি সৈনিকদের বেটেলিয়নে নিযুক্তি দেওয়া হয়। এ সময় থেকে ভারতীয় চিকিৎসা সহকারী বা দেশি ডাক্তার যুদ্ধে সৈনিকদের সহযোগী হয়েছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে এই ব্যবস্থা স্থায়ী হয়ে যায়।[৩৩] ১৮১২ সালের আগে তাদের তেমন স্বীকৃতি ছিল না। এ সময়ের মধ্যে তারা মেডিকেল সংস্থার বিভিন্ন শাখায় বিশেষ করে সামরিক অভিযানে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই এবং বিভিন্ন হাসপাতালের জন্য ঔষধ প্রস্তুতকারক, কম্পাউন্ডার ও ড্রেসার অর্থাৎ ক্ষত পরিষ্কারক নিয়োগের প্রয়োজন থেকেই ভারতবর্ষে চিকিৎসাশিক্ষায় ইংরেজ সরকার জড়িয়ে পড়ে। এসব ঔষধ প্রস্তুতকারক, কম্পাউন্ডার ও ড্রেসারদের কাজ ছিল ইউরোপীয় সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারীদের স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত ইউরোপীয় ডাক্তার ও সার্জনদের সহায়তা প্রদান করা।[৩৪]

১৭৬৭-১৮১২ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার কখনও ভাবেনি ভারতীয়দের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। ইংরেজ শাসকগণ দেশীয় লোকদের জন্য প্রাচ্যশিক্ষা বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তারা আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহ দেয়। ওয়ারেন হেস্টিংস (Warren Hasting 1732-1818) এর উদ্যোগে ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। আদালতের ভাষা ফারসি হওয়ায় দারোগা, কাজী, মৌলভী, মুনশী, উকিল ও আদালতের সংশ্লিষ্ট লোকের জন্য আরবি, ফারসি ভাষা ও মুসলিম আইনে পারদর্শী বিচারক নিয়োগের প্রয়োজনে এই মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়। কোম্পানি কর্তৃক ভূমি ও অর্থ প্রদান করা হলেও প্রতিষ্ঠানটি অকার্যকরভাবে পরিচালিত হওয়ায় ১৮১৩ সালের পর পর্যন্ত সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। অপরদিকে ১৭৯১ সালে বেনারসের রেসিডেন্ট জোনাথান ডানকান (Jonathan Duncan 1756-1811) সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যেসব বিষয় বিবেচনায় নেন তা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ প্রতিষ্ঠান থেকে দুই ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়। প্রথমত, ভারতীয় রীতিনীতির প্রতি ইংরেজদের আগ্রহের মাধ্যমে দেশীয়দের ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে আনা। দ্বিতীয়ত, দেশীয়দের দ্বারা জনসাধারণের প্রধান অংশকে প্রকৃত শিক্ষা প্রদান, নিয়মিত বিচারকার্যে সহায়তা করার জন্য আইনের ব্যাখ্যাকারী, ভবিষ্যৎ চিকিৎসক তৈরি ও হিন্দু আইনের জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচার করা।[৩৫]

প্রকৃতপক্ষে কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১) ও সংস্কৃত কলেজে (১৭৯১) প্রথম প্রাচ্যশিক্ষা নীতির প্রচলন শুরু হয়। এই মতের অনুসরণকারীরা বিশ্বাস করত যে, কোম্পানি মিশনারিদের ধর্মান্তকরণের উদ্যোগকে সমর্থন করবে না, ভারতীয়দের পশ্চিমা জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোনো তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টা চালাবে না।[৩৬] ১৬৮৯ সালের কোম্পানির সনদে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে মিশনারিদের কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি ছিল, কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২-১৮১৮) এর শাসন আমলে তাঁর কূটনীতির কারণে প্রাচ্যনীতি গ্রহণ করা হলে কোম্পানির সাথে মিশনারিদের সম্পর্ক পরিবর্তন হয়।[৩৭] ১৭৯৩ সালে

কোম্পানির সনদ নবায়নের সময় মিশনারিদের ভারত ভ্রমণ ও খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের প্রস্তাব দেওয়া হলে প্রত্যাখান করা হয়। ভারতে ব্রিটিশদের আধিপত্যকে নিয়ন্ত্রনে রাখার উদ্দেশ্যেই প্রাচ্যনীতি মেনে নেওয়া হয়। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ উল্লিখিত দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রতিষ্ঠান দুটি স্থাপনে মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু, মুসলমান উভয়ের মধ্যে সমঝোতা, ভারতীয় আইন রীতিনীতি সমৃদ্ধ একটি অভিজাত শ্রেনি তৈরি এবং ব্রিটিশ শক্তির দৃঢ়করণ ও সুরক্ষা করা।[৩৮] এর একমাত্র কাজ ছিল ঐতিহ্যগতভাবে সংস্কৃত ও ফারসি এবং আরবিতে শাস্ত্রীয় শিক্ষা গ্রহণ করা। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইংরেজ শাসকগণ উপলব্ধি করেন যে, দেশীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের কিছুটা দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। ফলশ্রুতিতে ১৮১৩ সালের চার্টার এ্যাক্টের অনুমোদনের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দেন।[৩৯] এই এ্যাক্টের ৪৩ ধারা অনুসারে কোম্পানি আংশিকভাবে ভারতীয়দের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে ১০,০০০ পাউন্ড বা ১০০,০০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। ১৮২৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো বাস্তব পদক্ষেপ না নেওয়া হলে আইনের এই ধারাটি অকার্যকর অবস্থায় ছিল, কারণ অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি ও সংস্থা না থাকায় কোম্পানি প্রাথমিকভাবে অর্থ ব্যয় করতে নারাজ ছিল।[৪০] শিক্ষার বিষয়বস্তু ও কোন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে সে প্রশ্নে কোম্পানির ভারতীয় কর্মকর্তাগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। এই বিষয়টি নিয়ে প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী প্রধান দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। ১৮১৩ সালের এ্যাক্টের তাৎপর্য হলো এই যে, পার্লামেন্টের বোর্ড অব কন্ট্রোল এবং কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স তারা কেবলমাত্র বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জনসাধারণের জন্য নয়, বরং বোম্বে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির জনসাধারণের জন্যও দায়িত্ব পালন করবে।[৪১] তাছাড়া এই এ্যাক্টের মাধ্যমে পুনরায় মিশনারিদের ভারত ভ্রমণ, খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার বৃদ্ধি পায়। ১৮২৩ সাল পর্যন্ত কোনো ধরনের সুশৃঙ্খল শিক্ষার কার্যকরী বাস্তবায়ন হয়নি, তবে শিক্ষা ব্যবস্থা তত্ত্বাবধানের জন্য 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন' গঠন করা হয়। এর মাধ্যমে স্কুল ও কলেজগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হতো, কিন্তু উন্নয়ন ছিল ধীর গতিতে।[৪২]

চিকিৎসা ব্যবস্থায় দেখা যায় দেশি সহকারীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকায় স্বাধীনভাবে রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে প্রায়ই ভুল হতো। তাই কলকাতার মেডিকেল বোর্ডের সদস্যগণ একটি মেডিকেল স্কুল নির্মাণ করে সেখানে তাদেরকে বৈজ্ঞানিক ও ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত নেন।[৪৩] এই ব্যাপারে মেডিকেল বোর্ড একটি প্রস্তাবনা তৈরি করে সরকারের নিকট স্বারকলিপি পেশ করে। তৎকালীন সময়ে দেশীয় চিকিৎসকের অভাব থাকায় সেনাবাহিনী ও সাধারণ মানুষের চিকিৎসা করা সম্ভব হতো না। সরকারি খরচে মেডিকেল স্কুল পরিচালিত হলে দেশীয় চিকিৎসকের অভাব পূরণ হবে বলে উল্লেখ করা হয়। সরকার মেডিকেল বোর্ডের প্রস্তাবনা অনুমোদন করে এবং স্কুলের পরিকল্পনা ও নিয়মকানুন গঠন করে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। অতএব মেডিকেল বোর্ড তাদের পরিকল্পনা জমা দেয় এবং সেই অনুযায়ী ১৮২২ সালের ২১ জুন কলকাতায় 'দ্য স্কুল ফর ন্যাটিভ ডক্টর্স' (The School for Native Doctors) প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮২৪ সালে এই স্কুলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'দ্য ন্যাটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশন'। এই ব্যাপারে *বঙ্গশ্রী* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে,

> ইহাই সমগ্র ভারতবর্ষে গভর্নমেন্ট-স্থাপিত সর্ব প্রথম চিকিৎসা বিদ্যালয়।[৪৪]

গভর্নর জেনারেল লর্ড ময়রা বা মারকুইজ অব হেস্টিংস (১৮১৩-১৮২৩) এর সময়ে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই স্কুলের প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন মেডিকেল বোর্ডের সেক্রেটারি সার্জন ডা. জেমস

জেমিসন (James Jameson 1789-1823)। স্কুলের নিয়ম বিধিটি ৩৯ দফা সম্বলিত ছিল। সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে যেসব দেশীয় চিকিৎসক সেবা দিবে, তাদের শিক্ষিত করে তোলাই এই স্কুলের উদ্দেশ্য। প্রথম হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চ বংশীয় ২০ জন ছাত্রের ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। স্কুলের ৭ ও ৮ দফায় উল্লেখ করা হয় যে, যেসব দেশীয় ডাক্তাররা ইতিমধ্যে চাকুরীতে রয়েছে তাদের ছেলেরা অগ্রাধিকার পাবেন, 'যদি পিতা পুত্র উভয়েরই ভালো বংশে জন্ম হয়, সৎ চরিত্রের হয়। এই স্কুলে ভর্তিকৃত ছাত্ররা নিয়মিত সৈনিক হিসেবে তালিকাভুক্ত থাকবে। পাশ করার পর তাদের সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের শূণ্যপদে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে এবং তাদের চাকুরির মেয়াদ হবে ১৫ বছর'।[৪৫] এই স্কুলে ভর্তিকৃত ছাত্রদের ফারসি ও নাগরি অক্ষরে হিন্দুস্তানি ভাষায় লিখতে ও পড়তে জানতে হতো কারণ তাদেরকে দেশীয় ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা দেওয়া হতো। জেমিসন তাদের উর্দু, হিন্দিতে পড়াতেন। ১৮২৩ সালে জেমিসনের মৃত্যুতে স্কুলের কার্যক্রমে সাময়িক অসুবিধা হলেও মেডিকেল বোর্ড তাঁর জায়গায় ডা. জন ব্রেটনকে (Dr. John Breton 1823-1828) স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি স্কুলে যোগদান করেই ছাত্রদের উপযোগী বেশ কিছু চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখেন। তাঁর এই গ্রন্থগুলো ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। তিনি হিন্দুস্তানি, ফারসি ও নাগরি অক্ষরে লিখেন,

A treatise on vaccination

A Ditto Hydrocele

A Ditto on mineral Poisons

Posological Table

Reference to various Anatomical Plates

বাংলায় লিখেন,

A treatise on vaccination[৪৬]

এ ছাড়া আরো কিছু গ্রন্থ Bibliotheca Orientals এ ক্যাটালকভুক্ত হয়। যেমন,

Anatomy of the urinary organs 1828
Anatomy of the human integuments
Anatomy Diseases and incidental Complaints of the human ear, 1829
On the Dislocation
On Air 1829
Treatise on Vegetable Poisons

বাংলায় লিখেন,

ওলা ওঠা বিবরণ[৪৭]

উপরি-উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) প্রশংসা সূচক মন্তব্য করেন। রাজা রামমোহন রায়কে গ্রন্থগুলো তাঁর জন্য পাঠানো হলে তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে পড়েন এবং এগুলো স্থানীয় জনগণের মধ্যে দান করা হলে অনেক খুশি হন। গ্রন্থগুলোর প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য রয়েছে এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। নিছক কল্পনা, কুসংস্কার এবং মতামত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। এজন্য তিনি ব্রেটনের অনেক সাফল্য কামনা করেন।[৪৮]

অপরদিকে রাধাকান্ত দেব কলেরা রোগের ওপর কাজের জন্য তাঁর ব্যাপক প্রশংসা করেন। এই রোগের কারণ, উপসর্গ ও প্রতিরোধের উপায়কে সঠিক, উপকারী ও ফলপ্রসু বলে মনে করেন। তিনি ব্রেটন এর

পরামর্শ ও চিকিৎসাকে দেশের ভেতরে ও বাইরে প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করেন। এর মাধ্যমে মানুষের জীবন রক্ষা পাবে বলে বিশ্বাস করেন। তিনি যে পরিমাণ মেধা, শ্রম ও কষ্ট করেছেন, এজন্য তাঁকে কৃতজ্ঞসহকারে বিরাট পুরস্কৃত করার জন্য সুপারিশ করেন।[৪৯] বস্তুত বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্রেটনের পরিশ্রম ও কাজকে তৎকালীন সময়ের সমাজ সংস্কারক ও রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ প্রশংসা করেন। যার প্রমাণ উপরি-উক্ত মন্তব্যগুলো। ব্রেটন পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষাকে ভারতীয় মোড়কে উপস্থাপন করতে ও কাজে পরিণত করতে সফল হন।

এই প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার কোর্স ৩ বছরে সম্পন্ন হতো। এন.এম.আই. (N.M.I) এর ছাত্ররা তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে সাথে ব্যবহারিক তথা ক্লিনিক্যাল শিক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল, কিংস হাসপাতাল ও ন্যাটিভ হাসপাতালে যেত। এনাটমিতে ছাত্রদের আগ্রহ ও উৎসাহ থাকলেও মৃত মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করা হতো না। ফলে এনাটমিতে তাঁদের জ্ঞান সীমিত ছিল। এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা ছাত্ররা দেশি ও বিদেশিদের চিকিৎসা করতে সক্ষম হন। তারা পাশ করার পর সামরিক বিভাগে ও ডিসপেনসারিতে যোগ দিত। তারা নিজেদের যোগ্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চিকিৎসাশিক্ষা দেওয়া হলেও তখন এদেশে চিকিৎসকের অভাব ছিল। যা তৎকালীন সময়ের (১৮২৫) কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল স্যার এডওয়ার্ড প্যাজেট (Edward Paget 1775-1849) কাউন্সিলের কাছে পেশ করেন, উপরন্তু ভারতে সেনাবিভাগসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দেশীয় চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ছিল। চিকিৎসক ছাড়া বাংলার সেনাবাহিনী অচল। এই প্রতিষ্ঠানের মতো এবং এর চেয়ে কম খরচে আরো এরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা সে ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে যে পরিমাণ আর্থিক খরচ হয়, তার চেয়ে বেশি উপকার হয়েছে।[৫০] ১৮২৫ সালের ৩১ অক্টোবর ডা. পিটার ব্রেটন সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যে চিঠি দেন তাতে উল্লেখ করেন,

> আপনি যে হিন্দু ও মুসলমানদের চিকিৎসাশিক্ষা দানের জন্য প্রতিষ্ঠিত NMI সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করেছেন এতে আমি খুশি।
>
> প্রাচ্যে সমস্ত বিজ্ঞানচর্চার মধ্যে সবচেয়ে কম চর্চা ও গবেষণা হয়েছে এনাটমি এবং মেডিসিন। তাই ব্রিটিশ সরকার NMI প্রতিষ্ঠা করে শুধু সামরিক এবং বেসামরিক লোকজনই নয় সাধারণভাবে ন্যাটিভ জনসাধারণের উপকার করেছেন। ...সত্যি বলতে কি, ভারতে সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের যেভাবে একই সূত্রে বাধন হয়েছে, মেডিকেল ইনস্টিটিউশনটি সেই একই আদর্শে স্থাপিত।[৫১]

এদিকে ১৮২৭ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় মেডিকেল ক্লাস শুরু হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চিকিৎসাশিক্ষা দেবার জন্য ডা. ব্রেটনের লেখা গ্রন্থগুলো দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ডা. ব্রেটন এর মৃত্যুর পর ডা. টাইটলার (John Tytler 1790-1837) মাদ্রাসার মেডিকেল ক্লাসকে সাহায্য করেন। এই ক্লাস সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায়,

> Dr Breton, the professor of medicine, had been authorized to obtain a supply of medical tracts, and a skeleton had been purchased for the use of the medical class. Orders had also been given for translating into Arabic an anatomical work published by Mr. John Tytler.[৫২]

ইতিমধ্যে ১৮২৬ সালের শেষের দিকে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের (স্থাপিত: ১৮২৪) বৈদ্য শ্রেণির ছাত্ররা সমবেতভাবে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশনের তৎকালীন সভাপতি ডা. হোরেস হেম্যান

উইলসন (Horace Hayman Wilson 1786-1860) এর কাছে তাদের জন্য চিকিৎসাশিক্ষার ক্লাস শুরু করার জন্য আবেদন জানান। ছাত্রদের আবেদনে ডা. উইলসন এবং ন্যাটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশনের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. টাইটলার সাড়া দেন। তাঁরা আয়ুর্বেদ এর মতো এমন একটি চিকিৎসা বিভাগের প্রয়োজনীতার কথা সরকারকে জানান এবং সরকার তাঁদের প্রস্তাবে রাজি হন। ফলে একই বছরের ডিসেম্বর মাসে আয়ুর্বেদ ক্লাস শুরু হয়। ১৮২৮ সালে ডাক্তার জন টাইটলার এনাটমি ও গনিতশাস্ত্র পড়াতে শুরু করেন। এদেশে চিকিৎসাশিক্ষার ব্যাপারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য, তিনি দেশীয় চিকিৎসকদের জন্য বেশ কিছু গ্রন্থ অনুবাদ করেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো ডা. রবার্ট হুপার (Robert Hooper 1773-1835) এর *'এনাটমিস্ট ভাদেমিকাম'(১৭৯৮) 'দ্য ফিজিসিয়ানস ভাদেমিকাম'* (১৮০৯), 'দ্য সার্জনস *ভাদেমিকা*', টি.জি. বান্ট ক্রকার আব্রাহাম (T.G. Bunt Crocker Abraham 1794-1872) এর *'এলিম্যান্ট অব ল্যান্ড সার্ভেয়িং'*, চালর্স হাটন (Charles Hutton 1737-1827) এর *'কোর্স অব ম্যাথমেটিকস'*।[৫৩] সংস্কৃত কলেজেও এনাটমি শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। তাই চিকিৎসাশিক্ষার উচ্চ শিক্ষায় ঘাটতি থেকে যেত এবং তারা এনাটমির প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতো। ফলে শল্য চিকিৎসায় তাঁরা যে জ্ঞান অর্জন করত তা ভাসা ভাসা ছিল।[৫৪]

সাধারণত এই পর্যায়ে ঔপনিবেশিক সরকার দ্বারা চিকিৎসাশিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি একই সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রন্থগুলো অনুবাদের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়, কিন্তু ক্লিনিক্যাল অভিজ্ঞতা ছিল আবশ্যক। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্ররা বিভিন্ন হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যোগদান করত এবং এই সকল দেশীয় ডাক্তারদের সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত করা হতো। এভাবে দেখা যায়, কলকাতার দেশীয় হেলথ প্রাকটিশনারদের জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দুইটি কলেজ ও একটি প্রশিক্ষণ স্কুল ছিল।

এ সময় পর্যন্ত বাংলা তথা কলকাতায় তিনটি চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে দেশীয় চিকিৎসক তৈরি করবার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে ইংরেজ চিকিৎসকরা যথেষ্ঠ যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক হলেও চিকিৎসাশিক্ষা সম্পূর্ণ হতো না। ছাত্রদের বেশির ভাগ ইংরেজি জানত না। তাই হিন্দি, উর্দু, বাংলাতে অনুবাদ করে শিক্ষাদান চলত। তাতে একদিকে যেমন শিক্ষকদের শিক্ষাদানে অনেক অসুবিধা হতো, অন্যদিকে ছাত্ররাও সবকিছু বুঝতে পারত না। তাই এসব শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্ররা প্রায়ই অনুপস্থিত ও অমনোযোগী থাকত।[৫৫] তারপরও তৎকালীন ইংরেজ সরকার এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চিকিৎসাশিক্ষা চালিয়ে যেতে থাকেন।

ইংল্যান্ডে এ সময়ের মধ্যে কোনো সরকারি শিক্ষানীতি ছিল না। রাষ্ট্র এর জন্য দায়ীও ছিল না। চার্চ তখনও শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও কাঠামোগুলো নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করত। ১৫০ বছরেরও কম সময়ে শিক্ষার একটি বিষয় হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার ইতিহাসে দেখা যায়, এটি উপনিবেশগুলোর পাঠ্যক্রমে আর্বিভূত হয়, কারণ এটি নিজ দেশে (ইংল্যান্ড) প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। ১৮২০ এর দশকের শুরুর দিকে ইংল্যান্ডে যখন ক্লাসিক্যাল পাঠ্যক্রমের সর্বোচ্চ আধিপত্য বিরাজ করছিল, তখন এটাকে অপসারণ করার জন্য সমালোচকদের সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও বজায় ছিল। ফলে ইংরেজি কেবল ভাষা হিসেবে নয় বরং সংস্কৃত চর্চার অংশ হিসেবে ব্রিটিশ ভারতের পাঠ্যক্রমে শক্ত অবস্থান করে নেয়।[৫৬]

ইতিমধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে উপযোগবাদ, প্রটেস্টানবাদ, উদারতাবাদ দ্বারা ইংল্যান্ডের বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে এই নীতির সমর্থক ও বিরোধী ভারতেও দেখতে পাওয়া যায়। পার্লামেন্ট ও কোম্পানি এবং সরকারি ক্ষেত্রে বিতর্কের কয়েক বছর পর ১৮৩০ এর দশকে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌছায় যে, বিষয়টি নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে বিতর্ক পরিচালিত হয়। প্রাচ্যবাদীরা মনে করত যে, দেশীয় সংস্কৃতি প্রশংসনীয় প্রকৃতির এবং এটা অব্যাহত রাখা উচিত, কেননা ধীরে ধীরে মানুষ ইউরোপীয় ধারণাগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছিল। অপরদিকে, থমাস বেবিংটন মেকলে (Thomas Babington Macaulay 1800-1859) এর মতো পাশ্চাত্যবাদীদের যুক্তি ছিল যে, ভারতীয় ঐতিহ্য বিবেচনার যোগ্য নয়। যদি দেশকে আধুনিক বিশ্বে প্রবেশ করতে হয়, তাহলে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে প্রেরিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রহণ করতে হবে। ফলে সমস্ত অংশগ্রহণকারীগণ একমত হন যে, ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের নৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটবে।[৫৭] এ সময় চিকিৎসাশিক্ষার মাধ্যম কী হবে? তা নিয়েও বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। একদিকে প্রাচ্যবিদ ডা. টাইটলার অন্যদিকে রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ (Rev. Alexander Duff 1806-1878)। টাইটলারের মতে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলো দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করে পাশ্চাত্য ধারায় চিকিৎসাশিক্ষা দেওয়া উচিত। ডাফ এর মতে, চিকিৎসাশিক্ষাসহ বিজ্ঞানের অন্যসব বিষয়ে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদান করা উচিত। অন্যদিকে চিকিৎসাশিক্ষার অন্যতম বিষয় হলো এনাটমি। এটি ছাড়া চিকিৎসাশিক্ষা অসম্পূর্ণ। উল্লিখিত তিনটি চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা পূর্ণতা পায়নি। এই সম্পর্কে এন.এম.আই. এর সুপারিনটেনডেন্ট ১৮২৯ সালেই উল্লেখ করেন।[৫৮]

এই তুমুল বিতর্কের মধ্যে যিনি সিদ্ধান্ত নেন তিনি হলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (Lord William Bentinck 1828-1835)। তিনি সতীদাহ প্রথা রদ, কন্যা সন্তান হত্যা ও ধর্মীয় হত্যা, ডাকাতি ও কুসংস্কার দূরকরীণের জন্য পরিচিত ছিলেন। তার এই সিদ্ধান্ত চিকিৎসাশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন মোড় নেয়। যদিও কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স এর নির্দেশ মোতাবেক তাঁর প্রধান ম্যানডেট ছিল অর্থনীতি। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য তাঁর অগ্রাধিকারে ছিল না। কলকাতা ও কোম্পানির অন্যান্য অঞ্চল ভ্রমণের সময় তিনি উপলব্ধি করেন যে, সাধারণ মানুষের জন্য বিদ্যমান চিকিৎসা সেবার নিম্নস্তর লাঘব করার জন্য কিছু করা উচিত।[৫৯] উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার কারণে প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির মান ভালো অবস্থায় ছিল না।[৬০] তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে, যা চিকিৎসাশিক্ষার উন্নয়ন ঘটাবে। কোনো রকম অপেক্ষা না করে এই প্রস্তাব অনুসন্ধান করার জন্য ১৮৩৩ সালের শেষের দিকে চিকিৎসাশিক্ষা বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়[৬১] এবং এর পাশাপাশি দেশীয় পদ্ধতির শিক্ষাদান বন্ধ করা উচিত কিনা সে বিষয়েও প্রস্তাব করা হয়। কমিটির সভাপতি হিসেবে ছিলেন ডা. জন গ্রান্ট (John Grant 1807-1897) এবং সদস্য হিসেবে জে.সি.সি. সাদারল্যান্ড (J.C.C. Sutherland 1733-1839), সি.ই. ট্রেভেলিয়ান (Charles Edward Trevelyan 1860-1886), থমাস স্পেনস (Thomas Spens 1764-1842), মাউন্টফোর্ড জে. ব্রামলি (Mountford J. Bramley 1803-1837) এবং একমাত্র ভারতীয় সদস্য রামকমল সেন (১৭৮৩-১৮৪৪) ছিলেন।

এ ক্ষেত্রে কমিটির সদস্যরা নেতৃস্থানীয় প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদীদের সাক্ষাৎকার নেন। প্রাচ্যবিদ টাইটলার সংস্কৃত কলেজে চিকিৎসা ক্লাস তুলে দেবার বিরোধিতা করেন। তিনি সংস্কৃত চিকিৎসাশাস্ত্র,

দেশীয় ঔষধ এবং জোর করে দেশীয় শিক্ষাকে বাদ দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি যুক্তি দেন, এর ফলে ভারতীয়রা ইউরোপীয়ান শিক্ষার ধারার প্রতি বিরক্ত হবে এবং মনে করবে এই ধারার শিক্ষা কোনো যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অন্যদিকে ভারতীয় শিক্ষার ধারার সাথে ইউরোপীয় শিক্ষার ধারার মধ্যে কোনো সংঘর্ষ না ঘটিয়ে একের সঙ্গে অপরের সমন্বয় করে খিস্ট্রধর্মের মতো ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে এদেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর থেকে প্রমাণিত হবে যে, ভারতীয়দের জ্ঞানের বিরুদ্ধে ইংরেজদের কোনো হিংসা নেই বরং তাদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এরূপ পরিস্থিতিতে ভারতীয়রা যদি যুক্তিগ্রাহ্য মানুষ হয়, তাহলে সত্য একদিন না একদিন তাঁদের মধ্যে চিরকালীন জায়গা করে নিবে বলে প্রাচ্যবিদ মনে করেন।[৬২] পরবর্তীকালে তাঁর এই সিদ্ধান্ত মানা হয়নি।

এ সময় ডাফ কলেজ পরিদর্শনের সময়ে কমিটির সদস্যরা সবচেয়ে কার্যকর প্রমাণ পান। ডা. আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৬-১৮৭৮) স্কটিশ মিশনারির শিক্ষক ও ডাফ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের পরিত্রাণ হবে খ্রিস্টানিটি, ধর্মনিরেপেক্ষতা এবং ইংরেজিতে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো শিক্ষাদানের মাধ্যমে। এই কমিটি তাঁর সহযোগিতায় কলেজের সিনিয়র শিক্ষার্থীদেরকে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় যে, তারা এনাটমির উদ্দেশ্যে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ (ডাইসেকশন) করবে কিনা? তখন তারা অকপটতার সাথে উত্তর দেয় নিশ্চয়ই, তবে তারা এটাও স্বীকার করে যে, এই ধরনের কাজ (মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ) ঐতিহ্যগত বিশ্বাসের বিপরীতে হবে।[৬৩] উপরন্তু এই কমিটি ন্যাটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশনে যে চিকিৎসাশিক্ষা দেওয়া হতো, এর ক্রটিগুলো তুলে ধরেন। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট মানের পদ্ধতির অভাব, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতির অপ্রতুলতা, ছাত্র ভর্তির সময় শৃঙ্খলার অভাব, শিক্ষার সংক্ষিপ্ত স্থিতিকাল, প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের অভাব, ব্যবহারিক শিক্ষার সময় নিয়মশৃঙ্খলহীনভাবে ছাত্রদের অনুপস্থিতি, চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণের সময় শৃঙ্খলার অভাব, অনুপযুক্ত প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি এবং ব্যবহারিক এনাটমি কোর্সের অনুপস্থিতি এবং সুপারিনটেনডেন্ট এর ওপর ন্যস্ত ক্ষমতার সঠিক প্রয়োগের অভাবের জন্য সমালোচনা করে। পুরো একবছর ধরে এই কমিটি চিকিৎসাশিক্ষা নিয়ে সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং বিচার বিশ্লেষণ করে ১৮৩৪ সালের ২০ অক্টোবর গভর্নর জেনারেলের কাছে রিপোর্ট প্রদান করে।[৬৪] রিপোর্টে প্রাচ্যবাদীদের ওপর পাশ্চাত্যবাদীদের মতামত প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিটি কলকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের চিকিৎসাশিক্ষার ক্লাশ এবং ন্যাটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশন বন্ধ করে দেশীয়দের পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষার জন্য একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেন। ইউরোপের চিকিৎসাবিজ্ঞানের যেসব শাখা রয়েছে, সেগুলো এই কলেজে পড়ানো উচিত বলে সুপারিশ করেন। এই আলোচনার ফলস্বরূপ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কলকাতা মাদ্রাসা ও কলকাতা সংস্কৃত কলেজের চিকিৎসাশিক্ষার ক্লাশ বন্ধ করার জন্য ১৮৩৫ সালের ২৮ জানুয়ারি এক আদেশ জারি করেন এবং একই আদেশের মাধ্যমে দেশীয়দের জন্য প্রতিষ্ঠিত ন্যাটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশন বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৬৫] ভারতীয় চিকিৎসকদের উচ্চতর চিকিৎসাশিক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষাতে সমস্ত শিক্ষণসহ ইউরোপীয় মডেলে একটি প্রতিষ্ঠান তথা ‘কলকাতা মেডিকেল কলেজ’ প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা ‘বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ’ নামেও পরিচিত ছিল।[৬৬] এটি এশিয়ার প্রথম ইউরোপীয় মেডিকেল কলেজ।[৬৭]

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে বেন্টিঙ্ক এর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর শাসনামল সশস্ত্র দ্বন্দ্ব এড়ানো এবং ব্যয়সঙ্কোচন নির্ভর। তার সময়ে চিকিৎসা এবং এর আনুষঙ্গিক বিজ্ঞান শিক্ষাসহ, সামাজিক উন্নয়ন

ও সংস্কারের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করা হয়। বেন্টিঙ্ক ভারতীয়দের সুবিধার জন্য ভারত শাসন করার নীতি গ্রহণ করেন। ইংরেজি ভাষার পক্ষে তার সমর্থন কেবলমাত্র ভাষাগত ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেকে ভারতীয়রা যাতে সুবিধা নিতে পারে, তাই তিনি এই মাধ্যমটিকে একমাত্র উপায় হিসেবে বিবেচনা করেন। বেন্টিঙ্ক এর দর্শন ছিল,

> The great object of British Government ought to be the promotion of European literature and science amongst the native of India.[৬৮]

অপরদিকে ইউরোপীয় দেশের ঘটনাবলির সাথে কলকাতার দেশীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অনেকে অবগত ছিলেন। এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। তিনি প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক গ্রন্থ এবং সত্যকে হিন্দুত্বের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একজন ব্যাখাকারী ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি সরকারকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম সজ্জিত একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, গণিত, জাতীয় দর্শন, কেমিস্ট্রি এবং এনাটমি শিক্ষার ব্যবস্থা এবং ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ দিয়ে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো উন্নত, উদার ও আলোকিত করার জন্য অনুরোধ করেন।[৬৯] রাজা রামমোহন রায়ের মতো শুধু প্রগতিশীল নেতাই নন, রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) এর মতো রক্ষণশীল কেউ কেউ পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষাকে সমর্থন দেন। রাধাকান্ত দেব সে সময়ের *চিকিৎসা* পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বাংলায় টিকা দেওয়াকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেন এবং চিকিৎসাশিক্ষার প্রসারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।[৭০]

এভাবে দেখা যায় যে, ভারতীয়রা জাতিগত বা প্রথাগত রীতিনীতির সাথে কোনো সমঝোতা ছাড়াই নতুন জ্ঞানকে গ্রহণ করে। এর সাথে যুক্ত ছিল শহুরে অভিজাত নতুন একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বর্তমান ধারণাগুলো গ্রহণ করে। তাদের সাথে সরকারের অধস্তন কর্মকর্তা, শিক্ষক, আইনজীবী, প্রযুক্তিবিদ, ব্যবসায়ী এবং ডাক্তার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাদের কাছে পাশ্চাত্য শিক্ষার আবির্ভাব ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপের রেনেসাঁসের আগমনের মতো একটি ঘটনা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দৃঢ়করণ ও স্থিতিশীলতায় কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যাপারটি কাজ করেনি বরং জ্ঞানের আহরণ ও সামাজিক যোগাযোগ ছিল গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র।[৭১] জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে দেশীয় তরুণদের আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষায় পারদর্শী করে তোলাই ছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজের লক্ষ্য। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে চিকিৎসাশিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাই উনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় চিকিৎসাশিক্ষার স্বর্ণযুগ।[৭২] এ সময় পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে রীতিসিদ্ধ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রাচ্যে পথ প্রদর্শনের ভূমিকা পালন করে।

ঔপনিবেশিক ভারতে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ, ব্যবসা-বানিজ্য বৃদ্ধি, নতুন নতুন বন্দর খোলা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সংক্রামক রোগ জনিত অধিক মৃত্যুর হার এবং ব্যাপকভাবে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ (কলেরা, প্লেগ ইত্যাদি) ছড়িয়ে পড়ার কারণে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও চিকিৎসাশিক্ষা প্রবর্তনেরক্ষেত্রে মেডিকেল কলেজ স্থাপনে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উল্লিখিত বিষয়গুলো ভূমিকা রাখে।

ঔপনিবেশিক ভারতের স্বাস্থ্যগত নানাসংস্কার, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন (১৮৩৫-১৯১২)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলকাতায় সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ লেখার সূচনা হয়, যা ব্রিটিশ ভারতের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে।[৭৩] ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'The Medical and Physical Society of Calcutta' থেকে *'TRANSACTIONS OF THE MEDICAL AND PHYSICAL SOCIETY OF CALCUTTA'* নামে পত্রিকা ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন রোগ বিশেষ করে সংক্রামক রোগ, প্রতিকার এবং চিকিৎসার উপায় নিয়ে প্রায় ৩৩টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৭৪] এই প্রবন্ধগুলোতে উল্লেখ করা হয় যে, সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে কলকাতার জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম ও প্রধান যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তাহলো স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক সংস্কার, নগর পরিকল্পনা এবং হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা। এটা ছিল পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষা ও চিকিৎসা পেশা গ্রহণের প্রথম উদ্যোগ। এ সময় বাংলার অনেক হিন্দু চিকিৎসক ব্যাপকহারে পাশ্চাত্য চিকিৎসা পেশায় চলে যায়।[৭৫] এ সময় দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির (আয়ুর্বেদিক ও ইউনানি) অবস্থা দেশীয় শাসনের অবসানের সাথে সাথে খারাপ হয়ে যায়। ১৮৬৬ সালে 'কনস্টান্টিনোপল স্যানিটারি কনফারেন্স' এর পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ওপর একটি বড় ধরনের আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হয় কারণ কলকাতা কর্তৃপক্ষ সবসময় প্রাদেশিক সরকারের মতের সাথে একমত হননি। তাই প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকে ভারত সরকারের কাছে বিভিন্ন ধরনের দাবি আসলেও, তারা (ভারত সরকার) দেশের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিল। তবে অনিচ্ছুকভাবে হোক আর না হোক ভারতের ভেতরে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি এসব ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাছাড়া ব্রিটিশ ভারতে ভারতীয় সৈন্যের চেয়ে ইউরোপীয় সৈন্যের মৃত্যুর হার বেশি ছিল। এর প্রধান কারন ছিল অপর্যাপ্ত নর্দমা ও পানি সরবরাহ, দুর্বল পানি নিষ্কাশন, অস্বাস্থ্যকর বায়ু চলাচল এবং ঘিঞ্জিপূর্ণ ব্যারাক।[৭৬]

উপরন্তু কলকাতা, বোম্বাইয়ের মতো বন্দর শহরগুলিতে 'পোর্ট হেলথ ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠার ফলে ১৮৯৬ সালে বোম্বেতে প্লেগ আমদানি বন্ধ হয়। অপরদিকে সরকারকে বোম্বে প্রেসিডেন্সির প্রস্তাবিত কঠোর ও নির্মম আইনকে সংযত করার জন্য বাধ্য করা হয় । এটি মহামারী দূর করার জন্য ভারতের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি আইন ছিল। ১৮৯৭ সালে আন্তর্জাতিক মহলকে আশস্ত করার জন্য 'The Epidemic Diseases Act' নামে একটি নতুন আইন পাশ করা হয় এবং এ সময় জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য অর্থ ব্যয় প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।[৭৭] অন্যান্য উদ্যোগের মধ্যে ছিল শহর উন্নয়ন ট্রাস্ট, মেডিকেল ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা ছাড়াও প্লেগের বিষয়টিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া হয়।

ব্রিটিশ ভারতের সরকারের ওপর অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গও চাপ সৃষ্টি করে আসছিল। আন্তর্জাতিকভাবে ভারত সরকারকে গঙ্গার পবিত্র স্নানের মতো হিন্দুদের স্পর্শকাতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়, কারণ হাওড়া ও এলাহাবাদের তীর্থ যাত্রীদের মাধ্যমে কলেরা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সম্মেলনে তুলে ধরা হয়। এখানকার জলাশয় থেকে রোগটি পর্যায়ক্রমে মহামারী আকারে বিশ্বের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

অপরদিকে ১৮৬৯ সালে যখন সুয়েজ খাল খুলে দেওয়া হয়, তখন সামুদ্রিক জলপথের ক্ষেত্রে বিশ্বে একটি নতুন পথকে উন্মোচিত করে। এটা কেবল পূর্ব ও পশ্চিমকে যুক্ত করেনি বরং দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আরব ভ্রমণকারীদের যাত্রার সময় ও দূরত্ব কমিয়ে দেয়। সুয়েজ খাল হজের ইউরোপীয়ান ও ঔপনিবেশিক ধারণার একটি দিক চিহ্নিত করে, কেননা হজযাত্রীদের মাধ্যমে ইউরোপীয় জাতির

চিকিৎসা ব্যবস্থা বড় ধরনের হুমকীর সম্মুখীন হয়। ১৮৬৫ সালে মক্কায় কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে তা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ায় পরবর্তীতে হজযাত্রীদের যাত্রার মাত্রা সতর্ক করে দেওয়া হয়।[৭৮] বিশেষত উপমহাদেশ থেকে আগত হজযাত্রীদেরকে মহামারী বহনকারী হিসেবে দেখা হতো যেমন, বাংলার গঙ্গানদী ছিল 'কলেরার প্রাকৃতিক আবাস'।[৭৯] ফলে হজ ও কলেরার এই বিষয়টি ইউরোপীয় বিভিন্ন জার্নাল, সময়িকী এবং আন্তর্জাতিক স্যানিটারি সম্মেলনে বিশেষ করে কনস্টান্টিনোপলে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়। তাদের এসব মতামতের সাথে ইউরোপীয় সরকারের মতের সামঞ্জস্য ছিল। অধিকাংশ ইউরোপীয় সরকার বিশ্বাস করত যে, এই রোগটি ভারতীয় হাজিদের দ্বারা মক্কায় বহন করে আনা হতো।[৮০] ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে উপমহাদেশ থেকে আগত হাজিদের ওপর সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তথা 'কোয়ারেন্টাইন' দাবি করে। তাদের এই দাবিটি চূড়ান্তভাবে কার্যকরও হয়েছিল। ১৮৮২ সালে কনস্টান্টিনোপলে 'The Superior Council of Health' প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বোম্বে থেকে আগত সমস্ত হাজিদের তাদের গন্তব্যস্থল থেকে প্রায় ৫০০ মাইল দক্ষিণে কামারান দ্বীপে থাকতে বাধ্য করা হয়। এখানে তাদের ১৫ দিন রেখে রোগ সংক্রামক শনাক্তকরণের জন্য পর্যবেক্ষণ করা হয়।[৮১] এটা হজযাত্রীদের জন্য অনেক কষ্টকর ছিল। তাছাড়া হজ ও কলেরার মধ্যে সংযোগ থাকায় ইউরোপীয় দেশগুলো কর্তৃক বারবার এই বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়।ফ্রান্স, ইটালির মতো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কলেরা ও প্লেগের সময়ে ভারতীয় জাহাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জোর আহ্বান করা হয়। পশ্চিম সুয়েজে রোগ ছড়িয়ে পড়লে তা প্রথম ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি অটোমান সাম্রাজ্য থেকে প্লেগ বিস্তারের বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে উদ্বিগ্ন ছিল। এ ছাড়া বোম্বের মতো ভারতীয় বন্দরের মাধ্যমে মেসোপটেমিয়া ও পার্সিয়ান গালফ থেকে ইউরোপ পর্যন্ত প্লেগ রোগ বিস্তারের ব্যাপারেও সতর্ক ছিল। তাই মিশর এবং কনস্টান্টিনোপলের স্বাস্থ্যবিধি বোর্ড যদি ভারতীয় জাহাজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয় তাহলে এই রাষ্ট্রগুলো অটোমান ও মিশরীয় জাহাজের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার হুমকি দেয়।

তুরস্ক, আরব ও লোহিত সাগরে একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষার জন্য ইউরোপীয় এই দেশগুলো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধকল্পে জাহাজ আটকে রাখার নিষেধাজ্ঞা ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে। ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসনের সন্দেহ ছিল যে, এই ব্যবস্থাটি শত্রুতামূলকভাবে উত্থাপন করা হয়। এই বিষয়টি ব্রিটিশ ভারতের আমদানি রপ্তানি ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে। ফলে এর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যাপারে আরো বলা হয় যে,

> This serves as a reminder that there was always a political dimension to quarantine and such measures were rarely determined by geographical location alone.[৮২]

কলেরা ও তীর্থযাত্রার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক থাকায় ১৮৬০ সাল থেকে স্যানিটারি প্রশাসনের ক্ষমতা ও আধিপত্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় এই প্রশাসনের বেশ কিছু উন্নয়ন ঘটে যা আরো কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসিত স্যানিটারি ও মেডিকেল প্রশাসন সৃষ্টি করে। ১৮৬৭ সালে স্বরাষ্ট্র সচিবের (Secretary of State) কাছে ভাইসরয় জন লরেন্স (Sir John Lawrence 1811-1879)) এর পাঠানো একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে,

> It will certainly never do to place (civilian sanitary) matters in the hands of the army sanitary commission.[৮৩]

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে,

> The urgent need for a central sanitary authority as there was practically no central control and the government of the minor presidencies act as they think proper.[৮৪]

সবকিছুর মূলে ছিল অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি ও ব্রিটিশ প্রশাসনের বাণিজ্যিক স্বার্থ। এ সময় মুক্তবাণিজ্য মতবাদটি একটি শক্তিশালী আইন হিসেবে ছিল। তাই অনেক বাদ-প্রতিবাদের পরে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার 'কোয়ারেন্টাইন' বা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে মেনে নেয়। রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য লোহিত সাগর, কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতীয় জাহাজকে আলাদা রাখার কারণে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য, ডাক ব্যবস্থা যেমন ক্ষতির সম্মুখীন হয়, ঠিক তেমনি হজ যাত্রীরাও বড় ধরনের অসুবিধায় পড়ে। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো ঔপনিবেশিক সরকারকে আঘাত করে। ফলশ্রুতিতে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারকে আন্তর্জাতিক বিধি অনুযায়ী ভারতীয় জাহাজ চলাচল নিয়মিত করতে, শহরগুলো পরিষ্কার করা এবং রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধকল্পে পোতাশ্রয়গুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে আলাদা রাখতে বাধ্য করা হয়।[৮৫] এর ফলে পাশ্চাত্য চিকিৎসা কেবলমাত্র সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই দেশে বসবাসরত ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কালক্রমে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং এরই ধারাবাহিকতায় সৈনিকদের সেবা দেওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় জনগণকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষায় পারদর্শী করে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পূর্ববাংলা ছিল অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ একটি অঞ্চল। এর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ছিল মুসলমান। ১৮৭২ সালের *সেন্সাস অব বেঙ্গল* এ দেখা যায় যে পূর্ববাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা ৭,৯৫,০৫৩০ এবং হিন্দুদের সংখ্যা ৪৮৬৯৭৩১।[৮৬] মুসলমানরা অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল ও অশিক্ষিত ছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতার খর্ব হয় এবং মুসলমানদের পাশাপাশি পূর্ববাংলার যেসব হিন্দু জমিদার ছিল ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে তাদের পতন হয়। এর ফলে পূববাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুত অবনতি হতে থাকে। যার প্রভাব এই অঞ্চলের জনগণের শিক্ষা, চিকিৎসাসহ নানা উন্নয়নমূলক কাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, কারণ এই অঞ্চলের উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

১৯০৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করে উচ্চতর কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন কোনো উন্নয়ন ঘটেনি। অথচ ১৮৩৫ সালে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা ও একই বছরে ২রা ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর পরই সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে মোট ১৬টি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৮৭] মাদ্রাজ চারটি, বোম্বে দুইটি, পাঞ্জাব তিনটি, যুক্তপ্রদেশ দুইটি, বাংলা দুইটি, বিহার একটি, দিল্লি একটি ও উড়িষ্যায় একটি মেডিকেল কলেজ হলেও পূর্ববাংলা তথা ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে বিলম্ব হয়।

এই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কোনো মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হলেও পূর্ববাংলা তথা ঢাকায় বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ১৭৯৪ সালে কলকাতার ন্যাটিভ হাসপাতালের শাখা হিসেবে ঢাকায় ন্যাটিভ হাসপাতাল (১৮০৩) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ঔষধপত্র ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ এবং প্রতিমাসে ১৫০ রুপি হারে চাঁদা সরকারের পক্ষ থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রদান করে। এই হাসপাতালকে

সাহায্য করার জন্য ইউরোপীয় ও স্থানীয় অধিবাসী চাঁদা তুলে ২২০০০ রুপির একটা ফান্ড গড়ে তোলে। হাসপাতালটি ৪০জন রোগীর চিকিৎসা প্রদানে সক্ষম ছিল, তবে আলো বাতাস চলাচলে অনুপযোগী ও আয়তনে ছোট হওয়ায় এটি যথাযথ চিকিৎসা সেবা প্রদানে ব্যর্থ হয়। এ ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল মানসিক হাসপাতাল, জেল হাসাপাতাল, সামরিক হাসপাতাল এবং ভ্যাকসিন ডিপার্টমেন্ট।[৮৮]

সমগ্র পূর্ববাংলা ও আসামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল মিটফোর্ড হাসপাতাল। ১৮৬৭ সালে ৯২ জন রোগীর থাকার ব্যবস্থা ছিল। এ সময় থেকেই হাসপাতালটির পরিসর বড় হতে থাকে। ১৯০৭ সালে ১৩৯ জন পুরুষ ও ৪২ জন মহিলা রোগীর শয্যা বিশিষ্ট ছিল। যেখানে একই পরিবেষ্টিত জায়গায় লেডি ডাফরিন হাসপাতালে ৪ শয্যা বিশিষ্ট ছিল। হাসপাতালের প্রধান ওয়ার্ডের সাথে যুক্ত ছিল লেকচার রুম, ডাইসেকটিং রুম, বহির্রোগী বিভাগ, এবং অভ্যন্তরীণ ইউরোপীয় রোগীদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। ১৮৭৫ সালে মিটফোর্ড হাসপাতালের সাথে স্থাপিত হয় 'ঢাকা মেডিকেল স্কুল'।[৮৯]

রবার্ট মিটফোর্ড (১৭৮২-১৮৩৬) এর অনুদানে এই হাসপাতাল তৈরি হলেও জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে চাঁদা দেওয়া হতো। ১৯০৭ সালে দেখা যায়, এর মোট বাৎসরিক আয় ছিল ৩৩,৭২৭ রুপি। যার মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ১০,০০০ রুপি, জেলা বোর্ড থেকে ৩,৬০৪ রুপি দেওয়া হয় এবং মোট বিনিয়োগের ওপর সুদ ছিল ৭,১৬৪ রুপি।[৯০] ঢাকা শহরের গরিব ও ধনী পরিবারের সবাই এই হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিত। এমনকি অন্যান্য জেলা থেকেও লোকজন সার্জিক্যাল চিকিৎসার জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালে আসত। ১৯০৭ সালে এই হাসপাতালে ৩,৫১৫টি অপারেশন হয়।[৯১]

১৮৯২ সালে নারায়ণগঞ্জে ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল স্থাপিত হয়। এই হাসপাতালে পুরুষের জন্য ২০টি শয্যা এবং মহিলাদের জন্য ১০টি শয্যা। শহরের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ছিল বিদেশি, যারা জুটমিল ও অন্যান্য জায়গায় চাকুরি করত। ১৯০৭ সালে এই হাসপাতালের অভ্যন্তরীন বিভাগে ৫৪০ জন পুরুষ ও ১১১ জন মহিলা রোগী ছিল। যার বহির্রোগীর সংখ্যা ছিল ১৭,০০০। ১৯০৭ সালে হাসপাতালের মোট আয় ছিল ৫,৬০০ রুপি। যার মধ্যে ৩,৩০০ রুপি মিউনিসিপ্যালিটি এবং জেলা বোর্ড থেকে ৬০০ রুপি দেওয়া হয়।[৯২]

এ সময় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে এসব হাসপাতাল ছাড়াও ২২টি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। যার মধ্যে ১৩টি জেলা বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হতো এবং ৯টি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হতো।[৯৩] এভাবে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত পূর্ববাংলায় বেশ কিছু হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে লিটন মেডিকেল স্কুল (ময়মনসিংহ), চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯৪] কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পূর্ববাংলায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা না হওয়ার পেছনে অনেক কারণই বিদ্যমান ছিল। এই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ভারতে নানারকম প্রশাসনিক, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে।

ঔপনিবেশিক শাসনকে টিকিয়ে রাখা ও একে স্বদেশের জন্য লাভজনক করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থাকে দক্ষ করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রণয়ন করে 'ভারত সরকার আইন ১৮৩৩' (The Government of India Act of 1833)। উক্ত আইনের অধীনে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে উত্তর ভারতীয়

অঞ্চলকে পৃথক করে আগ্রা প্রেসিডেন্সি নামে একটি নতুন প্রেসিডেন্সি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ১৮৩৫ সালের এক আইনে এর নাম দেওয়া হয় 'নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স' (North Western Provinces)। নতুন প্রদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য লেফটেন্যান্ট গভর্নর নামে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু বাংলার জন্য কোনো আলাদা গভর্নরের পদ সৃষ্টি করা হয়নি। গভর্নর জেনারেল একাধারে প্রেসিডেন্সির প্রধান অপরদিকে বাংলার গভর্নর। এদিকে ১৮৩৩ সালের আইনে গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিলের অফিসিয়াল পদবি (Governor General in Council at Fort William in Bengal) পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় 'গভর্নর জেনারেল অব ইন্ডিয়া ইন কাউন্সিল'। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে কাউন্সিলকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়।[৯৫]

বাংলার প্রশাসনে প্রেসিডেন্সি সরকার যেন অধিকতর মনোযোগ দিতে পারে সেজন্যই একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স গঠন করে বাংলা থেকে তা পৃথক করা হয়, কিন্তু বাংলার প্রশাসনে কাঙ্খিত দক্ষতা অর্জিত হয়নি। এ সময় বেন্টিঙ্ক রাজ্যবিস্তার এবং বঙ্গের বাইরে ভারত সাম্রাজ্য বিষয়ক সমস্যা নিয়ে ক্রমশ এতটাই জড়িয়ে যান যে, এরপর কোনো গভর্নর জেনারেলের পক্ষে বাংলা প্রশাসনে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। উপরন্তু আরেকটি সমস্যা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের অস্থীতিশিলতা। ফলে বাংলা প্রশাসন ছিল অবহেলিত। এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রেসিডেন্সি সরকার বলতে বস্তুত বাংলা সরকার। ওয়েলেসলি, হেস্টিংস, ও আর্মহাস্ট এর রাজ্যবিস্তার নীতির ফলে বাংলা প্রেসিডেন্সির তথা বাংলা সরকারের প্রশাসনিক এখতিয়ার বিস্তার লাভ করে আগ্রা থেকে পূর্বে পেনাং পর্যন্ত। জনসংখ্যা আয়তনের দিক থেকে ব্রিটেনের চারগুণ বড়ো এই রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল মাত্র গভর্নর জেনারেল-ইন-কাউন্সিল, একজন চিফ সেক্রেটারি ও চারজন সেক্রেটারির ওপর।[৯৬] ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক কারণ ও অন্যান্য প্রেসিডেন্সির সমস্যা নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত ছিলেন যে, পূর্ববাংলার স্বাস্থ্যগত বিষয়টি তাদের কাছে গুরুত্ব পায়নি। এর ফলে এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়।

গর্ভনর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-১৮৫৬) নিজে বাংলাকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আলাদা করে এর প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ গভর্নর নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে বাংলার পত্রপত্রিকা, সভাসমিতিগুলো সোচ্চার হয়ে ওঠে বাংলার জন্য আলাদা গভর্নর নিযুক্ত করার দাবিতে। বাংলার বাইরের রাজনৈতিক ও সামরিক সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এত ব্যস্ত ছিল যে, বাংলা প্রশাসনের ব্যাপারে মনোযোগ দেবার মতো সময়, সামর্থ্য সরকারের ছিল না। জনগণের দাবি ও পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ১৮৫৩ সালের চার্টার আইনে বিধান রাখা হয় যে, এখন থেকে ভারতের গভর্নর জেনারেল আর বাংলার গভর্নর থাকবেন না। বাংলার প্রশাসনিক প্রধান হবেন একজন পূর্ণকালীন স্থায়ী গভর্নর, তবে যতদিন পর্যন্ত গভর্নরের পদ পূরণ না হবে ততদিন একজন লে. গভর্নর নিয়োগ করার নির্দেশ গভর্নর জেনারেলকে দেওয়া হয়।[৯৭] এ ক্ষেত্রে তাদের (ব্রিটিশ প্রশাসন) এই কূটনৈতিক আশ্রয় নেওয়ার পেছনে বিশেষ কারণ ছিল।

বাংলাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় ব্রিটেনের ভারত সাম্রাজ্য এবং যে বাংলার রাজস্ব যোগান দেয় সাম্রাজ্যের অধিকাংশ খরচ, সে অঞ্চল একজন পৃথক গভর্নরের অধীনে আলাদা একটি প্রদেশে পরিণত হোক তা কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স চাননি। বাংলা সরকার পরিচালনার জন্য ১৮৬১ সালে ইন্ডিয়া কাউন্সিল এ্যাক্ট এর আওতায় আইন পরিষদের ব্যবস্থা করা হলেও লে. গভর্নরকে উপদেশ দেওয়া এবং বিভাগীয় কার্যপরিচালনার জন্য ক্ষুদ্র প্রেসিডেন্সি বোম্বাই ও মাদ্রাজের মতো কোনো নির্বাহী কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এর প্রধান কারণ কলকাতায় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের উপস্থিতি। রাজনৈতিক কারণে বাংলায়

গভর্নর-ইন-কাউন্সিল নিয়োগ না করে এই বিশাল প্রদেশকে একজন লে. গভর্নরের অধীনে রাখা হয়। গভর্নর জেনারেল ও উচ্চ আমলাতন্ত্র চায়নি কলকাতায় ভারত সরকারের পাশাপাশি আরেকটি সরকারের অবস্থান থাকুক। ঔপনিবেশিক শাসন ক্ষমতাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিট্রিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের মূল উদ্দেশ্য ভারতকে স্বৈরতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন করা। এই নীতি বাংলা প্রেসিডেন্সিতে প্রয়োগ করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে বাংলা সরকারের কাঠামোয়। ১৯০৫ সালে প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনের জন্য বাংলাকে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। এর পিছনে প্রশাসনিক কারণ থাকলেও রাজনৈতিক ও অন্যান্য উদ্দেশ্যও ছিল। সে বিতর্কে না গিয়ে দেখা যায় যে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম বাংলা প্রেসিডেন্সির মধ্যে পূর্ববাংলা তথা ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিলম্বের পেছনে তাদের এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে। অথচ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজস্বের দুই তৃতীয়াংশ আসত বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে। তার মধ্যে পূর্ববাংলার পাট রাজস্বের একটি অন্যতম উৎস হিসেবে ছিল।

বাংলাকে ভাগ করে উভয় অংশ পার্শ্ববর্তী কতগুলো অঞ্চলের সাথে যুক্ত করে দুইটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করা হয়, একটি পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ, আরেকটি বিহার, উড়িষ্যা, সম্বলপুর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সরকার প্রধান ছিলেন একজন লে. গভর্নর এবং আইন প্রণয়নের জন্য ৫০ সদস্যের একটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠিত হয়। ঢাকায় স্থাপিত হয় এর রাজধানী। তখন ঢাকাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তোলে বঙ্গীয় কংগ্রেস এবং স্বদেশিরা। আন্দোলনের চাপের মুখে মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে কোনো আলোচনা না করে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লির দরবারে লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন। এর ফলে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়। এই রদ যেমন আশাভঙ্গের তেমনি মুসলমানদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৯১৬) পূর্ববাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের অসন্তোষের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে এবং তাঁদের অস্থির হয়ে যাওয়া মনকে শান্ত ও সমস্যার সমাধান করতে ঢাকা পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় আসলে মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল যার মধ্যে স্যার নওয়াব খাঁজা সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫), এ.কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২), নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাঁর সাথে দেখা করেন।[৯৮]

তারা বড় লাটকে জানান যে, এই নতুন পরিস্থিতি পূর্ববাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত অগ্রযাত্রাকে পিছিয়ে দিবে। তারা বড় লাটকে প্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত অগ্রযাত্রার জন্য ফলপ্রসু ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানান। তাঁরা আরো জানায়, পূর্ববাংলা বঙ্গভঙ্গের সময় পর্যন্ত অবহেলিত অঞ্চল ছিল। মুসলমানরা ছিল এর প্রধান ভুক্তভোগী। এটি নিশ্চিত যে, বঙ্গভঙ্গের সময়কালে সরকার এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেন। বঙ্গভঙ্গ রদ জনগণের বিশেষ করে মুসলমানদের কাছে একটি আশংকা হয়ে ওঠে। এ সময় সরকারের কাছ থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষাগত উন্নতির জন্য যে মনোযোগ পায় তা ছিল বিষয়টির গুরুত্বের জন্য যথাযথ।

ফলশ্রুতিতে প্রতিনিধিদল বড় লাটকে বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে এবং মুসলমানদের প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্পারিক বিদ্বেষ প্রতিবাদ করতে, তারা অত্যন্ত জোরের সাথে দাবি জানায় যে, ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় অচিরেই যেন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর উত্তরে লর্ড হার্ডিঞ্জ জানান যে, তিনি নিশ্চিত যে, এই অঞ্চলের মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং নানা দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য শিক্ষাগত বিকাশ খুবই প্রয়োজন এবং ভারত সরকার তার ঐকান্তিক অভিপ্রায় হিসেবে অচিরেই বিলাতে সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১২ সালে ২রা ফেব্রুয়ারি ভারত সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ইস্তেহার হিসেবে প্রকাশিত হয়।[৯৯]

ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব (১৯১২)

ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দেওয়া হলে এর সাথে সাথে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবিও ওঠে। তবে এ সময় বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে বিরোধিতা করে। তাঁরা সংবাদপত্র এবং মঞ্চে বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের অননুমোদাত্মক মনোভাব প্রকাশ করেন। ১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি হিন্দু প্রতিনিধিদের প্রধান রাশ বিহারি ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১) ভাইসরয় এর সাথে দেখা করেন এবং তাদের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলেন যে, ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবে 'বাংলার অভ্যন্তরীন ভাগ'। তারা আরো মত দেন যে, পূর্ববাংলার বেশির ভাগ জনগোষ্ঠী কৃষক এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁরা কোনোভাবেই উপকৃত হবে না।[১০০] তাদের প্রত্যুত্তরে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ (Lord Hardinge 1858-1944) বলেন,

> ... That the Dacca University would be the first teaching and residential university of its kind in India. ...The Policy of Government is one of the gradual abandonment of the federal university system and the gradual multiplication of teaching and residential university.[১০১]

ঢাকার আরেকজন স্বনামখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চক্রবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। অর্থের অভাবে এই অঞ্চলে জনসাধারণের শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্যের চাহিদা ও সুষ্ঠু বিচারকার্য (শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ) সম্পাদন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতে পূর্ববাংলার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব তাদের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১০২]

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করার সাথে সাথে এই সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা ও আন্দোলন হয়। পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা অনুভব করেননি। তাদের অনেকেই এটা অকল্যাণকরণ হবে বলে আশঙ্কা করেন। তাদের যুক্তি ছিল অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে যদি ঢাকায় এক শিক্ষাদানমূলক ও ছাত্রাবাস সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তা দেশের জন্য কল্যাণকর হবে, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে, বঙ্গীয় সরকার সে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে সমর্থ হবে কী? সরকার অর্থাভাবের কারণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করতে পারছিলেন না। এই অবস্থায় ছাত্রাবাস সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় যে অতি উঁচু জিনিস এবং উঁচু শ্রেণির সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষার জন্য একটি অন্যতম উদ্যোগ। সমৃদ্ধি সম্পন্ন অল্পসংখ্যক সন্তানদের জন্য এত অর্থ ব্যয় করলে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য ব্যয়সংকোচন ছাড়া উপায় নেই। তাঁরা মনে করেন যে, দেশের জনসাধারণ যেখানে সার্বজনীন

শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সেখানে সামান্য সংখ্যক সমৃদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির উচ্চ শিক্ষার জন্য জনসাধারণের অর্থ হতে এত টাকা ব্যয় করা মোটেও যুক্তিযুক্ত না। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে অর্থ ব্যয় না করে ঐ টাকা দিয়ে দেশে কার্যকরী, শিল্পাদি শিক্ষার ওপর অথবা জনসাধারণের শিক্ষার পথ অধিকতর প্রশস্ত করতে পারলে দেশের মঙ্গল হবে বলে ধারণা করেন।[১০৩]

একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা অনেকেই জানি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সুধীজন নানারকম নেতিবাচক মন্তব্য করেন কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি এ. রসুল এর নেতিবাচক মন্তব্য থেকে তা বোঝা যায়। পূর্ববাংলার অধিকাংশ জনসাধারণ বিশেষ করে মুসলমানরা দরিদ্র, অশিক্ষিত হওয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাদের জন্য তেমন লাভ জনক হবে না বলে ধারণা করা হয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয় ও কারিগরি শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়ের ওপর জোর দেন। এর ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।[১০৪]

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রস্তাবের মীমাংসার জন্য বাংলা প্রেসিডেন্সির গভর্নর লর্ড থমাস গিবসন কারমাইকেল (Thomas Gibson Carmichael, Governor 1912-1917) এর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তি দেয় এবং কোন পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলে দেশবাসীর জন্য কল্যাণকর হবে তা বিবেচনায় নেওয়া হয়।[১০৫]

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের নানারকম ইতিবাচক ও নেতিবাচক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে **১৯১২** সালের **২৭** মে স্যার রবার্ট ন্যাথান (Sir Robert Nathan 1868-1921) এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি 'ন্যাথান কমিটি' বা 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি' নামে পরিচিত। এই কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন প্রণালী, কাঠামো, কার্যকলাপ সংক্রান্ত একটি চূড়ান্ত স্কিম তৈরি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে একটি মেডিকেল ফ্যাকাল্টি থাকবে তা স্কিমে উল্লেখ করা হয়। মূলত নাথান কমিটি, কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশিক্ষা, প্রকৌশলশিক্ষা, আইন এই বিষয়গুলো কোনো একটি সুনির্দিষ্ট জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালনার সুপারিশ করে। শুধু তাই নয়, এই কমিটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল স্কুলকে কলেজ রূপান্তর করে, এই দুইটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগে পরিণত করার সুপারিশ করে।[১০৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কমিটি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে মেডিকেল কলেজ বা চিকিৎসাবিদ্যা বিভাগ খোলার জন্য সুপারিশ করে তখন কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্র এই নিয়ে নানা আশংকার কথা প্রচার করে জনমনে ভীতির সৃষ্টি করে। এই খবরগুলি বেশিরভাগই ভিত্তিহীন, অতিরঞ্জিত এবং গুজব। মেডিসিন অনুষদ স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি আলোচনা করে, কিন্তু কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ঢাকায় স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। *ঢাকা প্রকাশ* থেকে জানা যায় যে,

> এককথা–শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে চলিল। উহা সশরীরে উঠিয়া যাইয়া ঢাকায় আসন গ্রহণ করিবে।
>
> আর এককথা, কলিকাতার মেডিকেল কলেজ উহার ভারত প্রসিদ্ধ কীর্তির কেন্দ্রস্থল কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ডানা মেলিয়া ঢাকায় উড়িয়া যাইবে এবং কলিকাতার গঙ্গাসলিলসিক্ত পূণ্য সমীর উপেক্ষা

প্রদর্শনপূর্বক বুড়িগঙ্গা তটে যাইয়া উপবিষ্ট হইবে। বিনা কারণেও তাহাদের মনে নানা আশঙ্কার উদয় হইয়া থাকে, ইহা অস্বাভাবিক কথা নহে। কলিকাতার প্রতি আন্তরিক গভীর আবেগ হইতেই এই শ্রেণির জনরবের সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।[১০৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার আগেই কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ঢাকা ও কলকাতার জনসাধারণ নানারকম ভীতিকর মন্তব্য করে। এই ধরনের প্রচারণা থেকে অনেক সময় হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কের অবনতি ঘটার আশঙ্কা দেখা দিলেও পরবর্তীতে যখন সঠিক তথ্য সম্পর্কে অবহিত হন তখন তাঁরা অনুধাবন করতে পান বিষয়টি পুরোপুরি ভিত্তিহীন। তাদেরকে বাংলা সরকার স্পষ্ট করে বলেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির প্রতিবেদন সরকারের কাছে প্রেরণ করার পর সর্বসাধারণের জন্য প্রচার করা হবে এবং প্রতিবেদন সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করে সেই মতামতের ওপর যথোপযুক্ত আলোচনার পর তা কার্যকরী করা হবে।

অতঃপর প্রায় ছয় মাসব্যাপী অনুসন্ধানের পর ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বাংলা সরকার সারা দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদক ও দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট এই প্রতিবেদনের কপি প্রেরণ করেন এবং তাদের নিজ নিজ অভিমত জ্ঞাপন করার জন্য আহ্বান জানান। এই প্রতিবেদন অনেক বিস্তৃত ছিল। প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কয়টি বিভাগ নিয়ে গঠিত হবে? সে ক্ষেত্রে বলা হয়, [১০৮]

The Dacca University shall include the following Departments

Arts	Law	Medicine
Science	Engineering	Teaching.
Islamic Studies		

এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি তার প্রতিবেদনে ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বিবেচনা করে। এজন্য কমিটি ঢাকায় উঁচু পর্যায়ের চিকিৎসাশাস্ত্রে পাঠদানের জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করে। প্রাথমিকভাবে কমিটি সুপারিশ করে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট এম.বি. মানের শিক্ষা প্রদান করবে। ফার্স্ট এম.বি. পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করবে। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষাটিকে তার ফার্স্ট এম.বি. পরীক্ষার সমতুল্য বলে স্বীকৃতি দেবে এবং পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট এম. বি. পাশ করা ছাত্রদেরকে তাদের দ্বিতীয় এম.বি. কোর্স সমাপ্তের জন্য গ্রহণ করবে। কমিটি সুপারিশ করে যে, এই ব্যবস্থার স্থলাভিষিক্ত হবে ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কোর্স প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।[১০৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং ফার্স্ট এম. বি. পর্যন্ত মেডিকেল বিভাগের শিক্ষাদানের পক্ষে উপ-কমিটির মতামতের সাথে একমত ছিল। তাই উপ-কমিটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গ্রহণ করে [*পরিশিষ্ট দেখুন*-১]। এই কমিটির প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয় যে,

Medical students will be undergraduates studying the scientific portion of their course, and they will be distributed between the various colleges.[১১০]

এ ছাড়া আবাসনের ক্ষেত্রে বলা হয় যে, মেডিকেলের শিক্ষার্থীসহ নিম্নের ছাত্রদের জন্য ৪টি সাহিত্য কলেজের প্রত্যেকটিতে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা হবে।[১১১]

	মোট	আবাসিক
ঢাকা কলেজ	৬৬০	৫৪০
নতুন কলেজ	৫৪০	৪০০
জগন্নাথ কলেজ	৫৪০	৩৪০
মোহাম্মদ কলেজ	৩২০	২২০
মোট	২০৬০	১৫০০

এই প্রতিবেদনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো *ঢাকা প্রকাশে* আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে উপরি উল্লিখিত ৭টি বিভাগ এবং চিকিৎসা ও প্রকৌশল বিভাগের ছাত্রদের জন্য আধুনিক ও উঁচু মানের গবেষণাগার নির্মাণের ওপর জোর দেওয়া হয়। মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসাশিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে,[১১২]

> ... বর্তমান সময়ে ঢাকাতে একটি সর্বাঙ্গীন সুন্দর মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু যে বিজ্ঞানাগার স্থাপিত হইবে তাহার সাহায্যে প্রাথমিক এম. বি. শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যাপনা করার সুযোগ ঘটিবে। এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের অভিজ্ঞতানুসারে চিকিৎসাবিভাগের কয়েকজন কর্মচারী দ্বারা একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো অসুবিধা হইবে বলিয়া ঐ কমিটি মনে করেন নাই। এই প্রস্তাবে কলকাতা মেডিকেল কলেজের কার্যভার অনেকটা লাঘবতা ঘটিবে এবং পূর্ববঙ্গের ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা হইবে। ...ঢাকা শহরের উত্তর দিকে যে সরকারি কৃষি উদ্যান আছে, তাহার সংস্রবে একটি কৃষি বিদ্যালয় সংস্থাপন করাও অভিপ্রেত।

এই (ঢাকা) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে কয়েকটি কলেজ থাকিবে—

কলেজ	ছাত্রসংখ্যা
১. ঢাকা কলেজ	৬০০
২. জগন্নাথ কলেজ	৫০০
৩. নূতন কলেজ	৫০০
৪. মুসলমান কলেজ	৫০০
৫. মহিলা কলেজ	৪০
৬. সম্ভ্রান্ত বংশীয় বালকদের কলেজ	১২০
৭. ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৬০
৮. শিক্ষকদের কলেজ	৮০
৯. আইন কলেজ	১৮০
১০. মেডিকেল কলেজ	১৬০
১১. বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির পর যাহারা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলন করিবেন তাঁহাদের জন্য কলেজ	১৫০

উপরি-উক্ত প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় যে, নতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিষয়ের ওপর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। সংস্কৃত কলেজের উল্লেখ না থাকায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের কথা বলা হয়। যে কারণে লর্ড হার্ডিঞ্জ বলেন যে, 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ একটা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকাতে স্থাপন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, ঢাকাতে কেবলমাত্র শিক্ষাদানমূলক ও ছাত্রাবাস সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে।'[১১৩] এই কমিটি মত দেয় যে, এটি একটি শিক্ষাদানমূলক ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হবে, তবে এর কোনো অধিভুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা বা ফেডারেল টাইপ হবে না। আরো গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি কেবল ঢাকা শহরের উল্লিখিত কলেজগুলো নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। যার

মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছিল অন্যতম। অর্থাৎ এই কমিটি ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বিবেচনা করে। অপরদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ব্যাপক সমর্থন করেন। তারা মনে করেন, বঙ্গভঙ্গের কারণে ইতিমধ্যে ঢাকায় যেসব বড় বড় প্রাসাদ তৈরি হয়েছে সেগুলোকে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, অন্যদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব কমে আসবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি প্রাপ্ত ছাত্রদের মনমানসিকতা আধুনিক উঁচু মানের হবে। তারা সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে। কলকাতা ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মানের ক্ষেত্রে যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে তার চেয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মান উঁচু হবে। তাদের এসব উৎসাহব্যঞ্জক ও ইতিবাচক মন্তব্য *ক্যাপিট্যাল* পত্রিকায় তুলে ধরা হয়।[১১৪]

এই ইতিবাচক মন্তব্যের কারণ ছিল এটি যুগোপযোগী ও জনগণের চাহিদা অনুযায়ী করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি দেশের জনগণের স্বাস্থ্যগত সমস্যাকে গুরুত্ব দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবার পর জনসাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহী হয় এবং সমর্থন দেয়। প্রতিবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিভাগগুলো খোলার কথা উল্লেখ করা হয় বিশেষ করে চিকিৎসাশিক্ষা, প্রকৌশলশিক্ষা, কৃষিশিক্ষা এগুলো ছিল এই অঞ্চলের জনমানুষের চাহিদা। পূর্ববাংলার অধিকাংশ জনসাধারণ দরিদ্র কৃষক ও অশিক্ষিত হওয়ায় তাঁরা আধুনিক শিক্ষা, চিকিৎসা ও উন্নত জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত ছিল। উঁচু পর্যায়ের চিকিৎসা গড়ে তুলতে হলে পূর্ববাংলা তথা ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা ছিল অতি জরুরি। তাছাড়া এই বিষয়গুলো থেকে ডিগ্রি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের চাকরির সংস্থান করা সহজতর হবে, কেননা তখন পর্যন্ত পূর্ববাংলায় একটি উন্নত চিকিৎসক পেশাজীবী শ্রেণি তৈরি হয়নি। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে এই পেশাজীবী শ্রেণির সৃষ্টি হবে বলে ধারণা করা হয়।

যাহোক ১৯১৩ সালে কমিটির সুপারিশ, জনগণের মতামত এবং স্কিমের সুনির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তনের পর সেক্রেটারি অব স্টেট দ্য মার্কুইজ অব ক্রু (The Marques of Crewe 1911-1951) এর কাছে পেশ করা হয় এবং এই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে তা অনুমোদন লাভ করে। অনুমোদিত স্কিমে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়,

> The approved scheme comprised the foundation of four new colleges (viz., a new general college, a Muhammadan College, a women's college and an engineering college), the establishment of a medical institution, a department of Islamic Studies and a Sanskritic department and the separation of the Law College from the Dacca college and its establishment as an independent law institution. The Teacher's College was to be transferred to a new site and the Jagannath College to the proposed university area, while a hostel was to be started for students of the well-to-do classes. The building of a library, a museum, and an observatory, a gymnasium and several laboratories, were contemplated.[১১৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্ট সংকটের কারণে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় পরিবর্তন

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এবং সরকারের আর্থিক সংকটের কারণে পুরো প্রকল্প কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। ১৯১৫ সালে মূল স্কিমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অব্যাহত রেখে অন্যান্য অংশ (নতুন কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সংস্কৃত বিভাগ, ধনী সন্তানদের জন্য হোস্টেল, মিউজিয়াম, কিছু গবেষণাগার) বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। এমন কি যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হ্রাসকৃত স্কিমের পরিকল্পনা সম্পন্ন করাও অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এদিকে ১৯১৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ভারত সরকারের শিক্ষা সচিব স্যার শঙ্কর নায়ার (১৮৫৭-১৯৩৪) ঢাকা পরিদর্শনে আসেন এবং ঢাকাবাসীর প্রতিনিধি হিসেবে আনন্দ চন্দ্র রায় (১৮৪৪-১৯৩৫) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁর সাথে আলোচনা করেন। শিক্ষা সচিবের আগমনের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ফলপ্রসু হবে বলে পূর্ববঙ্গবাসী মনে করে। এ সময় ঢাকা শহরের জনগণ মনে করত উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকা স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। তারা আশা করে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তাঁদের সব ধরনের চাহিদা এই বিশ্ববিদ্যালয় পূরণে সক্ষম হবে। ঢাকার জনগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আরো দুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে স্যার শঙ্কর নায়ারকে অবগত করেন। পূর্ববাংলার শিক্ষার্থীদের পক্ষে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় এই ধরনের কারিগরি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মেডিকেল কলেজ ও একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক হবে বলে উল্লেখ করেন। অন্যথা এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়বে এবং পূর্ববাংলার জনগণের স্বাস্থ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার আশংকা করেন।[১১৬]

অন্যদিকে ভারত সরকার ১৯১৬ সালে বাংলা সরকারকে স্কিমের নূন্যতম ব্যয়ের আনুমানিক পরিমাণ দেখিয়ে প্রস্তাবটি প্রেরণের নির্দেশ দেন। ১৯১৫ সালের পরিবর্তিত স্কিমটি পুনরায় পরিবর্তন করে ভারত সরকার এবং সেক্রেটারি অব স্টেট অস্টিন চেম্বারলিন (১৯১৫-১৯১৭) কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। এ সময় ৪টি কলেজ (জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ, মোহাম্মাদান কলেজ এবং নতুন-সাহিত্য (আর্টস) কলেজ) নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু করার প্রস্তাব করা হয়। আর্থিক সংকটের কারণে ধনী সন্তানদের জন্য হোস্টেল, মহিলা কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব স্থগিত করা হয়।[১১৭] তবে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আর্থিক সংকটের কারণে স্থগিত করা হলেও এ সময় মেডিকেল এ্যাক্ট সংক্রান্ত একটি নতুন এ্যাক্ট হয়। যেখানে মেডিকেল ডিগ্রি প্রদানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও চিকিৎসাশিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ১৯১৬ সালের এ্যাক্ট নং VII ধারায় বলা হয় যে,

> Western medical science" means the Western methods of Allopathic medicine, Obstetrics and Surgery, but does not include the Homoeopathic or Ayurvedic or Unani system of medicine.[১১৮]

এই আইনটি পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও চিকিৎসাশিক্ষার গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দেয়। যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা বিলম্ব হয়, তখন এই অঞ্চলের জনসাধারণ এই কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবিকে জোরদার করে। এই আইনটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবির ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিলম্ব হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠাও বিলম্ব হতে থাকে। ন্যাথান কমিটি বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি কর্তৃক প্রকল্প থেকে বোঝা যায় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিলম্ব লক্ষ্য করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি আশংকা সৃষ্টি হয় এই ভেবে যে, এ ক্ষেত্রে সরকারের আসল অভিপ্রায় কী? এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৭ সালের ৭ মার্চ এবং ২০ মার্চ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বিষয়টি উত্থাপন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রেক্ষিতে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করে যে, এটিকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত বা বাতিল করা হবে কিনা? তিনি প্রস্তাব করেন যে, এই আশংকা দূর করার জন্য এ ক্ষেত্রে সামান্য কিছু একটা করা প্রয়োজন। এর উত্তরে শঙ্কর নায়ার আশ্বস্ত করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলের খসড়া প্রস্তুত করা হয়। সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে বিলটি উত্থাপন করতে বিলম্ব করেন কেননা বিতর্কিত হওয়ার আশংকায় সরকার যুদ্ধকালীন সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মকর্তা কর্তৃক কাউন্সিলের মাধ্যমে বিলটি পাশ করতে চাননি। তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন এর প্রতিবেদন পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

পরবর্তীতে ১৯১৭ সালের ২৩ এপ্রিল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভায় ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড (Lord Chelmsford, Viceroy 1916-1921) অত্যন্ত পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীনভাবে পুনর্ব্যক্ত করেন যে, 'ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে বলে লর্ড হার্ডিঞ্জ যে প্রতিশ্রুতি দেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।'[১১৯] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজ তথা ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন স্থাপন জড়িত ছিল।

ইতিমধ্যে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অতিরিক্ত সদস্য কিশোরী মোহন চৌধুরী (এম.এ., বি.এল., অনারারি সেক্রেটারি, রাজশাহী এসোসিয়েশন, রাজশাহী) ব্যবস্থাপক সভায় ১৯১৭ সালের ৫ মার্চের অধিবেশনে একটি প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে তিনি কাউন্সিলকে ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাদেশিক গভর্নরের কাছে সুপারিশ করার বিষয়টি বিবেচনা করতে বলেন। কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েট প্রস্তাবটি গ্রহণ করেননি। কারণ দেখাতে গিয়ে সেক্রেটারিয়েট জানায় যে, ইতিমধ্যে একই প্রদেশে দুইটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একটি কলকাতা মেডিকেল কলেজ, (১৮৩৫) অপরটি বেসরকারি বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (১৯১৫)। তাই তৃতীয় আরেকটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বিবেচনা করার পূর্বে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। উপরন্তু দেশের বিদ্যমান আর্থিক সংকটে আরেকটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন।[১২০]

নানা অজুহাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা বিলম্ব হলেও ১৯১৩-১৯১৭ সময়কালে সরকার বাংলায় দ্বিতীয় সরকারি একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কলকাতা মেডিকেল কলেজের পক্ষে দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষালাভের বর্ধিত চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৫ সালে কলকাতা বেলগাছিয়া মেডিকেল স্কুলকে কলেজে উন্নীত করা হয়। এটি বেসরকারি খাতে পরিচালিত হতো।

এদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রতিবেদন পেশ করার আগেই বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য প্রভাস চন্দ্র মিত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংক্রান্ত একটি রেজুলেশন পাশ করার দাবি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, ঢাকায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের বিষয়টি মূলত প্রদেশের

চিকিৎসকদের সংখ্যা এবং তাদের বিদ্যমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। বর্তমানে (১৯১৯) প্রদেশের চাহিদা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, চিকিৎসাশিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের আরো বহু সুযোগ রয়েছে, তা সে মেডিকেল স্কুল বা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হোক না কেন? তার মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ছোট পরিসরে হলেও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা ছাত্ররা পূর্ববাংলার জনগণের চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখবে। এই অঞ্চলের তরুণরা সরকারি চাকুরি বা আইন পেশার দিকে ঝুঁকে পড়া থেকে বিরত থাকবে। তারা চিকিৎসাশিক্ষা লাভের মাধ্যমে নতুন পেশা গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশাভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের ঐতিহ্য গড়ে ওঠবে এবং সমৃদ্ধশালী হবে।[১২১]

অন্যদিকে প্রখ্যাত ডাক্তার ও লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নীলরতন সরকারও (১৮৬১-১৯৪৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পৃক্ত একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, এরকম একটি প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডকেই সমৃদ্ধ করবে। এটি প্রতিষ্ঠিত হলে কেবল ঢাকা তথা পূর্ববাংলা নয় সারা বাংলাই উপকৃত হবে। তার মতে, এটি প্রতিষ্ঠা করতে খুব বেশি অর্থ ব্যয় হবে না। তিনি সরকারের কাছে উদাত্ত আহ্বান করেন ঢাকায় যেন অনতিবিলম্বেই একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি বলেন,

> My Lord, I have looked at the matter from the point of view of the future University of Dacca whether the University of Dacca would be complete without a medical college - I believe, it will not be complete without a medical faculty. Such a defect would be extremely prejudicial to the interests of the University.[১২২]

অর্থ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিবের পক্ষ থেকে স্যার হেনরি হুইলার (Sir Henry Wheeler 1870-1950) বলেন, প্রস্তাবটি অত্যন্ত মূল্যবান ও আকর্ষনীয় এবং জ্ঞানগর্ভ। সরকার এই ব্যাপারে কোনো ফলপ্রসু মন্তব্য করেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের বিবেচনাধীন আছে, তাদের সুপারিশ না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করা সম্ভব নয়। তবে কমিশন যদি ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব দেয় তাহলে সরকার তা যথাযথভাবেই বিবেচনা করবে। তিনি সদস্যদের সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করেন যে, ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার যথেষ্ট আকর্ষণ রয়েছে এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ হতে হলে তার একটি মেডিকেল ফ্যাকাল্টি থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। সরকার এই ব্যাপারে আগ্রহী তবে বিশেষ কয়েকটি কারণের জন্য তিনি খুব দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারছেন না।[১২৩] এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণই ছিল মুখ্য।

এদিকে ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ভারতীয় সদস্যদের মতামত জানার জন্য রেজুলেশনটি উত্থাপিত হলে ভোটাভুটি হয়। উপস্থিত মাননীয় সদস্যদের মধ্যে রেজুলেশনের পক্ষে তথা 'হ্যাঁ' ভোট পড়ে ১৪টি এবং 'না' ভোট পড়ে ২৬টি।[১২৪] এভাবেই ঢাকা তথা পূর্ববাংলার নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং সামগ্রিকভাবে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা সরকারি ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৭-১৯১৯) এর প্রতিবেদনে মেডিসিন অনুষদ গঠনের প্রস্তাব

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯১৭-১৯১৯) তার প্রতিবেদনটি ১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ ভারত সরকারের কাছে পেশ করে। এই প্রতিবেদনে কমিটি প্রদেশে চিকিৎসাশাস্ত্রের পাঠদান বিষয়ের ওপর বেশ কিছু সুপারিশ করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন দেশে ভার্নাকুলার মেডিকেল স্কুল স্থাপন এবং ঢাকা মেডিকেল স্কুল, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের মতো নতুন নতুন আরো মেডিকেল স্কুল স্থাপন বিষয়ে কতকগুলো সুস্পষ্ট সুপারিশ করে।[১২৫] ঢাকায় চিকিৎসাশিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনায় তারা ঢাকা শহরে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও সুপারিশ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন অনুষদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রির্পোর্টের XXXIII অধ্যায়ের ৭২ ও ৮৩ অনুচ্ছেদে সুপারিশ করা হয় যে, কেবলমাত্র তিনটি অনুষদ তথা কলা, বিজ্ঞান, আইন নিয়ে শুরু করা উচিত এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি মেডিসিন অনুষদ ও পরে প্রকৌশল অনুষদ যুক্ত করা উচিত।[১২৬]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ঢাকার চিকিৎসাশিক্ষাকে দুই ভাবে প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় একই সাথে একই প্রতিষ্ঠানে যৌথভাবে মেডিকেল কলেজ এবং স্কুলের কোর্স শুরু করা অথবা নতুন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব করে। তবে এই ব্যাপারে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট লে. কর্নেল ই. এ. আর. নিউম্যান (E. A. R. Newman, I.M.S) মন্তব্য করেন যে,

> It would not be a good plan to carry on the two kinds of training in a single institution; but we are not prepared without further enquiry decisively to reject such a scheme, which, if contemplated, should be reported on by an expert committee.[১২৭]

কলকাতা কমিশন (১৯১৭-১৯১৯) এ ক্ষেত্রে লাহোর মেডিকেল স্কুল ও কলেজের অভিজ্ঞতাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরে। লাহোরে একই সাথে একই প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল স্কুল ও কলেজ চালু ছিল। কমিশন এটিও উল্লেখ করে, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের একটি সমস্যা হলো ছাত্রদের সংখ্যা, যা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে এসব যৌথ প্রতিষ্ঠানের সাজসরঞ্জাম, কর্মকর্তা এবং শিক্ষকবৃন্দের মান যাতে উঁচু-নিচু না হয় সেদিকে খেয়াল রাখার সুপারিশ করে। একই প্রতিষ্ঠানে একই সাথে স্কুল এবং কলেজ স্থাপন ব্যয়বহুল হওয়ায় বিকল্প হিসেবে ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে কলেজে রূপান্তর করা এবং নতুন স্কুলটিকে অন্য কোথাও স্থানান্তরের সুপারিশ করে।[১২৮]

কমিশন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কে বিজ্ঞানের প্রাথমিক ও মধ্যম কোর্সগুলো শিক্ষাদানে সক্ষম হতে হবে বলে সুপারিশ করে। যেমন, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন (অর্গানিক, ইনঅর্গানিক), উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা। এই বিষয়গুলো পাঠদানের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষকের দরকার হবে। অন্যদিকে এনাটমি, ফার্মাকোলজি, ম্যাটেরিয়া মেডিকো, ফার্মাসিসহ প্রাথমিক বিষয়ের শিক্ষকগণের মর্যাদা কলকাতা মেডিকেল কলেজের শিক্ষকগণের সমান মর্যাদার অধিকারী হবে। এ ছাড়া কমিশন মধ্যম মেডিকেল কোর্সের ক্ষেত্রে অর্গানিক, কেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি, এনাটমি, ফার্মাকোলজি সুপারিশ করে। ফিজিওলজি কোর্সটিকে বিজ্ঞান অনুষদের একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করার জন্য সুপারিশ করা হয়।[১২৯] পক্ষান্তরে অমীমাংসিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল স্কুলের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে ঢাকা কলেজের মাধ্যমে সক্রিয় করে তোলার সুপারিশ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্ররা পদার্থ ও রসায়নবিদ্যা ঢাকা কলেজ থেকে পাঠ গ্রহণ

করবে। এই ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকর ও সম্প্রসারিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে পারস্পারিক সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সুপারিশ করা হয়।[১৩০]

অন্যদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা এমনভাবে করা উচিত যাতে ছাত্রদের প্রয়োজন অনুসারে সম্প্রসারণ করা যায়। এনাটমি ও ফার্মাকোলজি বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার কাছাকাছি নির্মাণ করা এবং ফিজিওলজির গবেষণাগার নির্মাণের ব্যাপারে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় আনার সুপারিশ করে। তাই বাংলা প্রেসিডেন্সির চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়নে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কলকাতা কমিশন যে মন্তব্য করে তা হলো,

> আর্থিক অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। কেননা এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অংশকে যেমন উপস্থাপন করবে তেমনি মেডিকেল অনুষদের উপস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়কে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করবে।[১৩১]

উপরন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কর্তৃক ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ফার্স্ট এম. বি. পাশ করা ছাত্রদের গ্রহণ করার মতো কোনো প্রস্তুতি কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছিল না। তাই ভারত সরকারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রাথমিক ও মধ্যম শ্রেণির তথা একটি পরিপূর্ণ চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হতে সুপারিশ করে। ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কমিশন যে ধারণা দেয় তাহলো,

> We understand that the Government of India have considered the matter and take this view of the situation and hope that the college will be established in due course; but no financial estimates have yet been drawn up for the cost of such establishment. We believe it would be contrary to the interests of the students and to public policy to offer at Dacca a medical training and a medical degree markedly inferior to that obtainable at Calcutta; it is clear therefore that the establishment at Dacca of a considerable number of teaching posts held by men with high medical qualifications would be a necessary part of the plan.[১৩২]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশের ওপর দেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ মতামত দেন। কলকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট এবং পরবর্তীতে কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল লে. কর্নেল বি. এইচ. ডিয়ার [১৩৩] বলেন, একই সময়ে ঢাকাতে একটি মেডিকেল স্কুল এবং একটি মেডিকেল কলেজ পরিচালনা করা জটিল বিষয় হয়ে দাড়াবে। একই ক্লাসে উঁচু ও নিচু মানের পাঠক্রম পড়ানো অসম্ভব।[১৩৪] অন্যদিকে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তার মেজর সি.এ. গুরলে (Major C. A. Gourlay) অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে একটি মেডিকেল কলেজসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি মেডিকেল ফ্যাকাল্টি থাকার প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। তবে এই কলেজের মান যেন কোনোভাবেই কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে নিচুমানের না হয় এবং শিক্ষকগণের গুণাবলী এবং পরীক্ষার মান উভয় কলেজের একই হয়। তিনি আরো বলেন, একই প্রতিষ্ঠানে দুই মানের চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাদান প্রস্তাবটি একেবারেই ত্রুটিপূর্ণ। তিনি ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হস্তান্তর করে এটিকে কলেজে রূপান্তরিত করা আর স্কুলটিকে অন্য এক শহরে স্থানান্তর করার প্রস্তাব করেন।[১৩৫] এরপর বেঙ্গল স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির গভর্ণিং বডি মেডিকেল স্কুল সম্প্রসারণ সম্পর্কিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ অত্যন্ত জোরের সাথে সমর্থন করেন

এবং একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রস্তবটিকেও সমর্থন দেন।[১৩৬] ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন যে সকল সুপারিশ করে তার ওপর ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ভারপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তার কর্নেল জে. কে. ক্লোভ কিছু মন্তব্য করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি সুপারিশ করে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'প্রাথমিক ও মধ্যম' শ্রেণির অথবা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট এম.বি. মানের শিক্ষা প্রদান করবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষাটিকে তার ফার্স্ট এম. বি. পরীক্ষার সমতুল্য বলে স্বীকৃতি দিবে এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন বিভাগের পাশ করা শিক্ষার্থীদেরকে তাদের মেডিকেল কোর্স সমাপ্তির জন্য গ্রহণ করবে। যতদিন পর্যন্ত না ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলবে।[১৩৭]

অপরদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন উপরি-উক্ত ব্যবস্থাকে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে সম্মতি দেয়। কমিশন সুপারিশ করে যতদিন পর্যন্ত না ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে কলেজে রূপান্তর করা হবে এবং সম্পূর্ণ সিলেবাস পড়ানোর ব্যবস্থা করা যাবে ততদিন এই বন্দোবস্ত চলবে। জে. কে. ক্লোভ কমিশনের এই ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে বলেন যে, কলকাতা মেডিকেল কলেজের বর্তমান জনাজীর্ণ পরিবেশে এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় এবং ঢাকা মেডিকেল স্কুল যেভাবে চলছে সেভাবেই সেটিকে রাখার পক্ষে মত দেন। এদিকে ১৯১৯ সালে *ঢাকা প্রকাশ* এ ঢাকায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তকে অতিগুরুত্ব সহকারে একটি সংবাদ প্রচার করে। কমিশন পূর্ববাংলার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং সে সময়ের প্রেক্ষাপটে কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার চেয়ে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়। তাই এই দুইটি কলেজ (কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং) প্রতিষ্ঠা সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিত করা হয়।[১৩৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট এ মেডিসিন অনুষদ অন্তর্ভুক্তিতে বিশিষ্টজনের নানা মতামত

পূর্ববাংলার জনগণের এই দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বাংলা সরকারের মেডিকেল বিভাগ (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়) ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠাকে প্রয়োজনীয় এবং বাঞ্চনীয় বলে মত প্রকাশ করে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণয়ন ও কার্যক্রম শুরু না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত কিছু বলতে অনীহা প্রকাশ করে। আপাতত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল ফ্যাকাল্টি ছাড়াই তার যাত্রা শুরু করবে।[১৩৯] কেননা সরকারের পক্ষে ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ পরিচালনা করা তৎকালীন সময়ে সম্ভব ছিল না। পরবর্তীতে এই ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিস্তারিত স্কিম তৈরি করবে বলে মত দেন।

১৯২০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মূল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলের বিধি অনুসারে ২৩(১) ধারায় প্রথমে তিনটি অনুষদের (কলা, বিজ্ঞান, আইন) নাম উল্লেখ করা হয় এবং অন্যান্য অনুষদকে আইন দ্বারা নির্ধারিত করার অনুমতি দেওয়া হয়।[১৪০] নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) ও রায় লোলিত মোহন চ্যাটার্জী উভয়ই শুরু থেকে মেডিসিন ও কৃষি অনুষদ থাকার পরামর্শ দেন। তারা এই বিষয়ের ওপর যথেষ্ট যাচাই বাছাই করেন এবং ১৯১৯ সালের ১লা ডিসেম্বরের নোটে বিষয়টি নেতিবাচক অবস্থায় উল্লেখ করা হয়।[১৪১] বিলের শুরুতে এই দুইটি অনুষদ অন্তর্ভুক্ত করার বিধান রাখা হয়নি। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, কোনো বিধিবদ্ধ আইনের শুরুর শর্ত হিসেবে ২৩ ধারা অনুষদ গঠনের বিধান

প্রকাশ করতে পারেনি। যদিও বিষয়টি সক্রিয় ছিল না অথবা আইন পাশ করার পরপরই এগুলো বাস্তবায়ন করার কোনো সম্ভাবনাও ছিল না, তবে রাজস্ব বিভাগ কৃষি ইনস্টিটিউট চালু করার উদ্যোগ নেয়। কৃষি অনুষদ চালু করার মতো প্রয়োজনীয় উপকরণ বিদ্যমান ছিল বলে রায় লোলিত মোহন উল্লেখ করেন। কিন্তু মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে মেডিকেল বিভাগ কিছু জানায়নি।[১৪২] এই ব্যাপারে রাজস্ব ও মেডিকেল বিভাগের সাথে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। মেডিকেল বিভাগের সেক্রেটারি লুইস সিডনি স্টিওয়ার্ড (Lewis Sydney Steward 1874-1941), যিনি এল.এস.এস. ও'ম্যালি নামে বেশি পরিচিত। তিনি বলেন,

> For myself I may say that we should be careful about committing ourselves to liabilities which are at present uncertain as we should do, if we agree to Faculties of Medicine and Agriculture being included in the university at the time of its establishment (i.e. probably next year) without knowing exactly what is involved. [১৪৩]

ইতিমধ্যে গভর্ণর ইন কাউন্সিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলের ২৩(১) ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে অনুষদগুলোর মধ্যে মেডিসিন ও কৃষি অনুষদ অন্তর্ভুক্তিতে কারো কোনো আপত্তি আছে কি? জানতে চাওয়া হয়। এ সময় কাউন্সিলের বিভিন্ন মহল থেকে অনেক মতামত দেওয়া হয়। ১৯২০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি এইচ.হুইলার (H. Wheeler) বলেন, ঢাকায় মেডিকেল অনুষদ স্থাপনের জন্য সময়টি উপযুক্ত নয় এবং পরবর্তী উন্নয়ন খাতে দেখতে হবে। আর্থিক দিক বিবেচনা করে আমাদের অবশ্যই এই কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।[১৪৪]

অপরদিকে একই বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের আরেক সদস্য এম.সি. ম্যাকালপিন (M.C. Mcalpin) এর মতে, নতুন বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য ঢাকার কলেজগুলোতে অবকাঠামোগত কোনো ব্যবস্থা নেই। নতুন বিজ্ঞানের জন্য নতুন গবেষণাগার, অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, পাঠক, প্রভাষক এবং ডেমন্সট্রেটর এমনকি কেমিস্ট্রির জন্য সমস্ত কিছুর প্রয়োজন ছিল। চিকিৎসা অনুষদের জন্য নতুন বিজ্ঞানের উল্লিখিত সমস্ত কিছু দরকার। অন্যদিকে কৃষি অনুষদের জন্য নতুন বিজ্ঞানের (কেমিস্ট্রি, জুয়োলজি, জিয়োলজি, বোটানি এবং ব্যাকটেরিয়োলজি, প্যারাসিটলজি, ইটিওলজি) প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো দরকার। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কৃষি ও চিকিৎসা অনুষদ স্থাপনের সুবিধাটি ছিল কেবলমাত্র কেমিস্ট্রি। কিন্তু স্টাফ সংখ্যা স্বল্প থাকায়, এ সময় নতুন বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বাইরে ছিল। অতএব প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব বলে মনে করেন।[১৪৫]

একই বছরের অর্থাৎ ১৯২০ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি বাংলা সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল প্রবর্তনের সময় সম্মানীত কাউন্সিল সদস্যদের মতামতের সাথে সহমত পোষণ করে বলেন যে, শুরুতে অনুষদগুলোর অন্তর্ভুক্তির বিধান রাখা উচিত নয়, যদি না ইতিমধ্যে বিষয়টি বিদ্যমান থাকে অথবা আইন পাশের পরপরই এগুলো বাস্তবায়নের সম্ভাবনা না থাকে। প্রস্তাবিত মেডিসিন ও কৃষি অনুষদের ক্ষেত্রে যা সম্ভব নয়। বাংলা সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে অনুষদগুলোর মধ্যে এই দুটো অনুষদ অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মতি দেননি। ২০ ফেব্রুয়ারি এই বিষয়ের ওপর অ-দাপ্তরিক মতামত হিসেবে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল প্রায় সর্বসম্মত। এটা ধারনা করা হয় যে, এখানে ছাড় দেওয়া হলে কিছু মহলের বিরোধিতা তথা সাম্প্রদায়িকতার মতো কিছু বিষয়ের উত্থানের সম্ভাবনাকে হ্রাস করবে কেননা এটি ঢাকায় প্রবল ছিল। সংবেদনশীল দৃষ্টিকোন থেকে তাদের উল্লিখিত বিষয়গুলো ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং

এজন্য বাংলা সরকারকে আপাতত তাৎক্ষনিক ব্যয়ের জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। তাই ভারত সরকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে বিষয়টি পুর্নবিবেচনা করার পরামর্শ দেন।[১৪৬]

একই সালের (১৯২০) ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা সরকার যাচাই বাছাই করে ইতিমধ্যে তাদের মতামত দিলেও ভারত সরকার বিবেচ্য বিষয়ে অনুমতি প্রদানে সুবিধার ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অবস্থানে ছিলেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের বিতর্কের কঠোর মতামতের ভিত্তিতে মনে করা হয় যে, এই দুই অনুষদকে যুক্ত করার কৌশলগত সুবিধা অসুবিধার গুরুত্বকে অতিক্রম করেছে। অতএব এগুলো অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হয়। এই ব্যাপারে বাবু শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভায় জানতে চাইলে মেডিকেল বিভাগের স্যার হেনরি হুইলার বিষয়টি মেডিকেল বিভাগের বিবেচনাধীন আছে বলে ১৯২০ সালের ২২ জুন জানান। তখন থেকে এই বিষয়ে আর কিছু শোনা যায়নি।[১৪৭]

দীর্ঘ নয় বছরের (১৯১২-১৯২১) নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ভারতীয় আইন সভায় আলোচনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি ১৯২০ সালের ১৮ মার্চ গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলে উত্থাপিত হয় এবং তা আইনে পরিণত হয়। একই বছরের ২৩ মার্চ গভর্নর জেনারেল ১৯২০ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ১৮ নং এ্যাক্ট অনুমোদন করেন।

পরবর্তীতে একই বছরের ১লা জুলাই বাবু শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা ও কৃষি অনুষদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জানতে চাইলে এল.এস.এস ও'ম্যালি (L.S.S O'Malley) বলেন,

> Faculties of Medicine and Agriculture cannot be established in connection with the Dacca University until the Dacca University Act comes into force. Under section 51 of the act, however, the Vice-Chancellor may take action for the purpose of bringing the university into being, and when he is appointed it is proposed to consult him as to the possibility of taking preliminary steps to facilitate the establishment of faculties of Medicine and Agriculture when the University starts.[১৪৮]

মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলের বিধি বিবেচনা করার সময় সরকার যাদের পরামর্শ নেন, তিনি তাদের সাথে আলোচনা করে মেডিসিন অনুষদের মতো এই বিশেষ বিষয়ের ওপর ব্যাপক অনুসন্ধান চালান। প্রস্তাবটি ভারত সরকার কর্তৃক নির্বাচন করা হলে ভারত সরকার এই বিষয়ের ওপর অন্যান্যদের মতামত দেওয়ার জন্য আহ্বান করেন, তবে তারা অনুষদটি স্থাপনে আপত্তি জানায়। কারণ তাদের কাছে বিষয়টি বাস্তবসম্মত ছিল না। উপরন্তু আইন পাশের সাথে সাথে এটি বাস্তবায়নের কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। ভারত সরকার তাদের আপত্তি সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতার মতো স্পর্শকাতর ঘটনা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তথা সংবেদনশীল দৃষ্টিকোন থেকে কিছু সুনির্দিষ্ট সমস্যা দূর করে কেবলমাত্র মেডিসিন অনুষদ স্থাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বিলে অন্তর্ভুক্তকরণের সিদ্ধান্ত নেন।

এদিকে ১৯২০ সালের ৯ জুলাই বাংলার সার্জন জেনারেল ডব্লিউ. এইচ.ই. রবিনসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সংশ্লিষ্ট করে ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি স্কিম বা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে সরকারের কাছে পেশ করেন। তাঁর স্কিমটির মূল প্রতিবাদ্য বিষয় ছিল ঢাকাতে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা এবং একই সময়ে চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে অথবা অন্য কোথাও দুইটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর এই স্কিম বাস্তবায়ন করার জন্য ১৮ লক্ষ টাকার মূলধন দরকার।[১৪৯]

এ ছাড়া ঢাকা প্রসঙ্গে তিনি তিনটি বিকল্প চিন্তাভাবনা করেন। প্রথমত, ঢাকাতে একটি মিশ্র মেডিকেল কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করা। সেখানে প্রথমটির জন্য ১০০ জন এবং স্কুলের জন্য ২০০ জন ছাত্রছাত্রীর পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। দ্বিতীয়ত, ঢাকা মেডিকেল স্কুলটিকে কলেজে রূপান্তরিত করা এবং অন্য স্থানে নতুন একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপন করা। তৃতীয়ত, বিদ্যমান মেডিকেল স্কুলটিকে যেভাবে আছে সেভাবেই রাখা এবং একটি হাসপাতালসহ একটি নতুন মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি ত্রুটিযুক্ত মনে করে তৃতীয় পরিকল্পনাটি বেশি সুবিধাজনক মনে করা হয়। এটি একটি ব্যয়বহুল পরিকল্পনা হলেও তিনি এই প্রস্তাবের সুপারিশ করেন। কিন্তু রবিনসন এর প্রস্তাব সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়নি।[১৫০]

পরবর্তীতে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য ইন্দুভূষণ দত্ত ও মেডিকেল বিভাগের সেক্রেটারি এল. এস. এস. ও'ম্যালি (L.S.S. O'Malley 1874-1941) মেডিকেল স্কুল বিলুপ্তির পরিবর্তে এর সম্প্রসারণ অথবা নতুন নতুন মেডিকেল স্কুল স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। তৎকালীন সরকারের নীতি ছিল মেডিকেল স্কুলের সম্প্রসারণ করা। এসব মেডিকেল স্কুল থেকে পাশ করা ডাক্তারদের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক চাহিদা ছিল। সেখানেই তাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। তাদের উভয়ের মতেই, তৎকালীন সময়ে ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা ছিল ব্যয়বহুল কেননা সে সময়ে সরকারের আর্থিক সংকট ছিল। তারা যে প্রস্তাব দেন, সে তুলনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন যে ব্যয়ের ধারণা দেয় তার চেয়েও বেশি। যদিও ও'ম্যালি ইন্দুভূষণ দত্তের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হলেও নানা অসুবিধার কারণে তাঁর সিদ্ধান্তের কিছুটা সংশোধন করে এভাবে প্রস্তাব দেন 'That Medical College be established as part of the Dacca University as soon as practicable' উল্লেখ্য যে ইন্দুভূষণ দত্ত মিটফোর্ড হাসপাতালকে সংযুক্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চান।[১৫১]

ইন্দুভূষণ দত্তের প্রস্তাবটি সংশোধন করা হলেও তা কাউন্সিলে উত্থাপন করা হয়নি, কারণ উত্থাপনের তারিখ পার হয়ে গেলে এটিকে স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে আবার পেশ করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও সুনির্দিষ্ট সময়ে তা উত্থাপন করা হয়নি। এভাবে দেখা যায় ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নানা অজুহাতে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

মেডিসিন অনুষদ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা

১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোনো মেডিকেল ফ্যাকাল্টি ছাড়াই তার ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন বিভাগের অনুপস্থিতি সরকারি নীতির প্রতিফলন হলেও ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের দাবি আসতে থাকে। তাই বাংলার জনসাধারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বর্জন করার মনস্থির করে প্রতিবাদে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কী কারণে এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কে জনসাধারণ বর্জন করার পরিকল্পনা করেছিল? তার কারণ অনুসন্ধান করা হয়। প্রশাসক গিরিশচন্দ্র নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার ফিলিপ হার্টগ (Sir Philip Hartog, Vice Chancellor 1920-1925) কে একটি চিঠিতে বর্জনের বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেন। তার মধ্যে একটি অন্যতম কারণ ছিল চিকিৎসা, কৃষি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া।

বিপুল অর্থ ব্যয় করে মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা ছাড়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং এই দুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে আইন কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হলে পূর্ববাংলার জনসাধারণ অসন্তোষ প্রকাশ করে।[১৫২] বিশেষ করে তখন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবিটি

বেশ জোরালোভাবে আসে, তবে প্রতিষ্ঠালগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অসুবিধা ছিল অর্থের। বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণরূপে সাধারণ রাজস্বের ওপর নির্ভর করত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলার রাজস্বের অবস্থা ভালো ছিল না। ব্যয় সংকোচনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হলেও তা কার্যে পরিণত করা হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য সাধারণ রাজস্বের ওপর দেশের জনসাধারণের অধিকার ছিল। সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য গঠিত কোর্ট (বর্তমানে সিনেট নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠার জন্য এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লর্ড রোনাল্ডসে (১৯১৭-১৯২২) সভাপতি হিসেবে বলেন, ব্যবস্থাপক সভার অনুমতি ব্যতীত একটি টাকাও বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীতে বিজ্ঞানকে প্রয়োজনীয় স্থান দেওয়ার ওপর জোর দেন, কেননা তিনি আশা করেন যে, আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এখানে অর্থনীতি, শরীরবিদ্যা ও জীববিজ্ঞানসহ কৃষি ও শিল্প বিভাগ খোলার প্রয়োজন।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর পি. জে. হার্টগ (১৯২০-১৯২৫) এই পদে যোগদানের পর হতে বিভিন্ন কারণে হতাশ হন। তাঁর হতাশার অন্যতম একটি কারণ ছিল পর্যাপ্ত অর্থের অভাব, কেননা এর অভাবে অনেক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারছিলেন না।[১৫৩] ১৯২২ সালের ৬ জুলাই সরকারি একটি রেজুলেশনে (নং-১৩৩১) ঢাকায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য কমিশন নিয়োগ করার সময় চিকিৎসাশিক্ষার প্রস্তাবটি উল্লেখ করা হয়। রেজুলেশনের ৫ অনুচ্ছেদ এ দেখা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকৌশল ও চিকিৎসাশিক্ষা অপরিহার্য। আর্থিক সংকটের কারণে ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত করার কোনো ইচ্ছা সরকারের ছিল না। কমিটি এই রিপোর্টের ৭৮ অনুচ্ছেদে এই অনুষদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো অনুরোধ করেনি। কমিটির সদস্যরা জানায় যে, যখন প্রদেশে আরো মেডিকেল স্কুল (ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে রূপান্তরের প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক বিবেচনা করা যেতে পারে। উপরন্তু, কমিটি এই বিশেষ বিষয়ের ওপর কোনো আগ্রহ দেখায়নি। এই রেজুলেশনে আরো বলা হয় যে, যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে মেডিসিন অনুষদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি থাকবে না। ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে মেডিকেল কলেজে রূপান্তর করা সম্ভব কিনা এই ব্যাপারে তারা মেডিকেল বিভাগের মতামত জানার জন্য আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেন।[১৫৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন আহমেদ (১৯২১-১৯৪৪) বাংলা সরকারের এডুকেশন বিভাগের সচিব জে.এইচ. লিন্ডজে (J.H. Lindsay) কে জানান ১৯২৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টে নিম্নের রেজুলেশনটি গৃহীত হয়,

> That this court recommends to the Executive Council to approach Government for the necessary funds for the creation of a Faculty of Medicine and the institution of a course for the bachelor's degree in the faculty.[১৫৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ঢাকা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কমিটির রির্পোট প্রকাশ না করায় কোর্টের উল্লিখিত রেজুলেশনটি স্থগিত করে। রিপোর্ট প্রকাশিত হলে এক্সিকিউটিভ ও একাডেমিক কাউন্সিল কমিটির সুপারিশে সম্মতি দান করে এবং কোর্টের পূর্বোক্ত রেজুলেশনটি বিবেচনা করে। ১৯২৪ সালের ২৬ আগস্ট এর সাথে নিম্নের রেজুলেশনটি গ্রহণ করে,

> That Government be urged to convert the Dacca Medical School into a Faculty of Medicine as a department of the University and to provide the necessary funds for that purpose.[১৫৬]

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শিক্ষা সচিবের দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্য উল্লেখ করেন যে, ১৯২০ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট এর ২২ ধারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ হিসেবে মেডিসিন অনুষদ প্রতিষ্ঠায় নিম্নরূপ বলা হয়,

> 22 (1) the University shall include the faculties of Arts, Science, Law, Medicine and Agriculture.[১৫৭]

অতএব এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বাংলা সরকারের কাছে উত্থাপন করতে অনুরোধ করা হয়। একই বছরের ২২ নভেম্বর এস.ডব্লিউ. গুড (S.W. Goode) বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের প্রস্তাবের অর্থ এই নয় যে, ঢাকা মেডিকেল স্কুল স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির পরিবর্তে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিসিন ফ্যাকাল্টি করা এবং এর অংশ করা উচিত। যদি এটিকে কলেজের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়, কেবলমাত্র তখনই কি বিশ্ববিদ্যালয় ভূমিকা পালন করবে? স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি স্থাপনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিকেল স্কুলগুলো স্থাপনে রাজি হননি এবং একই কারণে তাদের এই যুক্তিগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।[১৫৮]

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে 'ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন' রূপান্তর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ করার অনুরোধ করেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে আবেদন জানান। সরকার এই আবেদনে সাড়া দেয়নি কারণ সরকার মনে করত, 'ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে বিবেচনা করার সময় এখনও আসেনি।' এই ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে নানা রকম মতামত দেওয়া হয়।

১৯২৫ সালের ২১ জানুয়ারি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য রজার উইলসন (Roger Wilson) বলেন, ঢাকায় একটি মেডিকেল ফ্যাকাল্টি স্থাপনের প্রস্তাব অবাস্তব। এরূপ একটি প্রস্তাব অবশ্যম্ভাবীরূপে অন্তর্ভুক্ত করা বা মেনে নেওয়া উচিত নয়। তিনি এই ব্যাপারে যুক্তি দেন যে, ভারতে এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই, যার নিজস্ব মেডিকেল কলেজ আছে, এমন কোনো রয়েল কলেজ নেই মেডিকেল প্রাকটিসের জন্য লাইসেন্স দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া কেবলমাত্র স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি এরূপ লাইসেন্স দিতে পারে। ঢাকা মেডিকেল স্কুলের মতো একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্থাপন করার প্রশ্নই উঠে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতি থাকলে মেডিকেল স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিতে ভর্তি অথবা স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির লাইসেন্সের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির পূর্বে ১৯২৪ সালের মেডিকেল এ্যাক্ট এর ১৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে সরকার কর্তৃক তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন কাউন্সিলের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সুপারিশ করতে হবে।[১৫৯]

একই বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য জে.এ.এল. সোয়ান (J.A.L. Swan) বলেন, 'এক্সিকিউটিভ ও একাডেমিক কাউন্সিলের দ্বারা পাশ করা রেজুলেশনের অর্থ স্পষ্ট নয়। ...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই আইনের অধীনে এর কোনো অধিভুক্ত করার ক্ষমতা নেই। মেডিকেল বিভাগের সিদ্ধান্ত হলো ঢাকা মেডিকেল স্কুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না এবং শিক্ষা বিভাগকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।'[১৬০] আরো লক্ষ্য করা যায় যে, ইতিমধ্যে চিকিৎসাশিক্ষার বিষয়টি ঢাকা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কমিটি দ্বারা বিবেচনা করা হয়। এই ব্যাপারে কমিটি ঢাকা মেডিকেল স্কুল থেকে স্বতন্ত্র মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে অযৌক্তিক

বলে মনে করে। তারা ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে। তবে তারা মনে করে যে যখন এই অঞ্চলে আরো মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের প্রস্তাব সরকার কর্তৃক বিবেচনা করা যেতে পারে।[১৬১]

এটি স্পষ্ট যে, ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের পদক্ষেপ কমিটি বিবেচনা করেনি। এর অন্যতম কারণ ছিল অর্থনৈতিক।[১৬২] তবে অন্যান্য কারণ সম্পর্কে মেডিকেল বিভাগ বিস্তারিত কিছু জানায়নি এবং একই কারণে এই বিষয়ের ওপর খসড়া প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। এ বছরের ২৩ মার্চ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য এ. রহিম বলেন, 'এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি মনে করি প্রতিটি প্রচেষ্টা দ্বারা যথাসম্ভব বিপুল সংখ্যক যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসক শ্রেনি তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত। তার কাছে এর চেয়েও কঠিন মনে হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো মেডিকেল অনুষদ নেই এবং সমগ্র পূর্ববাংলা জুড়ে কোনো মেডিকেল কলেজ না থাকা। এর ফলে পূর্ববাংলার সমস্ত ছাত্রদেরকে কলকাতায় যেতে হবে এবং সেখানে তাদেরকে অবশ্যই একটি বড় ধরনের অসুবিধায় পড়তে হবে। বাংলা সরকারকে যথাযথভাবে যোগ্য চিকিৎসক শ্রেণি গড়ে তোলার ওপর জোর দেওয়া উচিত। যাতে তারা গ্রামগুলোতে সেবা দিতে পারেন, কারণ সেখানে চিকিৎসা সহায়তা কম পাওয়া যায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উত্থাপন করা উচিত এবং চূড়ান্তভাবে মেডিকেল বিভাগের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রীর বিবেচনায় না আসা পর্যন্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি করা উচিত নয়।'[১৬৩]

এ রহিম এর মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, পূর্ববাংলায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা এবং এর দ্বারা বিপুলসংখ্যক উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসক শ্রেণি তৈরি করা কতটা জরুরি ছিল। ইতিমধ্যে ঢাকার ছাত্রদের জন্য কলকাতা মেডিকেল কলেজে মাত্র ৬টি আসন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অপরদিকে একই বছরের ২৭ এপ্রিল এস.ডব্লিউ.গুড (S.W. Goode) বলেন, কারো বক্তব্য কোনোভাবেই স্পষ্ট নয়। তবে তারা স্পষ্টতই চেয়েছিলেন, ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। নতুন মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কম উচ্চ দক্ষ মেডিকেল প্রাকটিশনার তথা লাইসেন্সিয়েটদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল স্কুলটি বজায় রাখার পরামর্শ দেয়। একই সময়ে ঢাকা মেডিকেল স্কুল ও মেডিকেল কলেজ উভয় প্রতিষ্ঠানের ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য হাসপাতালে পর্যাপ্ত ক্লিনিক্যাল উপাদান পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হলে চিকিৎসাশিক্ষার ওপর একটি উপ-কমিটি গঠনের পরামর্শ দেওয়া হয়। ময়মনসিংহে নতুন মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হলেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই তিনি উপরি-উক্ত মতামত অনুসারে বলেন যে, 'ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিবেচনা করার সময় এখনও আসেনি।'[১৬৪]

বাংলা সরকারের শিক্ষা সচিব জে.এইচ. লিন্ডজে (J.H. Lindsay) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরি-উক্ত ১৯২৪ সালের ২৬ আগস্ট এর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে জানান যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবটি পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তবে আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায় যে, ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে মেডিকেল কলেজে রূপান্তরের প্রস্তাব করা হয়। ঢাকা মেডিকেল স্কুলটি লাইসেন্স প্রাপ্তদের প্রশিক্ষণের জন্য দুর্দান্ত কাজ করে যাচ্ছে। যাদের সেবা গ্রামীন অঞ্চলে জরুরিভাবে প্রয়োজন। বছরে যেখানে এই স্কুল থেকে ১০০ জন যোগ্য প্রাকটিশনার দেখা যায়, সেখানে এটিকে কলেজে রূপান্তর করা হলে বছরে কেবলমাত্র ৪০ জন স্নাতক দেখা যেতে পারে। বাংলা সরকারের কাছে প্রস্তাবটি বাস্তবসম্মত নয়। এই ধারনাটি ঢাকা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কমিটি সুনির্দিষ্ট করে ভাগ করে বুঝিয়ে দেন। তারা আশা প্রকাশ করেছেন যে, যখন

আরো মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক বিবেচেনা করা যেতে পারে। তাদের কথাও কোনোভাবেই পরিষ্কার নয়। তবে তারা স্পষ্টতই চেয়েছিলেন ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তিনি বলেন,

> I am to say that the Government of Bengal are therefore, as stated above, of opinion that the time has not yet come to consider further the establishment of a Medical College at Dacca.[১৬৫]

১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ১৯২০ এর সংশোধনী বিল উত্থাপন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ব্যাপক অংকের বাজেট উত্থাপন করা হয়। বিলটি পাশ করার জন্য কাউন্সিল সদস্যরা বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। এ সময় বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য বাবু অমূল্য ধন আদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা বিকাশের গুরুত্ব কাউন্সিল সভায় উত্থাপন করেন। ১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম কলা ও বিজ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ এটি কেবল অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নয় বরং শিক্ষাদান ও পরীক্ষামূলক বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কোর্স খোলার তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে এই অঞ্চলের জন্য অতি জরুরি। এ সময় ঢাকা ছাড়া বাংলার আর কোথাও উপযুক্ত জায়গা ছিল না। এরূপ একটি কোর্স ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে যেমন উপস্থাপন করবে তেমনি এর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে। তাছাড়া পূর্ববাংলায় বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তি কোর্সের ব্যাপকা চাহিদা থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী অনুদানের ব্যবস্থার মাধ্যমে কোর্সগুলো চালু করা সময়ের দাবি ছিল।[১৬৬] এরপরে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা না হলেও ১৯২৭ সালে বিষয়টি পুনরত্থাপিত হলে সরকার জানিয়ে দেয় যে, 'বর্তমানে (১৯২৭) ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার কোনো প্রয়োজন নেই'।[১৬৭]

অর্থনৈতিক সংকট

দীর্ঘ সময় ধরে বিষয়টি নিয়ে আলোচিত হলেও সরকার কোনো বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়নি। এর প্রধান কারণ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি এবং দেশের সার্বিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। নীতি নির্ধারকগণ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার চেয়ে মেডিকেল স্কুল সম্প্রসারণের পক্ষে মত দেন কারণ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠায় সীমিত অর্থ ব্যয় হবে। আবার মেডিকেল কলেজের মাধ্যমে উঁচু পর্যায়ের চিকিৎশাশাস্ত্র পাঠদানে কর্তৃপক্ষের আগ্রহের অভাব না থাকলেও সাবধানতা অবলম্বন করেন। দেশে যখন মেডিকেল গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করার জন্য মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা আলোচনা করা হচ্ছিল তখন অনেকেই মন্তব্য করেন যে, এর ফলে দেশে শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব আরো বাড়বে। কেননা এদেরকে ব্যবহার করার মতো দেশে এমনকি সমৃদ্ধ কলকাতা নগরীতে বিত্তবান মানুষের সংখ্যা খুবই কম।[১৬৮] এই ধরনের মন্তব্যের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক আমলের দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার করুণ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৩০ এর দশকে বাংলা অঞ্চলে অর্থাভাব প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৩০-১৯৩১ সালে এই দুই বছর বাংলায় বন্যা ও অর্থকৃচ্ছ্রতা উভয় মিলে সমগ্র দেশকে চরম দুর্দশায় নিয়ে যায়। এ সময় বিশ্ব মহামন্দার কারণে পাটের মূল্য অধিক পরিমাণে হ্রাস পায়। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিশন (BPBEC) এর

তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, ১৯৩০ সালে ৬৩%, ১৯৩১ সালে ৪৯% এবং ১৯৩২ সালে ৪৫% পাটের মূল্য হ্রাস পায়।[১৬৯] পাটের মূল্য অধিক পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় কৃষক, জমিদার এবং তালুকদারগণ, মহাজন সকলেই অর্থনৈতিক দুর্দশার সম্মুখীন হয়। জমিদার ও তালুকদারগণ প্রজাগণের নিকট থেকে খাজনা ও পথকর না পাওয়ায় সরকারের রাজস্ব বাকি পড়তে থাকে। রাজস্ব ও পথকর অনাদায়ের জন্য বহু জমি নীলামে ওঠে। ১৯২৯-৩০ সালে মোট ১৪,২০৯টি জমি/মহালের রাজস্ব বাকি পড়ে। ১৯৩০-১৯৩১ সালে ১৬,০০০ মহালের রাজস্ব বাকি পড়ে।[১৭০] এই বাকি রাজস্বের দায়ে মহালগুলো নীলামে ওঠার আশঙ্কা দেখা দেয়। তবে বলা হয় যে, জমিদার ও তালুকদারগণ যদি রাজস্ব আদায়ের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের সামর্থের অভাব কর্তৃপক্ষকে দৃষ্টিগোচর করতে পারেন, তাহলে কর্তৃপক্ষ তাদের রাজস্ব পরিশোধের জন্য সময় দিবেন। বাংলার এই ঘাটতি রাজস্বের প্রভাব সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও অর্থের অভাবে তা সম্পন্ন হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও ভাইস চ্যান্সেলরের বক্তব্য থেকে তা বোঝা যায়।

তৎকালীন সরকার পূর্ববাংলার স্বাস্থ্য উন্নতির চেয়ে পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্য উন্নতির ব্যাপারে বেশি উৎসাহী ছিল। কেননা সরকারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও ঋণ করে এই অঞ্চলের স্বাস্থ্যগত সমস্যার সমাধানের কথা বলেন। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা নগরীতে পানি নিষ্কাশন এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের মাধ্যমে এক স্বাস্থ্যকর নগরীতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে।[১৭১] অথচ পূর্ববাংলা তথা ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা তেমন কোনো আগ্রহ দেখাননি। দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরের পূর্ব পর্যন্ত কলকাতা ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ায় এর নগর পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ফলে পূর্ববাংলা ছিল অবহেলিত।

এদিকে ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) প্রবর্তিত ভাবধারায় অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-১৯২২) জাতীয় জীবনে এক নতুন ভাবধারার জন্ম দেয়। চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫) এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। তাঁরই আহ্বানে দেশীয় ছাত্ররা ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল, কলেজ পরিত্যাগ করে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে এবং জাতীয় শিক্ষাদানের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সারা বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা ন্যাশনাল কলেজ তেমনি একটি প্রতিষ্ঠান। কলেজ সংলগ্ন মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট এবং একটি হাসপাতাল স্থাপিত হয়। কেবলমাত্র মিটফোর্ড হাসপাতাল ঢাকা শহরের চাহিদা মিটাতে পারছিল না। এই ঢাকা ন্যাশনাল কলেজ হাসপাতালের দ্বার দরিদ্র রোগীদের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত ছিল এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল।[১৭২] সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে উক্ত ন্যাশনাল কলেজ বন্ধ হলেও কমিটির পরিচালকবর্গের এবং কলেজের ডাক্তারগণের চেষ্টায় হাসপাতালটি ১৯৪০ এর দশক থেকে গবেষণার আলোচ্য সময় পর্যন্ত এবং বর্তমানে আজও ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হিসেবে এখনও টিকে আছে।

উল্লেখ্য ১৯২১ সালে জগন্নাথ কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র সরকারের দ্বারা স্থাপিত ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের পরিচালনা কমিটির সাথে মতবিরোধ হওয়ায় কয়েকজন শিক্ষক মিলে স্থানীয় অপর কয়েকজন চিকিৎসকের সহযোগিতায় ১৯২৫ সালে 'ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট' নামে প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[১৭৩] এই প্রতিষ্ঠানটি ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) উদ্বোধন করেন। এর চার বছর পর তথা ১৯২৯ সালে এর সংলগ্ন একটি

১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই হাসপাতালটি 'ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতাল' নামে পরিচিত ছিল। কয়েক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে বিবাদমান পক্ষগণ দিওয়ানি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির অনুমোদনের জন্য আবেদন করে। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ থাকার কারণে স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি অনুমোদন দিতে আগ্রহী হয়নি। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করা হলেও দুই বছর পর পুনরায় চালু করা হয়, কিন্তু ১৯৬৫ সালে চূড়ান্তভাবে সরকারি নির্দেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১৭৪] পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হিসেবে চালু করা হয়। উল্লিখিত এই ইনস্টিটিউট হাসপাতালটি বর্তমানে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হিসেবে চালু আছে।

১৯৪০ এর দশক থেকে দেখা যায় যে, ঢাকা ন্যাশনাল কলেজ হাসপাতালের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন প্রসুতি।[১৭৫] এই কলেজ হাসপাতালে প্রসুতিদের বিশেষ যত্ন নেওয়া হতো। তাই প্রসুতির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং এই কলেজ হাসপাতাল ছাড়া ঢাকার কোথাও প্রসুতি সদন ছিল না বললেই চলে। আর্থিক অবস্থা দুর্বল থাকার দরুন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই সকল রোগীর সেবা করা কষ্টকর ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই প্রতিষ্ঠানটিকে বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল ইম্যুনিটি, কিছু সংখ্যক ফার্মাসি ঔষধ ও ইনজেকশন দিয়ে সাহায্য করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এসব সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি বছরে ১২০০ টাকা, জেলা বোর্ড ৩০০ টাকা, কতিপয় সুহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য, ঢাকেশ্বরী কটন মিল গজ, ব্যান্ডেজ, ধুতি, শাড়ি প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করত। কিন্তু এই সামান্য আয়ে হাসপাতালটিকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। তাই হাসপাতালের পরিচালকবর্গ সাহায্য ও সহযোগিতা চেয়ে দেশের জনসাধারণের নিকট আবেদন করে। পূর্ববাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থার এই দৈন্য দশা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই অঞ্চলে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা কতটা জরুরি ছিল। আর্থিক সংকটের কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ১৯২৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বার্ষিক কনভোকেশন হয় সেখানে ভাইস চ্যান্সেলর সমগ্র প্রদেশ অথবা ঢাকা, চট্টগ্রাম বিভাগ নিয়ে সেকেন্ডারি বোর্ড গঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার ভিতর ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ওপর নানা বিষয়ে তত্ত্বাবধান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ফ্যাকাল্টি খোলার প্রস্তাব দিলেও চিকিৎসাশিক্ষা বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করেননি।[১৭৬] প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি ঔপনিবেশিক আমলের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল।

এই অবস্থায় মেডিকেল কলেজের মাধ্যমে উঁচু পর্যায়ের চিকিৎসাশিক্ষা পাঠদানে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত না নিলেও বিষয়টিতে তেমন কোনো ঘোর আপত্তি জানায়নি। তবে সীমিত বাজেটের কারণে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তেমন আগ্রহী হয়নি। সরকার অর্থ স্বল্পতার কারণে মেডিকেল কলেজের চেয়ে মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠাকেই অগ্রাধিকার দেন তবে বেসরকারিভাবে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো আপত্তি জানায়নি।

জগমোহন পাল এর অনুদান

অর্থের অভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা বিলম্ব হতে থাকলে ১৯২৯ সালে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। সে বছর ঢাকার নওয়াবপুরের বর্নাঢ্য ব্যক্তি জগমোহন পাল (মৃত্যু: ১৯২৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সংশ্লিষ্ট করে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিরাট অংকের টাকা দান করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ঢাকা প্রকাশ থেকে জানা যায় যে, 'ঢাকার জগমোহন পালের উত্তরাধিকারী মহাশয়েররা ঢাকায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য ৪ লক্ষ টাকা দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন'।[১৭৭] তাঁর এই অর্থের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আর দূরে সরিয়ে রাখা যায়নি।

বাস্তব ক্ষেত্রে এই দানের অর্থ হস্তান্তর করতে অনেক সময় লেগে যায়। ১৯৩৪ সালে এই অর্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়।[১৭৮] বাবু জগমোহন পাল তাঁর উইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সম্পত্তি থেকে ৪ লক্ষ টাকা দান করার কথা বলেন। উইলের এক্সিকিউটরগণ ১৯৩৪ সালের ৭ ডিসেম্বর এক চিঠিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ৪ লক্ষ টাকা দান করার কথা প্রস্তাব করেন, তবে শর্ত ছিল যে, কলেজটি জগমোহন পাল মেডিকেল কলেজ নামে পরিচিত হবে। ১৯৩৪ সালের ১০ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের এক বিশেষ সভায় এই দান গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৩৫ সালে জগমোহন পালের দান সংক্রান্ত ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এ.এফ. রহমান (১৯৩৪-১৯৩৬) বলেন, 'স্বর্গীয় জগমোহন পালের নামে ঢাকায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার জন্য তাঁর এক্সিকিউটর শ্রীযুত শ্যামচাঁদ বসাক, শ্রীযুত নিবারন চন্দ্র গুহ মুস্তোফী ও শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সেন ঐ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করতে সম্মত হয়েছেন'।[১৭৯] ফলশ্রুতিতে এক্সিকিউটরগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৪ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। একই বছর একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। সোনালাল পাল ও অপর দুই ব্যক্তি একযোগে জগমোহন পালের উইলের এক্সিকিউটরের পদ হতে উকিল শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র গুহ মুস্তোফী, শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সেন এবং মিউনিসিপাল কমিশনার শ্রীযুত শ্যামচাঁদ বসাককে অপসারণ করার জন্য ঢাকার জজ আদালতে এক মামলা দায়ের করেন। উল্লেখ্য ১৯২৬ সালে জগমোহন পাল মারা যান এবং মৃত্যুকালে তিনি ৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে যান।[১৮০]

বাদী পক্ষের অভিযোগ ছিল এই যে, জগমোহন পাল তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জনহিতকর কাজে ব্যয় করার জন্য এক উইল করে এক্সিকিউটরের হাতে ন্যস্ত করেন। একটি হাইস্কুল, একটি মেডিকেল কলেজ, একটি ফ্রি প্রাইমারি স্কুল, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি ধর্মশালা স্থাপন, একটি পুকুর খনন প্রভৃতি কাজ করার কথা উইলে লিখিত ছিল। এক্সিকিউটরগণ হাতে সম্পত্তি পেয়েও মহৎ কাজগুলি করেননি। এভাবে সম্পত্তি ফেলে রাখাকে বাদীগণ তাদের অযোগ্যতাকে প্রমাণিত করে বলে মন্তব্য করেন। অন্যদিকে বিবাদীগণের পক্ষ হতে বলা হয়েছে যে, বাদীগণের মামলা বিধিসম্মত নয়। জগমোহন পাল এর ভাইয়ের ছেলেদের প্ররোচনায় এই মামলা আনা হয়, তারা জগমোহন বাবুর শত্রু ছিল। আদালতে এই মামলা বিচারের অধিকার নাই, কারণ আদালত ঐ সকল ট্রাস্টি পরিবর্তন করতে পারেন না। দিওয়ানি কার্য বিধির ৯২ ধারা মতে এই মামলা চলবে না। জগমোহন বাবুর সমস্ত সম্পত্তি ১৯১০ সাল হতে তাঁর ভাইয়ের ছেলেদের সাথে মামলায় জড়িত ছিল এবং ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত আদালত নিযুক্ত রিসিভারের অধিকারে ছিল। সমস্ত সম্পত্তি তখনও তাদের (এক্সিকিউটরগণ) দখলে না আসায় সম্পত্তি পরিচালনা সম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে এক্সিকিউটরগণ একটি বালিকাবিদ্যালয়, একটি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ৪ লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন। কাজেই ট্রাস্টিগণের বিরুদ্ধে আনীত মামলা এবং অভিযোগ ছিল ঈর্ষা প্রাণোদিত এবং মিথ্যা। ফলে ঢাকার জেলা জজ মি.ই.বি.এইচ. বেকার উপরি-উক্ত মামলা নিষ্পত্তি বা ডিসমিস করে দেন।[১৮১]

মামলাজনিত কারণে জগমোহন পাল এর দানের টাকা পেতে দেরি হলেও এই অর্থ যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিকে একধাপ এগিয়ে দেয় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই ১৯৩৫ সালে ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে চ্যান্সেলর জন এন্ডারসন (১৯৩২-১৯৩৭) বলেন যে, ‘স্বর্গীয় জগমোহন পাল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের জন্য ৪ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইহা রাজোচিত দান'।[১৮২] জগমোহন পাল এর এক্সিকিউটরগণ ৪ লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হস্তান্তর করলে একাডেমিক কাউন্সিল ও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বিষয়টি বিবেচনায় নেয়। ঢাকার সিভিল সার্জন ও শীর্ষস্থানীয় মেডিকেল প্রাকটিশনারদের পরামর্শের আলোকে একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক খুব অল্প সময়ের মধ্যে সরকারের কাছে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।[১৮৩] অনুরূপভাবে ১৯৪৬–১৯৫২ সালের *ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বার্ষিক বিবরণীতে* উল্লেখ করা হয় যে,

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৩৬ সালে একটি প্রকল্প গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।[১৮৪]

জগমোহন পাল এর এই বিপুল পরিমাণ টাকা, অর্থ সংকটের বিষয়টি এই যাবত মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ ছিল তা বহুলাংশেই দূর করে দেয়।

মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় রমেশচন্দ্র মজুমদার এর পদক্ষেপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঢাকাতে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় প্রবল উৎসাহ দেখায়, কিন্তু কাজটি বাস্তবায়ন সহজ ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পৃক্ত যদি একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম যা দরকার, তাহলো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মেডিকল ফ্যাকাল্টি স্থাপন করা। এর জন্য প্রয়োজন সরকারি অনুমতি, যা অনায়াসেই পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী ও অনবদ্য ভূমিকা রাখেন, তিনি হলেন উপমহাদেশের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৯৩৭-১৯৪২)। বস্তুত তারই প্রচেষ্টায় বিষয়টি সফলতার দিকে এগিয়ে যায়। তিনি ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এতটাই জোর দেন, যা ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল মেজর ডা. ডব্লিউ. জে. ভারজিন (১৯৪৬-১৯৪৭) এর একটি উক্তি থেকে বোঝা যায়,

> ১৯৮৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৪০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মেজর ডা. ডব্লিউ. জে. ভারজিন বলেন, ‘রমেশচন্দ্র মজুমদার ও তাঁর মধ্যে ঢাকায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ চারিতার সময় রমেশচন্দ্র মহাশয় তাঁকে বলেছিলেন, মেডিকেল কলেজের জন্য যদি আমার বাড়ি ছেড়ে দিতে হয়, তাও ঢাকায় মেডিকেল কলেজ হবে।[১৮৫]

মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি দাতা পরিবার, ঢাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ব্যক্তিত্ব, সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং রাজনীতিবিদদের সাথে অনবরত পরামর্শ এবং সম্পর্ক বজায় রাখেন। তার উৎসাহে অনেকেই ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বরূপ বা প্রক্রিয়া কী হবে? সে সম্পর্কে সরকারি নীতিমালা, মেডিকেল বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ধ্যানধারণা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহকে ভিত্তি করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে দুটি ফ্রন্টে তারা পরিকল্পনা করেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল ফ্যাকাল্টি

প্রতিষ্ঠা করা, অপরটি ঢাকা মেডিকেল স্কুল ও মিটফোর্ড হাসপাতালকে সংশ্লিষ্ট করে অথবা নতুন একটি হাসপাতাল নির্মাণ করে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা।

১৯৩৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি জগমোহন পাল উইলের এক্সিকিউটরগণ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ঢাকায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে একমত হন। এই ঐক্যমত্যের আলোকে এক্সিকিউটরগণ বিশ্ববিদ্যালয়কে এই পর্যন্ত ৪ লক্ষ টাকার ওপর অর্জিত সুদের সকল অর্থ প্রদান করেন। চুক্তি হয় যে, এই অর্থ দিয়ে প্রথমে ১৯৩৭ সালের জুলাই মাস থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফিজিওলজির একটি বিভাগ এবং ১৯৩৯ সালের জুলাই থেকে ফার্স্ট এম. বি. কোর্স আরম্ভ করবে। এই উভয় কাজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে। আরো সিদ্ধান্ত হয় ফিজিওলজি বিভাগ, প্রি-মেডিকেল ফ্যাকাল্টি এবং মেডিকেল কলেজটি জগমোহন পাল বাবুর নামে হবে। অপরদিকে ১৯৪১ সালের জুলাই মাসের পূর্বে যদি সকল কোর্স পড়ানোসহ একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ স্থাপনে তাঁরা ব্যর্থ হন তাহলে উইলের এক্সিকিউটরগণের নিকট প্রাপ্ত মূল টাকা ফেরত দিবেন।[১৮৬]

একই বছরের মে মাসে ভাইস চ্যান্সেলর রমেশচন্দ্র মজুমদার মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার স্কিমটি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক এর সাথে আলোচনা করার জন্য দার্জিলিং যান। মাননীয় মন্ত্রী স্কিমটির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলেও তিনি এই বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং বাংলার সার্জন জেনারেলের সাথে আলাপ আলোচনা করতে বলেন। পরবর্তীতে রমেশচন্দ্র মজুমদার তাদের সাথে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সার্জন জেনারেল বিষয়টিকে অবাস্তবিক ও জটিল সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে বলে মন্তব্য করেন। তাই তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বাস্তবভিত্তিক পন্থা হবে ঢাকার বর্তমান মেডিকেল স্কুলটিকে মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত করার জন্য প্রস্তুত করা।[১৮৭]

অধ্যাপক মজুমদার পুনরায় এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক (১৯৩৭-১৯৪৩) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অবহিত এবং এর জন্য সরকারি অনুদান প্রার্থনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন কর্মপরিকল্পনাটি সর্বপ্রথম বাংলা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং তারপর সরকার সেটি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে বলে জানান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের এক সভায় এই সকল বিষয় মাননীয় সদস্যদের কাছে প্রকাশ করেন। কাউন্সিলের সদস্যরা বিস্তারিত আলোচনা করার পর ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত করার পরামর্শটি গ্রহণ করেন এবং এই প্রসঙ্গে একটি নতুন কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। কমিটিতে স্থানীয় খ্যাতিমান চিকিৎসক, সিভিল সার্জন এবং ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কয়েকজন অধ্যাপককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৮৮] ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তিনি চ্যান্সেলর জন এ্যান্ডারসন, প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখকে উদ্দেশ্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার পাশাপাশি ঢাকায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য ইতিমধ্যে জগমোহন পাল এর দেওয়া ৪ লক্ষ টাকা এবং প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনা সরকারের নিকট প্রেরণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আরো অর্থ সাহায্যের জন্য বিশিষ্টজনের প্রতি অনুরোধ করেন।[১৮৯]

এই কমিটি ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে এবং ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে যথাযথ প্রস্তুতিসহ এম.বি. ফাইনাল পরীক্ষার জন্য শিক্ষা প্রদানে সক্ষম করে মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ এবং কৌশল গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করে। নানারকম

মন্তব্য সমৃদ্ধ প্রতিবেদনটি কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ১৯৩৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তাদের এক সভায় সুপারিশ করে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কাছে প্রেরণ করে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ১৭ সেপ্টেম্বর তা অনুমোদন দেয়।[১৯০] কমিটির প্রতিবেদনের পরিকল্পনা অনুসারে ঢাকায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে পূর্ববঙ্গবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে এবং এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের অনেক সুবিধা হবে বলে আশা করা হয়। পরিকল্পনা যাতে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করা হয় এজন্য সরকারের কাছে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য চাওয়া হয়।[১৯১]

এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের স্কিমটি অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করেন। এটি বাস্তবায়ন করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। ১৯২০ সালের ১৮ নং এ্যাক্টের ২২ (I) অনুচ্ছেদ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয় কলা, বিজ্ঞান, আইন, মেডিসিন, কৃষি এবং সংবিধির দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য অনুষদ অন্তর্ভুক্ত হবে। অধ্যাদেশ দ্বারা অর্পিত প্রত্যেকটি অনুষদের গবেষণামূলক কাজ, পাঠ্যক্রম এবং অধ্যাপনার দায়িত্ব একাডেমিক কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রনে থাকবে।[১৯২] এই পরিকল্পনাটি বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট প্রণয়নকারীদের নির্দেশকেই বাস্তবায়ন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন আহমদ (১৯২১-১৯৪৪) জানান, ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমানে কলকাতা ছাড়া বাংলার আর কোথাও কোনো মেডিকেল কলেজ নেই। ফলে বাংলার অন্য কোনো স্থানে চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে বহুদিনের একটি অভাব দূর করা সম্ভব। এর ফলে ঢাকায় একটি চিকিৎসা গবেষণাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে, যেখানে বহু চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত থাকবেন। এই সব বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সেবা পূর্ববাংলার জনগণ নিতে পারবে এবং পূর্ববাংলাবাসীকে আর সুদূর কলকাতায় তাদের রোগীদের নিয়ে যাওয়ার কষ্ট ভোগ করতে হবে না। তিনি আরো জানান যে, এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করতে হলে এই পর্যন্ত মেডিকেল স্কুলের জন্য যে অর্থ দেওয়া হতো তার অতিরিক্ত মাত্র বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা সরকারকে ব্যয় করতে হবে।

মেডিকেল কলেজ স্থাপন সংক্রান্ত স্কিমটি জানাজানি হওয়ার সাথে সাথেই চারদিক থেকে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া আসে। বিভিন্ন পর্যায়ে এটি আলোচিত হয়। আলোচনার মূল বিষয় ছিল ঢাকা মেডিকেল স্কুলের বিলুপ্তি এবং ঢাকায় একটি নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা। যারা মেডিকেল স্কুল সম্প্রসারণের পক্ষে ছিলেন তারা ঢাকা মেডিকেল স্কুলের বিলুপ্তির প্রতিবাদ করেন, কেননা স্কুল থেকে পাশ করা ডাক্তাররাই গ্রামাঞ্চলে গিয়ে চিকিৎসা করত। সেখানেই তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। ঢাকা মেডিকেল স্কুল লাইসেন্সিয়েটদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছিল। অপরদিকে যারা মেডিকেল কলেজ চেয়েছিলেন তারা এর পক্ষে সোচ্চার হন, বিশেষ করে পূর্ববাংলার শিক্ষিত জনগণ। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সরকার স্কিমটির ওপর ব্যাপক পর্যালোচনা চালায়। এক পর্যায়ে বাংলার সার্জন জেনারেল স্কিমটির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য আরেকটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেন। ফলে পুনরায় এই প্রস্তাবের ওপর আলোচনা শুরু হয়।

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মতে, প্রকল্পটিতে সরকারের আর্থিক দায়দায়িত্ব কী পরিমাণ বাড়বে তা স্পষ্ট নয়। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট থেকে এটি স্পষ্ট যে, সাধারণ ব্যয় ও ছোটখাট উন্নয়ন চালানোর জন্য তা যথেষ্ট হলেও বড় রকমের কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিতে হলে যেমন, মেডিকেল কলেজ

স্থাপন, তা বিদ্যমান বাজেট থেকে করা সম্ভব ছিল না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে, বর্তমান পরিকল্পনাটি যদি গৃহীত হয় তাহলে এর জন্য বাজেট খুঁজতে হবে। ১৯৩৭ সালে নভেম্বর মাসে পরিকল্পনাটি মেডিকেল বিভাগের কাছে মতামতের জন্য পাঠিয়ে দেয়।

মেডিকেল বিভাগ স্কিমটি যাচাই করে দেখার জন্য সার্জন জেনারেল মেজর জেনারেল ডাক্তার পি. এস. মিলস এর কাছে পাঠিয়ে দেয়। মিলস স্কিমটির বিষয় পর্যালোচনা করে তার প্রতিবেদনে মন্তব্য করেন যে, প্রি-ক্লিনিক্যাল পাঠ প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কয়েকটি ভবন নির্মাণ করতে হবে, যেখানে এনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হবে। স্কিমের প্রণেতারা কলেজটিকে মোটামুটি বড় করেই প্রতিষ্ঠা করতে চান যেখানে প্রতিবছর ৭৫ জন নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। মিলস ব্যক্তিগতভাবে এত বড়ো ক্লাসের পক্ষপাতী নন। তার মতে ৫০ জন ছাত্রছাত্রীই যথেষ্ট। ছোট পরিসর এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা যাবে এমনই একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

মিটফোর্ড হাসপাতালটি যে জায়গায় অবস্থিত সেটি খুবই ছোট এবং ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। সে কারণে যেসব ভবনে প্রি-ক্লিনিক্যাল বিষয়গুলি পড়ানো হতো সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন। এর ফলে হাসপাতালের জন্য বেশ খানিকটা জায়গা পাওয়া যাবে বলে ধারণা দেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মেডিকেল স্কুলগুলিকে কলেজে রূপান্তরিত করাই বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। তাই ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে মেডিকেল কলেজে রূপান্তরের প্রস্তাব দেন। তিনি উল্লেখ করেন পুরো প্রকল্পটি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত। তাই নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।[১৯৩] নিম্নে সদস্যবৃন্দের নাম দেওয়া হলো,

(১) ডাক্তার মিলস (২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি (৩) লে. কর্নেল টি. সি. বয়েড (১৯৩২-১৯৩৯), প্রিন্সিপাল কলকাতা মেডিকেল কলেজ (৪) ডাক্তার এম. এন. বোস, প্রিন্সিপাল কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, বেলগাছিয়া (৫) লে. কর্নেল জে. সি. দে, সুপারিনটেনডেন্ট, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল (৬) কে. এম. মিত্র, সেক্রেটারি, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (৭) ডাক্তার পি. দে. অধ্যাপক, ফিজিওলজি বিভাগ, কলকাতা মেডিকেল কলেজ (৮) সিভিল সার্জন, ঢাকা (৯) খান সাহেব ডাক্তার মইজুদ্দিন খান, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট, ঢাকা মেডিকেল স্কুল। এ সময় চিকিৎসা ও কৃষি অনুষদ প্রতিষ্ঠার প্রকল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে কৃষি অনুষদ শুরু করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তহবিল গঠনের জন্য সরকারের সাথে আলোচনা করা হয়। অন্যদিকে চিকিৎসা অনুষদ প্রতিষ্ঠার পুরো প্রকল্প পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি এর সাধারণ বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয় এবং ১৯৩৯-৪০ সালের পূজার ছুটির আগেই কমিটি রিপোর্ট সরকারের নিকট প্রেরণের আশ্বাস দেন।[১৯৪] মিলস এর মতামত মেডিকেল বিভাগ সরাসরি গ্রহণ করেন এবং এমন একটি জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য স্কিমটিকে একটি এক্সপার্ট বা বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা যাচাই করে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়।

ইতিমধ্যে সারা পূর্ববাংলায় ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। ঢাকা পিপলস এসোসিয়েশন স্বায়ত্তশাসন সরকার ও মেডিকেল বিষয়ক মন্ত্রীর নিকট ১৯৩৮ সালের ৩১ মার্চ এক্সিকিউটিভ কমিটির এক সিদ্ধান্তের কপি বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেন। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে বাতিল না করে একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়। ঢাকা মেডিকেল স্কুল বজায় রাখার জন্য ব্যাপক জনমত রয়েছে কারণ স্কুলটি দীর্ঘদিন যাবত গ্রামীন এলাকায় দক্ষ, যোগ্য মেডিকেল প্রাকটিশনার সরবরাহ করে আসছে।[১৯৫] তাছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা গ্রামীন এলাকায় যেতে সম্মত হবে না।

ঢাকার মেডিকেল কলেজ স্থাপন নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। *ঢাকা প্রকাশ* জানায় ঢাকার চিকিৎসকদের 'ঢাকা মেডিকেল ক্লাব' ঢাকা শহরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ স্থাপন সম্পর্কে একটি অধিবেশনে এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, 'ঢাকা মেডিকেল স্কুল উঠাইয়া দিয়া তাহার স্থানে মেডিকেল কলেজ স্থাপন যুক্তিযুক্ত নহে এবং এই বিষয়ের সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্য একটা সাব-কমিটি গঠন করা হউক'।[১৯৬]

এদিকে বিষয়টি নিয়ে যখন সরকারি মহলের উঁচু পর্যায়ে আলোচনা চলছিল তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই ব্যাপারে তাদের নিজস্ব একটি কৌশল তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। এ ক্ষেত্রে ভাইস চ্যান্সেলর রমেশচন্দ্র মজুমদার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি 'ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন' থাকা বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ প্রদান না করা হলে বিশ্ববিদ্যালয় তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য মানব সেবায় তার দায়িত্ব পালন করা। তাছাড়া চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়া একটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্টেই চিকিৎসাশিক্ষা বিভাগের কথা উল্লেখ আছে, তাই তিনি এই ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টা চালান। ১৯৩৮ সালের ২০ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এই ব্যাপারে তাঁর বক্তৃতায় বিষয়টি উত্থাপন করার সংকল্প করেন। মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য সংশোধিত পরিকল্পনা সরকারের নিকট ইতিমধ্যে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের নিকট সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং ঢাকা মেডিকেল স্কুল থেকে ১ লক্ষ টাকা দাবি করা হয়, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় থেকে এই টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই পরিকল্পনা দ্রুত কার্যকর হওয়ার জন্য সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্য চান।[১৯৭] মূলত এই বক্তৃতায় 'ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন' ও 'ফ্যাকাল্টি অব এগ্রিকালচার' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো সম্প্রসারণের কথা এবং উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, কৃষি ও চিকিৎসাবিদ্যা পাঠ কেবল পেশাজীবী হবার প্রস্তুতি নয়, যদিও সেই দৃষ্টিতে এদের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। তাই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সবার কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন।[১৯৮]

তার বক্তৃতা সমাবর্তন সভায় যথেষ্ট আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। মাননীয় প্রাদেশিক গভর্নর স্যার জন কার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাটিকে সহানুভূতির সাথেই দেখা হচ্ছে এবং এটিকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। বহু মতামত ও আলোচনার পর ১৯৩৮ সালের ১৬ আগস্ট ১২ সদস্যের একটি কমিটি [*পরিশিষ্ট দেখুন*-২] গঠন করা হয়।[১৯৯]

কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ ছিল,

(১) একটি মেডিকেল স্কুলের স্থানে মেডিকেল কলেজ স্থাপন কতটুকু বাঞ্ছনীয়?

(২) কতজন ছাত্রের জন্য এই সুবিধা প্রদান করা হবে? এবং

(৩) এরূপ একটি অনুমোদনযোগ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে, অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদানের জন্য হাসাপাতালের যথাযথ উন্নয়নসহ, সরকারের কত অর্থ ব্যয় হবে?

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় কমিটির কাজ ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়। বস্তুত কমিটির কার্যপরিধি এমনকি প্রস্তাবটির ভবিষ্যতও যুদ্ধের কারণে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তবুও কমিটি তাদের কাজ চালিয়ে যায়। বেশ কয়েকজন সদস্য ঢাকায় সভা করেন এবং বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি বিশেষ উপ-কমিটি গঠন করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে সদস্যগণ ও অন্যান্য কর্মকর্তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

মিটফোর্ড হাসপাতাল এবং ঢাকা মেডিকেল স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করেন এবং প্রস্তাবিত কলেজ ও হাসপাতাল সম্প্রসারণের জন্য সম্ভাব্য জায়গা পরিদর্শন করেন। অবশেষে দীর্ঘ দুইবছর ধরে কাজ পরিচালনা করার পর ১৯৪০ সালের ১০ জুলাই কমিটি তার প্রতিবেদনটি পেশ করে। এই ব্যাপারে ১৯৩৯-৪০ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক বিবরণী*তে লিপিবদ্ধ করে,

> Satisfactory progress has been made in regard to the proposed Faculty of Medicine. The Committee appointed by the Government to examine the whole project of establishing a Faculty of Medicine has already submitted their final report to government and it is confidently hoped that the matter will receive their sympathetic consideration at an early date.[২০০]

কমিটির সদস্যগণ তাদের প্রতিবেদনে মতামত দিতে গিয়ে পূর্ববাংলায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বাঞ্ছনীয় প্রশ্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মতামত দেন।[২০১] একটি উন্নতমানের চিকিৎসাকেন্দ্রের জন্য এই অঞ্চলের জনগণের দীর্ঘকালের একটি যৌক্তিক দাবি ছিল, কেননা পূর্ববাংলার জনগণ উন্নত চিকিৎসা ও আধুনিক অস্ত্রোপচারের সুবিধা পেতে কলকাতায় যেতে বাধ্য হতো। অথচ কলকাতার হাসপাতালে একদিকে যেমন জায়গা পাওয়া খুব কঠিন ছিল অন্যদিকে সেখানে গিয়ে থাকাও ব্যয়বহুল ছিল। তাছাড়া পূর্ববাংলা ছাত্রদের মধ্যে চিকিৎসাশিক্ষার উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। কলকাতা মেডিকেল কলেজে ঢাকা তথা পূর্ববাংলা ছাত্রদের জন্য মাত্র ৬টি আসন সংরক্ষণ করা হতো এবং বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে পূর্ববাংলার ছাত্রদের জন্য কোনো আসনই সংরক্ষণ করা হতো না। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি চিকিৎসা অনুষদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিদ্যমান শূন্যতা পূরণ করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে। এ ছাড়া ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন এবং সেই সাথে একটি সম্প্রসারিত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হলে সমগ্র প্রদেশের ব্যাপক উপকারে আসবে বলেও কমিটি মত দেয়।[২০২]

ঢাকা বাংলার দ্বিতীয় বৃহৎ নগরী, নোয়াখালী, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রামের মতো পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ ঢাকা তখন গোটা পূর্ববাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। ইতিমধ্যে এই শহরে ভালো একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ভালো ভালো বিজ্ঞান গবেষণাগার ও একদল দক্ষ শিক্ষক রয়েছে। এরকম একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যদি একটি মেডিকেল কলেজ সংযুক্ত করা যায় তাহলে সেটি সুদূরপ্রসারী চিকিৎসাশিক্ষা বিষয়ক পাঠ ও গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে।[২০৩]

কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল ইতিমধ্যে অত্যধিকভাবে জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে। কমিটির সদস্যগণ মনে করেন যে, ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত করে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করাও অতি জরুরি। এর ফলে পূর্ববাংলা হতে কলকাতায় ব্যাপকহারে রোগী যাওয়া বন্ধ করা সম্ভব হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি মেডিকেল কলেজ হলে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর কোনো অভাব হবে না। ঢাকা নগর এবং পূর্ববাংলার অন্যান্য কলেজগুলিতে প্রচুর ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে আই.এসসি. পরীক্ষা দেয়। সেখান থেকে এসব ছাত্রছাত্রী ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবে। ১৯৪০ সালে ঢাকা শহরের কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে মোট আই.এসসি. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩১১ জন।[২০৪] এ ছাড়া অন্যান্য কলেজের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নের তালিকায় পাওয়া যায়,[২০৫]

কলেজের নাম	সাল	আই.এসসি. পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা
বরিশাল বি.এম কলেজ	১৯৩৯	১২৬ জন
চট্টগ্রাম কলেজ	১৯৩৯	৪৪ জন
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ	১৯৩৯	১১১জন
ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ	১৯৩৯	৪৮ জন
ময়মনসিংহ কলেজ	১৯৩৯	৯৫ জন
সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজ	১৯৩৯	৫৪ জন
মোট		**৭৮৯ জন (ঢাকার ৩১১ জনসহ)**

কমিটি উল্লেখ করে সারা ভারতবর্ষের চিকিৎসাশিক্ষার কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, সমগ্র দেশে একটি মানসম্মত চিকিৎসাশিক্ষা থাকা উচিত। এই মান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের। এটি অনস্বীকার্য যে, বিদ্যমান মেডিকেল স্কুলগুলির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে এগুলোর শিক্ষার মান ধীরে ধীরে উঁচু পর্যায়ের হওয়া উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত না সর্বত্র একই মান অর্জন করা সম্ভব হয়। উপরি-উক্ত বিবেচ্য বিষয়গুলি এবং বিভিন্ন পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে কমিটি বিদ্যমান মেডিকেল স্কুলের স্থানে ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পক্ষে মত প্রদান করে।

কলেজের গঠন ও কার্যক্রম কী ধরনের হবে? এই ব্যাপারেও কমিটির সদস্যগণ সুস্পষ্ট মত দেন। প্রাথমিকভাবে ৫০জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে মেডিকেল কলেজ শুরু করতে হবে। তবে ভবিষ্যতে যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহলে অধিক শিক্ষর্থী নেওয়ার জন্য সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। তাই বিষয়টি ভবিষ্যৎ ছাত্র বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করবে।[২০৬]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী একটি চিকিৎসা অনুষদ খোলার প্রস্তাব দেয়। এই বিষয়ে মত দেয় যে, প্রথম দিকে চিকিৎসা অনুষদের কারিকুলাম ও সিলেবাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ হওয়া উচিত। ১৯৩৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারিতে গৃহীত ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের বিধিগুলি *[পরিশিষ্ট দেখুন -৩]* মেনে চলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কমিটি জোর সুপারিশ করে।[২০৭] বিশেষজ্ঞ কমিটির ক্লিনিক্যাল বিষয়গুলি যেমন, এনাটমি, ফিজিওলজি, অর্গানিক, ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, ইলিমেন্টারি ফার্মাকোলজি, মেটেরিয়া মেডিকো, ফার্মাসি, ইলিমেন্টারি টক্সিকোলজিক্যাল কেমিস্ট্রি, ইলিমেন্টারি ফার্মাকোলজিক্যাল এবং কেমিস্ট্রি পড়ানো নিয়ে যথেষ্ট মনোনিবেশ করে। কমিটি মত দেয় যে, এগুলোর মধ্যে অর্গানিক এবং ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি ও বায়োকেমিস্ট্রির কিছু অংশ অনায়াসে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে পড়ানোর ব্যবস্থা করা যাবে। অন্য বিষয়গুলিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে পড়ানোর অনেক সুবিধা রয়েছে, তারপরও কমিটি মনে করে যে, যদি এটা করা হয়, তাহলে তা ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিল এর বিধিকে লঙ্ঘন করবে। উপরন্তু হাসপাতাল থেকে গবেষণাগার বেশি দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে কতগুলো অসুবিধা হবে। কমিটি এই বিষয়গুলো মেডিকেল কলেজ এলাকায় পড়ানোই যথাযথ এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাগার হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় জায়গা কিনে নিয়ে নির্মাণ করার পরামর্শ দেন। কোর্সের সময়কাল ও ভর্তির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের ১৯৩৭ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারির সিদ্ধান্ত *[পরিশিষ্ট দেখুন-৩]* অনুযায়ী হবে।[২০৮]

ছাত্রদের আবাসন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কমিটি পর্যালোচনা করে মন্তব্য করে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান যে ৪টি হল রয়েছে সেখানে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হবে। যতদিন পর্যন্ত

ছাত্রদের আবাসনের ব্যবস্থা না হয় ততদিন পর্যন্ত কলেজের নিকট থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য আপাতত মিটফোর্ড হাসপাতালের নিকট একটি ঘর ভাড়া করা যেতে পারে। তবে ভবিষ্যতে তাদের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণের বিষয় এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না। বর্তমানে মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের থাকার জন্য যে ধরনের ব্যবস্থা আছে, তেমনি ধরনের ব্যবস্থা কলেজের ছাত্রদের জন্য কলেজের কাছাকাছি করতে হবে।[২০৯]

কমিটি স্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে, ঢাকার সিভিল সার্জনকে মাসিক ৫০০ রুপি ভাতা দিয়ে সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করার সুপারিশ করে। মাসিক ২৫০ রুপি ভাতা দিয়ে একজন অধ্যাপককে কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার সুপারিশ করে। তিনি তার বিভাগের প্রধান হবেন এবং চিকিৎসা অনুষদের ডিন হবেন। প্রিন্সিপাল নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নের যোগ্যতা থাকতে হবে,[২১০]

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা।
২. উচ্চ ডিগ্রির অধিকারী যেমন, কলেজ অব মেডিসিনের সদস্য, অথবা রয়েল কলেজ অব সার্জন এর ফেলো অথবা অনুরূপ উঁচু শিক্ষাগত যোগ্যতা।
৩. প্রশাসনিক কাজের অভিজ্ঞতা।

হাসপাতালের জন্য সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি বোর্ড অব গভর্নরস থাকবে। এই বোর্ড/উপদেষ্টা কমিটি পূর্বের মতো কাজ পরিচালনা করবে।

কমিটি হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ব্যতীত অধ্যাপক, রীডার ও অন্যান্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপারিশ করে যে, এই পদগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন এবং স্টাটিউট এ বর্ণিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট স্টাটিউটটিতে উল্লেখ করা হয় যে, পদগুলি একটি নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে সুপারিশকৃত হতে হবে। এই নির্বাচন কমিটির গঠন সম্পর্কে স্টাটিউট ১৬ ধারায় বলা হয়, ভাইস চ্যান্সেলর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের একজন সদস্য, একাডেমিক কাউন্সিলের দুইজন সদস্য, একজন সরকারি কর্মকর্তা চ্যান্সেলর কর্তৃক নিয়োগকৃত সদস্যদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কমিটি গঠিত হবে।[২১১]

কমিটি প্রিন্সিপাল, অধ্যাপক, রিডার, প্রভাষক, শিক্ষক এবং অন্যান্য একাডেমিক কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে সুপারিশ করার জন্য মত দেয়। কমিটি আরো সুপারিশ করে যে, কলেজ ও হাসপাতালের অন্যান্য সকল পদে নিয়োগ গৃহীত বিধি অনুযায়ী করতে হবে। কমিটির মতে, হাসপাতালের জন্য ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট পদের কোনো দরকার নেই। তার স্থলে তিনজন রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার সুপারিশ করে, যেমন,

১. রেসিডেন্ট সার্জন
২. রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান
৩. প্রসুতি ও ধাত্রী বিভাগের জন্য রেসিডেন্ট সার্জন।[২১২]

এ ছাড়া একজন সেক্রেটারি থাকবেন, যিনি একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হিসাবরক্ষকও হবেন। হাসপাতাল পরিচালনার ক্ষেত্রে রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার পদটি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ, সে কারণে যিনি হাসপাতালের জুনিয়র ও সিনিয়র হাউজ চিকিৎসক এবং সম্ভব হলে যিনি হাসপাতালের রেজিস্ট্রারও ছিলেন এরকম অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই এই পদের জন্য নির্বাচন করতে হবে। বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসের বেতন স্কেল, সমপর্যায়ের সুবিধাসহ তিন বছরের জন্য তাকে নিয়োগ দেওয়া হবে।[২১৩]

কমিটি মত দেয় যে, কলকাতার মতো ঢাকার ডাক্তারদের জমজমাট প্রাকটিস করার মতো তেমন কোনো সুযোগ ছিল না, সে কারণে তাদের জন্য উঁচু হারের বেতন স্কেল সুপারিশ করে যাতে করে অত্যন্ত দক্ষ

একদল অধ্যাপক, শিক্ষক আকৃষ্ট হন এবং যাদের প্রতিভার কারণে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হবে। সকল শিক্ষক চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাবেন এবং প্রথমে দুইবছরের জন্য শিক্ষানবিশ থাকবেন। এ সময়ে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করলে তাকে তিন বছরের চুক্তিভিত্তিক চাকরি দেওয়া হবে, এরপর প্রতি পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিতে নিয়োগ নবায়ন করা হবে। মেডিসিনের অধ্যাপকগণের উঁচুমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে যেমন, এম. ডি. অথবা এম. আর. সি. পি.। সার্জারির অধ্যাপককে সার্জারিতে ফেলোশিপ বা মাস্টার ডিগ্রি থাকতে হবে, মিডওয়াইফারির জন্য এম. সি. ও. জি. এর ওপর ডিগ্রি এবং ফেলোশিপ থাকতে হবে। সকল অধ্যাপকগণেরই সন্তোষজনক শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।[২১৪]

মেডিকেল কলেজের জন্য উপযুক্ত একটি হাসপাতাল নিমার্ণের পরিকল্পনা করা হলে মিটফোর্ড হাসপাতালের সম্প্রসারণের মত দেন। ১৯৪০ সালে মিটফোর্ড হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ছিল ২৫১টি।[২১৫] এগুলোর মধ্যে,

সার্জিক্যাল শয্যা	৭৭টি
মেডিকেল শয্যা	৭৬টি
স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা শয্যা	২৮টি
সংক্রামক শয্যা	২৪টি
চক্ষু বিভাগ শয্যা	৪৬টি
মোট	২৫১টি শয্যা

মেডিকেল কলেজের জন্য এই সংখ্যার পরিমাণ নিম্নোক্তভাবে বৃদ্ধির সুপারিশ করে,[২১৬]

সার্জিক্যাল শয্যা	১২৫টি
মেডিকেল ও সংক্রামক শয্যা	১৩৫টি শয্যা
স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিভাগ	৬৮টি শয্যা
চক্ষু বিভাগ	৪৬টি শয্যা
মোট	৩৭৪টি শয্যা

ভারতীয় মেডিকেল কাউন্সিলের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক ছাত্রের জন্য মেডিকেল, সার্জিক্যাল, স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিভাগ এবং চক্ষু বিভাগে ক্লিনিক্যাল শিক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট শয্যা থাকার সিদ্ধান্ত হয়। যদি এই শয্যার সংস্থান করতে না পারে তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রিকে মেডিকেল কাউন্সিল স্বীকৃতি দিবে না।[২১৭] তাই কমিটি মিটফোর্ড হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধিসহ অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির সুপারিশ করে। এই কারণে ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি সচিব বাংলার গভর্নরের সচিবকে নতুন ভবন ও যন্ত্রপাতি আমদানি করার জন্য অবহিত করেন। [*পরিশিষ্ট দেখুন-৪*]

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের জন্য স্কুলের পাশেই ছোট একটা জায়গায় খেলার মাঠ রয়েছে। মাঠটি স্কুল থেকে পাঁচ মিনিট হাটার পথ এবং এর ছোট একটি প্যাভিলিয়ন রয়েছে। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানান যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার মধ্যে খেলার মাঠ পাওয়া যাবে, সেখানে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের বিনোদনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সুযোগসুবিধা রয়েছে। এই ব্যাপারটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বিবেচনা করে। এ ছাড়া কমিটি ছাত্রদের জন্য ক্যান্টিনসহ একটি কমনরুম এবং রিডিংরুম থাকতে হবে বলে সুপারিশ করে।[২১৮]

প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজের এবং সম্প্রসারিত হাসপাতালের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি খাতে অনাবর্তক এবং আবর্তক ব্যয় কত হতে পারে কমিটি এর ওপর বিস্তারিত পর্যালোচনা করে। কমিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভবন নির্মাণের জন্য আনুমানিক মোট

আবর্তকহীন খরচ দেখায় প্রায় ৬,৯৫,৫২০ রুপি এবং আসবাবপত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির খরচ ৯৪,০৯১ রুপি এবং বার্ষিক আবর্তক খরচ ধরা হয় ২,৯৯,১০০ রুপি।[২১৯]

কলেজের ক্ষেত্রে জমি গ্রহণ এবং ভবন নির্মাণের জন্য মোট আবর্তকহীন খরচ ৪,৮৮,০০০ রুপি, এবং আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির মূল্য ১,৭০,২৮৩ রুপি। বার্ষিক আবর্তক খরচ ১,১৫,২০৫ রুপি।[২২০] মোট আবর্তক এবং আবর্তকহীন খরচ নিম্নরূপ, [২২১]

আবর্তকহীন... ১৪,৪৭,৮৯৪ রুপি।

আবর্তক (বার্ষিক) .. ৪,১৪,৩০৫ রুপি।

কমিটি কিছু কিছু খাতে সেবা বাবদ অর্থ আদায়ের পরামর্শ দেয়। হাসপাতালে থাকা বিছানা ব্যবহার করা, অপারেশন, এক্স-রের জন্য সুনির্দিষ্ট ফি আরোপের জন্য কমিটি সুপারিশ করে। এজন্য কমিটি মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন খাতে কি পরিমাণ ফি ধার্য করা হবে তার তালিকা করে দেয়। কমিটি ধারণা করে যে, বিভিন্ন খাত থেকে হাসপাতালের বার্ষিক আয় হবে ৭৭,৬০০/- রুপি।[২২২] কমিটি হাসপাতাল ও কলেজের বিভিন্ন বিভাগের জন্য যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্রের একটি বিস্তারিত তালিকা প্রদান করে।

এ ছাড়া হাসপাতালের সম্প্রসারণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নতুন নতুন বিভিন্ন ভবন নির্মাণের বিষয়ে কমিটি একটি সাইট প্লান এবং লাইন প্লান প্রস্তুত করে এবং সুপারিশ করে যে, সরকারের যোগাযোগ ও পূর্ত বিভাগ যখন কাজ শুরু করবে তখন যেন এগুলোকে নির্দেশনা মনে করে তাদের রীতিসিদ্ধ প্লান ও ব্যয় অনুযায়ী কাজ শুরু করে।

বিশেষজ্ঞ কমিটির মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের কাজ যখন প্রায় শেষের দিকে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০) সমাবর্তন সভায় প্রস্তাবিত মেডিসিন অনুষদ গঠনের পরিকল্পনার কাজ যথেষ্ট অগ্রগতি এবং তা সরকারের নিকট প্রেরণের কথা উল্লেখ করেন। এ সময় তিনি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেন। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার মানকে সমৃদ্ধ করবে এবং ত্রুটি দূর করবে বলে মনে করেন।[২২৩]

দীর্ঘ দুইবছরের সময়, শ্রম, ও মেধা দিয়ে যে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়, তা কমিটি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি। প্রস্তাবিত কলেজ ও সম্প্রসারিত হাসপাতালের নানা দিক নিয়ে বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি জে.সি. ঘোষ বিরোধিতা করে তার 'Note of Dissent' দেন [*পরিশিষ্ট দেখুন*-৫]। তিনি বিরোধিতা করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বাস্তবায়নের মূল কৌশলকে। প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় একটি হাসপাতালের বিষয়ে মিটফোর্ড হাসপাতালকে কমিটির যেসব সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নির্বাচন করে জে.সি. ঘোষ তার বিরোধিতা করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, কমিটির সদস্যরা অনুধাবন করতে পারছেন না যে মিটফোর্ড হাসপাতালের বর্তমান (১৯৪০) সীমিত ও জনাকীর্ণ এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন করার অর্থ এর ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ বানচাল করে দেওয়া। তার মতে, এটি একটি ত্রুটিপূর্ণ ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত। তিনি এই স্থানে হাসপাতাল নির্বাচন করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর বিচক্ষণতা ও স্বপ্ন একদিন সত্য হয়। রমনায় পূর্ববাংলার প্রথম মেডিকেল কলেজ তথা ঢাকা মেডিকেল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সংকট

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর কারণে বাংলা তথা ভারত সরকার যুদ্ধ ব্যয়ের চাপের মুখে ছিল। শহরের বিভিন্ন জায়গায় আহতরা আশ্রয় নেয়। এ সময় সারা ঢাকা শহর গোরা সৈনিকে ভরে যায়। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আর যুদ্ধাহত সৈনিকদের সেবার জন্য অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে মিটফোর্ড হাসপাতাল ছাড়াও সামরিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি হয়। এ সময় তৎকালীন পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের সচিবালয় ভবনটিতে স্থাপিত হয় 'আমেরিকান বেস হাসপাতাল'। যুদ্ধ শেষ হলে মার্কিনিরা চলে গেলেও হাসপাতাল থেকে যায়। উল্লেখ্য যে, ১৯২১ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয় তখন এই ভবনটির কর্তৃত্ব পায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সে সময় বিশাল এই ভবনের একপাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা কেন্দ্র, একাংশে ছাত্রাবাস এবং বাকি অংশ ছিল কলা অনুষদের প্রশাসনিক শাখা।

যুদ্ধকালীন সময়ে ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রতিবেদনটি তেমন কোনো সাড়া জাগাতে পারেনি। কমিটির প্রতিবেদনের ওপর সরকারি মহলে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। এসব আলোচনায় কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যেমন, মেডিকেল কলেজটি কী একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হবে? হাসপাতালটি কি বিশ্ববিদ্যালয় না সরকারি তত্ত্বাবধানে থাকবে? এটি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকাল্টির অধীনে থাকবে? এমনি সব প্রশ্ন সরকারের উচ্চ পর্যায়ে করা হয়।

এই প্রসঙ্গে ঢাকার সিভিল সার্জন জি.বি. ডব্লিউ. ফিসার একটি খুব প্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, ঢাকা মেডিকেল স্কুল এবং মিটফোর্ড হাসপাতালের উন্নতি সাধনে ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় না করে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নতুন একটি কলেজ ও হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ হবে। উপরন্তু তিনি মন্তব্য করেন, কমিটি যে কেবলমাত্র ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার প্রস্তাব করেছে তা পূর্ববঙ্গের চাহিদার তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। সিভিল সার্জন আরো জানান যে, মিটফোর্ড হাসপাতালে সর্বোচ্চ ৩৭৪টি শয্যা স্থাপন করা যাবে। এর চেয়ে বেশি সম্প্রসারণ করা একেবারেই অসম্ভব। তিনি তাই অভিমত দেন যে, বিশেষজ্ঞ কমিটিতে জে. সি. ঘোষ যেভাবে বিষয়গুলি দূরদর্শিতার সাথে পর্যবেক্ষণ করার কথা বলেন, তা মেনে নেওয়া বিচক্ষণতার কাজ হবে।[২২৪] মেডিকেল বিভাগের সচিব উপরি-উক্ত মন্তব্যের একাংশের দ্বিমত প্রকাশ করে জানান যে, প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজটি চিকিৎসা অনুষদের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অঙ্গ হবে। এটি কখনই কলকাতা মেডিকেল কলেজের মতো রাষ্ট্রীয় কোনো প্রতিষ্ঠান হবে না।[২২৫]

মেডিকেল বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারাও নানা ধরণের মন্তব্য করেন। তারা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালটিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখার পক্ষে মত দেন। তাদের যুক্তি ছিল, বিশেষজ্ঞ কমিটির পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত মোট ব্যয়ের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেবল মূলধনের জন্য জগমোহন পাল বাবুর ৪ লক্ষ টাকা ছাড়া বাকি সব টাকা সরকারই দিবে। যদি সব টাকা সরকারকেই দিতে হয় তাহলে কলেজ ও হাসাপতালের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হস্তান্তরের কোনো যৌক্তিকতা নেই।[২২৬] কাজেই এর নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। এর ফলে সরকারি যে বিদ্যমান স্বাস্থ্য নীতিমালা রয়েছে তার সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

অপরদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই নীতি গ্রহণে অনেক আপত্তি ছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের অধীনে রেখে এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক লেখাপড়ার সাথে সম্পৃক্ত এবং উচ্চতর গবেষণাকর্মের একটি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চান। এমনি নানা ধরনের মতামতের ফলে মেডিকেল কলেজ প্রকল্পটি কোনো বিশেষ গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারেনি।

এদিকে রমেশচন্দ্র মজুমদার মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় সরকার কর্তৃক দ্রুত উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। জগমোহন পাল বাবুর উইলের অছিগণ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দানকৃত ৪ লক্ষ টাকা সুদ সমেত তাদেরকে ফেরত দেওয়ার জন্য তাঁকে ভীষণ চাপ দেন। ১৯৪২ সালের ৬ জানুয়ারি জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগের সচিব টি আই চৌধুরী কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গে ড. মজুমদারকে লিখেন, অছিগণ যে অভিযোগ করেছেন, এই ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি হয়নি, তা সম্পূর্ণ ঠিক নয় এবং সরকার এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি সরকার কর্তৃক পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করার জন্য বেশ সময়ের প্রয়োজন। তাই তিনি উপাচার্যকে অনুরোধ করেন তিনি যেন অছিগণকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন।[২২৭]

ফলশ্রুতিতে রাইটার্স বিল্ডিং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে তৎপর হয়ে ওঠেন। অতঃপর জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সরকার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী এস.কে. বসু বিষয়টি নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং তাঁর মন্ত্রণালয়কে জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ প্রদান করেন। ১৯৪০ এর দশকের পূর্বেই পূর্ববাংলা তথা ঢাকায় যখন একটি মেডিকল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য নানারকম চেষ্টা চলছিল তখন এরকম প্রচেষ্টা নয়া দিল্লিতেও লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৮ সালে ভারত সরকারের অধীনে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যে সম্মেলনে সমস্ত মেডিকেল স্কুলগুলিকে কলেজ রূপান্তরের সুপারিশ করা হয়। ফলে ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল একটি রেজুলেশন পাশ করে তাতে বলা হয় যে,

> That all medical schools should be abolished by 1947, its finding being based partly on the recommendation of conference (1938) mentioned above and partly on the repeated appeals made to it by licentiate Medical Associations. Since the 1938 conference eight been abolished or converted into colleges, but progress in this direction is slow and in the absence of provision of adequate funds, is likely to continue to be slow. [২২৮]

অর্থের অভাবে মেডিকেল স্কুলগুলোকে মেডিকেল কলেজে রূপান্তরের অগ্রগতি ধীর গতিতে হয়।

মেডিকেল স্কুলকে কলেজে রূপান্তরের প্রস্তাব বহাল ও পূর্ববাংলার জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ব্যাপারে স্থির হয় যে, বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রকল্প সংক্রান্ত সকল অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান করা, অর্থায়ন করা, বাস্তবায়নের পন্থা চূড়ান্ত করা এবং মন্ত্রী পরিষদের অনুমোদন লাভের প্রয়াসে একটি কনফারেন্স ডাকা। ১৯৪৩ সালের ৩ মার্চ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত কনফারেন্সে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য সচিব জনাব

নুরুন্নবী, সার্জন জেনারেল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য খান বাহাদুর ড. এম. হাসান (১৯৪২-১৯৪৮) এর উপস্থিতিতে বিষয়টির ওপর বিস্তারিত আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়। কিছু মৌলিক বিষয়ের ওপর আলোচনা হলেও ঢাকা মেডিকেল স্কুলকেই কলেজে রূপান্তরিত করার পূর্ব সিদ্ধান্ত বলবৎ রাখা হয়। এই নতুন কলেজের স্থান নির্বাচন করা হয় রমনায়। কলকাতা মেডিকেল কলেজ সম্প্রসারণে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেই একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি যাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে না হয় তাই এই স্থানটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সম্প্রসারনের জন্য আরো ভবন নির্মাণ, জমির দাম বৃদ্ধি এবং চাহিদা অনুযায়ী জমি না পাওয়ার আশংকা থাকায় রমনায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ স্থাপনে সকলে মত দেয়।[২২৯]

রমেশচন্দ্র মজুমদারের কার্যকালের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ তেমন এগোয়নি। তিনি ১৯৪২ সালের জুন মাসে উপাচার্যের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। মেডিসিন অনুষদ ও ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ প্রতিষ্ঠার কাজ তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টে বিদায়ী বক্তৃতা দেওয়ার সময় দুঃখ প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ স্থগিত করা হয়। অথচ এই অঞ্চলে উচ্চতর চিকিৎসাশিক্ষা ও চিকিৎসা প্রবর্তনের পাশাপাশি প্রযুক্তিগত উচ্চশিক্ষা জরুরি ছিল। তাই পরিকল্পনা স্থগিত করার পরিবর্তে যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট সংকট দূর করার জন্য আহ্বান জানান।[২৩০] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে রমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তবে পূর্ণ সফলতা আনতে পারেননি। তিনি চিকিৎসা, কৃষি, প্রকৌশল অনুষদ স্থাপনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের আগেই তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়।

এদিকে কনফারেন্সে জগমোহন পাল বাবুর দানকৃত অর্থ ফেরত দেওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ইতিমধ্যে দাতার উত্তরাধিকারীরা দুইটি দেওয়ানি মামলা রুজু করে। আশু কোনো ব্যবস্থা না নিলে বিশ্ববিদ্যালয় ৪ লক্ষ টাকা হারাবে। তাই এই ক্ষতি এড়ানোর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ড. এম. হাসান (১৯৪২-৪৮) পরামর্শ দেন যে, যদি প্রস্তাবিত কলেজের জন্য অবিলম্বে একটি জায়গা নির্বাচন করা হয় এবং সেই জায়গা অধিগ্রহণ করা যায় তাহলে দিওয়ানি মামলা ব্যর্থ হতে পারে অথবা মামলা তুলে নিতে পারে। অতএব বিস্তারিত আলোচনার পর কনফারেন্সে নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়,[২৩১]

১. অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে এবং মন্ত্রি পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে যুদ্ধজনিত জরুরি অবস্থার অবসানের পর ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ যত শীঘ্র সম্ভব স্থাপন করা হবে।
২. মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার জন্য রমনায় একটি স্থান নির্বাচন করা হবে ও জায়গাটি অধিগ্রহণ করার জন্য অবিলম্বে কাজ শুরু করতে হবে।
৩. জগমোহন পাল বাবুর উত্তরাধিকারীদের মামলা তুলে নেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এই ব্যাপারে অনুরোধ জানাবেন।

কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা স্থগিত হয়। ঢাকা শহর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর অনেকগুলি ভবন সামরিক বাহিনীর বাসস্থান অথবা অস্থায়ী হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের ভীষণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। ঢাকা শহর নিরাপত্তা ও খাদ্য

সংকটে পড়ে। জনসাধারণের মনে ভীতি সৃষ্টি হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব ছিল না।

এ সময়েই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যেমন, প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজের ওপর কার নিয়ন্ত্রণ থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় না সরকারের। এই ব্যাপারে সরকারি আমলা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব হয়। ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করার জন্য ১৯৪৫ সালে সরকার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য ড. এম. হাসান (১৯৪২-১৯৪৮) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য আহমেদ ফজলুর রহমান (১৯৩৪-১৯৩৬) তাঁদের মনোভাব পরিবর্তন করেন। ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হোক এটাই ছিল তাদের একমাত্র দাবি। কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে ব্যাপারটি নিয়ে আর তারা আপত্তি জানাননি।[২৩২]

বৈঠকে আরো কয়েকটি সমঝোতা হয়। কলেজের প্রিন্সিপালকে সহায়তা করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট প্রতিনিধি থাকবে। অধ্যাপক ও অন্যান্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গুণগতমান সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে। অধ্যাপক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে পি.এস.সি. এর মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি থাকবেন। নির্বাচিত অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সমপর্যায়ের পদমর্যাদা দেওয়া হবে, ঠিক যেমন এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট এ দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় একটি চিকিৎসা অনুষদ প্রতিষ্ঠা করবে। তবে এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন এর কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হবে।[২৩৩]

এ সকল সমঝোতার ফলে দীর্ঘ সময় ধরে ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা নিয়ে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে টানাপোড়ন চলছিল তার প্রায় সবটারই অবসান হয়। এর ফলে ঢাকা মেডিকেল কলেজকে একটি সরকারি কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসব অমীমাংসিত বিষয়গুলির সমাধান করা সম্ভব হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ফজলুর রহমান এর সহযোগিতামূলক মনোভাবের কারণে। এই ব্যাপারে ১৯৪৪-৪৫ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে লিপিবদ্ধ করা হয়,

> The scheme for the establishment of a Medical College at the University which has been before the University for several years, has at last received the attention of Government and it is hoped that the College will be established before long. Negotiations are in progress between the Government and the University about the starting of the College. [২৩৪]

সমঝোতা হলেও যুদ্ধকালীন সময়ে সরকারের পক্ষে ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য বিরাট অংকের টাকা ব্যয় করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে কয়েকটি কাজ চিহ্নিত করা হয়, যেমন, ভবন নির্মাণ, ছাত্র সংখ্যা। এই বিষয়গুলি উপরি-উক্ত বৈঠকে আলোচিত হয়। অবশেষে বিস্তারিত আলোচনার পরে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, [২৩৫]

ক) পুরাতন সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংটিকে ৫০০ শয্যার একটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হবে এবং এরই আশেপাশে প্রস্তাবিত মেডিকেল কলেজ, নার্সদের কোয়ার্টার ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে।

খ) সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংটি নিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘পুরানো সাদা গভর্নমেন্ট হাউজ’ এবং ঐ ক্যাম্পাসে বিদ্যমান সকল ভবন দিয়ে দেবে।

গ) ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজকে ঢাকা শহরের বিদ্যমান অন্য কোনো ভবনে স্থানান্তর করা হবে অথবা এর জন্য শহরের কোনো উপযোগী এলাকায় নির্দিষ্ট করে একটি নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে।

ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সবরকম প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন তখন কেবল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের অপেক্ষায় থাকা। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ১৪ আগস্ট বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ব্রিটিশ সরকার একই সাথে উপমহাদেশের ঢাকা, করাচি এবং মাদ্রাজে তিনটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন।[২৩৬] তবে যুদ্ধাবসানের পর ঢাকা তথা পূর্ববাংলা উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসন বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধকালীন রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে উপমহাদেশ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে চলে। সেই সাথে বয়ে এনেছিল সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা, দাঙ্গা হাঙ্গমা আর হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক প্রতিহিংসামূলক আচরণ।

এমনি এক অস্থিতিশীল পরিবেশেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঢাকাতে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালান। ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তারা থাকতে থাকতেই বিষয়টি চূড়ান্ত করে নেওয়া উচিত বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে। অন্যথা তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে এই আশংকা ছিল।

যুদ্ধাবসানের সাথে সাথেই কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে সরকারের সাথে যোগাযোগ শুরু করে এবং পূর্বের সমঝোতা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করতে শুরু করে। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেডিকেল কলেজ, নার্সদের কোয়ার্টার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার জন্য পুরানো সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং এবং এর আশেপাশের এলাকা স্বল্প সময়ের মধ্যেই সরকারের কাছে হস্তান্তর করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ও প্রাক্তন প্রিন্সিপাল মীর্জা মাজহারুল ইসলাম (১৯২৭-২০২০), ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলেন ‘ইতিহাসের অধ্যাপক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন সময়ে একটি রেজুলেশন নেওয়া হয়। ১৯৩৯ সালে সেই রেজুলেশনটা গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল দিল্লিতে পাঠায়। এ সময় ব্রিটিশ সরকার ভোর কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তিনটি মেডিকেল কলেজ করার চিন্তা করেন। ১৯৪৩ সালে স্যার জোসেফ উইলিয়াম ভোর (Sir Joshef William Bhore, 1878-1960)-কে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ‘ভোর কমিটি’ নামে পরিচিত ছিল’।[২৩৭] এই কমিটির নাম ভোর কমিটি বলা হলেও মূল নাম ছিল ‘দ্য হেলথ সার্ভে এন্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি’। ২৫ সদস্য বিশিষ্ট [*পরিশিষ্ট দেখুন*-৭] এই কমিটি ১৯৪৬ সালে তাদের রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন করা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই কমিটি যখন তার কাজ শুরু করে তখন তারা কিছু বিষয় চিহ্নিত করে এবং সেই অনুযায়ী সমস্যার সমাধান দেওয়ার দিক নির্দেশনা দেয়। এর মধ্যে অন্যতম সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক। এ ক্ষেত্রে কমিটি কিছু নির্দেশনা দেয়। অদূরদর্শী পরিকল্পনা যা বাস্তবায়ন অসম্ভব এবং স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নে কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারে না ও ব্যয়ের চেয়ে অলাভজনক পরিকল্পনা এড়িয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন।[২৩৮]

শল্য চিকিৎসক মীর্জা মাজহারুল ইসলাম (১৯২৭-২০২০) এর মতে, এই কমিটিই ঢাকা, করাচি এবং মাদ্রাজে তিনটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হলে তারা আবার এই বিষয়টা হাতে নেয় এবং ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।[২৩৯] তিনি তিনটি মেডিকেল কলেজের কথা উল্লেখ করলেও 'ভোর কমিটি' সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান মেডিকেল কলেজের উন্নয়ন, মেডিকেল স্কুলগুলোকে কলেজে রূপান্তর এবং নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সুপারিশ করেন।[২৪০] উপরি-উক্ত সুপারিশ অনুযায়ী দেখা যায় যে, এই কমিটি নিম্নের মেডিকেল স্কুলগুলোকে মেডিকেল কলেজে রূপান্তরের প্রস্তাব করে,[২৪১]

১. পুনা মেডিকেল স্কুল
২. আহমেদাবাদ মেডিকেল স্কুল
৩. দ্বারভাঙ্গা মেডিকেল স্কুল
৪. ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল
৫. কলকাতা মেডিকেল স্কুল
৬. ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল
৭. ঢাকা মেডিকেল স্কুল
৮. জলপাইগুড়ি মেডিকেল স্কুল
৯. নাগপুর মেডিকেল স্কুল
১০. মেডিকেল স্কুল, বেঙ্গালোর (মাইসূর)
১১. দ্য ইনডোর মেডিকেল স্কুল, (কেন্দ্রীয় ভারত ও রাজপুতানা রাজ্য)।

অপরদিকে নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষমতার ভিন্নতার মাত্রাকে তথা জনসংখ্যা, সম্পদ, অগ্রগতিকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। তবে তারা এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিলেও চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করা হবে না বলে উল্লেখ করে। তাদের কাছে যে তথ্যটি সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত বলে মনে হবে সেটিকেই তারা কার্যকর করবে। এই বিষয়টি প্রদেশ ও রাজ্যের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয়। যেমন, মাদ্রাজে ৪টি মেডিকেল কলেজ থাকলেও এবং কোনো মেডিকেল স্কুলকে রূপান্তর না করা হলেও আগামী ১০ বছরের মধ্যে আরো মেডিকেল কলেজ স্থাপন করে একটি অবস্থানে যাওয়ার সুপারিশ করে, যাতে সমগ্র প্রদেশে চিকিৎসার নতুন সুযোগসুবিধা ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে বেঙ্গল প্রদেশের ক্ষেত্রে তারা যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করে তা হলো,

> In addition to those metropolitan colleges, we recommend that in the province of Bengal, colleges should be established at Dacca, Burdwan, and Jalpaiguri.[২৪২]

তাছাড়া বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক পর্যন্ত সমগ্র ভারতে পর্যাপ্ত ডাক্তার ছিল না। ১৯৪৩ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতে তখন ৪৭,৪০০ জন ডাক্তার ছিল।[২৪৩] অতএব ৬৪০০ জনের জন্য মাত্র একজন ডাক্তার ছিল। ফলে ডাক্তারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছিল তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিশ্বযুদ্ধের অবসান হলেও চারদিকে রাজনৈতিক অরাজকতা ও অশান্ত অবস্থা বিরাজ করছিল। সরকার এরকম অবস্থার মধ্যেও এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে দ্বিধা করেননি। ১৯৪৬ সালে ১৭ জানুয়ারি বাংলার গভর্নর স্যার আর. জি. ক্যাসি (১৯৪৪-১৯৪৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বক্তৃতায় ঢাকায় খুব শীঘ্রই

একটি মেডিকেল কলেজ এবং পাঁচশত এরও বেশি শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে জানান।[২৪৪] রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকলে পূর্ববাংলার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এ দিকে গ্রামবাংলায় লাইসেন্সিয়েট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি (এল. এম. এফ) ডাক্তার বেশি প্রয়োজন, সেই কারণে ঢাকা মেডিকেল স্কুল বিলুপ্তির বিরুদ্ধে জোর বিরোধিতা শুরু হয়। অন্যদিকে সমগ্র পূর্ববাংলার জনগণ বিশেষ করে মুসলমান রাজনীতিবিদদের মধ্যে ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি অব্যাহত থাকে। এমনি অবস্থায় ১৯৪৬ সালের জুন মাসে ঘোষণা করা হয়, ১লা জুলাই থেকে ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত করা হবে এবং প্রথম বছর ১০০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। এই ব্যাপারে *ঢাকা প্রকাশ* প্রকাশ উল্লেখ করে যে,

> আগামী ১৯৪৬ সালের জুলাই মাস হইতে ঢাকা মেডিকেল স্কুলকে মেডিকেল কলেজে পরিণত করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।[২৪৫]

ঘোষণার পরপরই বলা হয় অনতিবিলম্বে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক নিয়োগ করা হবে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকার সিভিল সার্জন মেজর ডাক্তার ডব্লিউ. জে. ভারজিনকে (১৯৪৬-১৯৪৭) ১৯৪৬ সালের ১ জুলাই থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

অবশেষে বহু আকাঙ্খিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে, খুশি হয়, তা ১৯৪৫-৪৬ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণীতে* উল্লেখ করা হয়,

> The most outstanding event of the year under review is the starting of the Dacca Medical College as from July 1946. The College is a Government institution but in all academic matters, it will be under the University. The University has already constituted a Faculty of Medicine for the purpose. It should be remembered in this connection that the college owes its origin to the execution of the Estate of late Mr. Jagmohan Pal who gave a strong impetus to the idea of starting a medical college by making a princely donation of Rs. 4 lacs and odd for this purpose. [২৪৬]

একই বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়, পর্যালোচিত সময়ে (১৯৪৫-৪৬) কলা, বিজ্ঞান ও আইন অনুষদকে পুর্নগঠন করা হয় এবং নতুন অনুষদ তথা মেডিসিন অনুষদ চালু করার জন্য সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়। নতুন মেডিসিন অনুষদটি ১৯৪৬ সালের জুলাই থেকে কার্যকর হবে, উল্লেখ করা হয়।[২৪৭]

পূর্ববাংলার জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পুরো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভবন সরকারের কাছে হস্তান্তরে সম্মত হয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের জন্য নতুন নতুন ভবন নির্মাণ সরকারি ব্যয়ে নির্মিত হওয়ার আশ্বাস দেন। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে যায়।[২৪৮]

ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও এর অগ্রযাত্রা তেমন সন্তোষজনক হয়নি। একদিকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি অন্যদিকে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা শুরু হয়। অতীতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই মেডিকেল স্কুলকে কলেজে রূপান্তরের কথা থাকলেও এটা নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ঢাকা ছাড়াও পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং সরকারকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য বলা হয়। ইংরেজ শাসকবর্গ দেশ পরিত্যাগের দ্বারপ্রান্তে এসে কোনো জটিল সিদ্ধান্ত নিতে আর আগ্রহ প্রকাশ করেনি। উপরন্তু সরকারের নীতিনির্ধারকদের বেশিরভাগই এই স্কুলটিকে স্ব-অবস্থানে ধরে রাখার পক্ষে ছিলেন। তাই স্কুলটিকে কলেজে রূপান্তর করা হয়নি এবং

ঢাকা মেডিকেল কলেজ পূর্ববাংলার নতুন ও প্রথম একটি মেডিকেল কলেজ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দেশ বিভাগের চারদিন আগে *ঢাকা প্রকাশ* জানায়, 'সম্প্রতি ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, দেশের বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার বিবেচনায় গভর্নমেন্ট এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, ঢাকা মেডিকেল স্কুলটি বর্তমানে তুলিয়া দেওয়া হইবে না। স্কুলের প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতে এই বৎসর ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হইবে।'[২৪৯] এভাবেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলা তথা ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে প্রায় ১০০ বছরেরও বেশি সময় লেগে যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারত সরকার প্রথমদিকে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার, প্রশাসনিক সংস্কার ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিল। পূর্ববাংলার দিকে তেমন নজর দেয়নি। অন্যদিকে পূর্ববাংলার অধিকাংশ জনসাধারণ অশিক্ষিত হওয়ায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিক্ষকের অভাব না হলেও ছাত্র পাওয়া কঠিন হবে, এই ভেবে ভারত সরকার এই অঞ্চলে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। উপরন্তু কলকাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার উন্নয়নের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। যে কারণে জনস্বাস্থ্যগত উন্নয়নে বরাবরই কলকাতা গুরুত্ব পায়। পরবর্তীতে ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হলে তা অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে এই সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। এ ছাড়া সরকারের নীতিনির্ধারকরা সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করে। অর্থনৈতিক সংকট ছাড়াও ছিল রাজনৈতিক অসহিষ্ণু পরিবেশ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং সর্বোপরি ভারত উপমহাদেশের বিভাজন প্রক্রিয়ার সূচনা। মূলত, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কারণে ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ বিলম্ব হলেও বিশেষত অর্থনৈতিক সংকটের কারণেই এটি প্রতিষ্ঠিত হতে দেরি হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র ও প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ডা. মীর্জা মাজহারুল ইসলামও বলেন, 'অর্থনৈতিক সংকটের কারণেই ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লেগেছিল'।[২৫০]

তথ্যনির্দেশ

১. K. Park, *Preventive and Social Medicine,* 17th Edition, M/S Banarsidas Bhanot Publisher, India, 2003, p. 8.

২. 'In contemporary usage social medicine has two meanings, one broad and ill defined, the other more restricted and precise. In the broad sense, social medicine is an expression of the humanitarian tradition in medicine and people read into it any interpretation consistent with their own aspirations and interests. Thus it may be identified with care of patients, prevention of disease, administration of medical services; indeed, with almost any subject of the extensive field of health and welfare. But in the more restricted sense, social medicine is concerned with a body of knowledge embodied in epidemiology and the study of the medical needs or medical care of society.' দেখুন, K. Park, *পূর্বোক্ত,* p. 7.

৩. ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত,* শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ.১।

৪. ড. নীরদ বরণ পাল, *উনবিংশ ও বিংশ শতকে বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদ চর্চা,* সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা ২০১১, পৃ. ভূমিকা, পৃ. দ।

৫. সুব্রত পাহাড়ী, *আধুনিক বাংলায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা*, রচয়িতা, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১।

৬. ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *পূর্বোক্ত,* পৃ.১।

৭. সুব্রত পাহাড়ী, *উনিশ শতকের বাংলায় সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থা স্বরূপ,* ১৯৯৭, পৃ. ১২৫।

৮. Lt. Colonel D.G Crawford, *A History of the Indian Medical Service* 1600-1913, Vol. II Calcutta and Simla Thacker Spink and Co. 1914, p. 391.

৯. Mark Harrison, *Public health in British India: Anglo-Indian preventive medicine* 1859-1914, Cambridge University Press, 1994, p. 8.

১০. N.K, Sinha (ed.), *The History of Bengal* 1757-1905, Calcutta University Press, Calcutta, 1967, pp. 80-81.

১১. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৮৮।

১২. *ঐ*, পৃ. ১৮২।

১৩. Mark Harrison, *পূর্বোক্ত,* p. 38.

১৪. ঐ, p. 39.

১৫. ইফতেখার ইকবাল, 'পরিবেশ ও সংস্কৃতি' কে. এম. মোহসীন, শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত) *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৪, সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৭।

১৬. 'The Bengal Medical Service first came into existence from 1st January 1764, under the orders of the Home Department, Public Proceedings, dated 20th October 1763; the medical officers who were then serving, as independent units, in Bengal, being combined into a service of their own, with definite rank, pay and promotion. …. The last appointments to this service were made on 29th July 1896.' দেখুন, Major D.G Crawford (Civil Surgeon, Hughli, I.M.S), `Notes on the History of the Bengal Medical Service' *The Indian Medical Gazette,* January 1901, p. 1.

১৭. Mark Harrison, *পূর্বোক্ত,* p. 7.

১৮. ঐ

১৯. ঐ

২০. ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ক্র্যাফোর্ড উল্লেখ করেন, 'The present time is the more suitable, as the three independent services of Bengal, Madras, and Bombay, after a separate existence of 133 years, came to an end, as independent services or " establishments" in 1896…. From this date all medical officers admitted to the Indian Medical Service have been placed on one list under that name, being posted to the four different commands of the Indian Army; all, however, being liable to service in any command, as they may be required. The old Bengal service was, therefore, sub-divided into two branches, Bengal and Punjab, both of which were amalgamated with the Madras and Bombay services, from the beginning of 1897, the 28th January 1897 being the date of the first commissions conferred after the union. The names

of those officers who had entered the three separate services,' prior to 1897, still remain on three separate lists for promotion, and probably the last of them will not have disappeared from the Army List until at least another thirty years have elapsed.' দেখুন, Major D.G Crawford (Civil Surgeon, Hughli, I.M.S), `Notes on the History of the Bengal Medical Service' *The Indian Medical Gazette,* January 1901, p. 1.

২১. Lt. Colonel D.G Crawford, *পূর্বোক্ত*, 45.

২২. *ঐ*, p. 350.

২৩. *ঐ*, p. 325.

২৪. Mark Harrison, *পূর্বোক্ত*, p. 7.

২৫. *Annual Report on the Administration of the Bengal Presidency for* 1863-64, p. 110, উদ্বৃত, ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১।

২৬. 'The C.G of 18th Oct, 1792, notifies that it is intended to institute a hospital for natives, The same paper, on 1st Nov, 1792, states that a meeting had been held, at which it was determined (1) to institute a hospital for natives; (2) to vest the management in an equal number of European and Native Governors, residents of Calcutta, (3) to appoint a committee to raise subscriptions and prepare a plan.' দেখুন, D.G. Crawford, *পূর্বোক্ত*, p. 425.

২৭. Rev. James Hough, *The History of Christianity in India*, Vol.IV, London, 1845, pp. 61-62.

২৮. *The Calcutta Review*, Vol. XII, Jan-Jun, 1854, p. 329.

২৯. কাজী এহতেশাম, 'স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি', কে. এম. মোহসীন, শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত* পৃ. ৪৫৪।

৩০. Mark Harrison, *পূর্বোক্ত*, p. 7.

৩১. *Mark Harrison, 'Tropical medicine in Nineteenth - Century India', The British Journal for the History of Science,* Vol.25, 1992, pp. 299-318 এবং Mark Harrison *পূর্বোক্ত,* p. 7.

৩২. Mark Harrison, *পূর্বোক্ত*, p. 7.

৩৩. W.J. Buchanan, 'Introduction and Spread of Western Medical Science in India', *Calcutta Review*, Vol. Nil, No. 278, 1914, p. 431. এবং *The Indian Medical Gazettee,* 1901, p.1.

৩৪. ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫-১৭।

৩৫. ওয়ারেন হেস্টিংস ব্যাখ্যা দেন 'Two important advantages seemed derivable from such an establishment, the first to the British name and nation in its tendency towards endearing our Government to the native Hindoos by our exceeding in our attention towards them and their systems, the care shewn even by their own native princes; for `altho` Learning has ever been cultivated at Benares, in numerous private seminaries... The 2nd Principal advantage that may be derived from this institution will be felt in it effects, more immediately, by the natives, tho′ not without being participated in by the British subjects, who are the rule over them, by preserving and disseminating a knowledge of the Hindoo Law, and Proving a Nursery of future Doctors and Expounders thereof to assist the European Judge in the due regular, and uniform administration of its genuine Letter and spirit to the body of the people'. দেখুন, Lynn Zastoupil, and Martin Moir (Ed.), *The Great Indian Education Debate: Documents Relating to the Orientalist Anglicist Controversy,* 1781–1843, Curzon Press, London, 1999, p. 78. উদ্ধৃত, Mahmut Cihat Izgi, A Cultural Project of Control: The Foundation of Calcutta Madrassa and the Benares Sanskrit College in India, *The Journal of Social and Cultural Studies,* Vol. 1, Issue-2, Year 2015, p. 98.

৩৬. Mahmut Cihat Izgi, A Cultural Project of Control: The Foundation of Calcutta Madrassa and the Benares Sanskrit College in India, *The Journal of Social and Cultural Studies,* Vol. 1, Issue-2, Year 2015, p. 100.

৩৭. *ঐ*

৩৮. *ঐ*

৩৯. 'The East India Company Act of 1813 provided that any surplus of funds may be spent for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants.' দেখুন, M.R Paranjpe, *A Source Book of Modern Indian Education*, Macmillan, London, 1938 উদ্ধৃত, Mel Gorman,

'Introduction of Western Science into Colonial India: Role of the Calcutta Medical College', *Proceedings of the American Philosophical Society,* Vol. 132, No. 3, September 1988, pp. 278.

৪০. The Beginning of English Education in India, The Article shared by Simran S., www.ArticleLibrary.

৪১. Mel Gorman, 'Introduction of Western Science into Colonial India: Role of the Calcutta Medical College', *Proceedings of the American Philosophical Society,* Vol. 132, No. 3, September 1988, pp. 278.

৪২. *ঐ*

৪৩. ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫।

৪৪. *বঙ্গশ্রী*, জৈষ্ঠ, ১৩৪২, পৃ: ৫৬৮।

৪৫. ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৬-৭।

৪৬. *The Quarterly Oriental Magazine* Vol.VI. July-December, 1826, p. cxv, উদ্ধৃত ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৪।

৪৭. ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪-১৫।

৪৮. রাজা রামমোহন রায় ব্রেটন এর প্রশংসা করে বলেন, 'Ailing as I have been, I have perused with great pleasure the tracts you kindly sent me; and while reading them, I could not help anticipating the blessings which these and similar publications are calculated to bestow upon the Natives of this part of the globe; since they contain real facts, established by experience, and not mere speculations, supported only by prejudice and opinion. I hope and pray that your exertions may be crowned with success'. দেখুন *The Oriental Herald and Journal of General Literature,* Vol. X, July to Sept 1826, p. 21.

৪৯. রাধাকান্ত দেব ব্রেটন এর প্রশংসা করে বলেন, 'I have (he says in a latter to Dr. Breton) attentively perused the work (on cholera), and find the observations, symptoms and remedies of the dreadful malady contained in it to be very wise, proper, beneficial, and effectual. I shall introduce and recommend your advice and medicine both here and in the interior, and the human lives which will thereby be saved will, I trust, be an ample reward for the trouble you have taken, and the expense incurred in publishing and circulating the pamphlet gratuitously'. দেখুন *The Oriental Herald and Journal of General Literature,* Vol. X, July to Sept 1826, p. 21.

৫০. ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১৭।

৫১. *ঐ*

৫২. *ঐ*, পৃ. ২৪।

৫৩. *ঐ*, পৃ. ৩৩।

৫৪. *ঐ*, পৃ. ৪৩।

৫৫. *ঐ*, পৃ. ৫৬।

৫৬. এ ব্যাপারে গৌরি বিশ্বনাথান তাঁর *Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in India* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, 'The amazingly young history of English literature as a subject of study (it is less than a hundred and fifty years old) is frequently noted, but less appreciated is the irony that English literature appeared as a subject in the curriculum of the colonies long before it was institutionalized in the home country. As early as the 1820's, when the classical curriculum still reigned supreme in England despite the strenuous efforts of some concerned critics to loosen its hold, English as the study of culture and not simply the study of language had already found a secure place in the British Curriculum.' দেখুন, Gauri Viswanathan, *Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in India,* Oxford University Press, USA, 1998, p. 2-3.

৫৭. 'Of all the sciences studied by the Asiatics, that of anatomy and medicine is the least understood and cultivated; and therefore in India, it is universally admitted that the Government could not have established and institution calculated to be of greater public benefit, not only to the civil and military branches of the service, but to the natives generally, than the native medical institution. The knowledge which the natives at present possess of anatomy borders on nonentity and their skill in physic is not far above their anatomical knowledge.' দেখুন, *The Polar Star of Entertainment and Popular Science etc.,* Vol-1, London 1829 p. 90 উদ্ধৃত ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৫৮।

৫৮. H. H. Wilson, 'On the Medical and Surgical Sciences of Hindus', *Quarterly Oriental Magazine, Review and Register,* 1823 pp. 207-12. উদ্ধৃত, Mel Gorman, *পূর্বোক্ত*, p. 279.

৫৯. *ঐ*, p. 279.

৬০. Charles E. Trevelyan, *On the Education of the People of India,* Longman, Brown, Green and Longmans, London, 1838, pp. 28-29. 391.

৬১. Mel Gorman, *পূর্বোক্ত*, p. 279.

৬২. ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৪৬।

৬৩. Mel Gorman, *পূর্বোক্ত*, p. 279.

৬৪. *ঐ*

৬৫. *ঐ*

৬৬. *ঐ*

৬৭. *Heritage*, Medical College Hospital Kolkata West Bengal India, https: web.archive.org.

৬৮. J. A Richey, *Book Reviews Selections from Educational Records 1839-1859,* Superintendent Government Printing, Calcutta, 1922, p. 312-23. উদ্ধৃত, Mel Gorman, *পূর্বোক্ত*, p. 280.

৬৯. রাজা রামমোহন রায় তিনি সরকারকে অনুরোধ করেন, ...'To promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, national philosophy, chemistry and anatomy ... by employing a few gentlemen of talents ... educated in Europe, and providing a college furnished with the necessary books, instruments and other apparatus'. দেখুন, Roy to Governor General William Pitt, Lord Amherst, 11 December 1823, Reprinted in Upendra Ball, *Rammohun Roy,* U Ray and Sons, Calcutta, 1933, p. 168. উদ্ধৃত, Mel Gorman, *পূর্বোক্ত*, p. 281.

৭০. *Indian Journal of Medical Science*, Vol. I, No. 2, February 1834, p. 63. আরো দেখুন, ডাক্তার ক্যামেরন এর 'বঙ্গদেশে বসন্ত টিকার বর্তমান অবস্থা' নামক রিপোর্টে 'ভারতীয় টিকা ও বসন্ত রোগ' শীর্ষক রাধাকান্ত দেব এর দুইখানি পত্র স্থান পাইয়াছিল, *প্রবাসী*, ২৯শ ভাগ, ২য় খন্ড, ১৩৩৬, পৃ. ৮১।

৭১. Mahmut Cihat Izgi, *পূর্বোক্ত*, p. 97.

৭২. 'Sixty-One Years of Dhaka Medical College Present and Past', *DMC Day Celebration,* 2007, 10 July, Dhaka Medical College Alumni Trust, 2007, p. 24.

৭৩. Biswamoy Pati and Mark Harrison, *The Social History of Health and Medicine in Colonial India,* Routledge Studies in South Asian History, London and New York, 2009, p. 4.

৭৪. 'Essay on Kustha, or leprosy, as known to the Hindus' by Horace Hayman Wilson, Esq. Surgeon Bengal Establishment, Presented 3 May 1823,
'On the Exhibition of Phosphorus in colera Morbus' by John Adam (Asst. Surgeon, General Hospital, Calcutta.
'Notice of Oil found in the Human Blood' by John Adam, MD
'On the Madar and its Medical uses' by George playfair, Esq. Surgeon Garrison of Chunar, Bengal.
'Medical Sketch of Topography of the Chittagong District and Sickness Prevailing among the Troops in that quarter' by Adam Macdougal, M.D. Asst. Surgeon, Bengal, N.I, দেখুন, *TRANSACTIONS OF THE MEDICAL AND PHYSICAL SOCIETY OF CALCUTTA*, VOLUME THE FIRST, PRINTED FOR MESSRS. THACKER AND CO. ST. ANDREW'S LIBRARY, CALCUTTA: 1825, pp, XXIII-XXV, আরো দেখুন, *The Calcutta Journal of Medicine (1868), The Calcutta Monthly Journal (1836). Journal of the Calcutta Medical and Physical Society (1837), the India Journal of Medical Science (1834), The Calcutta Journal of Natural History and Miscellany of the Arts and Science in India (1841).*

৭৫. Percival Spear, *A History of India,* Pinguin Books, Baltimore, 1965, p. 162. উদ্ধৃত, Mel Gorman, *পূর্বোক্ত*, pp. 280-81.

৭৬. Mark Harrison, তাঁর *Public health in British India: Anglo-Indian preventive medicine 1859-1914* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়, 'During the cholera epidemic which swept northern India in 1867, European troops experienced a cholera mortality rate of almost 14 per 1,000, whereas Indian troops died at the far lower rate of 3 per 1,000. In fact, the death-rate from all diseases except fever was lower among Indian troops than among Europeans.

... 1870 the military authorities acknowledged that there was a strong link between the spread of cholera and water supplies. In 1877 the commander-in-chief of the British Army in India, Major-General F. Roberts, issued orders for the prevention of cholera which stressed that 'the utmost attention must be paid to the drinking water' and that temporary wells should be sunk if necessary during a cholera epidemic'. দেখুন, Mark Harrison, *পূর্বোক্ত*, pp. 66-68.

৭৭. Biswamoy Pati and Mark Harrison, *পূর্বোক্ত*, p. 2.

৭৮. *ঐ*, p. 32.

৭৯. *ঐ*

৮০. *ঐ*

৮১. *ঐ*

৮২. *ঐ*, p. 2.

৮৩. *ঐ*, p. 36.

৮৪. *ঐ*

৮৫. *ঐ*, p. 2.

৮৬. *Report of the Census of Bengal* 1872, The Bengal Secretariat Press, 1872, p. XXXIII.

৮৭. *Report of the Health Survey and Development Committee,* Vol: I, Survey, The Manager Government of India Press, New Delhi, 1946, p. 358.

৮৮. James Taylor, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca,* Vol. 11, Military Orphan Press, Calcutta 1840, p. 356.

৮৯. ঐ, p. 76

৯০. B. C. Allen, *Eastern Bengal District Gazetteers Dacca,* The Pioneer Press, Allahabad 1912, p. 75-76 .

৯১. ঐ

৯২. ঐ

৯৩. ঐ

৯৪. ঐ

৯৫. ঐ

৯৬. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস, ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ. ১৯২।

৯৭. ঐ, পৃ. ১৯৩।

৯৮. Muhammad Abdur Rahim, *The History of the University of Dacca*, University of Dacca, Dacca, 1981, p. 4.

৯৯. *ঐ*, p. 5.

১০০. *ঐ*, p. 6.

১০১. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৯ এপ্রিল ১৯১২, পৃ. ৩।

১০২. উকিল শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র চক্রবর্তী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করার সময় যে বক্তৃতা দেন, তা হলো— '... বঙ্গবিভাগ রহিত বিষয়ক আমাদের আন্দোলনের মূলসূত্র এই ছিল যে, সমস্ত বঙ্গবাসীর জন্য একই উচ্চ বিচারালয়, একই ব্যবস্থাপকসভা এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহারা একই শাসনাধীনে থাকিবে। জানি না কোন উদ্দেশ্যে, কোন সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ—অতীত মাননীয় রায় বাহাদুর অনঙ্গমোহন নাহা মহাশয় ঢাকা নগরীতে একটি স্বতন্ত্র হাইকোর্ট ও স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ... উচ্চশিক্ষায় প্রকৃত ফললাভ করিতে হলে এবং যথাযোগ্য সামর্থ্য থাকিলে, সর্বাংশে অক্ষুণ্নভাবে শিক্ষাদানমূলক ও ছাত্রাবাসযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা যে একান্ত প্রয়োজন তদ্বিষয়ে বোধ হয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ে কোনই মতদ্বৈতের আশঙ্কা নাই। ...সঙ্গে সঙ্গে তদ্রূপ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনের ব্যয়ভারের কথাও একটু স্থির হয়ে চিন্তা করা একান্ত কর্তব্য। ...আমাদের দেশে অর্থাভাব নিবন্ধন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবশ্য কর্তব্য সম্পাদিত হইতে পরিতেছে না; ম্যালোরিয়া, প্লেগ ইত্যাদি বৎসরের পর বৎসর আমাদের অগন্য ভ্রাতা ভগিনীকে জীবন-ক্ষেত্র হইতে অকালে অপসারিত করিতেছে। ঐ একই কারণে সাময়িক ভীষণ দুর্ভিক্ষ্যে অগণ্য ভারতবাসীর লোমহর্ষণ অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। আবার ঐ কারণেই গোখলে মহোদয়ের প্রস্তাবিত সাধারণ শিক্ষার সার্বজনীন প্রচার হইতে পারিতেছে না। নানারূপ বিচারবিভ্রাট গভর্নমেন্টের স্বীকার মতে সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও শাসক এবং বিচারকের স্বাতন্ত্র্য ঐ একই কারণে সম্পাদিত হইতে পারিতেছে না। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে অযাচিতভাবে পূর্ব সূচনা ব্যতীত সহসা টিচিং এবং রেসিডেনসিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব শুনিয়া কেমন করিয়া দেশের লোক তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ২৯ এপ্রিল ১৯১২, পৃ. ৩।

১০৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ মে ১৯১২, পৃ. ৩।

১০৪. বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি এ. রসুল বলেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম এই উভয় বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধী এবং তাহাদের এইরূপ বিরুদ্ধ মত পোষণের উভয় কারণও আছে। মহোদয়গণ! দারিদ্র অবশ্যই অপরাধ নহে। এবং সকলেই এ কথা স্বীকার করিবেন যে, বঙ্গের মুসলমানগণ দরিদ্র। দেশে যে সকল বিদ্যালয়াদি বিদ্যমান আছে, অর্থাভাবে আমরা ঐ সকল শিক্ষাগারের সুবিধাও ভোগ করিতে পারিতেছিনা। অতীত সময়ে আমাদের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ রুদ্ধ হওয়ার কারণ যাহাই থাকুক, বর্তমান সময়ে একমাত্র দারিদ্রই আমাদের বালকদিগের উচ্চ শিক্ষা লাভের বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ... মহোদয়গণ শিক্ষাদানমূলক ও ছাত্রবাস সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা মুসলমানদের জন্য গুরুতর অনিষ্টজনক হইবে। হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত বলবান, তাহাদের মধ্যে কতকলোক এই সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধা ভোগে সমর্থ হইবে। ... সর্বদাসুন্দর করিতে হইলে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থের আবশ্যক তাহা প্রাথমিক বিজ্ঞান বিষয় ও কার্যকরী শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলে অনেক অধিক উপকার হইবে। ঐরূপ করিলে আমাদের যুবকদিগের চাকরির পথ সঠিকতর প্রশস্ত হইবে, এবং অসন্তুষ্ট গ্রাজুয়েট উকিলদিগের সংখ্যাও অনেক হ্রাস পাইবে।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ১৪ এপ্রিল ১৯১২, পৃ. ৪।

১০৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ মে ১৯১২, পৃ. ৩ ।

১০৬. Muhmmad Abdur Rahim, *পূর্বোক্ত*, p. 9.

১০৭. *ঢাকা প্রকাশ* থেকে জানা যায় যে, 'ঢাকাস্থ ছাত্রাবাস সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত গভর্নমেন্টের গঠিত কমিটি আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে কোনোরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন কিনা, হইয়া থাকিলে সে সিদ্ধান্ত বহিঃস্থ লোকে তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন। কিন্তু কলিকাতার কোনো কোনো সংবাদপত্র ইহার মধ্যে নানা আশঙ্কার ধ্বনি তুলিয়া অকারণে লোকের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া দিতেছেন।.... আপনাকে দেখিয়া সুখী হইলাম বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট স্পষ্টাক্ষরে এই অলীক জনরবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। গভর্নমেন্ট হইতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, এই আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। কলিকাতার মেডিকেল কলেজ ঢাকায় তুলিয়া নেওয়া প্রসঙ্গে কোনো কথাই উত্থাপিত হয় নাই। ঢাকায় নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধ কোন একটা শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত করা যায় না কিনা, তাহাই কমিটির আলোচ্য বিষয়। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অঙ্গে কোনো দিক দিয়া কোনোরূপ আঘাত পড়িবার কোনই আশঙ্কা নাই,' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯১২ পৃ. ৪

১০৮. *Report of the Dacca University Committee*, 1912, The Bengal Sceretariat Book depot, Calcutta, 1912, p. 15.

১০৯. *ঐ*, p. 118.

১১০. *ঐ*, p. 19.

১১১. *ঐ*, p. 70.

১১২. 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য (আর্ট), বিজ্ঞান, মুহম্মদীয় শিক্ষা, আইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা ও অধ্যাপনা শিক্ষা এই কয়েকটি বিভাগ থাকিবে। বিজ্ঞানাগারে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ব্যতীত ইঞ্জিনিয়ারিং এবং চিকিৎসা বিভাগের ছাত্রগণের প্রবেশাধিকার থাকিবে, কাজেই বিজ্ঞানাগারটি একটি উচ্চতর আদর্শে গঠন করা হইবে', দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯১২, পৃ. ৪।

১১৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ মে ১৯১২ পৃ. ৩।

১১৪. প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটির প্রতিবেদন সম্বন্ধে *ক্যাপিট্যাল* পত্রিকা যে মন্তব্য করে তাহলো, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হইলে শিক্ষনীতিজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদ ব্যক্তিগণ এক বাক্যে বলিয়া ছিলেন যে, ঢাকাতে অজস্র অর্থব্যয় যে সমস্ত প্রাসাদোপম বাটিকা সকল নির্মিত হইয়াছে, সেগুলিকে কার্যে লাগাইবার উদ্দেশ্যেই ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সূচনা হইয়াছে; তাঁহারা আর একটি রাজনৈতিক কারণও নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা এই যে, ঢাকাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অশুভ প্রভাব তিরোহিত হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদন পাঠের পর আমাদের এই ধারণা হইয়াছে যে, যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সত্য সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সারাংশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গপুষ্টি হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গভর্নমেন্টের নিকট অধিকতর আদরণীয় হইবে; এবং গভর্নমেন্টের চাকুরি প্রার্থিগণও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করিতে অধিকতর আগ্রাহান্বিত হইবেন, আমাদের ইহাও বিশ্বাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ অপেক্ষা অধিকতর সম্মানিত ও মানসিক ঔৎকর্ষসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে। বর্তমানে কলিকাতা ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রণালীতে যেরূপ গ্লানি ও মলিনতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ পরীক্ষা প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিবে। এই জন্যই আমরা সর্বান্তকরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সমর্থন করিতেছি।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ৮ ডিসেম্বর ১৯১২ পৃ. ১।

১১৫. *Report of the Recommendations of the Commission*, Calcutta University Commission, 1917-1919, Vol-IV, part-11, Superintendent Government Printing, Calcutta, India, 1919, p. 130.

১১৬. কারিগরি শিক্ষার গুরুত্বের ওপর *ঢাকা প্রকাশ* জানায় যে, 'কলিকাতার মেডিকেল কলেজ এবং শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এ অঞ্চলের বালকেরা প্রায়ই প্রবেশলাভে অসমর্থ হইয়া এই উভয় বিভাগের উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে; অতএব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে একটি মেডিকেল কলেজ ও একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। ইহা না হইলে, এদেশের শিক্ষার ব্যাপারে এক গুরুতর অভাব রহিয়া যাইবে এবং এ দেশবাসীর প্রতি অতিশয় অবিচার করা হইবে। অতএব আমরা আশা করি শিক্ষা সচিব এই দুইটি কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে কোনো প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিবেন না।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ৬ আগস্ট ১৯১৬, পৃ. ৩।

১১৭. *Report of the Recommendations of the Commission*, Calcutta University Commission, 1917-1919, Vol-IV, part-11, p. 131.

১১৮. *The Pakistan Code*, From 1911 to 1919, Vol. VI, Ministry of Law and Parliamentary Affairs (Law Division), Government of Pakistan, The Manager of Publications, 1966, p. 496.

১১৯.Muhmmad Abdur Rahim, THE ORIGIN OF THE DACCA UNIVERSITY PROJECT (Chapter-1) *পূর্বোক্ত*, p.11.

১২০. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল: ইতিহাস ও ঐতিহ্য* ১৮৫৮-১৯৪৭, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৪০২-৪০৩।

১২১.*Proceedings of the Bengal Legislative Council,* 12 March, 1919, Calcutta, 1920, p. 430-440 উদ্ধৃত শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৩।

১২২. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৪।

১২৩. *ঐ*, পৃ. ৪০৫।

১২৪. *ঐ*

১২৫. *Report of the Recommendations of the Commission,* Calcutta, University Commission, 1917-1919, Vol. V. Part. II, Chapter-XI-IV, p. 98.

১২৬. *B. Proceedings,* Sub: Establishment of a Faculty of Medicine in the Dacca University, File No- I-U-78, SL no. 1-2 Progs. No. 115-14B, *Education Department, Education Branch, Government of Bengal,* June 1925, p. 1.

১২৭. *Report of the Recommendations of the Commission,* Calcutta University Commission. 1917-1919, Vol-IV, Part. II, Chapter-XXXIII, p. 188.

১২৮. *ঐ*, p. 188.

১২৯. *ঐ*, p. 186.

১৩০. *ঐ*, p. 189.

১৩১. *ঐ*, p. 188.

১৩২. *Report of the Recommendations of the Commission,* Calcutta University Commission. 1917-1919, Vol. IV, Part. II, Chapter-XXXIII, pp. 187-88.

১৩৩. Lt. Colonel B.H. Deare (I.M.S) M.R.C.S, M.R.C.P (London) D.P.H (cantab) C.I.E, K.H.S, *The Lancet,* When to Operate in Appendicitis, 3 May, 1913, p. 1266., আরো দেখুন, *B Prog*. No. 99-133, Aug 1895 $\frac{IM}{35}$, File No. $\frac{IM}{35}$, *Medical Branch, Financial Department,* Professor and Principal (1919-1922) Calcutta Medical College, Dr. Debasis Bose, Dr. Sankar Kumar Nath, Dr. Jayanta K. Das (ed.), *175 Years of Medical College Bengal,* p. 37.

১৩৪. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৭।

১৩৫. *ঐ*, পৃ. ৪০৮।

১৩৬. *ঐ*

১৩৭. *ঐ*

১৩৮. 'ঢাকা মেডিকেল স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে *ঢাকা প্রকাশ* জানায় যে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির সংস্রবে একটা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কৃষি কলেজ সম্বন্ধে কমিশন এরূপ মন্তব্য প্রদান করিয়াছেন যে, বর্তমানে কৃষিকাজের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি কৃষি কলেজ রাখিতে হইবে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কথা তুলিয়া কমিশন বলিয়াছে যে, বর্তমানে বঙ্গদেশের জন্য দুইটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না। বড় লোকের (well-to-do) কলেজের প্রস্তাব কমিশন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অন্ততঃ বর্তমান সময়ের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি প্রাপ্ত কলেজ লইয়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইবে।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ আগস্ট ১৯১৯, পৃ. ৪।

১৩৯. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০৯।

১৪০. *A Proceedings*, Sub: Dacca University Bill (Establishment of Faculties of Medicine and Agriculture), File No. I-U-21, SL No-1-5, Progs No. 84-88, *General Department, Education Branch, Government of Bengal,* February 1920. p. 1

১৪১. *ঐ*, p. 1.

১৪২. *ঐ*

১৪৩. *ঐ*

১৪৪. *ঐ*

১৪৫. *ঐ*, p. 2.

১৪৬. *ঐ*, p. 1.

১৪৭. *A Proceedings*, Sub: Establishment of Faculties of Medicine and Agriculture in connection with the Dacca University, Council Question by Hon'ble Babu Sarat Chandra Chakrabarty, File No. 11-C-75, SL No. 1-2, Progs No. 9-10, *General Department, Education Branch,* August 1920 p.1.

১৪৮. *ঐ*, p. 1.

১৪৯. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১১-৪১২।

১৫০. *ঐ*, পৃ. ৪০৯-৪১০।

১৫১. *ঐ*

১৫২. *ঢাকা প্রকাশ* থেকে জানা যায়, আপনি জানেন যে, '১৯১২ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন। যদি আট দশ বৎসর পূর্বে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতো তাহা হইলে অধুনা ভারতে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান আছে, তাহাদের ন্যায় ইহাতে আর্ট ও সায়েন্স শিখাইলে এই অঞ্চলের জনসাধারণ উহাতেই সন্তুষ্ট হইত। কিন্তু এখন ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে লোকের ধারণা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। এখন লোকের ধারণা জন্মিয়াছে যে, যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসাবিদ্যা এবং কৃষি প্রভৃতি আবশ্যক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া না হয় তাহা হইলে এত টাকা খরচ করিয়া কোনো লাভ নেই। জীবন সংগ্রামের প্রাবল্য দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ঐ সকল বিষয় শিক্ষার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাই প্রথম আপত্তি। ... নতুন আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।... কিন্তু আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিবার কল্পনা হইতেছে এবং ইহাতে ৪০ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ পড়িবে। অথচ ভাল রকম মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য টাকা যোগাড় হইতেছে না। আপনি আশা দিয়াছেন যে, টাকার যোগাড় হইলেই চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলা হইবে।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ৮মে ১৯২১, পৃ. ৫।

১৫৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ আগস্ট ১৯২১, পৃ. ৫।

১৫৪. *B Proceedings,* Sub: Establishment of a faculty of Medicine in the Dacca University (Conversion of the Dacca Medical School into a College), File No: 1-U-78, SL No. 1-2, Progs No. 113-14B, *Education Department, Education Branch, Government of Bengal,* June 1925, p.1.

১৫৫. *ঐ*

১৫৬. *ঐ*

১৫৭. *ঐ*

১৫৮. *ঐ*, p. 2.

১৫৯. 'So far as I know there is no university in India that has its own medical college, and Indian Universities are merely examining universities for students of affiliated colleges. There is no Royal College which can grant licence *[sic]* to practice medicine, and the State Medical Faculty is the only corporation competent to grant such licence *[sic]* apart from the universities. There could be no question of placing the Dacca Medical School, which is a Government Institution, under the jurisdiction of the Dacca University, that it is possible that the Dacca University might agree to the affiliation of the school in which event the students of the school would be eligible for admission to the degrees of that university (if this fulfills the requirements of that university) or for the licence *[sic]* of the State Medical Faculty, but before the degrees of the Dacca University could be recognized for registration the university would have to be recommended to the council of medical registration for inclusion in the schedule by Government under section 18 of the medical act of 1924'. দেখুন, *B Proceedings,* Sub: Establishment of a faculty of Medicine in the Dacca University (Conversion of the Dacca Medical School into a College), File No: 1-U-78, SL No. 1-2, Progs No. 113-14B, *Education Department, Education Branch, Government of Bengal,* June 1925, p.2

১৬০. *ঐ*, p. 3.

১৬১. কমিটির মতামত, 'After consideration of this report, we think that it would be impracticable to proceed with the establishment of a medical college in Dacca distinet *[sic]* from the Dacca Medical School, in view of the cost involved, apart from other considerations. We have been precinded *[sic]* by our reference from considering the question of the conversion of the Dacca Medical School into a University Institution. But we hope that when more medical schools have been established, the question of the conversion of the Dacca Medical School into a University institution may be considered by Government.' দেখুন, *B Proceedings,* Sub: Establishment of a faculty of Medicine in the Dacca University (Conversion of the Dacca Medical School into a College), File No: 1-U-78, SL No.

1-2, Progs No. 113-14B, *Education Department, Education Branch, Government of Bengal,* June 1925, p.3.

১৬২. *ঐ*

১৬৩. *ঐ*

১৬৪. *ঐ*, p. 4.

১৬৫. *ঐ*, pp. 1-2.

১৬৬. বাবু অমূল্য ধন আদি বলেন, 'I must also make it clear to the house that the activities of the Dacca University are at present confined merely to the ordinary arts and science courses. As we all know it is a teaching university and not merely an affiliating, an examining university, even its present activities cannot be carried on without the permanent grant we are asking for. But the Dacca University wants to open an agricultural course which is one of the essential needs of the Province, because for this purpose there is no place in Bengal more suitable than Dacca. As a matter of fact, it has been laid down that such a course should be an important feature of the Dacca University. Then there is in East Bengal as elsewhere a great demand for vocational and technical courses. That also has to be provided for. What I want to say is this, that it is necessary to make this grant permanent so that the Dacca University may carry on its essential activities. ....I do not oppose the bill, I am personally of opinion that the object is to develop technical and agricultural education but what I suggest is that we should wait for a month or two till we are favoured with the opinion of public bodies on the subject'. দেখুন, *Council Proceedings* (official Report) *Bengal Legislative Council,* Eighteenth session (12th to 14th and 17th to 21st August) Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1925 PP. 79-80, p. 97.

১৬৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩১ জুলাই ১৯২৭, পৃ. ৩।

১৬৮. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১৩।

১৬৯. *Bengal Provincial Banking Enquiry Commission,* Vol-II, Part-I, p.375. উদ্বৃত, Tariq Omar Ali, 'The Envelope of Global Trade: The Political, Economy and Intellectual History of Jute in the Bengal Delta, 1850-1950' *Doctoral dissertation,* Harvard University, 2012, p. 131.

১৭০. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ মার্চ ১৯৩২, পৃ. ৪।

১৭১.স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার স্বাস্থ্যনীতির বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্য এক সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করেন যে, 'জলপ্লাবনে দেশ ধুইয়া নিয়া জমিতে পলি পাওয়াতে যেমন শস্য সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, তেমনি ইহাতে ম্যালিরিয়ার জীবানু বিনষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গের যে সকল স্থানে জলপ্লাবনের সুবিধা নাই, তথায় ইহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে এ ম্যালেরিয়াও দূরীভূত হইবে এবং শস্যসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়াতে এই সোনার বাংলা সত্যসত্যই সুখী, সন্তুষ্ট এবং সমৃদ্ধিশালী লোকের বাসভবনে পরিণত হইবে। ঋণ করিয়াই এই অতিগুরুতর কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। কারণ গভর্নমেন্টের আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ নহে। এ জন্য ট্যাক্স করাও সমীচীন হইবে না। কাজেই ঋণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সকল দেশেই ঋণ করিয়া এইরূপ কার্য করা হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে ইজিপ্টেও তাহাই হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য বেশি দূরেও যাইতে হইবে না। এই কলিকাতা নগরী, যাহা এখন ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যকর স্থান, ৫০ বৎসর পূর্বে তাহা এমন ছিল না; ঋণ করিয়াই মৃত্যুর আধার স্বরূপ সেই জলাভূমিকে জলনিকাশ ও বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহের বিরাট ব্যবস্থাদি দ্বারা এইরূপ মহানগরীতে পরিণত করা হইয়াছে। অতএব দেশের এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য ঋণগ্রহণ সম্বন্ধে যেন কেহ কোনোরূপ আপত্তি উত্থাপন না করেন।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ জুলাই ১৯২১ পৃ. ৫।

১৭২. *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ আগস্ট ১৯৪৬, পৃ. ১।

১৭৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ মার্চ ১৯৩২, পৃ. ৪।

১৭৪. *দৈনিক আজাদ*, ২৭ এপ্রিল ১৯৬৯, পৃ. ৪।

১৭৫. *ঐ*

১৭৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯২৮।

১৭৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ৪ আগস্ট ১৯২৯ পৃ. ১।

১৭৮. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১৪।

১৭৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ জুলাই ১৯৩৫ পৃ. ৪।

১৮০. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ পৃ. ৫।

১৮১. *ঐ*

১৮২. *ঢাকা প্রকাশ*, ২১ জুলাই ১৯৩৫ পৃ. ৪।

১৮৩. ১৯৩৬-৩৭ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে লিপিবদ্ধ করা হয় যে, 'Another scheme of expansion to which the university has committed itself is the establishment of a Medical College in Dacca. Two years ago, the Vice-Chancellor mentioned in his Convocation Address that the executors of the will of the late Babu Jagamohan Pal had agreed to place at the disposal of University a sum of four lacs of rupees for the establishment of a Medical College at Dacca, The Executors have now paid to the University, the

entire sum of four lacs. The Academic and Executive Councils of the University carefully considered the whole matter and drew up a scheme in the light of the expert advice of the Civil Surgeon and several other leading medical practitioners of Dacca. The scheme would again be considered by the University and it is hoped that the University would be able to place their definite proposal formally before the Government within a short period'. দেখুন, *Annual Report of the University of Dacca for* 1936-37, p. 2.

১৮৪. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the* Year 1946-52, Government of East Bengal Press, 1954, p.1.

১৮৫. *বার্ষিকী ২০০৬, ঢাকা মেডিকেল কলেজ*, ২০০৬, পৃ. ২৩।

১৮৬. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১৫।

১৮৭. *ঐ*, পৃ. ৪১৬।

১৮৮. *ঐ*

১৮৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, '... ঢাকাতে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য স্বর্গীয় জগমোহন পাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে চার লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। শীঘ্রই অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইবে। কৃষি এবং রাজনীতি শিক্ষাদান সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়াও তিনি বলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে এতদুদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮ জুলাই ১৯৩৭, পৃ. ৪

১৯০. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১৭।

১৯১. *ঢাকা প্রকাশ* এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের এই অনুমোদন সম্পর্কে উল্লেখ করে যে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতি সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন, ঢাকায় এখন যে, মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতাল আছে, তাহারই উন্নতি ও বিস্তৃতি বিধান করিয়া উহা মেডিকেল কলেজে পরিণত করা হইবে। এই সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদনুসারে কার্য হইলে অদূর ভবিষ্যতে ঢাকায় যে একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতি এ সম্বন্ধে যেরূপ পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার অর্থ মর্ম এইরূপ : ঢাকায় মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয় হইবে আনুমানিক সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং কলেজ পরিচালনায় বার্ষিক ব্যয় হইবে আনুমানিক সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। জগমোহন পালের এক্সিকিউটরগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে যে টাকা প্রদান করিয়াছেন, তদতিরিক্ত যে টাকা কলেজ স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয় হিসেবে প্রয়োজন হইবে' বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আশা করেন, গভর্নমেন্ট তাহা প্রদান করিবেন। প্রথমত ৭৫টি ছাত্রের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা হইবে এবং যাহারা জড়বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, ও জীবতত্ত্ব-সহ আই.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহারাই মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের অধিকার পাইবে। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ৫টি হিসাবে ৫০০টি রোগশয্যার ব্যবস্থা হাসপাতালে করার কথা হইয়াছে। সেজন্য বর্তমান মিটফোর্ড হাসপাতালের উন্নতি ও বিস্তৃতি বিধানর্থ প্রায় দুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে, শুশ্রূষাকারিনী ও চাকর প্রভৃতির গৃহনির্মানার্থ সম্ভবতঃ আরও ৫০,০০০ টাকা লাগিতে পারে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি ও আসবাব প্রভৃতির জন্যও প্রায় ১ লক্ষ টাকার দরকার হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতি সম্ভাবিত আয় সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, প্রত্যেক ছাত্রের বেতনাদি বাবদ বার্ষিক ২০০ টাকা ধরা হইয়াছে, রোগ শয্যার জন্য যে সকল টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা হইতেও ১৫/১৬ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে। বর্তমানে মেডিকেল স্কুলে ৪৪ হাজার টাকা সাহায্য পাওয়া যায়, হাসপাতালের আয় ১ লক্ষ কুড়ি হাজার পরিমাণ হইবে। তাহা হইলেও বার্ষিক ঘাটতি ১ লক্ষ টাকার উপর হইবে। উল্লিখিত পরিকল্পনা অনুসারে কার্য হইলে এ অঞ্চলের যে একটি গুরুতর ও অতি প্রয়োজনীয় অভাব পূর্ণ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমান সময়ে কলিকাতায় যাইয়া মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন পূর্ববঙ্গের অনেকেরই পক্ষেই একরূপ অসম্ভব। ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, এদেশীয় ছাত্রগণের অনেক সুবিধা ঘটিবে। সুতরাং আমরা আশা করি সদাশয় গভর্নমেন্ট যথাচিত অর্থ সাহায্য করিয়া অবিলম্বে ঢাকায় একটা মেডিকেল কলেজ স্থাপনপূর্বক পূর্ববঙ্গ বাসীর ঐকান্তিক ইচ্ছা পূরণ করিবেন।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ জানুয়ারি ১৯৩৮, পৃ. ৪।

১৯২. ১৯২০ সালের ১৮ নং এ্যাক্টের ২২ (I) অনুচ্ছেদ, 'The University shall include the Faculties of Arts, Science, Law, Medicine and Agriculture and such other Faculties (whether formed by the sub-division or combination of an Existing Faculty or Faculties or by the creation of a new Faculty or otherwise) as may be prescribed by the statutes. Each faculty shall, subject to the control of the Academic Council, have charge of the teaching and the courses of study and the research work in such subjects as may be assigned to such Faculty by the Ordinance.' দেখুন, *Act No: xviii of 1920*, passed by the *Indian Legislative Council*, Received the assent of Governor-General on the 23rd March 1920, p, 12

১৯৩. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২৩।

১৯৪. ১৯৩৮-৩৯ সালের *ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে উল্লেখ করা হয়, 'The two big schemes of expansion viz, the establishment of a Faculty of Agriculture and a Faculty of Medicine, have made considerable progress during the session under review. The University has approached the Government for providing necessary funds in order to enable it to start the Faculty of Agriculture with effect from the session 1939-40. The expert Committee appointed by the Government to examine the whole project of establishing a Faculty of Medicine have already considered the question in its general aspects and it is hoped that the report of the Committee will be in the hands of Governments before the puja vacation of 1939-40.' দেখুন, *Annual Report of the University of Dacca for* 1938-39, p. 1.

১৯৫. Resolution No-2, 'That this Association is in favour of having a fully equipped Medical college at Dacca, provided the Dacca Medical School is not abolished as the result thereof; there is a strong feeling

for retaining the medical school at Dacca and the Medical College may be established as a separate Institution at Dacca in addition to the long established Medical School which has been supplying qualified Medical practitioners for the rural areas.' দেখুন, *B Proceedings*, Bundle No: 63, *Local-Self Government Department, Medical Branch,* December 1938.

১৯৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১ মে ১৯৩৮, পৃ. ৪।

১৯৭. সমাবর্তন সভায় ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, 'এই উভয় পরিকল্পনানুযায়ী (কৃষি বিভাগ ও চিকিৎসাবিভাগ) কার্য দ্রুতগতিতে চলিয়াছে এ কথা তিনি সানন্দে ঘোষণা করিতেছেন। সার্জন জেনারেলের উপদেশানুসারে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা সংশোধিত করিয়া গভর্নমেন্টের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। এ পরিকল্পনা অনুসারে গভর্নমেন্টের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। এ পরিকল্পনা অনুসারে গভর্নমেন্ট হইতে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং ঢাকা মেডিকেল স্কুলের বর্তমান সাহায্যের ওপর কিঞ্চিদধিক এক লক্ষ টাকা সাহায্য পাইলেই উক্ত মেডিকেল স্কুলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিকেল কলেজে পরিণত করা হইবে। এ বিষয়টা এক্ষণে গভর্নমেন্টের বিবেচনাধীন আছে। ... মেডিকেল কলেজ এবং কৃষি কলেজ স্থাপনে প্রথম ৪/৫ বৎসর এককালীন ৬ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক প্রায় সোয়া লক্ষ টাকা ব্যয় লাগিবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য আয় হইতে এই বিরাট ব্যয় নির্বাহ হওয়া সম্ভবপর নহে।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ জুলাই ১৯৩৮, পৃ. ৫।

১৯৮. *B proceedings*, Bundle No: 63, *Local-self Government Department*, *Medical Branch*, December 1938.

১৯৯. কমিটির সদস্যগণ হলেন,

'১. মেজর জেনারেল পি. এস. মিলস, সি আই. ই., কে. এইচ পি., আই. এম. এস., সার্জন জেনারেল, বাংলা সরকার—সভাপতি

২. ডক্টর, আর, সি, মজুমদার, পিএইচ.ডি., উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. ডক্টর এম. এন বোস, এম বি., সি.এইচ. বি., অধ্যক্ষ, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ।

৪. লেফটেন্যান্ট কর্নেল বিজি. মালয়, আই. এস. এস, সুপারিনটেনডেন্ট, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল এবং হাসপাতাল।

৫. ডক্টর জে, সি. ঘোষ, ডি. এসসি., ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, ব্যাঙ্গালোর।

৬. লে. কর্নেল জি. সি. ডি, আই. এম এস., অধ্যক্ষ, কলকাতা মেডিকেল কলেজ, কলকাতা।

৭. মেজর আর লিটন, আই. এম. এস., সিভিল সার্জন, ঢাকা।

৮. ক্যাপ্টেন পেমেঙ্কর দে, এম. আর. সি. পি (এডিন), অধ্যাপক, ফিজিওলজি, মেডিকেল কলেজ, কলকাতা।

৯. খান সাহেব ডক্টর এম. এম. খান, ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট, ঢাকা মেডিকেল স্কুল।

১০. কে. শাহাবুদ্দিন, সি.বি.ই., এম. এল. এ।

১১. যোগেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ. বি. এল. জগমোহন পাল বাবুর একজন তত্ত্বাবধায়ক ।

১২. কে. এস. মিত্র, এস, বি. ই, সেক্রেটারি, কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল- কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন।' দেখুন, *The Report of the Expert Committee for the Conversion of the Dacca Medical School into a Medical College under the University of Dacca*, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941, p. 1.

২০০. *Annual Report of the University of Dacca for* 1939-40, p. 1.

২০১. *The Report of the Expert Committee for the Conversion of the Dacca Medical School into a Medical College under the University of Dacca,* Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941, pp. 3-4.

২০২. *ঐ*, p. 3.

২০৩. *ঐ*

২০৪. *ঐ*, pp. 3-4.

২০৫. *ঐ*

২০৬. *ঐ*, p. 4.

২০৭. *ঐ*, pp. 4-5.

২০৮. *ঐ*.

২০৯. *ঐ*, p. 5.

২১০. *ঐ*

২১১. '16. (1) Appointments to Salaried Professorships and Salaried Readerships shall be made on the nomination of committees of selection constituted for the purpose as follows, namely—

(i) The Vice Chancellor;

(ii) One member of Executive Council selected by the Executive Council;

(iii) Two members of the Academic Council selected by the Academic Council on the ground of their special knowledge of, or interest in, the subject or subjects with which the Professor or Reader, as the case may be, will be concerned;

(iv) An officer of the Local Government appointed by the Local Government; and
(v) Three persons (two of whom shall not be officers or teachers) appointed by the Chancellor:

Provided that should a committee so constituted not include two Hindu and two Muhammadan members, the Chancellor shall nominate one or two additional Hindu or Muhammadan member or members, as the case may be.

(2) Committees of selection appointed under sub-clause (1) shall report to the Executive Council which shall, if it accepts the nomination of the committee, make the appointment to the post accordingly. If the Executive Council does not accept the nomination of the committee, it shall refer the case to the Chancellor, who shall make such appointment as he thinks fit.' *দেখুন, The Report of the Expert Committee for the Conversion of the Dacca Medical School into a Medical College under the University of Dacca,* Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941, p. 6

২১২. *The Report of the Expert Committee for the Conversion of the Dacca Medical School into a Medical College under the University of Dacca,* Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941, p. 7.

২১৩. *ঐ*

২১৪. *ঐ*

২১৫. *ঐ*

২১৬. *ঐ*

২১৭. *ঐ*

২১৮. *ঐ*

২১৯. *ঐ*

২২০. *ঐ*, p. 8.

২২১. *ঐ*

২২২. *ঐ*

২২৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, 'চিকিৎসা বিষয়ক প্রস্তাবিত ফ্যাকাল্টি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। ১০ জুলাই তারিখে বিশেষজ্ঞ কমিটির শেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে; এবং কমিটির প্রতিবেদন গভর্নমেন্টের নিকট দাখিল করিবার জন্য এ ক্ষেত্রে প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি আশা করেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিষয়ে একটি ফ্যাকাল্টি প্রতিষ্ঠায় প্রস্তাব গভর্নমেন্ট কর্তৃক সহানুভূতির সহিত বিবেচিত হইবে। একটি মেডিকেল কলেজের ব্যবস্থার পর, আর একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করা বাঞ্ছনীয়। ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজির কয়েকটি বিশেষ শাখার উচ্চশিক্ষাদানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। ... টেকনোলজি ও ইঞ্জিনিয়ারিং এ উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি বলিয়া অনেকে যে অভিযোগ করেন; তাহা কতকটা দূর হইবে।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮ জুলাই ১৯৪০ পৃ. ৩।

২২৪. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩৬।

২২৫. *ঐ*

২২৬. *ঐ*

২২৭. *ঐ*

২২৮. *Report of the Health Survey and Development Committee, Survey,* Vol. I, Government of India Press, Calcutta 1946, p. 165.

২২৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার এর '*জীবনের স্মৃতিদ্বীপে*' গ্রন্থ থেকে জানা যায়,... 'তখন অনেকেরই ইচ্ছা ছিল রমনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ির পাশেই এই মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে তার জন্য হাসপাতাল প্রভৃতি বাড়ি দরকার, এ জন্য ভবিষ্যতে বিস্তৃত জায়গা লাগবে। শুরুতেই যদি একটা বড় জায়গা কেনা যায় তাহলে পরে বাড়ি তৈরির দরকার হলে কোনো অসুবিধে হবে না। এ কারণে প্রস্তাব করা হয় যে, বুড়িগঙ্গার তীরে যেখানে মেডিকেল স্কুল আছে তারই সংলগ্ন জমি যদি গভর্নমেন্ট এখনই কিনে রাখেন তাহলে ভবিষ্যতে বেশি দাম দিয়ে আর জমি কিনতে হবে না। কারণ একবার মেডিকেল কলেজ তৈরি হলে পাশের জমির দাম সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাবে এবং জমিও তখন প্রয়োজনমত পাওয়া যাবে না। কলকাতার মেডিকেল কলেজ প্রসারের পথে যে রকম বিঘ্ন দেখা দিয়েছিল, সে কথাও উল্লেখ করি। অনেক বাদানুবাদের পর কমিটি শেষ পর্যন্ত এই স্থানে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সর্বসম্মতিক্রমে মত প্রকাশ করেন। প্রতিবেদনটি গভর্নমেন্টও অনুমোদন করেন। তবে গভর্নমেন্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজটি শুরু করেননি।' দেখুন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, *জীবনের স্মৃতিদ্বীপে*, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৫ পৃ. ৯৩।

২৩০. রমেশচন্দ্র মজুমদার এর বিদায়ী ভাষন, 'I am Sorry to have to report that no further progress has been made with the two major Schemes of the university, viz, the Institution of the Faculty of Medicine and the Faculty of Engineering. Here, again, the exigencies of the war have been the chief causes for the postponement of the projects. But I cannot help feeling that the war itself makes it imperative that there should be provisions for higher Medical Education and Better Hospitals as well as a fully equipped

Engineering college at Dacca. Recent events have opened our eyes to the great defects and dangers of the present system where by an all important utility service like medical relief and such an essential element in national defense as higher education in Engineering and Technology are practically centralized in a single city (Calcutta) which the authorities themselves regard as exposed to danger from air raid and certainly more unsafe than Dacca. As regards the cost involved, the schemes should rather be regarded or part of the war emergency measures for which the Government is spending a huge amount. Instead of being postponed these two schemes should, therefore, be expedited on account of the situation created by the war.' দেখুন, *B Proceedings, Education Department, Eduction Branch,* April 1948

২৩১. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪০।

২৩২. *ঐ*

২৩৩. *ঐ*

২৩৪. *Annual Report of the University of Dacca for* 1944-45, p. 1.

২৩৫. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪১-৪৪২।

২৩৬. *বার্ষিকী ২০০৬, ঢাকা মেডিকেল কলেজ*, ২০০৬, পৃ. ১৩।

২৩৭. সাক্ষাৎকার, মীর্জা মাজহারুল ইসলাম, বয়সঃ ৯৩ (১৯২৭-২০২০), প্রথম ব্যাচের (১৯৪৬-৪৭) ছাত্র, অধ্যাপক ও প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, তারিখ ১০.০৯.২০১৮, সময়-১০.০০, স্থানঃ বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা।

২৩৮. ভোর কমিটির নির্দেশনা, 'One of the difficulties with which the committee will be confronted is that of finance. Financial considerations clearly cannot be ignored. Plans based on the assumption that unlimited funds will be available for recurring expentiture will have little practical value. On the other hand it would be equally unwise to assume that expenditure on health administration will in the future be limited to the sums which were expended in the pre-war years. It is desirable, therefore, to plan boldly, avoiding on the one hand extravagant programes which are obviously incapable of fulfilment and on the other hand inadequate schemes which could have no effect on general health standards and which would bring little return for the expenditure involved'. দেখুন, *Report of the Health Survey and Development Committee,* Survey, Vol. I, Government of India Press, Calcutta, 1946, p. 2.

২৩৯. সাক্ষাৎকার, মীর্জা মাজহারুল ইসলাম, বয়সঃ ৯৩ (১৯২৭-২০২০), প্রথম ব্যাচের (১৯৪৬-৪৭) ছাত্র, অধ্যাপক ও প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, তারিখঃ ১০.০৯.২০১৮, সময়-১০.০০, স্থানঃ বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা।

২৪০. 'Our programme of expansion of educational facilities includes the improvement of existing colleges, the conversion of suitable medical schools into colleges and the establishment of new colleges in different parts of the country.' দেখুন, *Report of the Health Survey and Development Committee,* Vol. IV, Summary, The Manager Government of India Press, New Delhi, 1946 P. 62.

২৪১. *ঐ*, Vol. II, p. 361.

২৪২. *ঐ*, Vol. II, p. 362.

২৪৩. *ঐ*, Vol. II, p. 336.

২৪৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ২০ জানুয়ারি, ১৯৪৬, পৃ. ৪।

২৪৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৫ পৃ. ২।

২৪৬. 'In order to enable the Medical College to come into being almost immediately and in the larger interests of the province of Bengal, the university has willingly agreed to hand over the entire central university Building to Government, although it would mean that the difficulties of accommodation to which the university has been put during the last few years and the consequent unsatisfactory arrangements in teaching and administration would continue for sometime yet Government have however agreed to place the new Government House at the disposal of the university and have given the assurance that buildings necessary for accommodating the various departments of the university will be constructed at Government cost.' দেখুন, *Annual Report of the University of Dacca for* 1945-46, p. 2.

২৪৭. *Annual Report of the University of Dacca for* 1945-46, p. 4.

২৪৮. *ঐ*, p. 2.

২৪৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ১০ আগস্ট ১৯৪৭, পৃ. ২ ।

২৫০. সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক মীর্জা মাজহারুল ইসলাম, বয়সঃ ৯৩ (১৯২৭-২০২০), প্রথম ব্যাচের (১৯৪৬-৪৭) ছাত্র, অধ্যাপক ও প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, তারিখঃ ১০.০৯.২০১৮, সময়ঃ ১০:০০, বারডেম হাসপাতাল, ঢাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাথমিক অগ্রযাত্রা ও উন্নয়ন

১-৭-১৯৪৬ – ১৫-৮-১৯৪৭

সমসাময়িক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী পূর্ববাংলার অন্যতম ও প্রথম উন্নত চিকিৎসাশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করে। রোগ, হাসপাতাল ও চিকিৎসাশিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যে কোনো অঞ্চল বা দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসের অংশ। বিষয়টি পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের জনমানুষের কাছে অজানা। তাই এটা আলোচনার দাবি রাখে। অভিসন্দর্ভের এই অধ্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে দেশ বিভাগ পর্যন্ত কলেজের যাবতীয় কার্যক্রমের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এই এক (১) বছর ঢাকা মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম মন্থর গতিতে চললেও দেশ বিভাগের পর পূর্ণ গতিতে এগিয়ে যায়।

গত দুই দশক ধরে ব্রিটিশ, দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহাসিকগণ ঔপনিবেশিক ভারতের পাশ্চাত্য চিকিৎসার উদ্ভব, বিকাশ, প্রবর্তনের কারণ, রোগ, চিকিৎসা, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিতে এর প্রভাব নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করে আসছেন। বর্তমান সময়ে এই বিষয়টি গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক গুরুত্ব পাচ্ছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতের সমাজ ও জনজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের ছোয়া ব্রিটিশ ভারতের পূর্ববাংলায়ও লাগে। এ ক্ষেত্রে ফুকো'র জ্ঞান ও ক্ষমতা তত্ত্ব অনুসারে বলা যায় যে, পূর্ববাংলা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধিপত্যের সংস্পর্শে আসে। ব্যতিক্রম ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে কলকাতায় পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসাশিক্ষা প্রবর্তনে যতটা বাধার সম্মুখীন হয়, পূর্ববাংলায় কোনোরকম বাধা ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর জন্য কোনো আইন সংক্রান্ত লড়াই অথবা দেশীয় কবিরাজ, বৈদ্যদের রক্ষণশীল মনোভাব ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গের কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি। এর অন্যতম কারণ পাশ্চাত্য চিকিৎসা জ্ঞানের প্রভাব ততদিনে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া পাশ্চাত্য চিকিৎসা, চিকিৎসাশিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রযুক্তি, মহামারী সংক্রান্ত রোগ (কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা), মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসার আধুনিক পদ্ধতি, এর ইতিবাচক দিক সম্পর্কে পূর্ববাংলার জনসাধারণ, সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ ইতিপূর্বে অবগত। পূর্ববাংলার জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য, উন্নত চিকিৎসা ও উন্নত চিকিৎসাশিক্ষায় পারদর্শী এক শ্রেণির চিকিৎসক পেশাজীবী শ্রেণি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে ঢাকায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিষয়টা অনেকটা এরকম যে, একজন রোগী যেমন সুস্থ হবার আশায় চিকিৎসকের কাছে যেতে বাধ্য এবং চিকিৎসকের দেওয়া চিকিৎসা পদ্ধতি ও নির্দেশনা (প্রেসক্রিপশন) মেনে চলতে বাধ্য থাকে, ঠিক তেমনি এই অঞ্চলের জনসাধারণ উন্নত চিকিৎসা পাওয়ার আশায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাবি জানায় এবং তৎকালীন বাংলা সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। অর্থাৎ তারা নিজ উদ্যোগে ও নিজেদের প্রয়োজন অনুসারেই এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। ফলে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জোর দাবি জানায়। এমনকি তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা, সাহিত্য বিষয়ে কোর্স চালু করার চেয়ে চিকিৎসাশিক্ষার মতো কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়। এটা ছিল তাদের যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত দাবি। তৎকালীন বাংলা সরকার ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিল্লিতে ভারত সাম্রাজ্যের ব্রিটিশ সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলেও অর্থনৈতিক কারণে প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করতে বিলম্ব হয়। পূর্ববাংলার

জনসাধারণ, সুশীল সমাজ রাজনীতিবিদদের চাপে ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চলে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে। তাই এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে ১৯৩৩ সালের ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল এ্যাক্ট অনুসারে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] পূর্ববাংলার জনসাধারণের জন্য আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা ও চিকিৎসক শ্রেণি প্রতিষ্ঠা করার মানসে ১৯৪৬ সালের ১ জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ব্যাপারে ১৯৪৬ সালের *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital* এ উল্লেখ করা হয়,

> With the full support and keen enthusiasm of the Honble Mr. Mohammad Ali, Prime Minister of Pakistan (the then Minister of Health and Local Self-Government Department of undivided Bengal), the Dacca Medical College, came into being in 1946 and began functioning.[২]

এরই ধারাবাহিকতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট ও ঢাকার সিভিল সার্জন মেজর ডা. ডব্লিউ. জে. ভারজিন (আই. এম. এস.) কে ১লা জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি একাধারে ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের ডিন অন্যদিকে অধ্যক্ষ [*পরিশিষ্ট দেখুন-৮*] । এই ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে উল্লেখ করা হয়,

> The executive council welcome Major W.J. Virgin, I. M. S. Head of the Department of Medical Science in the Faculty of Medicine as Dean of the Faculty.[৩]

ডা. ডব্লিউ জে. ভারজিন ছিলেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের একজন ব্রিটিশ অফিসার। তিনি পেশাগত জীবনে একজন এফ.আর.সি.এ. ডিগ্রিধারী অর্থোপেডিক সার্জন ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯৪৫ সালে ঢাকার সিভিল সার্জন হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ১৯৪৬ সালের ১ জুলাই থেকে ১৯৪৭ সালের ১৯ জুলাই পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও সেই সঙ্গে হাসপাতালের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৪]

ভারজিনের মতো দক্ষ লোকের পক্ষেও মেডিকেল কলেজের শুরুর দিকের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কঠিন ছিল। এর অন্যতম কারণ ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা। ব্রিটিশ শাসকের ভারত উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা স্থানীয় রাজনীতিবিদদের কাছে হস্তান্তর করে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন যখন প্রায় নিশ্চিত, তখন দেশজুড়ে চলছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা। এরূপ অস্থিরতার মধ্যে সমাজের স্থিতিশীলতা ছিল হুমকী স্বরূপ। তখন সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ও বিরূপতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল। ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা দীর্ঘদিন ধরে চলার কারণে *স্টেটসম্যান* পত্রিকাতে 'ঢাকা রায়ট কন্টিনিয়ূজ' শিরোনামে কলাম প্রকাশ করে।[৫] এমনি এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় । ইতিপূর্বে এই কলেজে ছাত্র ভর্তির জন্য *ঢাকা প্রকাশ* এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এই বিজ্ঞাপনে ১০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি ও এই আসনগুলো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্টনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।[৬]

রমনার পুরানো সচিবালয় ভবনের এক অংশে এর যাত্রা শুরু হয়। ভবনটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভবন হিসেবে ছিল না। ১৯০১ সালে ভবনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং ১৯০৫ সালে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত

হয়। এ সময় বঙ্গভঙ্গ হলে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের সচিবালয় হিসেবে ভবনটি ব্যবহৃত হতে থাকে। ভবনটি সচিবালয়ের জন্য উপযুক্ত ছিল, মেডিকেল কলেজের জন্য এর ডিজাইন করা হয়নি। ৯৪০০০ বর্গফুটের এই ভবনে প্রায় ২০০টি কক্ষ ছিল।[৭] ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ভবনটি হস্তান্তর করা হয়। ফলে ভবনটি ১৯১১ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস, গ্রন্থাগার, কলা অনুষদ ও আইন অনুষদের শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক ও বিভাগীয় প্রধানের কক্ষ, শিক্ষার্থীদের জন্য কমনরুম, হোস্টেল, সাইকোলজিক্যাল গবেষণাগার, ইউ.টি.সি. এবং নীচ তলায় 'দ্য ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ইনফরফেশন ব্যুরো' হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভবনের তিন ভাগের দুইভাগেরও বেশি অংশে সামরিক হাসপাতালে পরিণত করার দাবি ওঠে। আমেরিকানরা ভবনটি অধিগ্রহণ করলে সামরিক হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই অস্থায়ী সামরিক হাসপাতালটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ছিল। যুদ্ধ শেষে আমেরিকানরা চলে গেলে ভবনের একটি অংশে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়। হাসপাতালটি এক বছর ছিল। সংশ্লিষ্ট এই অবকাঠামো ঢাকায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের পক্ষে সুবিধাজনক অবস্থান সৃষ্টি করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ববাংলা ও অসাম প্রদেশের সচিবালয় ভবনের একটি অংশে ১৯৪৬ সালে হাসপাতালসহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের আত্মপ্রকাশ। দেশ বিভাগের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এটা চলমান রয়েছে।

মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পর ১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই মেজর ডব্লিউ. জে. ভারজিন এর তত্ত্বাবধানে ১০১ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের গৌরবময় যাত্রা শুরু হয়।[৮] এই কারণেই ১০ জুলাই তারিখে 'ডি.এম.সি. দিবস' পালন করা হয়। এই ১০১ জন শিক্ষার্থী একটি বিশেষ প্রক্রিয়া ও নীতিমালার মধ্য দিয়ে ভর্তি হয়, তবে ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়াটি খুব সহজ ছিল না। এ সময় নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে গিয়ে সিলেকশন কমিটি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ সময় ৩৪৫ জন শিক্ষার্থী আবেদন করে। সিলেকশন কমিটি শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার চার (৩,৪,৫ এবং ১৬ জুলাই, ১৯৪৬) দিনে নেন এবং তাদেরকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা উপযুক্ত ছিল তাঁদের ক্ষেত্রে 'এস' (S) লেবেল দেওয়া হয়, যাদের অতিরিক্ত যোগ্যতা ছিল তাদের এস প্লাস (S^+) লেবেল, যাঁরা উপযুক্ত ছিল কিন্তু যোগ্যতা নিচু মানের ছিল, তাদের ক্ষেত্রে এস মাইনাস (S^-) লেবেল এবং যারা অনুপযুক্ত ছিল তাদের ক্ষেত্রে 'ইউ' (U) লেবেল দেওয়া হয় *[পরিশিষ্ট দেখুন-৯]*। মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য ১০০টি আসন নির্ধারণ করা হয়। আসনগুলো নিম্নোক্তভাবে বন্টন করা হয়,[৯]

১. মুসলিম ৪০ জন
২. তপশিলি সম্প্রদায় ৫ জন
৩. সাধারণ ৩৫ জন
৪. নারী ১০ জন (৫ জন মুসলমান + ১ জন তপশিলি সম্প্রদায় + ৪ জন সাধারণ)
৫. সরকারি মনোনয়ন ১০ জন (৫ জন মুসলমান + ১ জন তপশিলি সম্প্রদায় + ৪ জন সাধারণ)

উপরি উল্লিখিত ১ থেকে ৪ পর্যন্ত তথা ৯০টি আসনে শিক্ষার্থী নির্বাচিত করার ক্ষমতা সিলেকশন কমিটিকে দেওয়া হয়। বাকি ১০টি আসন সরকার কর্তৃক মনোনয়নের জন্য আলাদা করে রাখা হয়। নারীসহ মুসলমান, তপশিলি সম্প্রদায় এবং সাধারণ সম্প্রদায়ের জন্য মোট আসন সংরক্ষণ করা হয় যথাক্রমে ৪৫

জন, ৬ জন এবং ৩৯ জন। এ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয় যে, কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীর স্বল্পতার কারণে কোনো আসন খালি হলে সেই আসন যে কোনো সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করার ক্ষমতা সিলেকশন কমিটির থাকবে। তাছাড়া উল্লিখিত আসন বণ্টন 'ভোর কমিটি'র নির্দেশনা অনুসারে করা হয়। এই কমিটি অবিভক্ত ভারতের সমস্ত মেডিকেল কলেজগুলোতে সবচেয়ে মেধাবীদের ভর্তির ওপর জোর দেন। এমনকি তারা ভর্তির ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ের সাম্প্রদায়িকাতাকে যেন উপেক্ষা না করা হয় সেদিকেও নজর দেন। তাই কমিটির সদস্যগণ ভর্তি প্রক্রিয়ায় যাতে মেধাবীদের মূল্যায়ন করা হয় এবং সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয় তার ওপর জোর দেন।[১০]

অন্যদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে যে ১০টি আসন সংরক্ষণ করা হয় তা 'ভোর কমিটির' নির্দেশনা অনুসারেই করা হয়। এই কমিটি মা ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতবর্ষের নারী চিকিৎসকদের সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দেন। এই ব্যাপারে ভোর কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়,

> In view of the importance of increasing to a large extent the number of women doctors in the country we recommend that about a quarter to a third of the admissions in the medical colleges should be reserved for suitable women candidates, if they are available.[১১]

সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সিলেকশন কমিটি ৪৩ জন মুসলমান (উপযুক্ত নারী শিক্ষার্থী না পাওয়ায়), ৫ জন তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ২ জনসহ ৩৮ জন সাধারণ শিক্ষার্থী নির্বাচিত করে। এভাবেই ৪টি আসন (২ মুসলমান + ১ জন তপশিলি + ১ জন সাধারণ) খালি ছিল। সিলেকশন কমিটি এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়।

এদিকে খালি আসনগুলো পূরণ করার জন্য কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল লে. কর্নেল আর. লিনটন (১৯৪৫-১৯৪৭) ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালকে এই বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করতে বলা হয়। কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল এক চিঠির মাধ্যমে ঐ কলেজের খালি আসন পূরণ করার নিয়ম বা রীতিটি জানান। সিলেকশেন কমিটি শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ণ কোটা নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন বিভাগে যেমন, মুসলমান, সাধারণ, নারী, তপশিলি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের তথা একটি পৃথক পৃথক অপেক্ষমান তালিকা প্রস্তুত করে। কোনো বিভাগে শূণ্য আসন থাকলে সেই সুনির্দিষ্ট বিভাগের অপেক্ষামান তালিকা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রার্থী দ্বারা পূরণ করার প্রস্তাব করা হয়। প্রিন্সিপালের দ্বারা সিলেকশন কমিটির দিক নির্দেশনা দেওয়া হলে সে ক্ষেত্রে সিলেকশন কমিটির রেফারেন্সের কোনো প্রয়োজন নেই। তবে নির্দিষ্ট কোনো বিভাগের অপেক্ষামান তালিকা শেষ হয়ে গেলে বা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রাধিকারের আদেশ সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হলে সিলেকশন কমিটির নিকট একটি রেফারেন্সের প্রয়োজন রয়েছে।[১২]

সরকার কর্তৃক সুপারিশকৃত সকল শিক্ষার্থীদের ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের প্রথম বর্ষে ভর্তির অনুমোদনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন কমিটি দুইজন মুসলমান শিক্ষার্থী ছাড়া সবাইকে নির্বাচিত করে। এই দুইজন শিক্ষার্থীর আই.এসসি. পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ ছিল। তারা ভর্তির শর্তানুসারে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল না। ফলে চূড়ান্তভাবে ৪১ জন মুসলমান, ৫ জন তপশিলি সম্প্রদায়ভূক্ত এবং ৩৮ জন সাধারণ শিক্ষার্থীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। তাই ৬টি আসন (৪ জন মুসলমান + ১ জন

তপশিলি সম্প্রদায় + ১ জন সাধারণ সম্প্রদায়) খালি থাকে। তবে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের একটি গোপন চিঠি (D.O. Letter No. DMC-XII. Date 5/8/1946 *[পরিশিষ্ট দেখুন-১০]* থেকে জানা যায় যে, ৩৯ জন মুসলমান, ৪ জন তফশিলি সম্প্রদায় এবং ৩৮ জন সাধারণ শিক্ষার্থীকে ভর্তির জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। এভাবে খালি আসন ৬ থেকে ৯ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। সার্জন জেনারেলকে দেওয়া ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের ৪/৮/৪৬ তারিখের চিঠিতে [*পরিশিষ্ট দেখুন*-১১] খালি আসনের চিত্রটি বর্ণনা করা হয়নি। এই চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে, সিলেকশন কমিটির যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার পরও ৮টি আসন খালি থাকে। সিলেকশন কমিটির সদস্য মিসেস আনোয়ারা খাতুন (এম.এল.এ.) এর মনোনয়নের মাধ্যমে তপশিলি সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষার্থীকে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়। তিনটি সাধারণ আসন অপেক্ষামান তালিকা থেকে পূরণ করা হয়। এই তিনজন শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষামান তালিকায় থাকে। তাঁকে স্থানীয় প্রতিনিধির সুপারিশের ভিত্তিতে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হয়। মুসলমানদের চারটি শূন্য আসনের মধ্যে তিনটি (৩) আসন মুসলমানদের মধ্য থেকে পূরণ করা হয়, কিন্তু একটি (১) মুসলমান শূন্য আসন পূরণ করা সম্ভব হয়নি, কারণ যোগ্য মুসলমান প্রার্থী পাওয়া যায়নি।

চিঠিতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হলেও উপরি-উক্ত ৯টি শূন্য আসন সাধারণ শিক্ষার্থীর মাধ্যমে পূরণ করা হয়। যার মধ্যে ৩ জন বার্মার অধিবাসী (১ জন মুসলমান + ২ জন সাধারণ), একজন খ্রিস্টান, একজন অনুন্নত শ্রেণি, একজন বৌদ্ধ ছিল। সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে অবশিষ্ট যে তিনজন ছাত্র ছিল তারা কোন সম্প্রদায়ের ছিলেন তা জানা যায় নি। এভাবেই ৪৭ জন (৩৮+৯) সাধারণ শিক্ষার্থী ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়।[১৩]

এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের আরেকটি চিঠি (Letter No. 83/DMC-XVII Dated 2.11.46 [*পরিশিষ্ট দেখুন*-১২] থেকে জানা যায় যে, সিলেকশন কমিটি হিন্দুদের জন্য অপেক্ষামান তালিকা তৈরি করে এবং একজন মুসলমান শিক্ষার্থীকে অপেক্ষামান তালিকায় রাখা হয়, কারণ মুসলমান শিক্ষার্থী আর কেউ যোগ্য ছিল না। প্রিন্সিপালের ৪/৮/৪৬ তারিখের চিঠি থেকে এটি বোঝা যায় যে, বাইরে থেকে দুইটি সাধারণ আসন পূরণ করা হয়। এই চিঠিতে দেখা যায় যে, অপেক্ষামান তালিকা শেষ না হলেও দুইটি সাধারণ আসন বাইরে থেকে নেওয়া শিক্ষার্থী দ্বারা পূরণ করা হয়। সিলেকশন কমিটির রেফারেন্স ছাড়াই তিনজন মুসলমান ছাত্র ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে একটি আসন মুসলমান শিক্ষার্থী দ্বারা পূরণ করা হয়। যার নাম অপেক্ষামান তালিকায় ছিল (Principal’s Letter, Dated 7.11.46 [*পরিশিষ্ট দেখুন*-১২]। অতএব ৯টি আসনের মধ্যে ৩টি আসন (একজন মুসলমানসহ) অপেক্ষামান তালিকা থেকে পূরণ করা হয় এবং সিলেকশন কমিটি অপেক্ষামান তালিকার রেফারেন্স ছাড়াই প্রিন্সিপালের সাধারণ বিবেচনার ভিত্তিতে যে ৬টি আসন পূরণ করে তা অননুমোদিত ছিল। তাই ভবিষ্যতে প্রিন্সিপালকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য এবং এরূপ অননুমোদিত কাজের জন্য অব্যাহতি পাবে কি না এর জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করার জন্য বিবেচনা করা হয়।

সিলেকশন কমিটির সদস্য আনোয়ারা খাতুন ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের ভর্তির ব্যাপারে একটি রিপোর্ট প্রেরণ করেন। রিপোর্টটিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, কিছু শিক্ষার্থী মেধার ভিত্তিতে ভর্তি হতে ব্যর্থ হলে কিছু আসন খালি থাকে। সিলেকশন কমিটি হিন্দু ছাত্রদের জন্য একটি অপেক্ষামান তালিকা তৈরি করে। মুসলমান ছাত্রদের জন্য এরূপ কোনো তালিকা তৈরি করা হয়নি। কলেজের প্রিন্সিপাল অপেক্ষামান

তালিকার নির্দেশনা ছাড়াই হিন্দু ছাত্র এবং সিলেকশন কমিটির নির্দেশনা রেফারেন্স ছাড়াই মুসলমান ছাত্রদের ভর্তি করে। তাই সিলেকশন কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত অপেক্ষামান তালিকা উপেক্ষা করার জন্য প্রিন্সিপালের কাজকে ভুল এবং অবিবেচক মনে করা হয়।[১৪] ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালকে অনিয়মিত বা খালি আসনগুলো পূরণ করার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন, তাঁকে বিচক্ষণতা দিয়ে খালি আসন পূরণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। সার্জন জেনারেল এই ধরনের মতের সাথে একমত ছিলেন না। তিনি (সার্জন জেনারেল) কলকাতা মেডিকেল কলেজের অনুসৃত নীতিটি গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন। অবশেষে সার্জন জেনারেলের প্রস্তাবটি বিবেচনা করা হয়।

ভর্তির এই প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়। প্রথমে তারা অবেদনকৃত শিক্ষার্থীদের বাছাইয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে। এরপর সিলেকশন কমিটি এসব শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে নিম্নোক্ত শিক্ষার্থীদের মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য বাছাই করে,[১৫]

মুসলমান	৪৩ জন
সাধারণ	৩৮
তফশিলি সম্প্রদায়	৫ জন
নারী	২ জন
মোট -	৮৮ জন

যোগ্য নারী শিক্ষার্থীর অভাবে মুসলমান আসন বৃদ্ধি পায়। কেননা আটটি (৮) নারী শিক্ষার্থীর শূন্য আসন পাঁচজন (৫) মুসলমান এবং তিনজন (৩) হিন্দু শিক্ষার্থীর মধ্যে বন্টন করা হয়। মুসলমানদের মধ্যে কেবলমাত্র ৪৩ জনই যোগ্যতা সম্পন্ন ছিল।

এদিকে সিলেকশন কমিটি সরকার কর্তৃক মনোনয়নের জন্য সংরক্ষিত দশটি (১০টি) আসনের ব্যাপারে কী ধরনের উদ্যোগ নিবে, তা জানা ছিল না। তারা মনে করে সরকারি আসনগুলো পূরণ হতে অনেক সময় লাগতে পারে। নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষ ছাত্রের জন্য এই শূন্য আসন বিবেচনা করা হয়, তবে এসব ছাত্রের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিচুমানের ছিল। কলেজের যাত্রা মাত্র দু'সপ্তাহ হয়, তাই তাদের ভর্তি প্রক্রিয়া বিলম্ব হলে পড়াশুনা বাধাগ্রস্থ হতে পারে। এই কারণে অনুমোদনের আগেই এসব সুপারিশকৃত শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। অন্যদিকে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের নয়জন ছাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করে। এই নয়জনের মধ্যে তিনজনকে বাদ দেওয়া হয়। তাদের আই.এসসি. পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ ছিল। বাকী ছয়জনকে আই.এসসি. পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অথবা সরকার কর্তৃক মনোনয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়। তৃতীয় বিভাগ পাওয়া ছাত্রদের বাদ দেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন কমিটি তাদের ভর্তির অনুমতি দেয়নি। এই বিষয়েই জেনারেল সিলেকশন কমিটির সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন কমিটির মতের ভিন্নতা ছিল।[১৬]

মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য যে ৩৯ জন মুসলমান ছাত্রকে নিবন্ধিত করা হয়, তাদের মধ্যে ১৪ জনের আই.এসসি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ ছিল, বাকিদের দ্বিতীয় বিভাগ ছিল। মুসলমানদের জন্য তখনও একটি শূন্য আসন সংরক্ষিত ছিল। মেধার ভিত্তিতে এসব ছাত্রদের নেওয়া হয় এবং প্রত্যাশা করা হয় তাঁরা ভালো করবে। অন্যদিকে ৪৭ জন সাধারণ ছাত্র নিবন্ধিত হয়। এই সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে ৩ জন বার্মিজ, ১ জন খ্রিস্টানকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। উল্লিখিত এই ছাত্রদের উঁচুমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা

ছিল এবং একজন স্থানীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের জন্য জোরালো সুপারিশ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের এই গ্রুপটি ছিল খুবই সন্তোষজনক । এসব শিক্ষার্থী ভালোভাবে পড়াশোনা করে এবং প্রথম বর্ষের বিষয়ের প্রতি অনেক আগ্রহ দেখায়।[১৭]

৪ জন তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ১ জন অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্র ভর্তি হয়। প্রকৃতপক্ষে মোট পাঁচজন তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়। এদের মধ্যে একজন নিবন্ধিত হতে ব্যর্থ হয়। তাঁর অনুপস্থিতির জন্য মিসেস আনোয়ারা খাতুন (এম.এল.এ.) এর মনোনয়নের মাধ্যমে অনুন্নত সম্প্রদায়ের একজনকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়। সিলেকশন কমিটি এই শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার নেয়নি। দুইজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করলে একজন সিলেকশন কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হয় এবং অন্যদেরকে সরকার কর্তৃক মনোনয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়।[১৮]

কলেজ খোলার পূর্বেই অপসারিত বার্মিজদের জন্য ৪টি আসন সংরক্ষণ করার জন্য কলকাতা থেকে বার্মার রিলিফ অফিসার সরকারকে অনুরোধ করে। তিনি ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্টকে বার্মিজদের জন্য সুপারিশসহ অনুরোধ করে। ইতিমধ্যে সরকারের অনুমোদনের আগেই ৩ জনকে সাধারণ তালিকাভুক্ত করা হয়। সাধারণভাবে এসব শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল খুবই সন্তোষজনক। ভর্তিকৃত সমস্ত ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বা গুণাগুণ ও মানের ওপর কলেজের প্রিন্সিপাল এবং বিশেষ অফিসার ডক্টর চ্যাটার্জি উভয়ই সন্তুষ্ট ছিলেন।[১৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্টে ভাইস চ্যান্সেলরকে ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের জন্য সিলেকশন কমিটি গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মিশ্র ধরনের সিলেকশন কমিটির মতের সাথে একমত ছিল না। এটা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট বিরোধী এবং তারা মনে করে যে, কারিগরি শিক্ষার মধ্যে চিকিৎসাশিক্ষা অন্যতম। এ ক্ষেত্রে পেশাগতভাবে সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন, সন্তোষজনকমানের উপযুক্ত শিক্ষাবিদকে নির্বাচন করা জরুরি। এই ব্যাপারে সরকার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্টের অধীনে কমিটিকে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়।[২০]

আবার এটাও দেখা যায় যে, মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের নির্বাচিত করার জন্য সরকার কর্তৃক তারযোগে (wireless) সিলেকশন কমিটি গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, মেডিকেল স্কুলের সদস্য ও অন্যান্যদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই কমিটিতে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী একটা কমিটি গঠন করেন। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাধারণ কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমসংখ্যক সদস্য থাকবে ও তাঁরা প্রাথমিক যাচাই বাছাই করবে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি পর্যালোচনা করবে এবং নির্বাচিতদের হয় অনুমোদন দিবে অথবা অননুমোদন দিবে না। সৌভাগ্যবশত এ ক্ষেত্রে প্রয়োগসিদ্ধভাবে কোনো বৈসাদৃশ্য ছিল না। বিষয়টি তেমন সহনশীল ছিল না। তাই অদূর ভবিষ্যতের জন্য বিষয়টি বিধিসম্মত করা উচিত বলে মন্তব্য করা হয়।[২১]

এদিকে কমিটির অপেশাজীবী সদস্যরা পদের ক্ষেত্রে সহায়ক হলেও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক সমস্যা থাকার কারণে প্রকৃত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী রেখে কম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত করলে বিরোধ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেমন, একজন সদস্য একজন অনুপযুক্ত শিক্ষার্থীকে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচিত করেন এবং পরবর্তীতে এই একই শিক্ষার্থীকে ভর্তির জন্য সুপারিশ করেন।

প্রকৃতপক্ষে উক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য অযোগ্য ছিল। এভাবে কমিটির পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তের ফলে এক ধরনের বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই সিলেকশন কমিটিকে সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনীতিমুক্ত থাকতে বলা হয়।[২২]

১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য যে সিলেকশন কমিটি গঠিত হয়, তার কার্যক্রম নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমালোচনা করা হয়। এই সমালোচনার অন্যতম বিষয়টি ছিল সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৪৬ সালে ঢাকার রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল অসহিষ্ণু ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় জর্জরিত। এরূপ পরিবেশে যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন নানারকম মন্তব্য সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতাকে বৃদ্ধি করে। *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় প্রচারিত 'ঢাকা মেডিকেল কলেজে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক মোছলেম ছাত্র গৃহীত' শিরোনাম থেকে বোঝা যায়। পত্রিকাটি থেকে জানা যায় যে,

> ঢাকা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ আরম্ভ হইবার শুরু হইতেই যাহাতে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা তাহাদের জন্য বিশিষ্ট হইতে কম হয় তজ্জন্য সক্রিয়া হইয়া উঠিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে তাঁহারা বেশ কৃতকার্য হইয়াছেন। [২৩]

দৈনিক আজাদ পত্রিকার উপরি-উক্ত খবরটি এতটাই নেতিবাচক ছিল যে, এ বিষয়টি স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সরকার বিভাগের সচিবকে জানাতে বাধ্য হয়। ফলে তাঁকে রির্পোট করে জানানো হয় যে, শুরু থেকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হিন্দু সম্প্রদায়ের কেন্দ্র হতে যাচ্ছে। ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ৩৯ জন মুসলমান প্রার্থী ভর্তি করা হয়েছে। অনেক বি.এসসি. প্রার্থী থাকা সত্ত্বেও মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়নি। শুধু তাই নয় চাপরাশি থেকে শুরু করে অধ্যাপক নিয়োগে মুসলমান প্রার্থীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাই বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়।[২৪] রির্পোটের এই খবরটি যে সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন তা উপরি-উক্ত কমিটির যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া দেখে বোঝা যায়।

১৯৩৬ সালে ৩১ অক্টোবর মওলানা আকরম খাঁ এর উদ্যোগে ও সম্পাদনায় বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মুখপত্র হিসেবে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকার মাধ্যমে মুসলমানদের দাবিদাওয়া সংশ্লিষ্ট নানা খবর প্রচারিত হয়। পত্রিকাটি সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এই পত্রিকার সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন সবাই (বার্তা সম্পাদক, সাহিত্যিক মোহাম্মদ মোদাব্বের, মোহাম্মদ খায়রুল আলম খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, ঢাকা প্রতিনিধি খায়রুল কবির) মুসলমান ছিলেন। তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করাই ছিল পত্রিকার মূল উদ্দেশ্যে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ে তথা ১৯৪৬ সালে দেশভাগের প্রাক মুহূর্তে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি ঘটে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার মধ্যে মেডিকেল কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলে এ সময়কে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করে উল্লিখিত খবরটি প্রচার করে। সিলেকশন কমিটির যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া থেকে বিষয়টি বোঝা যায়, কেবলমাত্র উপযুক্ত ও যোগ্য মুসলমান শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। এখানে ধর্মের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পূর্ববাংলার প্রথম বাংলা সাংবাদপত্র *ঢাকা প্রকাশ* ব্রাহ্মধর্ম অনুসারীদের তথা হিন্দুদের মুখপত্র হিসেবে পরিচালিত হতো। এই পত্রিকার সম্পাদক থেকে শুরু করে সকলেই (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, দিনবন্ধু মৌলিক প্রমূখ) হিন্দু ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ৯০ এর দশকে হিন্দু পুনরত্থানবাদী আন্দোলনের খবর এই পত্রিকা থেকে প্রকাশিত হতো। প্রথম দিকে এই পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্মধর্মের মত

ও বিশ্বাস প্রচার হলেও পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশি আন্দোলন এবং তৎকালীন সময়ে নানা রাজনৈতিক খবরা খবর প্রচার হতো। স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে, পত্রিকাটি হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব ও পক্ষপাতিত্ব করত। অতএব ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হলে হিন্দুদের এই মেডিকেল কলেজে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার মতো *ঢাকা প্রকাশ* 'ছাত্র ভর্তিতে পক্ষপাতিত্ব' শিরোনামে খবরটি প্রচার করে।[২৫]

দৈনিক আজাদ পত্রিকায় মুসলমানগণ হিন্দুদের বেশি আসন দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করে। অন্যদিকে *ঢাকা প্রকাশ* এ হিন্দুরা মুসলমান ছাত্র বেশি ভর্তি করা হয়েছে বলে দাবি করেন। উভয় পত্রিকার মন্তব্য থেকে সাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ সরকারি কার্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, উপযুক্ত মুসলমান ছাত্র না পাওয়ায় হিন্দু ছাত্রদের ভর্তি করা হয়। এটা স্বাভাবিক যে, তৎকালীন সময়ে পূর্ববাংলার অধিকাংশ মুসলমান ছিল অশিক্ষিত। ভারতবর্ষে হিন্দুরাই প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে। এ দিক থেকে বিবেচনা করলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে বেশি ছিল। উপরন্তু চিকিৎসাশিক্ষা ছিল পুরোপুরি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানভিত্তিক ও কারিগরি শিক্ষা। তাই মেডিকেল কলেজে পড়তে হলে তাদের অবশ্যই আই.এসসি.তে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়তে হবে। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা ছিল যেমন ব্যয়বহুল তেমনি কঠিন। পূর্ববাংলার অধিকাংশ মুসলমান জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ ছিল। যারা স্বচ্ছল, সচেতন ছিল তারা তাদের সন্তানকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললেও, বেশির ভাগই তাদের সন্তানদের সাধারণ শিক্ষায় (কলা, সাহিত্য, আরবি) শিক্ষিত করে তুলতো। অন্যদিকে যেসব মুসলমান ছাত্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়তো তাদের আই.এসসি. পরীক্ষার ফলাফল তুলনামূলকভাবে খারাপ ছিল। মুসলমান ছাত্র থাকলেও তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়ার উপযুক্ত ছিল না। ঢাকা প্রকাশের সংবাদ প্রতিনিধিরা ভর্তি প্রক্রিয়ার বিষয়টি পুরোপুরি না জেনে অতিরঞ্জিত খবর প্রচার করে যা তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি ছিল খুবই স্পর্শকাতর। পর্যাপ্ত হিন্দু ছাত্র ভর্তি করা সত্ত্বেও *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় এই ধরনের মন্তব্য সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। এ সময় পূর্ববাংলা তথা ঢাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক আশঙ্কাজনক ও উদ্বেগজনক অবস্থায় ছিল, কারন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগে যায়। এরকম একটি পরিবেশে যখন মেডিকেল কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন এই ধরনের মন্তব্য প্রচারণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অকৃতকার্য হওয়ার কারণে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়, সেই শূন্য আসনগুলো পূরণ করার ব্যাপারে সরকারের তেমন কোনো নির্দেশনা ছিল না। শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ১০টি শূন্য আসন থাকে। সিলেকশন কমিটি অপেক্ষামান তালিকা থেকে শূন্য আসনগুলো পূরণ করার পরামর্শ দেয়। প্রিন্সিপাল চতুর্থবারের মতো সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে। সিলেকশন কমিটির কিছু সদস্য রাজনৈতিক কারণে ঢাকার বাইরে চলে যাওয়ায় সবাইকে একত্রিত করা সম্ভব হয়নি। তাই কমিটি কর্তৃক ২২ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই দুইজন শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা ছিল কঠিন। ইতিমধ্যে এই দুইজন ছাড়া সমস্ত শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এরূপ অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালকে তাঁর বিচক্ষণতা দিয়ে এই শূন্য আসন পূরণ করার জন্য পরামর্শ দেয়। এটি অনুমোদন করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হয়, কেননা এটা ছিল ন্যায়সংগত পদ্ধতি।

অন্যদিকে যে সমস্ত শিক্ষার্থী ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়, তাদের ২২ জনের মধ্যে কারো উদ্ভিদবিদ্যা ছিল, কারো প্রাণিবিদ্যা ছিল এবং ৩৪ জনের কেবলমাত্র উদ্ভিদবিদ্যা ছিল। এর ফলে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়। এসব ছাত্রদের জন্য এই বিষয়গুলোতে মেডিকেল কলেজে পাঠদানের ব্যবস্থা করা ছিল কঠিন। এমনিতেই মেডিকেলের কোর্সগুলো কঠিন ছিল, তা সত্ত্বেও তাদেরকে অতিরিক্ত জীববিজ্ঞানের ক্লাশ করতে হতো। তাই শিক্ষার্থীদেরকে সকাল ৭:৩০ থেকে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত কাজ করতে হতো। জীববিজ্ঞান ছাড়া এনাটমি ও ফিজিওলজি বোঝা সম্ভব ছিল না।

সরকারি কার্যবিবরণীতে ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের নির্বাচিত করা হয়, তাদের একটি নামের তালিকা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, মুসলমান শিক্ষার্থীদের ১৯৪৬ সালের ১৫ জুলাই এবং ১৬ জুলাই হিন্দু শিক্ষার্থীদের ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট এর দপ্তরে মেডিকেল পরীক্ষা নেওয়া হয়। সরকারি কার্যবিবরণীতে ৪১ জন মুসলমান, ৩৬ জন হিন্দু, ৫ জন তপশিলি সম্প্রদায় ও ২ জন নারী শিক্ষার্থীর নাম পাওয়া যায়।[২৬] [*পরিশিষ্ট দেখুন*-১৩]

এদিকে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্মোক্ত ফি ধার্য করা হয়।[২৭] যারা অকৃতকার্য হয় তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়,

ভর্তি ফি	২৫ রুপি
টিউশন ফি	১০০ রুপি
ছাত্র ইউনিয়ন ফি	৬ রুপি
গবেষণাগারে গবেষণা করার জন্য কশন ফি	১০ রুপি
মোট	১৪১ রুপি

এ ছাড়া ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন কমিটি নিম্লোক্ত দুইজন শিক্ষার্থীকে ভর্তির অনুমতি দেয়নি।[২৮] এই দুইজন শিক্ষার্থী সরকার কর্তৃক সিলেকশন কমিটিতে নির্বাচিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে অনুমোদন দেয়নি। তারা ভর্তির নিয়মানুযায়ী অনুপযুক্ত ছিল।

১. এ. এফ. এম বাসিত আই.এসসি. তৃতীয় বিভাগ
২. মীর্জা আলী হায়দার আই.এসসি. ঐ

অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন কমিটি আসামের নিম্লোক্ত পাঁচ জন শিক্ষার্থীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির অনুমোদন দেয়।[২৯]

১.	আবদুল হক চৌধুরী	আই.এসসি.	দ্বিতীয়	(আসাম)
২.	মো. ইশফাকুল জাহান	ঐ	দ্বিতীয়	(আসাম)
৩.	রত্নজিৎ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য	ঐ	প্রথম	(আসাম)
৪.	প্রবুদ্ধ এস ভট্টাচার্য	ঐ	প্রথম	(আসাম)
৫.	সুরীন্দ্র কুমার মিত্র	ঐ	প্রথম	(আসাম)

ঢাকা মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়াটি সহজ না হলেও যেকোনো ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, বংশের যোগ্য শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ আপত্তি ছিল না। অথচ ভারতবর্ষের প্রথম মেডিকেল কলেজ

কলকাতা মেডিকেল কলেজ যে ৩৫ দফা নিয়মাবলীর ভিত্তিতে স্থাপিত হয়, এগুলোর মধ্যে ২০ দফা নিয়ে বেশ সমালোচনা হয়। এই কলেজে ভর্তি হতে হলে ছাত্রদের বংশ মর্যাদা উচুঁ হতে হবে। এই দফায় উল্লেখ করা হয়,

> সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আসা ছাত্রদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে উৎসাহিত করার জন্য, দেশীয় চিকিৎসকগণ পাশ করলেই প্রশংসাপত্র ও মাসে ৩০ টাকা বেতন পাবেন।[৩০]

কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচে (১৮৩৫) ৫০ জন ছাত্র ভর্তি হয়। তার মধ্যে ৫ জন ব্রাহ্মণ, ১৫ জন কায়স্থ, ৩ জন বৈদ্য, ২ জন স্বর্ণকার, ১ জন গন্ধবণিক, ৬ জন তন্তুবায়, ৮ জন সুবর্নবণিক এবং অন্যান্য জাতি ১০ জন। এই ছাত্রদের মধ্যে একজন খ্রিস্টান ছিলেন। মুসলমান প্রার্থী যোগ্য না হওয়ায় কেউ ভর্তি হতে পারেনি।[৩১]

কলকাতা মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে এরকম অবস্থা হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ এ ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক ও শ্রেণিহীন সমতার পরিচয় দেয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য বংশগত কোনো শর্ত ছিল না, বরং তাদের যোগ্যতা ও মেধাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা যে সম্প্রদায়ের বা বংশের হোক না কেন তাতে কোনো আপত্তি ছিল না। ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষের ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে ডা. আশেকুর রহমান খান বলেন, 'ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে পাশ করার পর মৌখিক ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে আমরা ৪০ জন মুসলমান এবং হিন্দু ও খ্রিস্টানসহ ৬০জন মোট ১০০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হই। এর মধ্যে কল্যাণী নামে (সম্ভবত: বিধবা) মেয়ে এবং শীলা মেহরা নামে এক শিখ মেয়ে ছিল। তার পিতা ছিলেন রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার।'[৩২]

অন্যদিকে একই বিষয়ের ওপর অধ্যাপক ডা. মীর্জা মাজহারুল ইসলাম বলেন, '... মনে পড়ে আমরা ১০০ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিলাম। এর মধ্যে ৪০ জন মুসলমান, ৫০ জন হিন্দু ও ১০ জন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের। প্রথম ব্যাচে দিল্লি, বার্মা ও অন্যান্য প্রদেশের নারী শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও পূর্ববাংলার কোনো নারী শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। পরবর্তীতে অনেক নারী শিক্ষাথী ভর্তি হয়। এসব নারী শিক্ষার্থীর বেশিরভাগই মুসলমান সম্প্রদায়ের ছিল।'[৩৩]

পূর্ববাংলার যেসব শিক্ষার্থী এই কলেজে ভর্তি হয় তারা বেশিরভাগই স্বচ্ছল পরিবারের ছিল। স্বচ্ছল পরিবার বলতে স্বচ্ছল কৃষক, চাকুরিজীবী, আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদদের সন্তান ছিল। মীর্জা মাজহারুল ইসলামের পিতা একটি বার্মা কোম্পানিতে চাকুরি করতেন। তিনি বলেন, 'অধিকাংশ শিক্ষার্থী মেধার ভিত্তিতে ভর্তি হতো। এসব শিক্ষার্থীর পড়াশোনার খরচ সরকারই বহন করতেন এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থী স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা করত। ফলে কোনো শিক্ষার্থীর অর্থের জন্য পড়াশোনা বাধাগ্রস্থ হয়নি। তবে ১০ অথবা ১১ জন শিক্ষার্থী মুসলিম লীগ সরকারের নমিনেশন নিয়ে ভর্তি হয়েছিল।'[৩৪]

মীর্জা মাজহারুল ইসলাম, আশেকুর রহমান প্রমুখ ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচে (১৯৪৬-৪৭) ১০০ জন ছাত্র ভর্তির কথা উল্লেখ করলেও ১৯৪৬ সালের *ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বার্ষিক বিবরণীতে* শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০১ জন উল্লেখ করা হয়, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। নানা সমস্যার মধ্যদিয়ে যখন ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয় তখন কলেজের প্রিন্সিপাল ইন্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রারকে অবহিত করে একটি চিঠি [*পরিশিষ্ট দেখুন-১৪*] পাঠান। এই চিঠিতে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা দেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৪৬ সালের ১লা জুলাই থেকে

ঢাকায় একটি নতুন মেডিকেল কলেজের যাত্রা শুরু হয়েছে। কলেজটি রমনার পুরাতন সেক্রেটারিয়েট ভবনে অবস্থিত। এখানে প্রতিবছর ১০০ জন ছাত্র ভর্তি করা হবে। বাংলা সরকার সার্জন জেনারেলের মাধ্যমে মেডিকেল কলেজের জন্য গবেষণাগার, লেকচার থিয়েটার ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে একটি উন্নত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নতুন কলেজ হাসপাতালে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট করে প্রস্তুত করা হয়েছে। মিটফোর্ড হাসপাতালের শয্যা সংখ্যার চেয়ে বেশি। পরবর্তীতে এই শয্যা সংখ্যা ৬০০ থেকে ১০০০ হবে। এই বিষয়টি,

ক. ভোর কমিটি

খ. বাংলা সরকারের সার্জন জেনারেলের পরিকল্পনা অনুসারে করা হয়েছে।

তাই কলেজের প্রিন্সিপাল ইন্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের স্বীকৃতির (Recognition) ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তবে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদান করবে। তাই ব্রিটিশ লাইসেন্সির বোর্ডের রেগুলেশন অনুসারে কলকাতা মেডিকেল কলেজ কোর্সের একটি মডেল তৈরি করে।[৩৫]

এই চিঠির জবাবে ইন্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিলের সেক্রেটারি ৭ ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালের আরেকটি চিঠি ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে পাঠান। উক্ত চিঠিতে সেক্রেটারি জানান যে, কলেজের উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে ইন্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে কলেজের পাঠদানে সুযোগসুবিধা, কোর্স এবং পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয় পরিদর্শন করা হবে। ডিগ্রি দেওয়ার ব্যাপারে কলেজ যেকোনো পদক্ষেপ নিতে পারবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৯৩৩ সালের ইন্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিলের প্রথম তপশিলসহ ১১ (২) ধারা অনুসরণ করার প্রস্তাব করা হয়।[৩৬]

এই আইনটি অবিভক্ত ভারতের সমস্ত প্রদেশের উঁচু স্তরের চিকিৎসাশিক্ষার নূন্যতম মান বজায় রাখার জন্য করা হয়। ঔপনিবেশিক ভারতের প্রথম মেডিকেল কলেজ কলকাতা মেডিকেল কলেজে অনেক কিছুরই অভাব ছিল। শুরুর দিকে কলেজে মিউজিয়াম, হাসপাতাল এমনকি লাইব্রেরি ছিল না এবং মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। উপরন্তু মাত্র দুইজন শিক্ষক ডা. হেনরি হ্যারি গুডিভ (১৮০৭-১৮৮৪) ও ডা. মাউন্ডফোর্ড জোসেফ ব্রামলি (চাকুরিকাল: ১৮৩৫-১৮৩৭) কে নিয়ে এই কলেজের যাত্রা শুরু হয়। একই বছরের (১৮৩৫) অক্টোবর মাসে ডা. স্যার উইলিয়াম ব্রুক ওশনেশী (Sir William Brooke O'Shaughnessy 1809-1889) কলেজে যোগদান করেন। এসব সীমাবদ্ধতা নিয়ে কলেজের যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীতে কলেজটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কলেজে পরিণত হয়। উচ্চবর্ণ ও ভালো পরিবারের জ্ঞানী ও সুশিক্ষিত একটি শ্রেনি নিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজের যাত্রা শুরু হয়। ১৮৪৮ সালে এই কলেজেরই অধ্যাপক ডা. গুডিভ কলেজের এক অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।[৩৭]

কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার পর শুরুতে যতটা সাহায্য, সহযোগিতা, উৎসাহ পাওয়ার কথা ছিল ততটা পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে এই কলেজ ভারতের গৌরব হয়ে দাড়ায়। এই ব্যাপারে ১৮৫১ সালে লন্ডনের *'The King's College Magazine'* এ উল্লেখ করা হয়।[৩৮] অনুরূপভাবে পূর্ববাংলার প্রথম উন্নত চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ শুরুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র ভর্তি হলেও যথেষ্টসংখ্যক চিকিৎসা সংক্রান্ত বই, গবেষণাগার, মিউজিয়াম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, শিক্ষক, ছাত্রদের বাসস্থানের ব্যবস্থা, নার্স কোয়ার্টার, শিক্ষক ও প্রিন্সিপালের বাসভবনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই ঢাকার সিভিল সার্জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে ৩০০ থেকে ৪০০

জন ছাত্রের ধারণক্ষমতায় সক্ষম বড় হোস্টেল, নার্সদের কোয়ার্টার ও প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। ১৯৪৬ সালের ৬ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কাউন্সিলে উল্লেখ করা হয়,

> That the University will agree to part with the triangular area of land adjacent to the Medical College compound for the construction of additional buildings required for (i) nurse’s residence (ii) Principals quarters and (iii) hostel for the accommodation of students only when Government makes over to the University a suitable site for the construction of the Fazlul Haq Muslim Hall.[৩৯]

কলেজের নিজস্ব ছাত্রাবাস না থাকায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচ (১৯৪৬) ও দ্বিতীয় ব্যাচের (১৯৪৭) ছাত্রদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক হল, ঢাকা হল ও জগন্নাথ হল) থাকতে হতো। খ্রিস্টান ছাত্রদের জন্য সদরঘাটের কাছে অবস্থিত ‘ব্যাপটিস্ট মিশন’ হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া পূর্ববাংলা সরকার মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের বসবাসের জন্য তৎকালীন আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও কলেজ ক্যাম্পাসের দক্ষিণে রেল লাইনের অপর পারে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অবস্থিত পলাশী ব্যারাকের একটি অংশ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। আবার কেউ কেউ বাসায় থেকে পড়াশোনা করত। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শুরুর দিনগুলো সম্পর্কে প্রথম ব্যাচের ছাত্র অধ্যাপক মীর্জা মাজহারুল ইসলাম (১৯২৭-২০২০) বলেন,

> ১৯৪৬ সালে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে আই.এসসি পাশ করার পর কলকাতা ও ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য সিলেক্ট হই। কিন্তু দেশ বিভাগের পূর্বাভাসের কারণে ১৯৪৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হই। সেই সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজে শুধু প্রথম বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষের পড়াশুনা চলছিল।... তখন কলেজের কোনো নিজস্ব হোস্টেল ছিল না। আমি থাকতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের সাউথ ব্লকের গ্রাউন্ড ফ্লোরের ১৬৭ নম্বর কক্ষে। বদরুল আলম (মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র) বেশির ভাগ সময় বাসায় থাকত। আজিমপুরের বাসা থেকে ক্লাশ করত।[৪০]

ঢাকা মেডিকেল কলেজের একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, এই কলেজের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের প্রতিটি ব্যাচকে ইংরেজি ‘কে’ (K) অক্ষর দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। ‘কে’ এর নামকরণ কে বা কারা এবং কখন করা হয় তা কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। তবে এটা সত্যি যে, এটাই তাদের ব্যাচ পরিচিতি। এই নিয়ে নানারকম মতভেদ আছে। কারো মতে, ‘কে’ হলো ইংরেজি বর্ণমালার ১১তম অক্ষর। অতঃপর এটা দিয়ে পাক ভারত উপমহাদেশের ১১তম মেডিকেল কলেজকে নির্দেশ করে। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায় যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে ১৬টি মেডিকেল কলেজ ছিল, যা প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে কেউ মনে করেন যে, এটা করাচি শব্দ থেকে এসেছে। এটা প্রথম করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। কেউ মনে করেন, এটা কলকাতা শব্দ থেকে এসেছে। দেশ বিভাগের সম্ভাবনা ও দেশ বিভাগ এই উভয় কারণেই কলকাতা মেডিকেল কলেজের অনেক ছাত্র মাইগ্রেশন করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চলে আসে। আবার অন্যরা মনে করেন যে, ক্লিনিক্যাল (Clinical) শব্দ থেকে ‘কে’ এসেছে। ফলশ্রুতিতে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে ঢাকা মেডিকেল কলেজের যে প্রথম (১ম) ব্যাচ ভর্তি হয়, তা ‘কে-৫’ নামে পরিচিতি লাভ করে। একই সময়ে ভারতের অন্যান্য মেডিকেল কলেজ থেকে আসা মাইগ্রেশনকৃত শিক্ষার্থীদের ‘কে-১’, ‘কে-২’, ‘কে-৩’ এবং ‘কে-৪’ নাম দেওয়া হয় এবং যারা যথাক্রমে ৫ম বর্ষ, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় বর্ষ এবং ২য় বর্ষে ভর্তি হয়।[৪১] দেশ বিভাগের কারণেই ১৯৪৬ সালের

জুলাই মাসে ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিজস্ব নতুন প্রথম ব্যাচ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য মেডিকেল কলেজের মাইগ্রেশনকৃত বিভিন্ন বর্ষের (২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম) ছাত্রদের ভর্তি করে *[পরিশিষ্ট দেখুন-১৫]*। এই নামকরণের ব্যাপারে মীর্জা মাজহারুল ইসলাম (১৯২৭-২০২০) এর কাছে জানতে চাওয়া হলে, তিনি এই ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু জানেন না বলে মন্তব্য করেন।[৪২] তাই 'কে' এর সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আজও পাওয়া যায়নি। ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলেও আজও ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিটি ব্যাচের নাম 'কে' দিয়ে শুরু হয়।

ঔপনিবেশিক ভারতের প্রথম মেডিকেল কলেজ কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও পূর্ববাংলার প্রথম মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মধ্যে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো। কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রথম থেকে কী কী বিষয়ে পড়ানো হবে, তার একটা রূপরেখা ডা. ব্রামলি তৈরি করে দেন। তিনি বলেন,

> এই বিষয়ের প্রেক্ষিতে, মেডিকেল কলেজে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা দেবার পদ্ধতি এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা আমি পেশ করি বিবেচনার জন্য এখনও পর্যন্ত ছাত্রদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা হল তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক এনাটমি, শরীরতত্ত্ববিদ্যা, তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক রসায়নবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান, মেটেরিয়া মেডিকো, ব্যবহারিক ঔষধ প্রস্তুতিকরণ এবং হাসপাতালে উপস্থিত থাকা সম্পর্কে লেকচার।[৪৩]

ব্রামলি'র উপরিউল্লিখিত বিষয়গুলো মূল তিন শিক্ষক পড়াতেন। অধ্যাপক ডা. ব্রামলি পড়াতেন এনাটমি, ফিজিওলজি এবং সার্জারি, ডা. গুডিভ পড়াতেন এনাটমি, ফিজিওলজি, ফিজিকস, ধাত্রীবিদ্যা এবং ডা. ওশনেশী পড়াতেন ন্যাচারাল ফিলসফি, কেমিস্ট্রি, মেডিকেল বোটানি, মেটেরিয়া মেডিকো এবং ফার্মেসি। এই তিন শিক্ষককে ছাত্রদের এতগুলো বিষয়ের ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষাদান করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হতো। এই সমস্যাটি কেবল কলকাতা মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষই নয়, পত্রপত্রিকার লোকজনও উপলব্ধী করেন।[৪৪] অনুরূপভাবে ১৯৪৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ তিনটি প্রি-ক্লিনিক্যাল বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। যা নিম্নরূপ,

১. এনাটমি
২. ফিজিওলজি
৩. কেমিস্ট্রি

মেডিকেল কলেজের প্রধান ভবনের কোনো একটি অংশে এনাটমি বিভাগ ছিল। এর একটি বড় লেকচার হল ছিল। এ সময় কোনো ডাইসেকশন হল ছিল না। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ডাইসেকশনের জন্য ঢাকা মেডিকেল স্কুলে যেত। অন্যদিকে তাদের এনাটমির তত্ত্বীয় ক্লাশ, কলেজের বড় লেকচার হলে অনুষ্ঠিত হতো। আবার ফিজিওলজির বিভাগ হিস্টোলজি (Histology) ও কেমিক্যাল ফিজিওলজির (Chemical Physiology) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময় ফিজিওলজির ওপর গবেষণামূলক কাজের জন্য কোনো ল্যাবরেটরি ছিল না।[৪৫] রসায়ণ বিভাগের ল্যাবরেটরি প্রশাসনিক শাখার দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শুরুর দিকে পাঠদানের জন্য কোনো শিক্ষক যোগদান করেনি। শিক্ষার্থীদের কয়েক মাসের জন্য ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ক্লাশ করতে হয়েছে, তবে এই সমস্যা দ্রুত সমাধান হয়ে যায়। উক্ত দুই বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য ডাক্তার পশুপতি (এনাটমি) এবং ডাক্তার হীরালাল সাহা (ফিজিওলজি) যোগদান করেন। অন্যদিকে কেমিস্ট্রির পাঠদানের জন্য ঢাকা কলেজের কেমিস্ট্রির অধ্যাপককে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তৎকালীন সময়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে

সাইকোলজি বিষয়টি প্রথম বর্ষের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজে শুরুর দিকে থাকলেও পরবর্তীতে বিষয়টি পাঠ্যক্রমে রাখা হয়নি। এই বিষয়টি অধ্যক্ষ ভারজিন পড়াতেন। সাইকোলজি বিষয়টি বাদ দেওয়ায় এটি আর চিকিৎসাশিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়নি। অথচ সাইকোলজি বিষয়টি একজন ভবিষ্যৎ চিকিৎসকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[৪৬] ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডা. আশেকুর রহমান বলেন,

> এনাটমি ও ফিজিওলজির অধ্যাপক না আসা পর্যন্ত আমরা মিটফোর্ডে প্রায় মাসখানেক পড়াশুনা ও ডাইসেকশন শুরু করি। তখনকার লেকচারার ও ডেমনস্ট্রেটরগণ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতেন।[৪৭]

শুরুর দিকে শিক্ষার্থীদের কাছে চিকিৎসাশিক্ষার বিষয়গুলো অত্যন্ত জটিল মনে হতো। কোনো সিনিয়র শিক্ষার্থী না থাকায় তারা সহজেই কারো কাছ থেকে বুঝতে পারত না। এই সমস্যা সাময়িক ছিল। এনাটমির শিক্ষক হিসেবে পশুপতিকে নিয়োগ দেওয়া হলে তাদের কাছে চিকিৎসা বিষয়ের পাঠ অনেক সহজ হয়ে ওঠে। তিনি শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাতেন এবং ২-৩ ঘন্টা ধরে ক্লাশ নিতেন। তিনি এতটাই দক্ষতার সাথে ক্লাশ নিতেন যে, তাঁর লেকচারের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনেক চিকিসৎক তাঁর লেকচার শোনার জন্য উপস্থিত হতেন।[৪৮]

যাহোক এনাটমি বিভাগ নিম্নোক্তদের নিয়ে গঠন করা হয়,

১. একজন অধ্যাপক
২. একজন সহকারী অধ্যাপক
৩. তিনজন ডেমনস্ট্রেটর এবং
৪. দুইজন টেকনিশিয়ান

অপরদিকে ফিজিওলজি বিভাগ একজন অধ্যাপক একজন সহকারী অধ্যাপক এবং তিনজন ডেমনস্ট্রেটর নিয়ে গঠন করা হয়। ফিজিওলজি বিভাগের প্রথম প্রধান ছিলেন হীরালাল সাহা। আবার কেমিস্ট্রি বিভাগ একজন অধ্যাপক, তিনজন ডেমনস্ট্রেটর এবং দুইজন টেকনিশিয়ান নিয়ে গঠিত হয়।[৪৯] এসব বিভাগের ক্লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবনে অনুষ্ঠিত হতো।

উপরি-উক্ত বিভাগ ছাড়া ১৯৪৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের একটি ছোট গ্রন্থাগার ছিল। এটা উল্লেখ করার মতো ছিল না। গ্রন্থাগারটি হিস্টোলজি (Histology) ল্যাবরেটরির একটি ছোট অংশে অবস্থিত ছিল। এই গ্রন্থাগারের বেশিরভাগ বই আমেরিকার সামরিক হাসপাতালের কর্মকর্তারা রেখে যায়। এভাবেই দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজের এক দেড় বছর অতিবাহিত হয়। এরপরে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কারণে পঠন পাঠনে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ধর্মের ভিত্তিতে যখন ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয় তখন দুই বাংলাও বিভক্ত হয়। এর ফলে পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিমবাংলা ভূখন্ড পরিবর্তনের যাত্রা শুরু হয়। এই যাত্রার যাত্রী হয় ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষ। মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও এই একই ঘটনা ঘটে। দেশভাগের প্রাক মুহূর্তে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডা. ডব্লিউ. জে. ভারজিন কলকাতায় চলে যান। তার পদটি খালি হলে ডা. মো. রেফাতউল্লাহকে সাময়িকভাবে কলেজের প্রিন্সিপাল ও হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট এর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ভারজিনের পরপরই এনাটমি ও ফিজিওলজির শিক্ষকগণ চলে যান। এ ছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজের বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী চলে যায়। এ ক্ষেত্রে

ঢাকা মেডিকেল কলেজের যে দুইজন ছাত্রী ভর্তি হয়, তারমধ্যে গৌরি ভট্টাচার্য চলে যায় বলে আহমদ রফিক তাঁর *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন। অপরদিকে কলকাতা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বর্ষে অধ্যয়নরত মুসলমান ছাত্রদের অধিকাংশ ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। এদেরই একজন ডা. সাঈদ হায়দার, তিনি ১৯৪৪ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে টিসি নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এ সময় কলকাতা থেকে আসা ছাত্রদের অধিকাংশ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রদের জন্য নিজেস্ব কেনো ছাত্রাবাস না থাকায় সরকার কলকাতা থেকে আগত মেডিকেল ছাত্রদের বসবাসের জন্য পুরাতন পলাশী ব্যারাকগুলির একটি নির্দিষ্ট করে দেয়।[৫০] শুধু তাই নয় সে সময় যারা কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিল তাদের পরীক্ষা ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের প্রথম এমবিবিএস পরীক্ষার আগে তাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দেয়। সে আশ্বাসের ভিত্তিতে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে আসা ছাত্ররা ভর্তি হন।[৫১]

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ ১০১ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে তার যাত্রা শুরু করে। দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত তথা এক-দেড় বছরের মধ্যে প্রি-ক্লিনিক্যাল বিষয়গুলো (এনাটমি, ফিজিওলজি, কেমিস্ট্রি, ফার্মাকোলজি) পাঠদানের ব্যবস্থা করে। প্রথম অবস্থায় এই বিষয় গুলো পাঠদানে শিক্ষক স্বল্পতা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জামের অভাব ছিল। ফলে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ও ঢাকা কলেজের সহায়তা নিতে হয়। কর্তৃপক্ষ সাময়িক এই সমস্যা সমাধানের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের কারণে শিক্ষকশূন্যতাসহ নানারকম সমস্যা আবার দেখা দিলে পুনরায় প্রতিষ্ঠানটিকে নতুনভাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাই সবকিছু নতুন করে গড়ার পদক্ষেপ পরবর্তী অধ্যক্ষকে নিতে হয়। পরবর্তীতে নতুন নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা, দক্ষ, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দেওয়াসহ প্রতিষ্ঠানটি আধুনিকীকরণ ও বিশ্বমানসম্মত করার জন্য নানারকম উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. Indian Medical Council Act 1933, বলা হয় যে, 'Whereas it is expedient to constitute a Medical Council in India in order to establish a uniform minimum standard of higher qualification in medicine for all provinces; It is hereby enacted as follows,

   1. It extends to the whole of India
   2. a) "Indian University" means any University established by an Indian law and having a Medical Faculty.

      b) "The Council" means the Medical Council of India constituted under this Act;
      c) "Medical Institution" means any institution, within or without the states which grants degrees, diplomas, or license in medicine.
      d) "Medicine" means modern scientific medicine and includes surgery and obstetrics, but does not include veterinary medicine and surgery'. দেখুন, এ বিষয়ে আরও উল্লেখ রয়েছে Act 027 of 1933 : Indian Medical Council Act, 1933.

২. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1946 52, East Bengal Government press, Dacca, 1954, p. 1.

৩. *The Minutes of the Executive Council* held on 6th July, *Executive Counil, University of Dhaka*, Session: 1945-46, 1946.p. 6.

৪. *বার্ষিকী* ২০০৬, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, পৃ. ২৩।

৫. আহমদ রফিক, *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ*, ১৯৪৭-১৯৭১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৪।

৬. '১৯৪৬-৪৭ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ১০০জন বেসামরিক ছাত্রকে ভর্তি করা হইবে। বাঙলা গভর্ণমেন্ট এই ১০০টি সীট নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করিয়াছেন, মুসলিম ৪০, সাধারণ ৩৫, তপশীলী [*sic*] সম্প্রদায় ৫, মহিলা ১০, সরকার মনোনীত প্রার্থী ১০। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১০টি সীটের মধ্যে ৫টি মুসলিম এবং একটি তপসীলী *[sic]* প্রার্থীকে দেওয়া হইবে। সরকার মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যেও ৫জন মুসলিম এবং একজন তপশীলী ছাত্র থাকিবেন। কোন সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত সীটের অনুপাতে যোগ্য, প্রার্থী অভাব হইলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রার্থীর দ্বারা উহার পূরণ করা হইবে।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ জুন ১৯৪৬, পৃ. ২।

৭. *The Calendar, University of Dacca*, 1953, pp. 11-12.

৮. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1946-52, East Bengal Government Press, Dacca, 1954 p. I এবং তসলিমা কবির, এম. আর. মাহবুব (সম্পাদিত), *শল্য চিকিৎসক অধ্যাপক এম. কবির উদ্দিন আহমেদ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৪৩।

৯. *B Proceedings*, B. No. 100, List No. 109, SL. No. 74, *Medical Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1946.

১০. কমিটির সদস্যগণ বলেন, 'We realise that there are factors which militate against the application of this principle in its entirely and that communal considerations cannot perhaps be ignored in the present state of the country. We suggest that one-third of the admissions to every medical training institution should be by pure merit and that the remaining seats may be divided among all the communities, provided the best candidates from each community are selected'. দেখুন, *Report of the Health Survery and Development Committee*, Vol. IV, The Manager Government of India Press, 1946, P. 61.

১১. *ঐ*

১২. কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল চিঠির মাধ্যমে খালি আসন পূরণ করার নিয়ম সম্পর্কে জানান, 'The Selection Committee selects the full quota of students and prepares a separate waiting list of candidates of different categories, viz, Muslims, women, scheduled castes and general. The vacancy or vacancies occurring in any particular category is or are filled by candidates from the waiting list of that particular category in order of priority. Obviously no reference is required to be made to the Selection Committee in this case, in as much as it is the direction of the Selection Committee that is being given effect to by the principal. However, a reference would become necessary to Selection Committee if either the waiting list of that particular Category is Exhausted or it is proposed to modify the order of priority fixed by the Committee'. দেখুন, *B Proceedings*, B.No. 100, List No. 109, SL. No. 74, *Medical Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1946, p. 16.

১৩. *ঐ*

১৪. *ঐ*

১৫. *ঐ*

১৬. *ঐ*

১৭. *ঐ*

১৮. *ঐ*

১৯. *ঐ*

২০. *ঐ*

২১. *ঐ*

২২. *ঐ*

২৩. 'কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণিতে মোট ১০০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হইবে বলিয়া স্থির হয়। ইহাও স্থির হয় যে, শতকরা ৫০ জন মুসলমান ছাত্র ভর্তি করিতে হইবে, বাকী ৫০ জন হইবে হিন্দু অনুসৃত শ্রেণি সমেত। ভর্তি করিবার জন্য একটি সিলেকশন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে ছাত্র ভর্তি করিবার জন্য নিম্নলিখিত নীতি হয়। মুসলমান ছাত্র ৪০ জন ও ছাত্রী ৫ জন। হিন্দু অনুসৃত শ্রেণি সমেত ছাত্র ৪০ জন ও ছাত্রী ৫ জন। সরকারি মনোনয়ন বলে ১০ জন। মনোনয়নের ব্যাপারেও সাম্প্রদায়িক অনুপাত ঠিক রাখা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হয়। মোট ১০০ জন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ৩৯ জন মুসলমান ছাত্র ভর্তি করা হইয়াছে। মুসলমান ছাত্রী পাওয়া যায় নাই। তৎস্থলে মুসলমান ছাত্র ভর্তি করাই ন্যায় নীতি ছিল। হিন্দু ছাত্র ও দুইটি ছাত্রী নাকি ভর্তি হইয়াছে। কিন্তু এসব ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়া ইতোমধ্যেই তৎস্থলে ৫১জন হিন্দু ছাত্র (মুসলমান ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত ৫টি আসনেও মুসলমান ছাত্র দেওয়া হয় নাই যে আসনটিতে সেইটিতে) ভর্তি করা হইয়াছে। সরকারি মনোনয়ন যে ১০ জন ভর্তি করিবে, তাহাতেও ১০ জনই হিন্দু ছাত্রের নাম সুপারিশ করিয়া পাঠান হইয়াছে এবং তাহাদেরকে অনুমোদন সাপেক্ষে অধ্যক্ষ কর্নেল ভার্জিন, ক্লাশে উপস্থিত হইবার আদেশ দিয়াছেন।
ফল এই দাড়াইল যে, ১০০টি আসনের মধ্যে ছাত্র ৩৯টি আসন পাইল মোসলমানেরা। এর বাকী ৬১টি পাইল হিন্দুরা। অথচ বহু উপযুক্ত মুসলমান প্রার্থী ভর্তির জন্য ঢাকায় এখনও ঘুরতেছে। জানা গিয়েছে যে, ইহাদের মধ্যে নাকি বি.এসসি.'ও আছেন। তাহা ছাড়া কলেজের এনাটমি ও বাইওলজি বিভাগে চাপরাশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রফেসর পর্যন্ত সবই নাকি হিন্দু, এখানেও মুসলমান নাই, আছে শুধুমাত্র কেমিস্ট্রি বিভাগে। এই ব্যাপারে স্থানীয় লীগ কর্তৃপক্ষকে জানান হইয়াছে এবং ইহার প্রতিকারের জন্য মি. আবদুল ওয়াহেদ কলিকাতা রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।' দেখুন, *দৈনিক আজাদ*, ১০ আগস্ট ১৯৪৬, পৃ. ৪।

২৪. 'Is the Dacca Medical college going to be a center of Hindu communalism since its very inception? In the 1st year class of the college 100 students have already been admitted, of whom only 39 are Muslims. There is no dearth of suitable Muslim Students now-a- days. It is reported that of these who could not get admittance there are many B.Sc.S. The matter does not end here. It transpires that in the matter of appointments beginning from the chaprasis down to the professor-a very serious injustice has been done to the Muslim candidates. We beg to draw the attention of the higher authorities to this matter'. দেখুন, *B Proceedings*, B.No. 100, List No. 109, SL. No. 74 Sub: Azad (cal), of 12 August 1946 Writes, *Medical Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1946, p. 11.

২৫. ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র ভর্তি বিষয়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে এক মনোনয়ন কমিটি গঠিত হইয়াছে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মেজর ভার্জিন, ঢাকা জেলা মুসলিম লীগের সম্পাদক, ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, এটি. মোজাহার উল হক, এম. এল. এ মিসেস আনোয়ারা খাতুন, এম.এল.এ. তফসিলি *[sic]* সাম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বি. দাস, ঢাকা জেলা বণিক সমিতির সম্পাদক এবং মি. ওয়াকেস। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রভর্তি সম্পর্কে উক্ত কমিটি সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। এ পর্যন্ত ৯০ জন ছাত্র ভর্তি করা হইয়াছে তন্মধ্যে ৪৫ জন মুসলমান আর ৪৫ জন অন্যান্য শ্রেণির। অন্যান্য শ্রেণির ৪৫ জনের মধ্যে ৫ জন তফসিলিভুক্ত *[sic]* সম্প্রদায়ের আর ২ জন মহিলা ছাত্র। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১০টি আসনের মাত্র ৩ জন বর্ণ হিন্দু প্রবেশলাভের দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ২ জনের আবেদন মঞ্জুর করা হইয়াছে, ৫টি মুসলমান ছাত্রের জন্য সংরক্ষিত আসনের জন্য মহিলা প্রার্থী না থাকায় ৫ জন মুসলমান ছাত্র ভর্তি করা হইয়াছে। আরও ৫টি ছাত্র মনোনয়ন এখনও বাকি আছে; ইহার মধ্যে ৩টি হইবে মুসলমান এবং ২টি অমুসলমান। গভর্নমেন্ট মনোনীত ব্যক্তিদের জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত আছে, এবং এই ১০টি আসন পূর্ণ করিতেও অনুরূপ নীতি অবলম্বিত হইবে বলিয়া জনসাধারণ মনে করেন।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ১৪ জুলাই ১৯৪৬, পৃ. ২।

২৬. *B Proceedings*, B. No. 100, List No. 109, SL. No. 74 *Medical Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1946.

২৭. *ঐ*

২৮. *ঐ*

২৯. *ঐ*

৩০. ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত*, শিশুসাহিত্য সংসদ, ২০১৯, পৃ. ৬১।

৩১. *ঐ*, পৃ. ৭৯।

৩২. অধ্যাপক আফজালুন্নেসা ও এম. আর. মাহবুব (সম্পাদিত), *প্রথম শহীদ মিনারের স্থপতি ডা. বদরুল আলম স্মারক গ্রন্থ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৫।

৩৩. অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু ও এম. আর. মাহবুব, *ঢাকা মেডিকেল কলেজ: সেবা সংগ্রাম ঐতিহ্য*, গৌরব প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ২৫।

৩৪. সাক্ষাৎকার, মীর্জা মাজহারুল ইসলাম, বয়সঃ ৯৩ (১৯২৭-২০২০), অধ্যাপক ও প্রাক্তন প্রিন্সিপাল (ঢাকা মেডিকেল কলেজ), সার্জারি বিশেষজ্ঞ, ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র, তাং ১০/০৯/২০১৮ স্থানঃ বারডেম।

৩৫. *ডি. গ্রুপ*, ২২৭২/১৯৫০-৫৩, বিষয়ঃ Pakistan Medical Research Council.

৩৬. এই এ্যাক্টে বলা হয়, 11 (1) The medical qualification granted by medical institutions in [the states] which are included in the First Schedule shall be recognised medical qualifications for the purposes of this Act. 11 (2) ধারায় বলা হয়– Any medical institution in a state which grants a medical qualification not included in the First Schedule may apply to the Central Government to have such qualification recognised and the Central Government after consulting the council, may, by, notification in the official Gazette, amend the First Schedule so as to include such qualification therein. *দেখুন, ডি. গ্রুপ*, ২২৭২/১৯৫০-৫৩, বিষয়: Pakistan Medical Research Council.

৩৭. ডা. গুডিভ ১৮৪৮ সালে কলেজ অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় বলেন, 'Many here today may probably remember the formation of the college by Lord William Bentinck in 1835. The institution consisted of an old house in the rear of the Hindu College, in which two young assistant Surgeons, to whom a third was subsequently, and after much difficulty, added, were expected to teach the whole circle of medical science to a class of upwards of fifty students. There was neither library, museum, hospital nor philosophical apparatus; and we had to combat national prejudices against the study of anatomy, which were considered so deeply rooted, that the greater part of the community laughed the attempt to scron as a vain chimera; and our best friends assisted us with a very modified degree of encouragement, uncertain of the propriety of committing themselves to approve what appeared at best but a very doubtful experiment. An admirable class of intelligent and well-educated young men was soon collected, many of them of good family and of high caste and our labours began on the 20th February 1835.' দেখুন, *General Report of Public Instruction for* 1849-1850, p. 123. উদ্ধৃত, ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত*, শিশুসাহিত্য সংসদ, ২০১৯, পৃ. ৬৫-৬৬।

৩৮. 'While the institution was in its embryo, there were few marks of a promising character, and consequently it received very little encouragement; it is, however, now 'the glory of India'; and the ideas that the college suggests are more ennobling to the human mind than the lyre of a Sappho could ever breath, and passions more elevating to the soul than the classic effusions of poets can ever surpass', দেখুন, 'The Rise and Progress of the Medical College of Bengal, Calcutta', *The King's College Magazine*, Vol.I, February, 1851, pp. 249-250,

৩৯. *The Minutes of the Executive Council*, held on 6th July, Executive Council, University of Dacca, Session: 1947-46, p. 6.

৪০. ডা. মনিলাল আইচ লিটু ও এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮, ৩১।

৪১. *Alumni Directory, Dhaka Medical College,* Dhaka Medical College Alumni Trust, 2004, p. 12.

৪২. সাক্ষাৎকার, ডা. মীর্জা মাজহারুল ইসলাম বয়স: ৯৩ (১৯২৭-২০২০), ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র, অধ্যাপক, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল (ঢাকা মেডিকেল কলেজ), সার্জারি বিশেষজ্ঞ, তাং ১০/০৯/২০১৮ স্থান: বারডেম।

৪৩. ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮১।

৪৪. *ঐ পৃ.* ৮৪।

৪৫. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1946-1952, East Bengal Government Press, Dacca 1954, p. iii.

৪৬. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫।

৪৭. অধ্যাপক আফজালুন্নেসা ও এম. আর মাহবুব (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬।

৪৮. ডা. মনিলাল আইচ লিটু ও এম. আর মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৭।

৪৯. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1947-48, East Bengal Government Press, Dacca, 1954, p. I.

৫০. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬।

৫১. ডা. সাঈদ হায়দার বলেন, '১৯৪৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্মলগ্নে যারা এ কলেজের প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিল, দ্বিতীয়বর্ষ শেষে তাদের অনুষ্ঠিতব্য প্রথম এম.বি.বি.এস. পরীক্ষাও দু'মাস আগে আমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এমন আশ্বাসের প্রেক্ষিতেই আমরা ভর্তি হয়েছিলাম', দেখুন, ডা. মনিলাল আইচ লিটু ও এম. আর মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০।

তৃতীয় অধ্যায়

ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও বিকাশ

১৫-৮-১৯৪৭ – ৩১-১২-১৯৭১

চিকিৎসার ইতিহাস হলো চিকিৎসা ও ইতিহাস উভয়ই। সাহিত্য ও দর্শনের ইতিহাসের মতো এর ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। এটি সভ্যতার ইতিহাসের একটি পরিপূর্ণ রূপ দেয়। মানুষ অতীতে কী ধরনের রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতো, রোগ থেকে পরিত্রানের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নিত, তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপায় এবং কী ধরনের রোগ প্রতিরোধ করতে পারেনি তা জানা জরুরি। এটা চিকিৎসার উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝতে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের অর্ন্তদৃষ্টি নিয়ে কাজ করার ভবিষৎ দিক নির্দেশনা দেয়।[১] অনুরূপভাবে একটা চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসের মাধ্যমে অতীতের চিকিৎসা ব্যবস্থা, চিকিৎসাশিক্ষা, রোগ, প্রতিরোধ ব্যবস্থা, এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত শিক্ষক, চিকিৎসকের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত কর্তৃপক্ষের দিক নির্দেশনা তথা সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। এই আলোচ্য অধ্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের আলোচ্য সময়ের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন, চিকিৎসাশিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশ তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এই অঞ্চলের চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থার মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানা যায়।

দেশ বিভাগের পর থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের উন্নয়ন বিস্তার লাভ করতে থাকে। ১৯৪৭ সালে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কলেজের ওপর দারুণ প্রভাব ফেলে। তখন দেশের সর্বত্র অরাজকতা ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা চলছিল। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়, কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে এটলির লেবার পার্টি ক্ষমতাসীন হওয়ায় ভারতের ব্যাপারে ব্রিটিশ নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে কি না, এটা আর আলোচনার বিষয় ছিল না, বরং কত দ্রুত কার কাছে এবং কী শর্তে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে, এটাই ছিল আলোচনার বিষয়। পূর্বেই এই ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয়; যেমন, ক্রিপশ মিশন (১৯৪২), সিমলা সম্মেলন (১৯৪৫), ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬)। এ সময়ে লন্ডনের অগ্রাধিকারে ছিল ভারতে এমন এক উত্তরাধিকারীকে খুঁজে বের করা যে, সুয়েজের পূর্বাংশে ব্রিটিশের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় সক্ষম।[২] এজন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ ভারত, শক্তিশালী কেন্দ্র ও অবিভক্ত সৈন্যবাহিনী। ততদিনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, কোনো ধরনের সমঝোতা দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের (কংগ্রেস ও মুসলিম) নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। ফলে ঘন ঘন রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট এর কুখ্যাত কলকাতা হত্যাযজ্ঞের (Great Calcutta Killing) কথা উল্লেখ করা যায়। এই দাঙ্গায় প্রায় ৫০০০ লোক নিহত হয়।

এ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত নেয়। দেশ বিভাগের কয়েক মাস পূর্বে (১৯৪৭ এপ্রিল) সোহ্‌রাওয়ার্দী, শরৎ বসু ও কিরণ শঙ্কর বাবু বাংলাকে অবিভক্ত রাখার প্রস্তাব দেয়, যা 'বসু সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রস্তাব' নামে পরিচিত। কংগ্রেস ও লীগের বিরোধিতার কারণে পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়নি। ফলে এডমিরাল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব অর্পণ করা হলে তিনি সমস্ত দল ও মতের সাথে আলোচনা করে ভারত বিভাগের সিদ্ধান্ত নেন। ভারত উপমহাদেশের এমনি রাজনৈতিক অবস্থা সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পঠন পাঠনে তখনও সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে

তোলা যায়নি। ১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্টে (১৪ আগস্ট পাকিস্তান ও ১৫ আগস্ট ভারত রাষ্ট্র) ভারত উপমহাদেশ এবং বাংলা, পাঞ্জাবের বিভাজন ও ক্ষমতা হস্তান্তর হয়। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বাংলার দুই খণ্ডে শুরু হয় ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের ভূখন্ড পরিবর্তন। এর ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে মানুষের যাওয়া আসা শুরু হয়।

ভূখণ্ড পরিবর্তনের এই ধারায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল মেজর ডা. ডব্লিউ. জে. ভারজিন, (আই.এম.এস.) কলকাতায় চলে যান। তাঁর পরিবর্তে ডা. মো. রেফাতউল্লাহ্ সাময়িকভাবে কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল-কাম-সুপারিনটেনডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৬-৫৭ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে উল্লেখ করা হয়,

> Just Prior to the partition, Dr. Mohd. Refatullah M.B. took over the Principal ship from Major Virgin and thus coincidentally became the college's second Principal and his present incumbency as such is therefore his second in that office.[৩]

অপরদিকে ভারজিন এর শূন্য আসনটি সাময়িকভাবে পূরণ করা হলেও দেশ বিভাগের সময়ে কলেজের প্রিন্সিপাল ও হাসপাতালের প্রধান হয়ে আসেন সামরিক বাহিনীর চিকিৎসক কর্নেল (অব.) ই.জি. মন্টেগোমারি (১৯৪৭-১৯৪৮)। তিনি ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এই কলেজে যোগদান করেন। তিনি নতুন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাঁর কৃতিত্ব সম্পর্কে কলকাতা ফেরত সে সময়ের প্রাক্তন ছাত্র ডা. সাইদ হায়দার উল্লেখ করেন।[৪] এ ছাড়া দেশ বিভাগের সময়ে বেশ কয়েকজন দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকদের ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৫]

ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রি-ক্লিনিক্যাল অধ্যাপকদের বেশিরভাগ ছিল হিন্দু। একইভাবে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের বেশির ভাগ শিক্ষক ছিলেন হিন্দু। তারা দেশ বিভাগের পর ভারত চলে যায়। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজের এনাটমি ও ফিজিওলজির দুই শিক্ষক পশুপতি ও হীরালাল সাহা দেশ বিভাগের সময়ে ভারত চলে যান। এই মেডিকেল কলেজের শিক্ষাদানের এলোমেলো অবস্থায় আরেক দফা ভাঙ্গন দেখা দেয়। নতুন করে সব কিছু শুরু করতে হয়। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানে তথা নতুন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং সত্তর (৭০) বছরের পুরানো ঢাকা মেডিকেল স্কুলে এ সময় পশ্চিম বাংলা থেকে আগত মুসলমানরা যোগদান করে। সৌভাগ্যবশত কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রায় প্রত্যেক মেডিসিন শাখার মেডিকেল অফিসার ছিল মুসলমান। এদের সবাই নিজস্ব বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ ছিলেন।

ইন্দো-পাকিস্তান উপমহাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম একটি হলো কলকাতা মেডিকেল কলেজ। এই দক্ষ ব্যক্তিরা ১৩৫ বছরের পুরানো কলকাতা মেডিকেল কলেজের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা নিয়ে পূর্ববাংলায় আসেন। তারা ১৯৪৭ সালের ১ অথবা ১২ আগস্ট পর্যন্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। এ সময় পূর্ববাংলায় এসে তাদের পদ অনুযায়ী কাজ বুঝে নেন এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট কাজ শুরু করেন।[৬] এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পূর্ববাংলার মেডিকেল শিক্ষার উন্নয়নে নতুন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলার কাজে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নিজেদের নিয়োজিত করেন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত নতুন রাষ্ট্রের নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের অগ্রগতি তখন থেকে আজ পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলছে। শিক্ষকদের পাশাপাশি এই মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের ভর্তিকৃত অনেক ছাত্রছাত্রী চলে যায়। অনুরূপভাবে কলকাতা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থী মাইগ্রেশন নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময়ে মেডিকেল কলেজ ভবনটি কেবল মাত্র কলেজ ও হাসপাতালের ভবন হিসেবে নয়, বরং কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও ভারতের অন্যান্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থেকে আগত কর্মকর্তা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা হয়।[৭]

দেশভাগের পূর্বেই পশ্চিম বাংলায় যেসব মেডিকেল যন্ত্রপাতি ছিল, তা দুই বাংলার মধ্যে ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়। শুরু থেকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে যন্ত্রপাতির ঘাটতি ছিল। বিশেষকরে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, এক্সরে প্লান্ট, স্ট্রেলাইজিং ইত্যাদি। এটি সমগ্র পূর্ববাংলার মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল। এর ফলে শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির ঘাটতি এবং হাসপাতালে সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি না থাকায় পুরাতন যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পক্ষান্তরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে মাইক্রোস্কোপ, অটোকলভস এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির স্বল্পতা থাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। আবার মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে সবধরনের যন্ত্রপাতি, এক্স-রে প্লান্ট, স্ট্রালাইজার, জীবানুমুক্তকরণ বা ডিসইনফেকটরস, ওয়ার্ড সরঞ্জামের প্রয়োজন ছিল। এগুলোর সরবরাহ ও পাওয়ার ব্যাপারে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ জোর প্রচেষ্টা চালায়। তাদের ধারণা ছিল যে, খোলা বাজার থেকে এসব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কেনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ হবে। সার্জন জেনারেল দেশ বিভাগের পূর্বেই পশ্চিম বাংলা থেকে এসব যন্ত্রপাতি সংগ্রহের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। পশ্চিম বাংলায় এই ধরনের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের দোকান প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। উপরন্তু সার্জন জেনারেল মতামত দেন যে, কলকাতার লেক মেডিকেল কলেজে ৩০টি মাইক্রোস্কাপ রয়েছে, এগুলোর অধিকাংশই ব্যবহার করা হয় না বা প্রয়োজন নেই। শুধু মাইক্রোস্কোপই নয় মেডিকেল ও সার্জিক্যাল অনেক যন্ত্রপাতিই ছিল, যা পূর্ববাংলার জন্য প্রয়োজন।[৮] এসব যন্ত্রপাতি কেবল পশ্চিম বাংলার কলেজেই নয় বরং মেডিকেল কলেজের হাসপাতালগুলোতেও বিপুল সংখ্যক মাইক্রোস্কোপ এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, প্যাথলজিক্যাল নমুনা, মেডিকেল বই ইত্যাদি ছিল। পূর্ববাংলার সাথে এসব যন্ত্রপাতি ভাগ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই এসব যন্ত্রপাতি ভাগ করার জন্য সার্জন জেনারেল ১৯৪৮ সালে স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সচিবকে বলেন,

> I understand that the partition council and the Steering Committee have not yet finished their work and I strongly urge that we should make every effort for this state to obtain a fair share of medical and surgical equipment as soon as possible.[৯]

১৯৪৮ সালের ১৯ এপ্রিলের একটি চিঠি থেকে আরো জানা যায় যে, ভারত সরকার কর্তৃক আমেরিকা থেকে কাঁচড়াপাড়া টিবি হাসপাতালের জন্য অনেক যন্ত্রপাতি কেনা হয়। এসব যন্ত্রপাতির যে অংশ পূর্ববাংলার, তা দাবি করা হয়, তবে যন্ত্রপাতির মধ্যে কিছু যন্ত্রপাতি ভাগ করা সম্ভব ছিল এবং কিছু ভাগ করা সম্ভব ছিল না। এগুলোর ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে ভাগ করার প্রস্তাব করা হয়। এরূপ যন্ত্রপাতিকে 'এল' (L) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। [*পরিশিষ্ট দেখুন*-১৭]

১৯৪৯ সালে বিপুল পরিমাণে যন্ত্রপাতি আমেরিকা থেকে কেনা হয় যেমন, বিভিন্ন ধরনের বিছানা, ম্যাট্রিস, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, অক্সিজেন টেনট, অ্যানাসথিসিয়ার যন্ত্রপাতি, রোগজীবানু নাশক ঔষধ, ওয়াশিং মেশিন, প্রজেক্টর, এপিডায়াসকোপ, ইঙকিউবেটর, বিভিন্ন ধরনের বাতি, একটি এক্স-রে মেশিন, একটি এক্স-রে থেরাপি মেশিন এবং অপারেশন থিয়েটার ঘরের বাতি ইত্যাদি। এগুলো ১৯৪৯ সালে ক্রয় হলেও দেশে পৌঁছানোর পর ১৯৫০ সালে ব্যবহার করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রয়োজনীয় অগ্রগতিতে আরো ৭ লক্ষ রুপি মূল্যের যন্ত্রপাতি কেনার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১০]

এ সময় সমগ্র পূর্ববাংলার চিকিৎসাখাতে মোট বাজেটের আনুমানিক পরিমাণ ছিল ৬৮,১০,০০০ লক্ষ রুপি এবং সংশোধিত বাজেটের পরিমাণ ৪০,৬০,০০০ লক্ষ রুপি। তার মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য বাজেটের আনুমানিক পরিমাণ ছিল ১৫,৫০,০০০ এবং সংশোধিত বাজেটের পরিমাণ ছিল ১০,০০,০০০ লক্ষ রুপি। একই বাজেটে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সিভিল ওয়ার্কের জন্য বাজেটের আনুমানিক পরিমাণ ছিল ৩০০,০০০ লক্ষ রুপি এবং সংশোধিত বাজেটের পরিমাণ ছিল ৪০০,০০০, লক্ষ রুপি।[১১] ফলে চিকিৎসাখাতের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ ছিল। ১৯৫০-৫১ সালের এই বাজেটে চিকিৎসা খাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য যে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সে সম্পর্কে পার্লামেন্টের সদস্য হাফিজ উদ্দিন চৌধুরী লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতে উত্থাপন করেন। তিনি পূর্ববাংলার চিকিৎসা বিভাগের দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইতিমধ্যে এই মেডিকেল কলেজে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বেশ কয়েকজন চিকিৎসক যোগদান করেছেন। এই সকল চিকিৎসকদের যথাযথ পদে রেখে তাদের সেবা গ্রহন করার ব্যাপারে পরামর্শ দেন। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ৭ $\frac{১}{২}$ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম যাচাই বাছাইয়ের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন।[১২]

ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে বরাদ্দ বেশি হলেও জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে বাজেটের পরিমাণ কম ছিল, যা পার্লামেন্ট সদস্য হাজী মোহম্মদ কাশেম এর মন্তব্য থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন '১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে যে বরাদ্দ দেখা যায়, তা নিতান্ত অপ্রচুর।[১৩] সমগ্র পূর্ববাংলার চিকিৎসাখাতে বরাদ্দ কম হলেও সদ্য প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজের উন্নয়নের জন্য বাজেটে অর্থের পরিমাণ বেশি ছিল। এই অঞ্চলের প্রথম মেডিকেল কলেজ হওয়ায় এর আধুনিকীকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়। তাই দেশ বিভাগের পর থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের উন্নয়ন ও বিকাশ ক্রমবর্ধমান হারে হতে থাকে এবং সময়ের সাথে সাথে মেডিকেল কলেজটি যুগোপযোগী ও আধুনিক হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন একাডেমিক বিভাগের উন্নয়ন

১৯৪৬ এবং ১৯৪৭ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ১ম ও ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়া ছাড়াও কলকাতা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষকদের সাথে পূর্ববাংলায় চলে আসে। উপরন্তু সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সের শিক্ষার্থী যারা কলকাতার লেক মেডিকেল কলেজে প্রশিক্ষণ নেয় তারাও পূর্ববাংলায় চলে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই শিক্ষার্থীরা সামরিক বাহিনীর চিকিৎসক এবং তাদের বেশিরভাগই পুনার সামরিক একাডেমিতে 'ইনটেনসিভ ট্রেনিং' নেয়। তারা এক বছর অথবা দেড় বছরের অধ্যয়নকে কেবলমাত্র তিন অথবা চার মাসে সম্পন্ন করে। তারা একই সাথে কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং কলকাতার বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে এনাটমি, ফিজিওলজি এবং ফার্মাকোলজিতে প্রি-ক্লিনিক্যাল পড়াশোনা চালায়। তারা সকালে লেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মেডিসিন, সার্জারি এবং মিডওয়াইফারির কাজ করেন এবং দুপুরে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজে প্রি-ক্লিনিক্যাল অধ্যয়নের জন্য যান। সেখানে তারা মৃত মানব দেহের ব্যবচ্ছেদ (ডাইসেকসন) এবং ফার্মাকোলজি ও ফিজিওলজির তত্ত্বীয় ক্লাশের সাথে ব্যবহারিক ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন।[১৪]

স্বাভাবিকভাবেই দেশ বিভাগের পর মেডিসিন, সার্জারি এবং মিডওয়াইফারির শিক্ষাদানের জন্য ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শুরুতেই এখানে তিনটি মেডিকেল ওয়ার্ড ও তিনটি সার্জিক্যাল ওয়ার্ড ছিল। ঢাকা মেডিকেল স্কুলের মিটফোর্ড হাসপাতালে গাইনোকোলজিক্যাল বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়। এই মেডিকেল স্কুলের নাক, কান, গলা, যক্ষা, দন্ত এবং সংক্রামক রোগ বিভাগ, অফথালমোলজিক্যাল ও রেডিওলজিক্যাল বিভাগটি ভালোভাবে সজ্জিত হওয়ায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের জন্য এই বিভাগগুলোতে পাঠানো হয়। এ সময় গাইনোকোলজিক্যাল বিভাগটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডা. হাবিব উদ্দিন এবং অফথালমোলজিক্যাল বিভাগটি অধ্যাপক ডা. মো. রেফাতউল্লাহ’র তত্ত্বাবধানে ছিল। তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক হলেও মিটফোর্ড হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। এই দুই অধ্যাপক শুধু সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. শিক্ষার্থীদের পড়াতেন না, বরং ঢাকা মেডিকেল স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতেন। ফলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের এই বিষয়গুলোতে অধ্যয়নের জন্য এই বিভাগগুলোতে পাঠানো হয়। এভাবেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রি-ক্লিনিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।[১৫]

প্রি-ক্লিনিক্যাল বিভাগ

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ ভারতে শুরু হওয়ার প্রায় পাঁচশো বছর আগে প্রথম ইতালির বোলোনাতে মনদেনো দ্য লুৎসি (Mondeno de Luzzi 1270-1326) ব্যবচ্ছেদ করেন।[১৬] এর ফলে ইউরোপে মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদে একটা নতুন মাত্রা আসে এবং অন্যান্য দেশেও চিকিৎসাশিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পায়। ১৩৬৬ সালে মন্টেপেলিয়ারে সরকারিভাবে আইন করে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ শুরু হয়। ১৩৬৮ সালে ভেনিসে, ১৩৮৮ সালে ফ্লোরেন্সে, ১৪০৪ সালে ভিয়েনাতে, ১৪২৯ সালে পাদুয়াতে ব্যবচ্ছেদ শুরু হয়।[১৭] ১৫৪০ সালে ইংল্যান্ডে অষ্টম হেনরি এমন একটা আইন পাশ করেন যাতে শল্যচিকিৎসকরা এনাটমি শিক্ষার জন্য চারটি (৪) মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের দেহ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর পেতে পারেন। ক্যামব্রিজের দুইজন ফেলোশিপ প্রাপ্ত চিকিৎসক দুইটি করে এমন অপরাধীদের মৃতদেহ যাতে পান, তার জন্য রানি এলিজাবেথ অনুমোদন করেন।[১৮] তাছাড়া এনাটমির ইতিহাসে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, এড্রিয়াস ভেসালিয়াস, উইলিয়াম হারভে প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম স্মরণীয় হয়ে আছেন।[১৯] মেডিকেল শিক্ষার্থীর জন্য এনাটমি বিষয়ে শিক্ষণের জন্য মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করা যে কতটা জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ তা উপরি-উক্ত ইতিহাস থেকে বোঝা যায়। ভারত উপমহাদেশের প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কলকাতা মেডিকেল কলেজের শুরুর দিকে এনাটমি ও সার্জারি শিক্ষণের সময় মানুষের মৃতদেহ পরীক্ষা ও ব্যবচ্ছেদের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না, বরং তার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রাণি যেমন; ছাগল, ভেড়া, কুকুর ইত্যাদি ব্যবচ্ছেদ এবং কাঠের বা টিনের মডেল ব্যবহার করে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হতো। কর্তৃপক্ষ সর্বদা মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিতেন। এই কারণে বারবার আলোচনা ও চিঠি প্রদান করা হয়। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অন্ধ কুসংস্কার মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের গুরুত্ব যে অপরিসীম, যা পাশ্চাত্যে প্রচলিত রয়েছে। মানুষের চিকিৎসার জন্য সুচিকিৎসক তৈরি করতে হলে মানুষের মৃতদেহ ভালোভাবে ব্যবচ্ছেদ করে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের শিক্ষিত করা জরুরি, বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষ গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। শুধুমাত্র প্রাণি দেহ ব্যবচ্ছেদ করে, মডেল দেখিয়ে কিংবা মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চোখে দেখিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের

মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ ছাড়া কোনো রকমভাবেই চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না। কর্তৃপক্ষ যত সহজে একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক এবং পাশ্চাত্য রীতির মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন, তত সহজে মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করাটা সম্ভব হয়নি। কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর প্রায় এক বছর এবং ক্লাশ শুরু হওয়ার পর প্রায় সাত মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল।[২০] অন্ধ কুসংস্কারের গন্ডি পেরিয়ে, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বাধা এবং সমাজের প্রচলিত নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি অসমসাহসী, বিজ্ঞান মনস্ক, চিকিৎসাবিজ্ঞানে নিবেদিত প্রাণ কলেজের শিক্ষক পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত প্রথম মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে বাংলা তথা ভারতের কুসংস্কারে আবদ্ধ সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান।[২১] অন্যদিকে পূর্ববাংলার প্রথম উঁচুস্তরের পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষার প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজে শুরুর দিকে এনাটমি হাতেকলমে শিক্ষাদানের সময় মানুষের মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদে সামাজিক ও ধর্মীয় কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। তবে শুরুর দিকে ডাইসেকশন হল না থাকায় প্রথম কয়েক মাস ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ব্যবচ্ছেদ করা হয়। মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েই শিক্ষার্থীরা প্রথমে যে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে, তা হল এনাটমি। মেডিকেল শিক্ষার্থীরা মানবদেহের গঠনগত ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে থাকে ।

এনাটমি বিভাগ

দেশ বিভাগের কারণে এনাটমির শিক্ষার্থীদের তেমন কোনো বিরতি হয়নি। পুরাতন শিক্ষকরা চলে গেলে তাদের জায়গায় নতুন শিক্ষক যোগদান করে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এই কলেজে কোনো ডাইসেকশন হল ছিল না এবং এ বছরই একটি কক্ষে ডাইসেকসন হলের ব্যবস্থা করা হয়। জাদুঘর ছিল না। অনুরূপভাবে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কোনো এনাটমি জাদুঘর ছিল না। ১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সালে শীতকালে শিক্ষার্থীরা তাদের ডাইসেকশনের কাজ শুরু করে।[২২]

১৯৫০ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ডাইসেকশন হলের অনুকরণে ছোট একটি নতুন ডাইসেকশন হল নির্মাণ করা হয়। ডাইসেকশন হলটি প্রশস্ত ছিল এবং ডাইসেকশনের জন্য সবধরনের ব্যবস্থা ছিল। এই হলের নীচের তলায় এবং বারান্দায় ডাইসেকশনের জন্য ৪০টি টেবিল রাখা হয়। অন্যদিকে দেশ বিভাগের পর কলকাতা থেকে মর্গের শবকক্ষের জন্য একটি বড় আকারের কুলার কেনা হয়, কিন্তু কিছু ত্রুটি থাকার কারণে চালানো যায়নি। এ সময় একজন চিত্রশিল্পীকে পুরোসময় এনাটমির চিত্র আঁকতে নিয়োজিত করা হয় এবং ৪ বছর তাঁকে গ্রে'র *এনাটমির বই* থেকে প্রায় ৫০০ চিত্র অনুকরণ করে আঁকতে হয়।[২৩] শরীরের ব্যবচ্ছেদকৃত অংশগুলো জাদুঘরে রাখা হয়।

এনাটমির শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল মৃতদেহের অভাব। দেশ বিভাগের আগেই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মৃতদেহ হস্তান্তর করার কিছু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। হিন্দু মৃতদেহগুলো হিন্দু সৎকার প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া হতো এবং মুসলমান মৃতদেহগুলো 'আঞ্জুমান-ই-মুফিদুল-ইসলাম' থেকে নেওয়া হতো। কেবলমাত্র যে মৃতদেহগুলোর ওপর কারো কোনো দাবি ছিল না, সেই মৃতদেহগুলো ব্যবচ্ছেদের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হতো। ১৯৪৭, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালের শুরুর দিকে স্বল্পসংখ্যক মৃতদেহ ছিল, কিন্তু শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল বেশি। ১৯৪৭-৪৮ সালে মোট ৩১১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বর্ষে ১৬৫ জন, দ্বিতীয় বর্ষে ১২২ জন, অনিয়মিত ২৪ জন, ১৯৪৮-৪৯ সালে মোট ৩২৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বর্ষে ১৬০ জন, দ্বিতীয় বর্ষে ১৩০ জন, অনিয়মিত ৩৭ জন, ১৯৪৯-৫০ সালে মোট ৩৮৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে

প্রথম বর্ষে ১৩৬ জন, দ্বিতীয় বর্ষে ১৬৩ জন এবং অনিমিয়ত ৯০ জন শিক্ষার্থী ছিল।[২৪] ফলে পর্যাপ্ত মৃতদেহের অভাবে ১৯৪৭ সালে ১৭টি, ১৯৪৮ সালে ২১টি এবং ১৯৪৯ সালে মাত্র ২৮টি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করা হয়।[২৫] মৃতদেহের ঘাটতি সে সময়ে মেডিকেল কলেজের অন্যতম সমস্যা ছিল।

এনাটমির শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল শিক্ষকের অভাব। সম্পূর্ণরূপে যারা নিজেদেরকে এনাটমিতে নিয়োজিত রাখতে পারত, কেবলমাত্র তাঁদেরকে এই বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হয়। এনাটমি শিক্ষকগণ এই বিভাগে বেশিদিন থাকতে আগ্রহী ছিলেন না। পরবর্তীতে এই অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হয়। যাদের এনাটমির ওপর ভালো দক্ষতা ছিল, তারা ভবিষ্যতে সার্জন হতে পারত। শিক্ষার্থীদের দক্ষ হতে হলে অন্তত তিন বছর এই বিষয়ের ওপর জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদেরকে মানব শরীরের ওপর বিস্তারিত শেখানো হতো। অধ্যাপক ও ডেমনস্ট্রেটরের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পুরো মানব শরীর ব্যবচ্ছেদ করতে হতো। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বার্ষিক বিবরণী থেকে এই বিভাগের শিক্ষক সংখ্যা ও কর্মচারী সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায় [***পরিশিষ্ট দেখুন-১৮***]। ১৯৪৭-৪৮ সালে কলকতা মেডিকেল কলেজের মতো শিক্ষার্থীদের দুই মেয়াদে (গ্রীষ্ম ও শীত) পাঠদান সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ কলেজের শিক্ষার্থীরা বিলম্বে ভর্তি হয়। এ সময় প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ৩৭টি লেকচার এবং দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ১১০টি লেকচার প্রদান করা হয়।[২৬] ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ৪৯টি লেকচার এবং দ্বিতীয় বর্ষের ১১০টি লেকচার প্রদান করা হয়।[২৭] সাময়িক সমস্যা থাকলেও পাঠদান এবং ব্যবচ্ছেদ অব্যাহত ছিল। ১৯৪৯ সালের ১০ মে এনাটমি বিভাগের ডাইসেকশন হলে গ্যালারির ব্যবস্থা করার জন্য সার্জন জেনারেল মেডিকেল বিভাগের সেক্রেটারিকে জানান যে,

> A large number of extra students have been admitted into the College and the space now available for dissection is not sufficient. To provide extra space a gallery should be built in the dissection Hall.[২৮]

১৯৪৯-৫০ সালে দেখা যায়, প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীদের ৪৭টি লেকচার, দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ১১৪টি লেকচার দেওয়া হয়।[২৯] উপরি-উক্ত তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, ১৯৫০ এর দশক পর্যন্ত এনাটমি বিভাগের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি, কেননা তখনও অনেক কিছুর ঘাটতি ছিল।

দুই বছরের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য বিষয় হিসেবে 'এনাটমি' নানা উপবিভাগে বিস্তৃত ছিল। এই বিভাগে ডেমনস্ট্রেটর হিসেবে সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষকের দরকার হয়, যা সরকারি নথিপত্রে দেখা যায়। ১৯৪৮ সালের ৮ এপ্রিল প্রথম বছরের শিক্ষার্থীদের ডাবল শিফটে শিক্ষাদানের জন্য অতিরিক্ত স্টাফ চাওয়া হয়। সেখানে বলা হয় যে, এনাটমির শিক্ষাদান ফিজিওলজি থেকে ভিন্ন হওয়ায় এনাটমির জন্য ৩ জন এবং ফিজিওলজির জন্য ৫ জন ডেমনস্ট্রেটর দরকার। এ ছাড়া ২ জন ক্লার্ক ও ২জন বেয়ারা থাকলেও আরো অতিরিক্ত ক্লার্ক ও বেয়ারার দরকার হয়। শিক্ষার্থীদের সেবা দেওয়ার জন্য ডাবল শিফটে অন্তত ২ জন ক্লার্ক ও ৩ জন বেয়ারার দরকার ছিল।[৩০] তাই উপরি-উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নের স্টাফ রাখার ব্যবস্থা করা হয়,

৫ জন ডেমনস্ট্রেটর– এনাটমি
৩ জন ডেমনস্ট্রেটর ফিজিওলজি
২ জন ক্লার্ক
৩ জন বেয়ারা

এসব স্টাফদের জন্য যে পরিমাণ অর্থ খরচ হবে নিম্নের তালিকায় এর হিসাব পাওয়া যায়,[৩১]

স্টাফদের নাম	বেতন স্কেল	প্রতিমাসে
৫ জন ডেমনস্ট্রেটর (এ্যাটিম)	রুপি ১৪০-১৬০-১৮০ ২০০-২২৫-২৫০-২৭৫ ৩০০-৩২০-৩৪০-৩৬০ ৩৮০	রুপি ১০০০/-
২ জন ডেএস্টেটর (ফিজিওলজি)	ঐ	রুপি ৪০০/-
২জন ক্লার্ক (অফিস)	৩৫-৩৫-৪০ ৪/২-৬৮৩/২-৮০	রুপি ৮০/-
৩ জন বেয়ারা	১৩-১/৫-১৭	রুপি ৩৯/-
মোট-		**১৫১৯ রুপি (প্রতিমাসে)**
	প্রতিবছর	**১৮,২২৮ রুপি**

১৯৫০ সালের ৩০ মার্চ এই বিভাগের ডাইসেকশন হলে পানি সরবরাহজনিত সমস্যা ছিল। পানি সরবরাহের সমস্যা সমাধান করার জন্য যে প্রস্তাব করা হয়, তাতে প্রায় আনুমানিক ব্যয় ৬,৬৯৮ রুপি ধরা হয়। এ সময় সকল নতুন প্রকল্প স্থগিত রাখার জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। তাই মেডিকেল বিভাগকে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করার এবং পরবর্তী সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ব্যবস্থায় থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়। এদিকে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ঢাকা মেডিকেল কলেজের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি'র স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রে কলেজে কোনো রকম ত্রুটি থাকা যাবে না বলে উল্লেখ করা হয়। পরবর্তী ২/৪/৫০ তারিখের নোটে এই ব্যাপারে বলা হয় যে,

> The Dacca Medical College and Hospital will be visited by the Inspectiors of the Pakistan Medical Council in connection with the recognition of the M.B.B.S degree. So there should not remain any defect in water supply in the dissection Hall. This proposal cannot therefore be dropped and the work should be executed immediately.[৩২]

একই বছরের (১৯৫০) মে মাসে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক এই বিভাগ স্বীকৃতি না দেওয়ার ব্যাপারে যেসব কারণ উল্লেখ করা হয় তার ভিত্তিতে বলা হয়, এই বিভাগে জরুরি ভিত্তিতে একটা জাদুঘরের প্রয়োজন। জাদুঘর না থাকায় ভ্রুনবিদ্যার নমুনা, বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয়ের নমুনা এবং ব্যবচ্ছেদকৃত শরীরের অংশের নমুনা ছিল না। ইতিমধ্যে এই কাজের জন্য এনাটমি বিভাগের পাশে একটি ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই বিভাগের প্রধান সমস্যা ছিল ডাইসেকশনের জন্য মৃতদেহের অভাব। মেডিকেল কাউন্সিল মনে করে, শিক্ষার্থীরা ২ বছর এনাটমি বিভাগে কাজ করে, তাই মানবদেহের প্রতিটি অংশ তাদের ডাইসেকট করা উচিত। এটা করা তাদের জন্য সম্ভব ছিল না, কারণ ডাইসেকশনের জন্য পর্যাপ্ত মৃতদেহের অভাব এবং এর জন্য চেষ্টা করা হলেও কোনো অগ্রগতি হয়নি। অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির কারণে বিভাগটির ওপর প্রচন্ড চাপ পড়ে। এ সময় মৃতদেহ সরবরাহের প্রধান উৎস ছিল মিটফোর্ড হাসপাতাল। এই হাসপাতাল থেকে সারা বছরে প্রায় ৬০টি বেওয়ারিশ মৃতদেহ পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এগুলোর অধিকাংশ সমাধি দেওয়ার জন্য দূরে নিয়ে যাওয়া হতো।[৩৩] সংগৃহীত মৃতদেহগুলো সংরক্ষণের উদ্দেশ্য একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মরচুয়ারি কুলার (Mortuary Cooler) কলকাতা থেকে সংগ্রহ করা হলেও মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য বৈদ্যুতিক সংযোগের প্রয়োজন ছিল।

অন্যদিকে এই বিভাগের অধ্যাপককে পিএসসি (P.S.C) দ্বারা নিযুক্ত করা হয়নি। প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসহ একজন অধ্যাপক নিয়োগের চেষ্টা করা হয়, তবে এটা উল্লেখ করা হয় যে, সে সময়ের এনাটমির অধ্যাপক ডা. এ. রহমান এর দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অন্যান্য মেডিকেল কলেজে (লাহোর মেডিকেল কলেজ, কলকাতা মেডিকেল কলেজ, পাঞ্জাব মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ইত্যাদি) এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ওপর জোর দেওয়া হয়নি। এনাটমি শিক্ষাদানের জন্য এটা বাধ্যতামূলক নয়, তবে অনেকে নিজেদের ক্যারিয়ারের জন্য উচ্চতর ডিগ্রি নেয়। সাধারণত তাত্ত্বিক জ্ঞানের চেয়ে বিষয়টির ওপর বিশেষ অধ্যয়ন এবং ডাইসেকশন করা জরুরি। তাই পাকিস্তান পরিদর্শন কমিটির মতে স্থায়ী পদের জন্য ডা. রহমান এর উল্লিখিত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। বিচার বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে, তিনি একজন দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক এবং সংগঠক ছিলেন। এই বিভাগের অগ্রগতি সাধনে ব্যাপক কাজ করেছেন, যা শূণ্য থেকে শুরু হয়।[৩৪] সে সময়ের প্রেক্ষাপটে এবং উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব থাকায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা হয়, তবে পরবর্তীতে তাদের উচ্চ প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। তাই বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে যে কোনো বিষয়ের শিক্ষক হতে হলে প্রার্থীর অবশ্যই স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকা বাধ্যতামূলক। এদিকে ১৯৫০ সালের ১৭ অক্টোবর পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক একটি রেজুলেশন প্রকাশ করা হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা, অধ্যয়নের কোর্সগুলো যথেষ্ট নয়। তাই পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রিকে স্বীকৃতি না দেওয়ার ব্যপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অথবা পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল এ্যাক্টের তপশিল-১ এ ডিগ্রি অর্ন্তভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করবে না।[৩৫] তবে কাউন্সিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্য প্রাপ্তির ওপর ভিত্তি করে মেডিকেল কলেজ আরেকবার পরিদর্শন করার পরে এই ব্যাপারে পুর্নবিবেচনা করবে যে, পরিদর্শন কমিটির সদস্যদের রিপোর্টের ভিত্তিতে সমস্যাগুলো অপসারণ ও সুপারিশগুলো কার্যকর করা হয়েছে।[৩৬]

পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল ঢাকা বিশ্ববিধ্যালয় কর্তৃক ঢাকা মেডিকেল কলেজের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দিতে ইচ্ছুক ছিল না। তখন পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়াশোনার জন্য যথেষ্ট সুযোগসুবিধা ছিল না। এনাটমিসহ বিভিন্ন বিভাগে নানা রকমের ক্রুটি ও ঘাটতি বিদ্যমান ছিল। পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের শর্ত ছিল যে, এম.বি.বি.এস. ডিগ্রির স্বীকতি পেতে হলে এই মেডিকেল কলেজকে ভালোভাবে সুসজ্জিত ও সবধরনের সুযোগসুবিধা থাকতে হবে এবং কাউন্সিল কর্তৃক ক্রুটি চিহ্নিত হলে, তা সমাধানের ব্যবস্থা ও সুপারিশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল সে সময় এনাটমি বিভাগকে স্বীকৃতি দেয়নি, কারণ বিভাগটি মানসম্মত ছিল না। ১৯৫০-৫১ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে তা উল্লেখ করা হয়,

> This institution has not yet been recognised by the Pakistan Medical Council.[৩৭]

উপরন্তু ১৯৫১ সালের ১৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি রেজুলেশন গৃহীত হয়। উক্ত রেজুলেশনে এই বিভাগসহ আরো কিছু বিভাগের স্বীকৃতি না দেওয়ার ব্যাপারটি উল্লেখ করা হয়,

> ...that the Pakistan Medical Council have not recommended the recognition of the departments of Anatomy, Pathology, Hygiene and Medical Jurisprudence and Radiology as these Departments are not up to the standard.[৩৮]

১৯৫০ সাল পর্যন্ত বিভাগটি পরিপূর্ণ করা সম্ভব হয়নি, কারণ এনাটমি বিভাগে পূর্ববর্তী সময়ের যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল, সেই একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। ১৯৫০-৫১ সাল পর্যন্ত এই বিভাগে একজন অধ্যাপক,

৩ জন সহকারী অধ্যাপক এবং ১৩ জন ডেমনস্ট্রেটর ছিল *[পরিশিষ্ট দেখুন-২১]*। এর মধ্যে কেউ কেউ বিভাগ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় এবং নতুন কেউ যোগদান করে। প্রথম বর্ষে ১৩০ জন, দ্বিতীয় বর্ষে ১১৮ জন এবং অনিয়মিত ৭৫ জনসহ মোট ৩২৩ জন শিক্ষার্থী ছিল। এ সময় প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ৫৭টি লেকচার, দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ১০৪টি লেকচার এবং মাত্র ২৭টি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করা হয়।[৩৯] ব্যবচ্ছেদকৃত মৃতদেহের সংখ্যা শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী পর্যাপ্ত ছিল না।

এ সময় (১৯৫১) কোনো জাদুঘর ছিল না, তবে এটা নির্মাণাধীন ছিল, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল দ্বারা এনাটমি বিভাগের নানা সমস্যা, সাজসরঞ্জামের স্বল্পতার ঘাটতি চিহ্নিত হলেও প্রি-ক্লিনিক্যাল বিষয় হিসেবে এটি শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত একটি কঠিন বিষয় ছিল। ডাইসেকশন হলের গন্ধ সহ্য করতে না পেরে কোনো না কোনো শিক্ষার্থী মেডিকেল কলেজ ছেড়ে চলে যায়। উদাহরণস্বরূপ এই মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র খান আতাউর রহমান (১৯২৮-১৯৯৭)। তিনি মেডিকেল কলেজ ছেড়ে নাটক, সিনেমা ও গানের জগতে চলে যান। বিষয়টি কঠিন ছিল বলেই হয়তো মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের আরেক ছাত্র ডা. বদরুল আলম ১৯৫১-৫২ সালে এনাটমি নিয়ে একটি জারি গান রচনা করেন।[৪০]

এই জারি গান থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, ডাইসেকশন ক্লাশ অত্যন্ত কঠিন ছিল। চিকিৎসাশিক্ষার মোট পাঁচ বছরের মধ্যে তিন বছর এই বিষয়ের ওপর ক্লাশ করে। ডাইসেকশন ক্লাশবিহীন কোনো ছাত্র আধুনিক, দক্ষ, সুচিকিৎসক হওয়া সম্ভব নয়। মানবদেহের প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভ করা বাধ্যতামূলক। ডাইসেকশন ক্লাশ ফাঁকি দেওয়া মানেই হলো পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া এবং চিকিৎসক হওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা। ডাইসেকশন ক্লাশ কঠিন হলেও পঞ্চাশের দশকের প্রথমদিকে মেডিকেল কলেজে ডাইসেকশন ক্লাশ আয়োজনের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। ১৯৫২ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের এনাটমি বিভাগ পরিদর্শন করতে গিয়ে একই সমস্যা দেখা যায় এবং এগুলো সমাধানের মাধ্যমে কলেজকে আধুনিক ও মানসম্মত করার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব করা হয়।[৪১]

পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা না থাকায় এ বছরও এই বিভাগকে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল স্বীকৃতি দেয়নি। এর ফলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ স্বীকৃতি পায়নি। এ বছর পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির সদস্যদের দ্বারা কলেজের নিম্নের পাঁচটি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়,[৪২]
ক) এনাটমিসহ কলেজের বিভিন্ন বিভাগের আবাসনের ঘাটতি
খ) হাসপাতালের সুযোগসুবিধার ঘাটতি
গ. স্টাফ ঘাটতি
ঘ. যন্ত্রপাতির ঘাটতি
ঙ. সাধারণ ঘাটতি।

এনাটমি বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের ঘাটতি থাকায় সব বিভাগেরই সম্প্রসারণ প্রয়োজন ছিল। এসব ঘাটতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয় এবং একটি প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। বিদ্যমান ভবনের সীমাবদ্ধতা থাকায় বারান্দা বন্ধ করে অতিরিক্ত জায়গা স্থাপন করায় মূল প্রস্তাবটিতে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক আপত্তি জানায়। এই অস্থায়ী সমাধানের জন্য দুইটি বড় সমস্যা ছিল,[৪৩]
১. মেঝেতে পাওয়া অতিরিক্ত স্থান অপর্যাপ্ত হতে পারে।
২. ভবিষ্যতে এই সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে বিভাগগুলোকে সিল করা হতে পারে।

এই প্রকল্পটি বাতিল করা হয় এবং ফার্মাকোলজি ও অন্যান্য বিভাগগুলোকে খালি জায়গায় হস্তান্তর ও একটি নতুন প্যাথলজি ও লাইব্রেরি ব্লক নির্মাণের জন্য একটি নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের উন্নয়নের প্রস্তাবটি জমা দেওয়ার পর কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে অর্থায়ন করার জন্য বিবেচনা করা হয়। তবে এটা ধারণা করা হয় যে, উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হলেও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাবে না। কলেজের বেশিরভাগ গবেষণাগার নতুন ভবনে স্থাপন করা হবে। অতএব স্থপতির সাথে পরামর্শ করে ভবন নির্মাণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

এ সময় এনাটমি বিভাগের সম্প্রসারণের জন্য মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের দ্বারা এনাটমি বিভাগের সমস্ত ঘাটতি পূরণ ও অন্যান্য বিভাগের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়। এজন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। এনাটমি বিভাগের সামনে একটি 'ইউ (U)' আকৃতির ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই ভবনে প্রিন্সিপালের অফিস এবং পরীক্ষা হল, গবেষণাগার ও কেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি বিভাগের জন্য সংযোজন নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। একটি সরাসরি করিডোরের মাধ্যমে এনাটমি বিভাগের জাদুঘরের সাথে প্যাথলজি বিভাগকে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। পরিকল্পনাটি যখন সম্পন্ন হবে তখন একটি নতুন কলেজ ভবন নির্মাণ হবে। যেখানে সব বিভাগগুলোর পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের নির্দেশিত মান বজায় থাকবে। এ সময় এই প্রকল্পের লাইন প্লান সম্পূর্ণ করা হয় এবং নকশা করার কাজটি সম্পন্ন করতে আরো সময় লেগে যায়। ইতিমধ্যে প্রকৌশল বিভাগ বিস্তারিত হিসাব তৈরি করে এবং ভবন নির্মাণে প্রায় ১৬,৩৪,৯০০ রুপি ব্যয় হয়।[৪৪] এই ভবন নির্মাণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং প্রত্যাশা করা হয় যে, ১৯৫২ সালের শেষের দিকে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং পরবর্তী বছর (১৯৫৪) শেষ হবে বলে সরকারি নথিতে উল্লেখ করা হয়। এ সময় নতুন লেকচার থিয়েটার নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদন করা হয় এবং এজন্য প্রকৌশল বিভাগকে নিযুক্ত করা হয়। ধারণা করা হয় যে, যখন উপরিউল্লিখিত ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হবে তখন পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত সবধরনের আপত্তির অবসান হবে। ১৯৫১-৫২ সালে পাঠদান প্রক্রিয়ায় পূর্বের অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এ সময় ২২টি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করা হয়। পরিদর্শন কমিটির নির্দেশিত কাজগুলো এ সময় সমাপ্ত হলে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের ঢাকা মেডিকেল কলেজের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রির স্বীকৃতির ব্যাপারে আর কোনো বাধা বা অসুবিধা ছিল না। ১৯৫৩-৫৪ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে উল্লেখ করা হয় যে,

> After much correspondence with the Medical Council of Pakistan for the last two years and after several inspections of the Dacca Medical College by the Inspectors deputed by the Medical Council of Pakistan, the M.B.B.S. degree of the University of Dacca was recognised by the Council on 11.4.53.[৪৫]

এরপর থেকে এনাটমি বিভাগের অনেক অগ্রগতি হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে এই বিভাগের ডাইসেকশন হলের মেঝে মোজাইক দ্বারা টালি করা হয় এবং কক্ষের দেওয়ালে সাদা টাইলসের প্রলেপ দেওয়া হয়। এই পরিবর্তনগুলো ডাইসেকশন হলের শ্রী বৃদ্ধি করে, অন্য দিকে এটি পরিষ্কার করা অনেক সহজ হয়। এ ছাড়া হিমাগার মেরামত করায় ভালোভাবে কাজ সম্পন্ন হতে থকে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের ডাইসেকশনের জন্য মৃতদেহ সংরক্ষণ নিশ্চিত হয়।

১৯৫৭-৫৮ সালে এনাটমি বিভাগে কোনো অধ্যাপক না থাকলেও প্রভাষক এই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন এবং তার অধীনে বিভাগের অনেক অগ্রগতি হয়। ডাইসেকশনের জন্য মানুষের মৃতদেহের অভাব ছিল একটি অমীমাংসিত সমস্যা এবং নারায়নগঞ্জ থেকে কলেজের নিজস্ব ব্যয়ে মৃতদেহ আনা হতো।[৪৬]

অপরদিকে ১৯৫৮-৫৯ সালে নির্মিত ভবনের পরিবর্তন ও সংযোজনের মাধ্যমে কিছু পরিবর্তন হয়। এ সময় এই বিভাগের অগ্রগতি ছিল সন্তোষজনক।

১৯৫৯-৬০ সালে এনাটমি বিভাগের আরো অগ্রগতি হয়। বিভাগের জাদুঘরটি চার্ট, নমুনা (মডেল) দিয়ে ভালোভাবে সজ্জিত করা হয়। এসব উপকরণের কিছু বিভাগ নিজেই তৈরি করে। এই বিভাগে ফটোআর্ট বিভাগ নামে নতুন বিভাগ চালু হয়। সবসময়ের জন্য দুইজন (২) চিত্রকর, একজন ফটোগ্রাফার এবং একজন প্রজেকশনিস্ট (Projectionist) ছিল।[৪৭] এই প্রজেকশনিস্ট কেবল মাত্র কলেজের বিভাগগুলোতে কাজ করত না, হাসপাতালেও কাজ করত। ১৯৬১-৬২ সালে এনাটমি বিভাগ মেডিকেল সংস্কার কমিশনের সুপারিশে ফিজিওলজি বিভাগ থেকে হিস্টোলজির শিক্ষাদান কর্মসূচি গ্রহণ করে। এনাটমি বিভাগ এ সময়ও তার অগ্রগতি বজায় রাখে। ১৯৬৩-৬৪ সালেও এই বিভাগের অগ্রগতি সন্তোষজনক ছিল।[৪৮] এভাবে দেখা যায় যে, ১৯৪০-১৯৫০ এর দশকের প্রথম দিকে কিছু সমস্যা থাকলেও পরবর্তীতে তা সমাধান করা হয় এবং এটিকে একটি আধুনিক বিভাগে পরিণত করে। গবেষণার আলোচ্য সময় পর্যন্ত এর ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়।

ফিজিওলজি বিভাগ

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইতিহাস ঐতিহ্য যত পুরাতন, ফিজিওলজি বিভাগের ইতিহাস ঐতিহ্যও তত পুরাতন। অধ্যাপক হীরালাল সাহা প্রথম বিভাগীয় প্রধান হিসেবে এর কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময় তিনি কলকাতায় চলে যান, তার জায়গায় নতুন শিক্ষক স্থলাভিষিক্ত হন। এই বিভাগটি হিস্টোলজি বিভাগের লাইব্রেরির কাছে অবস্থিত ছিল। ১৯৪৯ সালে বিভাগটি স্থানান্তর করা হয় এবং লাইব্রেরি অন্য একটি বড় কক্ষে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে বিভাগের অধ্যাপক রেখাচিত্র, নকশা, আঁকা ছবি, যন্ত্রপাতি এবং এপিডায়াসকোপ ইত্যাদির মাধ্যমে ১১৮টি লেকচার প্রদান করেন। প্রতি ২ ঘণ্টায় ২৫টি ব্যবহারিক ক্লাশ হতো। প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের হিস্টোলজি এবং দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কেমিক্যাল ফিজিওলজি পড়ানো হতো।[৪৯] শিক্ষার্থীদের পাঠদান যাতে সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত হয়, এজন্য তাদের বিভিন্ন ব্যাচে বিভিক্ত করা হয়। ব্যবহারিক এবং কেমিক্যাল ফিজিওলজি ক্লাশ নিম্নের ব্যাচ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়,[৫০]

১ম শিফট (২য় ব্যাচ), ব্যাচ এ-৩৭ এবং ব্যাচ বি-৩১
২য় শিফট (২য় ব্যাচ) ব্যাচ সি-৩১ এবং ব্যাচ ডি-৩১

প্রতিদিন দুইটি করে ক্লাশ নেওয়া হয়, একটি ক্লাশ পূর্বাহ্নে এবং অন্যটি অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্লাশগুলোতে বিশেষ কিছু বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন, রক্তের আবরণ চিহ্নিতকরণের কৌশল, লোহিত ও শ্বেত কনিকা চিহ্নিতকরণ, লোহিত ও শ্বেত কণিকা গণনার পদ্ধতি, পৃথককরণ, রক্তের হিমোগ্লোবিন গণনা, কোষ চিহ্নিতকরণ। এই বিভাগে প্রথমবর্ষের হিস্টোলজি ক্লাশ শিক্ষার্থীদের চারটি ব্যাচে ভাগ করে অনুষ্ঠিত হয়, যেমন, ব্যাচ-এ ৪৪, ব্যাচ বি-৪০, ব্যাচ সি-৪০, ব্যাচ ডি-৪৭।[৫১] অন্যদিকে কেমিক্যাল এবং ফিজিওলজির অংশ হিসেবে প্রত্যেকটি ব্যবহারিক ক্লাশে রক্ত সংরক্ষণ এবং সংগ্রহের ওপর হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখানো হয় এবং বায়োকেমিক্যাল গঠন সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর বিশ্লেষণ করা হয়। এ ছাড়া কিডনি এবং লিভার পরীক্ষা করে দেখানো হয়।

উপরি-উক্ত বিবরণী থেকে পর্যালোচিত সময়ের ফিজিওলজি বিভাগ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানা যায়। এ সময় ব্যবহারিক ফিজিওলজি ক্লাশ করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল। ফিজিওলজি ক্লাশের

গবেষণামূলক কাজের জন্য শাফটারগুলো (Shafter) টেবিলের ওপর স্থির অবস্থায় রাখা হয় এবং ড্রামগুলো বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে চালাতে হয়। ১৯৪৯ সালে এসব কাজ অধ্যাপকের সহযোগিতায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কর্মচারীদের মাধ্যমে করা হয়। এরপর থেকে ফিজিওলজির ক্লাশের ব্যবহারিক ক্লাশে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। শিক্ষার্থীদের হিস্টোলজির ক্রমবিন্যাসের একটি স্লাইড প্রস্তুত এবং এগুলো সংরক্ষণ করতে হতো।

কেমিক্যাল ফিজিওলজির শিক্ষার্থীদেরকে খাদ্যদ্রব্যের রসায়ন (আমিষ, চর্বি, শর্করা), মুত্র পরীক্ষা এবং রক্তের গঠন প্রক্রিয়া সম্পর্কে শেখানো হতো। তাদেরকে রক্ত গঠনের পরীক্ষা হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হতো। তাছাড়া শিক্ষার্থীদেরকে মেডিকেলের যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো, যেমন, স্টেথেসকোপ, হেমোসাইটোমিটার, চোখ পরীক্ষা করার যন্ত্র বা অফথালমোস্কোপ, স্ফেগমোমেনোমিটার ইত্যাদি। উপরন্তু মানব শরীরের পুরো ক্রমবিন্যাস সম্পর্কে তাত্ত্বিক লেকচার প্রদান করা হয়।

১৯৪৮-৪৯ সালে সবকিছু পূর্বের বছরের মতো ছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে ১১৬টি লেকচার প্রদান করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের ২৬টি ব্যবহারিক ক্লাশ প্রতি ঘণ্টায় নিম্নের ব্যাচ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়,[৫২]
প্রথম শিফট (২টি ব্যাচ) ব্যাচ এ-৪২, ব্যাচ বি-৩৯
দ্বিতীয় শিফট (২টি ব্যাচ) ব্যাচ সি-৪০, ব্যাচ ডি-৩৭

অকৃতকার্য ও বিলম্বে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য পুনরায় ২০টি ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। বায়োকেমিস্ট্রির ক্লাশ পূর্বের মতো অনুষ্ঠিত হতো। অন্যদিকে প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীদের হিস্টোলজির ক্লাশ নিম্নের ব্যাচ অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়,
ব্যাচ এ-৩০ ব্যাচ বি-৩০
ব্যাচ সি-৩০ ব্যাচ ডি-৪১

এ ছাড়া বিভিন্ন হাসপাতাল যথা মিটফোর্ড হাসপাতাল, মিলিটারি হাসপাতাল এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ৩৬৪টি ক্লিনিক্যাল উপাদানের নমুনা পরীক্ষা করার জন্য এই বিভাগে পাঠানো হয়।[৫৩] ফলে তারা নমুনাকরণের বিশেষ কিছু নতুন পরীক্ষার সাথে পরিচিত হয়। এদিকে ১৯৫০ সালের মে মাসে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শনকারী দল বিভাগটি পরিদর্শন করে কিছু সমস্যা চিহ্নিত করেন। তারা উল্লেখ করেন যে, এই বিভাগটি ভালোভাবে সংগঠিত, তবে প্রধান ত্রুটি হলো সরঞ্জামের অভাব এবং ল্যাবরেটরিতে গ্যাসের ব্যবস্থা করা। ১৯৫০ এর দশকে সরঞ্জামগুলোর বেশিরভাগই আনা হয়, কিন্তু এগুলো তখনও সরবরাহ অবস্থায় ছিল। গ্যাস প্লান্টটির কাজ শুরু হয় এবং গ্যাস মিটার আংশিকভাবে ভরাট ছিল। ল্যাবরেটরিগুলোতে গ্যাস চালু হওয়ার পূর্বে প্রকৌশলির দ্বারা গ্যাসের ফিটিং এবং পাইপ আরো ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়। এই বিভাগে তখনও একটি মাইক্রোস্কোপ ছিল না। আর্থিক বছর শেষ হওয়ায় পূর্বেই একটি মাইক্রোস্কোপ সরবরাহের চেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন সমস্যার কারণে এটা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি অর্থ বিভাগের অনুরোধে পরিচালকের দফতরে পুনঃপরীক্ষা করা হয় এবং আরো তিন মাস বিলম্ব হয়। এ ছাড়া স্নাতকোত্তর যোগ্যতা ও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে পি.এস.সি. এই বিভাগে অধ্যাপক নিতে পারেনি।[৫৪] পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক এই বিভাগের সাজসরঞ্জাম ও শিক্ষক স্বল্পতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

অনুরূপভাবে ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শনকারী কমিটি যখন ফিজিওলজি বিভাগ পুনরায় পরিদর্শন করেন, তখন বিভাগে দুইটি গবেষণাগার ছিল। একটি ব্যবহারিক ফিজিওলজির, অন্যটি হিস্টোলজির এবং তৃতীয়টি কেমিস্ট্রির। ৪০ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেকের স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা ছিল, যা কলেজের ভর্তিকৃত ছাত্রদের জন্য যথেষ্ট। গবেষণাগারে পানি ও গ্যাসের সংযোগ এবং বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে সরবরাহকৃত সরঞ্জাম পর্যাপ্ত ছিল। শিক্ষার্থীদের নাক, কান, গলা, চোখ ডেমনস্ট্রেশনের জন্য আরো কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। পর্যাপ্ত স্পেকট্রোস্কোপ, চিত্র, মডেল, চার্ট এবং একটি হ্যালডেন (Haldane) ছিল না। বিভাগটিতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা এবং হাসপাতালের জন্য বায়োকেমিক্যালের কাজ পরিচালিত হতো। মেডিকেল কাউন্সিল বিভাগের শিক্ষকদের জন্য কিছু কক্ষের সুপারিশ করে এবং বিভাগটির যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়। ১৯৫১ সালের ফিজিওলজি বিভাগে কিছু সাজসরঞ্জামের (ই. এন. টি.'র যন্ত্র, স্পেকট্রোস্কোপ, নমুনা, হ্যালডেন যন্ত্র এবং ব্যবহারিক ফিজিওলজির ব্যবস্থা করা) ঘাটতি বিদ্যমান ছিল।[৫৫]

এসব সরঞ্জামের মধ্যে কিছু অর্ডার অবস্থায় ছিল এবং কিছু ধীরে ধীরে আনা হয়, তবে সরঞ্জাম পাওয়ার প্রধান অসুবিধা অনুদান নয়, বরং এগুলো সহজে বাজারে পাওয়া যেত না। এ ক্ষেত্রে এগুলো পাওয়ার একটি পদ্ধতি ছিল ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের নেতৃস্থানীয় সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা। এর ফলে সরঞ্জাম পাওয়া সহজ হয়। এ সময় স্থানীয় দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং সরবরাহ ও উন্নয়ন (করাচি) বিভাগের মহাপরিচালকের সাথে পরামর্শ করে অর্ডার দেওয়া হয়। এটি কেবল ফিজিওলজির সরঞ্জাম ছিল না। অন্যান্য বিভাগের (এনাটমি, হাইজিন, ব্লাড ব্যাংক, প্যাথলজি) সরঞ্জাম ছিল। ১৯৫০-৫১ সালে অধ্যাপকগণের মাধ্যমে লেকচারগুলো পূর্বের উল্লিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদান করা হয়। প্রতি ২ ঘন্টায় ২৬টি ব্যবহারিক ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবহারিক ও কেমিক্যাল ফিজিওলজির এবং বায়োকেমিস্ট্রির ক্লাশ পূর্বের নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়।[৫৬]

এই বিভাগে বিভিন্ন হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল কাজ যেমন, মিটফোর্ড হাসপাতাল, মিলিটারি হাসপাতাল এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ৬৪২টি নমুনা এই বিভাগে পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়। অপরদিকে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক ফিজিওলজিসহ অন্যান্য বিভাগের স্বীকৃতির ব্যাপারে ১৯৫০-৫১ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী* থেকে জানা যায় যে,

> The Pakistan Medical Council in their report of inspection have made certain recommendations in which they are agreeable to recognize the Departments of Medicine, Physiology Pharmacology, Surgery, Eye, ENT, Midwifery and Gynaecology provided the improvements suggested in the report of inspection are effected.[৫৭]

মেডিকেল কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে এই বিভাগের অগ্রগতি হয়। ১৯৫২ সালে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শনকারী দল ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শনের সময় ফিজিওলজি বিভাগে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ঘাটতি দেখতে পান যেমন, হ্যালডেন যন্ত্র, স্পেকট্রোস্কোপ, নাক, কান, গলার যন্ত্রপাতি, নমুনা ইত্যাদি।[৫৮]

এ সময় সাজসরঞ্জামের একটি বড় চালান ঢাকায় পৌছায়, যা এই বিভাগের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়। একই সময় সরবরাহ ও উন্নয়ন বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেলকে ফিজিওলজি ও এনাটমি বিভাগের জন্য

মডেল, চার্ট ও জার সংগ্রহ করার জন্য একটি বিশেষ ফরমাশপত্র প্রদান করা হয় ও আদেশ দেওয়া হয় এবং ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সরবরাহ করা হবে বলে এসব যন্ত্রপাতির সংস্থা প্রতিশ্রুতি দেয়। হিস্টোলজির শিক্ষার্থীদের জন্য আরো আসন প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রেফারেন্স বই সংগ্রহ করা হয় এবং আরো বইয়ের অর্ডার দেওয়া হয়। এসব ঘাটতির পাশাপাশি পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির একটি বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করে, তবে এই তালিকাটির বিবরণী পাওয়া যায়নি। একই বছরে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শনকারী কমিটির সদস্যগণ এই বিভাগের অধ্যাপক সম্পর্কে আপত্তি জানায় যে, এই বিভাগের অবস্থা এমন যে, অধ্যাপকগণ বেশিরভাগ সময় বিভাগের বাইরে সময় ব্যয় করেন। এজন্য নিন্দা জানানো হয় এবং 'তাঁকে এক্স-রের কাজ ও ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফিকের বিভাগ থেকে অনতিবিলম্বে অব্যাহতি এবং ৩০ শয্যা থেকে ১০ শয্যা দেওয়ার প্রস্তাব করা করা হয়।'[৫৯] কিছু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ফিজিওলজি বিভাগের অগ্রগতি হয়। ১৯৫১-৫২ সালে পূর্বের মতো লেকচার প্রদান, ব্যবহারিক ফিজিওলজি, হিস্টোলজি ও বায়োকেমিস্ট্রির ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় হাসপাতালে ১৫১৫টি নমুনা পরীক্ষা করা হয় এবং সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. লাইসেন্সিয়েট শিক্ষার্থীদের জন্য অধ্যাপকগণ ২৫টি ফিজিওলজির লেকচার, ৩০টি পরীক্ষামূলক ক্লাশ এবং বায়োকেমিস্ট্রির ওপর ৩০টি ক্লাশ নেন।[৬০] সহকারী অধ্যাপক ও ডেমনস্ট্রেটর দ্বারা হিস্টোলজির ওপর ২০টি ক্লাশ নেওয়া হয়, তবে এ সময় ফিজিওলজি বিভাগে ডেমনস্ট্রেটরের সংখ্যা ছিল কম। ফলে বিভাগের যাবতীয় ক্লাশ নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯৫৩ সালে ফিজিওলজির বিভাগের অধ্যাপক এ. রহমান, এম. এ, এম. বি. (কলকাতা) ডি.টি. এম. এন্ড. এইচ. (ইংল্যান্ড) উল্লেখ করেন যে, ব্যবহারিক ফিজিওলজি তিনটি বিভাগে বিভক্ত (১) হিস্টোলজি (২) বায়োকেমিস্ট্রি (৩) ব্যবহারিক ফিজিওলজি। প্রতিটি ব্যাচের ৩০ জন শিক্ষার্থীর পাঠদানের জন্য ৩ জন ডেমনস্ট্রেটর দরকার, যাতে করে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে সঠিকভাবে শিক্ষা পেতে পারে অথবা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি ভালোভাবে মনোযোগ দিতে পারে। সহকারী অধ্যাপকসহ যোগ্য উপযুক্ত ডেমনস্ট্রেটর নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। এ সময় (১৯৫৩) ফিজিওলজি বিভাগে একজন সহকারী অধ্যাপক এবং ৪ জন ডেমনস্ট্রেটর ছিল।[৬১] তাছাড়া এই বিভাগে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের বায়োকেমিক্যালের কাজ করা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই কাজগুলো দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই একজন ডেমনস্ট্রেটর নিয়োগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে ৫ বছরেরও বেশি সময়ের জন্য ফিজিওলজির ডেমনস্ট্রেটরের পদ বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। অন্যথা হাসপাতালের বায়োকেমিক্যালের কাজ বা ক্লিনিক্যাল কাজ ও ফিজিওলজির শিক্ষানবিশ কর্মশালা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়।[৬২] অপরদিকে সরকারি নথিতে পাওয়া ২৫/০৭/১৯৫৩ইং তারিখের একটি চিঠিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল এন. আহমেদ ফিজিওলজির একজন অস্থায়ী ডেমনস্ট্রেটরের পদের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে নিম্নের কারণ উল্লেখ করেন,[৬৩]

১. প্রকৃতপক্ষে ফিজিওলজির ব্যবহারিক ক্লাশ সঠিকভাবে পরিচালনা ও শিক্ষাদানের জন্য তিনটি ডেমনস্ট্রেশন ক্লাশ নেওয়া প্রয়োজন।

২. তিনটি ব্যবহারিক শ্রেণিকক্ষ:

   ক. একটি পরীক্ষামূলক

   খ. একটি কেমিক্যাল

   গ. একটি হিস্টোলজি

এই তিনটি ক্লাশ প্রতিদিন পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক ক্লাশে কমপক্ষে ৪০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকে ।

৩. তিনটি ক্লাশের শিক্ষার্থীদের ডেমনস্ট্রেটশন, শিক্ষাদান সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একের অধিক ডেমনস্ট্রেটর প্রয়োজন ছিল।

৪. ঢাকার মিলিটারি হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতাল এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বায়োকেমিক্যাল বিভাগে পরীক্ষার জন্য প্রতিদিন প্রায় ৩৬ জনেরও বেশি নমুনা (ব্লাড সুগার, ব্লাড ইউরিয়া, ব্লাড কোলেস্টরেল, গ্যাস্ট্রিক বিশ্লেষণ, এইচ. পি. এইচ. ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হতো।

৫. দুইজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থায়ী ডেমনস্ট্রেটর ডাক্তার আবুল কালাম এবং ডাক্তার মজিবুর রহমান চৌধুরী উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ায় একজন অস্থায়ী ডেমনস্ট্রেটরের পাশাপাশি আরও দুইজন ডেমনস্ট্রেটরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নতুনদের নিয়ে ডেমনস্ট্রেশন পরিচালনা করা কঠিন।

এভাবে দেখা যায় যে, ফিজিওলজি বিভাগের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডেমনস্ট্রেটর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ চলে গেলে ডেমনস্ট্রেটরের অভাব দেখা দেয় এবং বিভাগের কাজ পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। চিকিৎসাশিক্ষার ক্ষেত্রে ডেমনস্ট্রেটশন ক্লাশ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভাগীয় প্রধান, প্রিন্সিপাল, সার্জন জেনারেলকে অবহিত করে অতি দ্রুত এই পদ পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেন। অন্যদিকে ডেমনস্ট্রেটরের অভাব পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ যাতে সহজে বুঝতে ও চর্চা করতে পারে, এজন্য তাদের দক্ষ, যোগ্য শিক্ষকগণ বই লিখে সহায়তা করেন। ১৯৪৮ সালে ডাক্তার এ. এফ. এম. আব্দুল মজিদ (এম. বি., ই. পি. এম. এস.) কেমিক্যাল ফিজিওলজির ওপর *Practical Physiological Chemistry* নামে একটি ব্যবহারিক বই ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য লিখেন *[পরিশিষ্ট দেখুন-২৩]*। তিনি তাঁর এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার অনুমতি চেয়ে ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে সার্জন জেনারেলের কাছে আবেদন করেন। তাঁর গ্রন্থটি ১৯৪৮ সালে অক্টোবরে মুদ্রণ হলেও প্রকাশিত হয়নি। সে সময় তিনি ইংল্যান্ডে চলে যান। ফলে দেশে ফিরে আসলে প্রকাশ করার জন্য অনুমতি চান। উল্লেখ্য তিনি ১৯৫৩ সালে মিটফোর্ড হাসপাতালের ই.এন.টি. বিভাগে থাকলেও ১৯৪৮ সালে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফিজিওলজি বিভাগে ডেমনস্ট্রেটর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

১৯৫৭-৫৮ সালে ফিজিওলজি বিভাগের কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকলেও বিভাগীয় প্রধান এর অগ্রগতি বজায় রাখেন।[৬৪] অপরদিকে ১৯৫৮-৫৯ সালে এই বিভাগের ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। বিভাগটি শিক্ষাদানের জন্য সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত ছিল। জনসাধারণের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র হলো মাইক্রোপ্রজেক্টর, যা এই বিভাগে বিদ্যমান ছিল।[৬৫] ১৯৫৯-৬০ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী* থেকে এই বিভাগের অগ্রগতি সম্পর্কে জানা যায়। এ সময় ফিজিওলজি বিভাগটি নতুন ভবনের দ্বিতীয় তলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে অবস্থিত এবং এর তিনটি ল্যাবরেটরি ছিল । গবেষণামূলক কাজ ও শিক্ষাদানের জন্য যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত এই বিভাগের ল্যাবরেটরি এবং গবেষণাকক্ষ প্রদেশের সেরা। ইলেক্ট্রোফরেসিস (Electrophoresis) কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সে সময় ছিল। ফলে বিভাগের যথেষ্ট অগ্রতি হয়েছে।[৬৬] ১৯৬০-৬১ সালে বিভাগটি অগ্রগতি বজায় রাখে এবং এ সময় গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। এখানে পি.সি.এস.আই.আর. (P.C.S.I.R.) গবেষক নিয়োগের জন্য কিছু তহবিল বরাদ্দ করে।

বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিভাগীয় প্রধানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শিক্ষকদের তত্ত্বধানে একটি গবেষণা প্রবন্ধ বের করে। এটা ছিল শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের বিরাট সাক্ষ্য।[৬৭] ফলে ১৯৬১-৬২ সালে এই বিভাগ 'Blood Protein disorder in Pul, TB', 'Plasma protein level in East Pakistanis', 'Serum Protein in acute Cholera', 'Protein change in Nephrotic Syndrome', 'Serum amylase level in East Pakistanis', বিষয়ের ওপর গবেষণার কাজ পরিচালনা করে।[৬৮]

পি.সি.এস.আই.আর. (P.C.S.I.R.) বিভাগকে যে অনুদান দেয়, এর মাধ্যমে এসব গবেষণার কাজ করা হয় এবং এর মাধ্যমে বিভাগের গবেষণার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন হয়। এ সময় (১৯৬৩-৬৪) পাকিস্তান মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল অধ্যাপক ডা. আব্দুর রহমান এর অধীনে বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার জন্য ফিজিওলজি বিভাগকে সহায়তা করে। ১৯৬৫-৬৬ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী* তে ফিজিওলজি বিভাগের গবেষণা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়,

> With the funds provided by the Pakistan Medical Research Council, the research work on `Protein Serum' in the Department of Physiology, under the able guidance of Dr. Abdur Rahman, Prof. of Physiology, is steadily progressing.[৬৯]

পাকিস্তান মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের (P.M.R.C.) তহবিলের দ্বারা ফিজিওলজি বিভাগ 'প্রোটিন সেরাম' এর ওপর গবেষণা এবং এ সময় শীর্ষস্থানীয় মেডিকেল জার্নালে কিছু গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ এর দশকের শেষ দিকে বিভাগে শিক্ষক স্বল্পতা, জুনিয়র স্টাফদের বৈষম্যমূলক বদলি, এম.বি.বি.এস. প্রথম বর্ষে ভর্তি বিলম্বে সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তার অগ্রগতি বজায় রাখে। বিভাগটি পাকিস্তান মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের (P.M.R.C.) বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণামূলক কাজ চালিয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর থেকে আলোচ্য সময় পর্যন্ত এর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের প্রখ্যাত ফিজিওলজিস্টবৃন্দ এই বিভাগটি পরিচালনায় তাদের দক্ষতার ছাপ রাখেন। তাদের কার্যক্রম শুধু ফিজিওলজি বিভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বরং বাংলাদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে তাদের ভূমিকা ছিল গৌরবজ্জ্বল। বিশেষ করে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ডিন, চিকিৎসা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসকদের জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন এর নানামুখী চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক উন্নয়নমুখী কার্যক্রমে তাদের ভূমিকা অপরিসীম।[৭০] এভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজের এই বিভাগটি দেশের চাহিদা মাফিক চিকিৎসক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ফার্মাকোলজি বিভাগ

এই বিভাগে একটি জাদুঘরসহ গবেষণাগার ছিল। এখানে শিক্ষার্থীদেরকে ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার পদ্ধতির ওপর ব্যবহারিক শিক্ষা এবং বিভিন্ন ঔষধের ধরন ও গঠনের ওপর ঔষধ তৈরি করা শিখত। তারা অশোধিত ঔষধ শনাক্ত করা শিখে। শিক্ষার্থীদেরকে ফার্মাকোলজির (মানব শরীরের ওপর ঔষধের কাজ) ক্রমবিন্যাসের ওপর তাত্ত্বিক লেকচার দেওয়া হয়।

এ সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঔষধ তৈরির শিক্ষাদানের ওপর জোর দেওয়া হয় যেমন, আর্সেনিক (Arsenic), মারকিওরি (Mercury), বিসমাথ (Bismath), আয়রণ (Iron), এন্টিমনি (Antimony), এরগট (Ergot), ডিজিটালিস (Digitalis), এটরোপাইন (Atropine), স্ট্রিকনিন (Strychnine), মরফিন (Morphine), কুইনাইন (Quinine), এমিটাইন (Emetine), সেলিসিলেট (Salicylates) এন্ডোক্রাইন (Endocrines)

ভিটামিন (Vitamin) ইত্যাদি। এ সময়ে কিছু ঔষধ প্রাধান্য পায় যেমন, সালফনামাইডস (Sulphonamides) ও অন্যান্য কেমোথেরাপিটিক ঔষধ, (other Chemo Therapeutic) এবং এন্টিবায়োটিক, এসিটিএইচ, করটিজন (Cortisone) ইত্যাদি।[৭১] শিক্ষার্থীদেরকে প্রাণির ওপর ঔষধ প্রয়োগের প্রভাব সম্পর্কে হাতে কলমে ডেমনস্ট্রেশন করে দেখানো হতো। রোগীদের ওপর ঔষধের কার্যকারিতার প্রভাব তথ্য শনাক্ত করা হতো। ১৯৪৭-৪৮ সালে একজন অধ্যাপক, একজন সহকারী অধ্যাপক ও দুইজন ডেমনস্ট্রেটর নিয়ে বিভাগটি গঠিত ছিল *[পরিশিষ্ট দেখুন-১৮]*। পাঠদানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদেরকে নিয়মিত ও নভেম্বর ব্যাচ দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। দুইটি কোর্সের ওপর লেকচার দেওয়া হতো। একটি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদেরকে এবং অন্যটি নভেম্বর ব্যাচের শিক্ষার্থীদের দেওয়া হতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রথম এম.বি.বি.এস. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে পুরো বছর জুড়ে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদেরকে তাত্ত্বিক লেকচার ও ফার্মাসিতে ব্যবহারিক ক্লাশ নেওয়া হতো। এই বর্ষের শিক্ষার্থীদের লেকচার প্রদান করতেন ফার্মাকোলজির অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক এবং ব্যবহারিক ক্লাশ নিতেন ডেমনস্ট্রেটর ও সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর। নিম্নের তালিকা থেকে যা জানা যায়,[৭২]

দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (নিয়মিত)		দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (নভেম্বর)	
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৮৭	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২৪
লেকচার সংখ্যা	৫৪	লেকচার সংখ্যা	১২
ব্যবহারিক ক্লাশের সংখ্যা	৩০	ব্যবহারিক ক্লাসের সংখ্যা	৩০

অনুরূপভাবে ১৯৪৮-৪৯ সালে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের নিয়মিত এবং নভেম্বর ব্যাচে বিভক্ত করা হয়। দুইটি কোর্সের লেকচার একটি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের, অন্যটি তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য দেওয়া হয়। একইভাবে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য ফার্মাসিতে ব্যবহারিক ক্লাশ এবং তাত্ত্বিক লেকচার প্রদান করা হতো।[৭৩]

দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদেরকে ফার্মাকোলজির অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপক লেকচার প্রদান করতেন। ব্যবহারিক ফার্মাসি ডেমনস্ট্রেটর ও সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর তাদের ব্যবহারিক ক্লাশ নিতেন। অন্যদিকে তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ফার্মাকোলজির অধ্যাপক লেকচার প্রদান করেন। নিম্নের তালিকা থেকে এর সংখ্যা পাওয়া যায়,[৭৪]

দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (নিয়মিত)		দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (নভেম্বর)	
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১৩১	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৬৬
লেকচার সংখ্যা	৫৬	লেকচার সংখ্যা	১৬
ব্যবহারিক সংখ্যা	৩৯	ব্যবহারিক ক্লাশের সংখ্যা	২০
তৃতীয় বর্ষ ক্লাশ (নিয়মিত)		তৃতীয় বর্ষ ক্লাশ (নভেম্বর)	
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১৮	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৩৬
লেকচার সংখ্যা	৩৩	লেকচার সংখ্যা	৩১
দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (সাময়িক)		তৃতীয় বর্ষ (সাময়িক)	
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৮১	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২৮
লেকচার সংখ্যা	১৮	লেকচার সংখ্যা	১৫
ব্যবহারিক ক্লাশের সংখ্যা	৬		
তৃতীয় বর্ষ ক্লাশ (নভেম্বর পুরাতন) কলকাতা			
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২৪		
লেকচার সংখ্যা	৩৩		

১৯৪৮-৪৯ সালে প্রথম এম.বি.বি.এস. পরীক্ষা এবং চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় যাদের এপিয়ার্ড ছিল তাদের জন্য এসব ক্লাশ ছাড়াও কিছু টিউটোরিয়াল ক্লাশ নেওয়া হয়। একইভাবে কলকাতা থেকে যেসব সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. শিক্ষার্থী ঢাকায় চলে আসে, তাদের জন্য কিছু টিউটোরিয়াল ক্লাশ নেওয়া হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে পাঠদানে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবর্ষের শিক্ষার্থীদেরকে নিয়মিত ও নভেম্বর ব্যাচে বিভক্ত করা হয়। দুইটি কোর্সের লেকচার দেওয়া হয় তথা একটি দ্বিতীয় বর্ষের নিয়মিত ও নভেম্বর ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য, অন্যটি তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের নিয়মিত ও নভেম্বর ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য লেকচার দেওয়া হয়। প্রথম এম.বি.বি.এস. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদেরকে তাত্ত্বিক লেকচার ও ফার্মাসির ব্যবহারিক ক্লাশ নেওয়া হয়। উপরন্তু অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু লেকচার দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ফার্মাকোলজির অধ্যাপক লেকচার প্রদান করেন। ব্যবহারিক ফার্মাসি ডেমনস্ট্রেটর ও সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর ব্যবহারিক ক্লাশ নেন এবং ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজিস্ট দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য ৬০টি ডেমনস্ট্রেশন ক্লাশ নেন। নিম্নের তালিকা থেকে শিক্ষার্থীদের ক্লাশের সংখ্যা জানা যায়,[৭৫]

<u>দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (নিয়মিত)</u>		<u>দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (পুনঃপরীক্ষা)</u>	
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১৫৯ জন	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৫৯
লেকচার সংখ্যা	৫৪টি	লেকচার সংখ্যা	১৩
ব্যবহারিক ক্লাশের সংখ্যা	৪০টি		
ডেমনস্ট্রেশনের সংখ্যা	১৫৬		
<u>তৃতীয় বর্ষ (নভেম্বর)</u>		<u>দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (নভেম্বর)</u>	
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৪৪	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৩৪
লেকচার সংখ্যা	৩১	লেকচার সংখ্যা	১৯
		ব্যবহারিক ক্লাশের সংখ্যা	১৫
<u>চতুর্থ বর্ষ ক্লাশ (নিয়মিত)</u>		<u>চতুর্থ বর্ষ ক্লাশ (নভেম্বর)</u>	
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	১৭	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	২৫
লেকচার সংখ্যা	৩১	লেকচার সংখ্যা	৩১
<u>তৃতীয় বর্ষ ক্লাশ (নিয়মিত)</u>		<u>চতুর্থ বর্ষ ক্লাশ (পুনঃপরীক্ষা)</u>	
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৪৩	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৩৮
লেকচার সংখ্যা	২৬	লেকচার সংখ্যা	১৫

এ সময় প্রথম ও দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় যাদের এপিয়ার্ড ছিল তাদের জন্য কিছু টিউটোরিয়াল ক্লাশ নেওয়া হয়। ফার্মাকোলজির অধ্যাপক চিকিৎসাশিক্ষায় পাঠদান ছাড়াও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালের অন্তরোগী বিভাগে রোগীদের চিকিৎসা করেন এবং তিনি প্রায় ২৭৩ জন রোগীর চিকিৎসা করেন।[৭৬] এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের কোনো কোনো চিকিৎসক কিছু বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধ লিখেন এবং তা বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়।[৭৭]

১৯৫০ সালের দিকে বিভাগটি প্রাথমিক উন্নয়নের স্তরে যায়। এর কিছু নির্দিষ্ট সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। একই বছরের মার্চ মাসে এগুলো বিদেশ থেকে আনার জন্য ফরমাশ পেশ করা হয়। দ্রুত পাওয়ার ব্যাপারে সরবরাহকারী সংস্থার কাছে চিঠি দেওয়া হয়। অপরদিকে একই বছরের জুলাই মাসে পাকিস্তান

মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যগণ বিভাগটি পরিদর্শন করেন। এ সময় বিভাগে ৪০ জন শিক্ষার্থীর একটি গবেষণাগার এবং এটি ভালোভাবে সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত ছিল। গবেষণাগারে দুইটি জাদুঘর নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই ব্যাপারে পরিদর্শনকারী দল সন্তোষ প্রকাশ করে। বিদ্যমান যে কোনো ঘাটতি অবশ্যই পূরণ করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়। এই বিভাগের অধ্যাপক পুরো সময় বিভাগে নিয়োজিত ছিলেন। খুব দ্রুত পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে আশ্বাস দেন। ১৯৫০ সালে শিক্ষার্থীদের ফার্মাকোলজি পরীক্ষা পরিচালনার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ সময় অধ্যাপক নিজেই ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডেমনস্ট্রেশন প্রদর্শন করেন। গবেষণার জন্য একটি টিস্যু বাথ এবং একটি কেমোগ্রাফ আমদানি করা হয়। পরিদর্শনকারী দল জাদুঘর সঠিকভাবে সুসজ্জিত করা ও আরো নমুনা সংগ্রহ করার জন্য সুপারিশ করেন।[৭৮]

এই বিভাগে একটি কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা করা হয়। তখন হাসপাতালে বিভাগের অধ্যাপক বি. এম. আর. (B.M.R.) পরীক্ষা করত। এর জন্য একটি 'বেনেডিক্ট রস' (Benedict Ross) যন্ত্রপাতি ছিল। অধ্যাপক ছাড়াও একজন চিকিৎসক ৩০ শয্যার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফিক বিভাগ এবং এক্স-রে বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন, কিন্তু অধিকাংশ সময় বিভাগের বাইরে সময় ব্যয় করেন। এজন্য মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটি আপত্তি জানায়। ফার্মাকোলজি ও থেরাপেটিকস শিক্ষাদানের জন্য সর্বাধিক ১০ শয্যা বরাদ্দ করার সুপারিশ করে। এক্স-রের কাজ এবং ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফিক বিভাগের তত্ত্বাবধান এবং গবেষণার কাজ শিক্ষাদানের জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করতে সক্ষম এমন যোগ্য অফিসার পাওয়ার সাথে সাথে তাঁকে এই কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। নন-ক্লিনিক্যাল বিভাগে ফার্মাকোলজিতে উঁচু যোগ্যতা সম্পন্ন এবং শিক্ষকতায় পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উদ্যমী অফিসারের অভাব ছিল। এ রকম পরিস্থিতিতে তারা মনে করে যে, এগুলো পূরণ করা প্রয়োজন। কমিটি বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশ এবং বিভাগটির অগ্রগতির ব্যাপারে যথেষ্ট বিবেচনা করে। তাই বিভাগটিকে স্বীকৃতি দিতে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল সম্মত হয়। আবার ভবন ও কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্যাথলজি ও ফার্মাকোলজি বিভাগের মেঝেতে অতিরিক্ত জায়গার ব্যবস্থা এবং লাইব্রেরির স্টাফদের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা করার জন্য পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল সুপারিশ করে। উপরি-উক্ত চাহিদা পূরণ করার জন্য মূল প্রস্তাব ছিল সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং লাইব্রেরির চারপাশের বারান্দা সংযুক্ত করা, তবে এই অস্থায়ী সমাধানের ২টি ত্রুটি ছিল,[৭৯]

১. অতিরিক্ত জায়গা তৈরি করা সম্ভব ছিল না।

২. এটা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে বিভাগগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার আশঙ্কা।

অতএব এ সময় একটি বিকল্প প্রকল্প গঠন করা হয়। বিদ্যমান এনাটমি ব্লকের সমান্তরাল একটি পৃথক দুই তলা বিশিষ্ট প্যাথলজি ও লাইব্রেরি ব্লক তৈরি করা এবং স্থপতি এটি অনুমোদন করে। যখন প্যাথলজি বিভাগটি সরানো হয় তখন খালি জায়গাটিতে ফার্মাকোলজি বিভাগ স্থানান্তর করা হয়। একইভাবে লাইব্রেরি স্থানান্তরের মাধ্যমে খালি জায়গাটি প্রশাসনিক বিভাগ এবং ফিজিওলজি বিভাগের সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই প্রকল্পের ফলে কয়েকটি বিভাগ এবং অফিস অপরিসর অবস্থা থেকে মুক্ত থাকবে। এর ফলে পুরানো ভবনে যে বিভাগগুলো রয়েছে তা ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে আরো সম্প্রসারণ করা যাবে। যাতে তারা চারপাশের বারান্দায় সংরক্ষিত মেঝে ব্যবহার করতে পারে। ১৯৫০-৫১ সালে একই পদ্ধতিতে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয় *[পরিশিষ্ট দেখুন-২৪]*। পূর্বের মতো এ সময় প্রথম ও দ্বিতীয়

এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় যাদের এপিয়ার্ড ছিল তাদের পূর্বোক্ত ক্লাশ ছাড়াও কিছু টিউটোরিয়াল ক্লাশ নেওয়া হয়। এ ছাড়া ফার্মাকোলজির অধ্যাপক ফার্মাকোলজি ও চিকিৎসার পাঠদান ছাড়া হাসপাতালের অন্তরোগীদের চিকিৎসা করতেন। তিনি প্রায় ৩৫৫ জন রোগীর চিকিৎসা করেন। এ সময় কিছু বিষয়ের ওপর গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[৮০]

১৯৫১-৫২ সালে *ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ষিক বিরবণীতে* দেখা যায় যে, এই বিভাগের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় অধ্যাপকের সংখ্যা, ডেমনস্ট্রেটরের সংখ্যা পূর্বের চেয়ে বেশি ছিল। অন্যদিকে পাঠদানের ক্ষেত্রে এম.বি.বি.এস. শিক্ষার্থী ছাড়াও এম.এম.এফ. শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাশ নেওয়া হয় *[পরিশিষ্ট দেখুন-২৫]*। এ সময় ফার্মাকোলজির অধ্যাপক শিক্ষাদানের পাশাপাশি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অন্তরোগী বিভাগের ৫৮ জন রোগীর চিকিৎসা করেন এবং দুইটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।[৮১]

এই বিভাগের কিছু ত্রুটি থাকলেও এর অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক। পরবর্তীতে তারা ত্রুটিগুলো সমাধান করার চেষ্টা করেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে এই বিভাগের ব্যবহারিক কাজের জন্য অনেক যন্ত্রপাতি কেনা হয় এবং কিছু ফিজিওলজি বিভাগে স্থাপন করা হয়। স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির উদ্যোগে ফার্মাকোলজি বিভাগের ল্যাবরেটরিতে ড্রাগিস্ট ও কম্পাউন্ডদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া এই বিভাগ ঔষধ প্রস্তুত সংক্রান্ত ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তান সরকারকে সহায়তা করে। ১৯৫৮-৫৯ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে উল্লেখ করা হয় যে, এই বিভাগের অনেক অগ্রগতি হয়েছে।[৮২] অপরদিকে ১৯৫৯-৬০ সালে *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তেও বিভাগের সন্তোষজনক অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়।[৮৩]

পরবর্তীতে ১৯৬০ এর দশকে এই বিভাগ তার অগ্রগতি বজায় রাখে এবং এই প্রদেশের সরকারকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। ১৯৬৫-৬৬ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণীতে* উল্লেখ করা হয়,

> The Department of Pharmacology through its inspecting team and officer has helped the Government in inspecting and evaluating various pharmaceutical concerns in the province.[৮৪]

কেমিস্ট্রি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এসসি. কোর্সে অর্গানিক কেমিস্ট্রি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অথচ চিকিৎসাশিক্ষার অধ্যয়নের জন্য অর্গানিক কেমিস্ট্রির ওপর ভালো জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অর্গানিক কেমিস্ট্রির বিষয়টি চিকিৎসাশিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে তাত্ত্বিক ক্লাসে জৈব পদার্থের রসায়নের ওপর মৌলিক জ্ঞান প্রদান করা হয়। চিকিৎসাশিক্ষায় জৈব পদার্থের ব্যবহার, ধর্ম, গঠনপদ্ধতি ও প্রস্তুতকরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেমন, এ্যালকোহল (alcohol), ইথার (ether), ক্লোরোফম (Chloroform), আইয়োডোফম (Iodoform), এমিনিস (amines) পিউরিন (purine), ডেরিভেটিস (derivatives) ইত্যাদি। এ ছাড়া সালফানিলামাইডসের (Suplphanilaamides) এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কেমোথেরাপেটিক ঔষধের গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শেখানো হয়। শিক্ষার্থীদের খাদ্যের মূল উপাদান তথা শর্করা, আমিষ, চর্বি, সম্পর্কেও জ্ঞান প্রদান করা হয়। উপরন্তু শিক্ষার্থীদেরকে digitalis, ergot, quinine strychnine এর মতো পদার্থের ওপর বেশকিছু তথ্য দেওয়া হয়। অর্গানিক কেমিস্ট্রির

ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য গবেষণাগার সুসজ্জিত ছিল। এ সময় অর্গানিক কেমিস্ট্রির বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে বলা হয়ে যে,

> Our future aim should be to omit the subject of Organic Chemistry from the study of Medicine. Its place should be taken by Biochemistry. It should be split up from the vast subject of physiology.[৮৫]

১৯৪৭-৪৮ সালে বিভাগটি একজন অধ্যাপক ও তিনজন ডেমেনস্ট্রেটর নিয়ে গঠিত ছিল *[পরিশিষ্ট দেখুন-১৮]*। প্রথমবর্ষের নিয়মিত ও দ্বিতীয় বর্ষের পুনঃপরীক্ষার্থী এবং বিলম্বিত শিক্ষার্থীদেরকে বিভাগের অধ্যাপক অর্গানিক ও ফিজিক্যাল কেমিক্যালের ওপর লেকচার প্রদান করেন। বিভাগের সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর ও অন্যান্য ডেমনস্ট্রেটরগণ ১৪০টি ব্যবহারিক ক্লাশ এবং ১৫টি বিশেষ ক্লাশ নেন। এই মেডিকেল কলেজে কলকাতা মেডিকেল কলেজের মতো কেমিক্যাল বিভাগ এবং বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ কেমিস্ট্রি বিভাগের অংশ ছিল না। এগুলো যথাক্রমে পূর্ববাংলা সরকারের কেমিক্যাল পরীক্ষক এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফিজিওলজির অধ্যাপকের অধীনে ছিল। এই বিভাগে রক্ত, মুত্র ইত্যাদির ওপর বায়োকেমিক্যালের কাজ এবং হাসপাতালের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরীক্ষামূলক কাজ হতো না। এ সময় গ্যাসের সংযোগ ও যন্ত্রপাতি না থাকায় ল্যাবরেটরি চালু হয়নি। ফলে কোনো গবেষণামূলক কাজ করাও সম্ভব হয়নি।[৮৬] অপরদিকে ১৯৪৮-৪৯ সালে পূর্বের মতো একজন অধ্যাপক ও তিনজন ডেমনস্ট্রেটর ছিল। এ সময় অর্গানিক কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির ওপর ৭৫টি লেকচার প্রদান করা হয়। বিভাগের সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর ও অন্যান্য ডেমনস্ট্রেটরগণ ১৪০টি ব্যবহারিক ক্লাশ ও ২০টি বিশেষ ক্লাশ নেন।[৮৭] এ সময়ও গ্যাস সংযোগ ও যন্ত্রপাতি না থাকায় ল্যাবরেটরি চালু করা হয়নি। ফলে কোনো গবেষণামূলক কাজ করা হয়নি। একইভাবে ১৯৪৯-৫০ সালের *ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বার্ষিক বিবরণী*তে কেমিস্ট্রি বিভাগ সম্পর্কে আরো জানা যায় যে, এই বিভাগে একজন সহকারী অধ্যাপক যোগদান করেন।[৮৮]

অধ্যাপকগণ অর্গানিক ও ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির ওপর ৬০টি লেকচার প্রদান করেন এবং সহকারী অধ্যাপক অর্গানিক কেমিস্ট্রির ওপর ১০টি লেকচার প্রদান করেন। প্রথম বর্ষের নিয়মিত ও দ্বিতীয় বর্ষের অনিয়মিত, পুনঃপরীক্ষার্থী এবং বিলম্বে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদেরকে সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর ১০টি লেকচার প্রদান করেন। এ ছাড়া সহকারী এবং সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর ১৪০টি ব্যবহারিক ক্লাশ এবং ১২টি বিশেষ ক্লাশ নেন। এ সময় বিভাগের গবেষণাগারে গ্যাস সংযোগ ও সরঞ্জাম সরবরাহ না করায় গবেষণার কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি।[৮৯] তবে ১৯৫০ সালে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির সদস্যগণ এই বিভাগটি পরিদর্শনের সময় কোনো সমস্যার কারণ উল্লেখ করেননি। গবেষণাগারের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বলা হয় যে, বিভাগটি ভালোভাবে সুসজ্জিত।[৯০] ১৯৫০-৫১ সালে এই বিভাগের অধ্যাপক এস.এ. খান ১৯৫০ সালের ২৪ অক্টোবর ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হন মোতাহার উদ্দিন (এম.এস.সি., ই.পি.জি.এম.)। অনুরূপভাবে সহকারী অধ্যাপক (ভারপ্রাপ্ত) একই ব্যক্তি ছিলেন।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মূল কেমিস্ট্রির ওপর ৪৫টি লেকচার প্রদান করেন এবং সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির ওপর ২০টি লেকচার প্রদান করেন। সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর অন্যান্য ডেমনস্ট্রেটরের সহায়তায় ১৪০টি ব্যবহারিক ক্লাস ও ১০টি বিশেষ ক্লাশ নেন।[৯১] এ সময়ও গ্যাস সংযোগ ও সরঞ্জাম সরবরাহ না করায় গবেষণাগার পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। এদিকে ১৯৫১-৫২ সালে ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও দুইজন ডেমনস্ট্রেটর থাকলেও সহকারী অধ্যাপক পদে কেউ ছিলেন না। এ সময় অধ্যাপক (ভারপ্রাপ্ত) অর্গানিক

কেমিস্ট্রির ওপর ৪৫টি লেকচার প্রদান করেন এবং সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর প্রথম বর্ষের নিয়মিত ও দ্বিতীয় বর্ষের পুনঃ পরীক্ষার্থী ও বিলম্বিত ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে লেকচার প্রদান করেন। এ ছাড়া ১৩০টি ব্যবহারিক ক্লাশ এবং ১২টি বিশেষ ক্লাশ হয়।[৯২]

কলেজে গ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়, কিন্তু বিভাগে স্টাফ স্বল্পতা থাকায় গুরুত্বপূর্ণ কোনো গবেষণার কাজ করা হয়নি।[৯৩] ১৯৫৬-৫৭ সালে রাসায়নিক পরীক্ষকের কার্যালয় ও পরীক্ষাগারগুলি কলেজ ভবনে অবস্থিত ছিল, অথচ এই জায়গা কেমিস্ট্রি বিভাগের জন্য বরাদ্দ ছিল। পরবর্তীতে এখানে ফিজিওলজি বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ রাখা হয়। ফিজিওলজি বিভাগের গবেষণাগার কেমিস্ট্রি বিভাগের সাথে ভাগ করে নেয়। এই ব্যবস্থা ২টি বিভাগের ব্যবহারিক ক্লাশ নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি সমস্যা সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এরূপ পরিস্থিতিতে কেমিস্ট্রি এবং ফিজিওলজির গবেষণা একই পরীক্ষাগারে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হতো। উপরন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান ও গবেষণাগারের পরীক্ষার কাজ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তবে ১৯৫৭-৫৮ সালের *ঢাকা বিশ্বেবিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে বিভাগের অগ্রগতি সম্পর্কে উল্লেখ করে যে,

> কলেজ ভবন থেকে রাসায়নিক পরীক্ষকের কার্যালয় অপসারণ না করার কারণে শিক্ষকদের জন্য কক্ষ এবং এর পরীক্ষাগারের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা না থাকা সত্ত্বেও কেমিস্ট্রি বিভাগের অগ্রগতি দেখানো হয়েছে।[৯৪]

অনুরূপভাবে ১৯৫৮-৫৯ সালে দেখা যায় যে, বিভাগের জায়গার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত অগ্রগতি দেখানো হয়।[৯৫] অন্যদিকে ১৯৫৯-৬০ সালে পাকিস্তান সরকার রাসায়নিক পরীক্ষাগারের কার্যালয় ও পরীক্ষাগার তেজগাঁও এর মহাখালীর জনস্বাস্থ্য পরীক্ষাগার ভবনে স্থানান্তর করার পর কেমিস্ট্রি বিভাগ প্রথমবারের মতো এর নিজস্ব একটি পরীক্ষাগার এবং শিক্ষকদের জন্য কক্ষের ব্যবস্থা করে। এ সময় প্রাক্তন প্রধান মোতাহার উদ্দিন বিদায় নেওয়ার পর থেকে বিভাগটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বায়োকেমিস্ট্রির দায়িত্ব নেয়। পর্যালোচিত সময়ে বিভাগটির অগ্রগতি বজায় রাখে। তাই ১৯৬০-৬১ সালে *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে উল্লেখ করা হয়,

> In spite of the fact that there was no head of the Department ever since Mr. M. Motaharuddin left the college, the Chemistry Department was ably run and managed by the demonstrator, who was in charge of it.[৯৬]

দেশ বিভাগের পর থেকে এই বিভাগের অবকাঠামোগত সমস্যা থাকলেও এর অগ্রগতি বিরাজমান ছিল। শিক্ষক স্বল্পতা থাকলেও বিভাগ তার কাজ চালিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহের কোনো ত্রুটি ছিল না। সব কিছু সদ্য প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজের উন্নয়নের জন্য সহায়ক হয়।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রফেশনাল পার্ট-১ *[পরিশিষ্ট দেখুন-২৬]* পরীক্ষার পড়াশোনা নতুন সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদানের জন্য সামঞ্জস্য করা হয়। এই বিভাগগুলো (প্রি-ক্লিনিক্যাল) নতুন ও পুরাতন সিলেবাস অনুসারে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে বিভাগগুলোর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। তবে তারা কাজটি সম্পূর্ণরূপে করতে সক্ষম হয়। আলোচ্য সময় পর্যন্ত বিভাগটি সন্তোষজনকভাবে কাজ চালিয়ে যায়। ১৯৬৩-৬৪ সালে কেমিস্ট্রি বিভাগের নতুন সিলেবাস *[পরিশিষ্ট দেখুন-২৭]* প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বলা হয় যে,

> The Department of Chemistry with the introduction of the new syllabi will have to be converted into that of Bio-Chemistry.[৯৭]

প্যাথলজি বিভাগ

সব ক্লিনিক্যাল বিষয়ের মেডিসিন, সার্জারি, অবসটেট্রিকস, গাইনোকোলজির ভিত্তি হলো প্যাথলজি। যে কোনো মেডিকেল কলেজ বা স্কুলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো প্যাথলজি। দেশ বিভাগের সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজে কোনো প্যাথলজি বিভাগ ছিল না। তখন কেবলমাত্র প্রি-ক্লিনিক্যাল ক্লাশের শিক্ষার্থী ছিল এবং কলেজটি মাত্র এক দেড়বছর অতিক্রম করে। একটা মেডিকেল কলেজ প্যাথলজি বিভাগ ছাড়া চলতে পারে না। দেশ বিভাগের সময় থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কার্যক্রম দুইটি ইউনিট দিয়ে শুরু হয়। একটি হলো মেডিকেল ইউনিট এবং দ্বিতীয়টি হলো সার্জিক্যাল ইউনিট। ইতিমধ্যে একটি প্যাথলজি বিভাগ খোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যখন এই বিভাগটি খোলা হয় তখন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত খুশি হয়ে মন্তব্য করে,

> We remember with pleasure and pride that the Department of Pathology started with one microscope and one small table and a stool and the pathological works consisted of studies of blood of patients. These were mainly blood counts and examination of blood slides, so that we could attempt to save patients from malignant malaria and acute infections and inflammatory processes.[৯৮]

কালক্রমে প্যাথলজি বিভাগ প্রসাব, মল, থুথু ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে তার কাজ চালিয়ে যায়। অধ্যাপক কর্নেল ই.জি. মন্টেগোমারি (১৯৪৭-১৯৪৮) এর তত্ত্ববধান ও তাঁর বিচক্ষণতা, একাগ্রতা, আত্মনিয়োগ এবং অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভাগটি পরিপূর্ণ রূপ নেয় এবং দ্রুত গতিতে এর উন্নতি শুরু হয়। এই বিভাগের জন্য যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ, যেমন, কালচার মিডিয়া (Culture media)[৯৯] প্রস্তুত, এন্টিজেন তৈরি এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সেরোলজিক্যাল কাজ (serological work) যেমন, ওয়াসারম্যান (wasserman reaction)[১০০] এবং ব্যাকটেরিওলজিক্যাল কাজও সম্পাদন করা হয়। এভাবে বিভাগটির মাসের পর মাস উন্নয়ন ঘটে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে কোনো গ্যাস সংযোগ ছিল না, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্যাথলজিক্যাল সব কাজ স্প্রিট ল্যাম্পের সাহায্যে চালানো হতো এবং কালচার মিডিয়ায় জীবানুমুক্তকরণের কাজ প্রাইমাস স্টোভে করা হতো।

এই বিভাগে যারা প্রশিক্ষিত গবেষণাগারের সহকারী হিসেবে যোগদান করে, তারা সবাই কলকাতা মেডিকেল স্কুলের ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগে কাজ করেছে। তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ছাড়া এই বিভাগ চালানো সম্ভব ছিল না। তারা শুধুমাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগীদের বিভিন্ন ধরনের প্যাথলজিক্যাল, সেরোলজিক্যাল ও ব্যাকটেরিওলজিক্যাল কাজে সাহায্য সাহাযোগিতা করত না বরং ঢাকার অন্যান্য হাসপাতাল ও পুরো প্রদেশের হাসপাতালগুলোকে সহযোগিতা করে। এই বিভাগে হাসপাতালের বায়ো-কেমিক্যালের কাজ করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই প্যাথলজি বিভাগকে অন্যান্য ক্লিনিক্যাল বিভাগের তুলনায় ক্লিনিক্যাল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের কাজ হাতে নিতে হয়েছিল। ১৯৪৮ সাল ও তৎপরবর্তীকালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বর্ষের ক্লিনিক্যাল শিক্ষার্থীরা ঢাকায় চলে আসে এবং তাদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.বি.বি.এস. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালের একজন অধ্যাপক ও তিনজন ডেমনস্ট্রেটর নিয়ে বিভাগটি পরিচালিত হয় *[পরিশিষ্ট দেখুন-১৮]*।

পাঠদানের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিভাগের মতো নিয়মিত ও নভেম্বর ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত লেকচার ডেমনস্ট্রেশন এবং ব্যবহারিক ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয় এবং রোগে আক্রান্ত হিস্টোলজিক্যাল স্লাইডসহ অসুস্থ শরীরের অঙ্গ প্রতঙ্গের নমুনার প্যাথলজিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন ক্লাশ পরীক্ষাগারে অনুষ্ঠিত হয়। মেডিকেল, সার্জিক্যাল ও গাইনোকোলজিক্যাল প্যাথলজির ডেমনস্ট্রেশন ছাড়াও সহকারী অধ্যাপক ও অধ্যাপকের মাধ্যমে বিশেষ প্যাথলজি ক্লাশ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষাগারে নিম্নের ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়,[১০১]

১. মেডিকেল সিরিজঃ (ক) ক্লিনিক্যাল ১৮২২টি (খ) ব্যাকটেরিওলজিক্যাল-১২১ টি (গ) হিস্টোলজিক্যাল ২০টি
২. সার্জিক্যাল সিরিজঃ (ক) ক্লিনিক্যাল ৬২৮টি (খ) ব্যাকটেরিওলজিক্যাল-৬৭টি (গ) হিস্টোলজিক্যাল-৪০টি
৩. মেটারনিটি এবং গাইনোকোলজিক্যালঃ (ক) ক্লিনিক্যাল-শূন্য (খ) ব্যাকটেরিওলজিক্যাল-শূন্য (গ) হিস্টোলজিক্যাল- শূন্য।
৪. সরকারের কাজঃ (ক) ক্লিনিক্যাল-১৫টি (খ) ব্যাকটেরিওলজিক্যাল- শূন্য (গ) হিস্টোলজিক্যাল- শূন্য

এ সময় এই বিভাগে পোস্ট মর্টেমের কোনো নিওরপসি পরীক্ষা এবং জাদুঘরে কোনো নতুন নমুনা সংযোজন, সংযুক্ত, নতুন ফ্রেমে স্থাপন ও দুলর্ভ, গুরুত্বপূর্ণ নমুনা সংযোগ করা হয়নি। আর্টিস্ট বিভাগে কোনো ফটোগ্রাফ, ফটোমাইক্রোগাফ, হাসপাতালের জন্য ছবি আঁকা পিকচার বোর্ড (জল রং) এবং কার্ডের লেবেল প্রদর্শন করা হয়নি। তবে ডাক্তার আবদুল খালেক ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য দুইটি ব্যবহারিক ক্লাশের নোট বই লিখেন[১০২],

(১) *Practical Notes on Histology* (২) *Practical Notes on Experimental Physiology.*

১৯৪৯ সালে প্যাথলজি বিভাগ ব্যাপকভাবে কাজ চালিয়ে যায়। প্যাথলজি বিভাগের জাদুঘর নির্মাণের জন্য নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৃতদেহের অভাব ছিল বিভাগের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। প্রত্যেকটি মৃতদেহ পরীক্ষার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সার্জিক্যাল নমুনা সংগ্রহ ও সংযোজন করা হয়। ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ সালে কিছু ময়না তদন্তের পরীক্ষা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ১৯৪৯ সালে ময়না তদন্ত অথবা অপারেশনের মাধ্যমে হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। নিম্নের তালিকা থেকে ১৯৪৮-৪৯ সালের প্যাথলজি বিভাগের পরীক্ষাগারের ক্লিনিক্যাল কাজ সম্পর্কে জানা যায়,[১০৩]

১. মেডিকেলঃ		২. সার্জিক্যালঃ	
ক. ক্লিনিক্যাল	৩,৬৫২টি	ক. ক্লিনিক্যাল	১৭৫১টি
খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	৪৫৫টি	খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	২২৭টি
গ. হিস্টোলজিক্যাল	২০টি	গ. হিস্টোলজিক্যাল	৪০টি

৩. মেটারনিটি ও গাইনোকোলজিক্যালঃ		৪. সরকারের কাজ:	
ক. ক্লিনিক্যাল	শূন্য	ক. ক্লিনিক্যাল	২৮৬
খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	শূন্য	খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	শূন্য
গ. হিস্টোলজিক্যাল	শূন্য	গ. হিস্টোলজিক্যাল	শূন্য

ঢাকা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ একাডেমিক উন্নয়ন ও বিশ্বের সাথে তালমিলিয়ে চলার জন্য বরাবরই সচেতন ছিলেন। ফলে কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে এর যাবতীয় চাহিদা পূরণের চেষ্টা করেন। ১৯৪৯ সালের ১০ মে পূর্ববাংলা সরকারের সার্জন জেনারেল, মেডিকেল, পাবলিক হেলথ লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট

বিভাগের সেক্রেটারিকে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে শিক্ষাদানের জন্য প্যাথলজি ও এনাটমি বিভাগের জন্য জরুরিভিত্তিতে জাদুঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করার কথা জানান। এনাটমি অথবা প্যাথলজিক্যাল জাদুঘরের জন্য কোনো আবাসন নেই। তাই নতুন সংস্থানের ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেওয়া হয়। পরবর্তী ভবনের পশ্চিম অংশের উপরে একটি কক্ষ তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। এই ব্যাপারে নির্বাহী প্রকৌশলির সাথে আলোচনা করা হয় এবং পরিকল্পনা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১০৪]

শুধুমাত্র এই বিভাগের জন্য জাদুঘরই নয়, জরুরি ভিত্তিতে তিনি (সার্জন জেনারেল) একটি এনিম্যাল হাউজ তৈরির ব্যবস্থার কথা বলেন। একটি ছোট এনিম্যাল হাউজের প্রয়োজন দেখা দেয়, কারণ এই বিভাগে গিনিপিগ ও খরগোশের মতো প্রাণি সুনির্দিষ্ট ও অন্যান্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় 'সেরা' (Sera) তৈরির জন্য প্রয়োজন। সে সময় প্রাণিগুলো ল্যাবরেটরির বারান্দায় রাখা হতো, যা এর পরিবেশকে দূষিত করে। এখানে ব্যাকটেরিওলজিক্যাল কাজ করা হতো। তাই নির্বাহী প্রকৌশলি এনিম্যাল হাউজ তৈরির পরিকল্পনা করেন। [১০৫]

১৯৪৯-৫০ সালে পূর্বের মতো একজন অধ্যাপক, একজন সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার জে আহমেদ (এম.বি.) এবং প্যাথলজি জাদুঘরের কিউরেটর নিয়ে গঠিত ছিল। *[পরিশিষ্ট দেখুন-২০]* এ সময় পূর্বের চেয়ে বেশি নিম্নের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা হয়,[১০৬]

১. মেডিকেল:		২. সার্জিক্যাল:	
ক. ক্লিনিক্যাল	৬৩২২টি	ক. ক্লিনিক্যাল	২৫৮৩টি
খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	৫৯৩টি	খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	৩২৯টি
গ. হিস্টোলজিক্যাল	৩০টি	গ. হিস্টোলজিক্যাল	৪৮টি
৩. মেটারনিটি ও গাইনোকোলজিক্যাল:		৪. সরকারের কাজ:	
ক. ক্লিনিক্যাল	৭৪৪টি	ক. ক্লিনিক্যাল	৫৯১টি
খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	৭৯টি	খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	নাই
গ. হিস্টোলজিক্যাল	৭২টি	গ. হিস্টোলজিক্যাল	২টি

ময়না তদন্ত: মোট নিওরোপসি পরীক্ষার সংখ্যা ৬টি এবং জাদুঘরে ৬টি নতুন নমুনা সংযুক্ত করা হয়। হিস্টোলজি বিভাগে প্যারাফিনের ব্লক প্রস্তুত ও বিভাগ তৈরি এবং দাগযুক্ত করা হয় ২৪টি। এ সময় প্যাথলজি বিভাগের অধ্যাপক দ্বারা কলেরাসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর গবেষণামূলক কাজ করা হয়।[১০৭]

১৯৫০ সালে শিক্ষার্থীদেরকে মানবদেহের প্রত্যেকটি অংশের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্যাথলজিক্যাল নমুনাগুলো তুলে ধরা হয়। এ সময় তিনশত'র কম নমুনা ছিল। পরবর্তীতে এই নমুনার সংখ্যা পাঁচশত বৃদ্ধি পায় এবং এগুলোকে নমুনাস্বরূপ রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের অবসটেট্রিকস ও গাইনোকোলজির শিক্ষক ডা. আবদুস সামাদের কাছ থেকে সবচেয়ে বড় সাহায্য আসে। তিনি প্যাথলজি জাদুঘরের জন্য নমুনা পাঠান। এ সময় এই বিভাগে একজন আর্টিস্ট নিয়োগ করা হয়। একই বছরের জানুয়ারি মাসে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির সদস্যগণ ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করেন এবং একই বছরের মে মাসে এই কমিটি কর্তৃক প্যাথলজি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের ত্রুটি ও অস্বীকৃতির কারণ বর্ণনা করেন। ইতিমধ্যে এই বিভাগে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ

করা হলেও আরো মাইক্রোস্কাপ এবং গ্যাস প্লান্ট স্থাপন ও একটি এনিমাল হাউস নির্মাণ করার ব্যাপারে বিবেচনা করা হয়। একটি প্যাথলজিক্যাল জাদুঘরের ব্যবস্থা করা জরুরি ছিল। ইতিমধ্যে এটা এনাটমির জাদুঘরের ভবনের সাথে অনুমোদন করা হয় এবং কাজটির অগ্রগতিতে সাহায্যের প্রয়োজন। নমুনাকরণের জন্য কাচের কনটেইনারের অভাব হলে ফরমাশ দেওয়া হয়। অধ্যাপক এবং তাঁর সহকর্মীদের দ্বারা কিছু সংখ্যক নমুনা প্রস্তুত করা হয়, তবে বিভাগের রেফ্রিজারেটরটি বিকল থাকায় হাসপাতাল থেকে জরুরি ভিত্তিতে একটি রেফ্রিজারেটর স্থানান্তর করার জন্য হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই বিভাগের অধ্যাপককে পি.এস.সি. (P.S.C.) নিযুক্ত করেনি। তার এই বিষয়ে শিক্ষকতার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং স্নাতকোত্তর ডি.টি.এম. ও বি.এস.সি. শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেন। তাঁর চেয়ে আরো উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়ার অসুবিধা মনে করে পরিদর্শন কমিটি তাঁকে যোগ্য বলে বিবেচনা করে। সম্ভাব্য একজন প্রার্থীর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও কোনো লাভ হয়নি।[১০৮]

অপরদিকে ১৯৫০ সালের ১০ জুলাই পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির সদস্যগণ পরিদর্শনের খসড়া রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল টি. আহমেদ (১৯৪৮-১৯৫২) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তারা পুনরায় কলেজ পরিদর্শন করেন। এজন্য কয়েকজন অধ্যাপকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, কিছু রেকর্ড পরীক্ষা করা হয়। এ সময় তারা প্যাথলজি বিভাগ সম্পর্কে জানান যে, এই বিভাগের ল্যাবরেটরিতে ৪০ জন শিক্ষার্থীর ব্যবস্থা রয়েছে। ৩০টি 'অয়েল ইমিরেশন' লেন্সসহ ৪৩টি মাইক্রোস্কোপ রয়েছে, যা যথেষ্ট বলে বিবেচনা করা হয়, তবে শিক্ষার্থীদের জন্য যে আসনের ব্যবস্থা করা হয় তা অনুপযুক্ত।[১০৯]

এই বিভাগে তখনও কোনো জাদুঘর ছিল না। নমুনা সংগ্রহের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তবে বিদ্যমান নমুনাগুলো অপর্যাপ্ত ছিল। সঠিকভাবে শিক্ষাদানের জন্য বিপুল সংখ্যক নমুনা ও একটি উপযুক্ত ভবনের প্রয়োজন। কোনো জার ছিল না, শুধুমাত্র হাতে কাজ করার জন্য কিছু কেমিক্যাল ছিল। ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ল্যাবরেটরির জায়গা ও সরঞ্জাম উভয়ই অপর্যাপ্ত। কিছু প্রয়োজনীয় মিডিয়া কমিটিকে দেখানো হয়। হিস্টোলজি বিভাগের শিক্ষার্থীর জন্য কেবলমাত্র ১৫টি আসন রাখা হয়। এই সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য। বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগটি এই বিভাগে অবস্থিত ছিল এবং পরবর্তীতে এটি ফিজিওলজি বিভাগে স্থানান্তর করা করা হয়।[১১০]

হাসপাতালে পৃথক কোনো ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্ট না থাকায় এই বিভাগটি হাসপাতালের সব ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিক্যাল কাজ করে। এ সময় কাজের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪৯ সালে প্রায় ১১,০০০ প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা হয়। ১৯৫০ সালে ৪০০টি বিভাগ এবং ৬০০টি ব্যাকটেরিওলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়।[১১১] বিদ্যমান অবস্থায় বিভাগের এই অংশের অগ্রগতি দেখানো হয়, তবে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের সদস্যগণ পরামর্শ দেন যে,

> We however feel that this key Department needs serious attention on the part of the authorities and very liberal treatment in the matter of accommodation, equipment as well as staff in order to attain a satisfactory standard.[১১২]

এ ছাড়া এই বিভাগে সব সময়ের জন্য একজন চিত্রকর রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কারণ ডায়াগ্রাম ও চার্টগুলি অপর্যাপ্ত ছিল। অন্যদিকে ডায়াগনস্টিক কাজের জন্য আরো স্টাফের প্রয়োজন এবং ব্যবহারিক ক্লাশে শিক্ষার্থীদের দেওয়া আসনগুলো অনুপযুক্ত ছিল।

ইতিপূর্বে ১৯৪৯ সালে মাত্র ১২টি প্যাথলজিক্যাল পোস্ট মর্টেম হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই ধরনের কাজের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা যায়। ক্লিনিক্যাল স্টাফদের সহায়তায় পোস্ট মর্টেম পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানোর জোর প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। তাছাড়া এনাটমি বিভাগের পাশে ছোট একটি কক্ষে পোস্ট মর্টেম পরিচালিত হয়। কক্ষটি সুসজ্জিত না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের বসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। পোস্ট মর্টেমের সংখ্যাও ছিল নগন্য। শিক্ষার্থীদের জন্য গ্যালারিসহ উপযুক্ত পোস্ট মর্টেম কক্ষ থাকার সুপারিশ করা হয়। এই কক্ষটি প্যাথলজি পোস্ট মর্টেমের পাশাপাশি মেডিকো লিগ্যালের (Medico Legal) জন্য ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই বিভাগে সাজসরঞ্জাম অপর্যাপ্ত থাকায় বিদেশ থেকে আমদানি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাই পরিদর্শন কমিটি বিভাগটিকে অপর্যাপ্ত বলে বিবেচনা করে।[১১৩] তাই ১৯৫০ সালের শুরুর দিকে বিদেশ থেকে জার আনার অর্ডার দেওয়া হয় এবং ঢাকায় এগুলো স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। পরিদর্শন কমিটির রিপোর্টের পর থেকে কেমিক্যাল সরবরাহ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নতি হয়। ১৯৫০-১৯৫১ সালের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার সংখ্যা নিম্নের তালিকা থেকে জানা যায়,[১১৪]

১. মেডিকেল সিরিজ:		২. সার্জিক্যাল পরীক্ষা:	
ক. ক্লিনিক্যাল	৭,৫৩৭টি	ক. ক্লিনিক্যাল	৪,২২১টি
খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	৭৩১টি	খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	৫৭৮টি
গ. হিস্টোলজিক্যাল	৮৬টি	গ. হিস্টোলজিক্যাল	১৩৮টি
৩. মেটারনিটি এবং গাইনোকোলজিক্যাল:		৪. সরকারের কাজ:	
ক. ক্লিনিক্যাল	১০৭৫টি	ক. ক্লিনিক্যাল	৬৭০টি
খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	১৫৮টি	খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	৩০টি
গ. হিস্টোলজিক্যাল	২০৬টি	গ. হিস্টোলজিক্যাল	৩টি

৫. পোস্ট মর্টেম:

মোট নিক্রপসি পরীক্ষার সংখ্যা	১২টি
জাদুঘর নতুন নমুনা সংযুক্ত	১৩৭টি
নতুন নমুনা সংযোজন	১০০টি
নমুনা ফ্রেম স্থাপন	২০টি
দুর্লভ ও গুরুত্বপূর্ণ নমুনা সংযুক্ত	২টি

এ সময় আর্টিস্ট বিভাগে ১৫টি ফটোগ্রাফ, ৬টি ফটোমাইক্রোগ্রাফ সংযোজন করা হয়। এ ছাড়া হিস্টোলজি বিভাগে ৬০টি পরীক্ষা হয় এবং ‘Is Blastocystis hominis pathogenic?’ গবেষণা প্রবন্ধটি *দ্য পাকিস্তান জার্নাল অব সায়েন্স* এ প্রকাশিত হয়। এদিকে ১৯৫১ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে প্যাথলজি বিভাগে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সে সম্পর্কে বলা হয়,

> In Pathology Department, more floor space was required in the main and the bacteriological department. A museum was also to be provided.[১১৫]

পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এর উন্নয়ন ধীরে ধীরে হতে থাকে। ১৯৫১-৫২ সালে বিভাগটিকে অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, কিউরেটর, ক্লিনিক্যাল

প্যাথলজিস্ট এবং ডেমনস্ট্রেটর নিয়ে পরিচালিত হয়। *[পরিশিষ্ট দেখুন-২২]* এ সময় ল্যাবরেটরিতে নিম্নের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা করা হয়।[১১৬]

১. সার্জিক্যাল কাজ:		২. মেডিকেল পরীক্ষা:	
ক. ক্লিনিক্যাল	৫১২টি	ক. ক্লিনিক্যাল	৯০২৭টি
খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	৭২৫টি	খ. ব্যাকটেরিলজিক্যাল	৮৭৭টি
গ. হিস্টোলজিক্যাল	১১৬টি	গ. হিস্টোলজিক্যাল	৭২টি
৩. মেটারনিটি এবং গাইনোকোলজিক্যাল:		৪. অন্যান্য পরীক্ষা:	
ক. ক্লিনিক্যাল	২৪২১টি	ক. ক্লিনিক্যাল	১০২৫টি
খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	৩২৯টি	খ. ব্যাকটেরিওলজিক্যাল	৮৩টি
গ. হিস্টোলজিক্যাল	১৭৪টি	গ. হিস্টোলজিক্যাল	১টি
৫. পোস্ট মর্টেম:		৬. আর্ট বিভাগ:	
মোট নিক্রপসি পরীক্ষার সংখ্যা	৮	ফটোগ্রাফ	৮টি
জাদুঘর নতুন নমুনা সংযুক্ত	১৫০টি	ফটোমাইক্রোগ্রাফ	৩০টি
নতুন নমুনা সংযোজন	১০০টি	বিশেষ হিস্টোলজিক্যাল বিভাগ	৪৮টি
নমুনা ফ্রেমে স্থাপন	২৫টি		
দুর্লভ এবং গুরুত্বপূর্ণ নমুনা সংযুক্ত	৮টি		

এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে এই মেডিকেল কলেজের উন্নয়নের ধারা এবং বিশ্বমান সম্মত করার প্রয়োজনীয় আরো ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এ বছর কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক কাজ হয় এবং প্যাথলজি সংক্রান্ত প্রবন্ধ বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় ও ব্যাকটেরিওলজিক্যাল সংক্রান্ত অনুষ্ঠান রেডিওতে প্রচার করা হয়।[১১৭] প্যাথলজি বিভাগটি পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন রিপোর্টের প্রস্তাব অনুযায়ী সজ্জিত করা হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী* থেকে জানা যায় যে, 'প্যাথলজি বিভাগটি কলেজের অন্যান্য সব বিভাগের চেয়ে বড়। এর ল্যাবরেটরিগুলো সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সের শিক্ষার্থী এবং চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষামূলক কাজ ও শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া বিশেষ সংক্ষিপ্ত কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এখানে প্রযুক্তিগত গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই বিভাগে হাসপাতালের বেশিরভাগ ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়। ফলে প্যাথলজি বিভাগটি নিয়মিত এর অগ্রগতি বজায় রাখে এবং এর ল্যাবরেটরিগুলোতে ঔষধ বিক্রেতা এবং ঔষধ প্রস্তুতকারী কম্পাউন্ডারদের জন্য স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়'।[১১৮]

কালক্রমে এই বিভাগে মুত্র, থু থু ও রক্ত ইত্যাদি প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই বিভাগকে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সেরোলজিক্যাল (Serological) কাজ করতে হতো। উপরন্তু ল্যাবরেটরিতে টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দক্ষ সেবা দান করে। যারা প্রশিক্ষণ শেষে প্রদেশের জেলা হাসপাতালের লাবরেটরিগুলোতে কাজ করবে। সরকারের সেরোলজিক্যাল ও হাসপাতালের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াও কিছু সংখ্যক যোগ্য মেডিকেল প্রফেশনালস বা ডাক্তারদের ল্যাবরেটরির প্রযুক্তিগত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৯৫৯-৬০ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে উল্লেখ করা হয় যে,

> It showed excellent progress.[১১৯]

১৯৬০ এর দশকে বিভাগটি তার উন্নয়নের ধারা বজায় রাখে। ১৯৬৮-৬৯ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে এই বিভাগের প্যাথলজিক্যাল ও সেরোলজিক্যাল কাজের সন্তোষ প্রকাশ করে উল্লেখ করা হয়, প্যাথলজি বিভাগের সেরোলজিক্যাল কাজ অত্যন্ত কঠিন এবং এই কাজের মাধ্যমে সরকারকে অনেক সহায়তা করা হয়। সরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি হাসপাতাল এমনকি প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারদের দেওয়া প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য বিভিন্ন উপকরণ এই বিভাগে পাঠানো হয়। তাদের দেওয়া রির্পোটগুলো ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে, কারণ মানুষের চিকিৎসায় এবং রোগ নির্ণয়ে এই বিভাগ চিকিৎসকদের সহায়তা করে।[১২০]

ফরেনসিক মেডিসিন ও মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স বিভাগ

দেশ বিভাগের সময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ ছিল না। ক্লিনিক্যাল কোর্সের শিক্ষার্থীদেরকে এই বিষয় শেখানো হয়। দেশ বিভাগের সময়ে ক্লিনিক্যাল শিক্ষার্থী না থাকায় এই বিভাগ খোলার আবশ্যকতা তেমন ছিল না। ১৯৪৮ সালে লেক মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে শুরু করে, তখন থেকে তাদেরকে এই বিষয়ে শিক্ষাদান শুরু হয়। এই বিষয়ের ওপর এই মেডিকেল কলেজে তাত্ত্বিক লেকচার দেওয়া হয় এবং মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি পুলিশ মর্গ ছিল। সেখানে শিক্ষার্থীরা মৃতদেহ পোস্ট মর্টেম করত এবং এই প্রক্রিয়া বেশ কয়েক বছর (১৯৫১) পর্যন্ত চলমান ছিল।

১৯৪৮-৪৯ সালে এই বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন ডাক্তার মো. হোসাইন, (এম.বি.)। এ সময় ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ২৪টি লেকচার প্রদান করা হয়।[১২১] অপরদিকে ১৯৪৯-৫০ সালে বিভাগের অধ্যাপক হন ডাক্তার এ. আহাদ, এম.বি. (কলকাতা)। এ সময় ২৮টি লেকচার প্রদান করা হয়।[১২২] এদিকে ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল পরিদর্শন কমিটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনের সময় এই বিভাগ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, এই বিভাগে কোনো জাদুঘর, পোস্ট মর্টেম কক্ষ, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, ডায়াগ্রাম নেই। পোস্ট মর্টেম ঢাকা মেডিকেল স্কুলে সম্পন্ন করা হতো এবং শিক্ষার্থীরা সেখানেই উপস্থিত থাকত। ১৯৪৯-৫০ সালে ১৯টি পোস্ট মর্টেম করা হয়। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই বিভাগটি সুসজ্জিত করার সুপারিশ করা হয়।[১২৩] ১৯৫১ সালের ১৯ এপ্রিল পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স বিভাগকে আধুনিক ও মানসম্মত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[১২৪]

১৯৫০-৫১ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের এনাটমি বিভাগের বর্ধিতাংশে ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য একটি কক্ষ, শিক্ষার্থীদের জন্য গ্যালারিসহ পোস্ট মর্টেমের (ময়নাতদন্ত) একটি কক্ষ, অধ্যাপকদের জন্য একটি কক্ষ এবং একটি জাদুঘর করা হয়।[১২৫] ফরেনসিক মেডিসিনের পুরো পাঠদান তাত্ত্বিক লেকচার দ্বারা সম্পন্ন হতো। এই ব্যাপারে *ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসাপাতলের বার্ষিক বিবরণী* থেকে জানা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সালে এই বিষয়ের ওপর ৪১টি লেকচার[১২৬] এবং ১৯৫১-৫২ সালে ৪৩টি লেকচার প্রদান করা হয়।[১২৭]

পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে এই বিভাগের ঘাটতি পূরণ করার সব ধরনের চেষ্টা করা হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স এবং ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পুলিশ বিভাগকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স বিভাগের

সহযোগী অধ্যাপক ও তাঁর সহকর্মীদের সহায়তায় ঢাকা জেলার ১২টি পুলিশ স্টেশন থেকে পাঠানো মৃতদেহের ওপর পোস্ট মর্টেম বা ময়না তদন্ত করা হয়। এর ফলে আইন আদালতে এই বিভাগের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। একই সাথে শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।[১২৮] পরবর্তীতে এই বিভাগের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন সময়ে পোস্ট মর্টেমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যা নিম্নের তালিকা থেকে বোঝা যায়,

সাল	পোস্ট মর্টেমের সংখ্যা
১৯৫৭-৫৮	১০০টি
১৯৫৮-৫৯	১১০টি
১৯৫৯-৬০	১১৫টি
১৯৬০-৬১	১৪৬টি
১৯৬২-৬৩	...
১৯৬৩-৬৪	৫০০টি
১৯৬৪-৬৫	৬০০টি
১৯৬৫-৬৬	৫০০টি
১৯৬৬-৬৭	৫০০টি
১৯৬৭-৬৮	৫০০টি

উৎস: *Annual Report from* 1957-58 to 1967-68, *University of Dacca*, pp. 103, 105, 108, 113, 92, 101, 110, 119 & 103.

এটি কলেজের একমাত্র বিভাগ ছিল, যার বিশেষ কোনো স্টাফ ছিল না। এই বিভাগের শিক্ষকগণ অন্যান্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই বিভাগে কাজ করত। মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স বিভাগের প্রধান নিজস্ব দায়িত্ব ছাড়াও একাধারে সহযোগী অধ্যাপক ও সিভিল সার্জন ছিলেন। তিনি উল্লিখিত পোস্ট মর্টেমে সাহায্য করেন। ১৯৬৮-৬৯ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে উল্লেখ করা হয় যে,

> During the session about 500 Post-Mortem were performed in the Department of Jurisprudence and a large number of specimens and viscera were sent to the Chemical Examiner to the Government of East Pakistan for testing and submission of reports. Thus both the Police Department and Judicial Department were greatly assisted with the Post-Mortem reports and chemical.[১২৯]

এভাবে এই বিভাগটি পূর্ববাংলা সরকারের পুলিশ ও বিচার বিভাগকে সহায়তা করে সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচারের কাজকে এগিয়ে দেয়। এই বিভাগের অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক ও প্রশংসনীয় ছিল।

হাইজিন ও পাবলিক হেলথ বিভাগ

ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের ক্ষেত্রে যে মন্তব্য করা হয় সেই একই মন্তব্য এই বিভাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই বিভাগের পাঠদান তাত্ত্বিক লেকচার ও ডেমনস্ট্রেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন কর্ণেল এফ. এম. খান, (পি.এম.এস)। এ সময় তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদেরকে ৪৫টি লেকচার প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে ১৯৪৯-৫০ সালে এই বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন ডাক্তার আলী নওয়াব খান, এম.বি, ডি.পি.এইচ. (কলকাতা), এম.পি.এইচ. (হার্ভার্ড)। তারা দুই জনই যোগ্য, অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের ৪৭টি লেকচার প্রদান করা হয়।[১৩০] ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটি জানান যে, কলেজে কোনো হাইজিন বিভাগ নেই। জনস্বাস্থ্য বিভাগের একজন অফিসারকে খন্ডকালীন লেকচার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

কোনো কাজ অথবা টিকা দেওয়ার কোনো নির্দেশনা নেই। বিভাগটিতে ঘাটতি বিদ্যমান থাকায় সংগঠিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়।[১৩১]

১৯৫১ সালে দেখা যায় যে, বিভাগে যন্ত্রপাতি ও ডায়াগ্রামের ঘাটতি ছিল। এ সময় পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির রিপোর্টে হাইজিন বিভাগের অবকাঠামোগত ঘাটতি সম্পর্কে বলা হয় যে,

> Department of Hygiene should be provided with a small museum a laboratory and professor's room.[১৩২]

একই বছর ১৯ এপ্রিল পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল পরিদর্শন কমিটি বিভাগের কাঠামোগত পরিবর্তন ও ভবনের ক্ষেত্রে উল্লেখ করে যে আধুনিক ও মানসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।[১৩৩] ১৯৫০-৫১ সালে বিভাগের শিক্ষার্থীদেরকে ৫২টি লেকচার এবং ১৯৫১-৫২ সালে ৫৯টি লেকচার দেওয়া হয়।[১৩৪] সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস.. কোর্সের শিক্ষার্থীদেরকেও লেকচার দেওয়া হয়।

এনাটমি বিভাগের বর্ধিতাংশে হাইজিন ও পাবলিক হেলথ বিভাগের জন্য একটি গবেষণাগার, একটি জাদুঘর, একটি অধ্যাপকের কক্ষ নির্মাণ করা হয়। এ সময়ের শেষ (১৯৫২) পর্যন্ত সব ধরনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও হাইজিন জাদুঘরের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পাওয়া যায়নি। শিক্ষার্থীদের ডেমনস্ট্রেশনের জন্য সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ থেকে মডেল সংগ্রহ করা হয়। যেসব ডেমনস্ট্রেশনের কাজ হয় যেমন, পানি, মলশোধনী (Septic tank), পয়ঃনিষ্কাশন (Sewerage), জনস্বাস্থ্য গবেষণা ইত্যাদি। ১৯৫৮-৫৯ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে উল্লেখ করা হয় যে, জনস্বাস্থ্য ও হাইজিন বিভাগের ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে।[১৩৫] অপরদিকে ১৯৬০-৬১ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী* থেকে জানা যায় যে, জনস্বাস্থ্য ও হাইজিন বিভাগটি তাদের অগ্রগতি বজায় রেখেছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিছু মডেল আনার ফলে এর জাদুঘরটি সমৃদ্ধ হয়।[১৩৬]

পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এসব বিভাগের মান উন্নত হতে থাকে এবং স্বীকৃতির ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকেনি। কোনো ত্রুটি থাকলে বিভাগকে স্বীকৃতি না দেওয়ার পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত এম.বি.বি.এস.. ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না বলে উল্লেখ করা হয়। ফলে কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিভাগের কাজের মান ও সংখ্যা থেকে তা বোঝা যায়।

ক্লিনিক্যাল বিভাগ

ক্লিনিক্যাল বিভাগগুলো ছিল হাসপাতালের অপরিহার্য অংশ। মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লিনিক্যাল শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসাশিক্ষা কেবলমাত্র তাত্ত্বিক লেকচারের ওপর সীমাবদ্ধ থাকে না। ক্লিনিক্যাল বিভাগগুলোতে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপর ক্লিনিক্যাল শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিভাগগুলোর বেশিরভাগই কলেজ হাসপাতালে অবস্থিত ছিল। হাসপাতালে দুইটি ইউনিট ছিল, ১. মেডিকেল ইউনিট, ২. সার্জিক্যাল ইউনিট। এই দুইটি ইউনিট কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল। মেডিকেল ইউনিট: এই ইউনিটটি তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল ১. মেডিসিন বিভাগ (২) ক্লিনিক্যাল মেডিসিন বিভাগ (৩) অতিরিক্ত ফিজিশিয়ানের বিভাগ। প্রথমটি মেডিসিনের অধ্যাপক, দ্বিতীয়টি ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক এবং তৃতীয়টি অতিরিক্ত ফিজিওশিয়ানের অধীনে ছিল।

প্রায় এক-দেড় বছর এই ইউনিটে কেবলমাত্র মেডিসিনের অধ্যাপক এবং ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক ছিল। পরবর্তীকালে এখানে অতিরিক্ত ফিজিশিয়ানের বিভাগ হয়। ১৯৫০ সালে একই ওয়ার্ড অনানুষ্ঠানিকভাবে ফার্মাকোলজি ওয়ার্ড হিসেবে পরিচিত ছিল। এই ওয়ার্ড এবং একটি কার্ডিওলজি ওয়ার্ড ফার্মাকোলজির অধ্যাপকের অধীনে ছিল। তিনি ই.সি.জি. বিভাগের উন্নয়নে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেন।

একজন যক্ষ্মারোগ বিশেষজ্ঞকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ক্লিনিক্যাল শিক্ষার্থীদেরকে এই বিষয়ের ওপর ঢাকা মেডিকেল স্কুলের মিটফোর্ড হাসপাতালে শিক্ষাদান করেন। সে সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে টি.বি. (T.B.) ওয়ার্ড ছিল না। মিটফোর্ড হাসপাতালে ৬০ জন রোগীর যক্ষ্মারোগের ওয়ার্ড গড়ে তোলা হয়। মেডিসিন এবং ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফিজিশিয়ান ছিলেন। ১৯৫০ সালে অতিরিক্ত ফিজিশিয়ানের পদবিতে তৃতীয় একজন চিকিৎসককে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই ফিজিশিয়ানদের প্রত্যেককে হাসপাতালের ৪০ শয্যা (৩০টি পুরুষ ও ১০টি নারী শয্যা) দেখাশোনোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে কেবলমাত্র ২ জন হাউজ ফিজিওশিয়ান এবং তাদের প্রত্যেকের অধীনে ৬০ জন রোগী ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে মেডিসিন বিভাগে একজন অধ্যাপক, দুইজন রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান ও একজন সিনিয়র হাউজ ফিজিশিয়ান এবং একজন মেডিকেল রেজিস্ট্রার ছিলেন *[পরিশিষ্ট দেখুন-১৮]*। হাসপাতালের এই ইউনিটে অনেক রোগী চিকিৎসার নেওয়ার জন্য ভর্তি হয়। তাদের মধ্যে অধিকাংশ রোগী সুস্থ হয় এবং স্বল্প সংখ্যকের মৃত্যু হয়। নিম্নের তালিকায় বিভিন্ন ধরনের রোগীর সংখ্যার হিসেব পাওয়া যায়,[১৩৭]

মোট শয্যা সংখ্যা (তালিকাভুক্ত)	৯০টি	
মোট চিকিৎসা করা রোগীর সংখ্যা	৪৪৪ জন	
মোট নিরাময়যোগ্য রোগীর সংখ্যা	৩০০ জন	৬৭.৫%
মোট রোগ থেকে উপশম রোগীর সংখ্যা	৮৪ জন	১৯%
মোট অব্যাহতি দেওয়া রোগীর সংখ্যা	৫০ জন	১১.৩%
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	১০ জন	২.২%।

এ সময় এই ইউনিটে কোনো গবেষণামূলক কাজ হয়নি, কারণ গবেষণা করার মতো সুযোগসুবিধা ও সময় শিক্ষকগণ পাননি, তবে রেডিও পাকিস্তানে চিকিৎসা বিষয়ের ওপর এই বিষয় সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।[১৩৮] এ ছাড়া History of Anatomy'র ওপর লাইসেন্সিয়েট মেডিকেল কনফারেন্স উপস্থাপন করা হয়।

অনুরূপভাবে ১৯৪৮-১৯৪৯ সালে দেখা যায় যে,[১৩৯]

মোট শয্যা সংখ্যা (তালিকাভুক্ত)	৯০টি	
মোট চিকিৎসা করা রোগীর সংখ্যা	১,১৩৫ জন	
মোট নিরাময়যোগ্য রোগীর সংখ্যা	৫২৬	(৪৬.৩%)
মোট উপশম রোগীর সংখ্যা	৩৩ জন	(২৯.৭%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত ডিসচার্য রোগীর সংখ্যা	২৩০	(২০%)
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	৪৯ জন	(৪%)।

এ সময় কিছু গবেষণামূলক কাজ করা হয় এবং রেডিও পাকিস্তানে ‘Why do we Forget’ অনুষ্ঠানটি প্রচার করা হয়। এ ছাড়া ‘Rate of Vitamins' in Health’ প্রবন্ধটি পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সায়েন্টিফিক সেকশন-এ এবং `Hepatitis' ঢাকা মেডিকেল কলেজের *ডক্টর’স ক্লাবে* উপস্থাপন করা হয়।[১৪০]

আবার ১৯৪৯-৫০ সালে দেখা যায় যে,[১৪১]

মোট তালিকাভুক্ত ও অতিরিক্ত শয্যাসংখ্যা-৪০+১৫ =	৫৫টি,	
মোট চিকিৎসা করা রোগীর সংখ্যা	৬৫৩ জন	
মোট নিরাময়যোগ্য রোগীর সংখ্যা	৩১২ জন	(৪৭.৬%),
মোট উপশম রোগীর সংখ্যা	১৫৩ জন	(২৩.৫%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১৪২ জন	(২১.৮%),
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	৪৬ জন	(৭.১%)

এ সময় লিভার সিরোসিস, ম্যালেরিয়া, আমাশয়, টাইফয়েডসহ অন্যান্য রোগের ওপর গবেষণামূলক কাজ করা হয়।[১৪২] ১৯৫০-৫১ সালে দেখা যায় যে[১৪৩],

মোট শয্যা সংখ্যা তালিকাভুক্ত	৪০	
অতিরিক্ত	১৫	
মোট	৫৫টি	
মোট চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৭৫০ জন	
মোট নিরাময় রোগীর সংখ্যা	৪১৬ জন	(৫৫.৩%)
মোট উপশম রোগীর সংখ্যা	১৬৪ জন	(২১.৮%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১২০ জন	(১৫%)
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	৫০ জন	(১৬.৯%)

এ সময় ‘Reptic Ulcer’, ‘Varieties in the clinical features of Typhoid fever’, ‘High protein diet in Cirrhosis of liver and splenic anaemias’ ওপর গবেষণামূলক কাজ [১৪৪] এবং রেডিও পাকিস্তানে, ‘B.C.G (Bengali) 16th June 1950’, ‘Use of Radio active meterials in medicine (English) 13th July 1950’ ওপর অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।[১৪৫]

১৯৫০ সালে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির সদস্যগণ উল্লেখ করেন যে, এই বিভাগের ক্লিনিক্যাল কক্ষটি আরও ভালোভাবে সজ্জিত করা উচিত। হাউজ স্টাফের অপ্রতুলতা এবং হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্টের অভাব ও অপর্যাপ্ত পরীক্ষাগার গবেষণার পথে প্রধান বাধা। প্রাথমিক পর্যায়ে এসব সমস্যা সমাধান করা উচিত। যক্ষ্মার জন্য ২০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষ ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা, সে সময় এই ওয়ার্ড বিদ্যমান ছিল না। এ বিষয়ের ওপর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই ওয়ার্ডের আরো উন্নতি সাধন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৪৬]

মেডিসিনের অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে মানসিক রোগের প্রশিক্ষণের জন্য কোনো সুযোগসুবিধা ও সংক্রামক রোগের কোনো ওয়ার্ড ছিল না। কখনও কখনও যক্ষ্মা ও সংক্রামক রোগের ডেমনস্ট্রেশনের জন্য বাইরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হতো। পৃথক কোনো চর্ম ও শিশু ওয়ার্ড ছিল না। খুব অল্প সংখ্যক চার্ট ও ডায়াগ্রাম ছিল। তাই হাসপাতালের মধ্যে সবধরনের বিশেষ বিশেষ ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

মেডিকেল ওয়ার্ডের ব্যাচগুলির বিভাগ এমন ছিল যে, কোনো ব্যাচ মেডিসিনের অধ্যাপক অথবা ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপককে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারত না। পরিদর্শন কমিটি মনে করে যে, প্রত্যেক ছাত্রকে উভয় অধ্যাপকের কাছ থেকে নির্দেশনা গ্রহণ করা। অন্যদিকে নিম্নের তালিকা থেকে ১৯৫১-৫২ সালে এই ইউনিটে চিকিৎসা প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরণের রোগীর সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়,[১৪৭]

মোট শয্যা সংখ্যা তালিকাভুক্ত	৪০টি	
অতিরিক্ত	১৫টি	
মোট	৫৫টি	
মোট চিকিৎসা করা রোগীর সংখ্যা	১,০১৩ জন	
মোট নিরাময় রোগীর সংখ্যা	৪৩৭ জন	(৪৩.১%)
মোট উপশম রোগীর সংখ্যা	২৭৬ জন	(২৭.১%)
মোট অব্যাহতিপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	২১২ জন	(২১%)
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	৮৮ জন	(৮.৭%)

এ ছাড়া নিম্নের বিষয়ের উপর গবেষণামূলক কাজ হয়,[১৪৮]

Vit. B_{12} in Anaemia and in cirrhosis of the liver cases were tried.

১৯৪৭-৪৮ সালে মিডিসিন এবং ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের ওপর পাঠদান করা হতো না। এ সময় কোনো ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের শিক্ষার্থী ছিল না। এ সময় মেডিসিনের অধ্যাপকের বিভাগটি ৭৫টি শয্যা নিয়ে তথা ৩টি পুরুষ ওয়ার্ড এবং ১৫টি শয্যা নিয়ে ১টি নারী ওয়ার্ড গঠিত ছিল। অতিরিক্ত ফিজিশিয়ানের কোনো ওয়ার্ড বরাদ্দ করা হয়নি। মেডিকেলের রেডিওলজিক্যাল কাজ মিটফোর্ড হাসপাতালে করা হয়। ক্লিনিক্যাল কাজ তথা রক্তের কিছু সেরোলজিক্যাল পরীক্ষা, প্রসাব, মল, থুথু পরীক্ষা এবং বায়োকেমিক্যাল কাজ করা হয়। এগুলো প্যাথলজির অধ্যাপকের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। ১৯৪৯ সাল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ১ম বর্ষ এম.বি.বি.এস. পাশ করার পর ক্লিনিক্যাল ছাত্রে পরিণত হয়। তাদের সাথে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে আসা অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও যুক্ত হয়। ফলে একটি ক্লিনিক্যাল ছাত্রের ব্যাচ তৈরি হয়। তারা মেডিসিন, শল্য চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতিবিদ্যার ওপর সুশৃঙ্খল ক্লিনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে। মেডিসিনের লেকচার মেডিসিনের অধ্যাপক এবং ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের লেকচার ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক দেন। তিন বছর এই লেকচার প্রদান করা হয়। ছুটি ব্যতীত পুরো তিন বছর বাধাহীন শিক্ষার্থীদের যক্ষ্মারোগ, ট্রপিক্যাল ডিজিজ, (Tropical Diseases) চর্মরোগ, মানসিক রোগ, শিশু রোগসহ মেডিসিনের পুরো বিষয় শেখানো হয়। অবিভক্ত বাংলার কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকগণ কখনও কখনও মেডিসিনের পুরো বিষয় সমাপ্ত করতে পারতেন না। শিক্ষার্থীদেরকে কিছু বিষয় যেমন, কার্ডিওভাসকুলার, রেসপায়োরিটি, গ্যাসট্রোইনটেস্টিনাল এবং নার্ভস ইত্যাদি বিষয়ের ওপর লেকচার দেওয়া হয়। এগুলো শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়টির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শেখানো হয়। এ ক্ষেত্রে মেডিসিনের অধ্যাপক এ.কে.এম. আব্দুল ওয়াহেদ, প্রিন্সিপাল-কাম-সুপারিনটেনডেন্ট (১৯৫৩-৫৪) বিশ্বাস করেন যে, 'শিক্ষার্থীদের উপরি-উল্লিখিত বিষয়সহ শরীরের সমস্ত রোগের চিকিৎসা, সাধারণ ও জটিল রোগ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করা জরুরি, যা তাদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সহায়ক হবে এবং এর মধ্যে তাদের প্রাকটিস সীমাবদ্ধ থাকবে। তাঁর সহকর্মীরা এটা বিশ্বাস করলেও তিনি তাঁর মত বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেন'।[১৪৯]

মেডিসিনের বিষয়গুলো শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা ছিল মানবিক সচেতনতার অভাব। একজন মেডিসিনের অধ্যাপক এই বিষয়গুলো পুরোপুরি জানার চেষ্টা করে না। তিনি (মেডিসিনের অধ্যাপক) একজন সাধারণ চিকিৎসক হিসেবে মনে করেন যে, এই বিষয়গুলো বিস্তারিত জানার ব্যাপারটি বাদ দেওয়া উচিত। এই বিষয়গুলোর ওপর শিক্ষার্থীদের সাধারণ ধারণা এবং ক্লিনিক্যাল বিষয়ের ওপর শিক্ষাদান করা উচিত। অন্যদিকে উঁচু এবং বিশেষজ্ঞদের বিষয়ের ওপর একচেটিয়া জ্ঞান থাকা উচিত। সাধারণ চিকিৎসক ও সাধারণ ক্লিনিক্যাল শিক্ষার্থীদের বিষয়ের ওপর সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত। সে সময় এই ধারণাগুলো অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তারা সবসময় শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ও মৌলিক জ্ঞান প্রদান করতে উৎসাহী ছিল এবং তারা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর তাদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও আকাঙ্খা ইচ্ছা অনুসারে বিশেষজ্ঞ অথবা সাধারণ চিকিৎসক হতে পারত। অপরদিকে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক যথাযথ দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের শিক্ষাদান করেন। অতিরিক্ত ফিজিশিয়ান মেডিকেল কেস গ্রহণের পদ্ধতি, এক্স-রে ছবির ব্যাখ্যা, মেডিকেল যন্ত্রপাতির ব্যবহারিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। এই তিন ফিজিশিয়ান প্রতিবছর তাদের নিজ নিজ ওয়ার্ডে ক্লিনিক্যাল শিক্ষা প্রদান করতেন। মেডিকেল ইউনিটে ভর্তিকৃত রোগীর শরীরের সমস্ত অংশের বৈশিষ্ট্য নমুনাস্বরূপ রাখা হয়। এটা মেডিসিনের শিক্ষাদানের জন্য যথোপযুক্ত ছিল। অনুরূপভাবে ১৯৪৮-৪৯ সালের *ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বার্ষিক বিরবণী* থেকে জানা যায় যে,[১৫০]

মোট শিক্ষার্থীদের (৩য় বর্ষ) সংখ্যা ছিল	১০১ জন
মেডিসিনের ওপর মোট লেকচারের সংখ্যা	৬৮টি
মোট বেড সাইড ক্লিনিকের সংখ্যা	২৭০টি

বছরে তিন মাস গড়ে ১৫ জন শিক্ষার্থীকে এই বিভাগে পাঠানো হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ৩টি শয্যা তথা ১টি নারী ওয়ার্ড, ২টি পুরুষ ওয়ার্ড বরাদ্দ করা হয়। অপরদিকে ১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫১-৫২ সালের মেডিসিনের শিক্ষার্থীর সংখ্যা, লেকচার সংখ্যা নিম্নের তালিকা থেকে পাওয়া যায়,[১৫১]

বছর	শিক্ষার্থীর সখ্যা	মেডিসিনের ওপর মোট লেকচার সংখ্যা	বেড সাইড ক্লিনিকের মোট সংখ্যা
১৯৪৯-৫০	১২ ১ জন	৫১টি	২৪০টি
১৯৫০-৫১	২৫৫ জন	৬০টি	২৪৩
১৯৫১-৫২	৩২০ জন	৫৮টি	১৫০ (২৮৯ দিন)

১৯৪৯-৫০ সালে গড়ে ২০ জন শিক্ষার্থী, ১৯৫০-৫১ সালে গড়ে ৩১ জন এবং ১৯৫১-৫২ সালে গড়ে ৩৫ জন শিক্ষার্থীকে বছরে তিন মাস মেডিকেল ইউনিটের দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। প্রত্যেকের জন্য নারী ওয়ার্ড থেকে ১টি এবং পুরুষ ওয়ার্ড থেকে ২টি শয্যা বরাদ্দ করা হয়।[১৫২] তারা ওয়ার্ডে রোগীর অবস্থা কিভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয় এবং রোগের কারণ কিভাবে লিখতে হয় সে বিষয়ে সমন্বিত নোট দিত। অধ্যাপক নিজে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়াসহ অতি জরুরি রোগীর অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হাতে কলমে দেখান। সিনিয়র ফিজিশিয়ান এবং রেজিস্ট্রার শিক্ষার্থীদেরকে রোগী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যবহারিক শিক্ষা দিতেন এবং রোগীর অবস্থার ইতিহাসের শীট পরীক্ষা করে দেখেন। দুইজন শিক্ষার্থীকে পর্যায়ক্রমে জরুরি বিভাগে নিয়োগ করা হয়। যাতে জরুরি রোগীদের পরিচালনা করা ও দেখার সুযোগ পায়। রেজিস্ট্রারের অধীনে শিক্ষার্থীদেরকে এই দায়িত্ব পালন করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। সেখানে তারা ক্লিনিক্যাল ক্লার্ক হিসেবে কাজ করে এবং রোগীর অবস্থার ওপর পড়াশোনার সুযোগ পায়। ওয়ার্ডে ডায়াগ্রাম, মাইক্রোফটোগ্রাফ, নার্ভস সিস্টেমের মডেল, কঠিন রোগের ফটোগ্রাফ তৈরি করা হয় এবং তা ঝুলিয়ে রাখা

হয়। জটিল রোগের প্যাথলজিক্যাল নমুনাগুলো সংরক্ষণ এবং এগুলোর ওপর ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হতো। কঠিন রোগের নির্দাবি মৃতদেহের পোস্ট মর্টেম করা হয় এবং শরীরের ভেতরের অংশগুলো প্যাথলজি বিভাগে সংরক্ষণ করা হয় । প্যাথলজিক্যাল স্লাইডগুলো শিক্ষার্থীদেরকে প্রস্তুত করে দেখানো হয় এবং তাদেরকে দিয়ে মল, মুত্র পরীক্ষা ও রক্ত গণনা করা হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের সময়ে ক্লিনিক্যাল শিক্ষার্থী না থাকায় মেডিসিনের ওপর কোনো পাঠদান করা হয়নি। পরবর্তীকালে শিক্ষার্থী পাওয়া গেলে এবং এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে এই বিভাগের কার্যক্রমও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বিভাগটি অগ্রগতি বজায় রাখে এবং মেডিকেল কলেজের উন্নয়নে তা সহায়ক হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে এই বিভাগে কোনো সিনিয়র ছাত্র ছিল না। তবে হাসপাতালের এই ইউনিটে অনেক রোগী ভর্তি হয় এবং তাদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। নিম্নের তালিকা থেকে ক্লিনিক্যাল মেডিসিন বিভাগের শয্যা, বিভিন্ন রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়,[১৫৩]

মোট শয্যা সংখ্যা		
তালিকাভুক্ত	৯০ জন	
অতিরিক্ত	নাই	
মোট চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	৩০০ জন	
মোট রোগ নিরাময় রোগীর সংখ্যা	২০০ জন	(৬৬%)
মোট রোগ থেকে উপশম সংখ্যা	৫০ জন	(১৬%)
মোট অব্যাহতি দেওয়া রোগীর সংখ্যা	৪০ জন	(১৪%)
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	১০ জন	(৪%)

১৯৪৮-৪৯ সালে শিক্ষার্থীদেরকে যথাযথভাবে ক্লিনিক্যাল বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয় এবং বেশ কয়েকটি জরুরি রোগী ওয়ার্ডে নিযুক্ত করা হয়। হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসা নেওয়া রোগীর সংখ্যা নিম্নের তালিকা থেকে পাওয়া যায়,[১৫৪]

ভর্তিকৃত রোগীর মোট সংখ্যা	৩১৪ জন
রোগ থেকে নিরাময় রোগীর সংখ্যা	১৯৫ জন
রোগ থেকে উপশম রোগীর সংখ্যা	৫৫ জন
অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৬০ জন
মৃত্যুর সংখ্যা	১৫ জন।

এ সময় অগ্রাধিকারের দিক থেকে প্রথমে ম্যালোরিয়া, তারপরে পেপটিক আলসার, এন্টিক ফিভার, নিউমোনিয়া, ডিসেনট্রি হেলমিন্থয়াসিস, মালনিউট্রিশন ইত্যাদি রোগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিছু ম্যালেরিয়া রোগীর ক্ষেত্রে প্যালুড্রিন দিয়ে সন্তোষজনক চিকিৎসা করা হয়।[১৫৫] ১৯৪৯-৫০ সালে দেখা যায় যে, ১২১ জন শিক্ষার্থীকে ৫০টি লেকচার প্রদান করা হয় এবং মোট ২৪০টি বেড সাইড ক্লিনিক দেওয়া হয়। বছরে গড়ে তিন মাসের জন্য ২০ জন শিক্ষার্থীকে ওয়ার্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য নারী ওয়ার্ড থেকে ১টি এবং পুরুষ ওয়ার্ড থেকে ২টি শয্যা দেওয়া হতো।[১৫৬] এ সময় হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া রোগীর সংখ্যা,[১৫৭]

মোট শয্যা সংখ্যা		
তালিকাভূক্ত	৪০	
অতিরিক্ত	১৫	
মোট চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	৬০০ জন	
মোট নিরাময় করা রোগীর সংখ্যা	৩০০ জন	(৫০%)
মোট রোগ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১২৫ জন	(২১%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত (অন্যান্য) রোগীর সংখ্যা	১২৫ জন	(২১%)
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	৫০ জন	(৮.৩%)

১৯৫০-৫১ সালে ২৫৫ জন শিক্ষার্থীকে ৬২টি লেকচার, ২৪৩টি বেড সাইড ক্লিনিক দেওয়া হয়। এ সময় গড়ে ৩১ জন শিক্ষার্থীকে তিন মাসের জন্য ওয়ার্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তিনটি শয্যা তথা একটি নারী ওয়ার্ড ও দুইটি পুরুষ ওয়ার্ড বরাদ্দ করা হয়।[১৫৮] হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া মোট রোগীর সংখ্যা নিম্নের তালিকা থেকে জানা যায়,[১৫৯]

মোট ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা	৬২৫ জন
মোট রোগ থেকে নিরাময় রোগীর সংখ্যা	৩৫০ জন
মোট রোগে থেকে উপশম রোগীর সংখ্যা	৮৫ জন
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	৫১ জন

এভাবে সারাবছর শিক্ষার্থীদের ক্লিনিক্যাল শিক্ষাদান করা হয়। এ সময় ওয়ার্ডে লিভার সিরোসিস এবং পেপটিক আলসার রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে এই তালিকায় শীর্ষে ছিল ম্যালেরিয়া। ভর্তির পরে কিছু সংক্রামক রোগ যেমন, ধনুষ্টংকার, মেনিনজাইটিস, কলেরা রোগী শনাক্ত করা হয় এবং মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়, কারন এই হাসপাতালে সংক্রামক রোগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলো শিক্ষার্থীদেরকে পর্যবেক্ষণ করে দেখানো হয়। অনুরূপভাবে ১৯৫১-৫২ সালে শিক্ষার্থীদেরকে ৬০টি লেকচার, ১৫০টি বেড সাইড ক্লিনিক এবং বছরে গড়ে ৩০ জন শিক্ষার্থীকে ওয়ার্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যেককে নারী ওয়ার্ড থেকে ১টি এবং পুরুষ ওয়ার্ড থেকে ২টি শয্যা দেওয়া হয়।[১৬০] হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া রোগীর সংখ্যা,[১৬১]

মোট শয্যা সংখ্যা তালিকাভুক্ত	৪০টি	
মোট অতিরিক্ত শয্যা সংখ্যা	১০টি	
মোট চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	৭৭৬ জন	
মোট রোগ থেকে নিরাময় রোগীর সংখ্যা	৩৬৬ জন	(৪৭%)
মোট রোগে থেকে উপশম পাওয়া রোগীর সংখ্যা	১৯৪ জন	(২৫%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১৫৯ জন	(২০.৫ %)
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	৫৭ জন	(৭.৫%)

তৃতীয় অতিরিক্ত ফিজিশিয়ানের ওয়ার্ড

১৯৫০-৫১ সালে একজন অতিরিক্ত ফিজিওশিয়ান, একজন সিনিয়র হাউজ ফিজিশিয়ান এবং দুইজন জুনিয়র হাউস ফিজিশিয়ান নিয়ে এই ওয়ার্ডটি গঠিত হয়। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম বর্ষ এবং সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সের শিক্ষার্থীদেরকে ওয়ার্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২ মাস তারা এই দায়িত্ব পালন করে। ছুটির দিন (রবিবার) ব্যতীত প্রতিদিন ওয়ার্ড ক্লিনিক ছিল। শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া, নির্দেশনাবলী বা শারীরিক পরীক্ষার পদ্ধতি। এ সময় ২২৫ জন শিক্ষার্থীকে ব্যাচ অনুসারে বিভক্ত করা হয়, প্রতিটি ব্যাচে গড়ে ১০-২৫ জন শিক্ষার্থী ছিল।[১৬২]

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ২-৩টি (১টি নারী ওয়ার্ডসহ) শয্যা বরাদ্দ করা হয়। শয্যাগুলো এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপস্থিতির সময়কালে প্রত্যেককে শয্যায় থাকা উচিত। এরূপ শয্যা প্রতি ১০-১৫ দিন পরপর পরিবর্তন করা হয়। জটিল এবং দুরারোগ্য রোগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিদিন অগ্রগতি রিপোর্ট লেখার নির্দেশনা দেওয়া হয়। প্রতিদিন হাউজ ফিজিশিয়ান এবং সপ্তাহের দুইদিন পরিদর্শনকারী ফিজিশিয়ান দ্বারা নির্দেশনার ইতিহাসের শীটগুলি পরীক্ষা করা হয়। শিক্ষার্থীদেরকে প্রতি শনিবার প্যাথলজি এবং মেডিসিনের ওপর প্রশ্ন দেওয়া হয় এবং পরের সোমবার তা জমা দেওয়া হয়। হাউজ ফিজিশিয়ান দ্বারা তা সংশোধন করা হয় এবং পরিদর্শনকারী ফিজিশিয়ান দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা যেমন, মল, প্রসাব পরীক্ষা, রক্তের স্লাইড ইত্যাদির জন্য দুইটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদেরকে দায়িত্বে রাখা হয়। ব্যাচ দুইটিকে পর্যায়ক্রমে জরুরি দায়িত্বের জন্য রাখা হয় এবং শিক্ষার্থীদের সাধারণ দক্ষতা যাচাই বাছাইয়ের ওপর একটি অগ্রগতির বই সিনিয়র হাউজ সার্জন দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

হাসপাতালে অতিরিক্ত ফিজিশিয়ানের ওয়ার্ড একটি নারী ও একটি পুরুষ ওয়ার্ড দ্বারা গঠিত। ৩০টি পুরুষ শয্যা ও ১০টি নারী শয্যা ছিল তালিকাভূক্ত এবং ১৫-২০টি শয্যা ছিল অতিরিক্ত। নিম্নের তালিকা থেকে এই ওয়ার্ডের চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগী ও মৃত্যুর সংখ্যা জানা যায়,[১৬৩]

মোট চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	৫৫৩ জন
মোট আরোগ্য লাভ করা রোগীর সংখ্যা	৪৮০ জন
মোট রোগ থেকে উপশম রোগীর সংখ্যা	২৪ জন
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত (অন্যান্য) রোগীর সংখ্যা	৮ জন।
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	৪১জন।

আউট ডোর ক্লিনিকে প্রতি শনি ও বুধবার (ছুটিরদিন ব্যতীত) বিশেষ নতুন রোগ ও শয্যাগুলোর নিরীক্ষণ পদ্ধতির ওপর জোর দেওয়া হয়। চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. শিক্ষার্থীদেরকে এক্স-রে গবেষণা, যন্ত্রপাতি, নমুনা (প্যাথলজিক্যাল), তাপমাত্রা চার্ট, প্রেসক্রিপশন লেখা বিষয়ের ওপর দ্বি-বার্ষিক পাঠদান করা হয়।[১৬৪] এ ছাড়া করোনারি রক্তনালীতে রক্ত জমাটবাধা, পাইলরিক স্টেনোসিস (Pyloric stenosis), ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা, লিভার সিরোসিস বিষয়ের ওপর পোস্ট মর্টেম এবং বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ করা হয়।[১৬৫]

অনুরূপভাবে ১৯৫১-৫২ সালে এই বিভাগে পাঠদান, বিশেষ পাঠদান, ওয়ার্ড ক্লিনিক পাঠদানের প্রক্রিয়া, আউট ডোর ক্লিনিক পূর্বের ১৯৫০-৫১ সালের মতো একই রকম ছিল। এ সময় কিছু পোস্ট মর্টেম করা হয়।[১৬৬] হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া বিভিন্ন রোগীর সংখ্যা,[১৬৭]

এই ওয়ার্ডে মোট চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	১০৩৮ জন
মোট আরোগ্য লাভ করা রোগীর সংখ্যা	৫৫৯ জন (৫৩.৮%)
মোট রোগ থেকে উপশমপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	২৭৩ জন (২৬%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১৫৬ জন (১৫%)
মোট মৃত্যুর সংখ্যা রোগীর সংখ্যা	৫৩ জন (৫.২%)

এ ছাড়া কিছু জটিল রোগের ফটোগ্রাফি এবং ফটোমাইক্রোগ্রাফি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়[১৬৮] এবং কিছু প্যাথলজিক্যাল নমুনা প্যাথলজি জাদুঘরে রাখা হয়।[১৬৯] এ ছাড়া ‘ Bronchography’ এবং ‘Collapse of different lobes of the lung as demonstrable by radiography’ বিষয়ের ওপর গবেষণা মূলক কাজ করা হয়।[১৭০] অন্যদিকে রিওডি জেনেরিও’র দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ‘Bronchogenic Corcinoma in East Pakistan’ প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়।[১৭১] এভাবে বিভিন্ন রোগের ওপর নতুন নতুন গবেষণামূলক কাজের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তোলার চেষ্টা করা হয়। অতীতে যেসব জটিল রোগ চিকিৎসা করা সম্ভব ছিল না বা রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি তা এসব গবেষণালব্ধ কাজের মাধ্যমে সম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে অনেক জটিল রোগী সুস্থ হয়ে যায়।

সার্জিক্যাল ইউনিট

এ ইউনিটটি তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল,

১. সার্জারি বিভাগ একজন অধ্যাপকের অধীনে ছিল
২. ক্লিনিক্যাল সার্জারি বিভাগ একজন অধ্যাপকের অধীনে ছিল এবং
৩. অতিরিক্ত সার্জনের অধীনে ছিল।

সার্জারির অধ্যাপক সার্জারির ওপর তাত্ত্বিক লেকচার প্রদান করেন। ক্লিনিক্যাল সার্জারির অধ্যাপক প্রত্যক্ষ প্রমাণসহ ক্লিনিক্যাল সার্জারির লেকচার প্রদান করেন। শিক্ষার্থীদেরকে ছোটখাট অস্ত্রোপচার, ব্যান্ডেজ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। সারা বছর ধরে ওয়ার্ডে তিনজন সার্জনের মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল শিক্ষা দেওয়া হয়। বিভিন্ন ওয়ার্ডে যেখানে অস্ত্রোপচারের জন্য রোগী ভর্তি করা হয়, সেখানে শরীরের বিভিন্ন অংশের সবধরনের যথোপযুক্ত নমুনাস্বরূপ অস্ত্রোপচারের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষার্থীদের নেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে অপারেশন থিয়েটারের দায়িত্বে রাখা হয় এবং বেশিরভাগ অপারেশন বিশেষত সাধারণ এবং জটিল রোগের রোগীদের প্রত্যক্ষ করা হয়। যখন রোগীকে সার্জিক্যাল ইউনিটে রাখা হয়, তখন শিক্ষার্থীদের অপারেশনে সহায়তা করার সুযোগ দেওয়া হয়।

১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৪৮-৪৯ সালে পাঠদানের ক্ষেত্রে গড়ে ৪০ জন শিক্ষার্থীকে জেনারেল সার্জারির ওপর ৪০টি লেকচার দেওয়া হয়। ৩০ জন শিক্ষার্থীকে তিন মাসের জন্য ওয়ার্ডের দায়িত্বে রাখা হয়। তাদেরকে পর্যায়ক্রমে ইমার্জেন্সি রুম (E.R) ও আউট ডোর (O.D) বিভাগের দায়িত্বে রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে ১জন শিক্ষার্থীকে রাতে এবং ১ জনকে দিনের বেলায় ইমার্জেন্সি অফিসারকে সহায়তা করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ছাড়া তাদেরকে ২ দিনের জন্য ওয়ার্ডে, দুই দিনের জন্য বহির্বিভাগ, এবং ২ দিনের জন্য অপারেশন থিয়েটারে ক্লিনিক দেওয়া হয়। অপারেশন থিয়েটারে হাউস সার্জনকে সহায়তা করার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। কিভাবে একজন রোগীর যত্ন নিতে হয়, কিভাবে একজন অস্ত্রোপচার রোগীর রোগ নির্ণয় করতে হয়, সে বিষয়ে হাউজ সার্জন তাদের ক্লিনিক দিতেন।[১৭২] শিক্ষার্থীরা ড্রেসিংয়ের সময় হাউজ সার্জনকে সহায়তা করত।

নিম্নের তালিকা থেকে শিক্ষার্থীদের দেওয়া লেকচার, ক্লিনিকের সংখ্যা জানা যায়,

সাল	লেকচার সংখ্যা	মোট ওয়ার্ড ক্লিনিক/বেড সাইড ক্লিনিক	আউট ডোর ক্লিনিক	রেজিস্ট্রার কর্তৃক ক্লিনিক
১৯৪৭-৪৮	৪০	৪০	১৫	-
১৯৪৮-৪৯	৪০	৫০	২০	-
১৯৪৯-৫০	৫০	১০০	৮০	১০
১৯৫০-৫১	৪৫	১৩৮	১৮	১২
১৯৫১-৫২	৪০	১৫০	৫০	৪০

উৎস: *Annual Report of the Dacca Medical College & Hospital for the year* 1946-1952. pp. 22-169.

উপরের তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে লেকচার ও ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অন্যতম কারণ এ সময় থেকে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মেডিকেল কলেজের শুরুর দিকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে আসা শিক্ষার্থী ছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিজস্ব কোনো ক্লিনিক্যাল শিক্ষার্থী ছিল না। পরবর্তীতে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষের এবং সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সের শিক্ষার্থীসহ মোট ১০০ জন (একশত) শিক্ষার্থীকে ৪টি ব্যাচে বিভক্ত করে সার্জিক্যাল ইউনিটের ওয়ার্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়। হাসপাতালের এই ইউনিটে বিভিন্ন ধরনের রোগীর চিকিৎসা করা হয়। নিম্নের তালিকা থেকে ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত চিকিৎসাপ্রাপ্ত, আরোগ্য লাভ ও মৃত্যুর সংখ্যা জানা যায়,

রোগের বিবরণ	**আরোগ্য লাভ**					**মৃত্যু**				
রোগ	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২
১. টিউমার	১৩	৪৮				২	৫			
২. পেপটিক আলসার	১৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩. পেশী, জয়েন্ট ও হাড়ের রোগ	১০	৫৫				১	২			
৪. যকৃত, প্লীহা ও অগ্নাশয়ের রোগ	৬	২০				২	৪			
৫. এ্যাপেনডিসাইটিস	৪	২০				১	১			
৬. মুত্র	১৪	৪৫				১	২			
৭. থাইরয়েড	৪	৮				১	১			
৮. হার্নিয়া	৫	২০				-	২			
৯. স্তন	২	৬				-	১			
১০. পৌস্টিক তন্ত্র	২০	৫৮				১	২			
১১. ফাইলেরিয়া	১	৩				১	-			
১২. ফুসফুস	২	১				২	১			
১৩. আহত	১১	৪০				১	২			
১৪. অন্যান্য	২৫	১০৩				২	২২			
১৫. অস্ত্রোপচার ছাড়া চিকিৎসা	১৫	১২১				৫	২৫			
মোর্ট	(মোট ভর্তি ১৫১ ও আরোগ্য লাভ-১৩২ জন)	**৫৪৮**				**১৯**	**৭০**			

উৎস: *Annual Report of the Dacca Medical College & Hospital from* 1947-48 to 1951-52. pp. 23-170.

উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে ১৫১ জন রোগী ভর্তি হয় তার মধ্যে ১৩২ জন আরোগ্য লাভ করে, ১৯৪৮-৪৯ সালে ৬১৮ জন রোগী ভর্তি হয় তার মধ্যে ৫৪৮ জন রোগী আরোগ্য লাভ করে। ১৯৪৯-৫০ সালে সরকারি রির্পোটে রোগের বিবরণ না থাকলেও ৮১৭জন রোগী ভর্তি হয়, এর মধ্যে ৭৫৩ জন রোগী সুস্থ হয়ে যায়। ১৯৫০-৫১ সালে ১০৭৬ জন রোগী ভর্তি হয়, এর মধ্যে ৯৯৭ জন রোগী সুস্থ হয়, ৭৯ জন রোগীর মৃত্যু হয় এবং ১৯৫১-৫২ সালে ১১২৬ জন রোগী ভর্তি হয়, এর মধ্যে ১০৫২ জন রোগী সুস্থ হয় এবং ৭৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়।[১৭৩] গবেষণার পর্যালোচিত সময়ে কিডনিতে টিউমার, লিভারে পানি, ক্যান্সার, ম্যালিগন্যান্সি এর মতো নানা রকম জটিল রোগের চিকিৎসা করা হয় এবং কিছু জটিল রোগের অস্ত্রোপচার করা হয়। এই অস্ত্রোপচার সম্পর্কে বলা হয়,

> The interesting operations were partial gastrectomy under local anaesthesia [*sic*] with splanchnic block, porta caval anastomosis for portal obstruction and subserous dissection of gall bladder. Some arthroplasty of hip joint were performed with success. External urethrotomy in a case of neclected. Vesico–vaginal Fistula was done. vitelum cup was put on for Arthrodesis.[১৭৪]

এই ইউনিটে তিনটি অপারেশন থিয়েটার, যা জেনারেল সার্জন, ই.এন.টি. সার্জন এবং গাইনোকোলজি সার্জন দ্বারা পরিচালিত হয়। সপ্তাহে দুই দিন একই সাথে জেনারেল সার্জন ও অন্যান্য বিশেজ্ঞদের নিয়ে অপারেশন পরিচালনা করেন। অপারেশন থিয়েটারে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ছিল। ইতিমধ্যে অনেক যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম কেনা হয় এবং রেডিয়াম ছিল, যা সমগ্র ইউনিট ব্যবহার করেন। সামগ্রিকভাবে এই বিভাগ সন্তোষজনক অবস্থায় ছিল। এ সময় পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটি সব বিভাগের জন্য পৃথক পৃথক অপারেশন থিয়েটার রাখার জন্য জোরালো সুপারিশ করে।[১৭৫]

গবেষণার পর্যালোচিত সময়ে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ের ওপর রেডিও পাকিস্তানে স্বাস্থ্য সচেতন সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।[১৭৬] বর্তমান সময়ের মতো সে সময় টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন তথা যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ছিল না। রেডিও ছিল একমাত্র প্রচার মাধ্যম। এর মাধ্যমে সমগ্র পূর্ববাংলার জনসাধারণকে স্বাস্থ্য ও আধুনিক চিকিৎসা বিষয়ে সচেতন করা হতো। এর দ্বারা জনসাধারণ নানাভাবে উপকৃত হতো, কেননা সে সময় সবার পক্ষে ঢাকা শহরে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব ছিল না।

১৯৬০ এর দশকে অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে এই বিভাগের ব্যাপক অগ্রগতি হয়। ১৯৬৩ সালের *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে, ‘পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৪টি ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। তারমধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কেন্দ্রটিই আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত’।[১৭৭]

ক্লিনিক্যাল সার্জারি বিভাগ

এই বিভাগে একজন অধ্যাপক, একজন হাউজ সার্জন দ্বারা পরিচালিত হয় *[পরিশিষ্ট দেখুন-১৮]*। ১৯৪৭-৪৮ সালে শিক্ষার্থীদের ২০টি লেকচার, ৬০টি বেড সাইড ক্লিনিক দেওয়া হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে ৪০টি ক্লিনিক্যাল সার্জারির লেকচার এবং ২০টি অপারেটিভ সার্জারির লেকচার দেওয়া হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে ৪০টি ক্লিনিক্যাল সার্জারি, ৩০টি অপারেটিভ সার্জারি, ৮০টি নাক, কান, গলা রোগ, ১২টি সার্জিক্যাল রেজিস্ট্রার কর্তৃক ক্লিনিক দেওয়া হয়। ১৯৫০-৫১ সালে ৪০টি ক্লিনিক্যাল সার্জারি, ২০টি অপারেটিভ সার্জারি, ৪০টি অন্ত বেড সাইড ক্লিনিক, ৮৫টি আউট ডোর ক্লিনিক এবং ১২টি সার্জিক্যাল রেজিস্ট্রার কর্তৃক

ক্লিনিক দেওয়া হয়।[১৭৮] ১৯৫১-৫২ সালে একজন অধ্যাপক, একজন রেসিডেন্ট সার্জন ও তিনজন রেজিস্ট্রার ও তিন জন হাউজ সার্জন দ্বারা বিভাগটি পরিচালিত হয় *[পরিশিষ্ট দেখুন-২২]*। পর্যালোচিত সময়ে ৯০ জন শিক্ষার্থীকে ৩৫টি ক্লিনিক্যাল সার্জারি, ১৫টি অপারেটিভ সার্জারি, ১৫০টি অন্ত বেড সাইড ক্লিনিক, ৬০টি আউট ডোর ক্লিনিক এবং ১০টি সার্জিক্যাল রেজিস্ট্রার কর্তৃক ক্লিনিক দেওয়া হয়।[১৭৯] এই বিভাগে বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়। নিম্নের তালিকা থেকে ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের রোগের বিবরণ, আরোগ্য লাভকারী রোগী এবং মৃত্যুর সংখ্যা জানা যায়,

রোগের বিবরণ	**আরোগ্য লাভ**					**মৃত্যু**				
রোগ	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২	১৯৪৭-৪৮	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২
১. টিউমার	৫	৩৪		৫৪	৪৩	১	-		১৪	৩
২. পেশী, জয়েন্ট ও হাড়ের রোগ	৮	৩০		৫৯	৫২	-	১		২	১
৩. যকৃত, প্লীহা ও অগ্নাশয়ের রোগ	৩	৬		২০	৪০	১	২		২	৫
৪. এ্যাপেনডিসাইটিস	৫	১৫		১৬	১৪	-	-		১	১
৫. মুত্র	১০	৫০		৩৮	৩১	১	৩		১	২
৬. থাইরয়েড	-	৪		১২	১২	-	-		১	২
৭. হার্নিয়া	৬	২৭		৩৫	৪৭	১	৩		-	১
৮. স্তন	১	৪		৬	১০	-	-		-	১
৯. পৌস্টিক তন্ত্র	৯	৩৬		৬৬	৭০	১	১		২	৩
১০. ফাইলেরিয়া	১	৩		৪	২	-	-		-	-
১১. ফুসফুস	-	-		১	১	-	-		১	১
১২. আহত	১০	৪৪		৩৫	৩০	১	৩		২	১
১৩. অন্যান্য	১৬২	১১৬		২৪৫	২৭২	-	২৪		১৮	১৯
১৪. অস্ত্রোপচার ছাড়া চিকিৎসা	১২	১৫২		২৩৪	৪৫০	৪	২৪		১২	২৩
মোট	**২৩৫**	**৫২১**		**৮২৫**	**১০৭৪**	**১০**	**৬১**		**৫৮**	**৬৩**

উৎসঃ *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital from* 1947-48 to 1951-52, pp. 24-171.

উপরি-উক্ত তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে মোট চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ২৪৫ জন, এর মধ্যে আরোগ্য লাভ করেন ২৩৫ জন, মৃত্যু হয় ১০ জন রোগীর। এ সময় বড় অস্ত্রোপচার হয় ৭৮টি, ছোট অস্ত্রোপচার হয় ১৪৯টি এবং অস্ত্রোপচারে মৃত্যুর হার ২%। ১৯৪৮-৪৯ সালে চিকিৎসা প্রাপ্ত মোট রোগীর সংখ্যা ৫৬৮ জন, এর মধ্যে আরোগ্য লাভ করে ৫২১ জন এবং মৃত্যু হয় ৬১ জন রোগীর। বড় ধরনের অস্ত্রোপচার হয় ১৭০টি, ছোট অস্ত্রোপচার হয় ২৮৪টি এবং অস্ত্রোপচারে মৃত্যু হয় ১৫ জনের তথা মৃত্যুর হার ৩%।[১৮০] উপরি-উক্ত তালিকায় ১৯৪৯-৫০ সালের রোগের বিবরণের দ্বারা চিকিৎসা প্রাপ্ত ও আরোগ্য লাভ রোগীর সংখ্যা না থাকলেও *ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ষিক বিবরণী* থেকে জানা যায় যে, এ সময় মোট চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৭৩৪ জন, আরোগ্য লাভ করে ৬৮১ জন এবং মৃত্যু হয় ৫৩ জনের।[১৮১] ১৯৫০-৫১ সালে মোট চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৮৮৩ জন, আরোগ্য লাভ করে ৮২৫ জন এবং মৃত্যু হয় ৫৮ জনের।[১৮২] ১৯৫১-৫২ সালে মোট চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ১১৩৭ জন, আরোগ্য লাভ করে ১০৭৪ জন এবং মোট মৃত্যু হয় ৬৩ জনের।[১৮৩] এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শুরুর দিকে রোগীর সংখ্যা কম হলেও অধিকাংশ রোগী আরোগ্য লাভ করেন এবং চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর মৃত্যু হার ছিল তুলনামুলক কম। পরবর্তীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে রোগীর

সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তেমনি আরোগ্য লাভকারী রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। সে সময় কিডনি ও লিভারে পাথরসহ অনেক জটিল রোগের চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার করা হয়। সফল অস্ত্রোপচারে অধিকাংশ রোগী সুস্থ হয়ে যায়, যা উপরিউল্লিখিত সংখ্যা থেকে জানা যায়। এ ছাড়া সার্জারির ওপর কিছু গবেষণামূলক কাজ হয়। এগুলো প্রবন্ধ আকারে বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন কনফারেন্সে উপস্থাপন করা হয়।[১৮৪] ১৯৬০ এর দশকেও বিভাগটি তার অগ্রগতি বজায় রাখে। ১৯৬৬-৬৭ সালে দেখা যায় যে, পাকিস্তান মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল এর তহবিলের দ্বারা সার্জারি, ডারমাটোলজি, মেডিসিন এবং পেডিয়াট্রিক বিভাগ প্রচুর গবেষণামূলক কাজ করে।[১৮৫]

অতিরিক্ত সার্জনের ওয়ার্ড

১৯৪৮-৪৯ সালে এই ওয়ার্ডটি একজন অতিরিক্ত সার্জন, দুইজন রেসিডেন্ট সার্জন ও একজন হাউজ সার্জন দ্বারা গঠিত [*পরিশিষ্ট দেখুন*-১৯]। শিক্ষার্থীদেরকে ছোটখাট সার্জারি ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতির ডেমনস্ট্রেশনের ওপর ২০টি লেকচার দেওয়া হয় এবং তিন মাসের জন্য গড়ে ২০ জন শিক্ষার্থীকে ওয়ার্ডে রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে ওয়ার্ড ক্লিনিক ৫০টি, অপারেশন থিয়েটার ক্লিনিক ২০টি দেওয়া হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে ২০টি লেকচার, ১০০টি অন্ত বেড সাইড ক্লিনিক, ৮৪টি আউট ডোর ক্লিনিক, ১৯৫০-৫১ সালে ছোট সার্জারির ওপর ২০টি লেকচার, ৯৬টি অন্ত বেড সাইড ক্লিনিক, ৯৮টি আউট ডোর ক্লিনিক এবং ১৯৫১-৫২ সালে ২০টি লেকচার, ১০০টি অন্ত বেড সাইড ক্লিনিক এবং ৯৬টি আউট ডোর ক্লিনিক দেওয়া হয়।[১৮৬] প্রথম দিকে ক্লিনিকের সংখ্যা কম হলেও পরবর্তীতে অন্ত ও বহির্ক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সময় হাসপাতালে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হয়। এর মধ্যে অধিকাংশ রোগী সুস্থ হয় এবং স্বল্প সংখ্যক মৃত্যুবরণ করে। নিম্নের তালিকা থেকে বিভিন্ন রোগের বিবরণ, সুস্থ, আরোগ্য লাভ এবং রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা জানা যায়,

রোগের বিবরণ	**আরোগ্য লাভ**					**মৃত্যু**				
রোগ	১৯৪৭ -৪৮	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯-৫০	১৯৫০ -৫১	১৯৫১ -৫২	১৯৪৭ -৪৮	১৯৪৮-৪৯	১৯৪৯ -৫০	১৯৫০ -৫১	১৯৫১ -৫২
১. টিউমার		৩০	৩২		১২		৪	৪		২
২. পেশী, জয়েন্ট ও হাড়ের রোগ		৩০	৩০		৪৭		১	-		১
৩. যকৃত, প্লীহা ও অগ্নাশয়ের রোগ		৬	৭		১০		২	১		-
৪. এ্যাপেনডিসাইটিস		১৫	১১		১০		১	-		-
৫. মুত্র		৪৬	৩		৪০		২	-		১
৬. থাইরয়েড		৩	৩		-		-	-		-
৭. হার্নিয়া		২৩	২৮		৩৮		২	-		২
৮. স্তন		৩	৪		৭		১	-		১
৯. পৌস্টিক তন্ত্র		৩০	৩০		৩০		১	-		২
১০. ফাইলেরিয়া		৩	৩		৪		-	-		-
১১. ফুসফুস		-	-		-		-	-		-
১২. আহত		৪৩	৪৫		২৫		৩	৩		১
১৩. অন্যান্য		১১৪	২৪৮		৩৯৩		২৭	২৪		২৪
১৪. অস্ত্রোপচার ছাড়া চিকিৎসা		১৬০	১৮৯		৪৫৬		২৪	৩৬		২৪
মোট		**৫০০**	**৬৩৩**		৮৭২		**৬৮**	**৬৯**		**৫৮**

উৎস: *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital from* 1948-49 to 1951-52, pp. 55-176.

উপরি-উক্ত তালিকা থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে এই বিভাগে মোট চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৫৫৮ জন, এর মধ্যে আরোগ্য লাভ করে ৫০০ জন এবং মৃত্যু হয় ৬৮ জনের। ১৯৪৯-৫০ সালের মোট চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৭০২ জন, আরোগ্য লাভ করে ৬৩৩ জন এবং মৃত্যু হয় ৬৯ জনের। এ সময় ৪৫৭টি অস্ত্রোপচার (বড় ১০০টি এবং ছোট ৩৫৭টি) হয়। এই অস্ত্রোপচারে মৃত্যু হয় ১০ জন তথা ২%। ১৯৫০-৫১ সালে চিকিৎসা প্রাপ্ত মোট রোগীর সংখ্যা ৮২১ জন, সুস্থ হয় ৭৭৩ জন এবং মৃত্যু ৫৮ জন এবং মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ৫২৭টি ও অস্ত্রোপচারে মৃত্যু হয় ১৮ জনের। ১৯৫১-৫২ সালে মোট চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৯৩০ জন, আরোগ্য লাভ করে ৮৭২ জন, মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ৬৯৫ (বড় ২৫২টি এবং ছোট ৪৪৩টি), অস্ত্রোপচারে মোট মৃত্যু হয় ৫৮ জন তথা মৃত্যু হার ১.৭%।[১৮৭] এটা থেকে সহজে বোঝা যায় মৃত্যুর চেয়ে সুস্থ রোগীর সংখ্যা বেশি এবং অধিকাংশ অস্ত্রোপচার সফল হওয়ায় মৃত্যুর হার কম। ফলে শিক্ষার্থীরা এই বিভাগের অপারেশন থিয়েটারে উপস্থিত থেকে যে ক্লিনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ করে তা পরবর্তীতে কোনো কোনো শিক্ষার্থীদের সার্জারি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে উৎসাহিত করে। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের (ইংল্যান্ড) মতো আধুনিকতর তা প্রমাণ করে। এ সময় ৩০ জন পেপটিক আলসার রোগীর সফল চিকিৎসা করা হয়। আবার কিছু জটিল রোগ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।[১৮৮] এই ওয়ার্ডে কিছু গবেষণামূলক কাজ পরিচালনা করা হয়।[১৮৯]

এভাবে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীদের আধুনিক চিকিৎসাশিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন রোগের ওপর গবেষণা চালিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা আরো আধুনিক করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। এর ফলে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জনপ্রিয়তা দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অবসটেট্রিকস ও গাইনোকোলজি ইউনিট

১৯৪৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর একজন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে ৫টি গাইনোকোলজি ও ৫টি অবসটেট্রিকস শয্যা নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের এই ইউনিটটি খোলা হয়।[১৯০] ডেলিভারি রুমটি ওয়ার্ড থেকে একটু দূরে অপারেশন থিয়েটারের পাশে অবস্থিত ছিল এবং এটি একটি অসুবিধাজনক ব্যবস্থা ছিল। দুই বছর পর অবসটেট্রিকস বিভাগটি নীচের তলায় লেবার কক্ষ সংলগ্ন একটি একলামসিয়া কক্ষ এবং নবজাতকদের জন্য একটি কক্ষ নিয়ে দুইটি বিভাগ (গর্ভকালীন ও প্রসবোত্তর) সংযুক্ত করা হয়। এই ব্যবস্থা রোগী এবং স্টাফদের জন্য যথেষ্ট সুবিধা হয়। এর ফলে প্রসব সম্ভাবনা রোগীদের উপরের তলায় নিয়ে যেতে হতো না, আবার ওয়ার্ড থেকে প্রসব ঘরের বাইরে অনেকদূর পর্যন্ত যেতে হতো না। এগুলো একই জায়গায় এবং সরাসরি স্টাফদের তত্ত্বাবধানে ছিল। গাইনোকোলজিক্যাল কক্ষটি এর পূর্বের জায়গায় ছিল। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই বিভাগের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ হয় এবং একটি আলাদা ওয়ার্ডের বরাদ্দ করা হয়। ইতিমধ্যে অভ্যন্তরীণ বিভাগের ওয়ার্ডগুলো সম্প্রসারণ করা হয়। ফলে ৫টি মেডিকেল ওয়ার্ড, ৫টি সার্জিক্যাল ওয়ার্ড, ১টি গাইনোকোলজিক্যাল ওয়ার্ড এবং একলামসিয়া ও সেপটিক রোগীদের জন্য ৪ শয্যার একটি আলাদা কক্ষসহ ১টি অবসটেট্রিকস ওয়ার্ড ও ১টি নার্সারি যেখানে ২০ থেকে ৩৫ জন নবজাতক রাখা যেত এবং প্রত্যেকটি ওয়ার্ড ৩০ শয্যা বিশিষ্ট। সে সময় থেকে গাইনোকোলজিক্যাল এবং গুরুতর অবসটেট্রিকস রোগীদের (সিজারিয়ান, অ্যাক্টোপিক গর্ভধারণ, অসম্পূর্ণ গর্ভপাত, ফেটে যাওয়া জরায়ু ইত্যাদি) এখানে ভর্তি করা হয়। অধ্যাপক এইচ. আহমেদ তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের অবসটেট্রিকস এর ওপর ২০টি লেকচার প্রদান করেন। শিক্ষার্থীদের গর্ভবতী রোগীদের স্বাভাবিক প্রসব ডেমনস্ট্রেশন করে দেখানোর জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠানো হতো। এ সময় জরায়ু ফেটে যাওয়া একজন গুরুতর রোগী

ভর্তি হয়। মেজর এফ. ডব্লিউ. এলিনসন এবং অধ্যাপক এইচ. আহমেদ রোগীর অস্ত্রোপচার করেন। এ ছাড়া নিম্নের তালিকা থেকে এই বিভাগের বিভিন্ন ধরনের রোগীদের হিসাব পাওয়া যায়,[১৯১]

মোট চিকিৎসা করা রোগীর সংখ্যা	৯৮ জন	
মোট আরোগ্য লাভ করা রোগীর সংখ্যা	৫৫ জন	(৫৬%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১৪ জন	(১৪.৩৪%)
মোট ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১৪ জন	(১৪.৩৪%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত (অন্যভাবে)	১১ জন	(১১.২৩%)
মোট অপারেশনের সংখ্যা	৪৩ জন	(বড় ১৯, ছোট ২৯)
অপারেশনে মৃত্যু হার		২.৩%

১৯৪৯-৫০ সালে এই বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে পূর্বের ডাক্তার এইচ. আহমেদ থাকলেও রেসিডেন্ট সার্জন হিসেবে নারী চিকিৎসক জে. বি. কাজী, (এম.বি.) এবং হাউজ সার্জন ডাক্তার মোখলেসুর রহমান, (এম.বি.) যোগদান করেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের অবসটেট্রিকসের ওপর পূর্বের চেয়ে বেশি লেকচার তথা ৩০টি লেকচার প্রদান করা হয়। ১৯৪৯ সালের মে মাস থেকে গড়ে ৪ জন ছাত্রকে তিন মাসের জন্য ৫ জন রোগীর সন্তান প্রসব পর্যবেক্ষণ করার জন্য ওয়ার্ডে রাখা হয়। এই ওয়ার্ডে অবসটেট্রিক্যাল ও গাইনোকোলজিক্যাল রোগীর ক্লিনিক দেওয়া হয়। ৪ জন শিক্ষার্থীর এই ব্যাচকে সারাবছরে তিনমাসের জন্য ওয়ার্ডের দায়িত্ব পালন করতে হয়।[১৯২] এ সময় হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া বিভিন্ন ধরনের মোট রোগীর সংখ্যা জানা যায়,[১৯৩]

মোট চিকিৎসা করা রোগীর সংখ্যা	৬৫৩ জন	
মোট আরোগ্য লাভ রোগীর সংখ্যা	৩০৮ জন	(৪৭.২%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১৯৬ জন	(৩০%)
মোট ডি.ও.আর.বি. প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৯৩ জন	(১৪.৩%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত নয় রোগীর সংখ্যা	৩৭ জন	(৫.৬%)
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	১৯ জন	(মৃত্যু হার ২.৯%)
অপারেশনে মৃত্যুহার		১%
মোট সন্তান প্রসবের সংখ্যা	২০৭ জন	
মোট যন্ত্রপাতি দ্বারা সন্তান প্রসবের সংখ্যা	৮ জন	
মোট সিজারের সংখ্যা	৬ জন	
মোট অপারেশনের সংখ্যা	১৮০টি (বড় ৭৮টি, ছোট ১০২টি)	

এবং নিম্নের গুরুতর রোগীদের পর্যবেক্ষণ করা হয়,[১৯৪]

১. জরায়ু ফেটে যাওয়া দুইজন রোগী
২. ফেটে যাওয়া অ্যাক্টোপিক গর্ভাবস্থার দুইজন রোগী।
৩. ভেমিকুলার মোল

এই ইউনিটের আরেকজন নারী চিকিৎসক অধ্যাপক হুমায়রা সাঈদকে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। এই বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং উচ্চতর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছিল। তিনি যখন যোগদান করেন তখন পুরো ইউনিটকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি মিডওয়াইফারি ও গাইনোকোলজি বিভাগ, দ্বিতীয়টি ক্লিনিক্যাল

মিডওয়াইফারি ও গাইনোকোলজি বিভাগ এবং প্রত্যেকটি বিভাগ অধ্যাপকের অধীনে ছিল। প্রত্যেক বিভাগে ৩০টি করে শয্যা (১৫ টি অবসটেট্রিক্যাল ও ১৫ টি গাইনোকোলজিক্যাল) তথা মোট ৬০টি শয্যা ছিল। ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারি ও গাইনোকোলজি বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে একজন নারী ডাক্তারের নিয়োগের বিষয়টি রোগীদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের ছিল। নারী রোগীদের মধ্যে অনেকেই পুরুষ চিকিৎসকের কাছে পরীক্ষা বা চিকিৎসা নিতে পছন্দ করতেন না। সে সময় যখন কোনো নারী রোগী গুরুতর রোগে ভুগতে থাকে, তখন তাদের সংকোচ ও দ্বিধার কারণে সঠিক চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না।

এই বিভাগের নিজস্ব অপারেশন থিয়েটার ছিল এবং দুইজন গাইনোকোলজি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ৪র্থ ও ৫ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের এই ইউনিটে দায়িত্ব দেওয়া হতো। এই ইউনিটের দায়িত্বরত শিক্ষার্থীদের হাসপাতালের একটি কক্ষে নিয়োজিত করা হয়। যাতে তারা সারা দিনরাত স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সন্তান প্রসব পর্যবেক্ষণ ও তদারক করতে পারে। প্রতিদিন একজন অধ্যাপক অবসটেট্রিকস ও গাইনোকোলজির ওপর ক্লিনিক দেন। ডামি (কাপড়ের পুতুলের দ্বারা নমুনা হিসেবে সন্তান প্রসব প্রক্রিয়া) ও ভ্রুণ থেকে একটি বাচ্চার বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া তথা বাচ্চার ৮ সপ্তাহ (Foetus)[১৯৫] পরের প্রক্রিয়া এবং অবসটেট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির ওপর রেসিডেন্ট সার্জন ডেমনস্ট্রেশন করে দেখাতেন । শিক্ষার্থীদের অপারেশন প্রত্যক্ষ এবং সার্জনকে সহযোগিতা করার জন্য অপারেশন থিয়েটারের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সব ক্লিনিক্যাল ইউনিটে রোগের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের নমুনা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের শর্ত অনুযায়ী পর্যাপ্ত ছিল। ১৯৫০ সালে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ দ্বিতীয়বারের মতো পরিদর্শন করে তখন এই বিভাগ সম্পর্কে বলা হয় যে, এই বিভাগটি দুইটি ইউনিটে বিভক্ত ছিল। একটি মিডওয়াইফারি ও গাইনোকোলজি ইউনিট, অন্যটি ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারি ও গাইনোকোলজি। প্রত্যেকটি ইউনিটে ১৫টি অবসটেট্রিক্যাল ও ১৫টি গাইনোকোলজি শয্যা। শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সন্তান প্রসব রোগীর সংখ্যা মোটামুটি পর্যাপ্ত ছিল। বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রোপচারের নিবন্ধন দেখানো হলেও প্রসুতি বিভাগে আরো শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর সুপারিশ করে। যাতে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় ২০টি শয্যা তদারক করতে সক্ষম হয়। বিভাগটিতে স্টাফ সংখ্যা পর্যাপ্ত ছিল। ধারণা করা হয় যে, কাজের পরিমাণের চেয়ে স্টাফ সংখ্যা বেশি ছিল, তবে কাউন্সিল শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর ওপর বেশি জোর দেয়।[১৯৬]

অপরদিকে ১৯৫০-৫১ সালে দেখা যায় যে, মিডওয়াইফারি ও গাইনোকোলজি বিভাগের অধ্যাপক হাউজ সার্জন, রেসিডেন্ট সার্জন ১৯৪৯-৫০ সালের একই ব্যক্তি হলেও রেজিস্ট্রার হিসেবে নতুন চিকিৎসক এইচ. মালিক, (এম.বি.বি.এস.) যোগদান করেন। এ সময় ৪র্থ ও ৫ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের অবসটেট্রিকসের ওপর ৩০টি তাত্ত্বিক লেকচার এবং ২০টি গাইনোকোলজির ওপর লেকচার দেওয়া হয়। প্রতি তিন মাসের জন্য প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে গড়ে ১০ জন শিক্ষার্থীকে রাখা হতো। অধ্যাপক অস্ত্রোপচারের দিন অপারেশন থিয়েটারে ও প্রতিদিন ওয়ার্ডে শিক্ষার্থীদেরকে সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ব্যবহারিক শিক্ষা দান করেন এবং তাদেরকে অপারেশনে সহযোগিতা করার জন্য শিক্ষার্থীদের সুযোগ দেন। রেসিডেন্ট সার্জন, রেজিস্ট্রার এবং হাউজ সার্জন দ্বারা ক্লিনিক এবং ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা বহির্রোগী বিভাগেও উপস্থিত থাকত। তাদের ব্যাচগুলোকে লেবার ডিউটিতে রাখা হয় ও ৫টি শয্যা তদারক এবং ১৫ জনকে প্রত্যক্ষ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। তাছাড়া তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য সব ধরনের জরুরি অপারেশনে উপস্থিত থাকতে হতো।[১৯৭] নিম্নের তালিকা থেকে হাসপাতালের এই ইউনিটে চিকিৎসা নেওয়া রোগীর সংখ্যা পাওয়া যায়,[১৯৮]

মোট চিকিৎসা করা রোগীর সংখ্যা	৮১৭ জন	
মোট আরোগ্য লাভ করা রোগীর সংখ্যা	৫৭৫ জন	৭০%
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১৮০ জন	২২%
মোট ঝুঁকি বন্ডের ওপর অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৩১ জন	৩.৭%
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত (অন্যভাবে)	৯ জন	১.৭%
মোট মৃত্যুহার		২.৬%
মোট অপারেশনের সংখ্যা	২১৯ জন	
মোট অপারেশনের মৃত্যু	২২ জন	
অপারেশনের মৃত্যুহার		১.৪%
মোট সন্তান প্রসব সংখ্যা	৩৬৮ জন	
যন্ত্রপাতির দ্বারা সন্তান প্রসবের মোট সংখ্যা	১৪ জন	
মোট সিজারের সংখ্যা	১২ জন	

এ সময় ইউরিনারি ফিস্টুলা রোগী পাওয়া যায়। ফিস্টুলাটি আকারে অনেক বড় হওয়ায় অপূরণীয় ছিল। এ ক্ষেত্রে সিগময়েড কোলনে জরায়ুর প্রতিস্থাপন করা হয় এবং এর ফলাফল শতকরা ১০০% সফল। কোনো মৃত্যু ছাড়াই নয়টি প্রতিস্থাপন করা হয়। এ সময় জরায়ু ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য রেডিয়াম চিকিৎসা দেওয়া হয়। এর ফলাফল সন্তোষজনক ছিল।[১৯৯] ১৯৫০-৫১ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক বিবরণী*তে উল্লেখ করা হয় যে,

> The Pakistan Medical Council in their report of inspection have made certain recommendations in which they are agreeable to recognize the Departments of Medicine, Physiology, Pharmacology, Surgery, Eye, E.N.T Midwifery and Gynaecology *[Sic]* provided the improvements suggested in the report of inspection are effected.[২০০]

১৯৫১-৫২ সালে প্রিন্সিপাল কর্নেল এম. কে. আফ্রিদি (১৯৫২-৫৩) এই বিভাগের সম্প্রসারণের যে ধারণা দেন,

> It has been learnt recently that the University wing will be handed over to us. When that portion is available, we shall have a chance to accommodate the wards of infectious diseases' and the Maternity and Gynaecology *[Sic]* Departments will be shifted there.[২০১]

পর্যালোচিত সময়ের শুরুতে ১০নং ওয়ার্ডটি ৩০টি অবসটেট্রিক্যাল ও ১১ নং ওয়ার্ড ৩০টি গাইনোকোলজিক্যাল শয্যা নিয়ে বিভাগটি গঠন করা হয়। ১৯৫১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর অবসটেট্রিকস ওয়ার্ড এবং লেবার রুম হাসপাতালের নীচের তলার ৩ এবং ৪নং ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়। ফলে বিভাগটিকে নিম্নের তালিকা অনুযায়ী গঠন করা হয়,[২০২]

১.	প্রসব পূর্ব শয্যা	২০টি
২.	প্রসবোত্তর শয্যা	২০টি
৩.	একলামসিয়া	৩টি
৪.	কেবিন	৪টি

এ ছাড়া নবজাতকদের জন্য কক্ষ নির্মাণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে একটি জরুরি কক্ষ চালুর মধ্য দিয়ে এই বিভাগের আরেকটি উন্নয়ন ঘটে। মিডওয়াইফারি ও গাইনোকোলজি অধ্যাপকের অধীনে ১৫টি গাইনোকোলজিক্যাল ও ২৩টি অবসটেট্রিকস শয্যা ছিল।

পাঠদানের ক্ষেত্রে পূর্বের মতো ৩০টি অবসটেট্রিকস ও ২০টি গাইনোকোলজির ওপর লেকচার দেওয়া হয়। পূর্বের চেয়ে এ সময় গড়ে ১৫ জন শিক্ষার্থীকে তিন মাসের জন্য ওয়ার্ডে রাখা হয়। তাদেরকে অপারেশন থিয়েটার, ও.পি.ডি. (O.P.D) তে ক্লিনিক্যাল ও ওয়ার্ড ক্লিনিকে উপস্থিত এবং লেবার ও বর্হিরোগী বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। উপরন্তু তাদেরকে একলামসিয়া শয্যার রোগীদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা ওয়ার্ড পর্যবেক্ষণ শেষে ওয়ার্ড শেষ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে বৃটেনের বিখ্যাত গাইনোকোলজিস্ট কর্নেল বি.ভি. গ্রিণ আর্মিটেজ (B.V. Green Armytage) হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। নারীদের শারীরিক ব্যায়ামের গুরুত্ব ও বন্ধ্যাত্বের ওপর একাধিক লেকচার প্রদান করেন এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন যেমন, Vaginal Hysterectomy, Myomectomy, Tubal implantation and Fimbriolysis পরিচালনা করেন। এ ছাড়া আমেরিকান সার্জন ডাক্তার ইউ.জি. ডেইলি (U.G. Daily) একই বছরের ডিসেম্বর মাসে হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং গাইনোকোলজিক্যাল অস্ত্রোপচারের (Pan Hysterectomy) ওপর কিছু ফিল্ম প্রদর্শন করেন।[২০৩] এ সময় হাসপাতালে বিপুল সংখ্যক রোগীর চিকিৎসা করা হয়। হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের রোগী সংখ্যা নিম্নের তালিকায় পাওয়া যায়,[২০৪]

মোট চিকিৎসা করা রোগীর সংখ্যা	৫৫৯ জন	
মোট আরোগ্য লাভ করা রোগীর সংখ্যা	৬০৩ জন	(৬২.৮%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	১৯০ জন	(১৯.৮%)
মোট ডি.ও. আর. বি. প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৮৬ জন	(৯%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত (অন্যভাবে) রোগীর সংখ্যা	৫৪ জন	(৫.৭%)
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	২৬ জন (মৃত্যুহার ২.৭% অপারেশনের মৃত্যু হার ১.৫%)	
মোট অপারেশনের সংখ্যা	২৭৭ জন (বড় ১০৫, ছোট ১৭২)	
মোট যন্ত্রের দ্বারা সন্তান প্রসব সংখ্যা	২৫ জন	
মোট সিজার সংখ্যা	১৮ জন	

এ সময় বিভিন্ন ধরনের রোগী ভর্তি হয় যেমন, Ovarian Cyst, Fibroid Uterus, Sterility, T. O. Mass, Prolapse Uterus, Fistulae ইত্যাদি। তবে গর্ভাবস্থার রক্তস্বল্পতা (anaemia) ও একলামসিয়া রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া বড় ধরনের অস্ত্রোপচার, গর্ভবস্থার রক্তস্বল্পতা, এ.পি.এইচ. এবং পি.পি.এইচ. এ আক্রান্ত রোগীদের ব্লাড ট্রান্সফিউশন সার্ভিস অনেক সাহায্য করে এবং নিম্নের গুরুতর রোগের ওপর পর্যবেক্ষণ করা হয়,

১. A case of Abdominal Pregnancy Discovered by Laparotomy.
২. A case of Rupture of Uterus
৩. A case of Anencephaly
৪. A case of Ovarian pregnaney- Operated as a case of twisted ovarian cyst.

এ ছাড়া বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ করা হয়। একজন হাউজ সার্জন ১০০০ নবজাতক শিশুর গড় ওজন নেন এবং ৫ পাউন্ড ১৩ আউন্স ওজন পাওয়া যায়।[২০৫] এটি একটি শিশুর স্বাভাবিক ওজন।

ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারি ও গাইনোকোলজি বিভাগ

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই বিভাগটি চালু হয় এবং এর শয্যা সংখ্যা ছিল ৩০টি (অবসটেট্রিক্যাল ১৫টি ও গাইনোকোলজিক্যাল ১৫টি)।[২০৬] নারী চিকিৎসায় হুমায়রা সাঈদ যোগদান করার পর এই বিভাগটি গঠিত হয়। এই বিভাগে একজন অধ্যাপক, একজন রেসিডেন্ট সার্জন নারী চিকিৎসক জে.বি. কাজী ও হাউজ সার্জন মঈন উদ্দিন আহমেদ এবং ডা. নওয়াব আলী আহমেদকে নিয়ে বিভাগটি পরিচালিত হয়। [*পরিশিষ্ট দেখুন*-১৯] পাঠদানের ক্ষেত্রে অবসটেট্রিকসের ওপর চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ২০টি লেকচার দেওয়া হয়। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে ৪ জন শিক্ষার্থীর একটি ব্যাচকে ৩ মাসের জন্য ওয়ার্ডে রাখা হয়। অবসটেট্রিক্যাল ও গাইনোকোলজিক্যাল রোগের ওপর ওয়ার্ডে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া রোগীর সংখ্যা [২০৭]

মোট চিকিৎসা করা রোগীর সংখ্যা	৪৬০ জন	
মোট আরোগ্য লাভ করা রোগীর সংখ্যা	২৮৮ জন	(৬২.৬%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৮৬ জন	(১৮.৭%)
মোট ঝুঁকি থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৪৬ জন	(১০%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত (অন্যভাবে)	২৫ জন	(৫.৫%)
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	১৫ জন (মৃত্যুহার ৩.২%, অপারেশনে মৃত্যু হার ১.৯%)	
মোট স্বাভাবিক সন্তান প্রসবের সংখ্যা	১৪৬ জন	
মোট যন্ত্রের দ্বারা সন্তান প্রসবের সংখ্যা	৭ জন	
মোট সিজারের সংখ্যা	৪ জন	
মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা	১০৮ জন (বড় ৪৮, ছোট ৬০)	

এ সময় নিম্নের গুরুতর রোগ পর্যবেক্ষণ করা হয়,[২০৮]
১. A case of Accidental Haemorrhage
২. Two cases of Ruptured Ectopic Pregnancy.

অপরদিকে ১৯৫০-৫১ সালে ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারি ও গাইনোকোলজি বিভাগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অধ্যাপক, রেসিডেন্ট সার্জন, হাউজ সার্জন পূর্বের একই ব্যক্তি হলেও রেজিস্ট্রার হিসেবে ডাক্তার মঈনউদ্দিন আহমেদ এম.বি. এবং রেসিডেন্ট সার্জন হিসেবে আরেকজন তথা ডাক্তার এইচ. মালিক, এম.বি.বি.এস. যোগদান করেন। পাঠদানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ষের শিক্ষার্থীদেরকে ৫০টি তাত্ত্বিক লেকচার প্রদান করা হয়। প্রায় ১০ জন শিক্ষার্থীকে তিন মাসের জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে রাখা হয়। তাদের ব্যবহারিক শিক্ষার পাশাপাশি ও.পি.ডি'র ওপর ক্লিনিক দেওয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া বিভিন্ন রোগীর সংখ্যা,[২০৯]

মোট চিকিৎসা করা রোগীর সংখ্যা	৮৫৬ জন	
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৫৮৯ জন	(৬৮.৮%)
মোট ডি.ও.আর.বি. প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৩৮ জন	(৪.৪%)
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	২৩ জন	(মৃত্যুহার ২.৬ %)
মোট অপারেশনের সংখ্যা	২২৫ জন	
মোট অপারেশনের মৃত্যু হার		১.৮%
মোট প্রসব সংখ্যা	৪০১ জন	
মোট যন্ত্রের দ্বারা প্রসব সংখ্যা	১৮ জন	
মোট সিজারের সংখ্যা	৮ জন	

এ সময় বেশ কয়েকজন ফেটে যাওয়া একটোপিক রোগী ছিল, যা অপারেশন করে নিরাময় করা হয়। গর্ভাবস্থায় জরায়ু ফেটে যাওয়ার মতো রোগী পাওয়া যায় এবং এর চিকিৎসার জন্য একটি সাবটাটাল হিস্টেরেক্টোমি করা হয় এবং রোগী আরোগ্য লাভ করে।

পাঠদানের ক্ষেত্রে ১৯৫১-৫২ সালের মিডওয়াইফারি ও গাইনোকোলজি বিভাগের পদ্ধতির মতো ছিল। এ সময় হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা পূর্বের বছরের চেয়ে বেশি ছিল। নিম্নের তালিকা থেকে হাসপাতালে রোগীদের সংখ্যা পাওয়া যায়,[২১০]

মোট চিকিৎসা করা রোগীর সংখ্যা	৯৬৮ জন	
মোট আরোগ্য লাভ করা রোগীর সংখ্যা	৫৯০ জন	(৬০.৯%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	২০৮ জন	(২০.৬%)
মোট ডি. ও. আর. বি. প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৮৫ জন	(৮.৮)
মোট অব্যহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা (অন্যভাবে)	৬০ জন	(৬.৯%)
মোট মৃত্যুর সংখ্যা	২৫ জন	(মৃত্যু হার ২.৮%)
অপারেশনের মৃত্যু হার		১.৫%
মোট অপারেশনের সংখ্যা	২৬২ জন (বড় ১০৮, ছোট ১৫৪)	
মোট সন্তান প্রসবের সংখ্যা	৫৯০ জন	
যন্ত্রের দ্বারা মোট সন্তান প্রসবের সংখ্যা	২৮ জন	
মোট সিজারের সংখ্যা	১৩ জন	

উপরিউল্লিখিত মিডওয়াইফারি ও গাইনোকলজি বিভাগ এবং ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারি বিভাগের চিকিৎসা প্রাপ্ত মোট রোগীদের ৬০-৭০% আরোগ্য লাভ করে, মৃত্যু হয় ২-৩% এবং অস্ত্রোপচারে মৃত্যুর হার ১%। সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় বিষয়টি এই যে, সে সময় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সন্তান প্রসবের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। যন্ত্র এবং সিজারের মাধ্যমে সন্তান জন্মদানের সংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম, যা উল্লিখিত বিভাগের সিজারের সংখ্যা থেকে বিষয়টি বোঝা যায়। চিকিৎসকদের মতে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সন্তান জন্মদান সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি।

সে সময় বিভিন্ন ধরনের রোগী ভর্তি হলেও বন্ধ্যাত্বতা, ক্রনিকসানাইটিস একলামসিয়া ও গর্ভাবস্থার রক্তস্বল্পতা রোগী বৃদ্ধি পায়।[২১১] এ ছাড়া নিম্নের নারীদের জটিল রোগ পর্যবেক্ষণ করা হয়,[২১২]

1. A case of 'Pseudo- hermaphrodity' in a young girl of 16
2. A case of 'Acute inversion of Uterus'
3. A case of 'Physometra following attempt on criminal abortion'.

এভাবে দেশ বিভাগের পর থেকে এই বিভাগের অগ্রগতি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল কিছু শয্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করে এবং কাউন্সিলের প্রস্তাব অনুযায়ী শয্যা বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৫১-৫২ সালের বার্ষিক বিবরণীতে যা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া গর্ভাবস্থার নারীদের নানা জটিল রোগের সফল চিকিৎসা করা হয়। এর ওপর বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ হয়। ১৯৬১-৬২ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে এই বিভাগসহ মেডিকেল ও সার্জারি বিভাগের অগ্রগতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে,

> The Departments of Medicine, Surgery and Midwifery have gained considerably with the expansion and progress of the Hospital. Their contribution in the field of research has been progressing satisfactorily. The use of radio isotopes in the diagnosis of diseases of the thyroid etc. has been undertaken in the hospital. With the installation of latest equipment's in the treatment of cancer, the facilities afforded to the students are much more now than it was before.[২১৩]

অফথালমোলজি বিভাগ

১৯৪৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি এই বিভাগটির যাত্রা শুরু হয়।[২১৪] এই বিভাগে একজন অধ্যাপক, একজন রেসিডেন্ট সার্জন, একজন হাউস সার্জন নিয়ে গঠিত হয় *[পরিশিষ্ট দেখুন-১৯]*। প্রথম দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগে নিয়োগের জন্য দুইজন সিনিয়র হাউস সার্জনকে নির্বাচিত করা হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রাক্তন হাউজ সার্জন ডাক্তার আবদুর রউফ, এম.সি. এইচ. কলকাতা (১৯-৪-১৯৪৫ থেকে ১৪-৮-১৯৪৭), বি.এম.এ. (উঁচু)। দেশ বিভাগের পর তাঁকে ১৫/৮/১৯৪৭ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে রেসিডেন্ট সার্জন পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। সার্জন পদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং উপযুক্ত কোনো সিনিয়র অফিসার ছিল না। তাঁর চাকুরিকালীন সময় ছিল ২০-৪-১৯৪২ থেকে ৩০-৪-১৯৪৯ তথা ৭ বছর ১১ দিন। অপরদিকে ডাক্তার শামসুদ্দিন আহমেদ (প্রাক্তন সার্জন) কে হাউজ সার্জন পদে ১৫/৮/১৯৪৭ তারিখে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁর চাকুরিকালীন সময় ছিল ২০.৪.১৯৪২ থেকে ৩০.৪.১৯৪৯ তথা ৭ বছর ১১ দিন। পরবর্তী সময়ে ডাক্তার আব্দুর রউফকে সিলেটের সিভিল হাসপাতালে বদলি করা হলে তাঁর স্থলে ডাক্তার শামসুদ্দিন আহমেদকে রেসিডেন্ট সার্জন হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৫০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ই. পি.এম.এস. (উঁচু) স্বল্পতার কারণে রেজিস্ট্রার পদ ফাঁকা ছিল। তখন পর্যাপ্ত অফিসার না পাওয়ায় এই পদ পূরণ করা হয়নি।[২১৫] ১৯৪৯-৫০ সালে এই বিষয়ের ওপর পাঠদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অধ্যাপক ১৬টি লেকচার প্রদান করেন। চক্ষু বিভাগে ক্লিনিক্যাল নির্দেশনাবলীর জন্য অংশগ্রহণকৃত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ২৬ জন এবং তাদেরকে ৪টি ব্যাচে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি ব্যাচ তিন মাসের জন্য অংশগ্রহণ করে। এ সময় সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. এর শিক্ষার্থী ছিল না। অফথালমিক সার্জারির অধ্যাপক এবং চক্ষু বিভাগের রেসিডেন্ট সার্জন দ্বারা পর্যায়ক্রমে ক্লিনিক্যাল লেকচার এবং ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হয়। রেসিডেন্ট সার্জন প্রতিসরণ এবং ডার্ক রুম পরীক্ষার পদ্ধতির ওপর ডেমনস্ট্রেশন করে দেখান। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বহির্রোগী বিভাগের দেওয়ালে গুরুতর চক্ষু রোগের ১২টি ডায়াগ্রাম আঁকা হয়। হাসপাতালের মোট অভ্যন্তরীণ শয্যা ৩৮টি এবং কেবিন ছিল ২টি। মোট রোগীর সংখ্যা ১০,৯৬৮ জন এবং হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ছিল ৪৪১ জন।[২১৬]

হাসপাতালের অন্ত বিভাগে প্রায় ৩৫৮টি অস্ত্রোপচার করা হয়। এসব অপারেশনের মধ্যে লেন্সের ইন্ট্রাক্যাপসুলার এবং এক্সট্রাক্যাপসুলার এক্সট্রাকশন ট্রিফিনিং এনোক্লিয়েশন, এডিসিরেশন লিডস এর ওপর প্লাস্টিক অস্ত্রোপচার ইত্যাদি করা হয় এবং কিছু জটিল রোগের ওপর পর্যবেক্ষণ করা হয়।[২১৭] এ ছাড়া অধ্যাপক রেফাতউল্লাহ ১৯৪৯ সালের ১৩ জুলাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় 'A report on the Observations on Trachoma' শিরোনামে একটি গবেষণা প্রবন্ধ জমা দেন।

অপরদিকে ১৯৫০-৫১ সালে দেখা যায় যে, পাঠদানের ক্ষেত্রে এ সময় পূর্বের চেয়ে বেশি লেকচার তথা ২০টি লেকচার প্রদান করা হয়। ক্লিনিক্যাল নির্দেশনাবলীর জন্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ৫৪ জন এবং তাদেরকে ১০টি ব্যাচে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ব্যাচকে অন্যান্য বিভাগের মতো তিন মাসের জন্য ওয়ার্ডে কাজ করার জন্য অংশগ্রহণে করে। এ সময় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য চক্ষু রোগের ১০টি ডায়াগ্রাম আঁকা হয় এবং ও.পি.ডি.'র দেওয়ালে এগুলো ঝুলিয়ে রাখা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া এই বিভাগের রোগীর সংখ্যা নিম্নের তালিকায় পাওয়া যায়,[২১৮]

এ সময় মোট রোগীর সংখ্যা	২,২৯১ জন
হাসপতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা	৭৬০ জন
অপারেশনের সংখ্যা অন্তবিভাগ	৫৯০টি
বর্হি	৩০৫টি
মোট	৮৯৫টি

এ সময় নিম্নের ২টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ গর্ভনর হাউজ ও ডক্টর ক্লাবে উপস্থাপন করা হয় এবং রেডিওতে চক্ষু রোগের ওপর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।[২১৯] উপরি-উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয় যে, বিভাগটির অগ্রগতি ছিল সন্তোষজনক। শিক্ষার্থীদের দেওয়া শিক্ষাদান, রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থা, যা প্রমাণ করে। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির সদস্যগণ যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করেন, তখন তারা এই বিভাগ সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করে। পরিদর্শন কমিটি উল্লেখ করে যে,

> There is one unit in-charge of the professor and has 30 beds. The section has got an operation theater of its own which is fairly well equipped. The department is adequate.[২২০]

১৯৫১-৫২ সালে দেখা যায় যে, এই বিভাগে অধ্যাপক ও রেসিডেন্ট সার্জন ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫০-৫১ সালের একই ব্যক্তি ছিলেন। এ সময় সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ক্যাপ্টেন এস. এ. লস্কর, (এম. বি., ডি.টি.এম., ডি.ও.এম.এস. (লন্ডন), আই.এম.এস. (অবসর) যোগদান করেন এবং হাউস স্টাফ পদে ৩ জন ডাক্তার ছিলেন। [*পরিশিষ্ট দেখুন*-২২]

এ সময় ৭৭ জন শিক্ষার্থীদের ১৭টি লেকচার দেওয়া হয় এবং তাদেরকে ১১টি ব্যাচে বিভক্ত করা হয়। এ সময় সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সের শিক্ষার্থীদেরকে ওয়ার্ডের দায়িত্ব দেওয়া হয়। হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা (৩৮টি) ও কেবিন (২টি) পূর্বের মতই ছিল। হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়া রোগীর সংখ্যা ২৭,৪৮৮ জন, ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৮৩৬ জন। এ সময় মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১২৭০টি। এর মধ্যে অন্ত অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ৭৯৪টি এবং বহির্বিভাগ অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ৪৭৬টি।[২২১] চোখের কিছু জটিল রোগের রোগীদের বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয় এবং কিছু রোগী চিকিৎসা পেয়ে সুস্থ হয়ে যায় আবার কিছু রোগীর রোগ নিরাময় হয়নি।[২২২]

বিভাগের অধ্যাপক রেফাতউল্লাহ নিম্নের দুইটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের ১টি ঢাকা মেডিকেল কলেজের বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে উপস্থাপন করেন এবং অন্যটি *দ্য প্রসেডিংস অব দ্য থার্ড পাকিস্তান সায়েন্টিফিক কনফারেন্স* এ প্রকাশিত হয়,[২২৩]

১. `Eye and war injuries'
২. `Mistakes in-diagnosis and treatment of cataract'

উপরি-উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, অধ্যাপক রেফাতউল্লাহর অধীনে বিভাগটি অগ্রগতি হয়, তবে কেউ কেউ মন্তব্য করেন, এটা কেবলমাত্র বিভাগকে সুবিন্যস্ত রাখার চেষ্টা । *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ* গ্রন্থে আহমদ রফিক উল্লেখ করেন যে, ‘ঢাল তলোয়ারহীন অবস্থায় অনেকেই নিজ নিজ বিভাগ সুবিন্যস্ত রাখতে চেষ্টা করেছেন, যেমন চক্ষু বিভাগের প্রধান ডা. মোহাম্মদ রেফাতউল্লাহ, দন্ত বিভাগের ক্যাপ্টেন সি. এম. বেগ এবং ব্লাড ব্যাংক বিভাগের প্রধান ডা. আফতাবউদ্দিন আহমেদ। স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের চিরাচরিত অনীহা অতিক্রম করে বিভাগগুলোকে আরো কিছুদূর পর্যন্ত গুছিয়ে তোলা হয়তো সম্ভব ছিল। কিন্তু গতানুগতিক কাজের বাইরে এরা পা রাখছিল’।[২২৪] তাছাড়া ১৯৫০ সালে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির সদস্যগণ কলেজ পরিদর্শনকালে এই বিভাগের অধ্যাপকের শিক্ষকতার তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না বলে অভিযোগ করেন এবং একটি রিফ্রেশার কোর্স করার প্রস্তাব দেন। পরবর্তীতে তিনি উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হন। মূলত সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজের শুরুর দিকে

পর্যাপ্ত উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যায়নি। প্রথম দিকে ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল পরবর্তীতে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল কলেজের গুণগতমান বজায় রাখার ব্যাপারে সবসময় সচেষ্ট ছিল। এই ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি। ফলে কোনো শিক্ষকের পর্যাপ্ত উচ্চ প্রশিক্ষণ বা উচ্চতর ডিগ্রি না থাকলে শিক্ষাদানে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকার জন্য শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের উচ্চশিক্ষা না থাকলেও যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীতে উক্ত কয়েকজন উচ্চ শিক্ষা নেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৫১ সালে পূর্ববাংলার সার্জন জেনারেল জানান,

> Professor Anwar Ali has been selected to visit U.S.A. this year on Truman Fellowship. Owing to the death of his father, Professor Refatuallah was unable to go but his name will be included in the next fellowship programme.[২২৫]

চক্ষু বিভাগের অধ্যাপক রেফাতউল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও এই বিভাগের চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হয় তা অস্বীকার করা যায় না। উপরি-উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আরো বোঝা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে চক্ষু রোগের প্রকোপ ছিল বেশি। রোগীদের সংখ্যা থেকে তা অনুমান করা যায়। ১৯৬০ এর দশকে চক্ষু রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান মেডিকেল সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে ডা. এম. এইচ. রহমান চক্ষুরোগের প্রকোপ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পাঁচ বছরের কম বয়স্ক প্রায় ৫০,০০০ শিশু 'জেরোপথালমিয়া' নামক চক্ষু রোগে ভুগছে। ভিটামিন 'এ' এর অভাব থেকে এ রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এই রোগে শতকরা ২৫ জন মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং শতকরা ২৫ জন সম্পূর্ণ ও স্থায়ীভাবে অন্ধ হয়ে যায়।[২২৬] তিনি এই রোগের যে হার উল্লেখ করেন, তা ছিল সে সময়ের জন্য উদ্বেগজনক। সে সময় ভিটামিন 'এ' যুক্ত পুষ্টিকর খাবার যেমন, শাকসবজী, ফলমূল, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি, মাখন প্রভৃতি সংগ্রহ করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সুজলা-সুফলা হলেও দেশবাসী ছিল অত্যন্ত গরিব। দারিদ্রতাই সকল সমস্যার মূলে ছিল। তাছাড়া ইতিপূর্বে ১৯৪৯ সালের দুর্ভিক্ষ হওয়ায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা জনসাধারণের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। পুষ্টিকর খাদ্যের কথা তারা চিন্তাও করতে পারত না। জনস্বাস্থ্যের অবনতি রোধ করার জন্য দরকার ছিল আর্থিক অবস্থার উন্নতি। অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ তার চিকিৎসা ব্যবস্থার অগ্রগতি ও মান উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। *ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বার্ষিক বিবরণী* থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তা জানা যায়। এই উন্নয়ন ও বিকাশ পরবর্তী পর্যায়ে চলমান থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনিক থেকে আরো আধুনিক হতে থাকে। তবে *ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বার্ষিক বিবরণী* ১৯৪৬ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পাওয়া গেলেও ১৯৬০ এর দশকের কোনো বার্ষিক বিবরণী পাওয়া যায়নি। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকের বার্ষিক বিবরণী থেকে এই বিভাগসহ কলেজ ও হাসপাতালের অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৬৭-৬৮ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে এই বিভাগ সম্পর্কে বলা হয়,

> The Department of Opthalmology had the distinction of undertaking successfully two unusual cases of retinal detachment by application of diathermy.[২২৭]

ই.এন.টি. বিভাগ

১৯৪৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি এই বিভাগটি চালু হয়।[২২৮] অধ্যাপক বছরে একবার তাত্ত্বিক লেকচার দেন। ওয়ার্ড, বহির্রোগী বিভাগ এবং অপারেশন থিয়েটারে শিক্ষার্থীরা ক্লিনিক্যাল শিক্ষা নেয়। ১৯৫০ সালের ১০ জুলাই পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটি এই বিভাগের অগ্রগতি সম্পর্কে উল্লেখ করে যে,

> It is in-charge of one unit under the professor. There are about 30 beds in this section. The number of variety of cases operated are fair. This department is adequate.[২২৯]

এই অগ্রগতির ধারা পরবর্তী সময়ে বজায় থাকে। ১৯৬৭-৬৮ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে এই বিভাগের অগ্রগতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় যে,

> In the Department of Ear, Nose and Throat diseases a steady progress has been made with its research project of Foreign body in the Genio Glossus.[২৩০]

চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগ

১৯৪৯ সালের ১১ জুলাই এই বিভাগটি বহির্রোগী বিভাগের সাথে সংযুক্ত করে চালু হয়।[২৩১] এই বিভাগ বহির্রোগী বিভাগে দুপুরের সময় কাজ করে এবং এখানে শিক্ষার্থীদের দায়িত্বে রাখা হয়। ফলে যৌন রোগের বিভিন্ন দিক এবং সাধারণ ও গুরুতর চর্ম রোগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। বিভাগটি মেডিসিনের সহকারী অধ্যাপকের অধীনে ছিল। ১৯৫০ সালে এই বিভাগের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না বলে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটি উল্লেখ করে। পরবর্তীতে এই বিভাগের সন্তোষজনক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়।

দন্ত বিভাগ

১৯৪৯ সালের ১৫ নভেম্বর এই বিভাগটি সংশ্লিষ্ট বহির্রোগী বিভাগের সাথে চালু হয় [২৩২] এবং একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ সার্জনের অধীনে ছিল। তিনি এই বিভাগে প্রতিদিন সকালে বহির্রোগী বিভাগে কাজ করেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন সেখানে দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠানো হয়। ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের দন্তরোগের শিক্ষা লাভ করে। ১৯৫০ সালে বিভাগটির রোগীর সংখ্যা ছিল ২০ জন। ১৯৬০ এর দশকে ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্রোগী বিভাগের ২য় তলায় অবস্থিত ছিল। সে সময় এটা সার্জারির অধ্যাপক প্রিন্সিপাল মো. আসির উদ্দিন (এফ.আর.সি.এস., ঢাকা মেডিকেল কলেজ) এর দ্বারা আলাদাভাবে পরিচালিত হয়। তিনি সার্জারির অধ্যাপক হিসেবে নিজস্ব দায়িত্ব ছাড়াও উক্ত পদের দায়িত্ব পালন করেন। এই কলেজে এক ডজনেরও বেশি শিক্ষার্থী ছিল এবং ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে কয়েকজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.ডি.এস. ডিগ্রির জন্য প্রথম পেশাদার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নের তালিকায় পাওয়া যায়,[২৩৩]

প্রথম বি.ডি.এস. পরীক্ষা ১৯৬২	৫জন	(৮৩%)
প্রথম বি.ডি.এস. পরীক্ষা জুন ১৯৬৩	২জন	(১০০%)
দ্বিতীয় বি.ডি.এস. পরীক্ষা জুন ১৯৬৩	৫ জন	(১০০%)

১৯৬৩-৬৪ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণীতে এই কলেজ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়,

> With the completion of the construction work of the college premises on the 2nd floor of the Dacca Medical College Hospital Out-Patients Department, the college was shifted there and now it is an independent institution.[২৩৪]

রেডিওলজি ও রেডিও থেরাপেটিক বিভাগ (এক্স-রে ও ইলেকট্রথেরাপেটিক বিভাগ)

১৯৫০ সালের ২২ এপ্রিল একজন উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন বিদেশি রেডিওলজিস্ট ডা. হাবিল ই. ফরফোটা (Dr. Med. Habil E.Forfota) কে নিয়ে এই বিভাগ চালু হয়। প্রথম দিকে এই বিভাগ এক্স-রে বিভাগ নামে পরিচিত ছিল। তিনি বছরে একবার কলেজের সিনিয়র শিক্ষার্থীদেরকে রেডিওগ্রাফির ওপর লেকচার দিতেন এবং এক্স-রের ছবি প্রদর্শন করেন। তাছাড়া ক্লিনিক্যাল বিভাগের বিভিন্ন অধ্যাপকগণ এক্স-রের ছবি শিক্ষার্থীদের কাছে প্রদর্শন করেন। এই বিভাগে সব ধরনের সাধারণ রেডিওগ্রাফির কাজ হলেও অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ও ভেন্টিকুলোগ্রাফির কাজ তখনো শুরু হয়নি। অপরদিকে ১৯৪৮ সালে বড় থেরাপি যন্ত্র কেনা হলেও কিছু ত্রুটি থাকার কারণে চালু করা হয়নি। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটি এই বিভাগ সম্পর্কে উল্লেখ করে যে বিভাগটির মাত্র যাত্রা শুরু হয়েছে। এটি প্রধান ভবনের নীচের তলায় অবস্থিত এবং এই বিভাগে ডিপ এক্স-রে মেশিন, ডায়াগনস্টিক মেশিন, ইনফ্রা রেড মেশিন, শর্ট ওয়েব মেশিন, পেনটোসটেট ও অন্যান্য সরঞ্জাম ছিল।[২৩৫]

এ সময় বিভাগের একজন অফিসার ৬ মাসের উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ইংল্যান্ড যান। ফলে একজন জুনিয়র অফিসার দায়িত্ব পালন করেন, যিনি সাময়িকভাবে কিছু যন্ত্রপাতি পরিচালনা করেন। পরিদর্শন কমিটির সদস্যগণ লক্ষ্য করেন যে, হাসপাতালে এক্স-রের কাজটি পোর্টবেল মেশিন দ্বারা পরিচালিত হয়, যা দ্বারা অপারেশন থিয়েটার পরিচালিত হয় এবং এটি ফার্মাকোলজির অধ্যাপকের অধীনে ছিল। পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল কমিটির সদস্যগণ বিভাগের সমস্যা চিহ্নিত করে প্রস্তাব করেন যে,

> There has been no instruction in this section due to inadequacy of equipment and staff. This very important section of the hospital is practically non-existant and attempt should be made to bring it up-to-date at the earliest.[২৩৬]

১৯৫১-৫২ সালে এই বিভাগে স্টাফ সংখ্যা ছিল ৫ জন (রেডিওলজিস্টসহ)। সহকারী রেডিওলজিস্ট ডাক্তার মো. ইব্রাহীম, এম.বি.(কলকাতা), এম. আর. সি. পি. (লন্ডন), সহকারী সার্জন, ডাক্তার এ. কে. এম. তাহেরুল ইসলাম। অন্যান্য কর্মচারীর মধ্যে টেকনিশিয়ান ১জন ও সহকারী টেকনিশিয়ান ১ জন। এ সময় মোট এক্স-রে পরীক্ষার সংখ্যা ৫,৬৫২টি। নিম্নের তালিকায় এক্স-রের বিবরণ পাওয়া যায়,[২৩৭]

হাড়	২,৬৭৭টি
হাড় ভাঙ্গা	১,০৬৭টি
অস্থির প্রদাহ	৩১০টি
অন্যান্য	১,৪৩৭টি
যক্ষ্মা টিবি	৪৮৫
অন্যান্য	১৯২
বেরিয়াম মিল	১,২৬৫
পেলোগ্রাফি	৬২
বেরিয়াম এনিমা	৬৭
স্ক্রিনিং	৪১২
ব্রোঞ্চগ্রাফি	৭
চলেসিসটোগ্রাফি	৬৭
অন্যান্য পরীক্ষা	৭৬
দাঁত	৫৬

রেডিওলজি বিভাগ ১৯৫০ সালের ২২ এপ্রিল চালু হলেও ইলেকট্রথেরাপেটিক বা রেডিওথেরাপি বিভাগের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫০ সালের ৯ অক্টোবর। বিভাগটি একজন ইলেক্ট্রোথেরাপিস্টের অধীনে ছিল। যিনি রোগীদের মধ্যে ডায়াথেরাপি, আল্ট্রাভায়ালেট, ইনফ্রারেডরে এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রয়োগ করে ডেমনস্ট্রেশন

করে দেখান এবং শিক্ষার্থীরা এসব বিষয়ের ওপর শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৬০ এর দশকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম দ্বারা বিভাগটি সজ্জিত ছিল। ১৯৬২-৬৩ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে উল্লেখ করা হয়,

> The Blood Transfusion Service and the Radio-isotope Centre, the Radiotherapy Department and the Department of Physical Medicine are now better equipped and have been rendering invaluable help in the treatment of cancer, rehabilitation of the physically handicapped.[২৩৮]

১৯৬৪-৬৫ সালে রেডিওলজি ও রেডিও থেরাপি এবং অপারেশন থিয়েটারের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি কেনা হয়। ১৯৬৬-৬৭ সালে উল্লেখ করা হয় যে,

> The new blocks for Radiology and Radiotherapy Departments are now available for occupation by the Departments concerned and it is hoped that not only better facilities will be provided for the public, but also for students and staff for study.[২৩৯]

সংক্রামক রোগ বিভাগ

শুরুর দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে কোনো সংক্রামক রোগ ওয়ার্ড ছিল না। তাই শিক্ষার্থীদের ব্যাচগুলিকে বছরে দুই সপ্তাহের জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালে সংক্রামক রোগের ওয়ার্ডে পাঠানো হতো। ওয়ার্ডের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিতেন, কখনও কখনও মেডিসিনের অধ্যাপক অথবা ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক শিক্ষার্থীদের সংক্রামক রোগের কারণ হাতেকলমে দেখানোর জন্য ওয়ার্ডে নিয়ে যেতেন। পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে এই বিভাগ চালু হয়।

অ্যানাসথিসিওলজি

চারজন অ্যানাসথিসিস্টের অনুমোদন থাকলেও মাত্র দুইজনকে নিয়োগ করা হয়। এর মধ্যে একজন কর্মকর্তা ইতিমধ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ইংল্যান্ডে চলে যায়। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ চারজন অ্যানাসথিসিস্টের পরিপূরক এই বিভাগকে পর্যাপ্ত বলে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটি বিবেচনা করে। ১৯৪৬-৫২ সালের *ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বার্ষিক বিবরণী* থেকে জানা যায় যে, ১৯৫১ সালে একজন অ্যানাসথিসিয়ার প্রভাষক নিয়োগ করা হয়। তিনি প্রতি বছর ৫ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ের ওপর ৫টি লেকচার প্রদান করেন এবং অপারেশন থিয়েটারে অস্ত্রোপচার অ্যানাসথিসিয়ার প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর সার্জিক্যাল সাইডে ক্লিনিক্যাল শিক্ষাদান করেন। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদেরকে রোগীদের ওপর অ্যানাসথিসিয়া প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক শিক্ষার্থী ছাত্রজীবন থেকে অ্যানাসথিসিয়া পরিচালনার সুযোগ পায়।[২৪০]

উপরি-উক্ত বিভাগ ছাড়াও ১৯৪৯ সালের ৮ জুন কার্ডিওলজি বিভাগ চালু হয়। ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বক্ষব্যাধি (চেস্ট) বিভাগ খোলা হয়। ১৯৫২ সালের ২১ জানুয়ারি সাইকিয়াট্রিক (Psychiatric) বিভাগ বহির্রোগী বিভাগে খোলা হয়।[২৪১]

ক্লিনিক্যাল বিভাগগুলো হাসপাতালের অপরিহার্য অংশ। এর অগ্রগতি ও বিকাশ ছিল উল্লিখিত বিভাগের অগ্রগতি ও বিকাশ তথা ঢাকা মেডিকেল কলেজের অগ্রগতি। শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, ক্যানসারের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা এবং জরুরি সেবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। উল্লিখিত বিভাগের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি ও

উন্নতি হয়। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে এর আগে কখনও দুর্লভ অস্ত্রোপচার করা হয়নি কিন্তু আলোচ্য সময়ে এগুলো সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। এই অস্ত্রোপচারগুলো টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সামনে প্রদর্শন করা হয়, যা ছিল ক্লিনিক্যাল বিভাগের কাজের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। পোস্ট অপারেটিভ কক্ষের সাথে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অপারেশন থিয়েটার থেকে অনেক দূরে বসে শিক্ষার্থী ও ডাক্তারদের অপারেশন পর্যবেক্ষণ করার ঘটনা পাকিস্তানের কোনো হাসপাতালে এর আগে কখনও হয়নি। উপরন্তু শিক্ষার্থীদেরকে ওয়ার্ডের দায়িত্ব অর্পণ, ক্লিনিক্যাল শিক্ষাদান ও চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বেশিরভাগ সময় এই বিভাগ ব্যস্ত থাকে। বছরের পর বছর শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান ও ক্লিনিক্যাল কাজের জন্য শয্যা বরাদ্দের ক্ষেত্রে একটি সমস্যাও ছিল। শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও চাহিদা অনুযায়ী হাসপাতালে পর্যাপ্ত শয্যা পাওয়া যেত না। শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত শয্যার প্রয়োজন হয়, কারণ ক্লিনিক্যাল অনুশীলনের জন্য দরকার। অপরদিকে ক্লিনিক্যাল বিভাগগুলো দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গবেষণার ক্ষেত্রে অবদান রাখে, উপরিউল্লিখিত বিভাগের গবেষণার কাজ দেখে তা বোঝা যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রত্যেক মেডিকেল প্রতিষ্ঠানকে গবেষণার ক্ষেত্রে অবদান রাখা জরুরি। সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজের সব শিক্ষক তাদের বিষয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যোগ্য ও অভিজ্ঞ ছিলেন। দেশ বিভাগের সময় পর্যন্ত তাদের গবেষণামূলক কাজ পরিচালনা করার মতো যথেষ্ট সুযোগ ছিল না। এটা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোনো অভিযোগ ছিল না বরং এটা অবিভক্ত বাংলার সাধারণ অভিযোগ।[২৪২] এ সময় কোনো কোনো শিক্ষকের গবেষণার প্রতি আগ্রহ ছিল কিন্তু তাঁরা সুযোগ পায়নি। বিভাগকে সংগঠিত করতে ও পাঠদানের বিষয়ে এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হতো যে, গবেষণার কাজ পরিচালনার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন ছিল, তা খুবই অল্প সময়। তারপরও তাদের প্রত্যেকেই তাদের বিষয়ে কিছু গবেষণা করার চেষ্টা করেন। ফলে সে সময় তাঁরা বেশ কিছু ক্লিনিক্যাল গবেষণা করেন এবং এর ফলাফল ক্লিনিক্যাল মিটিং অথবা বিভিন্ন মেডিকেল জার্নাল ও ম্যাগাজিনে প্রকাশ করা হয়। তাদের এই গবেষণা পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান বরাবরই আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে পিছিয়ে ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উঁচুমানের আধুনিক পাশ্চত্য চিকিৎসাশিক্ষা প্রচলিত হলে, তা এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করেনি, বরং তারা এই শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও ক্লাশ উপস্থিতি দেখে তা বোঝা যায়। তাছাড়া এই কলেজে শিক্ষার্থীরা পাঠদানের অংশ হিসেবে ক্লিনিক্যাল বিভিন্ন বিভাগে রোগীদের পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা সেবা করার সুযোগ পান। যে কোনো হাসপাতালের জন্য এই নবীন চিকিৎসক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূল চিকিৎসকের সংখ্যা কম থাকলেও এসব শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণে থাকা রোগীরা যথাযথ চিকিৎসা পায়। প্রতিবছর এসব শিক্ষার্থী ক্লিনিক্যাল শিক্ষা পাওয়ার পাশাপাশি রোগী দেখার সুযোগ পান। একদিকে রোগীর সেবা দান ও পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রির অংশ হিসেবে পাঠ সম্পন্ন করেন, অন্যদিকে তারা ভবিষ্যৎ দক্ষ, যোগ্য, চিকিৎসক হয়ে ওঠেন। দেশের চিকিৎসকের ঘাটতি পূরণে যা সহায়তা করে। এসব শিক্ষার্থীদের সেবার মাধ্যমে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জনপ্রিয়তা সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। গবেষণার আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ বিশেষ করে প্রসবকালীন জটিলতা, বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার , অন্ধত্ব, কিডনিতে পাথর, লিভারে পানি, বিভিন্ন ধরনের টিউমার ইত্যাদির জটিল রোগের আধুনিক পদ্ধতির মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া শুরু হয়, যা উন্নত বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রচলিত ছিল। এই চিকিৎসা সেবা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক,

চিকিৎসক ও নবীন ছাত্রদের মাধ্যমে দেওয়া হয়। তারা সবসময় বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চিকিৎসাশিক্ষা ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ শুরুর দিকে স্নাতক পর্যায়ের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি প্রদান করলেও পরবর্তীতে ষাটের দশকে পোস্ট গ্রাজুয়েট বা স্নাতকোত্তর কোর্স চালু হয়, যা তৎকালীন সময়ের বিশেষ করে ১৯৬২-৬৩ সালের সিলেবাস [*পরিশিষ্ট দেখুন-২৮*] এ উল্লেখ রয়েছে। এ সময় বিভিন্ন বিষয়ের (D.C.T.D, D.T.M.H, D.C.P, D.C.H, D.D, D.L.O, D.M.R.D, D.M.R.T) ওপর ডিপ্লোমা কোর্স এবং অবসটেট্রিকসের ওপর মাস্টার্স কোর্স চালু হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালে উল্লিখিত ডিপ্লোমা কোর্স ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে সার্জারি এবং মেডিসিন এর ওপর যথাক্রমে মাস্টার্স কোর্স ও ডক্টর অব মেডিসিন কোর্স চালু হয়। পরবর্তীতে সত্তরের দশক থেকে তথা বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের সময়কালে এই মেডিকেল কলেজে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নতুন নতুন বিভাগ চালু হয় এবং পূর্ব উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও নতুন বিষয়ের ওপর এম.এস. ও এম.ডি. এফ.সি.পি.এস ডিগ্রি প্রদান করা হয়।[২৪৩] বর্তমান সময়ে ইউরোলজি, নিউরোসার্জারি, অর্থোপেডিক সার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারি, অটোলারিসোলজি জেনারেল সার্জারি, পেডিয়াট্রিক সার্জারি, অফথালমোলজি, গাইনোকোলজি ও অবসটেট্রিকস এর ওপর এম.এস. কোর্স, এনাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফার্মাকোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, রেডিওলজি ও ইমেজিং এর ওপর এম.ফিল (M.Phil) ডিগ্রি ও কমিউনিটি মেডিসিনের ওপর এম.পি.এইচ (MPH) ডিগ্রি প্রদান করে। অন্যদিকে ইনটার্নাল মেডিসিন (Ineternal Medicine), নিউরোলজি, নেফ্রোলজি, কার্ডিওলজি, রেডিওলজি এবং ইমেজিং, পেডিয়াট্রিক, প্যাথলজি, ডারমাটোলজি, অ্যানাসথিসিওলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, ফিজিক্যাল মেডিসিন, ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন, হিমোটোলজি, গ্যাসট্রোয়েন্ড্রোলজি ওপর ডক্টর অব মেডিসিন ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এসব কোর্স ও ডিগ্রি থেকে বোঝা যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যুগোপযোগী ও উন্নত সর্বাধুনিক চিকিৎসাশিক্ষা ও সেবা প্রদান করছে। তাই বর্তমান বাংলাদেশের কোনো মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যে চিকিৎসাশিক্ষা ও চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব নয়, তা ঢাকা মেডিকেল কলেজে দেওয়া সম্ভব। শুধুই তাই নয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাশিক্ষা ও সেবা বিশ্বমানসম্মত এবং বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসাশিক্ষা ও ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে চলছে, যা উপরিউল্লিখিত বিভাগের কার্যক্রম দেখে সহজেই বোঝা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. সুইজারল্যান্ডের চিকিৎসাবিষয়ক ইতিহাসবিদ হেনরি.ই. সিগরিস্ট (Henry E. Sigerist) উল্লেখ করেন যে, 'The history of medicine is both history and medicine. It is a historical discipline like the history of art or the history of Philosophy. It helps to give us a more complete picture of the history of civilization, because it is obviously not unimportant to know what diseases affected the people in the past, what they did not protect and restore their health and what thoughts guided their action. But the history of medicine is also medicine. By analyzing developments and trends it permits us to understand a situation more clearly and to act more intelligently.' দেখুন, Henry E. Sigerist, 'THE NEED FOR AN INSTITUTE OF THE HISTORY OF MEDICINE IN INDIA' Vol. 17, No. 2, *Bulletin of the History of the Medicine*, February 1945, P. 121.

২. জয়া চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হল, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ বিভাগ* (১৯৩২-১৯৪৭), অনুবাদ : আবু জাফর, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৬০।

৩. *Annual Report for* 1956-57, *University of Dacca*, Dacca University Press, Ramna, Dacca, p. 63.

৪. প্রাক্তন ছাত্র ডা. সাইদ হায়দার উল্লেখ করেন, 'ভারত বিভাগের প্রাকমুহূর্তে ডা. ডব্লিউ জে ভারজিন চলে যাওয়ায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ও হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদটি খালি পড়েছিল মাসখানেক এবং এক মাসের মধ্যেই কর্নেল (অব.) ই. জি মন্টেগোমারি সেই শূন্যস্থানে অধিষ্ঠিত হন। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক শীর্ষে তাঁর দায়িত্বপালনে মন্টেগোমারি দক্ষতার পরিচয় দেন এবং নতুন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখেন।' দেখুন, ডা. সাঈদ হায়দার, *পিছু ফিরে দেখা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর*, ১৯৯৬, পৃ. ২৪২-২৫৮ ।

৫. 'ডাক্তার এ. কে. এম. আব্দুল ওয়াহেদ, অধ্যাপক, মেডিসিন- ১৪.৮.১৯৪৭
ডাক্তার নওয়াব আলী, অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল মেডিসিন- ১৯.৮.১৯৪৭
মেজর এফ. ডব্লিউ. এলিনসন, অধ্যাপক, সার্জারি- ১৯.৮.১৯৪৭
কর্নেল জি. আহমেদ, অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল সার্জারি- ১৫.৮১৯৪৭
ডাক্তার আনোয়ার আলী, অধ্যাপক, প্যাথলজি- ১৫.৮.১৯৪৭
ডাক্তার আনসার উদ্দিন চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক, প্যাথলজি- ১৫.৮.১৯৪৭
ডাক্তার মো. মুস্তফা, ডেমনস্ট্রেটর অব প্যাথলজি- ৯.৯.১৯৪৭
ডাক্তার এস. এ. রহমান, অধ্যাপক, এনাটমি- ১৫.৮.১৯৪৭
জনাব মোতাহার উদ্দিন, ডেমনস্ট্রেটর অব কেমিস্ট্রি ১৫.৮.১৯৪৭
ডাক্তার এ. করিম, অধ্যাপক, ফিজিওলজি- ১৫.৮.১৯৪৭
ডাক্তার মীর এসুর আলী, সহকারী অধ্যাপক, প্যাথলজি- ১৫.৮.১৯৪৭
ডাক্তার এইচ. আহমেদ, অধ্যাপক, মিডওয়াইফারি- ১৩.৮.১৯৪৭
ডাক্তার আহমেদ সৈয়দ, ডেমনস্ট্রেটর অব এনাটমি- ১৮.৯.১৯৪৭
ডাক্তার মো. রহমত উল্লাহ্, অধ্যাপক, অফথালমিক সার্জারি- ২৭.৮.১৯৪৭', দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1946-1952, East Bengal Government Press, 1954, p. III.

৬. *ঐ*

৭. *ঐ*

৮. *B Proceedings*, B.No. 107, SL No. 81, List No. 109, *Medical and Local Self-Govt. Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1948, p. 2-3.

৯. *ঐ*

১০. *East Bengal Legislative Assembly*, Fourth Session 1949-50, 25th-28th February, 1st and 2nd March, East Bengal Government Press, Dacca, 1952 p.22.

১১. *ঐ*, pp. 22-23.

১২. মন্তব্য করেন, 'The medical department needs very care attention. We have got a good number of well qualified doctors with foreign training. The services of these medical men should be properly utilized by putting them in proper posts. There is provision for $7\frac{1}{2}$ lakhs for purchase of medical apparatus for the medical College and hospital. I think, a committee of medical experts should be formed to select necessary equipments that are in use at present.' দেখুন, *East Bengal Legislative Assembly*, Fourth Session 1949-50, 25th-28th February, 1st and 2nd March, East Bengal Government Press, Dacca, 1952 p.123.

১৩. *ঐ*, p. 128.

১৪. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1946-1952, p. V.

১৫. *ঐ*, pp. IV-V.

১৬. ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন* গুপ্ত, শিশুসাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১১৩।

১৭. *ঐ*, পৃ. ১১৪।

১৮. D. V. Subha Reddi, 'Centenary of First Dissection of India', *Journal of the Indian Medical Association*, Vol. V, No. 9, June 1936, p. 589.

১৯. ডা. শঙ্করকুমার নাথ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৪।

২০. *ঐ*, পৃ. ১১২।

২১. *ঐ*

২২. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1946-1952, p. VI-13.

২৩. *ঐ*, p. VII.

২৪. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital* from 1947-48 to 1948-49, pp. 13-70.

২৫. *ঐ*

২৬. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1947-48 p. 13.

২৭. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1948-49 p. 39.

২৮. *B. Proceedings*, B No. 128, List No. 109, SL. No. 102, 1953, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953, p. 17.

২৯. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1949-1950, p. 70.

৩০. *B.* Proceedings, B No. 107, SL No. 81, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1950, p. 3 .

৩১. *ঐ*

৩২. *ঐ*

৩৩. *B. Proceedings*, B No. 128, SL No. 102, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953, p. 1.

৩৪. *ঐ*, p. 1.

৩৫. 'That this council, fully endorsing the views expressed in the Report of the Visitors appointed by the Council to visit the Medical College, Dacca, are of the considered opinion that the courses of study and facilities for teaching provided at this Institution are not sufficient, and therefore, the Council decide not to recognize the M.B.B.S degree granted by the University of Dacca, nor do the Council recommend the inclusion of this degree in the 1 schedule to the Pakistan Medical Council Act'. দেখুন, *B Proceedings*, B No. 128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953 p. 50.

৩৬. কাউন্সিল আরো প্রকাশ করে যে, 'That the Council, however will re-consider this case after carrying out another inspection of the College on receipt of intimation from the University of Dacca to the effect that the defects pointed out by the visitors in their report have been removed and the recommendations given effect to'. দেখুন, *B Proceedings,* B No. 128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953 p. 50.

৩৭. *Annual Report for* 1950-51, *University of Dacca*, p. 21.

৩৮. *B Proceedings*, B No. 128, List No. 109, SL No. 107, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953, p. 54.

৩৯. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1950-1951, p. 106.

৪০. জারি গান,'ওগো দিন দয়াময়
বন্দি আল্লা, বন্দি খোদা আর এসকেলোপিয়াস
এ জারি গাইতে যেন মনে না পাই ত্রাস।
হেথায় হোথায় আছেন যারা বসে সারি সারি
এ দিয়া শোনেন সবে এনাটমির জারি।
গ্রে নামে এক সাহেব ছিল লন্ডন শহরে
লন্ডনে শহরে
এনাটমি লেখার তার কষে কলম ধরে

পাতার পরে পাতা লিখে পটল তুলিল,
এভাবে এনাটমি দেশেতে আসিল।
তাই দেশে দেশে ছড়াইল সাঙ্গপাঙ্গ চেলা–
রে এনাটমি কে বুঝিতে পারে তোমার খেলা।
আরে কষ্ট করে অস্টিয়োলজি বেচারারা শিখি
এক হাতে ফিমার ধরি ক্ল্যাভিকেলে লিখি।
ভার্টিব্রার মালা গাঁথি লিগামেন্টের সুতা
কার্টিলেজের কুশন চেয়ার লাগতে দেই না গুঁতা
সবই উঠতে বসতে লাগে কাজ যায় না কিছু ফেলরে
এনাটমি কে বুঝিতে পারে তোমার খেলা।
কষ্ট করে বন্ধ ঘরে করছি ডাইসেকশন
খুঁজে ফিরি পচামাংসে কার যে কি একশন,
নিউরোন দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে গ্যাংলিয়নে যাই
ব্রেইন কিংবা মাসলেতে একটু ছাড়া পাই
সিনাপস আর এন্ডঅর্গানে এ তো চলে খেলা রে
এনাটমি কে বুঝিতে পারে তোমার খেলা।
অনেক কথা রয়ে গেল নাইকো তাহার শেষ
গ্রে ছাড়িয়া চলুন এবার কানিংহামের দেশ।
ও চাচা কানিংহাম
সেরিব্রামের ক্ষীর পাকাইলাম খাইয়া গেলা না
ও চাচা আমরা বুঝি হতভাগার দল
বানাইলা যে ভাইভাভোসি ইদুরমারা কল
অনেক কিছু পড়ার আছে, আরো থাকি বাকি
পরীক্ষাতে ভুগতে হবে হেথায় দিলে ফাঁকি।
এত কষ্ট করলাম তবু ছাইড়া দিলা না চাচা
সেরিব্রামের ক্ষীর পাকাইলাম খাইয়া গেলা না।
এনাটমির জ্বালায় মোরা জ্বলছি দিবরাতি
আচ্ছালামু ওয়ালাইকুমে হেথায় করি ইতি', দেখুন, আহমদ রফিক, *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩ পৃ. ২৫৫-৫৬।

৪১. **'সমস্যা**

১. ডাইসেকশন হলে ধোয়ার জায়গা পর্যাপ্ত নয়।
২. শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো লকার নেই।
৩. মৃতদেহে সংখ্যা খুবই নগন্য (বছরে ২৫টি)। তাই মেডিকেল কাউন্সিলের শর্তানুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী পুরো মানব শরীর ডাইসেকট করতে পারত না।
৪. কোনো জাদুঘর ছিল না। কোনো ভ্রূণবিদ্যার নমুনা অথবা বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয়ের নমুনা নেই।
৫. মৃতদেহ নিয়ে কাজের কোন নির্দেশনা মন্ত্রিসভার নেই।
৬. বিভাগটি যখন আধুনিকায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয় তখন এনাটমির অধ্যাপকের সাথে পরামর্শ করা হয়নি।

প্রস্তাব

১. শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক লকার এবং ধোয়ার কক্ষের ব্যবস্থা করা।
২. ডাইসেকশনের জন্য একটি স্টাফ রুমের ব্যবস্থা করা।
৩. ডেমনস্ট্রেশন কক্ষের ব্যবস্থা করা।
৪. অপারেটিভ সার্জারির কক্ষের ব্যবস্থা করা।
৫. একটি সঠিক প্রস্তুতকৃত কক্ষের ব্যবস্থা করা।
৬. নমুনা ও মডেল সংগ্রহের জন্য অনতিবিলম্বে জাদুঘরের ব্যবস্থা করা।
৭. মৃতদেহের সংখ্যা বৃদ্ধি করা
৮. মৃতদেহ রাখার জন্য অনতিবিলম্বে হিমাগারের ব্যবস্থা করা।
৯. যখন জাদুঘরের জন্য কক্ষ নির্মাণ করা হবে তখন তার (অধ্যাপক) সাথে পরামর্শ বা তাঁকে অবগত করা উচিত।'

দেখুন, *ডি গ্রুপ*, ২২৭২/১৯৫০-৫৩, Sub: Pakistan Medical Research Council, File No: ২২(৩), University of Dacca, p. 3.

৪২. *ঐ*, p. 3.

৪৩. *ঐ*

৪৪. *ঐ*, p. 2.

৪৫. *Annual Report for* 1953-54, *University of Dacca*, p. 8.

৪৬. *Annual Report for* 1957-58, *University of Dacca* p. 102.

৪৭. *Annual Report for* 1959-60, *University of Dacca* p. 104.

৪৮. *Annual Report for* 1963-64, *University of Dacca* p. 113.

৪৯. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1947-1948, p.14.

৫০. *ঐ*

৫১. *ঐ*

৫২. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1948-1949, p.71.

৫৩. *ঐ*, p.72.

৫৪. *B Proceedings*, B No. 128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953, p. 1-2.

৫৫. *ঐ*

৫৬. '১ম শিফট (২ ব্যাচ করে) ব্যাচ এ-৪১, ব্যাচ বি-৪৩, ২য় শিফট (২য় ব্যাচ করে) ব্যাচ সি-৫২ ব্যাচ ডি-২০, অকৃতকার্য ও বিলম্বে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য ২০টি রিভিশন ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়। হিস্টোলজিঃ প্রথম বর্ষের হিস্টোলজি ক্লাশ নিম্নোক্তভাবে অনুষ্ঠিত হয়, ব্যাচ এ-৩৪, ব্যাচ বি-৩৩। ব্যাচ সি-৩২, ব্যাচ ডি-৩০।' দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1950-1951, p.107.

৫৭. *Annual Report for* 1950-51, *University of Dacca*, p. 21.

৫৮. *ডি গ্রুপ*, ২২৭২/১৯৫০-৫৩, Sub : Pakistan Medical Research Council, University of Dacca, p. 54.

৫৯. *ঐ*

৬০. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1951-1952, p.154.

৬১. *B Proceedings*, B No. 126, SL No. 100 List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953, p. 6.

৬২. *ঐ*

৬৩. *ঐ*

৬৪. *Annual Report for* 1957-58, *University of Dacca*, p. 102.

৬৫. *Annual Report for* 1958-59, *University of Dacca*, p. 102.

৬৬. 'The Physiology Department now occupies the entire portion of the southern and western wings of the second floor and has three laboratories of its own. Its equipment for teaching and work in the laboratories and research room is the best in the province. It also has the necessary apparatus for Electrophoresis work. The department showed considerable progress.' দেখুন, *Annual Report for* 1959-60 *University of Dacca*, p. 104

৬৭. 'The Physiology Department continued to make steady progress and is now making itself felt in the research field. The P.C.S.I.R has now allocated some funds to it for appointment of a research worker. The students of the Department brought out a paper under the guidance of their teachers and active patronage of the Head of the Department. It was an ample testimony of students' interest in the subject and their studies'. দেখুন, *Annual Report for* 1960-61, *University of Dacca*, p. 107.

৬৮. *Annual Report for* 1961-62, *University of Dacca*, p. 124.

৬৯. *Annual Report for* 1965-66, *University of Dacca*, p. 100.

৭০. *বার্ষিকী ২০০৬, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, পৃ. ৭৬।*

৭১. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1946*-1952, p.VIII

৭২. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 15 August 1947-31st March 1948, p. 15.

৭৩. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1948-49, DMCH, 1953-54 p. 41.

৭৪. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1948*-1949, pp. 41-42.

৭৫. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1949-50, pp. 73-74.

৭৬. *ঐ*

৭৭. 'The action of Quabain (G. Strophanthin) on the circulation in man and a comparison with Digoxin', *Clinical Science*, Vol. 9, No 1 Feb. 1950, London. 'Rheumatic carditis [*sic*] in East Pakistan' *At The Director's Club*, Literary Section Meeting, July 1949. দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1949-50, p. 74.

৭৮. *ডি গ্রুপ*, ২২৭২/১৯৫০-৫৩, Sub: Pakistan Medical Research Council, University of Dacca p. 1.

৭৯. *ঐ*

৮০. 'Antibiotics and their uses' at *Doctors Club* Scientific Meeting in May 1950) 'Catheterisation of the Human Heart' Published in *The Medicus*, Vol. IV, 1 April 1952', দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1950-51, pp. 108-109.

৮১. ‘Buerger's Disease and its treatment in East Pakistan’, *Doctor's Club*; July 1951 ‘The Aeteology and Prevention of Cirrhosis of liver in East Pakistan’, *Doctor's Club*, December 1952’. দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1951-52, pp. 155-56.

৮২. *Annual Report for* 1958-59, *University of Dacca*, p. 103.

৮৩. ‘Once again the Department of Pharmacology through its Head rendered much service to the Government of East Pakistan in the matter of inspection of old pharmaceutical concerns and also newly started ones in the province. By holding the practical portions of the Compoundership Examinations, it proved to be of great help to the State Medical Faculty of East Pakistan. On the whole the departments progress was quite satisfactory.’ দেখুন, *Annual Report for* 1959-60, *University of Dacca*, p. 104.

৮৪. *Annual Report for* 1965-66, *University of Dacca*, p. 101.

৮৫. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1946-52, East Bengal Government Press, p. VIII.

৮৬. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1947-48, p. 161.

৮৭. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1948-49, p. 43.

৮৮. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1949-50, p. 75.

৮৯. *ঐ*

৯০. *B Proceedings*, B No. 126, SL No. 100, List No: 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch*, *Government of East Bengal*, 1953 p. 1-2.

৯১. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1950-51, p. 110.

৯২. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1951-52, p. 157.

৯৩. *ঐ*

৯৪. *Annual Report for* 1957-58, *University of Dacca*, p. 102.

৯৫. *Annual Report for* 1958-59, *University of Dacca*, p. 102.

৯৬. *Annual Report for* 1960-61, *University of Dacca*, p. 107.

৯৭. *Annual Report for* 1963-64, *University of Dacca*, p. 113.

৯৮. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1946-52, East Bengal Government Press, 1954, p. VIII.

৯৯. Culture Media: A Liquid as glatinous substance containing nutrienls in which micro-organisms or tissues are cultivated for scientific purpose: Different types of media are used for growing different types of cells. ...The most common growth media for micro-organisms are nutrient broths and agar plates; specialized media are sometimes required for micro-organism and cell culture growth.

১০০. Wasserman reaction: The complement fixing reaction that occurs in a positive component fixation test for syphilis using the serum of an infected individual.

১০১. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1947-48, p. 17.

১০২. *ঐ*

১০৩. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1948-49, pp. 44-45.

১০৪. ‘There is no existing accommodation which can be used for housing the anatomy or pathological museums and new structures will have to be provided. For the latter a room can be built over the porch at the western end of the building. For the former a new structure will have to be erected near the Anatomy Department. I have supplied the executive Engineer with details. Plans are already completed for the provision of a room over the porch and this work could be taken up at once.’ দেখুন, *B Proceedings*, B No. 128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch*, *Government of East Bengal*, 1953, p. 2.

১০৫. ‘A small animal house is essential. The pathological Department requires animals such as guinea pigs and rabbits for the preparation of sera required in certain tests and for other test purposes. At present animals are kept in the laboratory verandah. This is very unsatisfactory and will lead to the contamination of the laboratory which is often difficult to eradicate. Bacteriological work is carried out in this laboratory and media is certain to become contaminated. The executive engineer has been supplied with details of the animal house required.’ দেখুন, *B Proceedings*, B No. 128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch*, *Government of East Bengal*, 1953, p. 2 .

১০৬. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1949-50, pp. 76-77.

১০৭. গবেষণামূলক কাজঃ (১) 'Growth of vibrio Cholerae (Inaba) on Fresh Seasonal Fruits'. *Journal of the Pakistan Medical Association,* 1950. (২) 'Laboratory Diagnosis of Amoebic by dysentery, 1950'. দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1949-50, p. 77.

১০৮. 'The Professor of this Department has not been accepted by the P.S.C. He also has had long experience in the teaching of the subject and has postgraduate qualifications of D.T.M. and B.Sc. It might be worthwhile here also to obtain the opinion of the inspectors on him in view of the difficulty in obtaining a more suitable candidate. Correspondence has taken place with one possible candidate but this has not produced any result.' দেখুন, *B Proceedings,* B No.128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953, p. 2

১০৯. *B Proceedings,* B No.128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953, p. 2.

১১০. *ঐ*

১১১. *ঐ*

১১২. *ঐ*, p. 4.

১১৩. 'It is essential that there should be a proper Post Mortem room with adequate gallery for the students. This room should be used for the Pathology Post Mortem as well as for the Medico legal. The equipment in this Department is inadequate but we were informed that either they are on the way from abroad or orders have been placed. We are of the opinion that this department is not adequate.' দেখুন, *B Proceedings,* B No.128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953, p. 4.

১১৪. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1950-51, p. 112.

১১৫. *B Proceedings,* B No. 128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953, p. 69.

১১৬. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, pp. 158-159.

১১৭. 'Incidence of Carcinoma in East Pakistan.

Lymph adenopathy

Diagnosis of Bronchogenic Carcinoma by special Technique

Liver Biopsies

Buerger's Disease

Early Diagnosis of Cervical Cancer by Papanicolaou methods of staining.

১. Practical Pathology for medical Students.

২. 'Ankylostomiasis' [*Sic*] (ঢাকা মেডিকেল কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়)

রেডিও কথোপকথন:

'Man Studies life-chemistry of life and Bacteriology' দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, p. 159.

১১৮. *Annual Report for* 1956-57, *University of Dacca*, p. 66.

১১৯. *Annual Report for* 1959-60, *University of Dacca*, p. 104.

১২০. 'The work of the Serological section of the Department of Pathology was purposeful and of much assistance to the Government. The clinical and pathological investigations of various materials sent to the Department of Pathology by Government Hospitals, Non-Government Hospitals and even private practitioners from various parts of the province were promptly done and reports passed on to the persons concerned was much appreciated by all as these greatly helped in the treatment of suffering humanity and assisted the physicians in their diagnosis of disease.' দেখুন, *Annual Report for* 1968-69, *University of Dacca,* p. 103.

১২১. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1948-49, p. 46.

১২২. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1949-50, p. 78.

১২৩. *B Proceedings,* B No. 128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953, p. 56.

১২৪. *ঐ*, p. 57.

১২৫. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1946-52, p. IX.

১২৬. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1950-51, p. 113.

১২৭. *ঐ*, p. 160.

১২৮. *Annual Report for* 1956-57, *University of Dacca*, p. 66.

১২৯. *Annual Report for* 1968-69, *University of Dacca*, pp. 103.

১৩০. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1946-52, pp. 47-79.

১৩১. 'There is no department of Hygiene. A part time officer of public Health Department has been appointed to give lectures to students. There is no indication that any field work or vaccination is being done. This Department is deficient and needs organization.' দেখুন, *B Proceedings*, B No.128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch*, *Government of East Bengal*, 1953, p. 5.

১৩২. *ঐ*, p. 71.

১৩৩. *ঐ*

১৩৪. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital from* 1950-51 to 1951-52, pp. 117-161.

১৩৫. *Annual Report for* 1958-59, *University of Dacca*, p. 102.

১৩৬. *Annual Report for* 1960-61, *University of Dacca*. p. 108.

১৩৭. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1947-48, p. 19.

১৩৮. 'রেডিওতে প্রচারিত অনুষ্ঠান,

'১. রেগুলেশন অব মেডিকেল প্রফেসন (বাংলা) Regulation of Medical Profession- (Bengali)- 29.81 1947) ২৯৮-১৯৪৭

২. চ্যালেঞ্জ অব ডিজিজ (ইংরেজি) ১৭-৯-১৯৪৭ Challenge of Disease (English) 17-9-1947

৩. Anaesthetics and Analgesics (Bengali) 12-10-47

৪. Dreams and their Interpretations (English) 18-12-17

৫. Dreams a little Physical Exercise (English) 19-1-48

৬. Knowledge of Sex; Sex Education of Children (Bengali) 30-1-47

৭. Conversion of Mental Conflicts into physical symptoms (English)

৮. Sex knowledge for Boys and girls (Bengali) 22-2-48

৯. Physique and Nutrition (English) 13-3-48

১০. Sex Education and Parents (Bengali) 20-3-48' দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1947-48, pp. 19-20.

১৩৯. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1948-49, p. 48.

১৪০. 'Effect of Paludrine in Malaria'. 'Tela Kachu leaves in the treatment of Diabetes.' দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1948-49, p. 49.

১৪১. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1949-50, p. 80.

১৪২. বিভিন্ন প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়, 'Efficacy of paludrine in Malaria'- Pakistan Association for the advancement of Science, Lahore

'Streptomycin in the coma-vigil condition of Typhoid Fever' (Pakistan Association for the advancement of Science, Lahore)

'Dysentery', (*Pakistan Medical Association*)

'Cirrhosis of Liver' (*Pakistan Medical Association*)

'Chronic Amoebiasis' (*Journal of the Pakistan Medical Association*)'

দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1949-50, pp. 80-81.

১৪৩. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1950-51, p. 146.

১৪৪. *ঐ*

১৪৫. *ঐ*

১৪৬. *B. Proceedings*, B No. 128, List No. 109, Sl. No. 102, 1953, p. 17.

১৪৭. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, p. 162.

১৪৮. *ঐ*

১৪৯. 'The students should be given a bird's-eye-view of all the medical diseases covering all the systems of the body including the specialities mentioned above. The students should also receive a detailed knowledge of the common as well as important diseases, which they will be expected to see frequently and in which their practice would mainly be limited. Some of his colleagues did not however believe in

this but so long as he was the professor of medicine he tried to implement this view of his.' দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1946-52, p. X.

১৫০. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1948-49, p. 48.

১৫১. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital from* 1949-50 to 1951-52, pp. 80-162.

১৫২. ঐ

১৫৩. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1947-48, p. 21.

১৫৪. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1948-49, p. 50.

১৫৫. ঐ

১৫৬. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1949-50, p. 82.

১৫৭. ঐ

১৫৮. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1950-51, p. 117.

১৫৯. ঐ

১৬০. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, p. 163.

১৬১. ঐ

১৬২. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1950-51, p. 118.

১৬৩. ঐ

১৬৪. ঐ, p. 119.

১৬৫. ঐ

১৬৬. '1. Rheumatics Carditis with mitral and aortic valvular lesions and congestive cardiac failure, 2. Tuberculosis of the Intestine, 3. Tropical splenomagaly, 4. Hodgkin's Disease, 5. Bronchogenic Carcinoma' দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, p. 164.

১৬৭. ঐ, p. 165.

১৬৮. '1. Congenital Heart Disease-Fallot's Tetralogy, 2. Klippel-Feil Syndrome., 3. Schmorl's degeneration. 4. Simmond's Cachexia Disease' দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, p. 165.

১৬৯. '1. Heart: Right-sided heart failure due to right coronary thrombosis, 2. Tape-worm 15 feet, 3. Pulmonary Arteriosclerosis' দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, pp. 164-165.

১৭০. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, pp. 164-165.

১৭১. ঐ

১৭২. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital from 1947-48 to 1948-49*, pp. 22-51.

১৭৩. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital from 1947-48 to 1951-52,* pp. 23-170.

১৭৪. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1949-50, p. 84.

১৭৫. 'There are three operation theaters which are used in common by the General Surgeons, E.N.T, Surgeon and Gynaecology [*Sic*] Surgeon. The General Surgeon operates twice a week along with the other specialities simultaneously. The equipment of the theatre is fairly adequate and we were told that certain amount of apparatus and instruments have either arrived or on the way. There is also some Radium which is used by all the units. On the whole this department is adequate. We, however, strongly recommend that there should be separate independent theatres for all the specialities.' দেখুন, *B Proceedings,* B No. 128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1953, pp. 5-6.

১৭৬. '১৯৫০-৫১

ক. শরীর ও স্বাস্থ্য ৯ জুন ১৯৫০

খ. এদের কেউ আবিষ্কার করতে চাননি; ১৮ আগস্ট ১৯৫০

গ. আমার রাষ্ট্র কিরূপ গড়ব, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫০
ঘ. পুষ্টির সমস্যা, ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১
১৯৫১-৫২ সালে রেডিও পাকিস্তানে ডাক্তার নওয়াব আলী আহমেদ (এম.বি.) এর স্বাস্থ্য বিষয়ক নিম্নের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়,
ক. পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ২০.৪.১৯৫০
খ. ডাক্তারি যন্ত্র ৫.৬.৫১
গ. ডাক্তারি যন্ত্র ১৯.৬.১৯৫১
ঘ. মানুষের কাজে বিজ্ঞান ৩.৭.৫১
ঙ. Meet your Radio Doctor 13.7.51
চ. Meet your Radio Doctor 31.8.51
ছ. Meet your Radio Doctor 14.9.51
জ. Meet your Radio Doctor, 28.9.51
ঝ. কেমন মজা ১৫.১.৫২
ঞ. কেমন মজা ৫.২.৫২
ট. শরীরের যত্ন নাও ৪.৩.৫২
ঠ. শরীরের যত্ন নাও ৫.৩.৫২' দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital from* 1950-51 to 1951-52, pp. 121-170.

১৭৭. *দৈনিক আজাদ*, ৫ জানুয়ারি ১৯৬০, পৃ. শেষ।

১৭৮. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital from* 1947-48 to 1950-51, pp. 24-175.

১৭৯. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, p. 171.

১৮০. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital from* 1947-48 to 1948-49, pp. 24-53.

১৮১. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1949-50, p. 85.

১৮২. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1950-51, p. 123.

১৮৩. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, p. 172.

১৮৪. 'এ সময় এই বিভাগে নিম্নের কিডনি ও লিভারে পাথরসহ কিছু জটিল রোগের চিকিৎসা করা হয়,

১. Branched Calculus of Kidney ($2\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{4}$ x $\frac{1}{2}$")
২. Neuro-Fibroma on the Median Nerve (size-Hen's egg)
৩. Hydatid Cyst of the liver.

গবেষণামূলক কাজ, ১৯৪৮-৪৯

১. 'Brain wound'

১৯৪৯-৫০

১. 'The teaching of surgery', *Pakistan Medical Journal*, January, 1950
২. 'The importance of a more adequate sterilization Technique in Hospitals', *Antiseptic*, January 1950.

১৯৫০-৫১

১. 'Research work', *Pakistan Medical Journal*, April, 1950
২. The Basic Principles of Surgical Technique', *Antiseptic*, May 1950
৩. 'Hypertrophy of the Prostate', *Indian Medical Journal*, May 1950
৪. 'Surgical Treatment of Pulmonary Tuberculosis', *Medical Digest*, May 1950
৫. 'Hospital Organization and Management, *Pakistan Medical Journal*, June 1950
৬. 'Anaesthesia in Surgery', *Indian Medical Record*, June 1950
৭. 'Faults, Errors and Dangers in Surgery', *New Pakistan Medical Journal*, October 1950
৮. 'Continental Degrees', *New Pakistan Medical Journal*, 1950
৯. 'Surgical Treatment of the Peptic Ulcer' *Medical Digest.*
১. 'Surgery of old people', *New Pakistan Medical journal*, 1951

১৯৫১-৫২

১. Paediatric Surgery' *Medicus* Part-1, June 1951
২. Paediatric Surery' *Medicus* Part-2 July 1951
৩. The Child as a Surgical Subject' *Antiseptic* July 1951
৪. `Mdical Ethics' `*Dacca Medical College Magazine*' 1951-52'
দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1946-52, pp. 54-172.

১৮৫. *Annual Report for* 1966-67, *University of Dacca*, p. 110.

১৮৬. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital from* 1948-49 to 1951-52, pp. 55-174.

১৮৭. *ঐ*

১৮৮. **জটিল রোগ: ১৯৪৯-৫০**

১. 'Thrombo'- Angitis obliterans (treated with lumber sympathectomy)

২. Two cases of 'Hypernephroma'.

১৯৫০-৫১

১. A case of 'Strangulation of Intestine' of 20 days

২. A case of 'Perforated peptic Ulcer without any previous symptom'.

১৯৫১-৫২

১. A 'floating Spleen Weighing to Ibs'

২. A case of 'Rodent Ulcer'

৩. A case of 'Congenital Inguinal Hernia' getting strangulated at the age of 40 and containing about more then half of the intestines, দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital from* 1949-50 to 1951-52, pp. 87-174.

১৮৯. **গবেষণা মূলক কাজ: ১৯৪৯-৫০**

`Surgery in world war' (II) প্রবন্ধটি *Journal of Pakistan Medical Association,* vol: 2, No. 1, January 1950 থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯৫০-৫১

Torsion of testis' (২) 'Intestinal Obstruction by Meckel's Diverticulum', *Dacca Medical College Magazine*-এ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া ১৯৫১-৫২ Projectile Injuries and their treatment' প্রবন্ধটি কলেজের ক্লিনিক্যাল মিটিংয়ে উপস্থাপন করা হয়।'

দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital from* 1949-50 to 1951-52, pp. 87-174.

১৯০. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1948-49, p. 56.

১৯১. *ঐ*

১৯২. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1949-50, p. 88.

১৯৩. *ঐ*

১৯৪. *ঐ*

১৯৫. 'Foetus or Fetus Development: The period from the beginning of the ninth week to birth is known as the fetal period'. দেখুন, T.W. Sadler, *Langman's Medical Embryology,* Eleveenth Edtion, Walters Kluwer, p. 91.

১৯৬. *B Proceedings,* B No. 128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1953, p. 6.

১৯৭. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1950-51, p. 127.

১৯৮. *ঐ*

১৯৯. *ঐ*

২০০. *Annual Report for* 1950-51, *University of Dacca,* p. 21.

২০১. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, p. 137.

২০২. *ঐ*, p. 177.

২০৩. *ঐ*, p. 178.

২০৪. *ঐ*

২০৫. *ঐ*

২০৬. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1949-50, p. 89.

২০৭. *ঐ*

২০৮. *ঐ*

২০৯. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1950-51, p. 128.

২১০. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, p. 179.

২১১. *ঐ*, p. 180.

২১২. *ঐ*

২১৩. *Annual Report for* 1961-62, *University of Dacca,* p. 124.

২১৪. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1948-49, p. 31.

২১৫. *East Bengal Legislative Assembly,* 1949-50, Fourth Session, 25th, 28th February, 1st and 2nd March, East Bengal Government Press, 1952, pp. 28-29.

২১৬. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1949-50, p. 91.

২১৭. **জটিল রোগঃ** 1. 'Trachoma: Treated with Sulpha drugs and Antibiotics, Particularly Chloromycetine and Aureomycine. 2. 'Purulent Conjunctivitis': Treated with Penicillin drops and injections. 3. 'Corneal ulcers and iridocyclitis': Treated with Penicillin drops and Atropin ointments'. *দেখুন, Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1949-50, p. 91.

২১৮. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1950-51, p. 125.

২১৯. গবেষণামূলক কাজঃ ১. 'The importance of opthalmoscopic examination of the eyes with relation to important systemic diseases, *Doctor's Club,* Dacca Medical college. ২. Prevention of Blindness in East Bengal; *Government House.*

রেডিওতে প্রচারিত অনুষ্ঠানঃ

১. Prevention and treatment of Squint

২. ছানি, ৯ মে ১৯৫০

৩. শিশুর চক্ষু রোগ ও চিকিৎসা

৪. গ্লুকোমা ১৯ মে ১৯৫০', দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1950-51, p. 125.

২২০. *B Proceedings,* B No. 128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1953, p. 61.

২২১. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, p. 175.

২২২. জটিল রোগগুলো বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণঃ

'1. A case of Methyl Alcohol Amblyopia with complete loss of vision.

2. Total Opthalmoplegia both eyes of unknown origin.

3. Internal Squint of eyes corrected by operation

4. Severe bilateral papillaedema in a child due to pituitary tumour. The patient did not survive the operation on the pituitary'. দেখুন, *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, p. 176.

২২৩. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, p. 176.

২২৪. আহমদ রফিক, *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৪৩।

২২৫. *B Proceedings,* B No. 128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1953, p. 7.

২২৬. *দৈনিক আজাদ*, ২৯ নভেম্বর ১৯৬৪, পৃ ৪।

২২৭. *Annual Report for* 1967-68, *University of Dacca,* p. 119.

২২৮. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1948-49, p. 31.

২২৯. *B Proceedings,* B No. 128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1953, p. 6.

২৩০. *Annual Report for* 1967-68, *University of Dacca,* p. 119.

২৩১. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1949-50, p. 61.

২৩২. *ঐ*

২৩৩. *Annual Report for* 1963-64, *University of Dacca,* p. 146.

২৩৪. *ঐ*

২৩৫. *B Proceedings,* B No. 128, List No. 109, SL No. 102, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1953, p. 6.

২৩৬. *ঐ*, p. 47 or 7.

২৩৭. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1951-52, p. 130.

২৩৮. *Annual Report for* 1962-63, *University of Dacca,* p. 122.

২৩৯. *Annual Report for* 1966-67, *University of Dacca,* p. 110.

২৪০. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1946-52, p. XI.

২৪১. *ঐ*, pp. 61-137.

২৪২. *ঐ*, p. XIII.

২৪৩. *Year Book* 2008-2011, *Dhaka Medical College & Hospital,* Dhaka Medical College, 2013, p. 37.

চতুর্থ অধ্যায়

ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রমের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও বিকাশ

১৫-৮-১৯৪৭ – ৩১-১২-১৯৭১

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কেবলমাত্র একাডেমিক উন্নয়নের ওপর নির্ভর করে না বরং এর প্রশাসনিক কার্যক্রমের উন্নয়নের ওপরও নির্ভর করে। প্রশাসনিক কার্যক্রমের মাধ্যমেই একাডেমিক যাবতীয় সমস্যা সমাধান ও এর চাহিদাগুলো পূরণ করা হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজকে নতুন করে সাজানো ও এর উন্নয়নের জন্য বাজেট প্রণয়ন, যন্ত্রপাতি ক্রয় পশ্চিম বাংলার সাথে যন্ত্রপাতি ভাগকরণ, ভর্তি প্রক্রিয়ার নতুন পদ্ধতি গ্রহণ, হোস্টেল, লাইব্রেরি ও গবেষণাগারের আধুনিকীকরণ, নতুন শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের পাশাপাশি এর ভবনের ক্ষেত্রে সংযোজন ও পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়ে। এমনকি এই প্রতিষ্ঠানটি যে অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) এর ওপর প্রতিষ্ঠিত, সময়ের সাথে সাথে সেই অধ্যাদেশের নানা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা হয়, যা অভিসন্দর্ভের এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মেডিকেল কলেজ ভবনের সংযোজন ও পরিবর্তন

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল একই ভবনে ছিল। দেশ বিভাগের সময়ে সচিবালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যা ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের অবকাঠামোগত সমস্যা একই ছিল। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের সচিবালয়ের ভবন, এটি পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইডেন বিল্ডিংয়ে সচিবালয়ের যাত্রা শুরু হয়, যেখানে সচিবালয়ের বিভিন্ন বিভাগ স্থাপন করার জন্য অনেক বড় বড় অস্থায়ী ছাউনি নির্মিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ ছাড়া মেডিকেল কলেজের ভবনটি সচিবালয়ের জন্য যেমন খুব ছোট ছিল, তেমিন মেডিকেল কলেজের সব বিভাগ স্থাপন করার ক্ষেত্রেও ইডেন বিল্ডিং অনেক ছোট ছিল। তাই সময়ের প্রয়োজনে মেডিকেল কলেজের ভবনটি আরো উন্নত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

দেশ বিভাগের সময়ে মেডিকেল কলেজ কেবল কলেজ এবং হাসপাতালেরই ব্যবস্থা করেনি বরং মেডিকেল ডিরেক্টরেটরও থাকার ব্যবস্থা করে। ভবনের নীচের ভালো অংশটি মেডিকেল ডিরেক্টরেটরের দখলে ছিল। একটি ওয়ার্ডে মেডিকেল ডিরেক্টরেটের কয়েকজন কেরানির আবাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাঁর উদ্যোগে মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে হাসপাতাল ভবনের সামনে বহির্রোগী বিভাগের জন্য বেশ কয়েকটি ছাউনি নির্মাণ করা হয়। মেডিকেল শিক্ষার্থীদের হোস্টেলে থাকার জন্য হাসপাতালের পশ্চিম দিকে আরো কয়েকটি বড় ছাউনি নির্মাণ করা হয় এবং প্রিলিমিনারি ট্রেনিং স্কুল নামে পরিচিত নার্সদের জন্য নার্সিং স্কুল ও আবাসনের জন্য ছাউনি নির্মাণ করা হয়। ১৯৪৯ সালের এক-দেড় বছরের মধ্যে সমস্ত ছাউনি নির্মাণ সম্পন্ন হয়। নার্সদের জন্য নতুন কোয়ার্টার এবং তাদের প্রিলিমিনারি ট্রেনিং স্কুল বায়তুল আমানের সাময়িক অবস্থান থেকে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে এই বাড়িটি ভারতীয় হাইকমিশনার ভাড়া নেয়। হাসপাতালের একটি অংশে নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট, ম্যাটরণ, সহকারী ম্যাটরণ ও অন্যান্য সিনিয়র নার্সদের আবাস নির্মাণ করা হয়। এ সময়ের মধ্যে অবেক্ষাধীন নার্স ও শিক্ষার্থী নার্সদের বায়তুল আমান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে আনা হয়।[১] ইতিমধ্যে এই ভবনের যে অংশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনুষদের ক্লাশ অনুষ্ঠিত হতো এবং লাইব্রেরি অবস্থিত ছিল, সেই অংশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন লাইব্রেরি ও নতুন বাংলা বিভাগ নির্মাণের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১০ লক্ষ

রুপির বিনিময়ে মেডিকেল কলেজের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে প্রস্তাব করা হয়।[২] নতুন কলেজ ভবন তৈরি ও সম্প্রসারণে যিনি উদ্যোগ নেন, তিনি হলেন অবাঙালি প্রিন্সিপাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. কর্নেল এম.কে. আফ্রিদি (১৯৫২-১৯৫৩)। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কলেজের উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন।

১৯৫৫ সালের শুরুর দিকে কলেজের নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হলে কলেজের বিভিন্ন বিভাগ অথবা মেডিসিন অনুষদকে নতুন নির্মিত তিনতলা ভবনে স্থানান্তর করা হয়। একই সময়ে মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ দুইটি শাখায় বিভক্ত করা হয়। ফলে কলেজের প্রধান ছিলেন প্রিন্সিপাল এবং একই সাথে তিনি ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের ডিন ছিলেন। অন্যদিকে হাসপাতালের প্রধান ছিলেন সুপারিনটেনডেন্ট। এ সময় মেডিসিন অনুষদের ডিন এর কাজ সম্পর্কে *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী* তে উল্লেখ করা হয়,

> The entire work of the Faculty of Medicine has devolved on the dean of the Faculty of Medicine and the administrative and establishment staff of the Dacca Medical College.[৩]

এ সময় (১৯৫৪-৫৫) ফিজিওলজি, কেমিস্ট্রি, প্যাথলজি ও ফার্মাকোলজি বিভাগের জন্য গবেষণাগার বাড়ানো হয় এবং এই বিভাগগুলোকে আরো ভালোভাবে সাজসরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত করা হয়। এ ছাড়া আরো দুইটি কক্ষ তথা একটি শিক্ষার্থীদের সাধারণ কক্ষ (কমন রুম) এবং অন্যটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ক্যান্টিনের জন্য পৃথক করা হয়। এই কক্ষগুলো ব্যবহার করার জন্য আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম স্থাপন করা হয়। অপরদিকে ১৯৫৬ সালে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী, গভর্নর এ.কে. ফজলুল হক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অসুস্থ সচিবকে দেখতে গেলে, সেখানে তাঁর সাথে প্রধানমন্ত্রী প্রদেশের বিভিন্ন বিষয় ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নানা অভাব অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনায় যেসব উল্লেখ করা হয়,

> মেডিকেল কলেজ ভবন হতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর করা, মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনের অভ্যন্তরে হাউস স্টাফদের বাসগৃহ নির্মাণ এবং বিদেশ হতে চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ও ঔষধপত্র আমাদানি করে মেডিকেল কলেজকে আরো আধুনিক পর্যায়ে উন্নত করা।[৪]

১৯৬০ সালে মেডিকেল কলেজের উন্নয়ন সম্পর্কে *দৈনিক ইত্তেফাক* থেকে জানা যায় যে, অল্প সময়ের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের রোগীদের চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা ও নার্সদের ট্রেনিং এবং তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। এ সময় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক লে. কর্নেল এম. হক সাংবাদিকদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ও নির্মীয়মান নতুন আউটডোর ঘুরে দেখান। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আরো অধিক সংখ্যক রোগীর স্থান সংকুলানের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা সম্পন্ন করতে আরো ৬ মাস লাগবে'।[৫]

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ক্রমবর্ধমানহারে বৃদ্ধি পায়। এই উন্নয়ন সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায় এবং এই কারণে মেডিকেল কলেজের ভবনকে কখনও সংযোজন কখনও পরিবর্তন করতে হয়। ফলে এর উন্নয়নের ধারা প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজও চলমান। অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিভাগেরও উন্নয়ন হয় এবং সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

ভর্তি প্রক্রিয়া

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভর্তি কমিটি বিভিন্ন সদস্যদের নিয়ে গঠিত ছিল। কমিটির প্রধান ছিলেন উপাচার্য (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে পার্লামেন্টের সদস্য, সমাজের প্রখ্যাত ব্যক্তি এবং কয়েকজন ডাক্তার। তাদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত ছিল। বাছাই প্রক্রিয়া প্রধানত ভৌগলিক ভিত্তিতে বেশি হতো, মেধার ভিত্তিতে কম হতো।[৬] কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে এই প্রক্রিয়া থাকলেও বর্তমান সময়ে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়। সে সময়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক মেধাবী ছাত্রছাত্রী না থাকায় প্রাক মেডিকেল পরীক্ষা তথা মেট্রিক ও আই.এসসি তে সাধারণ রেজাল্ট নিয়ে এই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারত। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ২৮ জন শিক্ষার্থী ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেন *[পরিশিষ্ট দেখুন*-২৯]।

এই শিক্ষার্থীরা দেশ বিভাগের কারণে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করেন। তাই কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি ফি প্রদান করায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ই.জি. মন্টেগোমারি তাদেরকে ভর্তি ফি প্রদান করা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। তাদেরকে কশন ফি ১০ রুপি এবং ইউনিয়ন ফি ৬ রুপি জমা দিতে বলা হয়। অব্যাহতির বিষয়ে সরকারি অনুমোদন পাওয়ার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল পূর্ববাংলার সার্জন জেনারেলের কাছে আবেদন করেন।[৭] ১৯৪৭-৪৮ সালে দেখা যায় যে, চিকিৎসকের ঘাটতি পূরণের জন্য এম.বি.বি.এস. কোর্সে বিপুল সংখ্যক গ্রাজুয়েট প্রদানের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১০০ জনের পরিবর্তে ১৬৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এই শিক্ষার্থীদের কয়েকজন ফলাফলসহ বিলম্বে ভর্তি হওয়ায় লেকচার ও ক্লাস দীর্ঘায়িত করতে হয়, যাতে তারা কোর্সটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। ফলে এ সময় মেডিকেল কলেজে মোট শিক্ষার্থী ছিল ২৭২ জন। তাদের মধ্যে ২৩ জন তৃতীয় বর্ষের সময় কলেজে আসে।[৮] ১৯৪৮-৪৯ সালে মেডিকেল কলেজের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের বর্ধিত সংখ্যা। মোট শিক্ষার্থী ৪১১ জন ছিল, যার মধ্যে ১০ জন নারী শিক্ষার্থী ছিল।[৯] ১৯৪৯-১৯৫০ সালে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রথম বর্ষে যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, তাদের বেশিরভাগ জীববিজ্ঞান নিয়ে প্রথম বিভাগে আই.এসসি পাশ করে। এটা তাদের আই.এসসি কোর্সের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অন্যতম একটি বিষয় ছিল। জীববিজ্ঞান নিয়ে সে সময় প্রথমবর্ষে ১২৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।[১০]

১৯৫০ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রথমবর্ষে ১২৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয় তার মধ্যে ৩২ জন সরকার কর্তৃক মনোনয়নের দ্বারা ভর্তি হয়। উল্লেখ্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনয়নের মাধ্যমে ভর্তি করা যেত। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিভাগ না থাকলে মনোনয়ন নিয়ে তৃতীয় বিভাগ পাওয়া শিক্ষার্থী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারত। অবিভক্ত বাংলার সময় একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। এ সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ চৌধুরী উল্লেখ করেন,

> Some scheduled castes students were admitted into the Medical College and Medical Schools but the fact is that after the riot many of them took scholarship money and went away to Calcutta. That is why, we are not maintaining any percentage for the scheduled casts at the present moment.[১১]

১৯৫০-৫১ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিম্নের তালিকায় পাওয়া যায়,[১২]

প্রথম বর্ষ	১২৯ জন
দ্বিতীয় বর্ষ	১৯৩ জন
তৃতীয় বর্ষ	১০৭ জন
চতুর্থ বর্ষ	১০২ জন
পঞ্চম বর্ষ	৪৯ জন
মোট	৫৮০ জন

এদিকে ১৯৫০ সালে কলেজগুলোতে আই.এসসি-তে নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে '*Morning News*' এ একটি সমালোচনামূলক খবর প্রকাশিত হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয় যে, ম্যাট্রিকে কোর্স পছন্দের ক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে ডমেস্টিক সায়েন্স এবং গণিত ছিল। এমন নারী শিক্ষার্থীদের আই.এসসি.'তে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ই বিকল্প নেই। তাদেরকে অবশ্যই অন্যান্য বিষয় (পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান) ছাড়াও গণিত নিতে হবে। স্বাভাবিকভাবে যে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক পর্যায়ে গণিতের প্রাথমিক ভিত্তি ছিল না, তাদের উচ্চতর আই.এসসি কোর্সে গণিত নেওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল। বিশেষ করে চিকিৎসাশিক্ষার জন্য রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের মতো বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরি ছিল। গণিতের বিকল্প কোনো বিষয় গ্রহণ না করে, তাদেরকে এটা নিতে বাধ্য করা হলে সম্পূর্ণরূপে আই.এসসি পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম হবে বলে উল্লেখ করা হয়। চিকিৎসাশিক্ষা এবং অন্যান্য পেশাদার শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে আই.এসসি.'তে বিজ্ঞানের কোর্স নেওয়ার ক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক নারী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বাধা বলে গণ্য করা হয় এবং একটি কঠিন ব্যাপার ছিল। জাতীয় স্বার্থের জন্য এটি ক্ষতিকর ছিল। উপরে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মিটিংয়ে বিষয়টির নিয়ম শিথিল করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়, যাতে নারী শিক্ষার্থীরা গণিত ছাড়াই উচ্চতর পড়াশোনায় বিজ্ঞান নিতে সক্ষম হন। বিশেষ করে চিকিৎসাশিক্ষায় অধ্যয়ন করার ক্ষেত্রে। এরূপ অবস্থায় ২৯/১০/১৯৫০ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের কাছে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করার জন্য তুলে ধরেন[১৩],

১. কোনো মহিলা শিক্ষার্থী আই.এসসি কোর্স সমাপ্তির পর চিকিৎসাশিক্ষায় পড়তে ইচ্ছুক এমন শিক্ষার্থীদের আই.এসসি কোর্সে গণিত নিতে বাধ্য করা উচিত কিনা?

২. চিকিৎসাশিক্ষায় পড়াশোনার জন্য নিজেকে যোগ্য করে তোলার জন্য গণিত নেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা?

৩. আই.এসসি. কোর্সে অধ্যয়নের জন্য একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে গণিত রাখা উচিত কিনা এবং

৪. মেডিকেলে অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো পূর্ব সংস্কার ছাড়াই আই.এসসি কোর্সে গণিতের পরিবর্তে শিশু মনোবিজ্ঞানের মতো কোনো বিষয় নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার্থীরা অনুমতি পাবে কিনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের ডিন টি. আহমেদ (১৯৪৮-১৯৫২) জানান যে,

> That Mathematics is not necessary in I. SC for medical student provided the student has passed the matriculation Examination in Arithmetic, Algebra and Geometry.[১৪]

৩০/১১/১৯৫০ তারিখে ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের উপরি-উক্ত বিষয়টি ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স এ প্রেরণের জন্য একাডেমিক কাউন্সিল সুপারিশ করে। এই বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পূর্ববাংলা সরকারের এডুকেশন ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগের সহকারী সচিবকে জানান। ১৮/১২/১৯৫০ তারিখে ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের রেজুলেশনের ব্যাপারে নিম্নের সুপারিশ করে,

> That the Faculty of Medicine is free to take a student without having Mathematics in I. SC but Mathematics should not be optional subjects in I. SC Examination of the University of Dacca.[১৫]

এ ছাড়া ১৬/১/১৯৫১ তারিখে অনুষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স এর সভায় এই ব্যাপারে আরেকটি সুপারিশ করা হয়,

> That as special cases lady students may be allowed to take up I.SC course without Mathematics.[১৬]

ফলে ১৭/১/১৯৫১ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদ ১৯৫১ সালের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত সভায় ‘শিক্ষার্থীদের আই.এসসিতে ভর্তির ক্ষেত্রে গণিতকে বাধ্যতামূলক বিষয় থেকে বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে’ একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৭] তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ২২/১/১৯৫১ তারিখে অনুষ্ঠিত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত পর্যবেক্ষণ করে উল্লেখ করেন এবং যুক্তি দেন যে, যারা মেডিকেল কোর্স নেওয়ার ইচ্ছাপোষণ করে আর যারা করে না, তাদের মধ্যে কোনো বৈষম্য তৈরি করা অধ্যাদেশের বাঞ্চনীয় ও অনুশীলনযোগ্য নয়। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের রেজুলেশনে কিছু আই.এসসি শিক্ষার্থীদের একটি কম বিষয় নিয়ে পরীক্ষায় পাশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ ১০০০ নম্বরের পরিবর্তে ৮০০ নম্বরের পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। একাডেমিক দিক থেকে এটা খুবই অসন্তোষজনক। তাই তাঁর যুক্তি ছিল কেবলমাত্র গণিতকে আই.এসসি পরীক্ষার ঐচ্ছিক বিষয় করা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও এরূপ নিয়ম বিদ্যমান। তাছাড়া বিদ্যমান (১৯৫০) অধ্যাদেশে বর্ণনা করা হয়, একজন আই.এসসি শিক্ষার্থীর ১০০ নম্বরের ইংরেজি এবং ১০০ নম্বর মাতৃভাষা ভার্নাকুলার নেওয়ার পাশাপাশি নিম্নের তিনটি বিষয় বাধ্যতামূলক,

১.	পদার্থ	১০০
২.	রসায়ন	১০০
৩.	গণিত	১০০

এবং নিম্নের ঐচ্ছিক বিষয়,

১.	জীববিজ্ঞান	১০০
২.	উদ্ভিদবিদ্যা	১০০
৩.	প্রাণিবিদ্যা	১০০
৪.	ভূগোল	১০০
৫.	ডায়িং (Dyeing)	১০০

এর পরিবর্তে তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নের দুইটি বিষয় বাধ্যতামূলক গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেন,

১. পদার্থ

২. রসায়ন

এবং নিম্নের ঐচ্ছিক বিষয়ের যে কোনো দুইটি বিষয়,

১. গণিত

২. জীববিজ্ঞান

৩. উদ্ভিদবিদ্যা

৪. প্রাণিবিদ্যা

৫. ডায়িং (Dyeing)

তিনি আরো উল্লেখ করেন, এই বিষয়ে একটি অধ্যাদেশ গ্রহণ করা যায় যে, গণিত ছাড়া যেসব শিক্ষার্থী আই.এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তারা বি.এসসি. (পাশ বা অনার্স) বা গণিত নিয়ে বি.এ. কোর্সে ভর্তি হতে পারবে না। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল রেগুলেশনে নিম্নের শব্দ পুনরায় যুক্ত হতে পারে,

> That Mathematics be made an Optional subject for the I.SC course that students passing the I.SC. Examination without Mathematics, be not admitted to the B.Sc. course (Pass or Hon's) and that the ordinance be amended accordingly.[১৮]

এই সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স এবং রেগুলেশনের সংশোধন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হয়। অর্ডিন্যান্স এবং রেগুলেশনের অধ্যায় XXVI, পার্ট 1-A, ধারা 6 এর একটি বিধি হিসেবে সন্নিবেশিত করা হয়, যা পূর্ব উল্লিখিত ২২/১/১৯৫১ তারিখের সিদ্ধান্তটি। অনুরূপভাবে অর্ডিন্যান্স এবং রেগুলেশনের (ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন) অধ্যায় XXVII-B, Part-II, ধারা ২ এর ১ অনুচ্ছেদের নিম্নের সংশোধন করা হয়,

> The minimum qualification for admission to the course shall ordinarily be first division I.SC. with (a) Physics (b) Chemistry (c) Biology or Geography from the Dacca University or an equivalent examination with the same subjects, of some other approved University or Board. But the admission committee may accept for admission candidates who have passed the I.SC Examination with the above group of subjects in the second division. In no case shall a candidate who has passed the I.SC Examination in the third division be admitted.[১৯]

এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেসব শিক্ষার্থী গণিত ছাড়া আই.এসসি পরীক্ষা পাশ করবে তারা মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাছাড়া গ্রেট ব্রিটেনের মেডিকেল কাউন্সিল মাধ্যমিকে বিজ্ঞান কোর্সের ব্যাপারে নিম্নের সুপারিশ করেন,

> Mathematics is not essential for the students of medicine.[২০]

এটা সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় এবং তরুণ মস্তিষ্কের ওপর অতিরিক্ত চাপ। ত্রিকোণোমিতি, পরিসংখ্যান, গণিতবিদ্যা, বীজগণিত প্রভৃতি জটিল বিষয়, যা প্রতিটি মেডিকেলের শিক্ষার্থী প্রথম বর্ষের শেষে ভুলে যেতে বাধ্য, বরং ফার্মাকোলজি বোঝার জন্য রসায়ন এবং এনাটমি ও ফিজিওলজি বোঝার জন্য জীববিজ্ঞান দরকার। অতএব মেডিকেলে অধ্যয়নে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক বিজ্ঞান কোর্সে গণিতকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া উচিত বলে উল্লেখ করা হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রদের নেওয়া হতো। সে ক্ষেত্রে কখনও কখনও অভিযোগ করা হতো যে, এই প্রদেশের চেয়ে অন্যান্য প্রদেশের ছাত্রদের বেশি ভর্তি করা হয়। এই বিষয়টি ১৯৫০ সালের লেজিসলেটিভ এসেম্বলির সদস্য শরফুদ্দিন আহমেদ এসেম্বলিতে উৎথাপন করেন।[২১] ১৯৫১-৫২ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৪৬ জন,[২২] ১৯৫২-৫৩ সালে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ৭৪৮ জন [২৩] [বিস্তারিত দেখুন *পরিশিষ্ট-৩০*]।

১৯৫২ সালের সরকারি একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, পূর্ববাংলা সরকারের প্রধান সচিবের নিকট পাকিস্তানের কাশ্মির বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জম্মু এবং কাশ্মীরের শরণার্থী শিক্ষার্থীদের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে কিছু আসন সংরক্ষণের জন্য আবেদন করেন। জম্মু এবং কাশ্মিরের কিছু শিক্ষার্থী ভারতীয় কাশ্মির থেকে পাকিস্তানে মাইগ্রেশন করে চলে আসে। ভারতীয় কাশ্মির থেকে পাকিস্তানের স্থানান্তরিত জম্মু কাশ্মির শরণার্থী শিক্ষার্থীদের পাকিস্তান মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে বড় ধরনের অসুবিধা দেখা দেয়। এই মন্ত্রণালয় শরণার্থী শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য সকল সহায়তা দিতে ইচ্ছুক ছিল। কাশ্মির সরকারের প্রার্থীর জন্য প্রাদেশিক সরকার ঢাকা মেডিকেল কলেজে কতটি আসন সংরক্ষণ করতে পারবে? এই ব্যাপারে জানতে চেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে, কেননা তাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছিল।[২৪] ১৯৫৩-৫৪ সালে এই কলেজের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮০০ জন,[২৫] ১৯৫৪-৫৫ সালে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৬৫ জন,[২৬] ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮৯২ জন ছিল।[২৭] [বিস্তারিত দেখুন *পরিশিষ্ট-৩০*]।

১৯৫৬-৫৭ সালে প্রথম বর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল ডা. নওয়াব আলী (১৯৫৩-৫৪, ১৯৫৫-৫৭) প্রধান এবং কলেজের কিছু সংখ্যক সদস্য, প্রাদেশিক আইন পরিষদের বেশির ভাগ সদস্যদের নিয়ে গঠিত সিলেকশন কমিটি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়। ২৬০ জন আবেদনকারীর মধ্যে ১০০ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে সরকারের মনোনয়নের মাধ্যমে আরো শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ সময় মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮৮৭ জন।[২৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ডব্লিউ. এ. জেনকিন্স (১৯৫৩-৫৬) এর সভাপতিত্বে ২৪ জন সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সের শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়। এ সময় (১৯৫৬) মেডিকেল কলেজে ভর্তি বিলম্ব হয়। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মেডিকেলে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী নানারকম বঞ্চনার স্বীকার হয়। এই ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগের সভাপতি আবদুল মমিন তালুকদার স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষন করেন।[২৯] এ সময় দক্ষিণ আফ্রিকার একজন বিদেশি শিক্ষার্থী চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় পাশ করে। এ ছাড়া একজন নেপালি শিক্ষার্থী প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়। তিনি পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিল এবং ভারত থেকে একজন নারী শিক্ষার্থী, যিনি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন।

অপরদিকে ১৯৫৭-৫৮ সালে প্রথম বর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি পদ্ধতি প্রথমবারের মতো পরিবর্তন করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের আই.এসসি পরীক্ষার অর্জিত নম্বরের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচিত করা হয়। ফলে ৩০৫ জন আবেদনকারীর মধ্য থেকে কেবলমাত্র ১০০ জনকে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়। যোগ্য শিক্ষার্থী নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে প্রিন্সিপালকে কিছু সংখ্যক অধ্যাপক সহযোগিতা করে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম (১৯৫৬-১৯৫৮) এর সভাপতিত্বে সিলেকশন কমিটি সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সে ৩৫ জনকে ভর্তি করে। এ সময় মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯১২ জন।[৩০]

১৯৫৮-৫৯ সালে দেখা যায় যে, আবেদনকরীদের আই.এসসি পরীক্ষার অর্জিত নম্বর এবং সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। এই কাজটি প্রিন্সিপালের সভাপতিত্বে অধ্যাপকদের নিয়ে গঠিত ছোট একটি কমিটি সম্পাদন করে। এ বছরও নির্বাচন কমিটির সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম (১৯৫৬-৫৮) এবং স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক দফতরের কর্মকর্তা এবং কলেজের কিছু সংখ্যক অধ্যাপক সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার নেন। কিছু নারী শিক্ষার্থীসহ ৭৬ জনকে বাছাই করা হয়। পূর্বের বছরের তুলনায় তিনগুন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।[৩১] [*পরিশিষ্ট দেখুন-৩০*]

১৯৫৯-৬০ শিক্ষাবর্ষে সিলেকশন কমিটি ১০৬ জনকে বাছাই করেন। সরকার এ বছর সংক্ষিপ্ত এম. বি. বি. এস কোর্সের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে উক্ত কোর্সে লাইসেন্সিয়েটদের ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত নেন। তাছাড়া ১৯৫৯ সালে যারা আই.এসসি পরীক্ষায় শতকরা ৪০ নম্বর পায়, তাদেরকে মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে আবেদন করার অনুমতি দেওয়া হয়। ঢাকা, রাজশাহীতে আই.এসসি. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করা শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের হারের ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকায় এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়।[৩২] এ বছর একজন নেপালি শিক্ষার্থী এম.বি.বি.এস. পরীক্ষা পাশ করে। একজন ছাত্রীসহ দুইজন বার্মিজ শিক্ষার্থী কলেজে অধ্যয়ণরত ছিল।[৩৩]

১৯৬০-৬১ সালে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পাঠের ধারাবাহিকতার পাশাপাশি আই.এসসির নম্বর এবং প্রফেশনাল পাঠের দক্ষতা অর্জনের জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়। এ সময় পরপর পাঁচদিন আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় এবং তাদের মধ্য থেকে ৯৮ জনকে বাছাই করা হয়। এ সময় মোট শিক্ষাথীর সংখ্যা ছিল ৮৩৪ জন।[৩৪] [বিস্তারিত *পরিশিষ্ট দেখুন-৩০*]

এই কলেজে অধ্যয়ণরত বিদেশি শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ বার্মা থেকে আসে। এর সংখ্যা ৩ জন ছাত্রীসহ ৬ জন ছিল। ১জন বার্মিজ ছাত্র এবং ১ জন ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় পাশ করে। এ ছাড়া পূর্ব আফ্রিকার একজন নারী শিক্ষার্থী চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় পাশ করে। এই কলেজের চতুর্থবর্ষে অধ্যয়ণরত ১ জন নেপালি ছাত্র পাকিস্তান সরকারের সাংস্কৃতিক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। ১৯৬১-৬২ সালে পূর্বের নিয়মে ছাত্ররা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। কয়েক বছর পর লাইসেন্সিয়েটেরা মৌলিক বিষয়ে পরীক্ষার ফলাফল স্বরূপ মেধার ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সে ভর্তি হয়। এ সময় কলেজে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭০১ জন[৩৫] এবং বিদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন বার্মিজ (শান রাজ্য), একজন থাইল্যান্ডের (মুসলিম ছাত্র), একজন উগান্ডার কাম্পালার, একজন নেপালি ছাত্র ছিল। নেপালি ছাত্র পাকিস্তান সরকারের সাংস্কৃতিক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছিল। এই ছাত্র চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি প্রাপ্ত হয়। পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের দ্বারা একজন অ-মুসলিম ভারতীয় মাদ্রাজি ছাত্র ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়। তিনি মালে থেকে আসেন।

১৯৬২-৬৩ সালে বাছাই কমিটি ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতা নূন্যতম দ্বিতীয় বিভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সে অধ্যয়নে ইচ্ছুক লাইসেন্সিয়েটদের জন্য মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজে কোর্স খোলা হয় এবং চিরকালের জন্য এরূপ ভর্তিচ্ছুকদের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৩৬] এ সময় মোট বিদেশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫০% ছিল বার্মিজ অর্থাৎ মোট ১২ জন ছিল। এর মধ্যে ১ জন বার্মার

শানরাজ্যের এবং আরেকজন মালয়ের ছিল। অন্যান্যরা উগান্ডা, সিঙ্গাপুর, নেপাল, কেনিয়া, টাঙ্গানিকা থেকে আসে।

১৯৬৩-৬৪ সালে ৪০০'র বেশি আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এর মধ্য থেকে ১৪৫ জনকে নির্বাচন করা হয়। এই ১৪৫ জন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রফেশনাল পার্ট-১, পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রথম দল। এর ফলে এটা কেবলমাত্র পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের বিধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণই নয়, বরং উক্ত পরীক্ষার প্রথম দল হওয়ায়, মেডিকেল অধ্যয়নের সে সময়ের কোর্সটি পশ্চিম পাকিস্তানের সব মেডিকেল কলেজের মতো হয়।[৩৭]

১৯৬৪-৬৫ সালে নারী শিক্ষার্থীসহ ১১২ জন আবেদনকারীকে বাছাই করা হয়। এই নারী শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ঢাকা, কুমিল্লা এবং যশোরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডের এইচ.এস.সি (বিজ্ঞান) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করে।[৩৮] এই কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ বিদেশি শিক্ষার্থী। ৩ জন নেপালি, ১জন মালেয়শিয়ান কলম্বো প্লান প্রশিক্ষণার্থী ছিল, ৩ জন মালয়শিয়ান, ১জন পেলেস্টাইন এবং একজন বার্মিজ (শান রাজ্য) সবাই পাকিস্তান সরকারের সাংস্কৃতিক বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র ছিল। দুইজন বার্মিজ নারী শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেডিসিন এবং সার্জারিতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং তারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চাকুরি করেন।

১৯৬৫-১৯৬৬ সালে ৩০০জন আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় এবং তাদের মধ্য থেকে ১১৩ জনকে বাছাই করা হয়।[৩৯] ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের মেডিকেল কলেজে কোটা সংরক্ষণ করা হতো। অনুরূপভাবে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রদের জন্য কোটা সংরক্ষণ করা হতো। তবে শতকরা কতজনের জন্য রাখা হতো তা জানা যায় নি।[৪০] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণীতে ১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিচ্ছু ১৫৫জন শিক্ষার্থীকে দেখানো হলেও *East Pakistan Provincial Assembly* (First Session) তে দেখা যায় ১৯৬৫ সালে ১৪৬ জন শিক্ষার্থীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। তার মধ্যে ১১৫ জনকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বাছাই করা হয় এবং ৩১ জনকে সরকার কর্তৃক মনোনয়ন দেওয়া হয়। [*পরিশিষ্ট দেখুন*- ৩১]

১৯৬৬-৬৭ সালে ৪০০ জন আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার ৫দিনে নেওয়া হয় এবং তাদের মধ্য থেকে ১১৩ জনকে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা হয়।[৪১] এ সময় একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, দক্ষিণ আফ্রিকার মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দেয়নি। তাই দক্ষিণ আফ্রিকান ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস. পরীক্ষা পাশ করার পর এই কলেজ থেকে মাইগ্রেশন করে করাচির ডাউ মেডিকেল কলেজে চলে যায়। সেখানে সে ১৯৬৬-৬৭ সালে ৪র্থ বর্ষে অধ্যয়ন করে। কারণ করাচি এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ডিগ্রি দক্ষিণ আফ্রিকার মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত ছিল।[৪২]

১৯৬৮ সালে প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীদের এইচ.এস.সি (মেডিকেল) পরীক্ষায় অর্জিত নম্বরের ভিত্তিতে কঠোরভাবে এই মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৮ সাল থেকে মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক মনোনয়ন বাতিল করা হয়।[৪৩] এ সময় মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭১৫ জন এবং চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষার পাশকৃত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল মোট ১৩১ জন।[৪৪] ১৯৬৯-৭০ সালে পূর্বের শিক্ষাবর্ষের মতো অর্জিত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়,[৪৫] কেননা ১৯৬৮ সালে সরকার কর্তৃক মনোনয়ন পদ্ধতি বাতিল করা হয়, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যদিকে ১৯৭০ সালের মার্চ/এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় পাশকৃত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ,[৪৬]

ছাত্র	৭৪ জন
ছাত্রী	৩১ জন
মোট	১০৫ জন

এ সময় সম্পূর্ণ চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ৩২ জন ও ছাত্রী ১৪জন তথা সর্বমোট ৪৬ জন। ৪৬ জনের মধ্যে পাশ করে ৪৪ জন। এর মধ্যে ৩০ জন ছাত্র, ১৪ জন ছাত্রী।[৪৭] অন্যদিকে ১৯৭০ সালের মার্চ/এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় পাশকৃত বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা,[৪৮]

দেশ	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
ইউ.এস.এ.		১	১
জর্ডান	১		১
মালয়শিয়া	১		১
নেপাল	৩		৩
সিলন (শ্রীলংকা)	১		১
মোট			**৭ জন**

মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী হিসেবে তাদের ক্যারিয়ার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রি-মেডিকেল শিক্ষার ওপর নির্ভর করত। চিকিৎসাশিক্ষায় ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের আই.এসসি. পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করার প্রয়োজন, কেননা তারাই সে সময়ে চিকিৎসাশিক্ষার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হতো। সাধারণত শিক্ষার্থীদের একটি কমিটি বাছাই করত। যার কিছু সদস্য ডাক্তার এবং বেশিরভাগ সদস্য প্রদেশের বিভিন্ন অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধি অর্থাৎ আইন সভার সদস্য ছিলেন। প্রতিবছর বি.এস.সি. পাশকৃত কিছু শিক্ষার্থী নেওয়া হতো। এই কমিটির বাছাইয়ের ওপর সরকার কর্তৃক আরেকটি কমিটি বাছাই করা হতো এবং যেসব শিক্ষার্থীদের বাছাই কমিটি বাদ দিত তাদেরকে সরকারের মনোনয়নের মাধ্যমে প্রায়ই নেওয়া হতো।

বাছাই কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে যেসব ছাত্র মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতো তারা সবসময় যোগ্য ছিল না। তাদের বেশিরভাগ ইংরেজি ও সাধারণজ্ঞানে দুর্বল ছিল এবং নিজস্ব মত প্রকাশের অভাব ছিল। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার যোগ্যতা অসন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়নি। তাছাড়া মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক এসব প্রার্থীদের চিকিৎসাশিক্ষায় অধ্যয়নের জন্য উপযুক্ত বিজ্ঞানের ভিত পুরোপুরি ছিল না। এ কারণেই ম্যাট্রিক ক্লাসে রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মতো সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানের বিষয়গুলো বাংলায় শেখানো হতো। ইন্টারমিডিয়েটের সময়ে শিক্ষার্থীরা পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞান শিখে। দেশ বিভাগের পূর্বে কলকাতা মেডিকেল কলেজে এবং দেশ বিভাগের পরে পূর্ববাংলায় উল্লেখ করা হয় যে, এই বিষয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশ বিভাগের কারণে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নের মতো বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোর শিক্ষাদানে সাজসরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির অভাব এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কারণে এর অগ্রগতির অবনতি ঘটে। ফলে ক্লাশে তাত্ত্বিক লেকচার প্রদানের সময়ে বিষয়ের ওপর পর্যাপ্ত ব্যবহারিক শিক্ষাদান ছাড়াই পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিষয়গুলো ইতিহাস, ভূগোলের মতো পড়ানো হতো। এই বিষয়গুলো অসম্পূর্ণভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো তথা ব্যবহারিক শিক্ষা অপর্যাপ্ত ছিল এবং তাদের অপর্যাপ্তভাবে পড়ানো হতো।[৪৯]

এই দুর্বল অভিজ্ঞতা নিয়ে শিক্ষার্থীদের চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রবেশ করা কঠিন ছিল। বিদেশের প্রতিটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে মৌলিক বিজ্ঞান তথা পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নের মতো বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়। এর ফলে সে সময় এগুলো বায়োফিজিক্স এবং বায়োকেমিস্ট্রি নতুন নামে পরিচিত লাভ করে। এই বিষয়গুলো চিকিৎসাশিক্ষার ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। দেশ বিভাগের পূর্বে ডিগ্রি কলেজের ৮০% শিক্ষক হিন্দু ছিল এবং দেশ বিভাগের পরে বেশিরভাগ হিন্দু শিক্ষক ভারত চলে যায়। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার মান খারাপ হয়ে যায় এবং ফলস্বরূপ দুর্বল বা কম যোগ্যতার শিক্ষার্থীদের চিকিৎসাশিক্ষার জন্য নেওয়া হয়, তবে এই ব্যাপারে একটি ইতিবাচক মন্তব্য উল্লেখ করা হয়,

> It is to be hoped that when the effect of sudden partition has been over come in the general education of scientific subjects, a better type of students will be available for the study of medicine.[৫০]

সদ্য প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজে পঞ্চাশের দশক ও ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভৌগলিক ও মনোনয়নের ভিত্তিতে এবং কম মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়। পর্যাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থী না থাকায় সে সময়ের প্রেক্ষাপটে যারা যোগ্য বলে বিবেচিত হতো তাদের ভর্তি করা হয়। মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং অন্যান্য প্রদেশের শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও তা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। ১৯৬০ এর দশক থেকে কেবলমাত্র মেধা ও প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়। এই ব্যাপারটি পরবর্তীকালে কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়, যাতে এই কলেজ থেকে পাশ করা চিকিৎসকদের গুনগত মান বজায় থাকে।

সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স

মেডিকেল স্নাতকদের অভাব পূরণের জন্য পাকিস্তান সরকারের সম্মতিতে ১৯৫১ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স চালু হয়। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই কোর্স চালু করার জন্য দাবি করা হয়, কিন্তু নানা কারণে বিলম্ব হয়। ১৯৪৩ সালে গঠিত 'ভোর কমিটি' দেশের বেসিক ডাক্তারদের অভাব পূরণের জন্য লাইসেন্সিটয়েদের জন্য দুই ধরনের পি.জি (পোস্ট গ্রাজুয়েট) প্রশিক্ষণের সুপারিশ করে।[৫১] এই কমিটির তিন সদস্য ডাক্তার আমেসুর, ডাক্তার ইউ.বি. নারায়ণ রায় এবং পণ্ডিত এল. কে. মিত্র মেডিকেল লাইসেন্সিয়েটদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের অনুমতি দেওয়া এবং কোর্স সম্পন্ন করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ডিপ্লোমা প্রদান করার পরামর্শ দেন।[৫২] তারা আরো বলেন,

> There is a very large number of licentiates in the country who are specialists in different branches of Medicine and Surgery. We feel that they should have unfettered chances to take up and compete for university postgraduate degrees and diplomas in their specialties without undergoing the complete university M.B.B.S course.[৫৩]

চিকিৎসাশিক্ষার মান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য এই কোর্সটি চালু করা জরুরি। তখন লাইসেন্সিয়েট পাশ করা ডাক্তারের সংখ্যা ছিল অনেক। তারা নিজেরাও এই ডিগ্রি নেওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিল। তাছাড়া কলকাতায় এই কোর্সটি চালু ছিল। তাই পূর্ববাংলার লাইসেন্সিয়েটদের দাবির পাশাপাশি লেজিসলেটিভ এসেম্বলি সদস্যরা এটা কার্যকর করার জোর দাবি জানায়। ১৯৫০ সালে আইনসভার সদস্য খয়রাত হোসেন বিষয়টি আইন সভায় উত্থাপন করেন।[৫৪] ইতিমধ্যে পাকিস্তানের লাহোর মেডিকেল কলেজে এই কোর্স চালু ছিল। সেখানে পূর্ববাংলার ছাত্ররা আবেদন করলেও ভর্তির

সুযোগ তেমন পেত না। আবার মেডিকেল কলেজে সীমিত আসন থাকার কারণে সবাই ভর্তির সুযোগ পেত না। তাই এই কোর্স চালু হলে তাতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনে সুযোগ হবে। আরেকজন সদস্য ডাক্তার মোঃ মোজাম্মেল হোসেন একই বিষয় সভায় উত্থাপন করেন এবং বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[৫৫]

এ সমস্ত দাবির কারণেই ঢাকা মেডিকেল কলেজে সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স চালু হয় এবং ৩০টি আসন বরাদ্দ করা হয়। আবার এই ৩০টি আসনের মধ্যে ৫টি আসন উপ-সহকারী সার্জনদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। অবিভক্ত বাংলার সাথে দেশভাগের পর পূর্ববাংলার কোর্সের পার্থক্য ছিল। কলকাতায় প্রাথমিকভাবে প্রাক্তন সামরিক লাইসেন্সিয়েটদেরকে এম.বি. ডিগ্রি অর্জন করার সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত কোর্স চালু হয়। এসব সামরিক লাইসেন্সিয়েটদের নন কলজিয়েট হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তাদের শিক্ষা খরচ সরকার বহন করত। অথচ পূর্ববাংলায় যে পাঁচজন উপ-সহকারী সার্জনের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়, তাদের জন্য কোনো শর্তাবলী নির্ধারিত হয়নি, বরং তাদের চাকুরির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য প্রত্যেককে অর্জিত ছুটি এবং বাকি সময়ের জন্য অতিরিক্ত সাধারণ ছুটি দেওয়া হয়।

এদিকে সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে মেডিকেল স্নাতকের অভাবের বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার Medical Practitioner Act, 1950 পাশ করে। এই আইনের অধীনে বেসরকারি ডাক্তারদের ওপর ২০০০ রুপি জরিমানা এবং ৬ মাসের আর.আই. এর অধীনে ৩ বছর সরকারি চাকুরি করতে বাধ্য করার নিয়ম করা হয়। এতে উল্লেখ করা হয়,

> These permanent Sub- Assistant Surgeons are bound to the Government by deed of registered bonds of Rs. 1000/- each to serve the Govt of East Bengal as well as the Govt of Pakistan both in the Civil and in the Army during the first 10 years of their services.[৫৬]

এ ছাড়া রেডিওলজি প্রশিক্ষণে যোগদানকারী উপসহকারী সার্জনদের বিবেচনা করা হয় এবং তাদেরকে পূর্ণবেতন, বিনামূল্যে টিউশন ফি, ভর্তি ও পরীক্ষা ফি এবং প্রতি মাসে লজিং ভাতা ৩০ রুপি দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়। পি.জি. প্রশিক্ষণে যোগদানকারী উপ-সহকারী সার্জনদের বেতন, বিশেষ বেতন, পদের সংযুক্ত ক্ষতিপূরণ ভাতা প্রদান করা হবে।[৫৭] উপরিউল্লিখিত প্রশিক্ষণে যোগদানকারী উপ-সহকারী সার্জনদের সুবিধা দেওয়ার আলোকে সুপারিশ করা হয় যে, উপ-সহকারী সার্জনদের এমন সুযোগসুবিধা এবং তাদের অধ্যয়নের সময়ে ডেপুটেশন প্রদান করা উচিত। দীর্ঘমেয়াদী কোর্স ও আর্থিক সংকটের কারণে তাদেরকে অতিরিক্ত কোনো ভাতা দেওয়া হবে না। তাই বিকল্প হিসেবে তাদেরকে বিনামূল্যে টিউশন ফিসহ শিক্ষা ছুটি প্রদান করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। ৪/৮/১৯৫৩ তারিখে সার্জন জেনারেলের নোটে উল্লেখ করা হয় যে,

> There was no discussion either by S.G or by the secretariat that Govt. would be committed to pay anything more for the 5 seats out of 25 seats reserved for admission of licentiate candidate belonging to the Govt. Medical Service. Therefore, no importance can be attached to the reservation of 5 seats for licentiate belonging to Govt. Medical Service so far any additional financial commitment on the part of the Govt. is concerned. These Government servants may be paid whatever is permissible according to the existing rules.[৫৮]

মেডিকেল স্নাতক হিসেবে নিজেদের যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পেতে লাইসেন্সিয়েটদের জন্য সংক্ষিপ্ত মেডিকেল কোর্স চালু হয়। তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের খরচ বহন করা সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। পূর্ববাংলার চিকিৎসাশিক্ষা কেবল সেবাই নয় বরং বড় ধরনের শক্তি। দেশ বিভাগের পরে সিলেট এবং রাজশাহীতে আরো দুইটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে লাইসেন্সিয়েটরা সরকারি এবং বেসরকারি চাকুরিতে নিজেদের যোগ্যতাকে আরো বৃদ্ধি করার জন্য সংক্ষিপ্ত মেডিকেল কোর্সে যোগদান করে। পূর্ববাংলা সরকার নৈতিকভাবে এই পাঁচজনের শিক্ষা খরচ বহন করতে বাধ্য হয়। তাই ১৯৫০ সালের LXXX নং আইনটি ডাক্তারের অভাব পূরণের একটি অসামান্য দলিল এবং এরূপ আইন অবিভক্ত বাংলায় ছিল না।[৫৯] তাদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বৃদ্ধি জনগণের জীবন ও মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত এবং জনগণকে ভালো চিকিৎসা সেবা দেওয়ার পথে তারাও বাধা। তাদের যোগ্য করে তুলতে সুযোগসুবিধা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। তাই তাদের জন্য প্রথম দিকে ডেপুটেশন ডিউটি বিবেচনা করা না হলেও পরবর্তীতে বিবেচনা করা হয়।

উল্লেখ্য যে, সরকারের সংরক্ষিত ৫টি আসনের বিপরীতে ৫ জন স্থায়ী উপ-সহকারী সার্জনকে সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সে নেওয়া হয় এবং তারা ১৯৫২ সালে বিভাগের আদেশে যোগদান করে। আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, তাদের বেতন এবং শিক্ষাছুটি তখনও প্রদান করা হয়নি। অথচ নিয়ম ছিল যে, মেডিকেল বিভাগের একই প্রশিক্ষণ, রেডিওলজি, পোস্ট গ্রাজুয়েট বা স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অথবা অন্যান্য বিভাগে যেমন, স্বাস্থ্য সহকারী প্রশিক্ষণ এবং বি.টি. ট্রেনিং ইত্যাদি 'ডেপুটেশন ডিউটি' হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং বিনামূল্যে টিউশন ফি, পূর্ণবেতন এবং অন্যান্য ভাতা দেওয়া হবে। ১৯৫৬ সালে ৪টি মেডিকেল স্কুলের (ঢাকা মেডিকেল স্কুল, রাজশাহী মেডিকেল স্কুল, চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুল, ময়মনসিংহ মেডিকেল স্কুল) শিক্ষার্থীরা অন্বেষণ শুরু করে। তাদের দুইটি দাবি ছিল,[৬০]

১. প্রদেশের মেডিকেল স্কুলগুলোকে ৫-৬ বছরের মধ্যে মেডিকেল কলেজে রূপান্তর করা।

২. মেডিকেল স্কুল থেকে লাইসেন্স ডিগ্রি অর্জনের পরে কোনো বিরতি ও পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স করার অনুমতি দেওয়া।

সে সময় নিয়ম ছিল ম্যাট্রিক পাশের ক্ষেত্রে তিন বছরের ব্যবধান থাকবে এবং যারা আই.এসসি. পাশ করে তাদের জন্য দুই বছরের ব্যবধান থাকবে। তারপর তাদের মেডিকেল কলেজের কনডেন্সড কোর্সে ভর্তির অনুমতি দেওয়া হবে এবং এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি পাবে। তবে উল্লেখ করা হয় শিক্ষার্থীদের দাবির ক্ষেত্রে কোনো ফাঁক থাকা উচিত নয় এবং কনডেন্সড কোর্সের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি অর্জনের জন্য দুই বছরের কোর্স নির্ধারণ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে ম্যাট্রিক এবং আই.এসসি. পাশকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করে। যারা আই.এসসি পরীক্ষায় পাশ করার পর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় তাদের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি পেতে সাত বছর সময় লাগে। যারা ম্যাট্রিক পাশ করার পর মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হয় তাদের একই ডিগ্রি পেতে ছয় বছর সময় লাগে। তাই দীর্ঘকাল পর মেডিকেল স্কুলের শিক্ষার্থীরা এক বছরের বিরতিকে সম্মতি জানায় এবং পরবর্তীতে আই.এসসি সনদ পাওয়ার পর যারা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়, এই নিয়মিত মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে সাত বছরের কোর্সকে দুই বছর করার ক্ষেত্রে সম্মতি দেওয়া হয়, যা কেবিনেট কর্তৃক অনুমতি এবং ঘোষণা করা হয়। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে তৃতীয় দাবিটি আসে। তারা জোর দাবি জানায় যে, যারা এল.এম.এফ. পাশ করার পর কনডেন্সড কোর্সে ভর্তি হতে চায়, তাদের অবশ্যই ফার্মাকোলজির পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে, যা তখন বিদ্যমান ছিল না। যারা নিয়মিত ছাত্র হিসেবে মেডিকেল

কলেজে ভর্তি হয়, তাদেরকে কোর্সের নিম্নতর পর্যায়ে এই বিষয়ে পাশ করতে হয়। এটি নিয়ে একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়। আইন সভার সদস্যরা পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশন (পূর্বাঞ্চল জোন), পাকিস্তান লাইসেন্সিয়েট মেডিকেল এসোসিয়েশন এবং মেডিকেল শিক্ষার্থীদের এসোসিয়েশনের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। মূলত সমস্যাটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে মেডিকেল স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের যে অভিযোগ ছিল, তা পূর্ব পাকিস্তানের এসেম্বলি সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লেখ করে বলেন যে,

> The students of the Medical College say that if we accept their demand in full the result will be that after passing the matric examination a student will get his M.B.B.S degree in six years time. But as a medical college student he shall have to pass at least I.SC. examination and complete a course of 5.5 years. So, a boy who pass the matriculation examination and gets himself admitted into the Medical College shall have to study for 7 years. This is the complaint of the Medical College students.[৬১]

পরবর্তীতে দেখা যায় যে, ১৯৫৯ সালে অনেক বাক-বিতন্ডার পর প্রদেশের চিকিৎসাশিক্ষার দ্বৈত ব্যবস্থার (এল.এম.এফ. এবং এম.বি.বি.এস.) বিলোপ করা হয় এবং স্থির করা হয় যে, এরপর পর থেকে কেবলমাত্র এম.বি.বি.এস. কোর্সই চিকিৎসাশিক্ষা হিসেবে প্রদান করা হবে। তখন অনুমোদিত স্কুলের ডিগ্রিপ্রাপ্ত ডাক্তারগণ শর্তসাপেক্ষে কনডেন্সড এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি লাভ করতে পারবে। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত প্রদেশে ১টি মেডিকেল কলেজ ও ৪টি মেডিকেল স্কুল ছিল।[৬২] সে সময় সব মেডিকেল স্কুল বিলোপ করা হলেও সিলেট এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল স্কুল পুনরায় চালু করা হয়। রাজশাহী ও চট্টগ্রামে দুইটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়। তারপরও প্রদেশের চিকিৎসাশিক্ষায় পড়তে ইচ্ছুক ছাত্রদের সকল সমস্যা দূর হয়ে যায়নি এবং স্নাতক ডাক্তারের অভাবও পূরণ হয়ে যায়নি। ১৯৬০ সালের *দৈনিক ইত্তেফাক* থেকে জানা যায় যে,

> প্রদেশে সব সমেত প্রায় সাড়ে চার হাজার রেজিস্ট্রার ডাক্তার রহিয়াছেন। তন্মধ্যে মাত্র ৩ শতের মতো এম.বি.বি.এস. রেজিস্টার্ড ডাক্তার আছেন। অথচ সমগ্র প্রদেশে ৩০,০০০ ডাক্তারের প্রয়োজন। বর্তমানে পল্লী অঞ্চলের অনেক স্থানে ২৫/৩০ মাইলের মধ্যে একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তারও পাওয়া যায় না।[৬৩]

এমনি ধরনের চিকিৎসক সংকটের মধ্যে চিকিৎসাশিক্ষার আরেকটি বড় প্রশ্ন ছিল এল. এম. এফ. পাশ ডাক্তারদের কনডেন্সড কোর্সে ভর্তি হবার ক্ষেত্রে শর্তাবলী। এল. এম. এফ. পাশ করলেই কোনো ডাক্তার কনডেন্সড কোর্সে ভর্তি হবার সুযোগ পেতেন না। প্রথমত, আই.এসসি পাশ এল.এম.এফ. ডাক্তারদের কনডেন্সড কোর্সে ভর্তি হবার অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং আই.এসসি বিহীন চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে তিন বছরের অভিজ্ঞতা অর্জনের শর্ত আরোপ করা হয়। চিকিৎসাশিক্ষার মান সমান ও উন্নতর করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া প্রদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক বিবেচনা করে বিষয়টি পুর্নবিবেচনা করা উচিত বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেন। এল.এম.এফ. ডাক্তারদের কনডেন্সড কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের পূর্ব পাকিস্তানের XXIII নং অধ্যাদেশ যা 'The Dacca University Ordinance' নামে পরিচিত, উক্ত অধ্যাদেশের 39(C) নং ধারায় উল্লেখ করা হয় যে,

> The L.M.F. doctors who have passed I.SC (Medical Group, that is I.SC with Physics, Chemistry and Biology) examination of Dacca University or some other approved University or Board and must have put up 2 years uninterrupted professional practice after obtaining I L.M.F. or alternatively one year if one year had been spent as house physician or house surgeon in a Government Hospital, may be admitted to the condensed M.B.B.S course.[৬৪]

যাহোক ঢাকা মেডিকেল কলেজে সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সের কার্যক্রম ১৯৫২ সালে শুরু হলেও ১৯৫৯-৬০ সালে কলেজে সংক্ষিপ্ত কোর্সের ছাত্রদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে সরকার লাইসেন্সিয়টদের ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৬০-৬১ সালে লাইসেন্সিয়টদের ভর্তি পুনরায় স্থগিত করা হয় এবং এ বছর কাউকে ভর্তি করা হয়নি। ১৯৬১-৬২ সালে লাইসেন্সিয়েটদের মৌলিক বিষয়ে পরীক্ষার ফলাফল স্বরূপ মেধার ভিত্তিতে সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সে ভর্তি করা হয়। অপরদিকে ১৯৬২-৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.বি.বি.এস. কোর্সে অধ্যয়নে ইচ্ছুক লাইসেন্সিয়েটদের জন্য মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজে এই কোর্স খোলা হয়, তাই চিরকালের জন্য এরূপ ভর্তিচ্ছুকদের জন্য এই প্রতিষ্ঠান তথা ঢাকা মেডিকেল কলেজের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বর্ষের কনডেন্সড কোর্সের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিম্নের তালিকায় পাওয়া যায়,

শিক্ষাবর্ষ	সংখ্যা
১৯৫১-৫২	৩০ জন
১৯৫২-৫৩	৫৭ জন
১৯৫৩-৫৪	৬৭ জন
১৯৫৪-৫৫	৭০ জন
১৯৫৫-৫৬	৭৫ জন
১৯৫৬-৫৭	৮৮ জন
১৯৫৭-৫৮	৮৪ জন
১৯৫৮-৫৯	১৫২ জন
১৯৫৯-৬০	১১১ জন
১৯৬০-৬১	৯৫ জন
১৯৬১-৬২	৪৬ জন
১৯৬২-৬৩	৬২ জন
১৯৬৩-৬৪	৪৫ জন

উৎস: *Annual Report form* 1951-52 to 1963-64, *Dacca University*.

এভাবে ১৯৫০ এর দশকে সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স চালুর মাধ্যমে লাইসেন্সিয়েটদের স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয় এবং আরো দক্ষ করে তোলা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিয়মিত এম.বি.বি.এস. কোর্স শিক্ষার্থীদের সাথে তাদেরকে ভর্তি করানো হলে এই প্রতিষ্ঠানের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়, কারণ নিয়মিত শিক্ষার্থীদের পাঠদান বাধাগ্রস্থ হয়। ফলে কোর্সটি স্থগিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। উপরন্তু সে সময় পূর্ববাংলায় যেসব মেডিকেল স্কুল ছিল সেগুলো কলেজে রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উদ্যোগটি ১৯৪৬ সালে 'ভোর কমিটি' সুপারিশের ভিত্তিতে নেওয়া হয়। পূর্ববাংলার মেডিকেল স্কুলগুলো পর্যায়ক্রমে মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হলে কনডেন্সড কোর্স চালুর মধ্য দিয়ে মেডিকেল স্নাতকের অভাব পূরণের চেষ্টা করা হয় এবং মেডিকেল কলেজের ওপর অতিরিক্ত চাপ হ্রাস করা হয়।

পরীক্ষা পদ্ধতি ও ফলাফল

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের প্রথমবারের মতো প্রথম এম.বি.বি.এস. পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে বছরে দুইবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। দুই বছর পর তথা ১৯৫০ সালে প্রথম ব্যাচের দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস. পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫১ সালে প্রথম ব্যাচের প্রথম চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।[৬৫]

এ ছাড়া মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে প্রথম বর্ষ এবং তৃতীয় বর্ষের শেষে একটি বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ করতে হতো। পরবর্তী উঁচু ক্লাসে পদোন্নতি লাভের জন্য এই বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা তথা প্রথম ও দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস. পাশের পর তারা পরবর্তী উঁচু ক্লাসে পদোন্নতি পেত। যদি কোনো ছাত্র পরপর তিনবার প্রথম এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় ফেল করে, তাহলে তাঁকে এম.বি.বি.এস. কোর্সের অধ্যয়ন থেকে বিরত রাখা হতো। তাঁর চিকিৎসাশিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি উপায় বের করা হয়। উদাহরণস্বরূপ পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র এম.এম.এফ. কোর্স নিতে পারত এবং এর পরীক্ষাগুলো পূর্ববাংলার স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতো। তাই অকৃতকার্য ছাত্র পুরোপুরি এই পেশার বাইরে ছিল না। চূড়ান্ত এম.এম.এফ. পরীক্ষা পাশের পর তাঁকে জনসাধারণের চিকিৎসা করার অনুমতি প্রদান করা হয়। ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, প্রথম এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় তৃতীয়বারের মতো অকৃতকার্য হওয়ার কারণে যেসব শিক্ষার্থীর নাম অপসারণ করা হয়, তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যেসব শিক্ষার্থী নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় অথবা প্রথম এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় তৃতীয়বার অকৃতকার্য হয় তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করতে পারবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান বিধি শিথিল করে তাদের আরো সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। ফলে ২০/১/১৯৫২ তারিখ একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে উপরি-উক্ত সুপারিশের ওপর ব্যবস্থা নেওয়া হয়।[৬৬] এম.এম.এফ. ডাক্তারদের সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের 39(a) এবং (b) ধারায় বিস্তারিত বলা হয়।[৬৭]

ফলে দেখা যায় যে, ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম এম.এম.এফ. পরীক্ষায় ১৪ জনের মধ্যে ৮ জন ছাত্র এবং ১৯৫১-৫২ সালে ২৩ জনের মধ্যে ১০ জন এবং চূড়ান্ত এম.এম.এফ. পরীক্ষায় মাত্র ২ জন ছাত্র পাশ করে।[৬৮] এদিকে ১৯৪৮-৪৯ সালে চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় ১২ জন ছাত্র, ১৯৪৯-৫০ সালে ২০ জন, ১৯৫০-৫১ সালে ১৭ জন এবং ১৯৫১-৫২ সালে ৩২ জন পাশ করে।[৬৯] তবে ১৯৪৯-৫০ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণীতে* উল্লেখ করা হয় যে, পূর্বের বছরের তুলনায় পর্যালোচিত সময়ে প্রথম এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৮ সাল থেকে প্রথম এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় পাশ করা এবং অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নের তালিকায় পাওয়া যায়।[৭০]

পরীক্ষার তারিখ	অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা
জানুয়ারি ১৯৪৮	২৩	২৩
আগস্ট ১৯৪৮	৪৮	১৮
জানুয়ারি ১৯৪৯	৫৮	৩৪
আগস্ট ১৯৪৯	১১৪	৪২

১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে ২৮ জন শিক্ষার্থীর একটি ব্যাচ চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যে ১৫ জনের ফলাফল ভালো হয়। আবার ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৮ জন শিক্ষার্থীর আরেকটি ব্যাচ ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে অংশ নেয়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কারণে এক ধরণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এর ফলে আই.এসসি'র ফলাফলও বিলম্বে প্রকাশিত হওয়ার কারণে ভর্তি বিলম্ব হয়। এ ছাড়া অন্যান্য কারণে

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তারিখ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয় এবং কলেজের সেশনগুলো নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী শুরু করা সম্ভব হতো না, তাই বছরের অনিয়মিত সময়ে পরীক্ষা শুরু করতে হতো। এর ফলে পরীক্ষা ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়। অনেক সময় শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অপর্যাপ্ত সময়, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন না করা ইত্যাদি অজুহাতে পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের জন্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন এবং কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরীক্ষা স্থগিত করার জন্য এরূপ সিদ্ধান্ত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হতো। ঢাকা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ, পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রধান ভূমিকা রাখেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল একা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। ১৯৫১ সালের চতুর্থ বর্ষের মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা এম.বি.বি.এস. পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তনের জন্য প্রিন্সিপালের মতামত নিয়ে আবেদন করে। এই ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী পরিষদ বিবেচনাপূর্বক উল্লেখ করে যে,

> Joint application (22.11.1951) from 4th year Medical student for shifting the date of the ensuing M.B.B.S Examination from the 16th January 1952, to any suitable date not earlier than the middle of February and not later than the middle of March, 1952 together with opinion of the principal Medical College in this connection.[৭১]

ফলে উপরি-উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পাঁচজন সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপাচার্যকে বিষয়টির সমাধান করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।[৭২]

চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় পাশকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮০ জন ছাত্র এবং ১ জন ছাত্রী ছিল। মোট ভর্তির বিবেচনায় পাশের হার খুবই কম। এর কারণ মেডিকেল অধ্যয়নের জন্য বাছাইকৃত শিক্ষার্থীদের মৌলিক বিজ্ঞানে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছিল না এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী ছিল না। তারা বাছাই কমিটির সামনে সাক্ষাৎকারের সময়ে উল্লেখ করে যে, তারা মানবতার সেবা করতে চান এবং শৈশবকাল থেকে চিকিৎসাশিক্ষায় পড়াশুনা করার ইচ্ছা ছিল। তাদের অভিভাবকরাও একইভাবে তাদেরকে চিকিৎসাশিক্ষা দিতে আগ্রহী ছিল। স্কুল বা কলেজের শিক্ষক বা তাদের অভিভাবকরা কখনই উপলব্ধি করেননি যে, তারা চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত কিনা। তবে চিকিৎসাশিক্ষার পরীক্ষার মান একটি ভালো পর্যায়ে বজায় রাখা হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন থেকে বিচার করা যায় যে, এটা অত্যন্ত কঠোর ছিল না। উল্লেখ্য ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৫০-৫১ সাল পর্যন্ত কলকাতা থেকে আগত বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষায় অধিকাংশ মুসলমান শিক্ষার্থী এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় পাশ করে [*পরিশিষ্ট দেখুন*- ৩২], কারণ দেশভাগের কারণে অধিকাংশ হিন্দু শিক্ষার্থী ভারত চলে যায়।

অপরদিকে ১৯৫২ সালে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল পাকিস্তানের সকল মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাশিক্ষা ও পরীক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ করে। পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেসব সুপারিশ করা হয়,[৭৩]

১. চিকিৎসাশিক্ষার যথাযথ ধারাবাহিকতা এবং এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য পূর্বের বিষয়গুলোতে দুইটি প্রফেশনাল পরীক্ষা বিশেষ করে প্যাথলজি, মেডিসিন, সার্জারি, চক্ষুবিদ্যা এবং মিডওয়াইফারির ওপর চূড়ান্ত পরীক্ষা পূর্বে অনুষ্ঠিত হতে পারে, যা নিম্নরূপ,

(ক) নিম্নের বিষয়গুলোতে দ্বিতীয় বর্ষের শেষে প্রথম প্রফেশনাল পরীক্ষা,

ক. এমব্রোয়লজি বা ভ্রুণতত্ত্বসহ এনাটমি

খ. হিস্টোলজি, বায়োকেমিস্ট্রিসহ ফিজিওলজি

গ. পরীক্ষামূলক ফার্মাকোলজিসহ মেটেরিয়া মেডিকো

(খ) নিম্নের বিষয়গুলোতে তৃতীয়বর্ষের শেষে দ্বিতীয় প্রফেশনাল পরীক্ষা,

ক. সাধারণ প্যাথলজি

খ. ব্যাকটেরিওলজি, প্যারাসিটোলজি এবং ইমিয়োনলজি

গ. হাইজিন

ঘ. মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স

(গ) নিম্নের বিষয়গুলোতে পঞ্চম বছরের শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষা

ক. বিশেষ প্যাথলজি (Papers only)

খ. থেরাপেটিকসসহ মেডিসিন

গ. নাক, কান, গলার রোগ এবং চক্ষুবিদ্যাসহ সার্জারি

ঘ. মিডওয়াইফারি এবং গাইনোকোলজি

৩. বিশেষ প্যাথলজি, মেডিসিন সার্জারি (চক্ষুবিদ্যা এবং নাক, কান ও গলারোগসহ) এবং মিডওয়াইফারিতে চূড়ান্ত পরীক্ষার চারটি অংশকে এমনভাবে উপবিভাগে বিভক্ত করা উচিত নয়, যা পৃথকভাবে পাশ হতে পারে।

৪. মেডিসিন, সার্জারি (চক্ষুবিদ্যা এবং নাক, কান ও গলারোগসহ), মিডওয়াইফারির ক্লিনিক্যাল পরীক্ষাগুলো পুরোপুরি সুসজ্জিত হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।

৫. শিক্ষার্থীদের সমস্ত পরীক্ষা সতর্কতার সাথে তদারক করা উচিত।

সে সময় শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়দিকেই সুশিক্ষণের অসুবিধা সত্ত্বেও নীতি হিসেবে অধ্যাপক, অধ্যক্ষ সবাই মিলে পরীক্ষার মান এতটাই উঁচু করেন যে, পরীক্ষা সব শিক্ষার্থীদের কাছে আতংকের বিষয় হয়ে উঠেছিল। এর ফলে পরীক্ষা পাশের হার ছিল খুবই কম, পশ্চিম পাকিস্তানের মেডিকেল কলেজের তুলনায় অনেক কম। ডা. সারওয়ার আলী উল্লেখ করেন যে, ‘সে সময় মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা পদ্ধতি ভীতিপ্রদ ছিল। কয়েকজন পরীক্ষকের লক্ষ্য ছিল মৌখিক পরীক্ষায় জটিল ও অস্বাভাবিক প্রশ্ন করে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীকে অকৃতকার্য করা। নবনির্বাচিত ছাত্র সংসদ এই পরীক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রদের সমর্থনে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।’[৭৪]

ঢাকা মেডিকেল কলেজে পরীক্ষার মান এতটাই উঁচু ছিল যে, ম্যাট্রিক ও আই.এসসি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পাওয়া ছাত্রও মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। আহমদ রফিক এই ব্যাপারে উল্লেখ করেন যে,

> এর দায় যে, সাধারণ বিচারেও ছাত্রদের ছিল না, তার প্রমাণ আমাদের দু/একজন সহপাঠী বারবার একই বর্ষের পরীক্ষায় বিফলতার পর তিক্তবিরক্ত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায় এবং সেখানকার কলেজ থেকে প্রথম চেষ্টাতেই কৃতকার্য হয়ে ফিরে আসে। বুঝতে কষ্ট হয় যে, আমাদের শিক্ষকদের অস্বভাবিক মানসিকতা এজন্য দায়ী। ...এমনও হয়েছে যে, পরীক্ষায় স্থানীয় পরীক্ষকের প্রশ্নের নমুনা দেখে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা পরীক্ষক অবাক হয়েছেন, তাঁর চোখ মুখের অভিব্যক্তি থেকে তা বুঝতে পরীক্ষার্থীর কষ্ট হয়নি।[৭৫]

১৯৫০ এর দশক থেকে পাশের হার তুলনামূলক অনেক কম ছিল এবং ১৯৬০ এর দশকেরও মাঝামাঝি পর্যন্ত পাশের হার মোটামুটি ভালো ছিল। তবে সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. পাশের হার প্রথম দিকে অত্যন্ত খারাপ হলে ১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে পাশের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে *[পরিশিষ্ট দেখুন*-৩৩]। জুলাই ১৯৬৮ থেকে জুন ১৯৬৯ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছাত্র ১০৮ জন, ছাত্রী ২৩ জন, মোট ১৩১ জন।[৭৬] অপরদিকে ১৯৭০-৭১ সালে কোনো ধরনের এম.বি.বি.এস. পরীক্ষা মে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে অন্যান্য চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় *[পরিশিষ্ট দেখুন*-৩৪]। এটা থেকে সহজে বোঝা যায় যে, প্রথম দিকে মেধাবীদের পাশাপাশি বিভিন্ন কোটা ও মনোনয়নের মাধ্যমে যাদের নেওয়া হতো তাদের ক্ষেত্রে এম.বি.বি.এস. পাশ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল, কেননা তারা এই পেশার জন্য তেমন যোগ্য ছিল না। পরবর্তীতে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে অনেক ভালো ছাত্রও অকৃতকার্য হতো। তাই চিকিৎসাশিক্ষার জন্য উপযুক্ত মেধাবী শিক্ষার্থী নেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষকগণ রক্ষণশীল মন মানসিকতা পরিহার করে পরীক্ষা পদ্ধতির মান বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের জন্য সহনশীল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলে পাশের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে একদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মান যেমন উঁচু ছিল, তেমনি তারা ভালো চিকিৎসক হিসেবে দেশ বিদেশে সুনাম অর্জন করেন ।

বৃত্তি

এ সময় শিক্ষার্থীদেরকে মেধা ও দারিদ্রতার ভিত্তিতে প্রচুর পরিমানে সরকারি বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রতিবছর কলেজের প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী বৃত্তি এবং উপবৃত্তি পেতো। সরকারি ছাড়াও জেলা বোর্ডগুলো স্ব-স্ব জেলার মেডিকেল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করত। উপরন্তু দাতব্য সংস্থাগুলো বৃত্তি প্রদানে অবদান রাখত। যেমন, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট।[৭৭] ১৯৪৭ সালে ৬ মাসের জন্য ১৪০টি বৃত্তি মেডিকেল স্কুল ও মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তবে ১৯৪৭ সালের চেয়ে ১৯৪৮ সালে বেশি বৃত্তি অনুমোদন করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য ১২টিরও বেশি বৃত্তি অনুমোদন করা হয়। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বর্ষ শুরু হয় এবং বৃত্তির সময়কাল ১৯৪৭ সালের মতো একই ছিল। অপরদিকে প্রত্যেক মুসলিম নারী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি সুপারিশ করা হয়, কেননা তারা ইতিপূর্বে বৃত্তি প্রাপ্ত হয়নি। তাই ২১০০০ রুপি অনুমোদনের জন্য বরাদ্দ করা হয়।[৭৮]

মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ১৯৪৮ সালের অর্থনৈতিক বাজেটে ৩১০০০ রুপির মধ্যে ১৪০টি বৃত্তি তথা ১৮০০০ রুপি বন্টন করার পর ১৩০০০ রুপি অবশিষ্ট ছিল। ১৯৪৮ সালে ৪৪০০০ রুপি বরাদ্দ করা হয়। এই ৪৪০০০ রুপি থেকে মিস কানিস মাওলা এর ইউ.কে. তে নার্সিং এ প্রশিক্ষণের জন্য খরচ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। এটি কার্যকর করা হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে এবং অর্থ বছরের (মার্চ ১৯৪৮- মার্চ ১৯৪৯) শেষ পর্যন্ত তাঁকে বৃত্তি দেওয়া হয়। ফলে খরচের পরিমাণ এমনভাবে দেখানো হয় যে, প্রতি মাসে ১০০ রুপি দেওয়া হলে বছর শেষে এর পরিমাণ হবে ২০০০। এর ফলে ৪৪০০০ রুপি থেকে ৪২০০০ রুপি অবশিষ্ট থাকে।[৭৯] এ ছাড়া যেসব শিক্ষক বিদেশে প্রশিক্ষণ নিবে তাদের খরচ দেওয়ারও প্রস্তাব করা হয়।

১৯৪৮-৪৯ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে উল্লেখ করা হয় যে, দরিদ্র, মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য সরকার প্রতিটি শ্রেণিতে ১৬ জনকে বিশেষ বৃত্তি প্রদান করে। এ ছাড়া নারী শিক্ষার্থীদের ও তপশিলি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য যথাক্রমে ২ জন করে ১০টি বৃত্তি এবং তপশিলি সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের ২০টি বৃত্তি সরকার প্রদান করে।[৮০] ১৯৪৯ সালে

একইভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন ধরনের ছাত্রদের জন্য ২২টি সরকারি বৃত্তি এবং ১২০টি অন্যান্য বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ সময় ১০টি বৃত্তি ছাত্রীদের দেওয়া হয়।[৮১] অপরদিকে ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলা সরকারের বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগের সহকারী সচিব মৌঃ শহীদউদ্দীন মোহাম্মদ মাসিক ২০ টাকা মূল্যের ৫টি মেমোরিয়াল বৃত্তির ঘোষণা দেন। এগুলো ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়।[৮২] এসব বৃত্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নের কিছু শর্ত ছিল,

১. আবেদনকারীকে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো মেডিকেল কলেজ বা স্কুলের ছাত্রী হতে হবে।

২. তার নিজের স্কুলের বা কলেজের সুপার অথবা অধ্যক্ষ এর নিকট থেকে একটি সার্টিফিকেট পেশ করতে হবে যে, সে নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে অথবা বৃত্তি পেলে পড়বে ও রোজ সকালে কোরআন তেলওয়াত করে বা বৃত্তি পেলে তেলাওয়াত করবে।

৩. চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা জেলার আবেদনকারীদের জন্য প্রতি জেলায় ১টি করে ৩টি বৃত্তি সংরক্ষণ থাকবে। যদি উক্ত জেলাগুলি হতে উপযুক্ত আবেদন না পাওয়া যায়, তবে তা সাধারণগুলোর মতো বিতরণ করা হবে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর পাঁচ বছরের মধ্যে বিধি মোতাবেক মাসিক কিস্তিতে উক্ত টাকা শোধ করে দিতে হবে। কেননা এই টাকা পরবর্তী ছাত্রীদের জন্য ব্যয় করা হবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রীকে এই বিষয়ে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে হবে। এই বৃত্তি দানের ক্ষেত্রে একটি কমিটি গঠন করা হবে। বৃত্তিদান সম্পর্কে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে।[৮৩]

একইবছর পূর্ববাংলার বিভিন্ন মেডিকেল স্কুল ও কলেজের মুসলিম শিক্ষার্থীদের মুসলিম এডুকেশন ফাণ্ড থেকে ১৮,০০০ রুপি বন্টন করা হয়,[৮৪] যা নিম্নরূপ,

<u>ঢাকা মেডিকেল কলেজ</u>

সব শ্রেণি/বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য ৪৪টি বৃত্তি (ছাত্রীসহ) প্রতি মাসে ২৫ রুপি (৬ মাস) ৬৬০০০ রুপি

<u>ঢাকা মেডিকেল স্কুল</u>

ক. প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ১৭ জন (৭ জন ছাত্রীসহ) প্রতিমাসে ২০ রুপি (৬ মাস)

খ. দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ১৭ জন (৮ জন ছাত্রীসহ)– প্রতিমাসে ২০ রুপি (৬ মাস) — ৪০৫০ রুপি

<u>লিটন মেডিকেল স্কুল, ময়মনসিংহ</u>

ক. প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ১৪ জন–প্রতিমাসে ২০ রুপি (৬ মাস)

খ. দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ১২ জন (১ জন ছাত্রীসহ)–প্রতিমাসে ২০ রুপি (৬ মাস) — ৩১২০ রুপি

<u>চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুল</u>

ক. প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ১৫ জন (১ জন ছাত্রীসহ)–প্রতিমাসে ২০ রুপি (৬ মাস) ২,৮৮০ রুপি।

খ. দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ৯ জন (১ জন ছাত্রীসহ)–প্রতিমাসে ২০ রুপি (৬ মাস)।

<u>সিলেট মেডিকেল স্কুল</u>

ক. প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ৮ জন (২ জন ছাত্রীসহ)–প্রতিমাসে ২০ রুপি (৬ মাস)।

খ. দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ৫ জন–প্রতিমাসে ২০ রুপি (৬ মাস)। ১ জন প্রতিমাসে ২০ রুপি (৩ মাস) ১,৬২০ রুপি।

উপরে বর্ণিত বরাদ্দের পরিমাণ দেখে বোঝা যায় যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ বেশি ছিল।

১৯৫২ সালে পূর্ববাংলার বিভিন্ন মেডিকেল স্কুল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য মুসলিম এডুকেশন ফান্ড থেকে ২৪,৫০০ রুপি বৃত্তি বন্টন করা হয়। তার মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য বরাদ্দ ছিল ৭,২০০ রুপি, সব বর্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৪৮ জন (ছাত্রীসহ)কে প্রতিমাসে ২৫ রুপি করে ৬ মাস দেওয়া হয়।[৮৫] ১৯৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার প্রদেশের ৩টি মেডিকেল কলেজ ও ৫টি মেডিকেল স্কুলের দরিদ্র মুসলিম ছাত্রছাত্রীর জন্য যথাক্রমে ২৫ রুপি ও ২০ রুপি হারে মোট ১৮৩ টি বৃত্তি মঞ্জুর করে। এর মধ্যে ১৮টি ৬ মাসের এবং ২টি ২ মাসের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সকল বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য ৫২টি বৃত্তি বরাদ্দ করা হয়।[৮৬] সে সময় দারিদ্রতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রচুর পরিমানে বৃত্তি ও উপবৃত্তি দেওয়া হতো এবং একাডেমিক কার্যক্রমের ওপর কম বৃত্তি দেওয়া হতো। তাই দুঃখের সাথে বলা হয়, যদি শিক্ষার্থীরা তাদের একাডেমিক কার্যক্রমে মেধা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে বৃত্তি অর্জন না করে তবে তা দাতব্যের অপচয় হবে বলে উল্লেখ করা হয়, তবে এটা পরবর্তীকালে সংশোধন করা হয়।[৮৭]

শিক্ষক নিয়োগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন ভোগ করলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছিল একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান তিন ধরনের শাসনের অধীন ছিল। ডিগ্রি প্রদান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দেয় সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং এর চিকিৎসা সংক্রান্ত আচরণবিধি স্থির করে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল এবং বর্তমানে বাংলাদেশ মেডিকেল কাউন্সিল এই আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে শিক্ষার্থীদেরকে পড়াশোনার চাপের সঙ্গে কঠোর নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়।

১৯৪৮ সালের ৬ এপ্রিল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ঢাকা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক নিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিদ্যমান বিধি অনুসারে অধ্যাপক নিয়োগে বেঙ্গল জেনারেল সার্ভিসের অন্তর্গত অর্থ বিভাগকে বেঙ্গল জেনারেল সার্ভিসের নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি উপযুক্ত সার্ভিসের কথা বলা হয়। এই বিষয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং এই ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো হয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য অধ্যাপকদের বিবরণ এবং এই পদের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্ধারণ করার কথা উল্লেখ করা হয়। এ সময় অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নের যেসব বিষয় বিবেচনাধীন ছিল সেগুলো হলো,[৮৮]

১. অধ্যাপক মেডিসিন
২. অধ্যাপক ক্লিনিক্যাল মেডিসিন
৩. অধ্যাপক সার্জারি
৪. অধ্যাপক ক্লিনিক্যাল সার্জারি
৫. অধ্যাপক মিডওয়াইফারি
৬. অধ্যাপক ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারি
৭. অধ্যাপক অফথালমোলজি
৮. অধ্যাপক প্যাথলজি
৯. অধ্যাপক ফার্মাকোলজি
১০. অধ্যাপক এনাটমি
১১. অধ্যাপক ফিজিওলজি
১২. অধ্যাপক জুরিসপ্রুডেন্স

১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে যখন একই পদের জন্য কলকাতার লেক মেডিকেল কলেজ (Lake Medical College) এবং হাসপাতালে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তখন উল্লেখ করা হয় যে, তাদেরকে অবশ্যই মেডিকেল গ্রাজুয়েট বিষয়ের ওপর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসহ উচ্চ শিক্ষাগতযোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে এবং গবেষণার কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। পূর্ববাংলার ঢাকা মেডিকেল কলেজে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এই যোগ্যতাগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে কমিশন ও উপদেষ্টার পাশাপাশি সার্জন জেনারেলকে সবচেয়ে উঁচু যোগ্যতা সম্পন্ন সেরা প্রার্থীকে বেছে নেওয়ার আহ্বান জানান। অনুরূপভাবে বেতন স্কেল নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কলকাতা মেডিকেল কলেজের কর্মকর্তাদের বয়সের ভিত্তিতে যে বেতন স্কেল দেওয়ার অনুমতি ছিল, তা ঢাকা মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করা উচিত বলে উল্লেখ করা হয়। নিম্নে কলকাতা মেডিকেল কলেজের কর্মকর্তাদের বয়স অনুসারে বেতনস্কেল অনুসরণ করা হয়,[৮৯]

বেতনস্কেল-৫৫০-৭৫/২-১০০০/-

৬৫০-৫০/২-৭৫/২-১২০০

বয়স	**টাইম স্কেলের পর্যায়**
৩৬ এর নীচে	১
৩৭	২
৩৮	৩
৩৯	৪
৪০	৫

ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য পূর্ববাংলায় সব মেডিকেল প্রার্থী পাওয়া যায়নি। তাই এই ধরনের কারিগরি পদে নিয়োগের জন্য পাকিস্তানের সকল নাগরিক ও ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমান ও বিদেশিদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।[৯০]

ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক পদের জন্য প্রার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা পূর্বের অবিভক্ত বাংলার মতো যদি একই থাকে এবং কোনো পরিবর্তনের উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে এই পদগুলোর জন্য সরাসরি বিজ্ঞাপন পাবলিক সার্ভিস কমিশন দিতে পারবে কিনা এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতির কারণে বিলম্ব এড়ানোর জন্য অধ্যাপক পদের নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে সচিব জানতে চেয়েছেন। ফলে এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বিষয়ে নিম্নের আপত্তি ছিল,

(১) যদিও কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং লেক মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা একই ছিল, তথাপি ঢাকা মেডিকেল কলেজের এই পদগুলো যুক্ত বাংলা থেকে স্থানান্তর করে আলাদা হিসেবে নতুন করে সৃষ্টি করা হয়। তাই পূর্ববাংলা পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণে সুপারিশ করবে। এটা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রেগুলেশনের/বিধি '৩' অনুসারে হবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মতিতে যোগ্যতা নির্ধারণের পর মন্ত্রিসভার অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

(২) এই পদের জন্য আবেদন করতে যোগ্য বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসের (উঁচু) সদস্যদের মহামান্যের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

(৩) পদগুলোর জন্য ভারতীয় যোগ্য মুসলমানদের আবেদন করতে হলে মন্ত্রীপরিষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

উপরি-উল্লিখিত বিষয়গুলো নিষ্পত্তির পূর্বে পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই পদগুলোর বিজ্ঞাপন দিতে পারবে না বলে উল্লেখ করা হয়।[৯১] ১৯৪৮ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য অধ্যাপকের পদ অনুমোদন করা হয়, যা ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে কার্যকর করা হয় এবং প্রত্যেকটি পদের বিপরীতে বেতন উল্লেখ করা হয় *[পরিশিষ্ট দেখুন-৩৫]*।

এই পদগুলো বেঙ্গল জেনারেল সার্ভিসের অন্তর্গত ছিল। নিয়োগ পদ্ধতি ছিল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের পর বাছাই করা। প্রাক্তন আই.এম.এস. অফিসার, মেডিকেল পেশার সাধারণ সদস্য, ই.পি.এম.এস. (উঁচু) এর কর্মকর্তা। তাদেরকে এই পদগুলোতে আবেদন করার জন্য যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। প্রাক্তন আই.এম.এস অফিসারের বেতন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সাধারণ নীতি অনুসারে নির্ধারিত হয়। এই পদগুলো পাকিস্তানের সকল নাগরিকের পাশাপাশি ভারতীয় মুসলমান অধিবাসী এবং বিদেশি নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়। তাছাড়া এই পদগুলোর জন্য প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা উল্লেখ করা হয়। প্রার্থীদের অবশ্যই মেডিকেল স্নাতক, তাদের নিজ বিষয়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসহ উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গবেষণার জন্য দক্ষতা থাকতে হবে এবং প্রার্থীর বয়স ৩৫ বছরের কম হওয়া উচিত নয় বলে উল্লেখ করা হয়। স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সচিব উল্লেখ করেন, অবিভক্ত বাংলার সময়ে এই পদের জন্য উপরি-উক্ত যোগ্যতাগুলো বিবেচনা করা হতো। তাই পূর্ববাংলার ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণ করা হয়।

উল্লিখিত পদগুলোর মধ্যে ৪টি পদ যুদ্ধ সেবা (ওয়ার সার্ভিস) প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। যদি ওয়ার সার্ভিসের যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া যায়, তবে অন্যান্যদের দ্বারা পদগুলো পূরণ করা হবে। আরো উল্লেখ করা হয় যে, বিজ্ঞাপন এবং নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাছাইকৃত প্রার্থীদের নাম দেওয়াসহ সরকার কমিশনকে অগ্রাধিকার দিবে। তাই কমিশন কর্তৃক পূর্ববাংলা সরকারের সার্জন জেনারেল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত থাকবেন, উল্লেখ করা হয়।[৯২]

একজন বিদেশি প্রার্থী হিসেবে মেজর এফ. ডব্লিউ. এলিনসন (F.W. Allinson) কে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি প্রাক্তন আই.এম.এস. অফিসার ছিলেন। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালের সার্জন সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন এবং তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সার্জারির অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পাকিস্তানে চাকুরির জন্য তাঁর এই নিয়োগ পূর্ববাংলা সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। সাত বছরের চুক্তিতে এই পদে কাজ করার জন্য মন্ত্রিসভার অনুমোদনসহ নিয়োগ লাভ করেন।

অপরদিকে অবিভক্ত বাংলার পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক পদে এ.কে.এম.এ. ওয়াহেদকে বাছাই করা হয়। তাই তাঁর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রেফারেন্সের প্রয়োজন ছিল না। এ সময় বাকি ১২টি পদের মধ্যে ৬ নং ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারি এবং ১২ নং মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স পদটি পূরণ করা হয়নি [*পরিশিষ্ট দেখুন - ৩৬ (ক)*]। কারণ কলেজে এই ক্লাশগুলো তখনও খোলা হয়নি। অন্যান্য ৮টি পদ অস্থায়ীভাবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে স্থগিত বাছাই প্রক্রিয়া ই.পি.এম.এস. সদস্যদের দ্বারা পূরণ করা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক হিসেবে ডাক্তার নওয়াব আলীকে এবং মিডওয়াইফারির অধ্যাপক হিসেবে হাবিবউদ্দিন আহমেদকে স্থায়ীভাবে নিয়োগের সুপারিশ করেন। তারা যোগ্য ছিলেন এবং উক্ত পদগুলো পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতার বাইরে ছিল।

এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনে করেন যে, এই পদগুলোর জন্য ভালো প্রার্থী পাওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং এমন কি বাইরে থেকে ভালো প্রার্থী পাওয়া গেলেও তাদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান পাওয়া কঠিন হবে। তাই

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতার বাইরে থেকে এই দুইজন অধ্যাপককে নেওয়ার জন্য মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করা হয়। ১লা নভেম্বর ১৯৪৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালসহ ও অন্যান্য শিক্ষকদের বেতন স্কেলের একটি তালিকা পাওয়া যায় [*পরিশিষ্ট দেখুন ৩৬ (ক)*]। এই তালিকায় মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল এর বেতন স্কেল ২০০০ রুপি এবং অন্যান্য অধ্যাপকের বেতন ৫৫০-১০০০ রুপি নির্ধারণ করা হয়।[৯৩]

১৯৪৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের উপ-সচিব পূর্ব পাকিস্তানের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সচিবকে জানান যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক পদগুলিতে সরাসরি নিয়োগকৃত আই.এম.এস. ছাড়া অফিসারদের নিম্নের বয়সের ভিত্তিতে ৬৫০-৫০/২-৭৫০-৭৫/২-১২০০/রুপি স্কেলের প্রাথমিক বেতন পাবে বলে উল্লেখ করেন,

বয়স	টাইম স্কেলের পর্যায়
৩৬ এবং এর নীচে	প্রথম
৩৭ এবং এর নীচে	দ্বিতীয়
৩৮ এবং এর নীচে	তৃতীয়
৫২ এবং তদুর্ধ্ব	১৭তম

প্রাক্তন আই.এম.এস. অফিসারদের বেতন তাদের র‍্যাঙ্ক অনুসারে হবে বলে উল্লেখ করেন। তাদের জন্য ২৫০ রুপির বিশেষ বেতনের ব্যবস্থা করা উচিত বলে উল্লেখ করা হয়, যা পে-কমিশনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিল। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের জন্য শিক্ষক পদের পূর্ণ তালিকা অনুমোদন করা হয়। তালিকায় অধ্যাপক পদ ছাড়াও ই.পি.এম.এস. (উঁচু) এর সাথে অন্যান্য পদ ছিল। এই শূন্য পদগুলো ইতিমধ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক পদটি একটি খণ্ডকালীন পদ ছিল এবং প্রতি মাসে ২০০/- রুপি ভাতা হিসেবে পূর্ববাংলার ডি.পি.এইচ. দ্বারা এটা রাখা হয়।

ডেন্সিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপকের পদটি ই.পি.এম.এস. বা বি.জি.এস. (B.G.S) এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং কেবলমাত্র ১০০/রুপি (প্রতিমাস) ভাতা রাখা হয়। এই দুইটি পদে প্রার্থী নেওয়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন ছিল না। এ ছাড়া উপসচিব আরো উল্লেখ করেন যে,

> The professional posts need not be advertised overseas at present. But may be advertised in West Pakistan and India also.[৯৪]

এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের অনুমোদিত শিক্ষকদের তালিকা পাওয়া যায় [*পরিশিষ্ট দেখুন - ৩৭*]। সে সময় ভারত এবং পাকিস্তানের যেসব প্রার্থী বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক পদে আবেদন করেছিল এবং তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর যাদের যোগ্য ও উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয় সেসব প্রার্থীদের নামের তালিকা নিম্নরূপ,

ক্রমিক	নাম	পদবী ও বিভাগ
১.	ডাক্তার এ. কে. এম. আব্দুল ওয়াহেদ	অধ্যাপক, মেডিসিন
২.	ডাক্তার নওয়াব আলী	অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল মেডিসিন
৩.	ডাক্তার ই.ভি. নোভাক	অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল সার্জারি
৪.	ডাক্তার আবুল খায়ের শামসুদ্দিন আহমেদ	অধ্যাপক, ফার্মাকোলজি

এই ৪টি বিভাগের যোগ্য প্রার্থী পাওয়া গেলেও বাকী ৭টি বিভাগের জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায়নি। তাই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সচিব জানান যে,

> I am also to request that the commission may be informed how Government propose to fill the vacancies for which commission have not found any candidate fit and in particular if advertisement overseas should be attempted.[৯৫]

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সচিবের যুক্তি ছিল যে, যদি অনতিবিলম্বে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য অন্যান্য ৭টি বিষয়ে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া যায়, তাহলে কলেজে একটি অচলাবস্থা সৃষ্টি হবে। ১৯৪৯ সালের জুন মাস থেকে চতুর্থ বর্ষের ক্লাস শুরু হবে। তাই উপযুক্ত, যোগ্য অধ্যাপকের অধীনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের সব বিভাগ খোলা দরকার। অন্যথা শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও সচিবের তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, ১৯৪৬ সালে যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ চালু হয়, তখন কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের পদসহ এনাটমির অধ্যাপক এবং ফিজিওলজির অধ্যাপকের পদের জন্য অবিভক্ত বাংলার পি.এস.সি. কর্তৃক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এনাটমির অধ্যাপক পদের জন্য পশুপতি বোস এবং ফিজিওলজির অধ্যাপক পদের জন্য হীরালাল সাহাকে পি.এস.সি. কর্তৃক সুপারিশ করা হয় এবং এই সুপারিশগুলো সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। অধ্যাপক পশুপতি বোস ১১/২/১৯৩৪ সালে বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি ১৯৩৮ সালের আগস্ট থেকে মার্চ ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল স্কুলের এনাটমির শিক্ষক ছিলেন। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। সহকারী সার্জন হিসেবে চাকুরিকালীন তিনি কলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ওপর ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেন। অন্যদিকে হীরালাল সাহা ১৯৪০ সালের ২ ডিসেম্বর একজন অস্থায়ী সহকারী সার্জন হিসেবে বেঙ্গল মেডিকেল সার্ভিসে যোগদান করেন। এখানে তিনি সহকারী সার্জন হিসেবে কাজ করেন এবং ১৯৪৪ সালের ১২ আগস্ট ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ফিজিওলজির শিক্ষক হন। পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফিজিওলজির অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যা ১৯৪৬ সালের ১৫ জুলাই থেকে কার্যকর হয়।

এটি সত্যি তাদেরকে একটি কঠিন অবস্থায় ফেলে, কারণ তারা পি.এস.সি'র সুপারিশের কারণগুলো অনুসরণ করেননি। পূর্ব পাকিস্তানের পি.এস.সি'র চেয়ারম্যান জনাব দাস কেবলমাত্র দুই বছর পূর্বে অবিভক্ত বাংলার পি.এস.সি. এর সভাপতিত্ব করেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য অধ্যাপক হিসেবে যাদের নির্বাচিত করেন, তাদের কেবলমাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.বি. ডিগ্রি ছিল এবং এ ক্ষেত্রে এনাটমির শিক্ষক হিসেবে ২ বছরের অভিজ্ঞতা এবং ফিজিওলজির ডেমনস্ট্রেটর হিসেবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা ছিল। ১৯৪৯ সালে এনাটমি বিভাগে এমন একজনকে পাওয়া যায়, যিনি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন। তিনি হলেন ডাক্তার মোঃ আব্দুর রহমান। তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজে সাড়ে ৭ বছরেরও বেশি সময় এনাটমির ডেমনস্ট্রেটর ছিলেন। তিনি এনাটমির ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য ইংল্যান্ডে যান, তবে তিনি ইংল্যান্ড থেকে কোনো ডিগ্রি পাননি। অনুরূপভাবে অফথালমোলজিতে একজনকে পাওয়া যায়, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি. এবং লন্ডন থেকে ডি.ও.এম.এস. ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি প্রায় ১০ বছর কলকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগ ও দুই বছর চক্ষু হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন ছিলেন এবং তাঁকে শিক্ষকতার কাজও করতে হয়েছিল। তিনি হলেন ডাক্তার মনসুরুল আলম।

মিডওয়াইফারির ক্ষেত্রেও একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যায়। তিনি হলেন ডাক্তার হাবিব উদ্দিন আহমেদ এম.বি, এফ.আর.সি.এস. (এডিনবার্গ, ডি.জি.ও.)। তিনি ২ বছর ইডেন হাসপাতালের হাউজ সার্জন ছিলেন এবং এফ.সি.পি.এস. করার পর কলকাতার ইডেন হাসপাতালে ২ বছর রেসিডেন্ট সার্জন ছিলেন। সেখানে তাঁকে মেডিকেল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের কাজ করতে হতো। এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সচিব মনে করেন, পি.এস.সি.'র সুপারিশ মূলত পরামর্শমূলক। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সম্মতি থাকলে, ঢাকা মেডিকেল কলেজের সব বিষয়ে অধ্যাপক নিয়োগে সব আবেদন রাখার জন্য পি.এস.সি. কে অনুরোধ করা হয়। এইচ.পি.এম. এর পূর্ব অনুমোদনসহ পি.এস.সি.'র পরামর্শকে মন্ত্রণালয় বাতিল করতে চায় কিনা তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বিবেচনা করতে বলা হয় এবং মন্ত্রিসভাকে প্রার্থীদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করতে বলা হয়। যদি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া যায় তাহলে দ্বিতীয়বার তথা পুনরায় এই পদের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়।

এ ছাড়া আরো কিছু ধারণা দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় যে, যদি পূর্ববাংলার উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া যায়, তাহলে ইউরোপীয়দের নিয়োগের মাধ্যমে এই পদগুলো পূরণ করা যেতে পারে। তবে এটি একটি নীতির প্রশ্ন ছিল। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রীর জন্য এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে, পূর্ববাংলার মেডিকেল প্রতিষ্ঠানগুলোর সব প্রধান পদগুলোতে ইউরোপীয়ানদের নিয়োগ দেওয়া উচিত হবে কিনা? তবে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পি.এস.সি. কেবলমাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক পদগুলোতে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেই নয়, বরং বিদেশের উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও খুব কঠোর মনোভাবের পরিচয় দেয়। এ ক্ষেত্রে পি.এস.সি'র সহজ যুক্তি ছিল যে, বেশ কয়েকটি বিষয়ে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায়নি। তবে এটা সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের প্রশ্ন ছিল না। এটা নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রার্থী দ্বারা পদ পূরণের প্রশ্ন ছিল। যাতে সে প্রথমে এই বিষয়ে স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে এবং তারপরে সরকারি খরচে এই বিষয়ের ওপর একটি উচ্চতর ডিপ্লোমা নিতে পারেন। পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পাঁচ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা প্রস্তাব করে, যা ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল এর শর্ত ছিল। তবে একজন অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব প্রার্থীর ৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নেই তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হলে কলেজের স্বীকৃতির ব্যাপারে তেমন কোনো প্রভাব ফেলবে না। উদাহরণ স্বরূপ কলকাতা মেডিকেল কলেজে এম.এম. সরকারকে ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারির অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেওয়া হলে কলেজের স্বীকৃতিতে কোনো প্রভাব ফেলেনি। তাঁর এফ.আর.সি.এস. শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দুই বছরের রেসিডেন্ট সার্জনের অভিজ্ঞতা ব্যতীত আর কোনো শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ছিল না।[৯৬]

অধ্যাপক ডা. আব্দুল ওয়াহেদ (মেডিসিন), অধ্যাপক ডাক্তার নওয়াব আলী (ক্লিনিক্যাল মেডিসিন), অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দিন আহমেদ (ফার্মাকোলজি) ও ডাক্তার ই. ভি নোভাককে পি.এস.সি'র সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদেরকে পি.এস.সি. যোগ্য ও উপযুক্ত মনে করে। তবে ই.ভি নোভাক এর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন সার্জন ছিলেন। আর্ন্তজাতিক শরণার্থী সংস্থার সার্জন হিসেবে তাঁর উচ্চখ্যাতি ছিল। তিনি এই পদে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করবেন এবং তাঁকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করার পূর্বে আরো যাচাই বাছাই করার কথা উল্লেখ করা হয়। তিনি আবেদনপত্রের কোথাও উল্লেখ করেননি যে, তিনি একজন ইহুদি। ইংরেজিতে কথা বলতে তাঁর সামান্য সমস্যা থাকলেও তিনি শিক্ষাদান করতে সক্ষম ছিলেন। তাই তাঁকে নির্ধারিত আবেদন ফর্মে

সবকিছু বর্ণনা করতে বলা হয়। পরবর্তীতে আরো যাচাই বাছাইয়ের জন্য লন্ডনে পাঠানো হয়। তাঁকে পাঁচ (৫) বছরের চুক্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়, যাতে পূর্ববাংলার সার্জনরা তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে পারেন। এই রকম অবস্থায় পি.এস.সি.'র সুপারিশের বিষয়ে স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারির মন্তব্য বিবেচনা করা হয়।[৯৭]

তাই উল্লিখিত ৪ জন অধ্যাপক ছাড়াও মিডওয়াইফারির অধ্যাপক অথবা ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারির অধ্যাপক পদের জন্য ডাক্তার হাবিব আহমেদ, এনাটমির অধ্যাপক পদের জন্য ডাক্তার আব্দুর রহমানকে পুর্নবিবেচনা করার জন্য পি.এস.সি'কে অনুরোধ করা হয়। অনুরূপভাবে অর্থ বিভাগের সচিব লক্ষনৌ মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডাক্তার আব্দুল হামিদকে প্যাথলজির অধ্যাপক পদের জন্য তিন বছরের চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়ার জন্য পি.এস.সি. কে সুপারিশ করেন। ডাক্তার আব্দুল হামিদ ১১ বছর ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের শিক্ষক ও প্যাথলজির রিডার ছিলেন এবং তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা এম.বি.বি.এস. (AIID) ১৯১৬, এম.আর.সি.পি (লণ্ডন) ১৯২৮, এম.ডি. (লক্ষনৌ) ১৯৩০, শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল।

এসব উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তি ছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে। শুরু থেকে এর শিক্ষার মান খুব উঁচু হওয়া উচিত। ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসকগণ এই প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসবে। পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসাশিক্ষার স্বার্থে এই প্রতিষ্ঠানে সবচেয়ে উঁচু যোগ্যতা সম্পন্ন অধ্যাপক থাকা উচিত। তাছাড়া চিকিৎসাশিক্ষার স্বার্থে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং টি.বি. হাসপাতাল স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রার্থী নির্বাচনের বা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত রাখার প্রস্তাব করা হয়। তাই পাঁচ (৫) বছরের চুক্তির ভিত্তিতে বিদেশ থেকে উঁচু যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যাপক আনা এবং তাদের অধীনে অধ্যয়ন করে পাঁচ বছর পরে পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব চিকিৎসকগণ বিদেশি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। আরো যুক্তি দেওয়া হয় যে, যদি পাকিস্তানিদের দীর্ঘ মেয়াদী চিকিৎসা সেবা ও ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করা যায়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তান চিকিৎসার সুযোগসুবিধা ভোগ করবে। তাই প্রস্তাব করা হয় যে, পি.এস.সি'র দ্বিতীয়বার ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর যদি এই পদগুলোতে উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া যায়, তখন বিদেশ থেকে প্রার্থী নিয়োগের মাধ্যমে পদগুলো পূরণ করা উচিত। এটা হতে পারে স্থানচ্যুত শরণার্থী ব্যক্তি অথবা ইংল্যান্ড থেকে পাওয়া প্রার্থী। এ ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে যোগ্যতা সম্পন্ন অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে। এজন্য ১৯৪৯ সালের জুন মাসে একটি রিক্রুটিং মিশন লন্ডনে পাঠানোর প্রস্তাব করা হয়।[৯৮] তবে কখনও কখনও একজন ব্যক্তিকে সাধারণ দিক থেকে শিক্ষকতার দিকে স্থানান্তর করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কারণ যখন পদ পূরণ করার আর কোনো উপায় থাকে না অথবা কেউ শিক্ষকতাকে অগ্রাধিকার দিলে তাঁকে এই পদে নিয়োগ দেওয়া, তবে এরূপ বিষয় বিরল। এ ক্ষেত্রে হাসপাতালের দায়িত্ব পালনকারী সহকারী সার্জনরা সাধারণ দিকের ছিলেন। উল্লিখিত ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসেবে স্থানান্তরিত করা হলে তাঁরা শিক্ষকতার মধ্যে পড়েন।

চল্লিশের দশকের শেষের দিকে (১৯৪৯) একটি আলাদা শিক্ষা ক্যাডার সৃষ্টির বিষয়টি বিবেচনায় ছিল না। এ ক্ষেত্রে ক্যাডারের সদস্য সংখ্যার চেয়ে উঁচু পদের সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল এবং এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়। কারণ একজন অনুপযুক্ত শিক্ষক এবং ডেমনস্ট্রেটরকে দায়মুক্ত করা অসম্ভব ছিল। মিডফোর্ড হাসপাতালে প্যাথলজির শিক্ষকতার পদে যে অফিসার ছিলেন তিনি 'under the next below rule' অনুযায়ী সিভিল সার্জনের বেতন পেতেন, তবে এটি একটি বিশেষ

বিষয় ছিল, যা ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্যাথলজির অধ্যাপক হিসেবে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি এবং পদটি তাঁর চেয়ে একজন জুনিয়র দ্বারা পরিচালিত হতো। তিনি সিভিল সার্জন হিসেবে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তাঁর জায়গায় কাউকে শিক্ষক হিসেবে বদলি করা যায়নি এবং কোনো জেলাতেও পদটি ফাঁকা ছিল না। পরবর্তীতে তাঁকে দিনাজপুরের সিভিল সার্জন হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

সমস্যাটি শিক্ষাদান এবং অ-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ছিল না, তবে উপযুক্ত অফিসারের অভাবের কারণে সিনিয়র ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে রাখতে হতো। সিভিল সার্জন হিসেবে তাঁদের চেয়েও জুনিয়ররা ছিল। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, এই পদে যা একজনের ছিল এবং অন্যদের ছিল না। তাই এই ব্যাপারে তারা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। নিম্নের ব্যক্তিগণ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন,

ডাক্তার আব্দুর রহমান, অধ্যাপক (ভারপ্রাপ্ত), এনাটমি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ডাক্তার আনোয়ার আলী, অধ্যাপক (ভারপ্রাপ্ত), প্যাথলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ডাক্তার এ. করিম, অধ্যাপক (ভারপ্রাপ্ত), ফিজিওলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা
ডাক্তার জে. এ. চৌধুরী, অধ্যাপক (ভারপ্রাপ্ত), অফথালমোলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

যথেষ্ট সংখ্যক বিদেশি স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে পি.এস.সি. কর্তৃক অধ্যাপকের পদগুলো বাছাই করা হয়নি। এদিকে ডাক্তার রেফাতউল্লাহ (ইতিমধ্যে সিভিল সার্জন হিসেবে ছিলেন) ব্যতীত অন্যদেরকে বদলি করা যায়নি, কারণ তাঁরা দীর্ঘদিন যাবত শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা তাদের বিষয়ে অভিজ্ঞ হলেও সাধারণ ক্ষেত্রে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পদগুলো অস্থায়ী থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত 'under the next below rule' অনুযায়ী পদগুলো উন্মুক্ত রাখার দাবি জানানো হয়। যদিও সিভিল সার্জন হিসেবে তাদের চেয়েও জুনিয়র কাউকে এই পদে দেওয়া হতো এটা পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে। তাই প্রস্তাব করা হয় যে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় স্নাতকোত্তর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিদেশ পাঠানো এবং পরবর্তীতে তাদেরকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া।

শিক্ষকতার ক্ষেত্রে আরো কিছু সমস্যা ছিল। এনাটমি, ফার্মাকোলজি, ফিজিওলজি, অ্যানাসথেটিস্ট এবং ডেমনস্ট্রেটরগণ প্রাইভেট প্রাকটিসের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে অক্ষম হওয়ায় অসন্তুষ্ট ছিল। তাই এই পদগুলোতে আগ্রহী শিক্ষক পাওয়া কঠিন ছিল। তাদের প্রাইভেট প্রাকটিস না করার ক্ষতিপূরণ এবং পদগুলো আকর্ষণীয় করার জন্য উপযুক্ত বেতনভাতা দেওয়ার দাবি করা হয়। বিশেষ বেতন ১০০/- রুপি প্রস্তাব করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক, কান ও গলা বিভাগের সার্জনের বিশেষ পদের ব্যাপারে বলা হয় যে, উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ই.পি.এম.এস. অফিসারের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু এই অফিসারের উচ্চ যোগ্যতা থাকায় ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য উচ্চ বেতন দাবি করা হয়। তাঁর এই দাবিটি যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করা হলেও উল্লেখ করা হয় যে,

> The state has paid for his post graduate training and he is expected to give some return for that. On the other hand some encouragement should be given to those returning from abroad with higher qualifications and experience.[৯৯]

পাকিস্তান পে-কমিশন মেডিকেল অফিসার এবং অধ্যাপকগণের বেতনের সমস্যা সমাধান ও যথাযথভাবে সুপারিশ করবে বলে উল্লেখ করা হয়। পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে, পূর্ববাংলায় এরূপ পদের বেতন অনাকাঙ্ক্ষিত। মেডিকেল স্নাতক ও লাইসেন্সধারীদের চিকিৎসা সেবায় অসন্তোষের অন্যতম কারণ হলো কম বেতন। কম বেতনের কারণে অনেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ

ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার চেষ্টা করত। এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে জে. এ. চৌধুরীর (Zinnur Ahmed Choudhury) নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি ১৯৪৬ সালের শুরুর দিকে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সার্জারির শিক্ষক ছিলেন। এর আগে ই.এন.টি'র বিশেষজ্ঞ হিসেবে সেনাবাহিনীতে ছিলেন। অবিভক্ত ভারতের একজন শিক্ষক হিসেবে ইংল্যান্ড যান এবং নাক, কান ও গলা রোগের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণসহ এফ. আর. সি. এস (এডিনবার্গ) নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ই.এন.টি. বিভাগের সার্জন-ইন-চার্জ পদে নিযুক্ত হন। এই পদটি অধ্যাপকের পদ ছিল না। তিনি শিক্ষার্থীদেরকে ই.এন.টি. বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন এবং মেডিকেল কারিকুলামের অন্যান্য বিষয় অথবা অফথালমোলজি বিষয়ের মতো ই.এন.টি. একটি বিষয় ছিল। অথচ লাহোর মেডিকেল কলেজ ও করাচির ডাউ মেডিকেল কলেজে অন্যান্য বিষয়ের মতো ই.এন.টি সার্জনের পদ ছিল একজন অধ্যাপকের পদ। ফলে পূর্ববাংলার ই.এন.টি.'র সার্জন না অধ্যাপকের বেতন, না অধ্যাপক পদের সুযোগসুবিধা পেতেন। ই.এন.টি. বিভাগের সার্জন-ইন-চার্জ হিসেবে তাঁকে একজন সহকারী সার্জনের বেতন তথা প্রতিমাসে ৩০০/- রুপি দেওয়া হতো। অথচ তাঁর উচ্চতর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিচু স্কেলের বেতন ও র‍্যাঙ্ক ছিল। তাঁর চেয়েও জুনিয়র কিছু মেডিকেল অফিসার সিভিল সার্জনের পদ, উঁচু স্কেলের বেতন এবং র‍্যাঙ্ক ছিল। উপরন্তু সব মেডিকেল স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ বেতন দেওয়া হতো। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম অনুযায়ী ই.এন.টি. বিষয়ের ওপর মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করলেও ই.এন.টি. সার্জনের জন্য কোনো বিশেষ বেতনের ব্যবস্থা ছিল না। তাই তিনি করাচি ডাউ মেডিকেল কলেজে ই.এন.টি'র অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করেন। সেখানে অধ্যাপকের পদ ছিল এবং শুরুতেই ৯০০/-রুপি (প্রতিমাস) বেতন ছিল, কিন্তু তাঁর আবেদন সরকার প্রেরণ করেনি। তাছাড়া সরকারও বাইরে থেকে উঁচু বেতন দিয়ে একজন সার্জন আনার চেষ্টা করে। তাই উপরি-উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ১৯৪৯ সালের ২৭ এপ্রিল দাবি জানান যে,[১০০]

ক. ই.এন.টি. সার্জনের পদ একজন অধ্যাপকের পদ এবং বেতন স্কেল মঞ্জুর করা অথবা

খ. (১) সিভিল সার্জনের বেতন স্কেল মঞ্জুর করা

(২) একটি বিশেষ বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ বেতন হিসেবে প্রতিমাসে ২০০/- রুপি দেওয়া।

(৩) ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকতার ভাতা হিসেবে আরো ২০০/- রুপি (প্রতিমাস) দেওয়া।

এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিদেশি শিক্ষকদের পরিষেবা ব্যবহার শীর্ষক অফিস স্মারকলিপিতে (Memo No F. 5-A/58 II. dated 29 Jan 1949) উল্লেখ করা হয় যে, এই বিভাগটি অতীতে কখনও কখনও বিদেশি শিক্ষকদের উপযুক্ত পদ দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করে। বিদেশি বৃত্তি প্রকল্প কমিটি এই প্রস্তাবটি বিবেচনা এবং পর্যবেক্ষণ করে দেখে যে, যেখানে বিদেশি শিক্ষক নিযুক্ত ছিল, সেখানে তাদের পদগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে সামঞ্জস্য ছিল না এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ২০০ বা ২৫০ রুপি প্রাথমিক বেতনের পদগুলো দেওয়া হতো। এটা সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ এবং হতাশা সৃষ্টি করে। এরূপ পরিস্থিতিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, শিক্ষকদের প্রত্যেকের নিয়োগ যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান সর্বাধিক অগ্রিম বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত।[১০১] উপরে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ডাক্তার জে. এ. চৌধুরীর বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে বলা হয় যে, যতদিন তিনি সহকারী সার্জনের পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন,

ততদিন তাঁকে সিভিল সার্জনের বেতন দেওয়া যেতে পারে, যা ইতিমধ্যে তিনি দাবি করেন। যদি তিনি উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ না যান এবং এই দায়িত্বশীল বিশেষ কাজের জন্য ২০০ রুপি বিশেষ বেতন না পান। আরো উল্লেখ করা হয় যে, এই পদে ৬০০-৫০-৯০০ রুপি বেতন স্কেলে একজনকে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রস্তুত ছিল; জে. এ. চৌধুরীর বিষয়টি ইতিমধ্যে তাঁদের কাছে বিবেচনাধীন ছিল, তাই প্রস্তাবটি আর পুনরাবৃত্তি হয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয়কে উপরি-উক্ত প্রস্তাবটিতে সম্মতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। অন্যদিকে কলকাতা মেডিকেল কলেজের নাক, কান, গলা বিভাগটি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের অধীনে ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে ডা. যুদা এবং ডাক্তার সাহেবান রায়ের নাম উল্লেখ করা যায়। তাঁরা সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক ছিলেন। তাদেরকে সহায়তা করার জন্য সুনির্দিষ্ট বেতনভোগী কর্মকর্তা ছিল। পূর্ববাংলা বা সমগ্র পাকিস্তানের জন্য নাক, কান ও গলা বিভাগের মতো কোনো বিশেষ বিভাগের দায়িত্বে অবৈতনিক ব্যক্তিদের চিন্তা করা অনুচিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়।[১০২]

কলকাতা মেডিকেল কলেজের সংস্করণে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পদগুলো অনুমোদন করা হয়। কলকাতা মেডিকেল কলেজের নাক, কান ও গলা বিভাগের সার্জনের দায়িত্বে একজন সম্মানীত কর্মকর্তা ছিলেন। পূর্ববাংলার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পদে একজন ইস্ট পাকিস্তান মেডিকেল সার্ভিস (উঁচু) এর অফিসার দ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল। এই পদটি একজন সহকারী সার্জনের জন্য ছিল, কিন্তু বিষয়টিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ ছাড়া সহকারী সার্জন দ্বারা পূরণ করা যায় না। পূর্ববাংলায় কিছু সময়ের জন্য একজন সম্মানীত কর্মকর্তার সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অতিরিক্ত সার্জন তথা ই.পি.এম.এস. এর একজন কর্মকর্তাকে প্রতিমাসে ৬০-১০-১১০ রুপি স্কেলে হাসপাতালে নিয়োগ দেওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। যেসব মেডিকেল অফিসার হাসপাতালে রোগীর শয্যার পাশে উপস্থিত এবং প্রাইভেট প্রাকটিসের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছিলেন না, তাদেরকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে এই ভাতা দেওয়া হয়। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, কেবলমাত্র সেসব মেডিকেল কর্মকর্তা, যারা হাসপাতালে শয্যার দায়িত্বে ছিলেন, তারাই প্রাইভেট প্রাকটিসের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেয়েছেন, যেখানে নন ক্লিনিক্যাল মেডিকেল কর্মকর্তা যেমন, শিক্ষক বা এনাটমির অধ্যাপক, ফিজিওলজির অধ্যাপক খুব কমই প্রাইভেট প্রাকটিসের সুযোগ পেয়েছে, কারণ তারা কোনো শয্যার দায়িত্বে ছিলেন না।

১৯৫০ সালের ৬ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজে নাক, কান ও গলা রোগের অস্থায়ী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করার অনুমোদন দেওয়া হয়। এর জন্য বেতন স্কেল নির্ধারণ করা হয় ৫৫০-৭৫/২-১০০০/- রুপি অথবা বয়সের ভিত্তিতে বাইরের জন্য ৬৫০-৫০/২-৭৫০-৭৫/২-১২০০/- রুপি। এই অধ্যাপকের দায়িত্ব হলো কলেজের সাথে সংযুক্ত হাসপাতালের সার্জন-ইন-চার্জের কাজ এবং কলেজের নাক, কান ও গলা রোগের অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করা।

অতএব পরবর্তীতে উপরি-উক্ত বিষয়ের ওপর ১টা স্মারকলিপি পেশ করা হয়। পূর্ববাংলা সরকারের সার্জন জেনারেল ও পূর্ব পাকিস্তানের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সাথে আলোচনা করে এই বিভাগ প্রার্থীদের জন্য নিম্নের যোগ্যতা নির্ধারণ করে।[১০৩]

- ক. মেডিকেল স্নাতক হতে হবে।
- খ. নাক, কান, গলা রোগের ওপর বিদেশি ডিগ্রি ডি.এল.ও. (ইংল্যান্ড), এফ.আর.সি.এস. (এডিনবার্গ)
- গ. রোগের সার্জিক্যাল ও মেডিকেল চিকিৎসায় ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং
- ঘ. প্রার্থীদের বয়স ৩৫ বছরের কম হতে পারবে না।

উপরিউল্লিখিত প্রস্তাবিত যোগ্যতার বিষয়ে মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করা হয় এবং ২৫/৭/১৯৫০ তারিখে স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রণালয়ের কাউন্সিল সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হলে অনুমতি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৯৫০ সালের ২৭ মার্চ পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটিতে অধ্যাপকদের পদমর্যাদা ও বেতনভাতা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১০৪]

এই পদে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের পাবলিক সার্ভিস কমিশন বিজ্ঞাপন দেয় এবং সাক্ষাৎকারের সময়ে কমিশনের সাথে পূর্ববাংলা সরকারের সার্জন জেনারেল উপস্থিত থাকেন। তারা জে. এ. চৌধুরীকে এম.বি., এফ.আর.সি.এস (এডিনবার্গ) ঢাকা মেডিকেল কলেজের এই বিভাগের (ই.এন.টি) অস্থায়ী অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয় এবং পূর্ববাংলা সরকারের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সচিব জানান, তার এই নিয়োগ ১৯৪৯ সালের ২২ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। তিনি ইতিমধ্যে নাক, কান ও গলা বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। ২ বছর পর ১৯৫২ সালের ১৮ জুন উপরি-উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলা সরকারের সার্জন জেনারেল বিষয়টি কর্ণেল এম.কে আফ্রিদিকে জানান।[১০৫] মেডিকেল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান এবং জনসাধারণকে চিকিৎসা দেওয়া, এই উভয় দিক থেকে নাক, কান ও গলা রোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয়ে লাহোর মেডিকেল কলেজ ও ডাউ মেডিকেল কলেজ উভয় মেডিকেল কলেজে স্থায়ী অধ্যাপক পদের ব্যবস্থা ছিল। এ ক্ষেত্রে কলকাতায় একজন সার্জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ঢাকায় এই পদটি অস্থায়ী ভিত্তিতে অনুমোদন পায়, যা একজন সার্জনকে দেওয়া হয়। তবে দুই বছর ধরে অপেক্ষা করার পরও তা তখনও পূরণ করা হয়নি এবং এটা ভবিষ্যতেও পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে উল্লেখ করা হয়। তাই সুপারিশ করা হয়,

> The Government may be pleased to convert the post of professor of Ear, Nose and Throat Diseases in Dacca Medical College into a permanent one so as to give the department the requisite degree of stability and continuity.[১০৬]

অপরদিকে ১৯৫০ সালের ২৫ অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল টি. আহমেদ এনাটমি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে মোঃ আলতাফ হোসেনকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য পূর্ববাংলা সরকারের সার্জন জেনারেল এর কাছে সুপারিশ করেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা অত্যন্ত উঁচু মানের এবং তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। এনাটমি ও অন্যান্য বিষয়ে এফ.আর.সি.এস এর জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি নেন। তাঁর এনাটমি জাদুঘরে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল। যেমন, এনাটমির নমুনা প্রস্তুতকরণ, স্থিরীকরণ এবং বৃদ্ধি। এটা এই কলেজে ইতিপূর্বে করা হয়নি। ফলে তার এই ধরনের সেবা ঢাকা মেডিকেল কলেজের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। তাই সাধারণ কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কৃষি কলেজ এবং মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ভর্তি ও এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য শিক্ষক নির্বাচন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সম্মতি ও পরামর্শে করা উচিত। এর ফলে ১৯৪৯ সালের ৫ নভেম্বর উপাচার্যের কক্ষে কলা, বিজ্ঞান, আইন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিনদের নিয়ে গঠিত স্টান্ডিং কমিটির সভায় ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের শিক্ষকদের স্বীকৃতির ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১০৭]

অধ্যাপক, রিডার ও প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা কি ধরনের হওয়া উচিত তা জানার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে ১৯৫০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি একটি চিঠি পাঠান *[পরিশিষ্ট দেখুন-৩৮]*। উক্ত চিঠির জবাবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জানান

যে, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত অনেক কলেজ স্টাফ রয়েছে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের স্বীকৃত শিক্ষক, প্রভাষক, সহকারী প্রভাষক এবং ডেমনস্ট্রেটর নিযুক্ত হতে পারে। সহকারী প্রভাষক থেকে সিনিয়র পর্যন্ত নিয়োগের পুরো দায়িত্ব কলেজের। তবে অধ্যাপক ও রিডার নিয়োগের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত শিক্ষকের পদমর্যাদার জন্য সহকারী প্রভাষক, প্রভাষক বা সিনিয়র প্রভাষক আলাদাভাবে কলেজগুলোতে আবেদন করতে পারবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত গবেষণার ওপর জোর দেওয়া হয়। রিডার নিয়োগের ক্ষেত্রে উপদেষ্টা বোর্ড গবেষণার কাজের ওপর বেশি জোর দেয় এবং একজন সম্ভাব্য অধ্যাপক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রার্থীর যোগ্যতাকে আরো বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রেও গবেষণার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।[১০৮] এই ব্যাপারে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন ২ এ উল্লেখ করা হয়,

> Applications for recognition in subjects within the Faculties of Law, Music, Medicine, Science and Engineering will also be considered in respect of teachers who have become able and valued teachers in virtue mainly of practical experience and have been engaged in university teaching of a responsible nature for not less than seven years.[১০৯]

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে মেডিকেলে নিযুক্ত অধ্যাপকদের জন্য নিম্নের বেতন ভাতা নির্ধারণ করা হয়,[১১০]

১. অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল ইউনিট ২০০০/-২৫০০/-
২. অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপক নূন্যতম ১৫০০/-
৩. ক্লিনিক্যাল ইউনিটে পুরো সময়ের জন্য রিডার বা প্যাথলজির একজন রিডার বা ক্লিনিক্যাল ইউনিটে সহকারী পরিচালক নূন্যতম ৯০০/-
৪. অন্যান্য বিষয়ের রিডার ৮০০/-

অপরদিকে সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের 31(I)(n) ধারায় উল্লেখ করা হয় যে,

> Provided further that in the case of a professional College like Law, Engineering or Medicine, standing in the profession will be considered equivalent to teaching experience; provided further that in the case of persons possessing high academic qualifications the syndicate may relax the condition regarding experience.[১১১]

অন্যদিকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় জানায় যে, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজ হলো সরকারি কলেজ। এসব কলেজের অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং ডেমনস্ট্রেটর সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের যথাযথ পদমর্যাদার প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনাধীন।[১১২]

শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর কার্যক্রম 'Whole-time persons' হিসেবে ১৯৪৯ সালের ৫ ডিসেম্বর পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মোহাম্মদ আলী মিস্ত্রি, এম.ডি. (লন্ডন), এম.আর.সি.পি. (লন্ডন) এফ.সি.পি.এস. (বোম্বাই) নিম্নের প্রস্তাব করেন,

> With a view to maintain the standard of medical education and in the interest of Medical Colleges, their executive committee is of the opinion that the principals of the Medical Colleges should be debarred from private practice in order to pay more attention to the development and other affairs of the Colleges.[১১৩]

ডা. মিস্ত্রির প্রস্তাবের সাথে কাউন্সিলের সভাপতি লে. কর্নেল এম. জাফর একমত হন। চিকিৎসাশিক্ষার স্বার্থে এটা প্রয়োজন। পাকিস্তানের সমস্ত মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের ‘সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা’ হওয়া উচিত এবং প্রাইভেট প্রাকটিসের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরে উল্লেখ করেন যে, এই মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল একজন ‘সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা’। এ ছাড়া ভারতের কলকাতা এবং মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের অবস্থা একই ছিল। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড সমস্ত মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ‘সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা’ ছিলেন। তবে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের কিছু সদস্য একটি সংশোধনী আনেন। তারা ‘Whole-time one’ শব্দটির পরিপূরক হিসেবে ‘debarred from private practice’ করা উচিত বলে উল্লেখ করেন।[১১৪] কাউন্সিলের আরেকজন সদস্য ডাক্তার পীরজাদা উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবটি এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং কাউন্সিল কেউই গ্রহণ করতে সম্মত নয়। তাই ডা. মিস্ত্রি পাকিস্তান সরকারের আইনী পরামর্শ দাতার কাছ থেকে আইনী পরামর্শ নেওয়া উচিত বলে উল্লেখ করেন।

অতএব ১৯৫০ সালের ২৮ মার্চ কাউন্সিল অধিবেশনে ডা. পীরজাদা এই বিষয়ের ওপর একটি রেজুলেশন গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। পাকিস্তানের নতুন রাজ্যগুলোর দায়িত্ব হলো নতুন ডাক্তার তৈরি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রিন্সিপাল, যাদের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হওয়া উচিত, তাদের ওপর অতিরিক্ত কাজ থাকা আবশ্যক।[১১৫] তাই কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকারকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সমস্ত মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালদের সার্বক্ষণিক কলেজে থাকা প্রয়োজন। ১৯৫১ সালের ৩ মার্চ পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল ‘Whole-time principal’ শব্দটি সংজ্ঞায়িত করার ওপর আরো আলোচনা করার পর সিদ্ধান্ত নেয় যে,

> The designation ‘Whole-time principal’ should mean a ‘principal who is whole-time and is not allowed private practice.[১১৬]

অন্যদিকে কলেজের অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেডিকেল কাউন্সিল আরো উল্লেখ করে,

> It is suggested that these professors should go abroad for a professors and it is not clear therefore that would be the position on their return from such a refresher course. If this can be appointed professors the difficulty is solved but I am not sure if such a course can be adopted. If not, it is necessary to advertise the posts again but I think more attractive terms will have to be made if we are to attract suitable candidates. I suggest that the matter should be returned to the Pakistan Medical Council first and then to the P.S.C if the Medical Council agrees to their appointment as proposals after a refresh course.[১১৭]

১৯৫৩ সালে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক শিক্ষক, পরীক্ষক নিয়োগের জন্য একটি নীতিমালা গৃহীত হয়।[১১৮] অন্যদিকে ইতিপূর্বে ১৯৪৯ সালের ৬ ডিসেম্বর কাউন্সিলের রেজুলেশন অনুসারে ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল কর্তৃক নীতিমালায় বিভিন্ন বিষয়ের নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন অধ্যাপকদের পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

একই বছরের অক্টোবরে প্রতিরক্ষা ও সিভিল উভয় মেডিকেল বিভাগের যোগ্য ডাক্তারের স্বল্পতা পূরণ করার জন্য ‘মেডিকেল প্রাকটিশনারস এ্যাক্ট’ (ন্যাশনাল সার্ভিস) ১৯৫০ নামে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। আইনটি কার্যকর করার পর থেকে ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তাই এই আইনটি সংশোধন করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং নিম্নের পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করা হয়,[১১৯]

১. বিধিবদ্ধ লাইসেন্সি ডাক্তারদের ৪০০ রুপি, স্নাতক ৪৫০ রুপি এবং স্নাতকোত্তর ডাক্তারকে ৮০০ রুপি বেতন দেওয়া উচিত।
২. ন্যাশনাল সার্ভিসের সময় হ্রাস করে ৩ থেকে ২ বছর করা উচিত।
৩. নিয়ম ভঙ্গকারীদের জন্য শাস্তি সহজ হওয়া উচিত। কারাগার এবং জরিমানা হওয়া উচিত নয়।
৪. ডাক্তারদের যারা আরো উচ্চ শিক্ষা করতে ইচ্ছুক তাদেরকে আইন অনুসারে কাজ থেকে অব্যহতি দেওয়া উচিত।
৫. মহিলা ডাক্তারদের জাতীয় সেবা বা ন্যাশনাল সার্ভিস থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। অথবা তাদের আবাসিক এলাকা থেকে সরানো উচিত নয়।
৬. ডাক্তারদের প্রদেশের বাইরে দেওয়া উচিত হবে না।
৭. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের নিবন্ধিত হতে হবে এবং ন্যাশনাল সার্ভিসের জন্য নিয়োজিত করা উচিত।

এই আইনটির কিছু অংশ পূরণ করা সম্ভব ছিল। এর গ্রহণযোগ্যতা অন্যান্যদের কাছে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। পাকিস্তান সরকারের মতামত ছিল যে, এই আইনের অধীনে যে আইনটি তখন বিদ্যমান ছিল এবং জাতীয় পর্যায়ে সেবার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ডাক্তারদের স্বল্পতা পূরণের জন্য আইন প্রণয়ণের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

বাস্তবে উপরি-উক্ত আইনের বিরোধিতা করা হলে আরো সংশোধন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কেননা প্রস্তাবিত সংশোধনের ২, ৪, ৫ এবং ৭ নং কে যুক্তিসঙ্গত মনে করা হলেও ৬ নং কে আরো পর্যবেক্ষণ করা উচিত বলে উল্লেখ করেন। তাই পরবর্তীতে এই আইনটি সংশোধন করে বলা হয় যে, Medical Practitioners (National) Service Act, 1950 অনুসারে প্রত্যেক রেজিস্ট্রিকৃত ডাক্তার, যারা সরকারি চাকুরিতে নেই এবং যাদের বয়স ৩২ বছরেরও কম তাদেরকে জাতীয় পরিষেবার (ন্যাশনাল সার্ভিসের) জন্য আহ্বান করা হয়।[১২০] তাই সরকার প্রস্তাবিত সংশোধনের ১ নং এর ক্ষেত্রে নিম্নহারে নিবন্ধিত ডাক্তারদের বেতন ও ভাতা প্রদান করার সুপারিশ করেন[১২১]

১.	লাইসেন্সিয়েট	বেতন স্কেল ১২৫-৫-২০০/রুপি, ভাতা ৩০/রুপি
২.	মেডিকেল স্নাতক	বেতন স্কেল ২৫০-২০-৪৫০-২৫-৬০০/রুপি, ভাতা ৬০/রুপি
৩.	স্নাতকোত্তর	বেতন স্কেল ৫৫০-৩০-৪৫০/রুপি, ভাতা ১০০/রুপি

এ ছাড়া বয়সের ভিত্তিতে বেতন নির্ধারণ করা উচিত বলে উল্লেখ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র পাকিস্তানের জন্য একই বেতন স্কেল ধার্য করা, কারণ নিবন্ধিত ডাক্তারদের প্রদেশের বাইরে নিয়োগ দেওয়া হবে না। তাই প্রাদেশিক স্কেল অনুযায়ী বেতন দেওয়া উচিত বলে উল্লেখ করা হয়। এভাবে নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে এই কলেজের অধ্যাপক সংখ্যা ছিল ১৬ জন, সহযোগী অধ্যাপক ৫ জন, প্রভাষক ২ জন, ডেমনস্ট্রেটর ২৩ জন।[১২২]

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষনপদ ও অশিক্ষনপদগুলোর মধ্যে কোনো নিয়মকানুন ছিল না। মেডিকেল গ্রাজুয়েটদের হয় ডেমনস্ট্রেটর অথবা হাউজ সার্জন হিসেবে মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রার্থীরা সাধারণ অথবা শিক্ষকতার বিষয়টি নিজেরা পছন্দ করত। একজন অফিসার ডেমনস্ট্রেটর হিসেবে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কয়েক বছর চাকুরি করার পর তাঁকে মেডিকেল স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হতো। যদি তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকে,

তাহলে একজন শিক্ষক অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করতে পারতেন। এমনকি তাঁকে সিভিল সার্জন হিসেবে যোগ্য বিবেচনা করা হতো। এসব সুযোগসুবিধা পি.এস.সি'র মাধ্যমে করা হতো। ডেমনস্ট্রেটর মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে ক্লিনিক্যাল শিক্ষা দিতেন বলে তাদের সংখ্যা বেশি থাকাটা জরুরি ছিল। বিভিন্ন বছরের বিভিন্ন শিক্ষক পদের অধিষ্ঠিত শিক্ষকদের সংখ্যা নিম্নের তালিকায় পাওয়া যায়,

<u>১৯৫৬-৫৭</u>

অধ্যাপক	১৩ জন
সহযোগী অধ্যাপক	৫ জন
প্রভাষক	৬ জন
সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর	৪ জন
ডেমনস্ট্রেটর	২৩ জন
অনারারি অধ্যাপক	১ জন

<u>১৯৫৮-৫৯</u>

অধ্যাপক	১২ জন
সহযোগী অধ্যাপক	৯ জন
প্রভাষক	৫ জন
সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর	৪ জন
ডেমনস্ট্রেটর	১৮ জন
কিউরেটর	২ জন
ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্ট	২ জন
বায়োকেমিস্ট্র	১ জন
অবৈতনিক অধ্যাপক	২ জন

<u>১৯৫৯-৬০</u>

অধ্যাপক	১২ জন
সহযোগী অধ্যাপক	৮ জন
অবৈতনিক অধ্যাপক	২ জন
প্রভাষক	৬ জন
সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর	৪ জন
ডেমনস্ট্রেটর	১৮ জন
কিউরেটর	২ জন
ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্ট	২ জন
বায়োকেমিস্ট	১ জন

উৎস: *Annual Report from 1956-57 to 1959-60, Univeristy of Dacca*, pp, 63,100,101.

এ সময় পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী লে. জেনারেল ডব্লিউ. এ. বারকী এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিচালক কলেজ পরিদর্শন করেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পরিদর্শকদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট স্কুল এর ডিন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাক্তার জে.ডব্লিউ. এসটন, ডারহামের অধ্যাপক ডাক্তার এ. এ. হার্পার, গুস্তাভ ভ্যালব, যুগোশ্লাভিয়ার ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ডাক্তার এম. জি. ক্যান্ডাউ (Candau), বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ফিজিওথেরাপি উপদেষ্টা মিস জি. এইচ. জনসন।[১২৩] এসব সম্মানীত ব্যক্তির পদাচারণে এই মেডিকেল কলেজ আরো সমৃদ্ধ হয়, কেননা তাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, পরামর্শ মেডিকেল কলেজের মানকে বিশ্বমানের হতে সহায়তা করে। তাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক মন্তব্য মেডিকেল কলেজের উন্নয়ন এবং প্রতিবন্ধকতা দূর ও সমৃদ্ধ হতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

তাছাড়া পাকিস্তান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে সমগ্র পাকিস্তানের সরকারি মেডিকেল কলেজের প্রশাসকদের দায়িত্বে ন্যস্ত করার জন্য লে. কর্ণেল এম. এম. হক-কে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ছাড়াও, ঢাকা, মহাখালী, নারায়নগঞ্জ, পি.এস. তেজগাঁওয়ের অন্যান্য সকল হাসপাতাল তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন

ছিল। ডাক্তার হাবিব উদ্দিন আহমেদ এবং ডাক্তার ক্যাপ্টেন এস. এ. লস্কর সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করায় তাদের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হন ডাক্তার নুরুল ইসলাম (অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারি) এবং এম. এ. জলিল (সহযোগী অধ্যাপক, অফথালমোলজি)। এ সময় (১৯৫৯-৬০) ঢাকা মেডিকেল স্কুলের মিডওয়াইফারির প্রভাষক মিসেস জোহরা কাজী, ঢাকা মেডিকেল কলেজে ক্লিনিক্যাল মিডওয়াফারির অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।[১২৪]

ঢাকা মেডিকেল কলেজে নতুন নতুন পদ সৃষ্টি করে শিক্ষক নেওয়া শুরু হয়। ফলে বিদেশ থেকে উচ্চ ডিগ্রি অর্জনকারী অভিজ্ঞ, দক্ষ, অনেক প্রার্থী এই মেডিকেল কলেজে যোগদান করতে শুরু করে। ডা. বাসিত এম.বি. (কোলকাতা), পিএইচ.ডি. বিদেশে উচ্চ শিক্ষার পর নতুন সৃষ্ট পদে ডারমাটোলজির সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন পদে মোট শিক্ষকের সংখ্যা নিম্নরূপ[১২৫]

<u>১৯৬০-৬১</u>

অধ্যাপক	১২ জন
সহযোগী অধ্যাপক	৮ জন
অবৈতনকি অধ্যাপক	২ জন
প্রভাষক	৬ জন
সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর	৪ জন
ডেমনস্ট্রেটর	১৮ জন
কিউরেটর	২ জন
ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্ট	২ জন
বায়োকেমিস্ট	১ জন

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেডিওথেরাপির সহযোগী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করায় রেডিওথেরাপিস্ট হিসেবে ডাক্তার সৈয়দ ফজলুল হক যোগদান করেন। কাজী জয়নাল আবেদিন কেমিস্ট্রির ডেমনস্ট্রেটর পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ায় ফাতেমা খাতুন ডেমনস্ট্রেটর হিসেবে যোগদান করেন। করাচির বেসিক মেডিকেল সায়েন্স ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ডাক্তার এম. এ. কাশেম এবং শামসুর রহমান যথাক্রমে এনাটমি, বায়োকেমিস্ট্রির প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। কলেজের প্যাথলজি, ফিজিওলজি ও এনাটমির আরো ডেমনস্ট্রেটরগণ এই প্রশিক্ষণ নিতে যান।

অপরদিকে ১৯৬১-৬২ সালে অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল ১২, সহযোগী অধ্যাপক ১৫ জন, অবৈতনিক অধ্যাপক ২ জন, প্রভাষক ৬ জন, সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর ৪ জন, ডেমস্ট্রেটর ২১ জন, কিউরেটর ২ জন, ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্ট ২ জন, বায়োকেমিস্ট ১ জন।[১২৬] এ সময় চিকিৎসা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে ঢাকা মেডিকেল কলেজ গর্ভনিং বডি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এর কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে মেডিকেল স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং এই পদের জন্য ডাক্তার এ. কে.এস. আহমেদকে নির্বাচিত করা হয় এবং তাঁকে ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের ডিন নির্বাচিত করা হয়। এই পদটি এই যাবত লে. কর্ণেল এম. এম. হক এর দ্বারা পরিচালিত হতো। মেডিকেল স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান একাডেমিক দিক এবং বাকি দিকগুলো গভর্নিং বডির সেক্রেটারি এম. এম. হক দেখাশুনা করতেন। এর চেয়ারম্যান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এ ছাড়া কিছু শিক্ষক পদোন্নতি নিয়ে অন্য মেডিকেল কলেজ, অন্যান্য স্বাস্থ্য সংস্থায় চলে গেলে কিছু নতুন শিক্ষক পদোন্নতি নিয়ে যোগদান

করেন। এই মেডিকেল কলেজের নাক, কান ও গলা রোগের অধ্যাপক জে. এ. চৌধুরী স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিচালকের দায়িত্ব পাওয়ায় কলেজ ছেড়ে চলে যান এবং তাঁর জায়গায় ডাক্তার আফজাল খান, সহযোগী অধ্যাপক (নাক, কান ও গলা) হিসেবে যোগদান করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার নুরুল ইসলাম (এম.আর.সি.পি) এর পদোন্নতি হওয়ায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ যোগদান করেন। ফলে তাঁর জায়গায় মেডিসিনের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ডাক্তার এস. এ. হাফিজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ যোগদান করেন। ডাক্তার কে. এস. হক কে ঢাকা মেডিকেল কলেজের রেডিওলজির সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেওয়া হলে প্রভাষকের পদটি আপগ্রেডেড করা হয়।[১২৭] ডারমাটোলজি এবং ফিজিক্যাল মেডিসিন ও অকুপেশনাল থেরাপিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সহযোগী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়। এই পদগুলো ডাক্তার এ. বাসিত (এম.বি, পিএইচ.ডি.) এবং আবুল হোসাইন, এম.এসসি., বি.এপিপি. এসসি (কুইন্সল্যান্ড) দ্বারা পূরণ করা হয়। ডাক্তার মোঃ নুরুল হুদা এবং মাজহারুল ইমাম করাচিতে ‘বেসিক মেডিকেল সায়েন্স ইনস্টিটিউট’ থেকে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে দেশে ফিরে আসলে ঢাকা মেডিকেল কলেজে যথাক্রমে কিউরেটর এবং সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর পদে যোগদান করেন।

এভাবে প্রতিবছর বদলি, পদোন্নতির কারণে শিক্ষকগণ ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে অন্য মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন। কেউ কেউ বিদেশ থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়ে এই মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন। নিয়োগ প্রক্রিয়া পি.এস.সি.’র মাধ্যমে সম্পন্ন হতো, তাই মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হিসেবে কেউই স্থায়ীভাবে এই কলেজে অবস্থান করতে পারতেন না। ফলে কেউ পদোন্নতি নিয়ে এই কলেজে যোগদান করত, আবার কেউ পদোন্নতি নিয়ে অন্য মেডিকেল কলেজে যোগদান করত। এভাবেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ

দেশ বিভাগের আগে থেকেই ভারত সরকার চিকিৎসকদের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ ১৯৪৭-৪৮ সালে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ভারতীয় রাজ্যগুলির প্রার্থী বাদ দিয়ে সর্বাধিক ৬৫ জনকে বিদেশে পাঠানোর প্রস্তাব করে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ২৫জন এবং প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে ৪০ জনের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়।[১২৮] অতীতের মতোই কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকপ্রাপ্ত প্রার্থীদের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিরক্ষা সেবায় নিয়োজিত অস্থায়ী অফিসার থেকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকার প্রার্থীদের সমস্ত খরচ বহন করে। প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীদের জন্য যে ব্যয় ধরা হয় তার ৫০ ভাগ ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করতে সম্মত হয়। এই অনুদানকে যুদ্ধোত্তর প্রদেশের উন্নয়নের জন্য সাধারণ অনুদানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ড দ্বারা প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। তাই চিকিৎসাশিক্ষার উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ড ৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়।[১২৯]

যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থী যাতে বাছাই করা হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য বলা হয় যে, প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত প্রার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, বিশেষত যেসব প্রার্থী বেসরকারি সংস্থাগুলোতে শিক্ষকতা করে, তাদের অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের যুদ্ধ সেবা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে এমন ব্যক্তিদের নেওয়া উচিত। প্রাদেশিক সরকার ভারত সরকারের কাছে তাদের সুপারিশ করার আগে স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আবেদনপত্র

আহ্বান করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে না বলে উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্মসচিব পি. মাধব মেনন ১৯৪৭ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি একটি চিঠির মাধ্যমে বিষয়টি দেখার জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ডের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে সিমলায় তাদের রিপোর্টের ৯c অনুচ্ছেদে দেখা যায় এবং যার কপি (Letter No F. 8/5/46-PR), dated the 10th August 1946) প্রাদেশিক সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে প্রেরণ করা হয়। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় দেখা যায় যে,[১৩০]

The majority of them applied for training in surgical specialities.

তবে ১৯৪৭-৪৮ সালে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয় বিশেষ করে মৌলিক বিজ্ঞান, মেডিসিনের অন্যান্য শাখার ওপর জোর দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হয় এবং প্রাদেশিক সরকারকে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে বলা হয়। তাই নিম্নের বিষয়ের ওপর উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়,

১. সাধারণ মেডিসিন এবং এর শাখা যেমন, প্রেডিয়াট্রিক
২. সামাজিক চিকিৎসা বা সোস্যাল মেডিসিন
৩. সার্জারি এবং এর শাখা যেমন, চক্ষু, নাক, কান ও গলা রোগ
৪. মিডওয়াইফারি ও গাইনোকোলজি
৫. প্রসুতি ও শিশুকল্যাণ
৬. ফিজিওলজি
৭. ব্যাকটেরিওলজি
৮. প্যাথলজি
৯. ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেলথ এন্ড মেডিসিন
১০. যক্ষ্মা
১১. জনস্বাস্থ্য প্রশাসন
১২. ফার্মাকোলজি
১৩. অ্যানাসথিসিয়া
১৪. স্বাস্থ্য শিক্ষা
১৫. মনোরোগবিদ্যা
১৬. যৌনরোগ
১৭. ডারমাটোলজি
১৮. চিকিৎসা প্রাণিবিদ্যা (Medical Zoology)
১৯. চিকিৎসা পরিসংখ্যান (Medical Statistics)

ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্মসচিব পি. মাধব মেনন জানান যে, স্বাস্থ্য বিভাগ এবং সাধারণ বৃত্তি প্রকল্পের অধীনে চিকিৎসা ও সমন্বিত বিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা শিক্ষা বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হবে না। ১৯৪৭ সালের ১৩ মার্চের একটি চিঠিতে থেকে জানা যায় যে, বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য যেসব প্রার্থীদের বাংলা সরকার মনোনীত করে তাদের নাম এবং প্রশিক্ষণের বিষয়ের নাম নিম্নরূপ[১৩১]

১. ডাক্তার রেফাতউল্লাহ্	সার্জারি (অফথালমোলজি)
২. ডাক্তার কুমার কান্তি ঘোষ	সার্জারি
৩. ডাক্তার শামসুল আলম	সার্জারি
৪. ডাক্তার অনিল কুমার রায়	সার্জারি
৫. ডাক্তার হাবিবুর রহমান	মেডিসিন
৬. ডাক্তার সুলতান আহমেদ চৌধুরী	মেডিসিন

৭. ডাক্তার ইব্রাহীম — মেডিসিন
৮. ডাক্তার বিমনেশ ভূষণ চ্যাটার্জি — রেডিওলজি
৯. ডাক্তার সুধানসু কুমার গাঙ্গুলী — যক্ষ্মা
১০. ডাক্তার সুরাজ কুমার দে — ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় প্রার্থীর মেধা, যোগ্যতা অথবা অনুপযুক্ত হিসেবে তালিকা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ডকে প্রতিটি প্রদেশের উপযুক্ত প্রার্থীদের নিম্নোক্তভাবে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করা হয়,[১৩২]

মাদ্রাজ, বোম্বে, বাংলা, যুক্তপ্রদেশে এবং পাঞ্জাব–৫ (প্রতিটি)

সি.পি. এবং বেরার, বিহার, আসাম, সিন্ধু, উড়িষ্যা এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ–৩ (প্রতিটি)

কোনো প্রদেশে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া না গেলে তা অন্য প্রদেশে বরাদ্দ দেওয়ার জন্য বোর্ড সুপারিশ করে। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক ভারতীয় রাজ্যগুলো থেকে মোট আবেদনের সংখ্যা ২৫ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে অনুরোধ করে। এ ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ আসনগুলো প্রদেশের মধ্যে বরাদ্দ করা উচিত বলে উল্লেখ করেন। অসম্পূর্ণ আসনগুলো অন্যান্য প্রদেশে বরাদ্দের ক্ষেত্রে ছোট প্রদেশগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বোর্ড সুপারিশ করে। উল্লেখ্য ১৯৪৭ সালের ৩রা এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের মহাপরিচালকের দপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এ সময় সমস্ত আবেদন প্রাপ্ত উৎস অনুসারে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়,[১৩৩]

ক. প্রাদেশিক সরকার	১০১টি
খ. কেন্দ্র শাসিত এলাকা প্রধান কমিশনার	১৩টি
গ. কেন্দ্রীয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	৩০টি
ঘ. প্রতিরক্ষা	৯০টি
ঙ. স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যক্তিদের কাছ থেকে সরাসরি প্রাপ্ত আবেদন	২৩৩টি
চ. ভারতীয় রাজ্য থেকে প্রাপ্ত আবেদন	২৭টি
ছ. ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত আবেদন	
১. প্রাদেশিক প্রার্থী	১০টি
যারা ১৯৪৬ সালে নির্বাচিত হয়, কিন্তু উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠানো যায়নি	
২. প্রাদেশিক প্রার্থী	৪০টি
যারা ১৯৪৭ সালের শিক্ষা বিভাগের মেডিকেল স্কলারশিপের জন্য আবেদন করে	
মোট	৫৩৩টি

কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ড কর্তৃক প্রার্থী নির্বাচন করার জন্য ভারত সরকার নিম্নের সদস্যদের নিয়ে একটি স্ক্রুনিং কমিটি গঠন করেন,[১৩৪]

১. ডাক্তার রাজা-সচিব
২. কর্ণেল কাটার, পাবলিক হেলথ কমিশনার
৩. লে. জেনারেল আর. হে, ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের মহাপরিচালক।

এই কমিটি উপরি-উল্লিখিত গ. ঘ. ঙ. এবং ছ [১ ও ২] এর আবেদনগুলো যাচাই বাছাই করে।

১৯৪৭ সালের ৯ই মে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি বাংলা সরকারের জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সচিবকে অবহিত করে চিঠি প্রদান করেন। উক্ত চিঠিতে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলা প্রদেশের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্য থেকে কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ড মেডিকেল এবং সুনির্দিষ্ট

বিষয়ে বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাংলা সরকার কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নের প্রার্থীদের কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ড দ্বারা নির্বাচন করা হয় এবং তাদের নামের পাশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত বিষয় উল্লেখ করা হয়,[১৩৫]

১.	ডাক্তার কাজী শামসুল আলম	সার্জারি
২.	ডাক্তার মোহাম্মদ ইব্রাহীম	মেডিসিন
৩.	ডাক্তার সুলতান আহমেদ চৌধুরী	জেনারেল মেডিসিন
৪.	ডাক্তার বিমনেশ ভূষণ চ্যাটার্জী	রেডিওলজি
৫.	ডাক্তার গুণীলাল মুখার্জী	ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ
৬.	ডাক্তার লীলা ব্যানার্জী	প্রসুতি ও শিশু কল্যাণ

দেশ বিভাগের পূর্বে চিকিৎসকদের উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। দেশভাগের পর থেকে পূর্ববাংলা মেডিকেল ও জনস্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষ লোকের অভাবে বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। তাই সমগ্র পাকিস্তানে দক্ষ লোকদের কাজে লাগানোর জোর প্রচেষ্টা শুরু হয়। টেকনিক্যাল পদে ভারতের মুসলমানদের জন্য দরজা উন্মুক্ত রাখা হয়। পাকিস্তান ও ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে দক্ষ প্রযুক্তিগত লোকের সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল। এর ফলে ভারত বিভাগের পর দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই বিদেশের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলোতে বৃহতসংখ্যক মেডিকেল ও অন্যান্য কারিগরি বিষয়ের ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করে তোলার জন্য তাদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

যুক্তরাজ্যে পাকিস্তান ও ভারতের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা জেনারেল হেনস বলেন, পূর্ববাংলার প্রার্থীদের যুক্তরাজ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ভালো ছিল না। এই ব্যাপারে সার্জন জেনারেল জানান যে, পূর্ববাংলার প্রার্থীদের বিদেশে পাঠানোর আগে তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা অথবা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা ছিলনা। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ইংল্যাণ্ডে সেসব প্রার্থীদের পাঠানো উচিত, যারা সেখানে প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত বলে গণ্য হবে এবং এসব প্রার্থীদের পূর্ববর্তী কোনো অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই একটি ডিগ্রি অথবা ছয় মাসের ডিপ্লোমার জন্য বিদেশের ভালো প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য বিবেচনা করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শে প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া এবং তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হবে, কিন্তু প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। দেশের বিদ্যমান অবস্থাকে বিবেচনা না করলেও এই বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে বলা হয়,

> This should be explained to the central Government and they should be requested to give us possible help in this connection.[১৩৬]

যাহোক এরই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান মেডিকেল সার্ভিসের নিম্নের অফিসারদের ইংল্যাণ্ডে উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়,[১৩৭]

১. ডাক্তার এইচ. রহমান
২. ডাক্তার এম. এ. লস্কর
৩. ডাক্তার মোঃ ইব্রাহীম
৪. ডাক্তার কে. এম. আলম
৫. ডাক্তার এস. এ. চৌধুরী, আগস্ট ১৯৫০ (প্রত্যাবর্তন)
৬. ডাক্তার কে. এম. হক, সেপ্টেম্বর ১৯৫০ (প্রত্যাবর্তন)
৭. ডাক্তার এ. মজীদ, নভেম্বর ১৯৫০ (প্রত্যাবর্তন)

৮. ডাক্তার এ. কাদেরী
৯. ডাক্তার কিউ. এ. খালেক

উপরি-উক্ত ৯ জন অফিসারের মধ্যে ১ থেকে ৪ নং পর্যন্ত ১৯৪৯-৫০ সালের অর্থ বছরের মধ্যে দেশে প্রত্যাবর্তন করে এবং ১৯৫০-৫১ সালের বাজেটে তাদের জন্য কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। ১ থেকে ৪ নং অফিসারের জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়,[১৩৮]

৮৩০/রুপি (প্রতি অফিসার) বেতন ৩৮০/রুপি, শিক্ষা ভাতা ৪৫০/রুপি

৮৩০×৪×১২=	৩৯,৮৪০/-রুপি
দেশে ফেরার ভ্রমণ বিল ১৬০০×৪=	৬,৪০০/রুপি
টিউশন ফি = ৫০৪×৪=	২,০১৬ রুপি
মোট -	৪৮,২৫৬/রুপি
৫ এবং ৬ নং এর জন্য ৮৩০×২×১২=	১৯,৯২০/-রুপি
টিউশন ফি ৫০৪×২=	১০০৮/-রুপি
মোট-	২০,৯২৮/-রুপি

৭ এবং ৯ নং এর অস্থায়ী নিয়োগ, তাই তাদের জন্য তালিকাভুক্ত বেতন ছিল না–

টিউশন ফি ৪৫০×৩×১২=	১৬,২০০/-রুপি
৫০৪×৩=	১৫১২/-রুপি
মোট -	১৭,৭১২/-রুপি
ডাক্তার খালেকের বেতন ৩৮০×১২=	৪,৫৬০/-রুপি
মোট -	২২,২৭২/-রুপি
১৯৪৯-৫০ সালের জন্য সংশোধিত বাজেট	৪৮,২৫৬/-
	২০,৯২৮/-
	২২,২৭২/-
মোট-	৯১,৪৫৬/- রুপি

এ ছাড়া নিম্নের অফিসারগণও বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়,

১. ডাক্তার মজিবুর রহমান
২. ডাক্তার মনসুর আলী
৩. ডাক্তার আব্দুর রহমান
৪. ডাক্তার কাজী আবুল মনসুর
৫. ডাক্তার এ. এম. নসিন
৬. ডাক্তার এস. আই. এম. গোলাম মান্নান।

৩ নং থেকে ৬ নং পর্যন্ত স্থায়ী নিয়োগ হওয়ায় তাদেরকে ছুটিজনিত বেতন এবং পড়াশোনার ভাতা দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ২ নং তথা ডাক্তার মনসুর আলী এর চাকুরী স্থায়ীকরণ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং ডাক্তার মজিবুর রহমান এর ক্ষেত্রেও একই প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। তাই তাদের সকলকে স্থায়ী চাকুরিজীবী বিবেচনা করা হয়। ১৯৫০-৫১ সালে তাদের জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়,[১৩৯]

টিউশন ফি	৮৩০×১২×৬=	৫৯,৭৬০/-
	৫০৪×৬=	৩০২৪/-
মোট -		৬২,৭৮৪/-

ডাক্তার এস. এ চৌধুরী	৪১৫০/- (৫ মাস)
ডাক্তার কে. এস. হক	৪৯৮০/- (৬ মাস)
ডাক্তার এ. মজিদ	৩৬০০/- (৮ মাস)
	৭৫,৫১৪/রুপি
ডাক্তার কিউ এ. খালেক এবং এ কাদের	১০,৮০০/-
মোট -	৮৬,৩১৪/-
ডাক্তার খালেক এর ছুটিজনিত বেতন	৪৫৬০/-
মোট-	৯০৮৭৪/-

তাই বাজেটে নিম্নের ব্যবস্থা করা হয়;

সংশোধিত বাজেট,

১৯৪৯-৫০	১৯৫০-৫১
৯১,৪৫৬/-রুপি	৯০,৮৭৪/-রুপি

অতএব উপরিউল্লিখিত বাজেটজনিত তথ্য অর্থ বিভাগের কাছে স্বাস্থ্য বিভাগ প্রেরণ করে।

এদিকে ১৯৪৯ সালের ৪ নভেম্বর মিসেস ডাক্তার হামিদা মালিক মেটারনিটি ও চাইল্ড হেলথ এর ওপর ইংল্যান্ডে উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হন। অনুরূপভাবে ডাক্তার এম. হাসানাত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অধীনে বি.সি.জি. এর ওপর উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হন। ফলে জনস্বাস্থ্য বিভাগ তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[১৪০]

১৯৫০ সালে চিকিৎসকদের বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠানো হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের তেমন কাউকে দেখা যায়নি। কেননা প্রথম ব্যাচ তখনও পাশ করে বের না হওয়ায় অন্যান্য মেডিকেল স্কুল থেকে উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হতো, যা সরকারি কার্যবিবরণীতে দেখা যায়। পাকিস্তান শাসনামলে বিদেশে উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য চিকিৎসকদের পাঠানোর বিষয়টি মিনিস্ট্রি অব হেলথ এণ্ড ওয়ার্কস (হেলথ ডিভিশন) থেকে নিষ্পত্তি করা হতো।

১৯৫০ সালে বেশিরভাগ মেডিকেল শিক্ষার্থী ইংল্যান্ডে উচ্চ শিক্ষার জন্য যায়। ১৯৫১ সালের শুরুতে গ্রীষ্মকালীন মেয়াদের কোর্সে ব্রিটিশ পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ফেডারেশন অবসটেট্রিকস অ্যান্ড গাইনোকোলজি ইনস্টিটিউটে পূর্ববাংলার শিক্ষার্থী ডাক্তার এ.এফ.এম. নুরুল ইসলাম, জে. কিউ. শেখ কে গাইনোকোলজিতে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করে। উল্লেখ্য যে, পঞ্চাশের দশকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যেতে হলে স্বাস্থ্যজনিত সার্টিফিকেট লাগত। একজন মিউনিসিপাল হেলথ অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত গুটিবসন্ত ও কলেরা নেই এমন সার্টিফিকেট সংযুক্ত করা হতো।[১৪১] এ সময় পূর্ববাংলার নিম্নের চিকিৎসকদের ইংল্যান্ডে উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়,[১৪২]

১. ডাক্তার এইচ. রহমান, প্রত্যাবর্তন জুলাই ১৯৫০
২. ডাক্তার এস. এ. লস্কর, প্রত্যাবর্তন জুলাই ১৯৫০
৩. ডাক্তার কে. এস. আলম, প্রত্যাবর্তন জুলাই ১৯৫০
৪. ডাক্তার এস. এ. চৌধুরী, প্রত্যাবর্তন এপ্রিল ১৯৫০
৫. ডাক্তার কে. এস. হক, প্রত্যাবর্তন জুলাই ১৯৫০
৬. ডাক্তার এ. মজিদ, প্রত্যাবর্তন নভেম্বর ১৯৫০
৭. ডাক্তার এ. কাদের
৮. ডাক্তার কিউ. এ. খালেক
৯. ডাক্তার মীর মনসুর আলী, প্রত্যাবর্তন জুলাই ১৯৫০

১০. ডাক্তার আব্দুর রহমান

১১. ডাক্তার কাজী আবুল মনসুর

১২. ডাক্তার এস. আই. এস. গোলাম মান্নান

১৩. ডাক্তার মজিবুর রহমান, প্রত্যাবর্তন সেপ্টেম্বর ১৯৫০

১৪. ডাক্তার এ. এম. নসিন

উপরি-উল্লিখিত চিকিৎসকদের উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য আনুমানিক ব্যয় দেখানো হয়,[১৪৩]

১ থেকে ৩ নং পর্যন্ত ৮৩০/- রুপি (জনপ্রতি প্রতিমাস) বেতন ভাতা, শিক্ষা ভাতা ৪৫০/- রুপি।

৮৩০×৪×৩=	৯৯৬০/- রুপি
৪ নং এর জন্য ৮৩০×৫=	৪১৫০/- রুপি
৫ নং এর জন্য ৮৩০×৬=	৪৯৮০/- রুপি
৬ নং এর জন্য ৪৫০×৮=	৩৬০০/- রুপি
৭ ও ৮ নং এর জন্য ৪৫০×২×২=	১০,৮০০/- রুপি
ডাক্তার খালেকের ছুটির বেতন=	৪,৫৬০/- রুপি
৯ থেকে ১২ নং এর জন্য ৮৩০×২×৪=	৩৯,৮৪০/- রুপি
১৩ থেকে ১৪ নং টিউশন ফি ৮৩০×২×২=	১৩,২৮০/- রুপি
৯ থেকে ১৪ নং পর্যন্ত ৫৪০×৬=	৩,০২৪/- রুপি
মোট-	৯৪,১৯৪/- রুপি

অনুরূপভাবে ১৯৫১ সালে ইংল্যান্ডে চিকিৎসাশিক্ষার ওপর উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য পূর্ববাংলার নিম্নের ১০ জন চিকিৎসকের নামের তালিকা পাওয়া যায়,[১৪৪]

১. ডাক্তার মীর মনসুর আলী, প্রত্যাবর্তন ডিসেম্বর ১৯৫১

২. ডাক্তার কাজী আব্দুল মনসুর, প্রত্যাবর্তন ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

৩. ডাক্তার মজিবুর রহমান, প্রত্যাবর্তন সেপ্টেম্বর ১৯৫২

৪. ডাক্তার, এস. আই. গোলাম রহমান

৫. ডাক্তার আজিজুর রহমান খান, প্রত্যাবর্তন ডিসেম্বর ১৯৫২

৬. ডাক্তার জে. আহমেদ, প্রত্যাবর্তন ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩

৭. ডাক্তার এ. এইচ. খান, প্রত্যাবর্তন মার্চ ১৯৫৩

৮. এ. এফ. এম. নুরুল ইসলাম, প্রত্যাবর্তন মার্চ ১৯৫৩

৯. মোঃ আলতাফ হোসাইন, প্রত্যাবর্তন মার্চ ১৯৫৩

১০. মোঃ আজিজ উদ্দিন, প্রত্যাবর্তন জুন ১৯৫৩

একই বছরের ১৩ ডিসেম্বর মীর মনসুর আলী ইংল্যান্ড থেকে ফার্মাকোলজির ওপর উচ্চ প্রশিক্ষণ শেষে ঢাকায় ফিরে আসলে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফার্মাকোলজির সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়। ১৯৫১-৫২ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিম্নের অধ্যাপকগণ 'প্রেসিডেন্ট টু ম্যান এর পয়েন্ট ফোর প্রোগ্রাম' এর অধীনে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য আমেরিকা যান।[১৪৫]

১. ডাক্তার এ. কে. এম আব্দুল ওয়াহেদ

অধ্যাপক, মেডিসিন

২. ডাক্তার আব্দুল করিম,
   অধ্যাপক, ফিজিওলজি
৩. ডাক্তার আনোয়ার আলী
   অধ্যাপক, প্যাথলজি

তাছাড়া 'দ্য পাকিস্তান গুড উইল মিশন' এর একজন সদস্য হিসেবে কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার নওয়াব আলী, এম. বি., ডি.টি.এম, এম. আর. সি.পি. (এডিন), রাশিয়া সফরে যান।[১৪৬] ১৯৫৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক স্বল্পমেয়াদী বৃত্তি দানের জন্য মিশরীয় অফথালমোলজিক্যাল সোসাইটির জুবিলি মিটিং কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয়। তিন সপ্তাহের এই বৃত্তিদানের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকারকে একজন প্রার্থী পাঠানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান। ট্রাকোমা কোর্সের জন্য এই বৃত্তিটি দেওয়া হয়। প্রার্থীকে উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ট্রাকোমা সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত অথবা চক্ষু বিষয়ে একজন প্রভাষক হতে হবে। এটাও বলা হয় যে, যিনি তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ বা কাজটি প্রথম সভায় উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তা যেন দেশ সেবায় ভূমিকা রাখে। এই ফেলোশিপটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের অফথালমিক সার্জারির অধ্যাপক ডাক্তার মোঃ রেফাতউল্লাহ্ কে দেওয়া হয়। তিনি চক্ষু রোগের ওপর আঞ্চলিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক ফেলোশিপপ্রাপ্ত হন। এই ফেলোশিপের মেয়াদ ছিল ১৪ই ফেব্রুয়ারির ১৯৫৩ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ পর্যন্ত। তিনি পাকিস্তানের একজন প্রতিনিধি হিসেবে কায়রোতে অনুষ্ঠিত 'গ্লোডেন জুবিলি অফথালমিক কনফারেন্স অব দ্য ইজিপটিয়ান অফথালমোলজিক্যাল সোসাইটি' এর সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এই সেমিনারে বিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বের বিখ্যাত ছয়জন চক্ষু বিশেষজ্ঞ যোগদান করেন। যেমন, অধ্যাপক লিন্ডায়ার (Lindyer), ভিয়েনা, ডাক্তার থিভেচো (Thyveso) ক্যালিফোর্নিয়া, ডাক্তার থায়াল (Thail) জার্মানি, ডাক্তার লিজ (Lyis) লন্ডন, ডাক্তার শলরচ (Shlors), কোপেনহেগেন এবং ডাক্তার কোগান (Cogan) ইউ.এস.এ। তাঁরা প্রত্যেকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আমন্ত্রণে চোখের অস্ত্রোপচারের ওপর আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, ডেমনস্ট্রেশন এবং লেকচার দেন। অন্যদিকে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক রেফাতউল্লাহ ২টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়,[১৪৭]

১. Incidence of Trachoma in East Pakistan.
২. True Diabetic Cataract with special reference to the position of cataract in Pakistan.

তিনি উপরি-উক্ত প্রবন্ধ উপস্থাপন ছাড়াও কায়রোর বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। কায়রোর হাসপাতালগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামে সজ্জিত থাকায় এখানকার জনগণ এই হাসপাতালগুলো থেকে চিকিৎসার ভালো সুযোগসুবিধা পেত। এর পাশাপাশি তিনি সৌদি আরবের মক্কা মদিনার হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় পরিদর্শন করেন। এখানে ট্রাকোমা ক্যাটারাক্টের মতো চোখের রোগের ভালো চিকিৎসা হতো। বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসা দিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ডাক্তার ছিল।[১৪৮]

১৯৫৬ সালের ২রা এপ্রিল পেশওয়ারে 'নিখিল পাকিস্তান মেডিকেল কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। এ কনফারেন্সে পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের পূর্বাঞ্চল শাখার ৪ জন প্রতিনিধি যোগদান করে। তারা হলেন ডাক্তার মোহাম্মদ হোসেন, ডাক্তার সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, ডাক্তার এম. এন. নন্দী, এবং ডাক্তার এম. আহমদ। এই প্রতিনিধি দল মেডিকেল এসোসিয়েশনের স্থানীয় শাখা প্রণীত পঞ্চবার্ষিক স্বাস্থ্য পরিকল্পনাটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তের দাবি জানায়।[১৪৯]

পরবর্তীতে ১৯৫৭-৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কিছু বিভাগের শিক্ষক উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ যান। এ সময় ফার্মাকোলজির প্রভাষক ডাক্তার কামাল উদ্দিন রোগের চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ে রেডিও আইসোটপের ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ইউ.এস.এ. যান। ডাক্তার হাবিবউজ্জামান ইউ.এস.এস. থেকে প্রশিক্ষণ শেষে প্যাথলজি বিভাগে সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর হিসেবে যোগদান করেন। ডাক্তার মোয়াজ্জেম ইউ.কে. থেকে অধ্যয়ন শেষে প্যাথলজি বিভাগে যোগদান করেন এবং ফিজিওলজির ডাক্তার ওয়াদুদ উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউ.কে-তে যান। অপরদিকে ১৯৬৩ সালে পূর্বাঞ্চল শাখার ১০তম মেডিকেল সম্মেলনে ডাক্তার মোঃ ইব্রাহীম বহুমুত্র রোগ (ডায়াবেটিক) সম্পর্কে এক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উল্লেখ্য ডাক্তার ইব্রাহীম বিদেশ থেকে উচ্চ ডিগ্রিধারী চিকিৎসক ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাথমিক পর্যায়ের সীমিত সংখ্যক অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর পদটি প্রথমে অতিরিক্ত চিকিৎসক হিসেবে হলেও পরবর্তীতে মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হন। তিনি সাংগঠনিক তৎপরতায় অভিজ্ঞ ছিলেন। এর ফলে তারই উদ্যোগে স্থাপিত ডায়াবেটিক এসোসিয়েশনের সেগুন বাগিচার টিনের চালাঘর থেকে রমনায় বিশাল ভবনে বারডেম নামক সংগঠন গড়ে ওঠে।[১৫০]

১৯৬৩ সালের মেডিকেল সম্মেলনে বহুমুত্র ছাড়া আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। প্রদেশের ফোলিক এসিডের স্বল্পতা সম্পর্কে ডাক্তার জন লিন্ডেন একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডাক্তার এম. এন. নন্দী গুটি বসন্তের ওপর একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। এ ছাড়া ডাক্তার এস. এম. রব, ডাক্তার এম. জি. ডাক্তার আনোয়ার হোসেন, ডাক্তার এম. এইচ. রহমান, ডাক্তার জহুরা খাতুন এবং ডাক্তার এব্রাম এম. কোনানসন প্রমুখ তথ্যপূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১৫১]

১৯৬৩ সালে সরকার ৫৫ জন চিকিৎসককে বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করে। প্রাদেশিক পরিষদের কার্যবিবরণীতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৬৩-৬৪ সালে একই সংখ্যক চিকিৎসক পাঠানো হবে। এর জন্য বাজেট প্রায় ৭.৮ লক্ষ রুপির ব্যবস্থা করা হয়।[১৫২] অপরদিকে ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে ৭.৭০ কোটি রুপি বরাদ্দ করা হয়। চিকিৎসাশিক্ষার ক্ষেত্রে নিরাময়ী এবং প্রতিরোধক উভয়ের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটা সফল করার জন্য চিকিৎসাশিক্ষার সাধারণ ক্ষেত্রে উঁচুমানের শিক্ষক ও ক্লিনিক্যাল স্টাফ এবং বিশেষ করে চিকিৎসকদের বিদেশে উচ্চ প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়। ফলে তৎকালীন সরকার চিকিৎসকদের বিদেশে স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণের জন্য একটি ক্রাশ প্রোগ্রাম হাতে নেয়। তৎকালীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকপ্রাপ্ত প্রোগ্রামটি হলো বিভিন্ন ফেলোশিপ প্রোগ্রামের আওতায় আন্তর্জাতিক সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রশিক্ষণের সুযোগসুবিধা প্রদান করা।[১৫৩] ১৯৬৭-৬৮ সালে উল্লেখ করা হয়,

> The development of post graduate training centre will continue and Rs 10 lakhs will be spent for foreign training of doctors, Nurses and Lady Health Visitors.[১৫৪]

এভাবে দেখা যায় যে, প্রথম দিকে বিদেশে উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য তেমন বরাদ্দ না থাকলেও পরবর্তীতে বরাদ্দ করা হয়। এ সময় স্বাস্থ্যখাতে যথেষ্ট উন্নতি হয়, যা পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ডাক্তার মীর্জা মজিবুল হক উল্লেখ করেন। দেশ বিভাগের পর এই প্রদেশে মাত্র ১টি মেডিকেল কলেজ ছিল। পরবর্তীতে ক্রমশ এর সংখ্যা বেড়েছে। ডাক্তারের সংখ্যাও পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি ৮০০০ লোকের জন্য একজন ডাক্তার ছিল। সে সময় এই প্রদেশে ৫টি মেডিকেল কলেজ এবং আরো ২টি মেডিকেল কলেজ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর ফলে এই অঞ্চলের

মেডিকেল কলেজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮টি। এই সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও বেশি, কারণ সেখানে ৭টি মেডিকেল কলেজ ছিল। স্বাস্থ্যখাতে এই অগ্রগতির জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর কৃতিত্ব রয়েছে বলে মীর্জা মুজিবল হক উল্লেখ করেন।

বিদেশি চিকিৎসকদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ঢাকা মেডিকেল কলেজকে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল, ব্রিটিশ জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল স্বীকৃতি দেয়নি। স্বীকৃতির বিষয়টি ছাত্র চিকিৎসকদের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের বিধি অনুযায়ী মেডিকেল কলেজে কোনো ত্রুটি, ঘাটতি থাকলে মেডিকেল কলেজকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে কিছু ঘাটতি থাকলে স্বীকৃতি পেতে বিলম্ব হয়। সদ্য প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজের ঘাটতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শক কমিটির সদস্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকগণ এই মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করেন এবং কলেজের ছাত্র, শিক্ষকদের জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ লেকচার, অস্ত্রোপচার, ডেমনস্ট্রেশন করে দেখান। এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র, শিক্ষকদের চিকিৎসার মান ও কলেজের উন্নয়নে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর ফলে স্বীকৃতির বিষয়টিও তরান্বিত হয়। আহমদ রফিক উল্লেখ করেন যে,

> নানা অজুহাতে স্বীকৃতির বিষয়টিকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। এ অন্যায় অবিচারের জন্য মূলত সংশ্লিষ্ট পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ দায়ী হলেও আমাদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দায়ও কম ছিল না। স্বভাবতই ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকগণ ক্ষুব্ধ হবার মতো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। যা প্রকাশ পেয়েছে কলেজে ইউনিয়নের কার্যক্রমে এবং দ্বিতীয় কলেজ ইউনিয়ন কর্তৃক প্রকাশিত 'কলেজ ম্যাগাজিন'। এসব ম্যাগাজিনে ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সমস্যা থেকে কলেজ ভবনের কাজ, কলেজের বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং কলেজের স্বীকৃতির বিষয়টি প্রকাশ করা হতো।[১৫৫]

এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৫১-৫২ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান সম্পন্ন চিকিৎসকগণ কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তাদের আগমণের বিষয়টি ফলপ্রসু করার জন্য কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য লেকচার ও ডেমনস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসকদের মধ্যে কেউ কেউ গুরুতর অস্ত্রোপচার পরিচালনা করেন, যা পূর্ববাংলায় আগে কখনও হয়নি। ফলে তাদের পরিদর্শন ছিল কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় নিম্নের চিকিৎসকগণ কলেজ পরিদর্শন করেন,[১৫৬]

১. ডাক্তার ইউ.জি. ডেইলি, এম.ডি.,এস.সি.ডি, এফ. এ.সি.এস., এফ.আই.সি.এস. (শিকাগোর শল্য চিকিৎসক)।
২. অধ্যাপক গ্রিন আর্মিটেজ, রয়েল কলেজ অব গাইনোকোলজিস্ট।
৩. ডাক্তার পি.ডি. হোয়াইট, এম.ডি।
৪. ডাক্তার ইদ্রিস জোন এবং এইচ. আর. ইং (রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ এবং মার্কেন্টাইল ইন্ডাস্ট্রি)

১৯৫২ সালের ৬ এপ্রিল সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিরা পূর্ববাংলায় আসেন। এদের মধ্যে দুইজন মস্কোর অধ্যাপক ছিলেন অধ্যাপক কারাকেরলভ ও অধ্যাপক সুরকিসভ। এ ছাড়া উজবেকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার বাট্রভ আসেন। স্বণামধন্য দুইজন অধ্যাপক রুশ শরীরতত্ত্ববিদ পাঙলভের তত্ত্বের বহুদিক নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। রুশ চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপর তাঁর তত্ত্বের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অন্যদিকে উজবেকমন্ত্রী বাট্রভ বলেন, 'তাদের দেশে চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে নিরাময়ী চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অধিকাংশ প্রতিরোধযোগ্য রোগ সোভিয়েত ইউনিয়নে নেই বললেই চলে। ছাত্রদের দেখানোর জন্য একটি

সিফিলিস রোগী খুজে পাওয়া যেত না।'[১৫৭] ১৯৫২-৫৩ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান চিকিৎসক ভিয়েনার চক্ষু বিশেষজ্ঞ লিন্ডার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের জন্য লেকচার প্রদান করেন এবং গুরুতর রোগীদের অস্ত্রোপচার পরিচালনা করেন। তাঁর পরিদর্শন কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে খুবই মূল্যবান ছিল।[১৫৮] ১৯৫৩-৫৪ সালে আমেরিকার বিশিষ্ট বক্তা, লেখক এবং ইতিহাসবিদ ড. লিল্যান্ড ডি. বোল্ডউইন (Baldwin) কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করার পাশাপাশি 'Approach to the welfare state and American Approach to peace' এর ওপর লেকচার প্রদান করেন। এ ছাড়া অন্যান্য পরিদর্শনকারীদের মধ্যে ছিলেন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হরস হিলডারথ, আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. চ্যামবারলিন, পূর্ব এশিয়ার প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ব্যুরোর পরিচালক মি. উইলসন এবং স্পেনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মীরান মোহাম্মদ শাহ।[১৫৯] ১৯৫৪-৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর শাহাব-উদ্দিন, মিশরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত তোফাজ্জেল আলী কলেজ পরিদর্শন করেন। উল্লিখিত এই দুই ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করেন।[১৬০]

অপরদিকে ১৯৫৫-৫৬ সালে কমনওয়েলথ সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ইউ.কে. সরকারের সেক্রেটারি অব স্টেট এর স্বাস্থ্য উপদেষ্টা স্যার বেনেট হ্যান্স (কে.সি.এস.আই) কলেজ পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা, গোল্ডকোস্ট, গুয়াতামালা, ইটালির কিছু বিদেশি শিক্ষার্থী কলেজ পরিদর্শন করেন এবং কলেজের হোস্টেলে তাদের আপ্যায়ণ করা হয়।[১৬১]

১৯৫৬-৫৭ সালে কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ কলেজ পরিদর্শন করেন এবং এসব সম্মানীত পরিদর্শনকারীদের মধ্যে যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় তারা হলেন ডাক্তার আর. এস. এইটকেন, এম.ডি, ডি.ফিল, এল.এল.ডি, ডি.এসসি., এফ.আর.সি.পি. এবং ডাক্তার জি.এইচ. হল, এম.ডি, ডি.এসসি., পিইএইচ.ডি। তারা পুরো কলেজ ঘুরে দেখেন এবং কলেজের বিভিন্ন বিভাগের কাজ অতি উৎসাহের সাথে পরিদর্শন করেন। তাদের পরিদর্শনে কলেজ কর্তৃপক্ষ গৌরব বোধ করেন । এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও শিক্ষামন্ত্রী জনাব জহিরউদ্দিন কলেজ পরিদর্শনে এসে সন্তোষ প্রকাশ করেন। প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব ডি.এন.দত্ত কলেজের নিয়মিত পরিদর্শক ছিলেন। কলেজকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগসুবিধা প্রদানে সহযোগিতা করায় কলেজের ছাত্র এবং শিক্ষক তাঁর ভূয়শী প্রশংসা করেন, কেননা তাঁর সহযোগিতা কলেজের উন্নয়নে ব্যাপকভাবে সহায়ক হয়।[১৬২]

১৯৫৭-৫৮ সালে লাহোরের ফাতেমা জিন্নাহ মহিলা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার সুজাত আলী'র (এম. ডি., পিএইচ. ডি) সভাপতিত্বে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত পরিদর্শকগণ কলেজ পরিদর্শন করেন। অন্যান্য পরিদর্শক হলেন (১) কর্ণেল জালাল শাহ, (এফ.আর.সি.এস.) সেক্রেটারি, পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল। (২) মুলতানের নিস্তার মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক, ডাক্তার মুশতাক হোসেন (এম. ডি., এম.আর.সি.পি.) (৩) করাচির ডাউ মেডিকেল কলেজের সার্জারির অধ্যাপক লে. কর্ণেল সাঈদ আহমেদ খান (এফ.আর.সি.এস.) (৪) ডাউ মেডিকেল কলেজের মিডওয়াইফারির অধ্যাপক এম. এ.সিদ্দিকী (এম.বি.বি.এস., ডি.জি.ও., এম.আর.সি.ও.জি.)।[১৬৩]

১৯৫৮-৫৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য বিভাগের মহাপরিচালক কর্ণেল জি. হায়দার, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী লে. জেনারেল ডব্লিউ এ. বারকী, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্বদ্যিালয়ের গ্রাজুয়েট স্কুল এর ডিন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাক্তার জে. ডব্লিউ. এসটন ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।[১৬৪]

১৯৫৯-৬০ সালে উপরিউল্লিখিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী কলেজ পরিদর্শনের পাশাপাশি নতুন নির্মিত নার্সেস কোয়ার্টার উদ্বোধন করেন। এ সময় উল্লেখযোগ্য পরিদর্শকদের মধ্যে ছিলেন ডারহামের ফিজিওলজির অধ্যাপক ডাক্তার এ. এ. হার্পার, যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রদূত গুস্তাব ভ্লাহব (Gustab Vlahov), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ডাক্তার এম. জি. ক্যান্ডাউ (Candau), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফিজিওথেরাপি উপদেষ্টা মিস জি. এইচ. জনসন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন কলিন্স এবং কিনকেইড।[১৬৫] এসব সম্মানীত ব্যক্তির আগমনে মেডিকেল কলেজের আরো উন্নয়ন ঘটে। তাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, পরামর্শ মেডিকেল কলেজের মানকে বিশ্বমানের হতে সহায়তা করে। ১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ ও শ্রম মন্ত্রী ছাড়াও পাকিস্তানে বেলজিয়াম ও রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। ১৯৬০ সালের ১৫ এপ্রিল পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের মহাপরিচালক বিগ্রেডিয়ার মোঃ শরীফ এবং ১৯৬১ সালের ৭ মার্চ নিউইয়র্কের রকফেলার ফাউণ্ডেশনের সহযোগী পরিচালক ডাক্তার জন মেয়ার কলেজ পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল নাট বি. কিং কলেজ পরিদর্শনে এসে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যাণ্ডের 'দ্য ইউনিভার্সিটি অব মেডিসিন' থেকে গৃহীত নমুনা এবং স্লাইড কলেজের কাছে হস্তান্তর করেন। উপরি-উক্ত সম্মানীত ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ কলেজ শুধু পরিদর্শনই করেননি বরং কলেজের গ্যালারির ছাত্র ও শিক্ষকদের সামনে বক্তৃতা দেন। তারা হলেন হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্ল ই. টেইলর, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিমাটোলজি বিভাগের পরিচালক জে. এফ. উইলকিনসন (এফ. আর. সি.পি, পিএইচ.ডি.) ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট বিভাগের অধ্যাপক এফ. জি. ইয়ং, (এফ.আর.এস., ডি.এসসি., এফ.আর.আই.সি.), করাচির 'দ্য বেসিক মেডিকেল ইনস্টিটিউট' এর প্রধান ডাক্তার পল. এ. নিকল।[১৬৬]

১৯৬১-৬২ সালে লওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইউ.এস.এ.) ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক ডাক্তার উইলিয়াম ই. কনা, বেসিক মেডিকেল সায়েন্স ইনস্টিটিউট এর মেডিসিনের অধ্যাপক ডাক্তার এইচ. মাগুলিস, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক উপদেষ্টা পরিদর্শক ডাক্তার পল টেইলার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সামনে লেকচার প্রদান করেন এবং নিউজিল্যান্ডের ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডানডিন স্কুল অব মেডিসিনের নিউরোলজির অধ্যাপক ডাক্তার জে. ই. কৌগে এর নেতৃত্বে 'দ্য মরাল রেয়ারমামেন্ট টিম' কলেজ পরিদর্শন করে এবং নৈতিকতা পুনর্গঠনের পাশাপাশি চিকিৎসার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করেন। দলটির জাপানি সদস্যরা নিজেকে রক্ষার জাপানি কৌশল জুডো এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিল্ম প্রদর্শন করে। এ ছাড়া যখন পাকিস্তানের পশ্চিম প্রদেশের গভর্নর লে. জেনারেল মোঃ আযম খান শেষবারের মতো কলেজ পরিদর্শন করেন তখন তাঁকে কলেজের শিক্ষার্থীরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানায়।[১৬৭]

১৯৬২-৬৩ সালে যুক্তরাজ্য থেকে আসা সার্জন, অ্যানাসথিসিস্ট এবং অপারেশন থিয়েটার সুপারিনটেনডেন্ট দলের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হলেন অধ্যাপক ওয়েলস (এফ. আর. সি. এস.), এল উইলিয়ামস, (এফ. আর. সি. ও. জি.), ডাক্তার গেডেস এবং অন্যান্যরা। কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের সুবিধার জন্য দলের সদস্যরা তাদের নিজ নিজ বিষয়ে পাঠদান ও অভিজ্ঞতার জন্য অস্ত্রোপচার পরিচালনা, লেকচার এবং ডেমনস্ট্রেশন করেন। এ সময় বিশিষ্ট পরিদর্শকরা তাদের সামনে লেকচার প্রদান করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা হলেন (১) অধ্যাপক জে. বি. কিনমাউথ, (এফ.আর.সি.এস.) (২) কমনওয়েলথ ট্রাভেলিং অধ্যাপক স্যার আর্থার সিমস (৩) যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসার্জারি বিভাগের ডাক্তার আর. এফ. হিমবার্গা (৪) করাচির বেসিক মেডিকেল সায়েন্স

ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ডাক্তার মাগুলিস (৫) ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাসথিসিস্ট বিভাগের প্রধান ডাক্তার ওল সেকার (Ole Sechar) (৬) যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক ডাক্তার ই. ডব্লিউ. স্রীগলি (E.W. Shrigley)। এ ছাড়া এ বছর পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের সেক্রেটারি লে. কর্ণেল কে. এ. রশীদ কলেজ এবং সংযুক্ত হাসপাতাল পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।[১৬৮]

১৯৬৩-৬৪ সালে আমেরিকান কলেজ অব কার্ডিওলজির ফ্যাকাল্টি কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। অন্যান্য পরিদর্শকদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী পি. ডব্লিউ. ডেল রাসেল, আর রবার্ট, মেজর জি. এইচ. কে. নিয়াজী, জে. ডি. এস. ক্যামেরন এবং অধ্যাপক এ. সি. পি. ক্যাম্পবল প্রমুখ।[১৬৯] ১৯৬৪-৬৫ সালে চায়না থেকে আসা বিখ্যাত কার্ডিয়াক সার্জনরা কলেজ পরিদর্শন করেন। পাকিস্তানের 'দ্য রেফারেন্স কমিটি অব কলেজ' এর চিকিৎসক ও সার্জনরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করেন এবং কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকের সামনে বক্তৃতা দিতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হলেন প্রাক্তন সার্জন জেনারেল টি.ডি. আহমেদ, লন্ডনের কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক কমিটির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি ভেইসে, লে. জেনারেল ডব্লিউ. এ. বারকী, পাকিস্তানে যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনারের চিকিৎসা পরামর্শদাতা লে. জেনারেল আলেকজান্ডার ড্রামন্ড।[১৭০] ১৯৬৫-৬৬ সালে চীনের দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যার বিশেষজ্ঞদের একটি দল কলেজ এবং সংযুক্ত হাসপাতাল পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মেডিকেল নিউট্রিশনিস্ট ডাক্তার জি. আর. ওয়াডসওয়াই, পাকিস্তানের স্বাস্থ্য বিভাগের মহাপরিচালক প্রমুখ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে. এ. হক এর কলেজ এবং হাসপাতাল পরিদর্শন কেবল কলেজের জন্য কল্যাণকর হয়নি, বরং তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৫০০ রুপি দান করে কলেজ কর্তৃপক্ষকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেন। এই দান ছাড়াও পাঠ্য বইয়ের জন্য একটি গ্রন্থাগার এবং পাঠকক্ষের মূল অংশের বেশিরভাগ কাজ শিক্ষার্থীরা আরম্ভ করেন।[১৭১]

১৯৬৬-৬৭ সালে পাকিস্তান সফরে আসা সৌদি আরবের একদল শিক্ষাবিদ, জাপানের মেডিকেল মিশন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেডিকেল পরামর্শকদাতাদের সাথে কলেজ কর্তৃপক্ষ আলোচনা করে অত্যন্ত আনন্দিত হন। অন্যান্য বিশিষ্টবর্গের মধ্যে পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য, শ্রম এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী, লন্ডনের স্নায়ুরোগের জাতীয় হাসপাতাল, মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল ইউনিটের ডাক্তার মেরিয়ন স্মিথ, যুক্তরাজ্যের ডার্বির কনসালটেন্ট ডারমাটোলজিস্ট (চর্ম বিশেষজ্ঞ) ডাক্তার পি.ডি.সি. কিনমন্ট, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উপ-আঞ্চলিক পরিচালক ডাক্তার এম. শোয়েব, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, কায়রো, ব্রিগ এবং পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের মহাপরিচালক এম. এস. হক।[১৭২]

১৯৬৭-৬৮ সালে মিশরের বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কনসালটেন্ট ডাক্তার এ. জগলুল শিক্ষার্থীদের লেকচার প্রদান করেন। এ সময় কলেজের পাবলিক হেলথ এবং হাইজিন বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার এস. হাসানকে স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী মহাপরিচালক হিসেবে বদলি করা হয়। কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ডাক্তার এম. জি. কিবরিয়াকে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল করা হয়। এ বছর তেমন কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কলেজ পরিদর্শন না করলেও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইরান, চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া থেকে মেডিকেল বই, জার্নাল, সাময়িকপত্র কলেজকে উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়।[১৭৩]

১৯৬৮-৬৯ সালে কলেজে দুইজন গুরুত্বপূর্ণ ডাক্তার তথা আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত, অ্যারিজোনার নিউরোসার্জন ডাক্তার উইলিয়াম হেলমি এবং অন্যজন ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার জন হাওয়ার্ড মিডলওয়াইস কলেজ পরিদর্শন করেন। ডাক্তার উইলিয়াম ১৯৬৮ সালের ৩ ডিসেম্বর কলেজ পরিদর্শন করেন ও নিউরো সার্জারির ওপর লেকচার প্রদান করেন এবং অধ্যাপক মিডলওয়াইস ২২.১১.৬৮ তারিখে হাসপাতালের রেডিওগ্রাফারদের প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন।[১৭৪] এ সময় পাকিস্তান মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের দেওয়া তহবিলের মাধ্যমে কিছু বিভাগে চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণামূলক কাজ করা হয়। ১৯৬৯-৭০ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেডিকেল অফিসারদের একটি দল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষামন্ত্রী, সৌদি সরকার যথাক্রমে ২৪.২.৭০ এবং ২৩.৩.৭০ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

এসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমনের মধ্য দিয়ে কলেজের শিক্ষাদান থেকে শুরু করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটে। তাছাড়া তাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক মন্তব্য এই মেডিকেল কলেজের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ও সমৃদ্ধ হতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। বিশেষ করে বিখ্যাত ডাক্তারগণ এই কলেজ শুধু পরিদর্শনই করেননি বরং তাদের নিজ নিজ বিষয়ের ওপর দুর্লভ অস্ত্রোপচার পরিচালনা করেন, যা কলেজের ছাত্র এবং শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে। তাদের কাছ থেকে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করে পরবর্তীতে তারা চিকিৎসা ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। ফলে কলেজের চিকিৎসাশিক্ষা ও চিকিৎসার মান উন্নত হতে থাকে।

লাইব্রেরি ও গবেষণাগার

দেশ বিভাগের পর প্রথম সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে উপলব্ধী করা হয় যে, ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য একটি ভালো লাইব্রেরি এবং ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি ও প্যাথলজি গবেষণাগারের জন্য সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। তাই সার্জন জেনারেল কর্ণেল ই.জি. মন্টেগোমারি মেডিসিনের অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. আবদুল ওয়াহেদ এবং অধ্যাপক ডা. আনোয়ার আলী (প্যাথলজি) কে নিয়ে একটি 'ক্রয় কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির সদস্যরা ১৯৪৮ সালে লাইব্রেরির জন্য বই এবং গবেষণাগারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে কলকাতা যান। সার্জন জেনারেলের অনুমোদনসহ এবং মেডিসিনের অধ্যাপকের বাছাই ও নিরীক্ষণের মাধ্যমে মেডিসিনের সব শাখার খুব গুরুত্বপূর্ণ বই কেনা হয়। ১৯৫০ সালে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির সদস্যরা ঢাকা মেডিকেল কলেজের লাইব্রেরি সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে,

> The library is still in a very elementary state. Shelves and Almirahs are required for books and tables and chairs are necessary. Administrative approval has been received during the past week for the provision of Almirahs and other furniture. This work requires to be expedited. Regarding the supply of text books and periodicals orders were placed by me when I was in London with the High Commissioners office for the supply of books and periodicals to the value of Rs 6000/-. I have since enquired of the positions and received a reply stating that the books were being obtained. It is not known when they are likely to arrive. I have again referred the matter to London.[১৭৫]

ফলে লাইব্রেরি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়। ১৯৫০-৫১ সালে বিদেশ থেকে প্রচুর বই কেনা হয়। শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরিতে আলাদা ছোট কক্ষ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১৯৫১-৫২ সালে ৩০১৪ রুপি মূল্যের বই দিয়ে লাইব্রেরি সজ্জিত করা হয়। এ বছর বই রাখার জন্য বুক কেস কেনা হয়।

১৯৫২-৫৩ সালে কলেজের লাইব্রেরিটি ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। কলেজের সব বিভাগ ভালোভাবে সজ্জিত করা হয়।[১৭৬]

১৯৫৪-৫৫ সালে ১৯৪৬ সালের শূন্য থেকে শুরু হওয়া কলেজের লাইব্রেরিতে কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক বই ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সকল শাখার বইয়ের একটি স্টক নির্মাণ করা হয়। এ সময় আরো ৪৪৭টি বই অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে বইয়ের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। কিছু বই সোভিয়েত ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ এবং জাপান সরকারের কাছ থেকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। লাইব্রেরিতে পড়ার পরিবেশ পূর্বের চেয়ে ভালো ছিল।[১৭৭]

১৯৫৫-৫৬ সালে লাইব্রেরিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ১৯৮৫টি ছাড়াও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ের কিছু বই ছিল। এ সময় আরো ২১৬টি বই লাইব্রেরিতে আনা হয়। এ ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কিছু চিকিৎসা সংক্রান্ত বই প্রদান করে।[১৭৮] অপরদিকে ১৯৫৬-৫৭ সালে উপহার ও ক্রয়ের মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার এবং সমন্বিত বিষয়ের ৩১৮৫টি বই কলেজ লাইব্রেরিতে রয়েছে।[১৭৯] চিকিৎসা ও সার্জারির বিভিন্ন শাখার গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক পূর্বসংস্করণ ও সর্বশেষ সংস্করণের বই লাইব্রেরিতে পাওয়া যেত। এ ছাড়া ভারত, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত সবচেয়ে মূল্যবান মেডিকেল জার্নাল ও ম্যাগাজিন লাইব্রেরিতে পাওয়া যেত এবং বিদেশ থেকে এগুলো নিয়মিত সরবরাহ করা হতো। মূল্যবান তথ্যবহুল চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক বই উপহার দেওয়ার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ 'দ্য ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিস', ঢাকা, 'দ্য ব্রিটিশ কাউন্সিল', ঢাকা, 'দ্য ইউনাইটেড স্টেট ইনফরমেশন সার্ভিস', ঢাকা এবং 'দ্য কমনওয়েলথ বুক ফান্ড', নিউইয়র্ক এর কাছে ঋণী। এসব প্রতিষ্ঠানের উপহার দেওয়া বই কলেজের লাইব্রেরিকে আরো সমৃদ্ধ করে। এ সময় মেডিকেল কলেজের লাইব্রেরিয়ান মিস এম. এল. মেথেন যুক্তরাষ্ট্রের এডুকেশন ফাউন্ডেশনের সহায়তায় 'ফুলব্রাইট স্কলারশিপ' নিয়ে লাইব্রেরি সায়েন্স এর ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট সব শাখার বই ক্রয় এবং বিভিন্ন বিদেশি সংস্থার উদারতা ও বদান্যতার কারণে লাইব্রেরিতে উপহার দেওয়া বহু মূল্যবান ও তথ্যবহুল বই লাইব্রেরির ব্যাপক উন্নতি সাধনে সহায়তা করে। ১৯৫৭-৫৮ সালে লাইব্রেরিতে মোট বইয়ের সংখ্যা ছিল ৩৮৮৫টি।[১৮০] ১৯৫৮-৫৯ সালে ৪২১৭টি বই ছিল।[১৮১] এ সময় উপরিউল্লিখিত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও 'দ্য জার্মান কনসালেট, করাচি, ইটালিয়া কনসালেট', করাচি প্রচুর পরিমাণে সৌজন্যমূলক বই ও মেডিকেল জার্নাল লাইব্রেরিতে উপহার দেয়। বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল বিষয়ের ওপর 'দ্য আমেরিকান মিশন হাসপাতাল' কিছু সংখ্যক আমেরিকান মেডিকেল জার্নাল প্রদান করে। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক দপ্তরের উপদেষ্টা ডাক্তার এ. কে. এম. আব্দুল ওয়াহেদ এর দেওয়া বই ও অন্যান্য মূল্যবান মেডিকেল গ্রন্থের জন্য কলেজ ঋণী ছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে কলেজের লাইব্রেরিতে ৪৭০৬টি বই, ১১০টি জার্নাল, ২০০০ মেডিকেল সাময়িকপত্র ছিল। এ সময় এশিয়া ফাউন্ডেশন ৯৫টি বই এবং ইউ. এস. আই. এস ২১০টি বই প্রদান করে।[১৮২] ১৯৬০-৬১ সালে বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০০, জার্নাল ৩০০ এবং সাময়িকপত্র ৪০০০ হয়।[১৮৩] মূলত ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতার কারণে যুক্তরাজ্যে প্রকাশিত মেডিকেল সাময়িকপত্র এবং জার্নাল সরবরাহের ফরমাশ তাদের প্রকাশকদের কাছে পেশ করা হতো। ফলে বিদেশি মেডিকেল জার্নালের দুষ্প্রাপ্যতার প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব হয়। ব্রিটিশ কাউন্সিলের এই অবদানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করে।[১৮৪]

১৯৬১-৬২ সালে লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা ছিল ৫৭২২টি, ৫০০টি বাউন্ড জার্নাল এবং বিদেশি ৪২টি মেডিকেল জার্নালের সাবস্ক্রাইব ছিল। ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং ইউ. এস.আই.এস. এর সহায়তায় বিদেশ

থেকে প্রায় ২৫টি মেডিকেল জার্নাল বিনামূল্যে লাভ করে। এ সময় কানাডা সরকার প্রায় ৫০০০ ডলার মূল্যের কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত সর্বশেষ মেডিকেল বই ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরিতে বিনামূল্যে প্রদান করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সব শাখায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার এই উপহার কলম্বো পরিকল্পনার একটি উদ্যোগ ছিল।[১৮৫] ১৯৬২-৬৩ সালে লাইব্রেরিতে মেডিকেল বইয়ের সংখ্যা ছিল ৫৮৩০টি,[১৮৬] ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল ৫৯২৮টি বই,[১৮৭] ১৯৬৪-৬৫ সালে ৭০৬৩টি বই, ৭৪টি বিভিন্ন মেডিকেল জার্নাল এবং সাময়িকপত্রের জন্য নিয়মিত চাঁদা প্রদান করা হতো।[১৮৮] অপরদিকে ১৯৬৫-৬৬ সালে ৮০০০টি বই এবং ৫৭টি বিভিন্ন মেডিকেল জার্নাল ও সাময়িকপত্রের জন্য নিয়মিত চাঁদা প্রদান করা হতো।[১৮৯] সুইডেন থেকে মেডিসিন ও সার্জারির ওপর ৮৩টি গবেষণামূলক চিকিৎসা সংক্রান্ত বই উপহার দেওয়া হয়। এগুলো ঢাকা মেডিকেল কলেজের লাইবেরির জন্য সহায়ক এবং প্রয়োজন ছিল।[১৯০] ১৯৬৬-৬৭ সালে বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮,৫০০টি হয়।[১৯১] ১৯৬৮-৬৯ সালে ৯৩০২টি বই এবং ৫৭টি জার্নাল ছিল। এ সময় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরিকে ১৯টি মেডিকেল বই এবং ৩৫টি মেডিকেল জার্নাল দান করে।[১৯২] ১৯৬৯-৭০ সালেও বই ও জার্নালের সংখ্যা পূর্বের মতোই ছিল। এ সময় মেডিকেল কলেজে লাইব্রেরিটি একজন সহযোগী অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে একজন লাইব্রেরিয়ান, ২জন সহকারী লাইব্রেরিয়ান, লেটারার এবং অন্যান্য সহকারীদের দ্বারা পরিচালিত হতো।

এভাবে দেখা যায় যে, বিদেশ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া এসব মেডিকেল বই, জার্নাল এবং সাময়িকপত্রের দ্বারা লাইব্রেরি একটি পরিপূর্ণ রূপ নেয়, যা দেশে পাওয়া যেত না। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা এর জন্য ব্যাপক প্রশংসা করত। এসব বই, জার্নাল ছাত্র ও শিক্ষকদের সমানভাবে সুবিধা প্রদান করত। ফলে বিদেশি বই, জার্নাল যেমন লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি ছাত্র, শিক্ষকদের পাঠগ্রহণ ও পাঠদানে ব্যাপক সহায়তা করে। এটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাশিক্ষার মান ও চিকিৎসা সেবাকে আরো উন্নত করে।

গবেষণাগার

দেশ বিভাগের পর গবেষণাগারের জন্য শিলদাহের কেন্দ্রীয় গুদাম থেকে গবেষণার সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, কাচের পাত্র সংগ্রহ করা হয় এবং ক্রয় কমিটির সদস্যদের যাচাই বাছাইয়ের পরে এগুলো কেনা হয়। শিলদাহ থেকে এসব সরঞ্জাম পূর্ববাংলা সরকারের 'পাইক' নামে একটি লঞ্চে করে আনা হয়। ১৯৪৯ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ব্যবহারের জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি বিদেশ হতে কেনা হয়। প্রাদেশিক সরকার উক্ত যন্ত্রপাতির অর্ডার দেন। দেড় লক্ষ টাকার এক্সরে যন্ত্র ভাঙ্গা অবস্থায় দেখা যায়।[১৯৩] ১৯৫১ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের গবেষণাগারের সহকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে শর্ত ছিল স্বীকৃত মেডিকেল অথবা টেকনিক্যাল বৈজ্ঞানিক কোনো প্রতিষ্ঠানের নূন্যতম দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এ সময় একজন ল্যাবরেটরি সহকারীর বেতন স্কেল–৬০-৪-১০০/- রুপি এবং একজন টেকনিশিয়ানের বেতন স্কেল ৭৫-৫-১৫০/- রুপি ছিল।[১৯৪]

অবিভক্ত বাংলার সময়ে একজন টেকনিশিয়ানের নূন্যতম আই.এসসি পাশ হতে হতো এবং এমনকি কিছু প্রতিষ্ঠানে বি.এসসি. পাশ করা প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া হতো। পে-কমিশনের স্কেল অনুসারে ল্যাবরেটরি সহকারীর বেতন ৬০-১০০ রুপি নির্ধারণ করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সেরোলজি বিভাগের টেকনিশিয়ানের বেতন ৪০ রুপি ছিল, কিন্তু স্কেল অনুসারে ৬০-৪-১০০ রুপি হওয়া উচিত ছিল। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের একজন টেকনিশিয়ানের বেতন এত অল্প ছিল যে, তা দিয়ে

জীবন নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে তারা সার্জন জেনারেলের কাছে সরকারের অন্যান্য বিভাগের বেতন স্কেল অনুসারে বেতন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন।[১৯৫]

প্যাথলজি জাদুঘরের জন্য দুর্লভ ও মূল্যবান প্যাথলজিক্যাল নমুনা উপহার দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডের 'স্কুল অব মেডিসিন' বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. উডওয়ার্ড এর কাছে এই মেডিকেল কলেজ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মহাখালীর কলেরা রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর ড. স্টকার্ড এর মাধ্যমে নমুনার সাথে প্রচুর স্লাইড আনা হয়। এসব স্লাইড তৈরি এবং নমুনা সংগ্রহে ম্যারিল্যান্ডের প্যাথলজির অধ্যাপক ড. ফার্মিংগার সহায়তা করেন। পাকিস্তান এবং ভারত পাকিস্তান উপমহাদেশে প্রথমবারের মতো সার্জিক্যাল অস্ত্রোপচার তিন চারদিন ধরে ক্লোজ সার্কিট টি.ভি.'র মাধ্যমে সিনিয়র শিক্ষার্থী এবং ডাক্তারদের দেখানো হয়। মেডিসিন এবং সার্জারির শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই অনন্য অগ্রগতিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ এবং শো পরিচালনার জন্য ঢাকার ইউ.এস.আই.এস. বিশেষভাবে অবদান রাখে এবং এই প্রতিষ্ঠানের কাছে কলেজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এই অস্থায়ী ব্যবস্থাপনার সাফল্য হলো গবেষণাগারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণ ক্রয় করার ফলে কলেজের সাথে স্থায়ীভাবে বিদেশি সংস্থাগুলোর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৬৩-১৯৬৪ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী* তে উল্লেখ করা হয় যে,

> We are also grateful to M/S Carl Zeiss of West Germany for providing the facilities to Dr. K. A Khaleque, professors of Pathology, to go to Germany to study the technique of Electron Microscope, its use and maintenance.[১৯৬]

দেশভাগের পর প্রথমদিকে কলকাতা থেকে কলেজের বিভিন্ন গবেষণাগারের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপকরণ সংগ্রহ করা হলেও পরবর্তীতে ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়। এসব উপকরণ সংগ্রহে বিদেশি চিকিৎসক, গবেষক, বিশেষজ্ঞ ঢাকা মেডিকেল কলেজকে যেমন সহায়তা করেছে, তেমনি তাদের সাথে কলেজের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠেছে। ফলে এসব দেশের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসাশিক্ষার ব্যাপারে এই কলেজের ছাত্র, শিক্ষক ব্যাপক জ্ঞান লাভ করে। পরবর্তীতে তাঁরা তাদের চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে কার্যকর করার চেষ্টা করে। কালক্রমে তারা যোগ্য ও দক্ষ চিকিৎসক হয়ে ওঠেন।

হোস্টেল

দেশ বিভাগের সময় থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের একটি অন্যতম সমস্যা ছিল শিক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা। এই কারণে এই প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ছাত্রাবাসের জন্য ভর্তিচ্ছুক মেডিকেল শিক্ষার্থীদের কোনো লিখিত অঙ্গীকারনামা দেয়নি এবং ভর্তিচ্ছুক প্রত্যেক ছাত্র ভর্তির জন্য তাদের আবেদনপত্র দাখিল করার পূর্বেই এই ব্যাপারে অবহিত করে। ফলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের (১৯৪৬) ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে হলেও ১৯৪৭ সালে ভর্তিকৃত ছাত্রদের জন্য কোনো ব্যবস্থা তখনও করা হয়নি। দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্ররা ভর্তির পর নিজেদের মতো করে থাকার ব্যবস্থা করে নেয়। এটা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল। তাই ছাত্রদের আবাসন সংকটের সমাধান জরুরি হয়ে পড়ে এবং ছাত্রদের দাবির মুখে কলেজ ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ অতি দ্রুত ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ শুরু করে।

এরূপ অবস্থায় হাসপাতাল প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে বাঁশের ছাউনির অস্থায়ী ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হয়, যা 'মেডিকেল ব্যারাক' নামে পরিচিত ছিল। ব্যারাকগুলোর মেঝে পাকা, কয়েক ফুট উঁচু দেওয়ালের ওপর

বাঁশের বেড়া আর মাথার ওপর সেনা ব্যারাকের মতো বাঁশের ছাউনি ছিল। এটা দেখতে সেনাছাউনির মতো বলেই এই ছাত্রাবাস 'মেডিকেল ব্যারাক নামে' পরিচিত হয়ে ওঠে । আহমদ রফিক বলেন,

> প্রতিটি ছাউনির সামনে টানা বারান্দা খুঁটিগুলো অমসৃন, বাকল তুলে ফেলে খুঁটিগুলোর আদিমতা দূর করার চেষ্টা করা হয়নি। প্রতিটি ছাউনির নিচে বাঁশের মাচাও ঐ অসংস্কৃত চেহারার সব কিছু মিলে যেন একটা যুদ্ধ পরিস্থিতির ফসল এই ব্যারাক।[১৯৭]

সময় সংকটের কারণে এমন অস্থায়ী ছাত্রাবাস নির্মাণের ব্যবস্থা নিতে হয়। ১৯৪৮ সালে ১১টি ছাউনি নির্মাণ করা হয় এবং ১৯৪৯ সালের মধ্যে তা পূরণ হয়ে যায়। এই ১১টি ব্যারাকে কলকাতা থেকে আসা ছাত্ররা উঠেছিল, পরে ১৯৪৭ সালে ঢাকায় ভর্তিকৃত দ্বিতীয় ব্যাচের ছাত্রদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে ১৯৪৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল-কাম-সুপারিনটেনডেন্ট নতুন নির্মিত হোস্টেলের আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করেন। এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সহকারী সচিবকে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের জন্য নিম্নের আসবাবপত্রের তালিকা পাওয়া যায়,[১৯৮]

হোস্টেল		মূল্য
খাট	১৯ × ১৬৫ রুপি	৩,১৩৫/- রুপি
টেবিল	৩৫ × ১৬৫ রুপি	৬,৭৭৫/- রুপি
চেয়ার	১৫ × ১৬৫ রুপি	৩,৪৭৫/- রুপি

ডাইনিং হল		মূল্য
ডাইনিং টেবিল	৩০ × ২৬ রুপি	৭৫০/- রুপি
সাইনবোর্ড	৪০ × ৬ রুপি	২৪০/- রুপি
আলমারি	১০০ × ২ রুপি	২০০/- রুপি
বেঞ্চ	১২ × ৫৫ রুপি	৬৬০/- রুপি
নোটিশ বোর্ড	২০ × ১ রুপি	২০/- রুপি

কমন রুম		মূল্য
টেবিল স্কয়ার	২৫ × ২০ রুপি	৫০০/- রুপি
চেয়ার	১৫ × ৪০ রুপি	৬০০/- রুপি
টেবিল আয়তন ৬×৩	২০ × ২ রুপি	৪০/- রুপি
আলমারি	১০০ × ২ রুপি	২০০/- রুপি
নোটিশ বোর্ড	২০ × ১ রুপি	২০/- রুপি

হোস্টেলের এই আসবাবপত্রগুলো ঢাকার নওয়াবপুর রোডের 'দ্য অমরপুর কেবিনেট ফার্ম' থেকে কেনা হয়। এ ছাড়া হোস্টেলের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা প্রসঙ্গে নিম্নের তথ্য উল্লেখ করা হয়,[১৯৯]

১. একটি মিটার থেকে হোস্টেলের মাসিক চার্জ গণনা করা হতো। যার সাথে চিকিৎসকদের ব্যারাক, ওয়ার্ড মাস্টারদের ব্যারাক এবং কলেজের গ্যারেজের সংযোগ ছিল।

২. বারান্দা, ডাইনিং হল, রান্নাঘর ছাড়াও হোস্টেলে ১১০টি ইলেকট্রিক বাতির পয়েন্ট ছিল। হোস্টেলের জন্য আলাদা কোনো মিটার ছিল না। গ্যারেজে এবং ব্যারাকে বাতির পয়েন্টসহ মোট বৈদ্যুতিক বাতির পয়েন্টের পুরো বিদ্যুৎ বিল কলেজ কর্তৃক পরিশোধ করা হতো

৩. বিদ্যুৎ বিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না দিলে হোস্টেলের সংযোগ কেটে দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কলেজের আংশিক অনুদান থেকে মোট বিল প্রদান করা হয়।

হোস্টেলের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ নিয়ে কিছু সমস্যা থাকলেও এই ১১টি ব্যারাক সব ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা করতে পারেনি। ফলে ছাত্রদের আবাসন সমস্যা আরো প্রকট হয়ে উঠেছিল। এরপর নতুন আরো ৬টি ব্যারাক নির্মাণ করা হয়। প্রতিটিতে ৬টি করে কক্ষ এবং প্রতিটি কক্ষে তিনজনের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। নতুন ১২-১৭ নং ব্যারাকে ১৯৪৮ সালের ভর্তিকৃত ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় এবং ১৯৪৭ সালের সিট না পাওয়া ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ করা হয়।[২০০]

ইতিমধ্যে হোস্টেলের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যাপারে প্রিন্সিপাল টি. আহমেদ হোস্টেলের বৈদ্যুতিক চার্জের জন্য প্রতিমাসে ৪০০ রুপি অনুমোদন করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। এই পদক্ষেপ এমন সময় নেওয়া হয় যখন হোস্টেলের প্রকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল অর্ধেক। এ ছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে কেবলমাত্র ১১টি ব্যারাক ছিল, তবে পরবর্তীতে আরো ছয়টি ব্যারাক নির্মিত হলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বৈদ্যুতিক বাতির পয়েন্ট বৃদ্ধি পায় চারগুণ। অথচ বৈদ্যুতিক বিল পরিশোধের জন্য সরকার কর্তৃক মাত্র ১৬৫/- রুপি অনুমোদন করা হয়, যা পরিমাণে খুবই অল্প ছিল।

১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে হোস্টেলের বৈদ্যুতিক বিলের নিম্নের একটি তালিকায় দেখানো হয় যে, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার জন্য সরকারের কাছ থেকে গড়ে আনুমানিক ১০১৬ রুপি অনুমোদন করা প্রয়োজন।[২০১]

মাস	বছর	রুপি	আনা	পাই
জানুয়ারি	১৯৪৯	৮৫০	১	০
ফেব্রুয়ারি	১৯৪৯	৮৬৬	৯	০
মার্চ	১৯৪৯	১২৪৫	০	৬
এপ্রিল	১৯৪৯	৯১১	১৫	০
মে	১৯৪৯	১২০৯	৪	৬
মোট		**৫০৮২**	**১৪**	**০**

এ সময় নির্দিষ্ট বৈদ্যুতিক উপকরণের চেয়ে বেশি উপকরণ ব্যবহারের ফলে হোস্টেলের কিছু শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ১০০/- রুপি জরিমানা করা হয়। এটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে নেওয়া হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হোস্টেলের শিক্ষার্থীদের কাছে ১৬৫/- রুপির বেশি দাবি করা হয়, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখান করে। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, তারা ভবিষ্যতেও বিদ্যুতের জন্য বাড়তি খরচ বহন করতে অস্বীকার করবে। ১৯৪৯ সালের মে মাসের ১২০৯-৪-৬ রুপি বিদ্যুৎ বিল প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ১ রুপি করে আদায় করা হয়।[২০২]

তাই কলেজের প্রিন্সিপাল উপরি-উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে প্রতিমাসে ৮০০/- রুপি অনুমোদন করার জন্য অনুরোধ করে। হোস্টেলের ছাত্রদের কাছ থেকে ১ রুপি করে অর্থ আদায় করা হলেও বিদ্যুৎ শক্তির পুরো খরচ মেটানো সম্ভব হয়নি। কারণ হোস্টেলে কেবলমাত্র ২৮২ জন ছাত্র ছিল এবং বিদ্যু বিলের পরিমান ছিল ৬০০/- রুপির বেশি।[২০৩] ফলে এ সময় শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা থাকলেও তাদের ওপর বাড়তি খরচ চাপানোর একটি প্রবণতা ছিল এবং শিক্ষার্থীরা তা মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিল। এ ছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল পরিচালনার জন্য নিম্নের স্টাফদের জন্য যে বেতন নির্ধারণ করা হয়, তা নিম্নরূপ,[২০৪] এবং ভবিষ্যতে তাদের এই বেতন ও অন্যান্য অনুমোদিত ভাতা বৃদ্ধি পাবে বলে উল্লেখ করা হয়।

ক্রমিক	পদবী	পদের সংখ্যা	বেতন
১.	সুপারিনটেনডেন্ট	১	৭৫/- রুপি
২.	সহকারী	১	২৫/- রুপি
৩.	বেয়ারা	১	১৩/- রুপি
৪.	দারোয়ান	১	ঐ
৫.	সুইপার	১	১২/- রুপি
৬.	মালী	১	১৩/- রুপি
৭.	ফারাস (Farash)	২	১৩/- রুপি

এদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ নিয়ে সমস্যার পাশাপাশি গ্যাস সমস্যা ছিল, কারণ তখনও কলেজে গ্যাস সরবরাহ করা হয়নি। কলেজের হোস্টেলসহ, ল্যাবরেটরি, হাসপাতালের রান্নাঘর, নার্সেস কোয়ার্টার, গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজন ছিল। কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে কলকাতার মূল গ্যাস কোম্পানি গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে ছিল। ঢাকায় এই পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল না, কারণ এরূপ গ্যাস ফার্ম ঢাকায় ছিল না। ঢাকার সমস্ত প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি, মনিপুরের 'দ্য ল্যাবরেটরি অব এগ্রিকালচার') গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেই করা হয়। তাই এই প্রতিষ্ঠানের গ্যাস প্লান্ট চালুর জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা এই প্রতিষ্ঠানকেই করতে হয়।

এরূপ পরিস্থিতিতে গ্যাস প্লান্ট চালানোর জন্য সরকারকে প্রতিমাসে ৬০০ মন কয়লা, ২০০ টিন কেরোসিন তেল এবং হাসপাতালের রান্নাঘর, নার্সেস কোয়ার্টার এবং শিক্ষার্থীদের হোস্টেলের জন্য ২৩০ মণ কয়লা (প্রতিমাসে) সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হয়। গ্যাস প্লান্টে কয়লা সরবরাহ না করার কারণে কলেজের হাসপাতালে বিভিন্ন রান্নাঘরের অসুবিধা ছাড়াও ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্ডের কাজ বাধাগ্রস্থ হয়।[২০৫] ফলে জেলা নিয়ন্ত্রক ৫০ মণ কয়লার অনুমতি প্রদান করলেও উল্লিখিত প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে অপর্যাপ্ত ছিল। তাই প্রতি মাসে ১ ওয়াগন কয়লা সরবরাহের অনুমতি প্রদানের জন্য সিভিল সাপ্লাই কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সরকারকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি নিম্নের ডিলারদের কাছ থেকে ৬০০ মণ বাষ্পচালিত কয়লা বরাদ্দ করা হয়।[২০৬]

১. এম/এস রশীদ ৩৪০ মণ
আর. কে মিশন রোড
রুপি ২-৪-১০ প্রতি মণ
২. এম/এস আর. বি. বোস ২৬০ মণ
বসন্ত কর দাস রোড, ঢাকা
২-১-০ প্রতি মণ

একদিকে হোস্টেলের গ্যাস সরবরাহ, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ নিয়ে সমস্যা অন্যদিকে ১৭টি ছাউনি থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পূরণ হয়নি। কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্রদের সবাই ছাত্রাবাসে আসতে পারেনি। প্রতিবছরই ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে, সে অনুপাতে কক্ষের সংখ্যা বাড়েনি। ফলে ১৯৪৯ সালে ভর্তিকৃত ছাত্রদের কারোর জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা যায়নি। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের প্রথম ব্যাচকে তাদের নিজস্ব ছাত্রাবাসে চলে যেতে ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করে। কাজেই ছাত্রাবাস সম্প্রসারণের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ বাড়তে থাকে। এই ব্যাপারে ১৯৫০-৫১ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক বিবরণী* তে উল্লেখ করা হয়,

Owing to lack of accommodation only 375 students could be provided lodging in the hostel attached to the College. The students admitted in the 1st year class, this year could not be accommodated. Additional barracks will be constructed for the purpose. Some of the staff have been accommodated in the requisitioned houses and some in the quarters at Azimpura colony.[২০৭]

এই অবস্থায় ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে তিনটি ব্যারাক তথা ১৮, ১৯, ২০ নং ব্যারাক নির্মাণ করা হয়। প্রতিটিতে ১১টি করে কক্ষ, প্রতিকক্ষে আগের মতোই তিনজন করে থাকার ব্যবস্থা ছিল। স্থাপত্যশৈলী আগের মতোই, পার্থক্য শুধু চাল বাঁশের নয়, টিনের। ফলে ১৯৪৭ সালের শেষ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রথমে ১১টি পরে আরও ৬টি ও ৩টি মোট ২০টি ব্যারাক মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের আবাসন সমস্যা নিরসণের জন্য নির্মিত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র মীর্জা মাজহারুল ইসলাম ব্যারাক সম্পর্কে বলেন,

আমি প্রথমে থাকতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ওয়েস্ট হাউজের সাউথ ব্লকের গ্রাউন্ড ফ্লোরের ১৬৭ নম্বর কক্ষে, সেখানে আমি প্রায় চার বছর ছিলাম। ১৯৫০ সালে আমি ব্যারাকে আসি, থাকতাম ১৯ নং ব্যারাকের ৫ নং রুমে।[২০৮]

অপরদিকে ডা. সাঈদ হায়দার বলেন, 'ছাত্ররা যে পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য ছাত্রাবাস থেকে ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকেই নতুন তৈরি ছাউনি ছাত্রাবাসে (মেডিকেল ব্যারাক) এসে ঠাঁই নিতে পেরেছিল তা অধ্যক্ষ মন্টেগোমারির কর্মতৎপরতার জন্যই সম্ভব হয়। সেই সঙ্গে ছিল তৎকালীন প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহারের আনুকূল্য।'[২০৯]

ব্যারাকগুলো বাঁশের তৈরি হলেও এই নিয়ে ছাত্রদের কোনো অভিযোগ ছিল না বরং থাকার ব্যবস্থা হয়েছে এটা নিয়েই খুশি ছিল। ব্যারাকগুলো ছিল অনেকটা জায়গা জুড়ে মুক্ত পরিবেশে। এর ফলে এটা যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে তাৎপর্য বহন করেছিল, তেমনি সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও ব্যারাক ছিল অন্য ছাত্রাবাস থেকে স্বতন্ত্র ও অনন্য। মেডিকেল কলেজের ব্যারাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মুক্তাঙ্গনের ছাপ। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর মতো শাসনব্যবস্থা ও নিয়মতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা ছিল না। ব্যারাকগুলোতে স্বনির্ভর মেস ব্যবস্থা ছিল। স্বভাবতই ব্যারাকের মেসে খাওয়া দাওয়ার মান ছিল উন্নত। এখানকার ভোজ, মহাভোজ এর তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকেও মুগ্ধ করে। মহাভোজের তালিকায় সাধারণত থাকতো পোলাও, মুরগির রোস্ট, রুই মাছের কালিয়া, দই ও কাঁচাগোল্লা এবং মৌসুমি ফল। ব্যারাকের খাবার সম্পর্কে ডা. এস.ডি. আহমেদ বলেন, 'মেসে খাওয়ার মান ছিল ভালো। দুবেলা খেতে প্রতি মাসে পয়তাল্লিশ টাকা দিতে হতো। সকালের প্রাতরাশ আর অপরাহ্নে চায়ের জন্য ছিল ক্যান্টিন'।[২১০]

মেডিকেল কলেজের প্রথমদিকে ছাত্রদের জন্য ব্যারাক নামে পরিচিত ছাত্রাবাস তৈরি হলেও ছাত্রীদের জন্য কোনো হোস্টেল ছিল না। ছাত্রী সংখ্যা কম থাকাই ছিল এর কারণ। কলেজ প্রাঙ্গনের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত নার্সেস কোয়ার্টারে ছাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এগুলো টিনশেড ছিল। ১৯৫০ সালে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটি ছাত্র হোস্টেলের ব্যাপারে ৮৫০ জন ছাত্র এবং ৫০ জন ছাত্রীর জন্য স্থায়ী হোস্টেলের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করে। তাই ছাত্রী হোস্টেল এবং ছাত্র হোস্টেলের প্রকল্পের জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয় যথাক্রমে ১,৪০,০০০ রুপি এবং ৪০০,০০০ রুপি।[২১১] এই ব্যাপারে ১৯৫১-৫২ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে উল্লেখ করা হয় যে, প্রায়

১০,০০,০০০ লক্ষ রুপি মূল্যের ৫০০ শিক্ষার্থী থাকার জন্য একটি স্থায়ী ছাত্র হোস্টেল নির্মানাধীন অবস্থায় ছিল। প্রকৃতপক্ষে হোস্টেল নির্মানের এই জায়গাটি সুন্দর।[২১২] ১৯৫২ সালের শেষের দিকে দেখা যায় যে, দেশ বিভাগের পাঁচ বছর পর ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৬৪০ জন ছাত্রদের মধ্যে ৩৬৭ জন ছাত্রকে হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। বাকিরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নেয়। তারা কোনো মেস অথবা কোনো বাড়িতে লজিং থাকে। বাকিদের ব্যবস্থা করার জন্য একটি বড় ধরনের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে একটি আধুনিক ও স্থায়ী হোস্টেল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। উপরি-উক্ত হোস্টেলটিতে একজন সুপারিনটেনডেন্ট দ্বারা পরিচালিত হতো। যিনি কলেজের একজন অধ্যাপক এবং অনাবাসিক ছিলেন। তাঁকে সহায়তা করার জন্য একজন আবাসিক সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ছিল।

অপরদিকে ১৯৫৫-৫৬ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক বিবরণী* তে উল্লেখ করা হয় যে, এ সময় ৬৫৫ জন ছাত্র এবং ২৪ জন ছাত্রী ছিল। মোট ৭৬% শিক্ষার্থী কলেজ হোস্টেলে থাকত। এ সময় ৩টি হোস্টেল তথা একটি ছাত্রী ও দুইটি ছাত্রদের জন্য ছিল। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে নতুন নির্মিত ছাত্র হোস্টেলে ছাত্ররা থাকতে শুরু করে। এই হোস্টেলে ৩১৫ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আরো ১৪০ জন ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য উল্লিখিত হোস্টেলে আরো দুইটি ব্লক নির্মাণের একটি প্রস্তাব করা হয়।[২১৩] ১৯৫৬-৫৭ কলেজের আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ,[২১৪]

ছাত্রদের জন্য নতুন হোস্টেল	পুরাতন হোস্টেল (ছাত্র)	ছাত্রী হোস্টেল	মোট
৪৩৫	৩০১	২৫	৭৬১

বকশি বাজারে অবস্থিত ছাত্রদের জন্য নতুন হোস্টেলের অতিরিক্ত ব্লক নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে অতিরিক্ত ১৪০ জন শিক্ষার্থীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এখানে অমুসলিম ছাত্ররা বেগম বাজারের ভাড়া করা একটি বাড়িতে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের হিন্দু ছাত্রদের সাথে থাকত। ফলে ছাত্রদের হোস্টেলে থাকার সব ব্যবস্থাই সম্পন্ন হয়। এভাবে প্রথমবারের মতো কলেজের সব আবাসিক ছাত্ররা প্রিন্সিপালের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে সরকারি হোস্টেলে থাকা শুরু করে। হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্টকে যারা এই কাজে সহযোগিতা করত তারা হলো ছাত্র হোস্টেলের ক্ষেত্রে ২ জন সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট এবং ছাত্রী হোস্টেলের ক্ষেত্রে নারী সুপারিনটেনডেন্ট। কলেজের মোট শিক্ষার্থীর ৮৫.৭% হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তাই বলা হয়,

> It is a matter of pride that the largest number of residential University students live in the hostels of the Dacca Medical College, but it is sad to note that the hostels of the Dacca Medical College have neither the status of a University Hall, nor enjoy the privileges of one.[২১৫]

১৯৫৮-৫৯ সালে হোস্টেলে আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ,[২১৬]

ছাত্রদের জন্য নতুন হোস্টেল	ছাত্রদের জন্য পুরাতন হোস্টেল	ছাত্রী হোস্টেল	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা
৪৩৫	৩০১	৪৩	৭৭৯

এভাবে আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ঢাকা এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো হলের চেয়ে দ্বিগুন ছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্য যে কোনো পেশাদার, কলা অথবা বিজ্ঞান কলেজের চেয়েও অধিক ছিল।

১৯৫৯-৬০ সালে হোস্টেলের আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ,[২১৭]

ছাত্রদের জন্য মেডিকেল হোস্টেল	নতুন নির্মিত হোস্টেল (ছাত্র)	ছাত্রী হোস্টেল	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা
৩৬৪	২৬৪	৫৬	৬৮৪

এ সময় ছাত্রদের জন্য নতুন নির্মিত হোস্টেল সম্পন্ন হওয়ার পর পুরাতন ব্যারাক টাইপের ছাউনিগুলো ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীদের নতুন নির্মিত ৩ (তিন) তলা ব্লকে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এটি খাদ্য বিভাগের মোটর গ্যারেজের প্লটের ওপর অবস্থিত ছিল। এই ব্লকগুলো বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়। প্রতিটি কক্ষের উত্তর-দক্ষিণ উভয় দিকে বারান্দা ছিল এবং কক্ষের সাথে সংযুক্ত বাথরুম ও টয়লেট ছিল। উল্লিখিত বারান্দায় বসে আটজন শিক্ষার্থীর প্রত্যেকে গ্রীষ্মকালের দক্ষিণের শীতল হাওয়া এবং শীতকালের রোদ উপভোগ করতে পারত। এই ছাত্রাবাসের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো ডাইনিং হলটির কোনো নির্মাণ পরিবর্তন ছাড়াই একটি মঞ্চসহ একটি মিলনায়তনে রূপান্তর করা যায়, যা বক্তৃতা, সভা, অন্যান্য বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

১৯৬০-৬১ সালে হোস্টেলে আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ,[২১৮]

ছাত্রদের জন্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেল	ছাত্রীদের জন্য মেডিকেল কলেজ হোস্টেল	মোট	শিক্ষার্থীর হার
৬৩৩	৬০	৬৯৩	৮৩%

ছাত্রদের হোস্টেলে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি একটি নামাজ ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। প্রিন্সিপাল এবং ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের ডিন এর দ্বারা পরিচালিত শিক্ষার্থীদের নতুন নির্মিত হোস্টেলের সাথে অবস্থিত পুকুরটি পরিষ্কার ও খনন করা হয়। পুকুরটি ছাত্রদের সাঁতার ও গোসলের জন্য উপযুক্ত ছিল। এটা সর্ম্পূনরূপে স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়।

১৯৬১-৬২ সালে হোস্টেলে আবাসিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা,[২১৯]

আবাসিক ছাত্রদের সংখ্যা	আবাসিক ছাত্রীদের সংখ্যা	মোট	কলেজে আবাসিক শিক্ষার্থীর শতকরা হার
৫৩৬	৬০	৫৯৬	৮৬%

এ সময় ছাত্রদের হোস্টেলে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধার পাশাপাশি একটি ক্যান্টিন, একটি লন্ড্রি এবং একটি চুল কাটার সেলুন খোলা হয়। তাদের শারীরিক সুস্থতা এবং শরীর চর্চার অনুশীলনে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জাম হোস্টেলের একটি ঘরে রাখা হয় এবং এটি একটি অস্থায়ী ব্যায়ামাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালের মেডিকেল কলেজের আবাসিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ,[২২০]

বছর	হোস্টেলে ছাত্রের সংখ্যা	হোস্টেলে ছাত্রীর সংখ্যা	মোট	আবাসিক মোট শিক্ষার্থীর শতকরা হার %
১৯৬২-৬৩	৬৪২	৮০	৭২২	৯৫.৩%
১৯৬৩-৬৪	৬৪২	৮০	৭২২	৯১.৩%
১৯৬৪-৬৫	৫৪৭	১০৫	৬৬২	৯৮.৫%

অপরদিকে ১৯৬৯-৭০ সালে দুইটি ছাত্র হোস্টেলের ছাত্রের সংখ্যা ৫৫৩ জন ছাত্র এবং একটি ছাত্রী হোস্টেলের ছাত্রীর সংখ্যা ১২০ জন।[২২১] হোস্টেলে থাকার খরচ ছিল প্রতি মাসে ১২০/- রুপি।

এভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজে যারা প্রথম দিকে ভর্তি হয়, তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে না পারলেও পরবর্তীতে সকল ছাত্রের জন্য থাকার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়। উপরিউল্লিখিত তালিকা ও বিবরণ থেকে তা বোঝা যায়। কলেজের প্রায় ৯৫% শিক্ষার্থীর ছাত্রাবাসে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। চিকিৎসাশিক্ষা অধ্যয়ন করার জন্য সকল শিক্ষার্থীর হোস্টেলে থাকা জরুরি। বিশেষ করে ক্লিনিক্যাল শিক্ষা নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাতদিন ২৪ ঘন্টা দায়িত্ব পালন করতে হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ১৯৬০ এর দশক থেকে কলেজের সব ছাত্রছাত্রীর হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পেরেছে। ১৯৪৮-১৯৫০ সাল পর্যন্ত ছাত্রদের আবাসন সমস্যা তাৎক্ষনিকভাবে নিরসনের জন্য ২০টি বাঁশের তৈরি ব্যারাক নির্মাণ করা হয়। এই ঘরগুলো ছাত্রদের থাকার জন্য উপযুক্ত ছিল। এই ব্যারাকে ছাত্রদের পড়াশোনার পাশাপাশি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হতো। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, সমসাময়িক রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই মেডিকেল ব্যারাক। ব্যারাকের মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল না, যা এই অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে ব্যারাক ভেঙ্গে পাকা ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণ করা হলেও ব্যারাকের মতো খ্যাতি তা পায়নি। ফলে ১৯৫০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ছাত্ররা ক্রমে ব্যারাক ছেড়ে নতুন হোস্টেলে ভিড় জমাতে থাকে, তবে ব্যারাক তখনও ছাত্রশূন্য হয়নি। এমন কি ১৯৫৮ সালে ব্যারাকের একাংশে সরকারি পর্যায়ে যখন জাতীয় শহীদ মিনার তৈরি হতে থাকে তখনও ব্যারাকের অস্তিত্ব পুরোপুরি লোপ পায়নি। আজও ব্যারাকের সেই অসাম্প্রদায়িক ও কলহমুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশের কথা সে সময়ের ছাত্ররা ভুলতে পারেনি।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের স্বীকৃতি

দেশ বিভাগের আগে চিকিৎসাশিক্ষা একটি কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হতো, যা 'ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল' নামে পরিচিত ছিল। দেশ ভাগের পর একই কমিটি বিদ্যমান ছিল, যা পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল' নামে পরিচিত। এই কমিটির প্রধান কাজ ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানে মেডিকেল শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং এই শিক্ষা প্রদানের জন্য মেডিকেল কলেজে পর্যাপ্ত সাজসরঞ্জামে সজ্জিত কিনা, যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা। এ ছাড়া মেডিকেল কলেজের পরীক্ষার মান অন্য যে কোনো উন্নত দেশের সমতুল্য কিনা এবং বিদেশের সাথে চিকিৎসাশিক্ষা, পরীক্ষা ও মানের ক্ষেত্রে পারস্পারিক সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের স্বীকৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানের যে কোনো মেডিকেল কলেজ চালু হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রতিষ্ঠিত নতুন কলেজ, কারণ পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো মেডিকেল অনুষদ ছিল না। এই মেডিকেল কলেজটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হিসেবে রাখার চেষ্টা করা হয়, যা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৪৯ সালের ৫ ডিসেম্বর পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটি পাকিস্তানের বিভিন্ন চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসাশিক্ষার পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা পরিদর্শন করার জন্য পরিদর্শক নিয়োগের সুপারিশ করে। পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পর এটি ছিল প্রথম পরিদর্শন, কেননা এ সময় সুনির্দিষ্ট কিছু নতুন মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করা হয়। তাই যাদের পরিদর্শনের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, এমন ব্যক্তিদের পরিদর্শনের কাজে নিয়োগ করা হয়। কাউন্সিল

পরিদর্শক নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বিধির ব্যবস্থা করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কাউন্সিলকে আমন্ত্রণ জানায়। এই ব্যাপারে কাউন্সিলের সভাপতি লে. কর্ণেল এম. জাফরি উল্লেখ করেন যে, 'পরিদর্শকদের প্রত্যেককে করাচি এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে নেওয়া হবে। তবে করাচি থেকে আগত পরিদর্শকের 'দাউ মেডিকেল কলেজ' পরিদর্শন এবং ঢাকা থেকে আগত পরিদর্শকের ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করা উচিত নয়'।[২২২] অতএব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরিদর্শন প্যানেল গঠন করা হলে, তা সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন লাভ করে।[২২৩] পরিদর্শন প্যানেলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মেডিকেল কলেজ অনুযায়ী কলেজ পরিদর্শনের জন্য নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়।[২২৪]

১। দাউ মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনের জন্য

ক. ডাক্তার সিদ্দিকী,

খ. কর্ণেল এস. এ. কে. মল্লিক,

গ. ডাক্তার এ. কে. এম. আব্দুল ওয়াহেদ।

২। ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনের জন্য

ক. ডাক্তার সিদ্দিকী, কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ, লাহোর, সভাপতি

খ. ডাক্তার পীরজাদা, কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ, লাহোর

গ. ডাক্তার এম. এল. মিস্ত্রী, দাউ মেডিকেল কলেজ, করাচি

পরিদর্শক কমিটি ১৯৫০ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করে শিক্ষক এবং ডেমনস্ট্রেটর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তা হলো কলেজের শিক্ষকদের সংখ্যা অপর্যাপ্ত এবং হাসপাতালে আরো ড্রেমনস্ট্রেটর প্রয়োজন। এ ছাড়া প্যাথলজি, এনাটমি, ফিজিওলজি ও অফথালমোলজি অধ্যাপকগণের পর্যাপ্ত শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাদের বিদেশে উঁচু ও নতুন নতুন প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে। এ ছাড়া ফার্মাকোলজির অধ্যাপকগণকে বাইরের কাজ কমিয়ে আনার সুপারিশ করে।

অন্যদিকে প্রি-ক্লিনিক্যাল বিভাগ ফিজিওলজি ও ফার্মাকোলজি বিভাগকে স্বীকৃতি দিলেও এনাটমি বিভাগকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। বিভাগটিতে সাজসরঞ্জাম ও মৃতদেহের অভাব ছিল এবং ডাইসেকশন হল ছিল না। ক্লিনিক্যাল বিভাগের মধ্যে মেডিসিন, সার্জারি, চক্ষু, নাক, কান, গলা, মিডওয়াইফারি এবং গাইনোকোলজি বিভাগকে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়। তারা প্যাথলজি, হাইজিন, মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স এবং রেডিওলজি বিভাগকে স্বীকৃতি দেয়নি। বিভাগগুলো মান সম্মত ছিল না।

এ সময় পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রির স্বীকৃতি নিশ্চিত করার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জানানোর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়। পরিদর্শন রিপোর্টে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নতি সাধনের জন্য কাউন্সিল যেসব বিষয় প্রস্তাব করে তা দ্রুত সম্পাদন করা এবং ১৯৫১-৫২ সালের মধ্যে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক ঢাকা মেডিকেল কলেজের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি'র স্বীকৃতি নিশ্চিত করার জন্য সরকার কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়। তবে এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য তখন অপেক্ষা করা হয়। ১৯৫০ সালে ৬ মার্চ পূর্ববাংলার লেজিসলেটিভ এসেম্বলির সদস্য ডাক্তার ভোলানাথ বিশ্বাস বলেন,

‘শুনলাম আমাদের ছেলেরা নভেম্বরের মাঝামাঝিতে পরীক্ষা দিবে। কিন্তু বিদেশ থেকে আমাদের এখানকার ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না, সেদিকে মন্ত্রী মহাশয়ের নজর দেওয়া দরকার। তারা বলে আমাদের এখানকার শিক্ষা আধুনিক নয়’।[২২৫]

ঢাকা মেডিকেল কলেজের চক্ষু ওয়ার্ডটি তেমন উন্নত ছিল না। তিনি (ভোলা নাথ) কলেজের বহির্রোগী বিভাগে চোখের উন্নত ধরনের পরীক্ষা করার এবং দক্ষ, অভিজ্ঞ ভালো ডাক্তারের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেন। সবাই ওয়ার্ডে ভর্তি হতে পারে না, তাই তারা বাইরে থেকে যেন ভালো চিকিৎসা পায় তার ব্যবস্থা করা। বহির্রোগীদের জন্য রক্ত, মুত্র ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। অন্ত রোগীদের সবাইকে একই রকম খাবার প্রদান করা হলে প্রত্যেক রোগীর চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের খাবারের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করেন। তিনি কলেজ ও হাসপাতাল সম্পর্কে আরো অভিযোগ করে উল্লেখ করেন যে, কলেজে অক্সিজেন প্লান্ট, হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র, হৃদ স্পন্দন রেকর্ড করার যন্ত্রসহ প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসের অভাব। এ ছাড়া ফটো ইলেকট্রন, প্রত্যেক ওয়ার্ড এ শীতাতপ যন্ত্র, রঞ্জন রশ্মির চিকিৎসা নেওয়ার জন্য সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি ছিল না। উপরন্তু মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা মৃতদেহ ডাইসেকশন করতে পারত না। সৎকার সমিতি ও আঞ্জুমানের মাধ্যমে যথেষ্ট সংখ্যক মৃতদেহ পাওয়া যেত না। তাছাড়া যতগুলো ওয়ার্ড থাকা দরকার, ততগুলো ওয়ার্ড না থাকায় শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হতো না। এরকম ত্রুটি বিচ্যুতি থাকায় পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল ঢাকা মেডিকেল কলেজকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করে। কাউন্সিলের বিধি অনুযায়ী কলেজে কোনো ত্রুটি থাকা যাবে না।

আইনের ১১ ধারা এর উপধারা (২) এর অধীনে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রির স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কাউন্সিল কর্তৃক ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করার জন্য পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৫০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর একটি রেজুলেশন গৃহীত হয়।[২২৬] কাউন্সিলে এ সময় আরো একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে বলা হয় যে,

That the council, however, will re-consider this case after carrying out another inspection of the College on receipt of information from the University of Dacca to the effect that the defects pointed out by the visitors in their report have been removed and the recommendations given effect to.[২২৭]

উপরি-উল্লিখিত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কাউন্সিলের রেজুলেশনের অনুলিপি এবং পরিদর্শকদের রিপোর্টের অনুলিপি প্রেরণ করা হয়।

১৯৫১ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের উন্নয়নের জন্য ১৮ লক্ষ রুপি বরাদ্দ করা হয়। এই বরাদ্দ মেডিকেল কলেজের চাহিদা অনুযায়ী কম। প্রতি বছর কম বা বেশি বরাদ্দ করা হলেও কলেজটিকে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল তখন পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়নি। একই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দুঃখ প্রকাশ করে পূর্ববাংলার লেজিসলেটিভ সভার সদস্য মীর্জা আব্দুল হাফিজ বিষয়টি লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতে উত্থাপন করেন।[২২৮]

স্বীকৃতির বিষয়টি মেডিকেল কলেজের জন্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এর ওপর শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করত। এই কলেজের ডিগ্রি স্বীকৃত না হলে তারা চাকুরি ও উন্নত প্রশিক্ষণ নিতে পারবে না। অথবা ব্যক্তিগতভাবে প্রাকটিস করার অনুমতি পাবে না। উপরন্তু উন্নত দেশের চিকিৎসাশিক্ষার মানের সাথে তুলনীয় হবে না। ফলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই

পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রির স্বীকৃতির ব্যাপারে ১৯৫১ সালের ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল অধিবেশনে তাৎপর্যপূর্ণ একটি রেজুলেশন গৃহীত হয়।[২২৯]

১৯৫২-৫৩ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য ১৯ লক্ষ ৩৬ হাজার রুপি ব্যয় করা হয় এবং প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য আরো ৩০,৬৪০০০ রুপি ব্যয় করার প্রয়োজন।[২৩০] মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনের কাজ শেষ হলে কলেজের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং কলেজটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হয়। অবশেষে ১৯৫৩ সালের ১১ই এপ্রিল পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দেয়। দুই বছর ধরে ঢাকা মেডিকেল কলেজকে পরিদর্শন করার পর তারা এই সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে পূর্ববাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী অত্যন্ত আনন্দিত হয়। ১৯৫৩ সালে ১৯ মার্চ পূর্ববাংলার লেজিসলেটিভ সভার সদস্য সুরেশ চন্দ্র দাস গুপ্ত আনন্দের সাথে সভায় জানান যে,

> মাননীয় প্রমুখ মহোদয়, মেডিকেল কলেজ অথবা চিকিৎসা বিভাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার পূর্বে একটা আনন্দের কথা আপনার কাছে নিবেদন করব। সেটা হল এবার আমাদের মেডিকেল কলেজ Pakistan Medical Council কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। এ গৌরবের কথা। আমরা আনন্দিত হয়েছি। মন্ত্রী মহাশয়ের অথবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের যদি এ সম্বন্ধে কৃতিত্ব থাকে আমি তাঁদের আমাদের সকলের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এ আনন্দ পূর্ব পাকিস্তানের সকলে অনুভব করছে।[২৩১]

পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের স্বীকৃতির পর ১৯৫৮ সালে যুক্তরাজ্যের জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রিকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই মেডিকেল কাউন্সিল ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাতিমা জিন্নাহ মহিলা মেডিকেল কলেজ এবং নিশতার মেডিকেল কলেজ এবং পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের ঢাকা মেডিকেল কলেজের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দেয়।

পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল এবং যুক্তরাজ্যের জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিলের মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার ফলেই এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এর ফলে উক্ত ডিগ্রিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহে যারা অবহিত এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা রয়েছে, তারা যুক্তরাজ্যের মেডিকেল কাউন্সিলের স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন লাভ করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়। এই ব্যাপারে *দৈনিক জমানা* উল্লেখ করে,

> যুক্তরাষ্ট্রের পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভের জন্য উহা কাউন্সিল উল্লিখিত তারিখের পূর্বে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হতে নির্দিষ্ট ডিগ্রি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা যাইবে।[২৩২]

মেডিকেল অধ্যাদেশ এর সংযোজন, পরিবর্তন ও সংশোধন

ঢাকা মেডিকেল কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্টের মেডিকেল অধ্যাদেশ (Chapter XXVII-B, Part I-II) এর অংশ। এই কলেজের স্বীকৃতির বিষয়টি বিভিন্ন বিভাগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আইনের যুগোপযোগী পরিবর্তনের সাথে জড়িত ছিল। পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের প্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব মেডিকেল কলেজের শিক্ষা ও পরীক্ষার গুণগত মান বজায় রাখা। এই নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক মেডিকেল শিক্ষার্থীকে তিনটি মেডিকেল পরীক্ষায় পাশ করতে হতো। যেমন, দ্বিতীয় বর্ষের শেষে প্রথম এম.বি.বি.এস. পরীক্ষা, চতুর্থ বর্ষের শেষে দ্বিতীয়

এম.বি.বি.এস. এবং পঞ্চম বর্ষের শেষে চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় পাশ করতে হতো। এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে পরীক্ষা ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করার সর্বত্র চেষ্টা করা হয়। শুরু থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের অধ্যাদেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো, যা ১৯৪৬ সালে প্রণীত হয় *[পরিশিষ্ট দেখুন-৪১]*। তাই এ সময় মেডিকেল অধ্যাদেশও কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। এই ব্যাপারে ১৯৪৬-৪৭ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক বিবরণী* থেকে জানা যায়,

> During the session under review, all the faculties (Arts, Science, Law, Agriculture and Medicine) continued to function as usual and there was no important change in the ordinance and regulations relating thereto.[২৩৩]

দেশ বিভাগের পর এই অধ্যাদেশে পরিবর্তন আনা জরুরি হয়ে পড়ে। অধ্যাদেশটি যুগোপযোগী বা সন্তোষজনক পর্যায়ে ছিল না। বিষয়টি দেশ বিভাগের পর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৫০ সালে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির সদস্যগণ ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনের সময় এই অধ্যাদেশের ২ ধারায় কিছু অন্যান্য ডিগ্রি (M.S, M.D, M.O, D.P.H., D.T.M.) ও ডিপ্লোমা কোর্সের উল্লেখ ছিল। সে সময় কোর্সগুলোর পাঠদান শুরু করা সম্ভব হয়নি। তাই ১৯৪৫ সালের প্রণীত অধ্যাদেশটি পুনর্বিবেচনা করার জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।[২৩৪] এই কমিটির সদস্যগণের নাম মেডিকেল কলেজের রিপোর্ট বা নথিতে উল্লেখ না থাকায় জানা যায়নি।

১৯৫১-৫২ সালে মেডিসিন অনুষদ নতুন অধ্যাদেশের খসড়া তৈরি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাঠায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নতুন অধ্যাদেশের খসড়া আরো পরিবর্তনের দাবি জানায় এবং মেডিসিন অনুষদে ফেরত পাঠায়। ১৯৫৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) এবং রেগুলেশন সংক্রান্ত '*The Calendar*' এ মেডিসিন অনুষদের অধ্যাদেশ Chapter XXVII-B, Part-II এর ধারা 6 এর প্রথম অংশে কিছু পরিবর্তন করা হয়। ১৯৫২ সালের ধারায় উল্লেখ করা হয়,[২৩৫]

> The Examination in Organic and Physical Chemistry shall consist of
> a. One theoretical Paper
> b. A Practical Examination and
> c. Oral Examination

১৯৫৩ সালে অধ্যাদেশের মুদ্রিত ২৮৮ পৃষ্ঠার এই অংশটি সংশোধন করে উল্লেখ করা হয়,[২৩৬]

> Every candidate shall be Examined in the following subjects
> 1. Organic and Physical Chemestry
> 2. Anatomy
> 3. Physiology
> 4. Pharmacology.

The Examination shall be written, oral and practical, three hours being allowed for each paper.

পরবর্তীতে সংশোধিত নিচের লাইনটি রাখা হলেও উপরের অংশটুকু বাদ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে মেডিসিন অনুষদের অধ্যাদেশে আরো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও সংশোধন করা হয়। ১৯৫৭ সালে এই অধ্যাদেশের (XXVII-B) Part-II এর '৬' ধারার প্রথম অংশে বলা হয়,

> The Examination shall be theoretical of three hours' duration in each paper and also oral and practical.[২৩৭]

এভাবে দেখা যায় যে, মেডিসিন অনুষদের অধ্যাদেশটি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়। ফলে ১৯৪৬ সালের প্রণীত অধ্যাদেশ Part-I- এ ৫টি ধারা এবং Part-II এ ১০টি ধারা ছিল। ১৯৫৩ সালের একই অধ্যাদেশ সংশোধন করে Part-II- এ ৭টি ধারা সংযোজন করা হয়। অন্যদিকে ১৯৫৭ সালে অধ্যাদেশে আরো পরিবর্তন আনা হয়। এ সময় অধ্যাদেশের Part-I এ ৬টি ধারা এবং Part-II এ ৪০টি ধারা তথা নতুন ২৩টি ধারা সংযোজন করা হয়। আবার ১৯৬০ এর দশকে এই অনুষদের অধ্যাদেশে ব্যাপক পরিবর্তন, সংযোজন ও সংশোধন করা হয়। এ সময় THE DACCA UNIVERSITY ORDINANCE, 1961 এর Chapter XXX অংশটি মেডিসিন অনুষদের অধ্যায় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ সময় অধ্যাদেশের Part-I এ ৭টি ধারা, এবং Part-II এ ৫০টি ধারা ছিল। অর্থাৎ ১০টি নতুন ধারা সংযোজন করা হয়। উল্লেখ্য ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশে মোট ১৬টি (Part-I-XVI) পার্ট ছিল। অর্থাৎ নতুন আরো ১৪টি পার্ট যুক্ত হয়।[২৩৮] এ অধ্যাদেশ সম্পর্কে বলা হয় যে,

The ordinance will come into force with effect from the session 1963-64.'[২৩৯]

মেডিকেল কলেজ ভবনের সংযোজন ও পরিবর্তন থেকে শুরু করে এই অধ্যাদেশের পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটে, যা এই মেডিকেল কলেজকে স্বীকৃতি পেতে এবং আধুনিক ও বিশ্বমান সম্মত হতে সহায়তা করে।

তথ্যনির্দেশ

১. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1946-52, East Bengal Government Press, Dacca, 1954, p. 11

২. *ঐ*, p. 11

৩. *Annual Report for* 1957-58, *University of Dacca,* Dacca University Press, Ramna, Dacca, p. 100

৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ মে ১৯৫৬, পৃ. ৬।

৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, পৃ. ৩।

৬. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1946-52, p. X.

৭. *B Proceedings,* B. No. 128, SL No. 94, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953, p. XIV.

৮. *Annual Report for* 1947-48, *University of Dacca*, pp. 14-15.

৯. *Annual Report for* 1948-49, *University of Dacca,* p. 16.

১০. *Annual Report for* 1949-50, *University of Dacca,* p. 18.

১১. *Assembly Proceedings,* (Offical Report), *East Bengal Legislative Assembly,* Seventh Session, Vol. VII (20th-22nd February), East Bengal Government Press, Dacca, 1953, pp. 82-83.

১২. *Annual Report for* 1950-51, *University of Dacca,* p. 20.

১৩. *ডি গ্রুপ*, ১২০/১৯৫০-৫১, File No: 2A-10, বান্ডেল নং-৪, ক্রমিক নং-১৯৫, University of Dacca.

১৪. *ঐ*

১৫. *ঐ*, p. 17.

১৬. *ঐ*

১৭. 'That in the case of students intending to take up Medical course, Mathematics may not be a compulsory subject in the I.SC Examination. Such students shall have to take up Botany or Zoology in place of Mathematics, provided that shall not be admitted to the B.Sc. or the course for the degree of B.Sc. in Engineering or B.Ag. Course of this University unless they pass the I.SC Examination in Mathematics.' *দেখুন, ডি গ্রুপ*, ১২০/১৯৫০-৫১, File No: 2A-10, বান্ডেল নং-৪, ক্রমিক নং-১৯৫, University of Dacca.

১৮. *ঐ*

১৯. *ঐ*

২০. *Paksitan Observer*, 14 August 1958, p. 3.

২১. 'I happened to be a member of the admission committee of the Calcutta Medical College and the Dacca Medical College and also the Mymensingh Medical School. What I have found so far as the admission is concerned is that we all intend and desire that better doctors should be turned out by the medical institutions. So unless good and meritorious boys are available, I do not think it will become possible, because I have found that mostly third division boys come for admission from all the divisions and the members sitting in this committee find it really difficult. I remember, while sitting in the Dacca Admission committee, one of my colleagues sitting here said that we must take more boys from this province. But when boys from other Provinces, Viz., U.P., Allahabad, Aligarh, Madras and the Punjab were coming in one after another, it was found that each one of them was far superior to the boys of this Province and my friends in the committee suggested that we should take these boys and the result was that after calculation it was found that we were taking more boys from their provinces leaving aside the boys of this province. So, we had to revise our decision subsequently.' *দেখুন, Assembly Proceedings,* (Offical Report), *East Bengal Legislative Assembly,* Fourth Session 1949-50, 3rd, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, and 13th March 1950, Vol. IV, No-8, East Bengal Government Press, Dacca, 1952, p. 51.

২২. *Annual Report for* 1951-52, *University of Dacca,* p. 27.

২৩. *Annual Report for* 1952-53, *University of Dacca,* p. 19.

২৪. *B Proceedings,* B. No. 126, SL No. 100, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1953.

২৫. *Annual Report for* 1953-54, *University of Dacca,* p. 27.

২৬. *Annual Report for* 1954-55, *University of Dacca,* p. 1.

২৭. *Annual Report for* 1955-56, *University of Dacca*, p. 43.

২৮. 'এ বৎসর প্রথম বর্ষ মেডিকেল কলেজে ভর্তির ব্যাপারে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আই.এসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের সাথে সাথে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ দশদিনের মধ্যে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করিবার নির্দেশ দেন এবং জানান যে, পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে ইন্টারভিউর তারিখ ঘোষণা করা হইবে। কিন্তু দরখাস্ত দিবার পর আজ তিন সপ্তাহ হইতে চলিল কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনো প্রকার তারিখ এখনও ঘোষণা করেন নাই। প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে এই দুদিনে বহু ছাত্র রাজধানীতে ইন্টাভিউর আশায় আসিয়া বসিয়া আছে। শোনা যাইতেছে যে, আর ২/৩ সপ্তাহের মধ্যে ইন্টারভিউ হইবার আশা নাই। অপরদিকে যাহারা ভর্তি হইতে পারিবে না, তাহাদের বিশ্বদ্যিালয় বা অন্যান্য কলেজে ভর্তি হইতে পারিবে না, তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য কলেজে ভর্তি হইতে বেগ পাইতে হইবে, জরিমানা দিতে হইবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া পরে এই দুদিনে ছাত্রদের অর্থ নষ্ট করিবার কোনো যৌক্তিকতা আছে কি-না, কর্তৃপক্ষের কাছে তাহাই জিজ্ঞাসা। এ ব্যাপারে আমি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও প্রদেশের শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেতেছি।' *দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জুলাই ১৯৫৬, পৃ. ৩।

২৯. *Annual Report for* 1956-57, *University of Dacca*, p. 19.

৩০. *Annual Report for* 1957-58, *University of Dacca*, p. 101.

৩১. *Annual Report for* 1958-59, *University of Dacca*, p. 101.

৩২. 'পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের ডিরেক্টর জানিয়েছিল যে, ঢাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাসের নম্বরের হারের বৈষম্য থাকায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হইয়াছে যে, যে সকল ছাত্র শতকরা ৪০ নম্বর অর্থাৎ মোট নম্বর পাইয়াছেন তাহারা ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং তাহাদের দরখাস্ত বিবেচনা করা হইবে।' দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ জুলাই ১৯৫৬, পৃ. শেষ।

৩৩. *Annual Report for* 1959-60, *University of Dacca*, p. 102.

৩৪. *Annual Report for* 1960-61, *University of Dacca*, p. 105.

৩৫. *Annual Report for* 1961-62, *University of Dacca*, p. 122.

৩৬. *Annual Report for* 1962-63, *University of Dacca*, p. 120.

৩৭. *Annual Report for* 1963.-64, *University of Dacca*, p. 111.

৩৮. *Annual Report for* 1964-65, *University of Dacca*, p. 90.

৩৯. *Annual Report for* 1965-66, *University of Dacca*, p. 98.

৪০. *East Pakistan Provincial Assembly*, The 17th-20th January 1967, East Pakistan Government Press, Dacca, 1968, p. 12-14.

৪১. *Annual Report for* 1966-67, *University of Dacca*, p. 108.

৪২. *Annual Report for* 1967-68, *University of Dacca*, p. 118.

৪৩. *Annual Report for* 1968-69, *University of Dacca*, p. 102.

৪৪. *ঐ*

৪৫. *Annual Report for* 1969-70, *University of Dacca*, pp. 138-139.

৪৬. *ঐ*, p. 139.

৪৭. *ঐ*

৪৮. *ঐ*

৪৯. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1946-52, pp. IV-V

৫০. *ঐ*, p. V.

৫১. '1. Condensed M.B.B.S Course or Training which will enable them to obtain a university degree. There are a large number of licentiates particularly those 40, who are anxious to obtain a University degree. The All - India Medical Council has suggested certain changes which some Universities have accepted, the result of which will be that a licentiate can within 18 to 24 months obtain the degree of M.B.B.S special concessions to those who are serving in the armed forces so that they may, after demobilization, proceed to a degree have also been recommended. We consider that every encouragment should be given to all licentiates who wish to obtain the full medical qualification and they should be given every reasonable facility in the different medical colleges to pursue the necessary courses of study. So far only a few universities have been their way to arrange this, but we suggest that it should be endeavor of every University and every medical college to reserve a much larger number of places for licentiates. So as to enlarge substantially their opportunities to obtain a medical degree.
2. Advanced training for licentiates. It is desirable that licentiates should have opportunities of training so that they may be in a better position to practice the various specialties. There are at present only a few centers are where such training can be obtained by licentiates. The Calcutta school of tropical medicine and the All - India Institute of Hygiene and Public Health afford opportunities for licentiates acquire their diplomas while the Madras Government have introduced special courses in Ophthalmology, Obstetrics and Gynecology, Tuberculosis and Clinical laboratory sciences for licentiates leading to a Government diploma after a period of training for one year. We feel that such diplomas should be made more freely available to licentiates on the lines which we have suggested in our proposals for the postgraduate training of University graduates.' *দেখুন, Report of the Health*

Survey and Development Committee, Vol. II, The Manager, Government of India Press, New Delhi 1946, pp. 375-376.

৫২. *ঐ*

৫৩. *ঐ*

৫৪. ' স্যার, আমি বলতে চাই যুক্ত বাংলায় Condensed M.B.B.S Course খোলা হয়। এখানেও পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কনডেন্সেড কোর্স খোলার জন্য বলা হয়। গভর্নমেন্ট তা শুনেন নাই। লাহোর মেডিকেল কলেজ বরাবরই Condensed কোর্স পড়াচ্ছেন। সেখানে আমাদের ছেলেরা দরখাস্ত করলে প্রভিন্স এর কথা ওঠে। তারা ভর্তি করেন না। এখানে কনডেন্সেড কোর্স যদি খোলা যায় তা'হলে এ সমস্যা ঘুচে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, মেডিকেল কলেজে সিট নাই বলে ভর্তি হতে পারে না। কনডেন্সেড কোর্স না খোলার দরুন তাঁরা এই সুযোগা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমানে মেডিকেল কলেজে এমন অনেক আছেন যাঁরা কনডেন্সেড কোর্সে পাশ করেছেন।' *দেখুন, Assembly Proceedings* (Official Report), *East Bengal Legislative Assembly,* Fourth Session 1949-50 (3rd, 6th....13th March 1950), East Bengal Government Press, Dacca, 1952, p. 51.

৫৫. 'আমাদের পাকিস্তানে বর্তমানে যে মেডিকেলশিক্ষার স্ট্যান্ডারড তা অত্যন্ত অনুন্নত। এই স্টান্ডারকে উন্নত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। মেডিকেল স্কুলে ডাইসেকশন ব্যবস্থার অভাবে তাদের এনাটমি, ফিজিওলজি ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। এনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি এই সব বিষয়ে প্রাকটিকাল ট্রেনিং দিয়ে তারপর মেডিকেল সার্টিফিকেট দিলে মান উন্নত হবে। তাছাড়া আমরা বহুদিন ধরে কনডেন্সড কোর্সের দাবি করে আসছি, কিন্তু কোনো বন্দোবস্ত হয়নি। কনডেন্সড কোর্স প্রবর্তিত হলে আমার মনে হয় মান উন্নত হবে। এল. এম. এফ. স্টুডেন্টদের পাশ করার পরে একটা ইন্টারমিডিয়েট স্টেজ করে তাদের একটা সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। যাতে তারা মেডিকেল কলেজের স্টান্ডারড এ আসতে পারে।' *দেখুন, Assembly Proceedings* (Official Report), *East Bengal Legislative Assembly,* Fourth Session 1949-50 (3rd, 6th....13th March 1950), East Bengal Government Press, Dacca, 1952, p. 55.

৫৬. *B Proceedings,* B No. 128, SL No. 102, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1953.

৫৭. *ঐ*, p. 9.

৫৮. *ঐ*, pp. 11-12.

৫৯. *ঐ*, p. 19.

৬০. *Assembly Proceedings* (Official Report), *East Pakistan Legislative Assembly,* Third Session 1956, The East Pakistan Government Press, Dacca, 1957, pp. 124-125.

৬১. *ঐ*

৬২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০, পৃ. ৫।

৬৩. *ঐ*

৬৪. *The Dacca Gazette Extra,* 19 June 1961, p. 1153.

৬৫. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1946-52, p. XIV

৬৬. *Executive Council,* 1951-52, *University of Dacca,* p. 21.

৬৭. '39(a) These doctors who have passed the Final M.M.F Examination of the East Bengal or East Pakistan State Medical Faculty may be allowed to appear in the Final M.B.B.S Examination of the Dacca University at the next available chance provided they have passed the 1st and 2nd M.B.B.S Examination of the Dacca University previously. Those M.M.F doctors who have not passed the 1st and 2nd M.B.B.S Examination will have to pass the 1st M.B.B.S Examination first. After passing the 1st M.B.B.S Examination of the Dacca University, they will be allowed to take both second and final M.B.B.S Examination of the Dacca University at the next available chance together, or separately in successive chance. They will however, be eligible to appear at the first, second and final M.B.B.S Examination of the Dacca University, without further attending the course of lectures, demonstrations or hospital duties.
(b) The M.M.F students attending Medical College classes will be absorbed in the corresponding M.B.B.S classes only after they have passed the corresponding M.B.B.S Examination.' *দেখুন, The Dacca Gazette Extra,* Extra-ordinary, June 1961, pp. 1152-53.

৬৮. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1946-52, p. 150.

৬৯. *ঐ*

৭০. *Annual Report for* 1949-50, *University of Dacca,* p. 18.

৭১. *Executive Council,* 1951-52, *Universtiy of Dacca,* 6th December 1951, p. 2.

৭২. **'কমিটির সদস্য**
উপাচার্য
প্রিন্সিপাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ
ডিন, ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স
প্রভোস্ট, এফ.এইচ.এম.হল

পি.সি. ঘোষ' দেখুন, *Executive Council*, 1951-52, *Universtiy of Dacca*, 6th December 1951, p. 2.

৭৩. *ডি গ্রুপ*, ফাইল নং ২২৭২/১৯৫০-৫৩, বিষয় Pakistan Medical Research Council, p. 1.

৭৪. সাক্ষাৎকার, ডাক্তার সারওয়ার আলী, ১৯৫৯-৬০ শিক্ষাবর্ষের ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বয়সঃ ৭৭ (১৯৪৩), নির্বাহী, বারডেম, তারিখঃ ৭/২/২০১৯।

৭৫. আহমদ রফিক, *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ* ১৯৪৭-১৯৭১, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩, পৃ. ৪৪।

৭৬. *Annual Report for* 1968-69, *University of Dacca*, p. 102.

৭৭. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1946-52, p. XV

৭৮. *B Proceedings,* B No. 120, SL No. 94, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1948.

৭৯. *ঐ*, p. 1.

৮০. *Annual Report for* 1948-49, *University of Dacca*, p. 17.

৮১. 'আবার ১৯৪৯ সালের *ঢাকা প্রকাশ* থেকে জানা যায় যে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগকে উৎসাহ প্রদান করার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ সরকার ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন মানের ছাত্রদের জন্য ২২টি সরকারি বৃত্তি এবং ১২০টি অন্যান্য বিশেষ বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিভিন্ন শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করিবে, তাহাদিগকে এক বৎসর জন্য যথাক্রমে মাসিক ৩০ টাকা, ২৫ টাকা এবং ২০ টাকার তিনটি বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

আরও জানা গেল যে, যেসব ছাত্রী অন্য কোন বৃত্তি পাইতেছেন না তাহাদিগের জন্য মাসিক ২৫ টাকায় ১০টি বৃত্তি দেওয়া হইবে। উক্ত বৃত্তির মধ্যে দুইটি প্রত্যেক বার্ষিক শ্রেণিতে দেওয়া হইবে।

এগুলো ছাড়া, সরকার আরও ৮০টি বিশেষ বৃত্তি শ্রেণিতে ১৬টি করিয়া দেওয়া হইবে। দরিদ্র মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের এই বৃত্তিগুলি দেওয়া হইবে। তফশিলি সম্প্রদায়ের ছাত্রদের জন্যও ৪০টি বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা হওয়াইছে। এই বৃত্তিগুলি ৪টি করিয়া প্রত্যেক বার্ষিক শ্রেণিতে দেওয়া হইবে। বৃত্তি পাইলে কলেজে বেতন দিতে হইবে না।' *দেখুন, ঢাকা প্রকাশ*, ৯ জানুয়ারি ১৯৪৯, পৃ. ৩।

৮২. **'বৃত্তিগুলির নাম**

১. মৌঃ মোঃ হামিদ মেমোরিয়াল

২. কে. বি. আবদুল আজিজ

৩. বেগম রাবিয়া খাতুন মেমোরিয়াল

৪. মোঃ ওয়াজিউদ্দিন মেমোরিয়াল

৫. বেগম হাসিনা খাতুন মেমোরিয়াল।' *দেখুন, ঢাকা প্রকাশ*, ৯ জানুয়ারি ১৯৪৯, পৃ. ৩।

৮৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ এপ্রিল ১৯৫০, পৃ. ৭।

৮৪. *B Proceedings,* B No. 106, SL No. 80, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1952.

৮৫. *ঐ*

৮৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ মার্চ ১৯৫৯, পৃ. ১।

৮৭. *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year*, 1946-52, East Bengal Government Press, Dacca, 1954, p. XV.

৮৮. *B Proceedings,* B No. 106, SL No. 80, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1952, p. 6.

৮৯. *ঐ*

৯০. 'If two candidates from the two dominions are of equal merit, the National of Pakistan should receive the prior consideration by the Public Service Commission. We may first of all consult the Surgeon General whether he has any comment to make on the above point. Then we shall consult the Finance Department regarding the pay on the age basis as well as their concurrence to the eligibility of Nationals of Pakistan and the Muslim residents of the Indian Union to apply for these posts. We will then have to write to the Public Service Commission to give their advice as to qualification proposed. The matter will then have to be taken up to the Cabinet for their final approval before the posts are actually advertised.' দেখুন, *B Proceedings,* B No. 106, SL No. 80, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1952, p. 6.

৯১. *ঐ*, p. 10.

৯২. *ঐ*

৯৩. *ডি গ্রুপ*, ফাইল নং ৩৫২৮/১৯৪৬-৪৭, বান্ডেল নং. ৯, ক্রমিক নং. ২৩৩ Sub: Recognition of teachers of Dacca Medical College, University of Dacca p. 5.

৯৪. *B Proceedings,* B No. 106, SL No. 80, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1952, p. 20.

৯৫. *ঐ*, p. 2.

৯৬. 'I understand that Pakistan Medical Council has circularized that in Medical Colleges professor should be appointed provided he has got high academicals qualification and at least 5 years teaching experience. But may point out that similar condition was also laid down by Indian Medical Council in undivided India. This is suggestion by the Medical Council and this did not really affect the recognition of the Medical Collage for our appointing a professor who had not 5 year's teaching experience I may cite for example that in Calcutta Medical College Dr. M.N. Serker who after passing his F.R.C.S and acting as residential surgeon for 2 years became Professor of Clinical Midwifery in the Calcutta Medical College and had no other teaching experience except 2 years resident surgeon in Eden Hospital. His appointment did not affect the recognition of the Calcutta Medical College. Many other example of similar kinds may be cited necessary.' দেখুন, *B Proceedings,* B No. 106, SL No. 80, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1952, p. 28.

৯৭. 'I think, in the interest of services themselves, it is advisable to accept P.S.C. recommendations, unless there are strong reasons to the contrary. The P.S.C. has to do a very unpleasant job of selecting one man far a post where there are so many applicants. If faith in the bonafide of the P.S.C itself is shaken by self-interest of prospective candidates, it will be evil day for the provincial Government. I know, unsuccessful candidates approach persons in authority in their own interests. We should ignore, if possible, all these appeals and decide each case on its merit.' দেখুন, *B Proceedings,* B No. 106, SL No. 80, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1952, p. 26.

৯৮. *ঐ*

৯৯. *ঐ*, p. 11.

১০০. *ঐ*, p. 2.

১০১. *ঐ*, pp. 1-2.

১০২. *B Proceedings,* B No. 106, SL No. 80, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1952, p. 3.

১০৩. *ঐ*, pp.10-15.

১০৪. 'That this executive committee recommends to the council that the provincial Governments be approached through the central Government in the matter of the general status and emoluments of the professors of medical colleges and informed that this council views with grow concern the present status and emoluments of the professors of Medical Colleges particularly in East Bengal and recommends that their status and Emoluments should be raised commensurate with their duties and responsibilities.' *দেখুন*, *Minutes of the Medical Council of Pakistan and of its Executive committee* 1949-50, p.55.

১০৫. *B Proceedings,* B No. 106, SL No. 80, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1952.

১০৬. *ঐ*, p.25.

১০৭. 'That the committee feels that those teachers of the Engineering College and the Medical College, Dacca, who possess the highest academic distinction and are appointed professors in the subjects in these Colleges, may be recognized as professors.

That an enquiry be made of some of the recognized universities in Europe, India, and Pakistan as to the qualifications that are usually recognized by them for giving the teachers of the Engineering Colleges and the Medical Colleges the status of professors and readers.

That the question as to what qualifications will usually be recognized for giving the teachers of the Engineering Colleges and the Medical Colleges in Pakistan the status of professors and readers be referred to the Inter University Board, Pakistan.' দেখুন, *ডি গ্রুপ*, ৩৫২৮/১৯৪৬-৪৭, বান্ডেল নং ৯. ক্রমিক নং ২৩৩, Sub: Recognition of teachers of Dacca Medical College, p. 13.

১০৮. *ডি গ্রুপ*, ৩৫২৮/১৯৪৬-৪৭, বান্ডেল নং ৯. ক্রমিক নং ২৩৩, Sub: Recognition of teachers of Dacca Medical College, p. 13.

১০৯. *ঐ*

১১০. *ঐ*

১১১. *ঐ*, p. 2.

১১২. *ঐ*

১১৩. *Minutes of the Medical Council of Pakistan and of its Executive Committee for the year* 1949-50, Vol. II, The Medical Council of Pakistan, Karachi, 1951, p. 46.

১১৪. *ঐ*, p. 46.

১১৫. *ঐ*, p. 35.

১১৬. *The Medical Council of Pakistan, Minutes of* 1950-51, Vol. III, The Medical Council of Pakistan, Karachi, p. 22.

১১৭. *B Proceedings,* B No. 128, SL No. 102, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1953, p. 8.

১১৮. '(ক) এনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি এবং ব্যাকটেরিওলজি, প্রিভেনটিভ মেডিসিন, ডেন্টিস্ট্রি এবং রেডিওলজির অধ্যাপক ও অতিরিক্ত অধ্যাপক নিয়োগে পোস্ট গ্রাজুয়েট অথবা সমমান যোগ্যতা অথবা তাদের নিয়োগকৃত বিষয়ে ডিপ্লোমা অথবা একটি গবেষণামূলক ডিগ্রি থাকতে হবে।

(খ) এনাটমি এবং ফিজিওলজির অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পূর্বে অন্তত ৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এ ছাড়া উপরিউল্লিখিত অন্যান্য বিষয়ে অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

(গ) উপরি-উল্লিখিত বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা অনুষদের অধীনে একটি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অথবা একটি গবেষণামূলক ডিগ্রি অথবা ডিপ্লোমা থাকতে হবে। অথবা

এনাটমি, ফিজিওলজি, ব্যাকটেরিওলজি, প্যাথলজি বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তত ৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২. (ক) মেডিসিন, সার্জারি, মিডওয়াইফারি, অপথালমোলজির অধ্যাপক, অতিরিক্ত অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেডিকেল অনুষদের পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অথবা সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।

(খ) এ বিষয়ের অধ্যাপক ও অতিরিক্ত অধ্যাপকদের পূর্ববর্তী অন্তত ৪ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৩. (ক) পেডিয়াট্রিক, নাক, কান, গলা, রোগ অ্যানাসথেটিকস, টিউবারকিউলসিস, সাইকিয়াট্রি ইত্যাদি বিষয়ের অধ্যাপক, অতিরিক্ত অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেডিকেল অনুষদের অধীনে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অথবা কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সমমান ডিগ্রি থাকতে হবে।

(খ) এসব বিষয়ের অধ্যাপক ও অতিরিক্ত অধ্যাপক, তাদের বিষয়ের ওপর অন্তত ২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৪. মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স, ডারমাটোলজি এবং ভেনেরিয়াল ডিজিজ বিষয়ের অধ্যাপক, অতিরিক্ত অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের ক্ষেত্রেও চিকিৎসা অনুষদের অধীন পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অথবা পোস্ট গ্রাজুয়েট সমমান ডিগ্রি অথবা বিষয়ের ওপর ৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

সংশোধিত পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের এ্যাক্ট অনুযায়ী যে কোনো প্রতিষ্ঠানে ক্লিনিক্যাল বিষয়ের শিক্ষককে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে।' দেখুন, *ডি গ্রুপ*, ফাইল নং ২২৭২/১৯৫০-৫৩, File No-22(3), Sub: Pakistan Medical Council, University of Dacca, pp. 55-56.

১১৯. *ডি গ্রুপ*, ২২৭২/১৯৫০-৫৩, File No-22(3), Sub: Pakistan Medical Research Council, University of Dacca, pp. 55-56.

১২০. *ঐ*

১২১. *ঐ*

১২২. *Annual Report for* 1955-56, *University of Dacca,* p. 43.

১২৩. *Annual Report for* 1959-60, *University of Dacca,* p. 105.

১২৪. *ঐ*, pp. 101-102.

১২৫. *Annual Report for* 1960-61, *University of Dacca,* p. 104.

১২৬. *Annual Report for* 1961-62, *University of Dacca,* p. 121.

১২৭. *ঐ*, pp. 121-122.

১২৮. *B Proceedings,* B No. 120, SL No. 94, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1948, p. 1.

১২৯. 'খান বাহাদুর জাওয়াদ হোসাইন, বার-এট-ল, সদস্য, ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন– চেয়ারম্যান

কর্ণেল ই-কাটার, সি.আই.ই. পাবলিক হেলথ কমিশনার, ভারত সরকার–সদস্য

কর্ণেল এম জাফারি, আই.এম. এস, ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল, ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস–সদস্য

ডাক্তার ভি. আর. খানকার (Khanolkar), এম.ডি, ডিরেক্টর, টাটা রিসার্চ ল্যাবরেটরি, বোম্বে–সদস্য

ডাক্তার সি.জি. (C.G) পণ্ডিত, ও.রি.ই, ডিরেক্টর, কিং ইনস্টিটিউট অব প্রিভেনটিভ মেডিসিন, গুন্ডি, মাদ্রাজ–সদস্য

ডাক্তার এম. এ. এইচ. সিদ্দিকী, অধ্যাপক, এনাটমি, কিং এডওয়ার্ড মেডিকেল কলেজ, লাহোর–সদস্য

রাও বাহাদুর ডাক্তার কে.সি.কে.ই রাজা, ও.বি.ই, অফিসার (বিশেষ দায়িত্ব), (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), ডিরেক্টর জেনারেল, ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস–সদস্য (সচিব)' দেখুন, *B Proceedings,* B No. 120, SL No. 94, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1948, p. 1.

১৩০. *B Proceedings,* B No. 120, SL No. 94, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1948, p. 1.

১৩১. *ঐ*

১৩২. *ঐ*

১৩৩. *ঐ*
১৩৪. *ঐ*
১৩৫. *ঐ*
১৩৬. *B Proceedings,* B No. 107, SL No. 81, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1951.
১৩৭. *ঐ*
১৩৮. *ঐ*
১৩৯. *B Proceedings,* B No. 120, SL No. 94, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1952, p. 2.
১৪০. *ঐ*
১৪১. *ঐ*
১৪২. *ঐ*
১৪৩. *B Proceedings,* B No. 109, SL No. 83, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1950, p. 9.
১৪৪. *ঐ*
১৪৫. *B Proceedings,* B No. 117, SL No. 91, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1952.
১৪৬. *Annual Report for* 1952-53, *University of Dacca*, p. 19.
১৪৭. *ঐ*
১৪৮. *ঐ*
১৪৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ এপ্রিল ১৯৫৬, পৃ. ৮।
১৫০. *দৈনিক আজাদ*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১ এবং আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭।
১৫১. *দৈনিক আজাদ*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১।
১৫২. *East Pakistan Provincial Assembly,* Second Session 1963, 4th, 5th, 9th, 10th.....16th June 1963, East Bengal Government Press, Dacca, 1964, p. 127.
১৫৩. *East Pakistan Provincial Assembly,* Budget Session 1964-65, June 1964, East Pakistan Government Press, Dacca, 1966, p. 259.
১৫৪. *East Pakistan Provincial Assembly,* Budget Session 1967-68, The 12th, 13th, 15th, 19th June 1967, East Bengal Government Press, Dacca, 1969, p. 139.
১৫৫. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত।*
১৫৬. *Annual Report for* 1950-51, *University of Dacca*, pp. 27-28.
১৫৭. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২২।
১৫৮. *Annual Report for* 1952-53, *University of Dacca*, p. 19.
১৫৯. *Annual Report for* 1953-54, *University of Dacca*, pp. 27-28.
১৬০. *Annual Report for* 1954-55, *University of Dacca*, p. 41.
১৬১. *Annual Report for* 1955-56, *University of Dacca*, p. 44.
১৬২. *Annual Report for* 1956-57, *University of Dacca*, p. 67.
১৬৩. *Annual Report for* 1957-58, *University of Dacca*, p. 103.
১৬৪. *Annual Report for* 1958-59, *University of Dacca*, p. 103.
১৬৫. *Annual Report for* 1959-60, *University of Dacca*, p. 105.
১৬৬. *Annual Report for* 1960-61, *University of Dacca*, p. 109.
১৬৭. *Annual Report for* 1961-62, *University of Dacca*, p. 125.
১৬৮. *Annual Report for* 1962-63, *University of Dacca*, p. 122.
১৬৯. *Annual Report for* 1963-64, *University of Dacca*, p. 114.
১৭০. *Annual Report for* 1964-65, *University of Dacca*, p. 92.
১৭১. *Annual Report for* 1965-66, *University of Dacca*, p. 101.
১৭২. *Annual Report for* 1966-67, *University of Dacca*, p. 111.
১৭৩. *Annual Report for* 1967-68, *University of Dacca*, p. 118-119.
১৭৪. *Annual Report for* 1968-69, *University of Dacca*, p. 104.

১৭৫. *B Proceedings*, B No: 128, SL No: 102, List No: 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953, p. 1-2.
১৭৬. *Annual Report for* 1952-53, *University of Dacca,* p. 119.
১৭৭. *Annual Report for* 1954-55, *University of Dacca,* p. 42.
১৭৮. *Annual Report for* 1955-56, *University of Dacca,* p. 42.
১৭৯. *Annual Report for* 1956-57, *University of Dacca,* p. 65.
১৮০. *Annual Report for* 1957-58, *University of Dacca,* p. 42.
১৮১. *Annual Report for* 1958-59, *University of Dacca,* p. 42.
১৮২. *Annual Report for* 1959-60, *University of Dacca,* p. 104.
১৮৩. *Annual Report for* 1960-61, *University of Dacca,* p. 107.
১৮৪. *ঐ*
১৮৫. *Annual Report for* 1961-62, *University of Dacca* , p. 123.
১৮৬. *Annual Report for* 1962-63, *University of Daccap,* p. 121.
১৮৭. *Annual Report for* 1963-64, *University of Dacca,* p. 113.
১৮৮. *Annual Report for* 1964-65, *University of Dacca,* p. 91.
১৮৯. *Annual Report for* 1965-66, *University of Dacca,* p. 100.
১৯০. *ঐ*
১৯১. *Annual Report for* 1967-68, *University of Dacca,* p. 109.
১৯২. *Annual Report for* 1968-69, *University of Dacca,* p. 103.
১৯৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯, পৃ. ১।
১৯৪. *B Proceedings,* B No. 117, SL No. 91, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1952.
১৯৫. *ঐ*
১৯৬. *Annual Report for* 1963-64, *University of Dacca,* p. 112.
১৯৭. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২২।
১৯৮. *B Proceedings,* B No. 104, SL No. 78, List No. 109, *Public Health & Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1949, p. 6-7.
১৯৯. *ঐ*
২০০. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২২।
২০১. *B Proceedings,* B No. 104, SL No. 78, List No. 109, *Public Health & Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1949, p. 6-7.
২০২. *ঐ*
২০৩. *B Proceedings,* B No. 104, SL No. 78, List No. 109, *Public Health & Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1949, p. 1-2.
২০৪. *ঐ*, p. 10.
২০৫. *ঐ*
২০৬. *ঐ*, p. 7.
২০৭. *Annual Report for* 1950-51, *University of Dacca,* p. 21.
২০৮. '..... সমস্ত ব্যারাকগুলো ছিল বাঁশের তৈরি। কারণ তখনকার দিনে এতো টিন ছিল না। তবে বাঁশের কোনো অভাব ছিল না। দু'চালা ব্যারাকগুলো জানালার উচ্চতা পর্যন্ত ৫ ইঞ্চি পাকা গাঁথুনি ছিল এবং ফ্লোর ছিল পাকা। প্রথম সারিতে ছয়টি এবং পরের সারিতে পাঁচটি মোট ব্যারাক ছিল বিশটি। দু'টি ব্যারাকের মাঝখানে ছিল বাথরুমের অবস্থান। ১৬ ও ১৭ নং ব্যারাক ডাইনিং হল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ....তখন এসব ব্যারাক নিয়ে মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করা হতো। এ রকম একটি সংগীত আজও মনে পড়ে।

'ব্যারাক ভরা ধুলির আকড়
রাজধানী এই ঢাকা শহর
তারই ভিতর আছে যে এক
সকল গোয়ালের সেরা
অসুখ দিয়ে ভরা সে যে
ঔষধ দিয়ে ঘেরা
এমন কলেজ কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি
সে যে মোদের
প্রাণের ডিএমসি'

দেখুন, অধ্যাপক মনিলাল আইচ লিটু ও এম. আর মাহবুব, *ঢাকা মেডিকেল কলেজ: সেবা সংগ্রাম ঐতিহ্য*, গৌরব প্রকাশন, ঢাকা ২০১২, পৃ. ৩১-৩২।

২০৯. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৬।

২১০. *ঐ*, পৃ. ৪০।

২১১. *B Proceedings,* B No. 128, SL No. 102, List No. 109, *Health & Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953, p. 58.

২১২. *Annual Report for* 1951-52, *University of Dacca,* p. 27.

২১৩. *Annual Report for* 1955-56, *University of Dacca,* p. 43.

২১৪. *Annual Report for* 1956-57, *University of Dacca,* p. 64.

২১৫. *Annual Report for* 1957-58, *University of Dacca,* p. 65.

২১৬. *Annual Report for* 1958-59, *University of Dacca,* p. 101.

২১৭. *Annual Report for* 1959-60, *University of Dacca,* p. 103.

২১৮. *Annual Report for* 1960-61, *University of Dacca,* p. 105.

২১৯. *Annual Report for* 1961-62, *University of Dacca,* p. 123.

২২০. *Annual Report for* 1962-63, *University of Dacca,* p. 120, 1963-64, p. 112, 1964-65, p. 91.

২২১. *Annual Report for* 1969-70, *University of Dacca,* p. 140.

২২২. *Minutes of The Medical Council of Pakistan*, 1949-50, Vol. II, p. 41.

২২৩. '১। ডাক্তার এম. এ. এইচ সিদ্দিকী, বি. এস সি, এম. বি, এম. এস., ডি. এল. ও. এফ, আই. সি. এস., এফ. আর. সি. এস (ইংল্যান্ড)

২। লে. কর্ণেল এস. এম. কে মল্লিক, এম. বি., বি. এস., এম. আর. সি. পি., এম. আর. সি. এস., ডি. পি. এইচ।

৩। ডাক্তার এম. এ. পীরজাদা, এম. বি. বি. এস., এম. আর. সি. পি., ডি. পি. এইচ, ডি. টি. এম. এইচ।

৪। ডাক্তার এম. এল মিস্ত্রী, এম. ডি., এম. আর. সি. পি., এফ. সি. পি. এস।

৫। ডাক্তার এ. কে. এম. আব্দুল ওয়াহেদ, এম. বি., এম. আর. সি. পি., এফ. আর. এফ. এস., এম. এম. এফ., বি. এস. সি., অধ্যাপক (মেডিসিন), ঢাকা মেডিকেল কলেজ।' দেখুন, *Minutes of The Medical Council of Pakistan,* 1949-50, Vol. II, p. 41.

২২৪. *Minutes of The Medical Council of Pakistan*, 1949-50, Vol. II, p. 41.

২২৫. *Assembly Proceedings,* (Offical Report), *East Bengal Legislative Assembly,* Fourth Session 1949-50, 3rd, 6th, 7th, 8th....13th March 1950, Vol. IV, No-8, East Bengal Government Press, Dacca, 1952, p. 52.

২২৬. 'That this council fully endorsing the views expressed in the report of the visitors appointed by the council to visit the Medical College, Dacca, are of the considered opinion that the courses of study and facilities for teaching provided at this Institution are 'not sufficient', and therefore, the council decides not to recognize the M. B. B. S degree granted by the University of Dacca, nor do the council recommend the inclusion of this degree in the I schedule to the Pakistan Medical Council Act.' দেখুন, *The Medical Council of Pakistan*, 1950-51, Vol. III, p. 4.

২২৭. *ঐ*

২২৮. 'পূর্ববাংলার His Excellency Malik Firoz Khan Noon এর মত সুযোগ্য গভর্নর থাকতে এবং মাননীয় মি. নুরুল আমিন সাহেবের মত সুযোগ্য লোক প্রধানমন্ত্রী থাকতে পূর্ব-বাংলার সরকারি তহবিল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা কলেজের জন্য খরচ করেও recognition পায় না ইহার কারণ কি? Pakistan Medical Council এর পক্ষেও নিশ্চয়ই ইহা graceful নয়। ছোটো-খাটো দোষত্রুটি উপেক্ষা বা ignore করে বড় বড় দোষ-ত্রুটি থাকলে তাহা at any cost with iron hands দূরীভূত করেই মেডিকেল কলেজটি recognition এর ব্যবস্থা করা যায়। আমি আশা করি প্রধানমন্ত্রী সাহেব আমাদের মেডিকেল কলেজটি যাতে শীঘ্রই Pakistan Medical Council-এ recognised হয় তার ব্যবস্থা করবেন।' দেখুন, *Assembly Proceedings,* (Offical Report), *East Bengal Legislative Assembly,* Fifth Session 1951, 15th....28th February 1951, East Bengal Government Press, Dacca, 1953, p. 45.

২২৯. 'That Attention of Government be drawn to the recommendations made by the Pakistan Medical Council in the report of inspection in which they agree to recognize the Departments of Medicine, Physiology, Pharmacology, surgery, Eye E. N. T., Midwifery and Gynecology provided the improvements suggested in the report of inspection are effected and to the fact that the Pakistan Medical Council have not recommended the recognition of the Departments of anatomy, pathology, Hygiene and Medical Jurisprudence and Radiology as these departments are not up to the standard. That Government be requested to inform the university as to what action they are talking to effect the improvements to ensure the recognition of the M.B.B.S degree of the Dacca Medical College by the Pakistan Medical Council and that Government be informed that unless the improvements as suggested in the report of inspection are made immediately and effective steps are taken by Government for securing the recognition of the M. B. B. S degree of Dacca Medical College by the Medical Council of Pakistan within the session 1951-52, it will not be possible for the university to

conduct the M. B. B. S examination to be held from the session 1952-53.' দেখুন, *B Proceedings*, B No. 128, SL No. 102, List No. 109, *Health & Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953, p. 54.

২৩০. *East Bengal Legislative Assembly*, Tenth Session 1953, East Bengal Government Press, Dacca, 1954, p. 15.

২৩১. *ঐ*, p. 446.

২৩২. *দৈনিক জমানা*, বুধবার ২০ এপ্রিল, ১৯৬০, পৃ. ২।

২৩৩. *Annual Report for* 1946-47, *University of Dacca*, p. 3.

২৩৪. *Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1946-52, p. XIV.

২৩৫. *ডি গ্রুপ*, ২২৭২/১৯৫০-৫৩, Sub: Pakistan Medical Research Council, 1953.

২৩৬. *The Calendar, Containing University Ordinance and Regulations*, Vol. 1, The University of Dacca, 1953, pp. 288-289.

২৩৭. *The Calendar, University Act, Statutes, Ordinance and Regulations*, University of Dacca, The University of Dacca, 1957, p. 347.

২৩৮. *The Calendar, University Ordinance, Statutes, Ordinance and Regulations,* University of Dacca, The University of Dacca, 1969, pp. 336-409.

২৩৯. *ঐ*, p. 355.

পঞ্চম অধ্যায়

ঢাকা মেডিকেল কলেজের নারী চিকিৎসক: জ্ঞান আহরণ ও সেবা

পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজে আজ অর্ধেকেরও বেশি ছাত্রী। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে এ রকম অবস্থা ছিল না, কারণ এই অঞ্চলের কোনো ছাত্রী ভর্তি হয়নি। দেশভাগের পর কলকাতা মেডিকেল কলেজসহ ভারতের অন্যান্য মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ঢাকা মেডিকেল কলেজে চলে আসে। এই মেডিকেল কলেজে ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে কলকাতা মেডিকেল কলেজের মতো কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। এই কলেজে ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের প্রচলিত নিয়ম ও কলেজ কাউন্সিলের কোনো বিধি নিষেধ ছিল না। উপরন্তু ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করার জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তা সত্ত্বেও তেমন কোনো ছাত্রী ভর্তি না হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল ধর্মীয় গোড়ামি, নারী শিক্ষার অভাব, বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা, পুত্র সন্তানদের পড়াশোনার ব্যাপারে অধিক সচেতনতা। এই বিষয়গুলো দরিদ্র পরিবার থেকে শুরু করে সচ্ছল পরিবারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া পূর্ববাংলার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ছিল দরিদ্র, অসচ্ছল ও অশিক্ষিত হওয়ায় কন্যা সন্তানকে উচ্চ শিক্ষিত করার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী ছিল না। তৎকালীন সময়ে তথা উনবিংশ শতাব্দীর বিশ ত্রিশের দশক পর্যন্ত কন্যাদের শিক্ষিত করলেও তারা চাকুরি করতে দিতে রাজি ছিল না। তখন ধারনা ছিল মেয়েদের কাজ হলো ঘর সংসার ও সন্তান লালন পালন করা। উপরন্তু ছেলেরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেও কম মেয়েরা তুলনামূলক বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করত। চিকিৎসাশিক্ষায় অধ্যয়ন করতে হলে অবশ্যই বিজ্ঞান নিয়ে আই.এসসি পাশ করা ছিল বাধ্যতামূলক। অধিকাংশ সময় দরিদ্র পরিবারের পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। কালক্রমে এই দেশের স্বচ্ছল ও শিক্ষিত পরিবারের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সমাজ সচেতন, উদার মনোভাবাপন্ন, কন্যাসন্তানের অভিভাবকরা চিকিৎসাশিক্ষা অধ্যয়নে আপত্তি জানাননি, বরং তারা এটাকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে গণ্য করেন। এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ মনে করে নারীদের জন্য সম্মানজনক পেশা হলো দুটি এক, শিক্ষকতা, দুই, চিকিৎসক। বর্তমান সময়ের গবেষণায় দেখা যায় চিকিৎসাশিক্ষা ও সেবার ক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা পুরুষকে ছাড়িয়ে গেছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ২০১৯ সালে ২২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। তার মধ্যে ১৩৬ জন ছাত্রী, ৮৪জন ছাত্র। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে, সমগ্র বাংলাদেশে চিকিৎসাশিক্ষায় ভর্তি হয়েছে ৬০% ছাত্রী, ৪০% ছাত্র।[১] ডি.এম.সি. স্টুডেন্ট সেকশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ১১৪ জন, ছাত্রী ১০৫ জন, ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ৯৭ জন, ছাত্রী ১১৩ জন, ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ১১৫ জন, ছাত্রী ১০১ জন, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ৮৮ জন, ছাত্রী ১৪৩ জন এবং ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ১৩১ জন, ছাত্রী ১১৪ জন ভর্তি হয়। স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় মেডিকেল কলেজে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি, কখনও কখনও ছাত্রের সংখ্যার চেয়েও বেশি।[২] বর্তমান সময়ের জন্য এই ব্যাপারটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ও গর্বের বিষয় হলেও অতীতে অবিভক্ত ভারতের রাজধানী কলকাতাসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীরা সহজেই চিকিৎসাশিক্ষায় আসতে পারেননি। এর জন্য তাঁদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। এটা ছিল তাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও দাবির ফসল। পূর্ববাংলার প্রথম মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাশিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও চিকিৎসক হিসেবে তাদের অবদান জানার আগে কলকাতাসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নারীরা কিভাবে এই শিক্ষা ও পেশায় এসেছিল তা জানা দরকার।

ঔপনিবেশিক ভারতে চিকিৎসাশিক্ষা ও সেবায় নারীদের আগমন

১৮৪৯ সালে ইংল্যান্ডের এলিজাবেথ ব্লাকওয়েল (Elizabeth Blackwell 1821-1910) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের জেনেভা মেডিকেল কলেজ থেকে প্রথম নারী গ্রাজুয়েট হন। ১৮৫০ সালে ফিলাডেলফিয়ায় নারীদের জন্য পৃথক একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৬৫ সালে ইংল্যান্ডের এলিজাবেথ গ্যারেট এন্ডারসন (Elizabeth Garrett Anderson 1836-1917) মিডলসেক্স হাসপাতালে যোগদান করে তাঁর কোর্স সম্পন্ন করলেও পরিচালনা পর্ষদ বছর শেষে তাঁকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি একই বছর 'দ্য ডিপ্লোমা অব সোসাইটি অব এপোথেসি' অর্জন করেন এবং গ্যারেট হাসপাতাল নামে একটি বহিঃডিসপেনসারি চালু করেন ও প্রাইভেট প্রাকটিস শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৮৭০ সালে প্যারিসে এম.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৮৭৬ সালে সোফিয়া লুইস জেক্স-ব্লাক (Sophia Louisa Jex-Blake 1840-1912) এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করলেও সামাজিক বাধার কারণে প্রত্যাখান করতে হয়েছে। পরবর্তীতে পার্লামেন্টে একটি আইন (The Medical Act 1876) পাশের মাধ্যমে সমস্ত ব্রিটিশ মেডিকেল বোর্ড নারীদের পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার দিতে সক্ষম হয়।[৩] তিনি নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য আন্দোলন ও প্রচার কাজ চালান।

গবেষক মিতা ভদ্রের মতে, পশ্চিমাদেশের নারী চিকিৎসকদের মতো ভারতীয় নারী চিকিৎসকদের এই পেশায় প্রবেশের জন্য আইন বা রাষ্ট্রের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীতে মূলত সমাজ থেকে বাধা আসে। পুরাতন ঐতিহ্যে ভরা একটি সমাজে নারীদের স্বাধীনভাবে কোনো কাজ বা চিন্তা করার কোনো সুযোগ ছিল না। নারীদের ঘরের বাইরে যাওয়া এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের কর্মজীবন শুরু করার জন্য সামাজিক পরিবেশ বিরূপ ছিল।[৪] জেরাল্ডিন এইচ. ফোর্বস (Geraldine H. Forbes) উল্লেখ করেন যে, ঐতিহাসিকরা ভারতীয় নারীদের চিকিৎসাশিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর জোর দেন। যেমন, নারী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণে প্রধান বাধা হিসেবে ছিল পর্দাপ্রথা। অন্যদিকে ভারতে স্ত্রীরোগ ও প্রসুতিবিদ্যার মতো কিছু বিশেষ চিকিৎসায় নারীদের প্রবেশের অন্যতম প্রধান কারণ হলো পর্দাপ্রথা ও নারী পুরুষ পৃথকীকরণ।[৫] উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় নারীদের জীবন বদলে যেতে শুরু করে। যখন ঔপনিবেশিক সরকার ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের চিকিৎসার দোষত্রুটি সংস্কারকদের সামনে তুলে ধরেন, তখন তারা নিজেদের সমাজ সংস্কারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় নারীরা শিক্ষক ও চিকিৎসক হয়ে স্কুল, কলেজ ও হাসপাতালে যোগদান করেন।

যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার হাসপাতাল স্থাপন করেন, তখন ভারতের বিভিন্ন অংশের নারীদের অন্তর্মুখী থাকার কারণে তাদের উপস্থিতি প্রায় নগণ্য ছিল। হাসপাতালে কোনো নারী চিকিৎসক না থাকায় তারা পুরুষদের কাছ থেকে চিকিৎসা নিতে সংকোচ করত এবং হাসপাতাল থেকে দূরে থাকত। এই ব্যাপারটি প্রথমে নারী চিকিৎসক খ্রিস্টান মিশনারিরা উপলব্ধী করে। হাসপাতালে নারীদের উপস্থিতি না থাকার কারণে সন্তান প্রসবের সময়ে দুঃখ দুর্দশা এবং বিপুল সংখ্যক শিশুর মৃত্যু বহু খ্রিস্টান নারী মিশনারিদের কষ্ট দেয়। তাই তারা এসব নারীদের কষ্ট লাঘব করার জন্য বাড়িতে হাসপাতাল চালু করে এবং সন্তান প্রসবের জন্য এসব হাসপাতালে যেতে উৎসাহিত করে। তারা জনজীবন ও সমাজ সেবা কার্যক্রমে অংশ নেয়।[৬] উনবিংশ শতাব্দীর ষাট সত্তর এর দশক থেকে এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত

কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বে, এলাহাবাদ, কাশ্মির, শ্রীনগর, গুন্টারসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ ও আমেরিকান অসংখ্য যোগ্য নারী মেডিকেল মিশনারি কাজ করে, উদাহরণস্বরূপ আমেরিকার ডা. ক্লারা সোয়েইন ১৮৩৪-১৯১০ (Clara Swain Bareilly 1869), ইংল্যান্ডের ফানি জেন বাটলার ১৮৫০-১৮৮৯ (Fanny Jane Butler, Kashmir, 1880), ফ্লোরিডার সারা কোর্নিলিয়া সাইওয়ার্ড ১৮৩০-১৮৯১ (Sarah Cornelia Seward, Allahabad, 1871), পেনসিলভেনিয়ার আনা স্যারা কুগলার ১৮৫৬-১৯৩০ (Anna Sarah Kuglar, Gunter 1883), ইংল্যান্ডের এডিথ পেসি ১৮৪৫-১৯০৮ (Edith Pechey, Bombay, 1880), ইংল্যান্ডের এডিথ মেরি ব্রাউন ১৮৬৪-১৯৫৬ (Edith Mary Brown, Ludhiana, 1891), আমেরিকার আইডা এস. স্কুডা ১৮৭০-১৯৬০ (Ida S. Scudder, Vellore, 1900), কানাডার ডা. এলিজাবেথ বিটি (Dr. Elizabeth Beatty, Central India, 1874) প্রমুখ ঔপনিবেশিক ভারতের নারীদের চিকিৎসার সুযোগসুবিধা দেওয়ার জন্য ভারতে আসেন। উল্লিখিত নারী মেডিকেল মিশনারিরা বিভিন্ন মিশনারি সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, মেডিকেল স্কুল ও কলেজে কাজ করেন। এই সকল মিশনারি সোসাইটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দ্য আমেরিকান প্রেসবিটারিয়ান (১৭৮৯), দ্য চার্চ মিশনারি সোসাইটি (১৭৯৯), দ্য ব্যাপটিস জেনানা মিশন সোসাইটি, দ্য চার্চ অব ইংল্যান্ড জেনানা মিশনারি সোসাইটি (১৮৮০), দ্য জেনানা বাইবেল এন্ড মেডিকেল মিশনারি সোসাইটি (১৮৫২) এসব মেডিকেল মিশনারি বাংলার চেয়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে পাঞ্জাবে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়। এখানে নারীদের জন্য আলাদা করে ১৭টি হাসপাতাল স্থাপন করা হয়।[৭] এ ছাড়া কানাডার টরেন্টোর উইমেনস ফরেন মিশনারি সোসাইটি (১৮৭৪) কেন্দ্রীয় ভারতের মধ্যপ্রদেশে কাজ করে। এই মিশনারি সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের তিন ভাগের এক ভাগ ছিল চিকিৎসক।[৮]

এসব নারী মেডিকেল মিশনারিদের দুই ধরনের ক্ষমতা ছিল, চিকিৎসার মানবিক শক্তি ও খ্রিস্টান করার ধর্মীয় শক্তি। অর্থাৎ তারা আধ্যাত্মিক ও শারীরিক রোগ নিরাময়ের দায়িত্বে ছিলেন।[৯] ভারতীয় সমাজে প্রভাব বিস্তার করার জন্য নারী মেডিকেল মিশনারিদের চিকিৎসা সেবাকে একটা কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়। রোগীর সুস্থতা তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, বরং চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে নারীদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করে সমগ্র ভারতে খ্রিস্টান ধর্মকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালান। এ ক্ষেত্রে মেডিকেল মিশনারির উদ্যোক্তা উইলিয়াম জ্যাকসন এলমস্লি (William Jackson Elmslie 1832-1872) অন্যতম ভূমিকা রাখেন।[১০] তাছাড়া আন ডগলাস (Ann Douglas) এর মতো নারীবাদীরা মনে করেন, আমেরিকার নারী মিশনারিরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য ধর্মীয় আদর্শ ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে।[১১] এখানে নারীবাদী সংস্কৃতি কাজ করেছিল।

পরবর্তীতে মিশনারিদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য থাকলেও সামাজিক ও মানবিক উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজ সংস্কারের দ্বারা ভারতীয় সমাজের কুসংস্কার দূর করার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাদের যুক্তি ও প্রচারণা ঔপনিবেশিক ভারতে নারী চিকিৎসাশিক্ষা প্রবর্তনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ক্ষেত্রে ভারতের নারীদের লজ্জা ও শালীনতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়। এ সময়ের ভারতের নারীরা একজন পুরুষ চিকিৎসক দ্বারা শরীর পরীক্ষা নিরীক্ষা (Diagnosis) করার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় বলে মনে করত।[১২]

কমলেশ মোহন তাঁর ‘Carving Identities, Building Hospital and Modernizing Motherhood: A Critical Review of Edith Brown’s Life and Career’ প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, এই একই যুক্তি

ব্রিটিশ নারীরা পশ্চিমের নারীদের চিকিৎসাশিক্ষার বিতর্কে ব্যবহার করেন। এই ব্যাপারে ১৮৭২ সালের ২৭ মে এক নারী (নাম পাওয়া যায়নি) *'The Scotsman'* এ অনুরূপ লিখেন।। তিনি লিখেন – 'agonies of shame and female modesty, when submitting to male medical and surgical treatment.'[১৩]

নারী মিশনারিদের সচেতনতা সত্ত্বেও উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারীরা এ সময় পর্দাপ্রথার কারণে পাশ্চাত্য চিকিৎসার সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এমনকি বেশির ভাগ নারী বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ ও সন্তান প্রসবের সময়ে পুরুষ চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা নিতে অপরাগ ছিল। দেশীয় অদক্ষ 'দাই' (ধাত্রী) এর হাতে তাদের সন্তান জন্মদান করত। এই সকল দাইরা অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ এবং তাদের কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না।[১৪] ঔপনিবেশিক ভারতের অসংখ্য মা ও শিশুর মৃত্যুর জন্য তা দায়ী ছিল। ঔপনিবেশিক ভারতের অবহেলিত বঞ্চিত, নিপীড়িত নারীদের পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ব্রিটিশ ও আমেরিকান নারীর চিকিৎসকগণ তৎপর হন। এ ক্ষেত্রে তারা ভারতের নারীদের সহায়তা করার জন্য চিকিৎসাশিক্ষাকে সর্বোত্তম বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেন।[১৫] অনুরূপভাবে অম্বালিকা গুহ তাঁর 'The 'Masculine' Female: The Rise of Women Doctors in Colonial India, c.1870-1940' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, ভারতের নারী চিকিৎসাশিক্ষার ধারনা যারা উত্থাপন করেন তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হচ্ছে, ভারতের সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীদের পুরুষ চিকিৎসকদের কাছ থেকে চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা হচ্ছে পর্দাপ্রথা (Seclusion)। এই ধারণা ব্রিটেন ও ভারতের চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল।[১৬] ১৮৬৭ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ভার্নাকুলার লাইসেন্সিয়েট ছাত্ররা জানান যে, তাদেরকে ধাত্রীবিদ্যা এবং স্ত্রী ও শিশুরোগ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত, কিন্তু কলকাতা মেডিকেল কলেজ কাউন্সিল আপত্তি জানায়। কাউন্সিলের একজন বিশিষ্ট সদস্য ডা. টি.ই. চার্লস (T.E. Charles) যুক্তি দেন যে, ডেমনস্ট্রেশনের (হাতে কলমে শিক্ষাদান) উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত নারী রোগী না পাওয়ার কারণে ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যকর করা কঠিন ছিল।[১৭] বাঙালি সাব-এসিস্ট্যান্ট সার্জনরা জানান যে, Women felt a habitual repugnance towards allowing 'manual interference' into their body by male physicians.[১৮] গবেষক এন্টোয়ানেট বার্টন (Antoinette Burton) যুক্তি দেন যে, লন্ডন স্কুল অব মেডিসিনের ব্রিটিশ নারী চিকিৎসকরা একটি জাতীয় অথবা সামাজিক বাধা হিসেবে 'জেনানায়' বন্দী ভারতীয় নারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করেন। এর অন্তর্নিহিত কারণ ছিল ব্রিটিশ পুরুষ চিকিৎসকদের দ্বারা এই নারী চিকিৎসকরা ব্যাপক বাধার সম্মুখীন হন। ব্রিটেনের পুরুষ নিয়ন্ত্রিত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে তাদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হয়।[১৯] অর্থাৎ তাদের নিজেদের দেশের মেডিকেল কলেজ ও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত মেডিকেল প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে প্রবেশ অস্বীকৃত এবং সামাজিক ও ধর্মীয় দিক থেকে অধস্তন পর্যায়ে ছিল। তাই তারা একজন নারী হিসেবে এবং কর্মজীবনে মিশনারি ও চিকিৎসক হিসেবে স্বতন্ত্র পরিচিতি পাবার আকাঙ্খায় এশিয়ার দেশগুলোতে আসে।[২০] এরই ধারাবাহিকতায় তারা ঔপনিবেশিক ভারতে আসে।

১৮৭২ সালে ভারতে নারী চিকিৎসাশিক্ষার ধারণাটি প্রথম মাদ্রাজের সার্জন জেনারেল ডা. এডওয়ার্ড গ্রিন বেলফোর (Edward Green Balfour 1813-1889) উত্থাপন করেন। প্রাথমিকভাবে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ এর বিরোধিতা করলেও, কলেজের অধ্যক্ষ ও মাদ্রাজের গভর্নর প্রস্তাবটিতে সম্মতি দেন। ১৮৭৫ সালে চারজন ইউরোপীয় বা এ্যাংলো ইন্ডিয়ান নারী মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়।

১৮৮০ সালে বোম্বেতে একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী জর্জ টি কিট্রেডজ (George T. Kittredge) ভারতে নারী চিকিৎসক সৃষ্টিতে ফান্ড গঠনের কাজ শুরু করেন। এই তহবিল বোম্বের নারী ও শিশুদের চিকিৎসার সুযোগসুবিধা প্রদান এবং নারীদের চিকিৎসাশিক্ষার জন্য গঠন করা হয়। এ ক্ষেত্রে বোম্বের গ্রান্ট মেডিকেল কলেজ নারী শিক্ষার্থীদের জন্য এর দরজা খুলে দেয়।[২১] কিন্তু অবিভক্ত বাংলার কলকাতায় প্রচলিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির পশ্চাদপদ ধারণার কারণে নারীদের চিকিৎসাশিক্ষাকে বিরোধিতা করা হয়। তখন ধারণা করা হতো যে, নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পরিবারের জন্য হুমকীস্বরূপ। তাই নারীদের চিকিৎসাশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল। ১৮৭০ এর দশকে নারীশিক্ষার ধরণসহ নারীমুক্তির ব্যাপারে ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কারকরা দুইটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৮৭১ সালে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ইংল্যান্ড থেকে ভ্রমণের পর নারীদের জন্য আলাদা বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। যে শিক্ষার মধ্যে নারী সংশ্লিষ্ট কাজের উন্নয়ন ঘটাবে। তার মতে, নারীদের গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনের মতো বিষয়ে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং রন্ধন শৈলি ও গৃহে কাজের ওপর দক্ষতা অর্জন করা উচিত, যা মা এবং স্ত্রী হিসেবে ভবিষ্যতে তাদের কাজে আসবে। তার মতের বিপরীতে প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম দুর্গামোহন দাস (১৮৪১-১৮৯৭), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী (১৮৪৪-১৯৯৮) ছিলেন। তারা মনে করেন শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষদের মতো নারীদের একই সুযোগসুবিধা থাকা উচিত।[২২] এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৭৫ সালে ব্রাহ্ম নীলকমল মিত্র তাঁর নাতনি বিরাজ মোহনীকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তির ব্যাপারে সরকারের কাছে আবেদন করেন। তাঁর আবেদনের মূল বিষয়বস্তু ছিল, কোনো হিন্দু নারী যদি চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে সঠিকভাবে অধ্যয়ন করার পরে সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে চায় এবং সেই পরীক্ষায় পাশ করে তাহলে তাকে ডিপ্লোমা দেওয়া হবে কিনা? মেয়েদের জন্য কোনো কোনো বিষয়ে ক্লাসে উপস্থিত থাকার আবশ্যিক বিষয়টি শিথিল করা যাবে কিনা? এ ক্ষেত্রে যুক্তি ছিল, তাঁর নাতনি একজন পর্দানশিন নারী। এজন্য ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করা সম্ভব নয়। তবে ক্লাসে ছাত্রদের থেকে পৃথকভাবে পর্দার আড়ালে বসে নোট নেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। চিকিৎসাশিক্ষার মূল অংশ হলো মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করা, কিন্তু তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় অপর পুরুষের সামনে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করা নিন্দনীয় ছিল। তাই তাঁর জন্য আলাদা একটি ঘরে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করার অনুমতি চাওয়া হয়। নীলকমল মিত্র তাঁর নাতনিকে চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে মন্তব্য করেন তা হলো, বর্তমান অবস্থায় এক বা একাধিক নারীকে ডাক্তার হিসেবে গড়ে তোলা হিন্দু সমাজের পক্ষে একটা পরিবর্তন।[২৩] কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ সার্জন মেজর ডা. নর্মান সির্ভাস (Dr. Norman Chevers 1861-1873) নারীদের চিকিৎসাশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত দেশীয় নারীগণ চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে সেচ্ছায় পড়াশোনা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করবে ততদিন পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে ইচ্ছুক। তাহলেই অতি যত্নসহকারে ও উদারভাবে এই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। অন্যদিকে শিক্ষা অধিকর্তা বলেন, 'যদি কোনো অবস্থাপন্ন মহিলা এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহলে তাঁকে সমস্ত প্রকারে সাহায্য করা প্রয়োজন। অন্যান্য নিম্নশ্রেণির মেয়েদের তুলনায় তার উদাহরণ আরও বেশি ফলপ্রসু হবে।'[২৪]

পরবর্তীকালে ১৮৭৯ সালের ১৩ মার্চ রাখালদাস মুখার্জীসহ আরো কয়েকজন ব্যক্তি শিক্ষা অধিকর্তার নিকট আরেকটা প্রতিবেদন পেশ করেন। তাতে বলা হয়, ছয়জন বাঙালি নারী শিয়ালদহের ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছাপোষণ করলেও তাদের অভিভাবকগণ বিরোধিতা করেন। ১৮৮২ সালের ৫মে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন স্যার আলফ্রেড উডলি ক্রফট (Sir Alfred Woodley

Croft 1841-1925) মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও কলেজ কাউন্সিলের কাছে নারীদের চিকিৎসাশিক্ষা সম্পর্কে একটি চিঠি দেন। তাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, যদি একদল নারী চিকিৎসক অন্ত:পুরে প্রবেশের অধিকার পায়, তাহলে সেখানকার দুঃখকষ্ট দূর হতে পারে। তাই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একদল দেশীয় ও অন্যান্য নারীদের চিকিৎসাশিক্ষার সুযোগ (এল.এম.এস) দেওয়া উচিত।[২৫]

আলফ্রেড ক্রফটের সুপারিশ মেডিকেল কলেজের এক কাউন্সিল সভায় অধ্যক্ষ উত্থাপন করেন। সভার পাঁচজন সদস্যের মধ্যে চারজনই এর বিরোধিতা করেন। অনেকেই মনে করেন, নারীদের চিকিৎসাশিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। আবার অনেকে মনে করেন, নারীরা চিকিৎসাশিক্ষার অনুপযুক্ত। ক্রফট দেশের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করে বলেন, বিরাট সংখ্যক ভারতীয় নারীদের কষ্টকর অবস্থা অথবা অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একদল সুশিক্ষিত নারী চিকিৎসক প্রয়োজন।[২৬]

আলফ্রেড ক্রফট এর নারী চিকিৎসাশিক্ষার ব্যাপারে ইতিবাচক মন্তব্য থাকা সত্ত্বেও কলেজ কাউন্সিলের সমস্ত সদস্য এর বিরোধিতা করেন। ১৮৮২ সালের ১০ জুন কলকাতা মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আর. হার্ভে (R. Harvey) শিক্ষা বিভাগের কাছে এক চিঠি পাঠান। উক্ত চিঠিতে তিনি বলেন, কলেজ কাউন্সিলের সমস্ত সদস্য ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ভর্তির মান হ্রাস করার প্রশ্নে বিরোধিতা করেন। তাঁরা মনে করেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানে নারীদের ভর্তির সুযোগ থাকা বাঞ্চনীয় নয়। ছেলে ও মেয়েদের একসঙ্গে পড়ার সুযোগ দেওয়া প্রতিবাদযোগ্য। এর ফলে উভয়ের চরিত্রের মনোবল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে।[২৭] তারা নারীদের জন্য আলাদা মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপনের সুপারিশ করেন। উপরন্তু তারা এটাও উল্লেখ করেন, দেশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে নারী চিকিৎসকের কোনো চাহিদা নেই। ধাত্রীবিদ্যা এবং নারী ও শিশুরোগের শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করলে নারী চিকিৎসকের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব।

এ রকম অবস্থায় মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার সার্জন অধ্যাপক জে.এম. কোটস (J.M. Coates 1880-1890) সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সের মেডিকেল স্কুল ভ্রমণ করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তার ওপর ভিত্তি করে বলেন, সহশিক্ষার দ্বারা অধ্যাপক ও ছাত্রদের মনোবল কখনই নষ্ট হয় না, বরং শ্রেণিকক্ষ ও হাসপাতালে পুরুষদের সাথে মহিলাদের উপস্থিতি সকলের ওপর পরিমার্জিত প্রভাব বিস্তার করে।[২৮] কোটস তাঁর বক্তব্যকে এখানেই সীমাবদ্ধ না রেখে ১৮৮২ সালের ১৬ অক্টোবর মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের কাছে এই ব্যাপারে জানতে চান। মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ জানান যে, তাঁর কলেজে আটজন ছাত্রী রয়েছে। ভর্তির সময়ে তাদের নিম্নলিখিত বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়,[২৯]

ক. কোনো একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখকের বই থেকে ৩০ লাইন শ্রুতিলিখন।
খ. প্রবেশিকা পরীক্ষার সমকক্ষ ইংরেজি ব্যাকরণ ও রচনা।
গ. ইতিহাস ও ভূগোল
ঘ. গণিত: সামান্য দশমিক ও ভগ্নাংশ।

মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে পর্দার পরিবর্তে ছাত্রছাত্রীদের বসার জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রীরাও পৃথকভাবে পর্দার আড়ালে বসতে অনিচ্ছুক ছিল। শরীরের গঠনতন্ত্র ও শল্যচিকিৎসা পাঠের সময় ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল না। তাদের জন্য আলাদা কোনো ডাইসেকশনের (শব ব্যচ্ছেদ) ঘর ছিল না। প্রথম দুই বছর নারী ও শিশুদের তারা সেবা করত এবং ঐ বিষয় সম্পর্কে ধারণা না পাওয়া পর্যন্ত সহকারীদের কাছ থেকে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত। কলেজ ও হাসপাতালে তাদের জন্য পৃথক বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা ছিল। চিকিৎসাশিক্ষার জন্য তাদের কাছ থেকে কোনো বেতন নেওয়া

হতো না এবং সরকার তাদেরকে বিনা পয়সায় পাঠ্য বই প্রদান করত। সহশিক্ষার জন্য কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়নি এবং মনোবলও নষ্ট হয়নি। তাই সমস্ত দিক বিচার বিবেচনা করে কলকাতা মেডিকেল কলেজ কাউন্সিলের বক্তব্যকে লে. গভর্নর স্যার অগাস্টাস রির্ভাস টমসন (Sir Augustus Rivers Thompson 1882-1887) বাতিল করে দেন এবং নারী চিকিৎসাশিক্ষার যুক্তিকে সমর্থন এবং এই বিষয়ে সরকার উদার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সরকারি নথিতে লিপিবদ্ধ চিঠি থেকে জানা যায় যে, স্যার ক্রফটের সংগ্রামী চেতনা এবং স্যার রিভার্স টমসনের উদার দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ছাত্রী ভর্তি করার নীতি গৃহীত হয়। লে. গভর্নর এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য সকলকে আহ্বান জানান।[৩০] তাঁর এই সমর্থন শুধু নারীদের মেডিকেল কলেজে ভর্তিই অনুমোদন করেনি বরং তাদের পড়াশোনার জন্য সবধরনের সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করে। মেডিকেল কলেজে পড়াশোনার জন্য প্রত্যেক ছাত্রীর জন্য ২০ রুপি করে বৃত্তির প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৮৩ সালের ২৯ জুন থেকে প্রগতিশীল ব্রাহ্মণ ও উপরিউল্লিখিত ব্রিটিশ প্রশাসকদের মধ্যস্থতায় কলকাতা মেডিকেল কলেজে নারীদের ভর্তির অনুমতি প্রদান করা হয়। গবেষক চন্দ্রিকা পাল (Chandrika Paul) এটাকে দেখান যে,

> As an attempt of the British administrative officials to salvage the image of the Bengal Presidency and prevent it from falling behind its administrative rivals, Madras and Bombay in introducing female medical education.[৩১]

এ সময় দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর মতো ব্রাহ্ম সংস্কারকরা নারী চিকিৎসাশিক্ষার সমর্থক ছিলেন। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র এবং জার্নাল নারীদের পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষায় শিক্ষিত নারী চিকিৎসকদের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। ১৮৮৩ সালে *Brahmo public opinion* প্রকাশ করে,

> If there be any one country where more than at another, the want of lady doctors is most keenly felt, it is no doubt India. The system of zenana seclusion makes it nearly impossible for male doctors to be very useful in treating female patients. Consequently, a very large number of our women face premature death from want of proper medical attendance.... Besides, there are disease peculiar to them, which it is simply impossible for male doctors to diagnose or treat.[৩২]

অন্যদিকে *বামাবোধিনী পত্রিকা* প্রকাশ করে যে, দূরদর্শিতার সাথে সবাই স্বীকার করবে যে, পুরুষদের মতো নারীদের জন্য সমানভাবে চিকিৎসাশিক্ষা প্রয়োজন। নারীদের এমন বিশেষ কিছু রোগ রয়েছে, যা কেবলমাত্র নারীরাই উপলব্ধি করতে পারে এবং পুরুষদের দ্বারা তাদের চিকিৎসা কার্যকর হওয়ার চেয়ে নারীদের দ্বারা হতে পারে।[৩৩]

এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৮৩ সালে শিক্ষিত জমিদার ব্রজকিশোর বসুর কন্যা কাদম্বিনি বসু (Kadambini Basu 1861-1923) প্রথম কলকাতার মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করলে লে. গভর্নর স্যার অগাস্টাস রির্ভাস টমসন এর সম্মতিতে মেডিকেল কাউন্সিল ভর্তির অনুমতি প্রদান করেন। ফলে তিনি ১৮৮৪ সালে এই কলেজে ভর্তি হন। তিনি বরিশাল জেলার চাদশীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বাবা ও স্বামী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর উৎসাহে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু তিনি চূড়ান্ত মেডিকেল পরীক্ষার সব লিখিত বিষয়ে পাশ করলেও ব্যবহারিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে অকৃতকার্য হন। তাই এই কলেজ থেকে প্রথম গ্রাজুয়েট প্রাপ্ত দুই নারী হলেন বিধুমূখী বসু (Bidhumukhi Basu 1860-1944) ও ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র (Virginia Mary Mitter)। পরবর্তীতে কাদম্বিনি বসু জি.বি.এম.সি. (গ্রাজুয়েট অব বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ) অর্জন করেন এবং প্রাইভেট প্রাকটিস করার অনুমতি পান। তিনি ইডেন

হাসপাতালের বহির্রোগী বিভাগের এবং ডাফরিন হাসপাতালের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল ৩০০ রুপি। ১৮৯৩ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডের এডিনবার্গ যান। তিনি পুরুষ চিকিৎসকদের সাথে প্রতিযোগিতা করে সফল হন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের একটি অংশ তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়। আশঙ্কা করা হয় যে, তাঁকে অনুসরণ করে ভারতের অন্যান্য নারীরা ঘরের বাইরে যেতে এবং পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহিত হবে। তাঁকে নিয়ে সবচেয়ে জঘন্য সমালোচনা করা হয় গোড়া হিন্দুদের একটি পত্রিকা '*বঙ্গবাসী*'। এই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের লেখক কাদম্বিনিকে 'বেশ্যা' (Whore) বলে সম্বোধন করেন।[৩৪] যদিও সম্পাদক এর বিরুদ্ধে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, শিবনাথশাস্ত্রী, ডা. নীল রতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩) আইনানুগ ব্যবস্থা নেন। ফলে সম্পাদককে ১০০ টাকা জরিমানা ও ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতার সাথে নারীদের সামাজিক স্বাধীনতা সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। সে সময়ে পুরুষরা নারীদের স্বাধীনতাকে অনুমতি দিতে ইচ্ছুক ছিল না। তাদের ভয় ছিল যে, এর ফলে নারীদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য কমে যাবে।[৩৫]

তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতার কারণে নারী চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণ যেমন কঠিন ছিল, তেমনি চিকিৎসাশিক্ষা সম্পন্ন করার পর চিকিৎসা পেশা গ্রহণও কঠিন ছিল। কাদম্বিনি বসু কেবলমাত্র ভারতীয় পুরুষদের বিরোধিতার সম্মুখীন হননি, কর্মক্ষেত্রে বর্ণবাদী পক্ষপাতিত্ব ও বৈষম্যের স্বীকার হন। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ডাফরিন ফান্ডের দ্বারা ভারতের বিভিন্ন অংশে নারীদের জন্য অনেক হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ফান্ডের বিশেষত্ব ছিল নারী চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠা করা। নারী চিকিৎসকদের মাধ্যমে ভারতীয় নারীদের চিকিৎসা সহায়তা সরবরাহের উদ্দেশ্য নিয়ে এই ফান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর নারী চিকিৎসাশিক্ষার ক্ষেত্রকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিতে মহারানী স্বর্ণময়ী (১৮৩৮-১৮৯৭) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নারীদের চিকিৎসাশিক্ষার উদ্দেশ্যে সরকারের হাতে দেড় লক্ষ টাকা দেন। এই টাকায় নারীদের জন্য একটি উপযুক্ত হোস্টেল তৈরি করা হয়। এর ফলে যে সমস্ত নারী কলকাতায় থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করতে ইচ্ছুক, সেই অভাব দূর হয়। আবার স্যার ওয়ালটার ভিসুজার ডাফরিন ফান্ডের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে দুইশত রুপি হারে তিন বছরের জন্য বৃত্তি প্রদান করতে সম্মত হন। এর অন্যতম শর্ত ছিল চিকিৎসাশিক্ষার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও ইউরোশিয়ান নারীদের সহায়তা করা। তিনি মনে করেন, এদের মধ্যে এমন অনেক নারী আছেন, যারা চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

নারীদের চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণে নানা রকম সুযোগসুবিধা প্রদান সত্ত্বেও কাদম্বিনি বসুর মতো অনেক ভারতীয় দক্ষ নারী চিকিৎসকগণ বর্ণবৈষম্যের শিকার হন। তারা (ভারতীয়) দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও সাদা চিকিৎসকদের নিয়োগ দেওয়া হতো। কাদম্বিনি 'কলকাতা জেনানা হাসপাতালে' অস্থায়ী পদে ছিলেন। তাঁকে স্থায়ী পদ দেওয়া হয়নি। তিনি আরো অভিযোগ করেন যে, ভারতীয় নারী চিকিৎসকদের নির্বিচারে সেরা হাসপাতালের চাকরি থেকে বাদ দেওয়া হতো। এটা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বাধা স্বরুপ ছিল। তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালের দায়িত্ব থেকে বাদ অথবা নিচু পদ দেওয়া হতো। সাধারণত বড় ও ভালো হাসপাতালগুলোতে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সাদা সিনিয়রদের দেওয়া হতো।[৩৬]

পুরুষ নিয়ন্ত্রিত গোড়া রক্ষণশীল সমাজ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নারীরা চিকিৎসাশিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখায়। তাদের এই আগ্রহকে রূপ দান করে সংস্কারবাদী, আলোকিত ও শিক্ষিত মানুষ। উদাহরণ হিসেবে ভারত উপমহাদেশের প্রথম নারী চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করা যায়।

তিনি হলেন বোম্বে প্রেসিডেন্সির আনন্দীবাঈ গোপালরাও যোশী (১৮৬৫-১৮৮৭)। তিনি ১০ বছর বয়সে ১৭ বছর বয়সী গোপাল রাও যোশী'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ১২ বছর বয়সে মা হলেও সন্তানকে বাঁচাতে পারেননি। অন্যদিকে ক্রমাগত তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলেও পড়াশোনা চালিয়ে যান। তাঁর স্বামী ছিলেন একজন সংস্কারবাদী। গোপাল রাও এর ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা ও আমেরিকান মিশনারিদের সাথে তাঁর যোগযোগ আনন্দীবাঈ যোশীকে আমেরিকাতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। স্বামী ছাড়াও দুইজন প্রখ্যাত নারী তাঁর চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একজন ছিলেন নিউ জার্সির বি.এফ. কার্পেন্টার (B.F. Carpenter), অন্যজন হলেন মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কারক পণ্ডিত রামাবাই। তিনি তাঁকে সব ধরনের সামাজিক ও নৈতিক সমর্থন দেন। মিস কার্পেন্টার আনন্দবাঈকে আমেরিকা যাওয়ার জন্য আর্থিকভাবে সহায়তা করেন। ১৮৮৩ সালে ১৮ বছর বয়সে কলকাতা থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। একই বছরের অক্টোবর মাসে পেনসেলভিনিয়ার উইমেন মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন। ১৮৮৬ সালে ডিগ্রি লাভ করার পর বোম্বে প্রেসিডেন্সির কলাপুর রাজ্যের একজন নারী চিকিৎসকের পদ গ্রহণ করলেও যোগদানের পূর্বেই ১৮৮৭ সালে ২৯ ফেব্রুয়ারি মারা যান।

কলকাতা মেডিকেল কলেজে কাদম্বিনি বসু, বিধুমূখী বসু ও ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র এর ভর্তির মধ্য দিয়ে বাংলায় নারী চিকিৎসাশিক্ষার অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৮৮৭ সালের ৬ এপ্রিল স্যার আলফ্রেড ক্রফট সরকারের কাছে আরেকটি প্রস্তাব দেন। তিনি কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে নারীদের পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করার প্রস্তাব দেন, কেননা বিরাট বাংলা প্রদেশের জনগণের অর্ধেকেই নারী। এই নারীদের বেশির ভাগই গ্রামে বাস করে। তাদের শারীরিক সুস্থতার জন্য কোনো সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণ অসুখ ছাড়াও সন্তান প্রসবের সময় নানারকম জটিলতা হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা থাকা সত্ত্বেও তারা তা গ্রহণ করতে পারত না, কেননা চিকিৎসকদের বেশিরভাগই পুরুষ ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরুষ চিকিৎসকদের কাছ থেকে সেবা নেওয়াকে লজ্জাকর বলে মনে করত। অনেকের কাছে এটা সমাজ বিরোধী ছিল। এমন একটা ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে করে তারা ইউরোপীয় চিকিৎসাশিক্ষায় পারদর্শী এমন সব নারী চিকিৎসক তৈরি করা, যারা গ্রামে গিয়ে এই নারীদের সেবা করবে। তাই এই শ্রেণির নারী চিকিৎসক প্রত্যন্ত অঞ্চলের বড় বড় গ্রামগুলোতে একই রকম পরিবেশে এবং একই ধরনের জনগোষ্ঠীর মাঝে চিকিৎসা চালাবে। তাছাড়া কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা গ্রামে গিয়ে প্রাকটিস করবে না বলে ক্রফট উল্লেখ করেন। এই ভার্নাকুলার কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে নারীদের জন্য কিছু ছাড় দিতে বলা হয়। এগুলোর মধ্যে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলেদের জন্য যে ভর্তি নীতি রয়েছে তা নারীদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না। নারীদের শিক্ষাগত পশ্চাদপদতার কারণে যারা উচ্চ প্রাইমারি স্কলারশিপ পাশ করেছে বা স্কুলের শিক্ষক ও সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক আয়োজিত নিম্নবর্ণিত বিষয়ে গৃহীত ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করবে, তাদের ভর্তি করা হবে,

১. রামকৃষ্ণ মুখার্জির লেখা বাংলার ইতিহাস এর মানের মতো কোনো বাংলা বই পাঠ ও ব্যাখ্যা
২. কোনো একটি সহজ বাংলা বই থেকে শ্রুতিলিপি লিখন
৩. পাটিগণিত সহজ ভগ্নাংশ এবং সহজ ত্রৈরাশিক

উপরিউল্লিখিত বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে (ভর্তির বয়স, বৃত্তি, পাঠ্য বিষয়, লেকচার, ডাইসেকশন কক্ষ, হোস্টেল, হাসপাতাল উপস্থিতি, যাতায়াত, বিশেষ পুরস্কার) সুবিধাসহ স্যার আলফ্রেড ক্রফট ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ছাত্রীদের ভর্তি করার জন্য জেনারেল ডিপার্টমেন্টের কাছে অনুরোধ জানান।

এই ব্যাপারে লে. গভর্নর স্যার স্টুয়ার্ট বেইলি (Sir Stuart Bailey 1887-1890) বিশেষজ্ঞদের মতামত জানতে চান। কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাক্তার জে.এম. কোটস মন্তব্য করেন যে, দেশে হসপিটাল এসিস্ট্যান্ট পদমর্যাদার নারী চিকিৎসকের চাহিদা আছে। তাই ভার্নাকুলার মেডিকেল স্কুল থেকে হসপিটাল এসিস্ট্যান্ট হবার জন্য ছাত্রদের যেভাবে পড়ানো হয়, স্যার আলফ্রেড এর প্রস্তাব অনুযায়ী ছাত্রীদের সেভাবেই পড়ানো দরকার। তিনি ইতিমধ্যে অনেক জায়গা থেকে হসপিটাল এসিসট্যান্ট মানের চিকিৎসক পাঠানোর জন্য অনুরোধ পেয়েছেন। এই জাতীয় চিকিৎসক তৈরির প্রশিক্ষণ নেওয়ার মতো বহু নারী এই দেশে রয়েছে।[৩৭]

অপরদিকে দেশের সেরা সাতজন ডাক্তার সার্জনকে এই ব্যাপারে মত দিতে বলা হয়। তারা তাদের মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভক্ত। এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় গুরুত্ব পায়। প্রথমত, কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে এই শিক্ষা গ্রহণ করবে না, দ্বিতীয়ত, যদিও তারা গ্রহণ করে, তবে তারা কোনো চাকুরি বা কাজ পাবে না, তৃতীয়ত, তারা যদি প্রাইভেট প্রাকটিস করার সুযোগ পায় তাহলে তারা ভালোর চেয়ে ক্ষতিই বেশি করবে এবং এর ফলে নারীদেরকে চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ করার সুযোগ করে দেওয়ার যে আন্দোলন চলছে, তা ভীষণভাবে সমালোচিত হবে। মেডিকেল বিভাগের সচিব শিক্ষা বিভাগকে এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে বললে শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব পি. নোলান সবকিছু পর্যালোচনা করে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে একটি নোট দেন, যা ছিল ঐতিহাসিক। তিনি বলেন, ডাক্তাররা যে সমালোচনা করেছেন এবং প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দিয়েছেন তা তেমন শক্তিশালী নয়। এগুলো এক ধরনের পেশাভিত্তিক দোষগুণ যাচাই বা বিচার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া উঁচুমানের চিকিৎসাশিক্ষা কেবলমাত্র কলকাতা মেডিকেল কলেজে রয়েছে, যা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পড়ানো হয়। এই ইংরেজি ভাষার ওপর বাংলার হিন্দু ও মুসলমান নারীগণের তেমন দক্ষতা নেই। তাদের ভার্নাকুলার মেডিকেল স্কুলে পড়ার জন্য মতামত দেন। এদিকে সারা দেশে সরকার নারী চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। ইংরেজি ভাষায় নারীদের চিকিৎসক নিয়োগ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ফলে নোলানের মতো উচুঁ স্তরের কর্মকর্তার সাড়া পাওয়ায় স্যার ক্রফটের প্রস্তাবটি লে. গভর্নর স্যার স্টুয়ার্ট বেইলির মনে গভীর প্রভাব ফেলে। এর তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করেন এবং সরকারের পক্ষে কিছু করা যে জরুরি তা উপলব্ধি করেন। বেইলির অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা বিভাগ ১৮৮৭ সালের ১৮ নভেম্বর কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ছাত্রী ভর্তির প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। তবে তিনি ছাত্রীদের প্রাক-মেডিকেল শিক্ষাগত যোগ্যতা বা ভর্তি পরীক্ষা দুর্বল ও মান সম্পন্ন না হওয়ায় ভবিষ্যতে শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি পুনর্বিবেচনার করার শর্ত দেন। এ বছর (১৮৮৭) থেকেই এই মেডিকেল স্কুলে ছাত্রী ভর্তি আরম্ভ হয়। প্রথম বছর ১৪ জন ভর্তি হয়। এই স্কুল থেকে ছাত্রীরা মেডিসিন ও সার্জারিতে ভার্নাকুলার লাইসেন্সিয়েট ইন মেডিসিন এন্ড সার্জারি ডিগ্রি লাভ করে, যা কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা স্নাতকদের চেয়ে নিচুস্তরের ছিল। ১৮৯০ সাল নাগাদ সারা ভারতবর্ষে তথা মাদ্রাজ, কলকাতা, বোম্বে, আগ্রা, লাহোরে নারী চিকিৎসাশিক্ষার বিস্তার লাভ করে। ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ২৫ জন। তাদের মধ্যে ১২ জন প্রথম বর্ষের ছাত্রী, ৭ জন দ্বিতীয় বর্ষের, ৬ জন তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী।[৩৮] ১৮৯৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলার লে. গভর্নর স্যার চার্লস আলফ্রেড ইলিয়ট (Sir Charles Alfred Elliott 1835-1911) ভারতবর্ষের নারী চিকিৎসকের অভাবের বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।[৩৯]

পূর্ববাংলার নারীদের চিকিৎসাশিক্ষায় আগমন

ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ছাত্রী ভর্তি হওয়ার পাঁচ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও পূর্ববাংলার ঢাকা মেডিকেল স্কুলে কোনো ছাত্রী ভর্তি হয়নি। বিষয়টি কলকাতায় সরকারের উঁচু মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লে. গভর্নর স্যার চার্লস আলফ্রেড ইলিয়ট প্রকাশ্যেই কলকাতার টাউন হলে এই বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ১৮৭৫ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ ১৮ বছরে কোনো ছাত্রী ঢাকা মেডিকেল স্কুলে ভর্তি না হওয়ার পেছনে কোনো আইনগত বাধা না থাকলেও তৎকালীন পূর্ববাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি কাজ করে। ঢাকা তথা গোটা পূর্ববাংলায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময় পর্যন্ত নারী শিক্ষার প্রসার ছিল বেশ কম। ১৮৯১-৯২ সালে ঢাকা বিভাগে ২০% নারী লেখাপড়া করত (১৪,৯৩৫ জন)। ১৮৯৬-৯৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ২৩% (১৭,১৯৪ জন) হয়। প্রাইমারি পর্যন্ত পড়ানোকে খারাপ চোখে দেখা হতো না কিন্তু উচ্চ শিক্ষা নেওয়ার পক্ষে একটি সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কাজ করত। এ সময় মেয়েদের বিয়ে, পর্দাপ্রথা নারী শিক্ষার পথে প্রধান বাধা ছিল না, বরং স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, কুসংস্কার, আর্থিক অস্বচ্ছলতা নারী শিক্ষার অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা ছিল।[৪০]

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট সার্জন মেজর ডাক্তার কব ১৮৯৪ সালে ঢাকায় একটি ক্লাশ খোলার অনুমতির জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেন। তিনি তার আবেদনপত্রে জানান ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে যে ধরণের ব্যবস্থা, সুযোগসুবিধা, ভর্তি পরীক্ষা ইত্যাদি আছে তা ঢাকাতে অনুসরণ করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের একই সাথে ক্লাশ করানোর যে সমস্যা রয়েছে তা এড়ানো সম্ভব। ইতিমধ্যে লেডি ডাফরিন ফান্ডের অনুদানে ঢাকায় নারীদের জন্য একটি পৃথক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে এই হাসপাতালে মেয়েদের পৃথকভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং লেকচার থিয়েটার ও ডাইসেকটিং রুমে পর্দা দিয়ে ছাত্রীদেরকে আলাদা করা যাবে।[৪১] এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লে. গভর্নর স্যার ইলিয়ট ঢাকা মেডিকেল স্কুলে অবিলম্বে ছাত্রী ভর্তির সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। সরকারি নির্দেশ পাওয়ার পর ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত সকল আয়োজন শুরু হয়। তাদের নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মেট্রিক পাশ তার থেকেও অনেক নিচুমানের ছিল। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী তাদের ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং অবশেষে ৬ জনকে ভর্তি করা হয়। ১৮৯৫ সালের ২০ জুন ঢাকা মেডিকেল স্কুলে পূর্ববাংলার নারীদের জন্য প্রথম একটি আলাদা ক্লাস খোলা হয়। অনেকেই এতে খুশি হন, কিন্তু পূর্ববাংলার মুখপাত্র *ঢাকা প্রকাশ* বিষয়টিকে ব্যঙ্গাত্মক ও নেতিবাচকভাবে তুলে ধরেন।[৪২]

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের প্রথম দিকের ছাত্রীরা ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। নিজের বাড়ি থেকেই স্কুলে যাতায়াত করত। এরা বেশিরভাগ ইংরেজ কর্মকর্তাদের কন্যা, স্ত্রী ছিল। যথেষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও এই সকল ছাত্রী তাদের বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমের দ্বারা লেখাপড়া চালিয়ে যায়। ঢাকা বিষয়ক গবেষক, ইতিহাসবিদ শরীফউদ্দিন আহমেদ তাঁর *মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, 'তথ্যের অভাবে সঠিক করে না বলা গেলেও ১৯১০ সালে সর্বপ্রথম কোনো নারী ঢাকা মেডিকেল স্কুল থেকে ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করে লাইসেন্সিয়েট ডাক্তার বা হসপিটাল এসিস্ট্যান্ট ডিপ্লোমা পায়। এ বছর যে তিনজন মেয়ে পাশ করেন তারা হলেন মিস এগনেস ম্যাকবিন, মিসেস ডানিয়েল, এবং আলিকান্নেসা খাতুন।'[৪৩]

নিম্নে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের প্রথম দিকের ছাত্রীদের সংখ্যার একটি তালিকা,

বছর	–	মোট ছাত্রী
১৮৯৫-৯৬	–	৬ জন
১৮৯৬-৯৭	–	১০ জন
১৮৯৮-৯৯	–	৮ জন
১৯০৭-০৮	–	৮ জন
১৯০৯-১০	–	৮ জন
১৯১০-১১	–	৮ জন
১৯১১-১২	–	১১ জন
১৯১২-১৩	–	৮ জন
১৯১৩-১৪	–	৫ জন
১৯১৪-১৫	–	৫ জন
১৯১৫-১৬	–	৩ জন
১৯১৬-১৭	–	২ জন
১৯১৭-১৮	–	৭ জন
১৯১৮-১৯	–	৭ জন
১৯১৯-২০	–	১০ জন
১৯২১-২২	–	১৩ জন
১৯২২-২৩	–	১৪ জন
১৯২৪-২৫	–	১৬ জন
১৯২৫-২৬	–	১৭ জন
১৯৩২-৩৩	–	১১ জন
১৯৩৩-৩৪	–	১৬ জন

উৎস: শরীফ উদ্দিন আহমেদ: *মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল: ইতিহাস ও ঐতিহ্য* ১৮৫৮-১৯৪৭ পৃ. ৩০৯।

ঢাকা মেডিকেল স্কুল থেকে নারীদের চিকিৎসাশিক্ষায় পাশ এবং সমাজে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা বাড়েনি। এজন্য কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের দারিদ্রতাকে প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেন। তাই বৃত্তির সংখ্যা কমিয়ে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। এর ফলে ছাত্রী সংখ্যা অল্প করে হলেও বাড়তে থাকে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে অধ্যয়ন করার জন্য প্রয়োজন মেধা, ধৈর্য ও অর্থের। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পাঠদানের পরিধি ও মান বিস্তারিত ও কঠিন। অনেকের পক্ষে ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। নারীদের প্রাথমিক পড়ালেখার ভিত্তি ছিল দুর্বল ও সংক্ষিপ্ত। সার্বিকভাবে নারীরা নানারকম প্রতিবন্ধকতায় জর্জরিত। নারীরা এসব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সংখ্যায় কম হলেও এই নতুন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে এবং সমাজে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ধীরে ধীরে নারীদের চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাই ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্যায়ে চিকিৎসাশিক্ষায় নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তবে ঢাকা তথা পূর্ববাংলায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের একটা তুলনামূলক সংখ্যা পাওয়া গেলেও সমগ্র ভারতের ১৯০১-১৯০২ সালের একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। সে সময় সমগ্র ভারতের মেডিকেল কলেজে ১৪৬৬ জন শিক্ষার্থী এবং মেডিকেল স্কুলে ২৭২৭ জন শিক্ষার্থী ছিল। এর মধ্যে ২৪২ জন নারী। ৭৬ জন মেডিকেল কলেজে এবং ১৬৬ জন স্কুলে অধ্যয়ন করত।[৪৪] এই সংখ্যা অত্যন্ত কম। তথাপি পূর্বের তুলনায় এর হার ধীরে ধীরে

বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় সারা ভারতে নারী চিকিৎসাশিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে। ফলে এই পেশায় নারীদের আগমনও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শামশাদ এবং বশির আহমেদ ডাবলা (Shamshad and Bashir Ahmed Dabla) তাঁর 'A Sociological Prespective on Kashmiri Women in Medical Profession' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় নারীদের চিকিৎসা পেশায় আসার সুযোগ শুরু হয়। এই পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রধানত দুইটি কারণ ছিল,

প্রথমত, অভ্যন্তরীন দিক থেকে, রাজনৈতিক সচেতনতা, আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, সাংস্কৃতিক সচেতনতার বিস্তার, অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং বৃহত্তর সামাজিক জাগরণের কারণে সমাজে পরিবর্তন শুরু হয়। এগুলো এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাতে নারীরা সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে বিশেষত পরিবারের ভেতরে এবং বাইরে তাদের ভূমিকা ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা উপলব্ধি করে।

দ্বিতীয়ত, বহিরাগত দিক থেকে, নিউব্রিমাইজেশন (Neobremization) প্রক্রিয়ার ব্যাপক প্রভাব। যার দ্বারা মূলত ভারতীয় জনগণের ওপর বিদেশি সাংস্কৃতিক প্রভাব এবং অন্যান্য দেশের উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।[৪৫] অপরদিকে গবেষক মিতা ভদ্র তাঁর 'Indian Women in Medicine: An Enquiry Since 1880' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, পাশ্চাত্য প্রভাব ভারতীয় নারীদের পুরুষদের মতো উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে আসতে অনুপ্রাণিত করে। উচ্চ শ্রেণির নারীরা এই পরিবর্তনকে দ্রুত সাড়া দিলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নিম্নস্তরের নারীরা অনেক দেরিতে এই পরিবর্তনে সাড়া দেয়। নারীদের উত্থানের জন্য কেবল আধুনিকীকরণ, শিক্ষার উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে নতুন সামাজিক ভূমিকার উত্থান হয়নি বরং নতুন সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। ফলে তারা পড়াশোনা শুরু করে এবং পেশাগত ক্ষেত্রে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তারা ধীরে ধীরে বাড়ির বাইরের পেশাদার কাজে জড়িয়ে পড়ে। এটি তাদের উপলব্ধি করতে, দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রসারণ এবং নতুন পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করে। ফলে ধীরে ধীরে গৃহবধুর ঐতিহ্যগত ভূমিকা দ্বৈত রূপ পালন করে তথা একই সাথে সে পেশাদার কর্মজীবী স্ত্রী ও গৃহবধু। চিকিৎসা পেশার প্রতি ভারতীয় নারীদের আগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো ভারতীয় সমাজে এই পেশাকে সর্বদা মর্যাদাপূর্ণ পেশা বলে মনে করে।[৪৬] অথচ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেও নারীদের এই পেশা গ্রহণ করাকে ভালোভাবে নেওয়া হতো না। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ১৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে *175 years of Medical College Bengal* নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। উক্ত গ্রন্থ থেকে তৎকালীন সময়ের নারী চিকিৎসকদের জীবন সম্পর্কে জানা যায়। তখন একজন নারী চিকিৎসকের জীবন ছিল মিশনারি নান (Nun) এর মতো। মানুষের চিকিৎসা সেবায় জীবন উৎসর্গ করা হতো। সমাজ এই পেশা গ্রহণ করাকে অপছন্দ করত।[৪৭]

পূর্বে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের ইডেন হাসপাতালে ছাত্রদের সাথে লেবার কেস পরিচালনার অনুমতি ছিল না। ছাত্রীদের অন্য কোথাও যেতে হতো। দ্বিতীয় দশক থেকে কর্নেল গ্রিন আর্মিটেজ (Col. Green Armytage) এই ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেন এবং ইডেন হাসপাতালে একসাথে ছাত্রছাত্রীদের কাজ করার অনুমতি দেন। তাদের জন্য কোনো আলাদা কক্ষ ছিল না। কোনো জরুরি বা রাত্রিকালীন দায়িত্ব পালন করতে হতো না। নারী চিকিৎসকদের জন্য কোনো হাউজ স্টাফশিপের সুযোগ ছিল না। চল্লিশের দশকে হাসপাতালে ছাত্রীদের রাত্রিকালীন দায়িত্ব (Night duty) পালন করতে হতো। এ সময় তাদের জন্য রাতে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা ছিল। কোনো ছাত্রীকে একা হাসপাতালে রাত্রিকালীন দায়িত্ব পালন করার অনুমতি ছিল না। পরবর্তীতে একে

অপরকে সাহায্য করার জন্য তাদেরকে প্রতি সপ্তাহে তিনদিন রাত্রিকালীন দায়িত্ব পালন করতে হতো। পরবর্তীতে সার্জারি ও গাইনোকোলজিতে কাজ করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। সবাই একসাথে আন্তরিকতার সাথে কাজ করত। কলকাতা মেডিকেল কলেজে ১৯২৫-৩১ সাল পর্যন্ত ৬টি আসন, ১৯৪০-৪৫ সাল পর্যন্ত ৫টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ ছিল। ১৯৪৫-৫০ সালে কোনো আসন সংরক্ষণ করা হয়নি। এ সময় (১৯৪৫) ১০০ জন ছাত্রের মধ্যে ১০ জন মনোনীত ছাত্রী ছিল।[৪৮]

১৯৪৬ সালে সমগ্র ভারতে এম.বি.বি.এস বা গ্রাজুয়েট নারী ডাক্তার এবং লাইসেন্সিয়েট ডাক্তারের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে জানা না গেলেও ধারণা করা হয় যে, সর্বোচ্চ ৪০০০ এর বেশি ছিল না। এর মধ্যে প্রায় ১০০০ পাবলিক সার্ভিসে নিযুক্ত ছিল। এক হাজার বিভিন্ন কারণে প্রাকটিস করত না। ধারণা করা হয় যে, বাকি ২০০০ প্রাকটিস করত।[৪৯] এদের বেশিরভাগই বড় বড় শহরে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রাকটিস করত। যেখানে নারী ও শিশুদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য শহরগুলোতে নারী চিকিৎসকের সংখ্যা পর্যাপ্ত ছিল না, সেখানে গ্রামের অবস্থা ছিল আরো খারাপ। এ সময় জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে। যার উদ্দেশ্য হলো প্রসুতি ও শিশু কল্যাণ সংস্থাগুলোকে চিকিৎসা সেবা সরবরাহ করা। স্বাস্থ্য প্রশাসনের এই শাখায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ৬ জন মেডিকেল গ্রাজুয়েট এবং প্রায় ৫০ অথবা ৬০ জন লাইসেন্সিয়েট।[৫০] আরো আটজন গ্রাজুয়েট ১৯৪৬ সালের এপ্রিলের মধ্যে তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করার কথা বলা হয়। লাইসেন্সিয়েটরা সাধারণত এই বিষয়ে ছোটখাট কোর্স করে কিন্তু নারী গ্রাজুয়েটদের ডিপ্লোমার জন্য সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ নিতে হয়।

নারীদের প্রসবকালীন, গর্ভাবস্থা এবং সন্তান জন্মদানের পরে মা ও শিশুর যত্নের যথাযথ অগ্রগতির জন্য প্রসুতি ও শিশুকল্যান সংস্থাগুলোতে পর্যাপ্ত নারী চিকিৎসক নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সময় (১৯৪৬) সার্বিকভাবে দেশে শিশুকল্যাণ ও প্রসুতি ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল। তাই ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ভোর কমিটি' মা ও শিশুকল্যাণমূলক কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দেয়, কেননা ভারতে মোট মৃত্যুর অর্ধেক ছিল ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের। অথচ সে সময়ে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে মৃত্যুর হার অত্যন্ত কম ছিল। কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ ভারতে ৪৮.৫% এবং ইংল্যান্ডে ১০% ছিল।[৫১] অন্যদিকে গর্ভাবস্থা ও সন্তান প্রসবের সময়ে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল প্রতিবছর প্রায় ২০০,০০০ লক্ষ এবং একই কারণে প্রায় ৪ মিলিয়ন নারী নানা ধরনের শারীরিক সমস্যায় ভুগত।[৫২] এ সময় মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার অনেক বেশি ছিল। প্রতিবছর সন্তান জন্মের পর প্রথম মাসে শিশুমৃত্যুর হার ছিল ৪৫-৫০%।[৫৩] নারী চিকিৎসক ও দক্ষ ধাত্রীর অভাবে মাতৃমৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশি। অন্যদিকে শিশু মৃত্যুর অন্যতম আরেকটি কারণ অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন আঁতুর ঘর। বাংলার ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে দেখা যায়, শতকরা ১১ জন শিশু প্রসবের ৬ দিনের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর আঁতুর ঘরে মারা যেত। আধুনিক চিকিৎসার অভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণ দেশের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী প্রসুতি মাকে এই ঘরে রাখত। ঘরটি অন্য সকল কাজের জন্য অনুপযুক্ত। মাত্র একটি দরজা বিশিষ্ট, আলো, বাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে মেঝে, ধোয়ায় ভরা, ধুলোবালি যুক্ত ছেড়া মাদুর, নোংরা কাঁথা, কাপড় এবং আবর্জনাপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র ঘর হলো এই আঁতুর ঘর। প্রতি বছর এই অস্বাস্থ্যকর ঘরের কারণে লাখ লাখ শিশু মারা যেত।[৫৪]

সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, কুসংস্কার ও নারী চিকিৎসকের অভাবে এই সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করে। তাই জনসংখ্যার এই অংশটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। কমিটি প্রচার করে যে, ভারতে মা ও শিশু কল্যাণমূলক আন্দোলন

শুরু হয় দেশীয় 'দাই' (dai) দের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার উদ্যোগের মধ্য দিয়ে। কমিটি আরো উল্লেখ করে যে, ১৮৬৬ সালের শুরুর দিকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করে 'দ্য চার্চ অব ইংল্যান্ড জেনানা মিশন' এর মিস হিউলেট। এ ছাড়া ১৮৮৫ সালের ডাফরিন ফান্ড, ১৯১৮ সালে দিল্লিতে 'দ্য লেডি রিডিং হেলথ স্কুল', ১৯১৯ সালে 'দ্য লেডি চ্যামসফোর্ড অল ইন্ডিয়া লীগ', ১৯৩০ সালে ভারতীয় রেডক্রোস সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় 'মেটারনিটি এন্ড চাইল্ড ওয়েলফার ব্যুরো' প্রতিষ্ঠা, ১৯৩৩ সালে 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এন্ড পাবলিক হেলথ' এই নারী চিকিৎসকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের একটাই উদ্দেশ্য ভারতের মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও নারী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।[৫৫] এই প্রতিষ্ঠানগুলো মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও তা সমগ্র ভারতের জন্য যথেষ্ট ছিল না। ফলে এই কমিটি সমগ্র ভারতবর্ষের জনস্বাস্থ্য ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে, তার মধ্যে মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নারী চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধিও অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল। তাই এই কমিটির প্রস্তাব ছিল,

> Our proposals to expand this important service as part of the future health programme will necessitate the training of large numbers of women as doctors as well as their specialisation, later, in this branch of health work.[৫৬]

এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য ভোর কমিটি সমগ্র ভারতবর্ষে নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল স্কুলগুলোকে কলেজে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়। যাতে প্রত্যেক অঞ্চলের জনসাধারণ উন্নত চিকিৎসা সেবা পেতে পারে যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, তেমনি নারী চিকিৎসকের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে। ফলে এসব মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা নারী চিকিৎসকরা উন্নত সেবা/চিকিৎসা দিতে তৎপর হয়। এ সময় নারীদের চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণে কোনো সামাজিক বিধি নিষেধ বা আইন ছিল না, বরং নারী পুরুষ উভয়ই সমান যোগ্যতা নিয়ে এই মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ পায়। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে নারী পুরুষ একসাথে এই শিক্ষা গ্রহণে কোনো আপত্তি ছিল না।

ঢাকা মেডিকেল কলেজে নারী শিক্ষার্থীদের আগমন

প্রথম দিকে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার, ব্যবসা-বাণিজ্য, খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তকরণ ও সামরিক সম্প্রসারণের উদ্দেশ্য নিয়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও চিকিৎসাশিক্ষা প্রবর্তন হলেও পরবর্তীতে তাদের মধ্যে মানবিকতা লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রভাবেই নারী শিক্ষা ও নারী স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ঘটে। ঔপনিবেশিক সরকার ভারতের নারীদের পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষায় পারদর্শী হওয়ার জন্য নানারকম সুযোগসুবিধা প্রদানে আগ্রহী হয়। সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নারী চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে স্যার জোসেফ উইলিয়াম ভোর এর সভাপতিত্বে ১৯৪৩ সালে গঠিত 'হেলথ সার্ভে এন্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি' অথবা 'ভোর কমিটি' নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং পুরানো মেডিকেল স্কুলগুলোকে কলেজে রুপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২৫ সদস্য বিশিষ্ট এই কিমিটিতে তিন জন নারী চিকিৎসক (লে. কর্নেল এইচ.এম. লাজারাস, এফ.আর.সি.এস., আই.এম.এস., চিফ মেডিকেল অফিসার, উইমেন মেডিকেল সার্ভিস, ডা. ডি.জে. দাদাভয়, এম.ডি., এফ.আর.সি.পি., প্রেসিডেন্ট, অল ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন অব মেডিকেল উইমেন, বোম্বে, কে. সুফি তায়াবজি, জে.পি., কে.আই.এইচ.) ছিলেন [*পরিশিষ্ট দেখুন*-৭]।

ঔপনিবেশিক সরকার যখন এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে তখন তাদের ক্ষমতা ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে এই পরিকল্পনা করেনি বরং তারা চলে গেলেও তাদের প্রভাব যাতে বিদ্যমান থাকে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ মুহূর্তে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মানবিকতা কাজ করেছিল। তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও পর্দাপ্রথায় আবদ্ধ ভারতীয় নারীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, কারণ আধুনিক শিক্ষার ওপর জনসাধারণের স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার উন্নয়ন নির্ভরশীল। এই শিক্ষার প্রভাবেই ভারতীয় নারীরা পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এই কমিটি সাধারণ শিক্ষার সীমাবদ্ধতা ও স্বাস্থ্যশিক্ষার মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য তুলে ধরে। সাধারণ শিক্ষা ব্যক্তিকে সুনাগরিক হতে দায়িত্ববোধের জ্ঞান দেয়। অন্যদিকে চিকিৎসাশিক্ষা নাগরিককে সুস্থাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের নীতিমালা হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে থাকে।[৫৭] ফুকোর 'জ্ঞান ও ক্ষমতা' অনুসারে ভারতের নারীরা পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞান দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। কালক্রমে এটা পূর্ববাংলার নারীদের ওপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ববাংলায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে নারীদের ভর্তির ব্যাপারে কোনো বিধি নিষেধ ছিল না, বরং নারী চিকিৎসাশিক্ষাকে উৎসাহিত করা ও নারীদের সুযোগ দেওয়ার জন্য ১০টি আসন সংরক্ষণ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষা ও আই.এসসির প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ভর্তি করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৪৬-১৯৪৭ শিক্ষাবর্ষে মোট ১০১ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। যাদের মধ্যে ২জন ছিলেন নারী শিক্ষার্থী, তবে তারা কেউই পূর্ববাংলার ছিলেন না। এর প্রধান কারণ পূর্ববাংলায় তখন কোনো যোগ্য ছাত্রী পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে তাদের এই আসনগুলোতে ছাত্রদের ভর্তি করা হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর উল্লিখিত দুই নারী শিক্ষার্থী ভারত চলে যান।

বিংশ শতাব্দীতেও নারীদের কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল, কিন্তু তা উনবিংশ শতাব্দীর মতো নয়। এ সময় পূর্ববাংলার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর নারীরা পর্দা মেনে চললেও শিক্ষার জন্য ঘরের বাইরে যেত এবং তা পরিবার থেকে মেনে নেওয়া হতো। ফলে নারীরা পর্দার মধ্য থেকে বাইরে আসতে পারত, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় যেতে পারত, মিছিলে ও মানবসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারত। ফলে তাদের মধ্য থেকে চিকিৎসক, শিক্ষক, আইনজীবী এবং লেখক এর মতো সম্মানজনক পেশা গ্রহণ করত। অধ্যাপক সোনিয়া নিশাত আমিন *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন ১৮৭৬-১৯৩৯ গ্রন্থে* কলকাতা ও ঢাকা শহরের নারীদের পারিবারিক, শিক্ষাগত এবং সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। তার মতে, ১৯৪০ সালের আগে ভদ্রমহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল না। নারীদের শিক্ষাগ্রহণ তখন চাকুরি পাবার কোনো উপায় বলে বিবেচিত হতো না। ১৯২৩-৪০ সালের মধ্যেই বাঙালি মুসলিম নারীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।[৫৮]

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরে পূর্ববাংলার প্রথম মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজে যেসব নারী শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, তাদের বেশিরভাগই পূর্ববাংলার মুসলিম নারী। অন্যান্য সম্প্রদায় (হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ) তুলনামূলক কম ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে ছাত্রীদের শ্রেণিবিন্যাসকৃত নিম্নের তালিকা থেকে বিষয়টি বোঝা যায়,

শ্রেণিবিন্যাস	মোট অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী	
১৯৪৭-৪৮	পুরুষ	নারী
ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	নাই	নাই
ভারতীয় খ্রিস্টান	১	নাই
হিন্দু	৬৮	নাই
মুসলিম	২৪০	১
অন্যান্য	নাই	নাই
মোট	৩০৯	১
১৯৪৮-৪৯		
ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	নাই	নাই
ভারতীয় খ্রিস্টান	১	১
হিন্দু	২	১
মুসলিম	৩৯৯	৭
অন্যান্য	নাই	নাই
মোট	৪০২	৯
১৯৪৯-৫০		
ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	নাই	নাই
ভারতীয় খ্রিস্টান	১	নাই
হিন্দু	২	১
মুসলিম	৪৮৭	৮
অন্যান্য	নাই	নাই
মোট	৪৯০	৯
১৯৫০-৫১		
ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	নাই	নাই
ভারতীয় খ্রিস্টান	১	নাই
হিন্দু	৫	১
মুসলিম	৫৭২	১৫
অন্যান্য	নাই	নাই
মোট	৫৭৮	১৬
১৯৫১-৫২		
ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	নাই	নাই
ভারতীয় খ্রিস্টান	১	নাই
হিন্দু	৭	১
মুসলিম	৬৭২	১৮
অন্যান্য	নাই	নাই
মোট	৬৮০	১৯

উৎস : *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1946*-1952, p. 148.

উপরের তালিকা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কম হলেও অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম নারী। উপস্থিতির ভিত্তিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের নিম্নের তালিকাটি পাওয়া যায়,

সাধারণ শিক্ষার্থী		পূর্ব বছরের শিক্ষার্থী	ভর্তিকৃত বছর	পুনরায় ভর্তি	অন্যান্য মেডিকেল কলেজ থেকে আসা শিক্ষার্থী	
					মোট	মোট
১৯৪৭-৪৮	পুরুষ	১০৪	১৬৫	,,	৪০	৩০৯
	মহিলা	,,	,,	,,	১	১
১৯৪৮-৪৯	পুরুষ	২৪০	১৫৪		৮	৪০২
	মহিলা	১	৭	,,	,,	৮
১৯৪৯-৫০	পুরুষ	৩৫০	১২৩	,,	৭	৪৯০
	মহিলা	৪	৪	,,	১	৯
১৯৫০-৫১	পুরুষ	৪৫১	১২৭	,,	,,	৫৭৮
	মহিলা	৯	৭	,,	,,	১৬
১৯৫১-৫২	পুরুষ	৫৪৭	১৩৩	,,	,,	৬৮০
	মহিলা	১৪	৫	,,	,,	১৯

উৎস : *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1946-1952, p. 149.

উপরের তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজে ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত মোট নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯ জন। ১৯৪৭-৪৮ শিক্ষাবর্ষে তথা ২য় ব্যাচে পূর্ববাংলার কোনো নারী শিক্ষার্থী ভর্তি না হলেও দেশ বিভাগের পর কলকাতা মেডিকেল কলেজের নদীয়া জেলার শামসুন নাহার ঢাকা মেডিকেল কলেজে চলে আসেন।[৫৯] সরকারি নথিতে প্রাপ্ত একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে, ১৯৫১ সালে এই ১৯ জন ছাত্রী ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের মাধ্যমে সার্জন জেনারেলের কাছে হাসপাতালে ছাত্রীদের জন্য আলাদা কেবিনের ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন করেন *[পরিশিষ্ট দেখুন-৪২]*।[৬০] কলকাতা মেডিকেল কলেজে অসুস্থ ছাত্রীদের জন্য কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আলাদা কেবিনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ রকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না। যখন কোনো ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ত তখন তাঁকে অনেক সমস্যায় পড়তে হতো। সঠিক চিকিৎসা পাওয়ার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দ্বিতীয় তলায় সংযুক্ত বাথরুমসহ ভালোভাবে সজ্জিত দুই সিটের একটি কেবিন দেওয়ার জন্য সার্জন জেনারেলকে জানান। অন্যদিকে কলেজের প্রিন্সিপাল টি.এ. আহমেদ (১৯৪৮-১৯৫২) প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় অধিক আসন বিশিষ্ট একটি কেবিন করার জন্য প্রস্তাব করেন। ১৯৫২ সালে প্রিন্সিপাল এফ.ডব্লিউ. এলিনসন (F.W. Allinson) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন।[৬১] একই বছর এই ব্যাপারে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল কর্তৃক একটা নোটস-অব-অর্ডার (Notes of order) এ মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মতো ছাত্রীদের জন্য হাসপাতালে আলাদা কেবিনের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়,

> It is now proposed to allow the lady students of the Dacca Medical College the same facilities for their treatment in a separate room with 4 beds in the Dacca Medical College Hospital.[৬২]

১৯৫৩ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট এর দেওয়া এক চিঠি থেকে সহজে বোঝা যায় যে, মেডিকেল কলেজের অসুস্থ ছাত্রীদের জন্য পৃথক কেবিন থাকাটা জরুরি ছিল। এ সময় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কোনো কক্ষকে দুই সিট বিশিষ্ট কেবিনে রূপান্তর করা সম্ভব ছিল না।

প্রতিবছর অসুস্থ ছাত্রীদের জন্য একটি কক্ষকে কেবিনে রূপান্তরের চাহিদা বেড়েই চলছিল। তাই এটা বাস্তবায়নের জন্য নিম্নের আর্থিক খরচের একটা হিসাব দেখানো হয়,[৬৩]

দ্বিতীয় তলায় কেবিন
ডায়েট চার্জসহ কেবিন ভাড়া
১২ রুপি দিনপ্রতি- ১২ × ১২ × ৩০ = ৪৩২০ রুপি
নীচের তলায় কেবিন
৮ রুপি দিনপ্রতি- ৮ × ১২ × ৩০ = ২৮৮০ রুপি

ইতিমধ্যে ১৯৫২ সালে প্রথম তলায় অসুস্থ নার্সদের জন্য অপারেশন থিয়েটারের বিপরীতে বড় একটি কক্ষে কেবিনের ব্যবস্থা থাকলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের জন্য কোনো কেবিনের ব্যবস্থা ছিল না। নার্সদের কক্ষে এক দুইজন ছাত্রীর ভালোভাবে থাকার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তারা তাদের (নার্স) সাথে থাকতে পছন্দ করত না। অন্যদিকে সাধারণ ওয়ার্ডগুলোতে বহির্রোগীদের সাথে তাদের ভর্তি করাটা সমীচীন ছিল না। এই ওয়ার্ডগুলোতে প্রচুর ভিড় ছিল। উপরন্তু ছাত্রীরা পছন্দ করত না। তাই এই বিষয়গুলো অবহিত করে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট সার্জন জেনারেলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের শুরুর দিকে ছেলেদের জন্য যেমন হোস্টেলের ব্যবস্থা ছিল না, তেমনি মেয়েদের জন্যও কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রীরা বেশিরভাগ আত্মীয়স্বজনের বাসায় থেকে পড়াশোনা করত। কেউ কেউ নার্সেস কোয়ার্টারে থাকত। উদাহরণস্বরূপ ১৯৪৭ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে মাইগ্রেশন করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রী শামসুন নাহার নার্সেস কোয়ার্টারে থাকতেন।[৬৪] পরবর্তীতে ছাত্রীদের জন্য আলাদা হোস্টেল নির্মাণ করে এই সমস্যা সমাধান করা হয়, যা পূর্বের একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরিউল্লিখিত উপস্থিতির ভিত্তিতে ১৯৪৮-১৯৪৯ শিক্ষাবর্ষের নারী শিক্ষার্থীদের নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতার নিম্নের তালিকাটি পাওয়া যায়, [৬৫]

নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদমর্যাদা ও ঠিকানা
ডা. শায়লা আহমেদ,		চক্ষু বিশেষজ্ঞ, আমেরিকা
ডা. সুফিয়া খাতুন	এম.আর.সি.ও.জি. এফ.আর.সি.ও.জি. এফ.সি.পি.এস.	অধ্যাপক, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ এম. এস. এম. সি, মিটফোর্ড হাসপাতাল, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ঠিকানা: বনানী, ঢাকা
ডা. আকতার ইকবাল বেগম	এম.পি.এইচ. (ইউ.এস.এ.)	জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ যুগ্ম সচিব (স্বাস্থ্য) (অবসর) ধানমন্ডি, ঢাকা
ডা. সৈয়দা ফিরোজা বেগম (মৃত)		স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা।
ডা. জুবায়দা খাতুন		স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, কনসালটেন্ট গাইনোকোলজিস্ট, রাজশাহী
ডা. মোনোয়ারা বিনতে রহমান (মৃত)		ডি.জি. স্বাস্থ্য সেবা, বাংলাদেশ
ডা. রওশন আরা খাতুন		
ডা. অনিমা দত্ত।		

১৯৪৯-৫০ সালে মোট নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা নয়জন। তারমধ্যে ১ জন অন্য মেডিকেল কলেজ (নাম জানা যায়নি) থেকে এসে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। ভর্তিকৃত বছরের ৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন শিক্ষার্থীর নাম পাওয়া যায়। তিনি হলেন সুরাইয়া খাতুন।[৬৬]

১৯৫০-৫১ সালে ১৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭ জন ছিল ভর্তিকৃত বছরের। এদের মধ্যে ৩ জনের নাম নিম্নের তালিকায় পাওয়া যায়,[৬৭]

নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদমর্যাদা ও ঠিকানা
১. ডা. মালেকা খাতুন (মৃত)	ডি.সি.এম., এম.আর.সি.পি.	শিশু বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক ঢাকা মেডিকেল কলেজ।
২. ডা. রওনক আরা খাতুন		(আমেরিকা)
৩. ডা. শাহজাদী বেগম		ইউ. কে.

অনুরূপভাবে ১৯৫১-৫২ সালে মোট ১৯ জন নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভর্তিকৃত বছরে ৫ জন নারী শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। তার মধ্যে ২ জনের নাম নিম্নের তালিকায় পাওয়া যায়, [৬৮]

নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদমর্যাদা ও ঠিকানা
১. ডা. আফজালুন্নেসা (মৃত)	ডিপ্লোমা ইন অ্যানাসথিসিয়া	অ্যানাসথিসিওলজি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, আই.পি.জি.এম.এন্ড.আর. শাহবাগ, ঢাকা
২. ডা. হোসনে আরা		

দেশ বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজের নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তখন আর কাউকে উন্নতর চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণের জন্য কলকাতা বা ভারতের অন্যান্য মেডিকেল কলেজে পড়তে যেতে হতো না। দেশ বিভাগ পূর্ববাংলার নারীদের জন্য চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি আরো সহজ করে তোলে। পূর্ববাংলা থেকে কলকাতা অনেক দূরে হওয়ায় এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজে মাত্র ৬টি আসন এই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীর জন্য সংরক্ষণ করায় সবার পক্ষে কলকাতা গিয়ে চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। নারীদের ক্ষেত্রে তা প্রায় অসম্ভব ছিল। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা থাকায় অভিভাবকগণও তাদের কন্যাসন্তানদের দূরে পাঠাতে অনিচ্ছুক ছিল। উপরন্তু বিজ্ঞান নিয়ে পাশ করা নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল তুলনামূলক কম। ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নারীদের চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারটি তাদের দ্বারে পৌঁছে যায়। এর ফলে ধীরে ধীরে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতীতে পূর্ববাংলা ও আসামকে যখন নতুন প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয় তখন নারী শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। ১৯০৭-১৯১২ সালের শিক্ষা রিপোর্টে বলা হয়, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার।[৬৯] ঢাকা মেডিকেল কলেজে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে আরেকটি কারণ হলো সহশিক্ষা। সহশিক্ষায় কলেজ কর্তৃপক্ষের কোনো আপত্তি ছিল না। ক্লাশগুলো একসাথে হতো। ক্লাশে কোনো পর্দার ব্যবস্থা ছিল না। সহশিক্ষা বিদ্যমান থাকায় ছাত্রছাত্রী ক্লাশে, করিডোর, রুম তথা যে কোনো জায়গায় কথা বলতে পারত। অথচ পূর্ববাংলার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন সময়ে তা সম্ভব ছিল না। তখন কোনো ছাত্রকে ছাত্রীদের সাথে কথা বলতে হলে প্রক্টর এর অনুমতি নিতে হতো। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল না, তবে ছাত্রীরা আলাদা আসনে বসত। জাতীয় অধ্যাপক শাহলা খাতুন বলেন, ‘তারা সামনের দুইটা সিটে বসতেন। শিক্ষকগণ ক্লাশে প্রবেশ করার সময় ছাত্রীরা

প্রবেশ করত, আবার ক্লাশ শেষে শিক্ষকের পিছু পিছু বেরিয়ে আসতো। তাদের সময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রথমবারের মত ১২ জন ছাত্রী ভর্তি হয়। এই প্রথমবারের মতো এত ছাত্রী ভর্তি হয়। এটা নিয়ে চারদিকে হইচই পড়ে যায়। ১২ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জন এক চেষ্টাতে পরীক্ষায় পাশ করে। তখন একবার পরীক্ষা দিয়ে কম শিক্ষার্থীই পাশ করতেন।'[৭০] সহশিক্ষা বিষয়ে ১৯৫৯ ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র সারওয়ার আলী তাঁর *পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> মেডিকেল কলেজ ছিল আমাদের সবার জন্য প্রথম সহশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ছাত্রীরা দল বেঁধে ক্লাসে এসে প্রথম দুই সারিতে আসন নিত। মেডিকেল কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক বিরাজ করে।[৭১]

ঢাকা মেডিকেল কলেজে নারী পুরুষ একসাথে অধ্যয়নে কলেজ কর্তৃপক্ষের এবং তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের কোনো আপত্তি বা বিধি নিষেধ ছিল না। বিশেষ করে পূর্ববাংলার শিক্ষিত পরিবারগুলোতে কন্যাসন্তানের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে উদার মানসিকতা কাজ করেছিল, কারণ তারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তাছাড়া এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আরো অনেক মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই অন্যান্য মেডিকেল কলেজের নিয়মনীতি অনুসরণ করেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে কলকাতা মেডিকেল কলেজ শুরুতে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, তা যেন পূর্ববাংলার ঢাকা মেডিকেল কলেজে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, এই ব্যাপারে কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে যারা জড়িত ছিলেন তারা সর্তক ও সচেতন ছিলেন।

তৎকালীন সময়ে নারী শিক্ষার্থীরাও ছেলেদের মতো সমান যোগ্যতা নিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতো। নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে পূর্বের (মেট্রিক ও আই.এসসি.) শিক্ষাগত যোগ্যতার মান কমানোর কোনো নিয়ম ছিল না। কলকাতা মেডিকেল কলেজের শুরুর দিকে নারী শিক্ষার্থীরা ৫ বছরের কোর্সের জন্য এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই সরকারি বৃত্তি নিয়ে ভর্তি হতে পারত। এই কোর্স সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য সকলকে মাসিক বিশ টাকা হারে সরকারি বৃত্তি দেওয়া হয়। এ ছাড়া সরকারি জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি এবং বেসরকারি বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। এত সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেখা যায়, কলকাতা মেডিকেল কলেজের শুরুর দিকে তেমন কোনো ছাত্রী ভর্তি হয়নি। বিংশ শতাব্দীর ১৯৪০-১৯৫০ এর দশকেও নারীদের জন্য কিছু আসন বরাদ্দ ছিল। এ সময় একটি ক্লাশে প্রায় ২০ জন করে ছাত্রী ছিল। এ সময় পর্যন্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজে কোনো সিনিয়র নারী শিক্ষক ছিল না। পরবর্তীতে ডাক্তার অঞ্জলি মুখার্জী রেজিস্ট্রার এবং ডাক্তার বিমলা ভট্টাচার্য রেসিডেন্ট সার্জন ছিলেন। কোনো বিভাগে নারী ডেমনস্ট্রেটর ছিল না। ১৯৬০-৭০ এর দশকে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। সবাইকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। তবে জেলা, তপশিলি সম্প্রদায়, উপজাতি ও বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণ করা হয়।[৭২]

ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। নারী, তপশিলি, বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু আসন বরাদ্দ করা হলেও যোগ্য প্রার্থীকেই বাছাই করা হয়। আসন বরাদ্দ থাকলেও অযোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হতো না, বরং কোনো আসনে যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে তা অন্য যোগ্য প্রার্থী দিয়ে পূরণ করা হতো। এই দিক থেকে বলা যায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিয়মনীতি কলকাতা মেডিকেল কলেজের চেয়েও অনেক অগ্রসর ছিল। শুরুতেই কলকাতা মেডিকেল কলেজের অনেক ডাক্তারদের পরামর্শ ও নীতি অনুসরণ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫০ এর দশকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে যখনই কোনো জটিলতা সৃষ্টি হতো, তখনই তা বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মকানুন জেনে এবং তা

সমন্বয় করে সমাধান করার চেষ্টা করা হতো। উদাহরণস্বরূপ ঢাকা মেডিকেল কলেজে কোনো নারী শিক্ষার্থীর ভর্তির ক্ষেত্রে আই.এসসি.তে গণিত থাকা আবশ্যক কিনা তা জানার জন্য কোনো এক অভিভাবক সার্জন জেনারেলের কাছে আবেদন করেন। তখন বিষয়টি ভালোভাবে সমাধানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করেন। পরে তাদের সিদ্ধান্ত জেনে বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়। এই বিষয়ে পূর্বের অধ্যায়ে তথা তৃতীয় অধ্যায়ের ভর্তি প্রক্রিয়ার অংশে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যাপক শাহলা খাতুন বলেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে কখনও কখনও সামান্য মৌখিক পরীক্ষা হতো। সাধারণত আই.এসসি.'র বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন করা হতো এবং প্রাক-মেডিকেল পাশের ওপর ভিত্তি করে ভর্তি করা হতো। তবে যারা সাপ্লিমেন্টারি (অনিয়মিত পাশ) পাশ করত তারা লেজিসলেটিভ এসেম্বলির সদস্যদের (এম.এল.এ) নমিনেশন নিয়ে ভর্তি হতো। তিনি আরো বলেন, প্রথমদিকে মেয়েদের জন্য আসন বরাদ্দ থাকলেও পরবর্তীতে ১৯৫০-১৯৬০ এর দশকে আসন বরাদ্দ ছিল না। এ সময় মেয়েদের জন্য আলাদা কোনো বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল না। তবে মেধা বৃত্তি তথা ডি.পি.আই বৃত্তি আই.এসসি.তে ভালো ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হতো। গরিব মেধাবী ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে তা দেওয়া হতো।[৭৩] ফলে কোনো ছাত্রীর অর্থের অভাবে চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণ বন্ধ হয়ে যেত না।

চিকিৎসাশিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বিষয় হলো এনাটমি। এনাটমি বিষয়ে ভালোভাবে শিক্ষাগ্রহণ করতে হলে মৃতদেহ ডাইসেকশন (শব ব্যবচ্ছেদ) বাধ্যতামূলক। মৃতদেহ ডাইসেকশনের মাধ্যমে মানবশরীর সম্পর্কে জানা। বিশেষ করে মানবশরীরের শিরা, উপশিরা, ধমনী সম্পর্কে জানা যায়। তাছাড়া নারী পুরুষ উভয় শরীর সম্পর্কে ডাইসেকশনের মাধ্যমে জানা জরুরি। কলকাতা মেডিকেল কলেজের শুরুর দিকে মৃতদেহ ডাইসেকশনে নানারকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের একসাথে ডাইসেকশনে আপত্তি ছিল। তাই কলকাতা মেডিকেল কলেজে যখন নারীদের ভর্তির ব্যাপারে দাবি উত্থাপন করা হয়, তখন বলা হয়, তাদের জন্য যেন আলাদা ডাইসেকশন রুমের ব্যবস্থা থাকে, যা এই অধ্যায়ের প্রথমদিকে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যাপারে ঢাকা মেডিকেল কলেজে কোনো আপত্তি ছিল না, বরং একই মৃতদেহ ছাত্রছাত্রী উভয়ই একসাথে ডাইসেকশন করত। স্বাভাবিকভাবে পূর্ববাংলা নারীদের চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রসর ছিল। অথচ পূর্ববাংলা ভারতের অন্য যেকোনো প্রদেশের চেয়ে শিক্ষাদীক্ষা, উন্নত জীবনযাত্রা থেকে পিছিয়ে ছিল। উচ্চ চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হলে পূর্ববাংলার আধুনিক ও সুশিক্ষিত পরিবারের অভিবাবকরা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে তাদের কন্যা সন্তানদের এই শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহ দান করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে এই শিক্ষা ও পেশা অনেক বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর সুফল সম্পর্কে পূর্ববাংলার জনসাধারণ ইতিমধ্যে অবগত হয় এবং এই শিক্ষা ও পেশাকে অনেক বেশি সম্মানের মনে করা হয়, কারণ এর সাথে মানবসেবা জড়িত ছিল। অধ্যাপক শাহলা খাতুন বলেন,

> প্রথম দিন ডাইসেকশনের সময় একটু ভয় পাই। কারণ ছোট বেলা থেকে আমরা জানি এটা একটা পবিত্র জিনিস। তাই প্রথম দিন আমি রুমাল দিয়ে নাক চেপে ছিলাম। কিন্তু পেছন থেকে কেউ একজন এসে আমার রুমাল সরিয়ে ফেলেন। শিক্ষকরা জানেন একজন শিক্ষার্থী এ রকম অবস্থার সম্মুখীন হবেন। তাই তারা শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক করতেন এবং বোঝাতেন। ফলে আস্তে আস্তে বিষয়টি আমার কাছে স্বাভাবিক হয়ে যায়। পরবর্তীতে আমরা হাসিঠাট্টা বা আগ্রহের সাথে ডাইসেকশন করতাম। এই কাজটি আমাদের তিন বছর করতে হতো।[৭৪]

বিংশ শতাব্দীতে সামাজিক নানা প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায় এবং সমাজ আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যায়। তাই ঢাকা মেডিকেল কলেজের নারী শিক্ষার্থীগণ কলকাতা মেডিকেল কলেজের নারী শিক্ষার্থীদের মতো বাধার সম্মুখীন হননি। পরবর্তীতে কলকাতা মেডিকেল কলেজেও এই প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীদের মেডিকেল কলেজে ভর্তির ব্যাপারে বিধি নিষেধ উঠে যায়। ফলে উভয় মেডিকেল কলেজে ধীরে ধীরে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, যা ভর্তিকৃত নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা থেকে বিষয়টি বোঝা যায়। বিশেষ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ১৯৫২-৫৩ শিক্ষাবর্ষে ৭ জন, ১৯৫৩-৫৪ শিক্ষাবর্ষে ১০ জন, ১৯৫৪-৫৫ শিক্ষাবর্ষে ৯ জন, ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে ৯ জন, ১৯৫৬-৫৭ শিক্ষাবর্ষে ১২ জন, ১৯৫৭-৫৮ শিক্ষাবর্ষে ২০ জন, ১৯৫৮-৫৯ শিক্ষাবর্ষে ১২ জন, ১৯৫৯-৬০ শিক্ষাবর্ষে ১২ জন নারী শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।[৭৫] ***[পরিশিষ্ট দেখুন-৪৩]***

ভোর কমিটির ভারত উপমহাদেশে নারী চিকিৎসাশিক্ষার বিস্তার ও চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম উদ্দেশ্যে ছিল মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা করা। পরবর্তীতে দেখা যায় নারী চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও গাইনোকোলজিস্টের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। ঢাকা মেডিকেল কলেজের নারী চিকিৎসকগণের সবাই গাইনোকোলজিস্ট ছিলেন না। কেউ অ্যানাসথিসিওলজিস্ট, কেউ ফিজিওলজিস্ট, কেউ রেডিওলজিস্ট, কেউ নেফ্রোলজি, কেউ সাইক্রিয়াট্রিক ছিলেন। ১৯৫০ এর দশকে বেশিরভাগ নারী চিকিৎসকগণ প্রাইভেট প্রাকটিস করতে আগ্রহী ছিল। চাকুরি করতে অনিচ্ছুক ছিল। এর প্রধান কারণ চিকিৎসা পেশা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণির চাকুরি। সাধারণত চাকুরির ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ নিয়মের মধ্যে কাজ করতে হয় কিন্তু প্রাইভেট প্রাকটিসের ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করা যায়। অধ্যাপক শাহলা খাতুন বলেন, 'তখন ডাক্তারি পেশা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণির। তার পরিবারের সবাই প্রথম শ্রেণির চাকুরি করতেন। তাই তাঁর পরিবার আপত্তি জানালেও তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হবেন। সরকারি চাকুরি ছাড়া তা সম্ভব না। তিনি আরও উল্লেখ করেন, সে সময় ইংল্যান্ডের মতো দেশেও বেশিরভাগ গাইনোকোলজিস্ট পুরুষ ছিলেন। বর্তমানে কেউ গাইনোকোলজিস্ট না হওয়ার অন্যতম কারণ এই পেশায় কষ্ট বেশি। একজন ডাক্তারকে রাত-দিন ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করতে হয়। যা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না। বাংলাদেশের মতো একই অবস্থা ইংল্যান্ড, আমেরিকাতেও বিরাজ করছে'।[৭৬]

তৎকালীন সময়ে নারী চিকিৎসক কম থাকায় কেউ কেউ গাইনোকোলজিস্ট হতো। পুরুষ চিকিৎসকগণ এটা ভালো পারত না। নারী রোগীরা তাদের কাছে খোলামেলাভাবে সবকিছু বলতে পারতেন না। ফলে পুরুষ চিকিৎসকের পক্ষে ভালো চিকিৎসা করা সম্ভব হতো না। বিশেষ করে একজন নারী রোগীর অভ্যন্তরীন পরীক্ষা নিরীক্ষায় সমস্যা হতো। নারী চিকিৎসকের কাছে যত সহজে তাদের (নারী রোগী) সমস্যাগুলো বলতে পারতেন, পুরুষ চিকিৎসকের কাছে তা বলতে পারতেন না। তাছাড়া ১৯৪০-৫০ এর দশকে উন্নত যন্ত্রপাতিও পর্যাপ্ত ছিল না। যেমন, ল্যাপারোস্কপ, আলট্রাসোনোগ্রাফ ইত্যাদি। ফলে একজন পুরুষ চিকিৎসকের পক্ষে একজন নারী রোগীর গর্ভকালীন সূক্ষ্ম সমস্যাগুলোর চিকিৎসা করা সম্ভব হতো না। অধ্যাপক শাহলা খাতুন বলেন, 'তার এক সিনিয়র কলিগ ভালো গাইনোকোলজিস্ট হওয়া সত্ত্বে Internal Examination করতে পারেননি। এটা নিয়ে তাঁর অনেক আফসোস ছিল।'[৭৭]

নানারকম সমস্যার কারণে অনেকেই গাইনোকলজিস্ট হতেন না। বিশেষ করে রাত-দিন ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করতে হতো বলে অনেকেই গাইনোকোলজিস্ট হতে চাইতেন না। চিকিৎসা পেশার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, প্যাথলজি, রেডিওলজি, সাইক্রিয়াটিক ইত্যাদিতে তুলনামূলক কষ্ট কম ছিল কারণ

তাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করতে হতো। তবে কেউ কেউ নিজ উপলব্ধী থেকে গাইনোকোলজিস্ট হতেন। তৎকালীন সময়ে তথা ১৯৪০ এবং ১৯৫০ এর দশকে সন্তান প্রসবের সময় অথবা গর্ভকালীন মায়ের মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। তখন প্রচলিত ধারণা ছিল মা হয়েছে তো মরবেই।[৭৮] এই ধারণা বা বিশ্বাস কোনো কোনো নারী চিকিৎসকের মনকে নাড়া দেয়। ১৯৫০ এর দশকে প্রাক্তন ছাত্রী জাতীয় অধ্যাপক শাহলা খাতুন বলেন, 'তাঁর শখ ছিল সার্জারির। কিন্তু তিনি তাঁর বাবার উৎসাহেই গাইনোকোলজিস্ট হয়েছেন। তাঁর বাবা বলতেন, আমাদের দেশে ভালো নারী চিকিৎসকের অভাব। মেয়েরা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়।'[৭৯] তাই দেখা যায়, কখনও নিজ উপলব্ধি, কখনও পরিবারের ইচ্ছাতে চিকিৎসা পেশার স্বস্ব কাজে প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পরবর্তীতে তারাই বর্তমান বাংলাদেশের মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে ভূমিকা রাখছেন। প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে গিয়ে গর্ভকালীন মায়ের বিশেষ সেবা যত্ন ও আধুনিক চিকিৎসার ব্যাপারে সচেতন করে তুলছেন।

১৯৫০ এর দশকে অনেক নারীই গর্ভকালীন অবস্থায় ভালো চিকিৎসকের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যেত অথবা পর্যাপ্ত দায়িত্বশীল নারী চিকিৎসক না থাকায় তাদের প্রতি অনেক অবহেলা করা হতো, যা ১৯৫৬ সালের একজন প্রসুতির চিঠি থেকে বোঝা যায়। উক্ত চিঠি এতটাই মর্মস্পর্শী ছিল যে ইস্ট পাকিস্তান এসেম্বলিতে সম্মানীত সদস্য মোল্লা আবুল কালাম আজাদ উত্থাপন করেন।[৮০] অনুরূপভাবে ১৯৫৭ সালের *এসেম্বলি প্রসেডিংস* থেকে আরো জানা যায় যে, পাবনা জেলার সদর হাসপাতালে ৫/৬ মাস থেকে মহিলা চিকিৎসক নাই। সেখানে রোগী প্রসুতিদের খুব অসুবিধার মধ্য দিয়ে দিনগুলো অতিবাহিত হতো।[৮১] এ সময় সারা পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে ৪২টি মাতৃসদন ও শিশুকল্যান সংস্থা ছিল। এর বেশিরভাগই শহরে অবস্থিত ছিল।[৮২] প্রত্যন্ত গ্রামে বিশেষ করে প্রত্যেক মহকুমায় মাতৃসদন ছিল না। এর ফলে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরে এসে চিকিৎসা নেওয়া সবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার মাতৃসদন থাকলেও তার কার্যক্রম চালু ছিল না বা পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ছিল না। ফলে এই ধরনের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যেত। তাছাড়া সে সময় সমগ্র পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে মেডিকেল রেজিস্ট্রিকৃত ডাক্তারের সংখ্যা ৩,৩৯০ জন। তার মধ্যে ২,৬৪৫ লাইসেন্সিয়েট, ৭১৩ জন মেডিকেল গ্রাজুয়েট, ৩২ জন বিদেশি ডিগ্রিধারী ছিলেন।[৮৩] তার মধ্যে ২,১৩৯ জন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডাক্তার প্রত্যন্ত গ্রামে চিকিৎসা করত। এর পাশাপাশি বিনানিবন্ধিত ডাক্তাররাও প্রত্যন্ত গ্রামে চিকিৎসা করত। তখন প্রতি ১৪,০০০ লোকের জন্য ১ জন ডাক্তার ছিল।[৮৪] এই সংখ্যা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে স্নাতকধারী চিকিৎসকের মধ্যে নারী চিকিৎসকের অভাব ছিল। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার একমাত্র মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬৭ জন। সে সময়ে এক চেষ্টাতে এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় পাশ করা ছাত্রীদের সংখ্যাও কম ছিল। কারণ ১৯৫৬ সালে ১২ জন ছাত্রীর মধ্যে প্রথমবারে মাত্র ৪জন পাশ করে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৫৯ সালেও নারী চিকিৎসকের অভাব বিদ্যামন ছিল তা এম.এল.এ. রহিম উদ্দিন উল্লেখ করেন।[৮৫]

এসব অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে নারী চিকিৎসকের যথেষ্ট অভাব ছিল। ১৯৬০ এর দশকেও অনেক নারী শিক্ষার্থী ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় ***[পরিশিষ্ট দেখুন-৪৩]।*** যার মাধ্যমে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে যে নারী চিকিৎসকের ঘাটতি ছিল তা কিছুটা পূরণ হতে থাকে। ইতিমধ্যে পূর্বের পাশ করা নারী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন হাসপাতালে যোগদান করেন এবং কেউ উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ গমন করে। ফলে রোগীরা তাদের কাছে সুচিকিৎসা পেতে শুরু করে।

১৯৫০ এর দশকের চেয়ে ১৯৬০ এর দশকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের নারী শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ১৯৬০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষের দিকে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট শিক্ষার্থীর অর্ধেক ছিল। বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের তালিকা থেকে জানা যায় যে, ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে ৪৫ জন, ১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষের ৫০ জন, ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে ৩৮ জন, ১৯৬৭-৬৮ শিক্ষাবর্ষে ২৬ জন, ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষবর্ষে ৪৪ জন, ১৯৬৯-৭০ শিক্ষাবর্ষে ৫৪ জন এবং ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে ৫৩ জন ছাত্রী ভর্তি হয়।[৮৬] স্বাভাবিকভাবে তালিকা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় ***[পরিশিষ্ট দেখুন-৪৩]***। এসব নারী শিক্ষার্থী মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করার পর বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত কোম্পানি, জেলা সদর হাসপাতাল, বিদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে যোগদান করেন এবং প্রাইভেট প্রাকটিস করেন। আবার কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ গমন করেন এবং সুনামের সাথে কাজ করেন। উচ্চ শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে এসে জনসাধারণকে উন্নতর চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন এবং সমাজ ও আর্ত মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। নারী চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবন্ধকতার হ্রাস ও নারী শিক্ষার প্রতি পরিবারের সচেতনতা বৃদ্ধিই ছিল মূল কারণ। এ সময় যারা নারী চিকিৎসক হয়েছেন তারা প্রত্যেকে সম্ভ্রান্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত, চাকুরিজীবী, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, সাংবাদিক পরিবারের সন্তান ছিলেন। তারা পরিবার ও নিজ উৎসাহেই এই শিক্ষা ও পেশা গ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে তাদের স্বপ্ন পূরণে পরিবারের সমর্থন ছিল শতভাগ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সফল নারী চিকিৎসক এবং পূর্ববাংলার প্রথম মুসলমান নারী চিকৎসকের কর্ম ও জীবন থেকে তা বোঝা যায়। এই সফল নারী চিকিৎসকগণ পাকিস্তান শাসনামল থেকে বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের চিকিৎসা ও সমাজসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। অভিসন্দর্ভের আলোচ্য সময় পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে অনেক নারী শিক্ষার্থী পাশ করে বের হয়। গবেষণার সীমাবদ্ধতার কারণে সব নারী চিকিৎসকদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নারী চিকিৎসকের কর্ম ও জীবন তুলে ধরা হয়েছে। যাদের চিকিৎসা সেবা দ্বারা বর্তমান বাংলাদেশের চিকিৎসাক্ষেত্র আলোকিত।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের নারী শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা সেবা ও অবদান

১৯৩০ সালে ডা. সৈয়দা ফিরোজা বেগম কুমিল্লা জেলার চান্দিনা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ জুলফিকার আলী একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। তাঁর অনেক ভাইবোন ছিল। তিনি সুষ্ঠু ও স্বাধীন পরিবেশে বড় হয়েছেন। তিনি কুমিল্লা ফয়জুন নেসা গার্লস গভর্নমেন্ট হাই স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই.এসসি. করার পর ১৯৪৮-৪৯ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে পাশ করার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ গমন করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.আর.সি.ও.জি, ও এফ. আর. সি.ও.জি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে এই কলেজের অধ্যাপক হন এবং ১৯৮৬ সালে অবসরে যান। বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজেও অধ্যাপনা করেন। তিনি স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি একজন চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও উপলব্ধি করেন সমাজের বিদ্যমান কুসংস্কার দূর করতে হবে। বিশেষ করে মেয়েদের চলার পথকে বাধাগ্রস্থ করে এমন কুসংস্কার দূর করাই ছিল তার লক্ষ্য। তাই তিনি মহিলা

পরিষদের সাথে যুক্ত হন। তিনি নারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি কুমিল্লার চান্দিনায় একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি এতিমখানা স্থাপন করেন। এ ছাড়া 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ম্যাটারনাল এন্ড নিউনাটাল হেলথ' এবং 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব প্রিভেনশন অব সেপটিক অ্যাবরশন' এর মতো প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। সমাজসেবার পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথেও জড়িত ছিলেন। ১৯৮৬ সালে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচন করেন। উপরন্তু তিনি তাঁর পেশাগত কাজে সফল গবেষক ছিলেন। তিনি এই অঞ্চলের নারীদের জটিল রোগ, মাতৃমুত্যু, চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যার ওপর বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৮৭]

প্রবন্ধ ছাড়াও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে তাঁর *Medical Problem in Obstetrics Practice* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ একজন চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষক, উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক কর্মী, মাতৃসেবা দানকারী হিসেবে এওয়ার্ড ফেইথ এন্ড বোস্টন (Award Faith and Boston), কুমিল্লা জেলা বোর্ড স্বর্ণপদক (Comilla District Board Gold Medal), জিয়াউর রহমান স্বর্ণপদক (Gold Medal), স্যার জগদীশ বোস স্মৃতিপদক (১৯৮৯) পান।[৮৮]

ডা. মালেকা খাতুন ১৯৩৪ সালের ১ জানুয়ারি মালদা জেলার নদিশীক গ্রামের মল্লিক পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আমিরুদ্দিন সরকার। তিনি অ-বাঙালি ভারতীয় ছিলেন। পরবর্তীতে তারা দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ী হন। তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠু, সুন্দর, আধুনিক পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। তথাকথিত সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তাঁর চলার পথকে বাধাগ্রস্থ করতে পারেনি। তাঁর পরিবার তাকে পূর্ণ সমর্থন দেয়। তিনি ১৯৫০-৫১ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং এই কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাশ করেন। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন। তারপর সাড়ে পাঁচ বছর উচ্চতর শিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্যে অবস্থান করেন। তিনি লন্ডন থেকে এফ.আর.সি.পি. এবং গ্লাসগো থেকে এম.আর.সি.পি., ডি.সি.এইচ. ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজে সহযোগী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তীতে তিনি বর্তমান বাংলাদেশের 'বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট'এর পরিচালক এবং অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৮ সাল থেকে পিজি হাসপাতাল তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ও অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে একজন শিশু বিশেষজ্ঞ হিসেবে ঢাকাতে শিশুদের চিকিৎসার জন্য সেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। তিনি বাংলাদেশের শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নের জন্য শিশু স্বাস্থ্যের ওপর নানারকম গবেষণা করেন এবং তা দেশ বিদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপন করেন এবং এই প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৮৯]

অধ্যাপক আফজালুন্নেসা ১৯৩৩ সালের ২ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন সাদাত আলী ভূইয়া ও মাতা শরিফুন্নেসা। সাদাত আলী ভূইয়া ঢাকার পোগোজ স্কুলের শরীর চর্চার (Drill) শিক্ষক ছিলেন।[৯০] তিনি চিকিৎসক হওয়ার ক্ষেত্রে পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের যথেষ্ট সমর্থন পান । আই.এসসি.তে ভালো ফলাফল করায় তাঁর বাবা তাঁকে মেডিকেল কলেজে পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং মেডিকেল কলেজে ভর্তি করার জন্য আবেদনপত্রটি এক ছাত্রের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। আবেদনপত্রটি যথাস্থানে না পৌঁছালে তাঁর নাম ভর্তির তালিকায় প্রকাশিত হয়নি এবং তাঁর ভর্তি হতে

তিন মাস বিলম্ব হয় তথা অবশেষে ১৯৫১ সালে ভর্তি হন। মেডিকেল কলেজের বেতন ও অন্যান্য খরচ মিলে মাসিক খরচ ছিল ৮০ টাকা। তাঁর বাবা এই টাকা দিতে অক্ষম ছিলেন। আফজালুন্নেসা শিক্ষিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলেও তাঁর পরিবারের মেডিকেল কলেজে পড়ানোর মতো অর্থবিত্ত ছিল না, তা স্বত্তেও তার বাবা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন কন্যাকে মেডিকেল কলেজে পড়াবেন। পরবর্তীতে তাঁর বাবাই মেয়ের চিকিৎসাশিক্ষা অধ্যয়নের জন্য অর্থের উৎস এক আত্মীয়ের (তাঁর মামা আজহারুল ইসলাম) মাধ্যমে আবিষ্কার করেন। মাসিক ৫০ টাকা হারে আর.পি. সাহা বৃত্তি নিয়ে চিকিৎসাশিক্ষা চালিয়ে যান। এই বৃত্তির শর্ত ছিল, মেডিকেল কলেজের ডিগ্রি অর্জনের পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বৃত্তি দেওয়া হবে, কিন্তু একটা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তাঁর বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। তিনি আর.পি. সাহার কাছে যান এবং সমস্যার কথা বলেন। আর.পি. সাহা সরাসরি জানান যে, তিনি আর বৃত্তি দিবেন না। আফজালুন্নেসা যুক্তি দিয়ে বলেন যে, তাঁর আবেদনপত্রে লেখা ছিল পাশ না করা পর্যন্ত বৃত্তি বন্ধ হবে না। আর.পি. সাহা তাঁর আবেদনপত্রটি বের করে পড়েন এবং তাঁকে পুনরায় বৃত্তি দিতে রাজি হন। এই বৃত্তির কারণেই তিনি বর্তমান বাংলাদেশের একজন সফল নারী চিকিৎসক হয়েছেন। এই সাফল্যের জন্য তিনি আর.পি. সাহাকে সবসময় স্মরণ করেন। অন্যদিকে চিকিৎসাশিক্ষায় অধ্যয়নের জন্য তাঁর পরিবারের পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলেও তারা তাঁকে সমর্থন দিয়েছেন এবং তিনি যাতে চিকিৎসক হন সেই ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। এদিক থেকে বলা যায় তাঁর পরিবার অনেক উদার এবং আধুনিক ছিল। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন সময়ে যত নারী শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন প্রত্যেকে শিক্ষিত আধুনিক পরিবারের ছিলেন। সে সময়ের নারী চিকিৎসকদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় তা জানা যায়। প্রত্যেকের পারিবারিক পরিচিতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। কোনো কোনো পরিবারে অর্থবৃত্ত কম থাকলেও কন্যাকে চিকিৎসক করবেন এটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির ব্যবস্থা থাকায় কোনো ছাত্রী ও তাঁর পরিবারকে কোনো অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অধ্যাপক আফজালুন্নেসা। তাঁর পরিবারের অর্থ সংকট থাকলেও চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়নি। এটা স্পষ্ট যে, আধুনিক ও সুশিক্ষিত পরিবারগুলো কন্যা সন্তানকে বোঝা ভাবেননি, বরং তারা তাদের কন্যাদের এই শিক্ষা ও পেশাসহ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ এবং প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে অনেক বেশি উৎসাহ প্রদান করেন।

১৯৫৭ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করার পর স্বামী শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. বদরুল আলম (১৯২৮-১৯৮০) এর সাথে পেশোয়ার যান। সেখানে তিনি লেডি রিডিং হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। চার বছর চাকরি করার পর লন্ডনে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার জন্য যান। ১৯৬১ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬৫ সালের জুলাই পর্যন্ত ইংল্যান্ডের ইস্ট বার্মিংহাম হাসপাতালে (East Birmingham Hospital, 1825) চাকুরি করেন। তারপর স্বামী স্ত্রী দুইজনই একই জায়গায় দুই হাসপাতালে যোগদান করেন। লন্ডনে থেকে অ্যানাসথিসিয়াতে ডিপ্লোমা করেন। ১৯৬৭ সালে দেশে ফিরে এসে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন। এর পূর্বে আট মাস ঢাকা মেডিকেল কলেজে সংখ্যাতিরিক্ত বা সুপি ডিউটিতে (Supy duty)[৬১] কাজ করেছেন। এরপর ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। একজন অ্যানাসথিসিস্ট হিসেবে তাঁর দক্ষতার চাহিদা ছিল, কারণ ৮ বছর ইংল্যান্ডের হাসপাতালে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল। ফলে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। এক ক্লিনিক থেকে আরেক ক্লিনিকের অপারেশন থিয়েটারে ছুটতে হতো। কখনো তিনি কারো ডাক ফিরিয়ে দেননি এবং বিরক্তও হননি। একজন অ্যানাসথিসিস্টকে শল্যবিদদের কাজের আগে কাজ শুরু করতে হয়। ফলে তাঁকে

তাদের আগে উপস্থিত থাকতে হতো। মিটফোর্ড হাসপাতালের ওটিতে অস্ত্রোপচার সকাল সাড়ে আটটায় শুরু হলে তিনি তাঁর আগেই উপস্থিত থাকতেন। তাঁর এই কঠোর পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা তাকে সফল হতে সাহায্য করে। ১৯৯৩ সালে তৎকালীন আই.পি.জি.এম.আর. থেকে অ্যানাসথিসিওলজির অধ্যাপক হিসেবে অবসর নেন। তাঁর ৩৬ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন নানা সাফল্য গাঁথায় পূর্ণ। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটি অব অ্যানাসথিসিওলজিস্ট এর প্রেসিডেন্টসহ দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংগঠনের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন।

তিনি ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ দর্শী ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের 'শিল্পী সংঘ' এর সদস্য ছিলেন। সংগীত শিল্পী হিসেবে এবং জাতীয় দৈনিকে কলাম লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪৫ সালে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েজ' থেকে তাঁর দুইটি একক পল্লীগীতির রেকর্ড বের হয়। পরে রূপলাল হাউজ থেকে ফেরদৌসি রহমান ও মোস্তফা জামান আব্বাসীর সাথে যৌথভাবে আরও রেকর্ড বের হয়।[৯২] আর্ত মানবতার সেবায় এবং জনকল্যাণের জন্য 'আফজালুন্নেসা ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৫০ এর দশকের আরেকজন বিখ্যাত নারী চিকিৎসক হলেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন। তিনি ১৯৩৯ সালের ২৯ জুন সিলেটের উচ্চবিত্ত, সুশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, উদার, সংস্কৃতিমনা পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আবু আহমেদ আবদুল হাফিজ ছিলেন আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ। রাজনীতি ও শিক্ষাবিস্তারে তাঁর ভূমিকা অনন্য। তৎকালীন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সিলেটে অসংখ্য হিন্দু মুসলমান মারা যায়। এই দাঙ্গা বন্ধে তাঁর বাবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মা স্বশিক্ষায় শিক্ষিত সৈয়দা শাহার বানু চৌধুরীও সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করতেন এবং মানুষের প্রয়োজনে ছুটে যেতেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলায় ব্যাপক শিক্ষক সংকট দেখা দেয়। অধিকাংশ শিক্ষক হিন্দু হওয়ায় তারা এদেশ ছেড়ে চলে যায়। যার প্রভাব সিলেটের স্কুলগুলোতে পড়ে। এই অবস্থায় সৈয়দা শাহার বানু ও অন্যান্য নারী সমাজকর্মী বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষিত মুসলমান মহিলাদের স্কুল শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। অপরদিকে তাঁর পূর্বপুরুষরাও ছিলেন শিক্ষিত ও রাজনীতিবিদ। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক তাঁর দাদা খান বাহাদুর আবদুর রহিম এর বন্ধু হওয়ায় প্রায়ই তাদের বাড়িতে আসতেন এবং তৎকালীন সময়ের রাজনীতিসহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। এই বিষয়গুলো শাহলা খাতুনকে আলোড়িত করত এবং তাঁর জীবনবোধ তৈরিতে প্রভাব ফেলে। এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণেই শাহলা খাতুনকে কখনও মেয়ে বলে অবহেলা করা হয়নি। তিনি অনেক স্বাধীনভাবে বড় হয়েছেন। শৈশবকালে দৌড়ঝাপ, সাতাঁরকাটা, সাইকেল চালানো, দোলনায় চড়া, গাছে ওঠা, ভাইদের সাথে ব্যাটমিন্টন, হকি, ফুটবল খেলা তথা সবরকম খেলা খেলতেন। তাঁরা কখনও ছেলেমেয়েতে পার্থক্য করেনি। মেয়ে বলে তাঁকে কখনও শুনতে হয়নি, তুমি সবকিছু করতে পারবে না বরং তাঁর ইচ্ছাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। তিনি অনেক আধুনিক, উন্নত, সুস্থ, সুন্দর পরিবারে মানুষ হয়েছেন।

ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময়ে তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির করে ফেলেন। এই সিদ্ধান্তের পিছনে হিন্দু ধর্মাবলম্বী দুইজন নারী চিকিৎসক, মনিকা চৌধুরী, হাসি রাণি ঘোষ এর পরোক্ষ প্রভাব। তাঁর বাবা মা সমাজকর্মী হওয়ায় তাদের কাছে অনেক মানুষ আসতেন সেই সূত্রে তাঁরাও আসতেন। তাদের দেখে শাহলা খাতুন অনুপ্রাণিত হন। কলেজ পড়াকালীন সময়ে প্রিয় বান্ধবীর মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলে তাঁর মুখটি শেষবারের মতো দেখতে দেওয়া হয়নি। এর ফলে মনোজগতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

ঘটতে পারে। এই বিষয়টিও তাঁকে অনেক স্পর্শ করে। ১৯৫৬-৫৭ শিক্ষাবর্ষে শাহলা খাতুন ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। সে সময়ের নারী শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে বলেন, 'তাঁর সাথে ১২ জন মেয়ে ভর্তি হয়। তখনকার সময়ে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর শিক্ষাই ছিল সোনার হরিণ, সেখানে ১২ জন মেয়ের ডাক্তারি পড়তে আসা বিস্ময়কর ঘটনা।'[৯৩]

মেডিকেল কলেজে পড়তে এসে শিক্ষক হুমায়রা সাঈদ এর সুন্দর বাচনভঙ্গি, শব্দচয়ন, সর্বোপরি চমৎকার লেকচার প্রদান তাঁকে আকৃষ্ট করে। ফলে তিনি সিদ্ধান্ত নেন মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হবেন। এই ব্যাপারে তাঁর বাবাও তাঁকে উৎসাহিত করেন। তখন প্রসুতি মায়েরা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে সন্তান জন্মদান করত। অবহেলিত দুর্ভাগা মায়েদের প্রসবকালীন যন্ত্রণা লাঘবের জন্য মেয়ের সিদ্ধান্তকে সম্মতি দেন। পরবর্তীতে স্ত্রীরোগ ও প্রসুতিবিদ্যার ওপর অধ্যয়ন করেন।

ছাত্রজীবনে তিনি অনেক পরিশ্রম করেন। মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী হিসেবে রাতদিন অনেক দায়িত্ব পালন করতেন। সকালে ক্লাস শুরু হতো, দুপুরে ওয়ার্ড ডিউটি। সন্ধ্যার দিকে আবার রোগীদের দেখতে হতো। তখন কলেজের ছেলেমেয়ে উভয়ই নাইট ডিউটি পালন করত। বিশেষ করে লেবার রুমের ডিউটি সবার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। মেডিকেল কলেজের শিক্ষকগণ তাঁদের কাজ তদারক করতেন। দায়িত্বে কোনো অবহেলা ধরা পড়লে অনুপস্থিত করে দেওয়া হতো। সে সময়ে একদিন অনুপস্থিত মানে শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারবে না। যত ভালো শিক্ষার্থীই হোক না কেন, ছাড় দেওয়ার কোনো মানসিকতা ছিল না।

রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া ও ভালোভাবে কোনো বিষয়ের ওপর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ছাড়াও অন্য হাসপাতালে যেতে হতো। তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সব ধরনের ওয়ার্ড থাকলেও টি.বি. ওয়ার্ড ও ইনফেকসাস ওয়ার্ড ছিল না। এজন্য তাদেরকে মিটফোর্ড হাসপাতালের টি.বি. ও ইনফেকসাস ওয়ার্ড এবং মহাখালীর টি.বি. সেন্টারে পোস্টিং করা হতো। এই প্রক্রিয়াকে বলা হতো 'ওয়ার্ড প্লেস', কেননা কলেজের শিক্ষকগণ এই বিষয়ের ওপর শিক্ষাদান এবং কলেজের হাসপাতালে এক দুইজন রোগী থাকলেও তা একজন মেডিকেলের শিক্ষার্থীর জানার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই সব রকমের টি.বি. রোগীদের পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাদের মহাখালীর টি.বি. সেন্টারে ট্রাকে করে পাঠানো হতো।[৯৪] একজন ভালো চিকিৎসক হওয়ার জন্য তিনি শিক্ষকদের সবধরনের নিয়মনীতি মেনে চলতেন। কখনো কাজে ফাঁকি দেননি, হাতে কলমে সবকিছু শিখেছেন। পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালন এবং বহির্রোগী বিভাগেও কাজ করেছেন। তার সময়ে ইন্টার্নিশিপ পদ্ধতি ছিল না। এই ব্যাপারে জাতীয় অধ্যাপক শাহলা খাতুন বলেন,

> আমরা না করলেও এখনকার নব্য ডাক্তাররা ইন্টার্নি করছে। এটা খুব দরকার। বিদেশে ইন্টার্নিশিপের সার্টিফিকেট ছাড়া কেউ কিছু করতেও পারবে না। হাতে কলমে শিক্ষাটা সবচেয়ে ভালো হয়। কোনো কিছু তাত্ত্বিকভাবে জানার চেয়ে একবার দেখে নেওয়া, করে নেওয়া বেশি ফলদায়ক।[৯৫]

১৯৬১ সালে মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করার পর সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। তিনি এই কলেজের প্রসুতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগে বিভিন্ন পদে তথা হাউস সার্জন, এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার এবং রেসিডেন্ট সার্জন পদে ১৯৬১-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য একজন এম.বি.বি.এস. ডাক্তারের জন্য রেসিডেন্ট সার্জন ছিল সবচেয়ে বড় পদ।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে সরকারি বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাজ্যের রয়েল কলেজ অব অবসটেট্রিশিয়ান এন্ড গাইনোকোলজিস্ট (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 1929) এ উচ্চ শিক্ষা করতে যান। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডের বিভিন্ন হাসপাতাল যেমন, গ্লাসগো রয়েল ইনফার্মারি (Glasgow Royal Infirmary, Glasgow), ব্রাডফোর্ড জেনারেল হসপিটাল (Bradford General Hospital, Bradford), নারীদের জন্য কুইন চারলটস এন্ড চেলসি হসপিটাল (Queen Charlotte's and Chelsea Hospital, 1739), হ্যামার স্মিথ হসপিটাল (Hammersmith Hospital, 1902) এবং লুইশাম জেনারেল হসপিটালে (Lewisham General Hospital) প্রশিক্ষন নেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে উচ্চতর ডিগ্রি যেমন, এম.আর.সি.ও.জি. (১৯৬৮), এফ.আর.সি.ও.জি, ই.সি.এফ.এম.জি (১৯৭৫, ইউ.এস.এ.) এফ.আই.সি.এস. (১৯৯৫, ইউ.এস.এ.), এফ.সি.পি.এস. (পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) লাভ করেন।

১৯৬৮ সালে ইংল্যান্ড থেকে ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে এসে কিছুদিন ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন রিসার্চ (আই.পি.জি.এম.আর.) এ কাজ করেন। তারপর খুলনা জেলা হাসপাতালে সরকারিভাবে তার পোস্টিং দেওয়া হয়। এখানে তিনি ১৯৬৯ সালের জুলাই থেকে ১৯৭০ সালের জুলাই পর্যন্ত প্রসুতি ও স্ত্রীরোগের জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করেন। এরপর আবার ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন রিসার্চ (আই.পি.জি.এম.আর.) এ সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।[৯৬] পোস্ট গ্রাজুয়েটগণ উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য এই প্রতিষ্ঠানে আসে এবং প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ছিল। ১৯৭১ সালে শাহবাগে স্থানান্তর করা হয়। তিনি ১৯৭০ সাল থেকে বর্তমান বাংলাদেশের ২০০১ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক এবং ইউনিটের প্রধান হিসেবে চাকুরি করেন। ১৯৯৮ সালে এই ইনস্টিটিউটকে চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।' তার উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানে প্রসুতি ও স্ত্রীরোগবিদ্যা বিভাগ চালু করা হয়। তিনি ছিলেন এই বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন। তিনি বিভাটিকে পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ করেন। বিশেষ করে বিশেষ কিছু ইউনিট, যেমন, একলামসিয়া ইউনিট, সাবফার্টিলিটি ইউনিট, কলপসকপি (ল্যাপারসকপি) পরীক্ষার সুযোগসুবিধা, আল্ট্রাসোনোগ্রাম, জরুরি সিজারিয়ান ওটি (অপারেশন থিয়েটার), অ্যানাসথিসিওলজিস্টের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি, প্রসুতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের সাথে সহায়ক স্টাফ থাকা প্রভৃতির মাধ্যমে সম্প্রসারণ করেন। তিনি নিরাপদ মাতৃত্ব ও জরুরি প্রসুতি সেবার জন্য নানারকম কাজ ও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এস, এম.ডি. এম.ফিল শুরু করা হয়। শুরুতে তিনি প্রতিষ্ঠানের পূর্ণকালীন পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষক ছিলেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের সব মেডিকেল কলেজের বহিঃপরীক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন। বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জন থেকে প্রসুতি ও স্ত্রীরোগের ওপর প্রথম দুইজন ছাত্রী অধ্যাপক জাহানারা বেগম এবং আশফাকুন্নেসা তাঁর তত্ত্বাবধানে যথাক্রমে এফ.সি.পি.এস. পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। বি.এস.এম.এম.ইউ.তে চাকুরি করার সময়ে সমাজ সেবামূলক নানারকম কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। গরিব রোগীদের চিকিৎসার জন্য তহবিল গঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ৪০ বছরের চাকুরি জীবনে এই প্রতিষ্ঠানে ৩০ বছর চাকুরি করেন এবং এখান থেকে অবসর নেন। তবে এর মাঝখানে ১৯৭২ সালে অল্পকিছুদিনের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে কাজ করেন এবং ১৯৮৭ সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে গাইনোকোলজি বিভাগের প্রধান ও অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০১ সালে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নেওয়ার পর বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ২০১১ সাল পর্যন্ত এই পদে থাকার পর বর্তমানে চেয়ারপার্সন হিসেবে আছেন। তিনি ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালের প্রতিষ্ঠাতা ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেয়ার লিমিটেড এবং বি.এম.আর.সি'র ন্যাশনাল ইথিকস এন্ড রিসার্চ কাউন্সিল এর চেয়ারপার্সন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি উত্তরার আধুনিক মেডিকেল কলেজে প্রসুতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগ চালু করেন।

১৯৯৫ সালে শাহলা খাতুন ঢাকা মেডিকেল কলেজের তাঁর সমমনা বন্ধু ও সহকর্মীদের নিয়ে গ্রীন লাইফ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম এর নাম ছিল নিউ আল রাজি ক্লিনিক। এই প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসা সেবা সফলতার সাথে চললেও কার্যক্রমে তারা নবীন চিকিৎসকের অভাব অনুভব করেন। নবীন চিকিৎসক হচ্ছেন একটি হাসপাতালের মেরুদণ্ড। যাদের ওপর হাসপাতাল, রোগীর দায়িত্ব দিয়ে আস্থা রাখা ও বিশ্বাস করা যায়। জনসংখ্যা, রোগ, মানুষের আয়ু বৃদ্ধিসহ নানারকমের চিকিৎসার প্রসার হলেও উন্নত ধরনের চিকিৎসা দিতে সক্ষম নবীন ভালো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের বড়ই অভাব ছিল। এই উপলব্ধি থেকেই শাহলা খাতুন চিকিৎসক তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। ফলশ্রুতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বি.এম.ডি.সি'র নিয়মকানুন, বিধিব্যবস্থা অনুশীলন করে ২০০9 সালে ৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে 'গ্রীন লাইফ মেডিকেল কলেজের' যাত্রা শুরু হয়। তিনি কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারপার্সন হিসেবে কাজ করছেন। এই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একদিকে নতুন চিকিৎসক তৈরি করা হচ্ছে, অন্যদিকে সদ্য পাশ করা চিকিৎসকদের জন্য চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে । তাছাড়া এই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসহ অন্যান্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাধ্যমে সরকারি কলেজ ও হাসপাতালগুলোর ওপর কিছুটা চাপ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে এই সব প্রতিষ্ঠান (গ্রীন লাইফ মেডিকেল কলেজ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বি.এস.এম.এম.ইউ.), বি.এম.সি., এবং আই.এম.সি')র অবৈতনিক ভিজিটিং প্রফেসর এবং কনসালট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়া ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'অবসটেট্রিকস এন্ড গাইনোকোলজি সোসাইটি অব বাংলাদেশ' এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, জীবন সদস্য ও সভাপতি ছিলেন। এই সমিতির সদস্যরা মিরপুরে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের লোকদের চিকিৎসা দেওয়া হয়।

অধ্যাপক শাহলা খাতুন দীর্ঘ বছর (৩০-৪০) ধরে বাংলাদেশের নারী ও শিশু সুস্বাস্থ্যের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, বিকাশ, উন্নতির উপায় এবং আর্থিক সংস্থানের সাথে জড়িত আছেন। তিনি ঢাকার সবচেয়ে পুরাতন ও বড় শিশু হাসপাতাল এবং চাইল্ড হেলথ ইনস্টিটিউটের সাথে যুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্ট ফান্ড এবং বোর্ড অব ম্যানেজম্যান্টের অবৈতনিক চেয়ারপার্সন। হাসপাতালে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা এডোলেসেন্ট হেলথ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেন। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ছয়শত'রও বেশি বৃদ্ধি করেন এবং ৩৫-৪০% রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

তিনি মূলধারার পেশাগত কর্মজীবন ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। ১৯৭০ সাল থেকে এম.ও.এইচ.এফ. (MOHF), ইউনিসেফ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বাংলাদেশ মেনোপোজ সোসাইটি, সাউথ-এশিয়ান মেনোপোজ সোসাইটি, বাংলাদেশ ফ্যামিলি প্লানিং এসোসিয়েশন, সেফ মাদারহুড প্রোগ্রাম (Safe Motherhood Program), লায়নস ক্লাব, মাদার কেয়ার হসপিটাল এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ এবং শল্যচিকিৎসা প্রদান করেন এবং বাংলাদেশ 'ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশন' এর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন।

ইউনিসেফ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ইমার্জেন্সি অবসটেট্রিক কেয়ার (ইওসি) এর যাত্রা শুরু হয়। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাথেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর নিজস্ব অর্থায়নে ইওসি প্রকল্পকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। এজন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের বহু জেলা হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, প্রসুতি ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্যাটেলাইট ক্লিনিক, পরিবার কল্যান কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এর ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক, নার্স, ব্লাড ব্যাংক টেকনিশিয়ানদের একটি বড় দল অনুন্নত অঞ্চলে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছে। তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের একজন নন-অফিসিয়াল স্বেচ্ছাসেবক পরিদর্শক ছিলেন। যেখানে বন্দীদের প্রধানত তরুণ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে এবং নারীদের জীবনযাত্রার অবস্থা, স্বাস্থ্যের উন্নতি করার জন্য কাজ করেন। তিনি অন্যান্য মানব হিতৈষীদের সাহায্য সহযোগিতায় ঢাকার বাইরে গাজীপুরে এতিম ও বঞ্চিত শিশুদের জন্য একটি বাসভবন 'সেফ হোম ফর গার্লস' নির্মাণ করেন। এখানে বিনামূল্যে নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৭৪ এবং ১৯৭৬ সালের শুরুর দিকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পাথ ফাইন্ডার এর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে প্রথম প্রশিক্ষক হিসেবে মেনস্ট্রুল রেগুলেশন প্রোগ্রামে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের মাতৃমৃত্যু, রোগ, অনিরাপদ গর্ভপাত এবং অন্যান্য দীর্ঘকালীন অসুস্থতা এবং মৃত্যুর হার কমাতে সহায়তা করে। তিনি স্ত্রীরোগ ও প্রসুতিবিদ্যার ওপর আন্তর্জাতিক কার্যক্রমের আওতায় ১৯৭৮ সালে মিসৌরির সেন্ট লুইস, জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি হসপিটাল এর স্কুল অব মেডিসিন এবং ১৯৮৬ সালে বাল্টিমোরের জন হপকিনস ইউনিভার্সিটিতে এসটিডি ও 'এডভান্স ম্যানেজমেন্ট অব রিপ্রোডাকটিভ হেলথ প্রোগ্রামে' প্রশিক্ষণ নেন।

১৯৯৬ সাল থেকে তিনি সিমান্টিক এর সম্মানীত মেডিকেল উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এটি একটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থা। এটা 'প্রজন্ম প্রকল্পের' মাধ্যমে নবজাতকের যত্নের ওপর আই.সি.ডি.ডি.আর.বি. (ICDDRB) এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ করেছেন। তিনি এখানকার টেকনিক্যাল এডভাইসরি কমিটি অব রিসার্চ, ট্রেনিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট এর চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

উপরিউল্লিখিত কার্যক্রম ছাড়াও 'ডিএমসি ১৯৫৬ ট্রাস্ট ফান্ড' এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৫৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নিয়ে এই ফান্ড গঠন করেন। এর উদ্দেশ্য দরিদ্র মেডিকেল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান করা। তাই তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ২০ জন শিক্ষার্থীকে, এম.বি.বি.এস. কোর্স সম্পাদন করার জন্য প্রতিবছর বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি দেশ বিদেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সায়েন্টিফিক সম্মেলনগুলোতে একজন সদস্য, একজন আমন্ত্রিত বক্তা, একজন অনুষদের সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন দেশ যেমন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা, কুয়ালালামপুর, কোপেনহেগেন, আবুধাবি, রোম, ভারত, শ্রীলংকা, সেভিয়েত ইউনিয়ন, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, নেপাল, জাপান এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।

বাংলাদেশ সরকার তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১১ সালে তাঁকে 'জাতীয় অধ্যাপক' হিসেবে ঘোষণা করেন। চিকিৎসক হিসেবে তিনি প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক এবং দ্বিতীয় নারী জাতীয় অধ্যাপক। এই স্বীকৃতির পেছনে ছিল তাঁর কঠোর পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা এবং সততা। তিনি পেশাকে তার জীবনের অংশ মনে করেন। এই দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সাথে পালন করে যাচ্ছেন।

তাই স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ হিসেবে দেশ বিদেশে সুখ্যাতি পেয়েছেন। এ ছাড়া কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ 'মাদার তেরেসা এওয়ার্ড' পান। তিনি চিকিৎসা পেশা, নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও সমাজ কল্যানমূলক কাজে অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন মেডেল ও সনদপত্র গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেন, 'জীবনে এত দূর আসা ও অনেক সম্মান পাওয়ার মূলে আছে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীর পরিচয়টি।'[৯৭] মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী থাকাকালে এবং কর্মজীবনে কাজের মাধ্যমে যাদের সাথে পরিচিত হয়েছেন তাদের অবদান অন্যতম। তিনি তাঁর চিকিৎসা সেবা দিয়ে এদেশকে উপস্থাপন করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাশিক্ষা ও সেবার মান অনেক উন্নত ও বিশ্বমান সম্মত । অধ্যাপক শাহলা খাতুন বলেন, 'তিনি যখন ইংল্যান্ডে যান, তখন ব্রিটিশদের চাকুরি না হয়ে তাঁর চাকুরি হয়। এতে অনেকেই অবাক হয় এবং তাঁরা (ব্রিটিশরা) চেয়ারম্যানের কাছে আপত্তি জানায়। তখন চেয়ারম্যান তাদেরকে জানান, অন্যদের চেয়ে তাঁর রেজাল্ট ভালো এবং দক্ষতা, যোগ্যতা বেশি। তখন ব্রিটিশ জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক যে সিলেবাস ছিল, তা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সিলেবাস ছিল। উপরন্তু ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছিল ব্রিটিশ মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ঢাকা মেডিকেল কলেজের পরীক্ষার মান ব্রিটিশ মেডিকেল কলেজের সমান ছিল বলে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফলে তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতার কারণে তাঁকে চাকুরি দিতে বাধ্য হন। চাকুরি হবার পর অন্যান্য বিভাগের সবাই তাঁকে মানত আর বলতো বাপরে 'oldy'র selection'।[৯৮] মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তার হাত ধরেই বাংলাদেশের মা ও শিশু স্বাস্থ্যের ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে এবং নারী সমাজ আলোকিত হয়েছে। বিশেষ করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে নারীদের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন অনুপ্রেরণার উৎস।

অপরদিকে ১৯৬০ এর দশকের অন্যতম নারী চিকিৎসক হলেন অধ্যাপক ডা. সুলতানা জাহান। তিনি ১৯৪৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর শেরপুর জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাবিবুর রহমান। তিনি পেশায় আইনজীবী ছিলেন। অধ্যাপক সুলতানা জাহানও সুষ্ঠু ও সুন্দর, শিক্ষিত পরিবেশে মানুষ হয়েছেন। শেরপুর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক, ইডেন গার্লস কলেজ থেকে আই.এসসি পাশ করার পর ১৯৬২-৬৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এম.বি.বি.এস. পাশ করার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য লন্ডন যান। সেখান থেকে এফ.সি.পি.এস. (গাইনোকোলজিস্ট এন্ড অবসটেট্রিকস), এম.আর.এস.এইচ. ডিগ্রি লাভ করেন। তার স্বামী ডা. মল্লিক আব্দুল্লাহ্ হারুনও পেশায় চিকিৎসক ছিলেন।

১৯৬৮ সালের ১১ নভেম্বর সহকারী সার্জন হিসেবে বরিশালে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর ১৯৭৫ সালে এফ.সি.পি.এস. পাশ করার পর খুলনা আধুনিকীকরণ সদর হাসপাতালের কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রোগীদের চিকিৎসা সেবা ও শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষাদান ছাড়াও গবেষণামূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর অনেক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এসব গবেষণার মাধ্যমে নারী রোগের বিভিন্ন সমস্যা ও এর সমাধান তুলে ধরেন।[৯৯]

এ ছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে (আমেরিকা ও ব্যাংকক) অংশগ্রহণ করেন। একজন চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য চর্চা করতেন। নিম্নের গল্প, উপন্যাস, কবিতা, বই তথা রচনা সামগ্রী তাঁর লেখা,

১. অনন্যা (গল্প)

২. স্মৃতির পাতা থেকে (গল্প)

৩. ভালবাসার নকসা কাঁথা (কবিতা)

৪. নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় (উপন্যাস)

৫. শুধুই তোমার (কবিতা)

৬. মুখর হলো দিনগুলো (উপন্যাস)

এ ছাড়া সমাজকল্যাণমূলক কাজ ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। তিনি লায়নস ক্লাব, লেখিকা সংঘ, শিশু হাসপাতালের আজীবন সদস্য (চট্টগ্রাম) ছিলেন।

একই দশকের নারী চিকিৎসক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. মাখদুমা নার্গিস ১৯৪৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আবদুল গণি খান একজন ব্যারিস্টার ছিলেন। তিনিও পরিবার ও নিজ ইচ্ছাতেই চিকিৎসাশিক্ষায় পড়তে আগ্রহী ছিলেন। ১৯৬২-৬৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এম.বি.বি.এস. পাশ করার পর ১৯৬৯ সালে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার হিসেবে চাকুরিজীবন শুরু করেন। এরপর সিভিলিয়ান এয়ার ফোর্সে কিছুদিন চাকুরি করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এয়ার ফোর্সে আর ফিরে না গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এ মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে একই প্রতিষ্ঠানে আবাসিক মেডিকেল অফিসার হন। এর পাশাপাশি তিনি চিকিৎসাশিক্ষার ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ (এফ.সি.পি.এস, মেডিসিন) নেন। ১৯৯৯ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব হিসেবে যোগদান করেন এবং ২০০৯ সালে তাঁকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এডিশনাল সেক্রেটারি করা হয় এবং কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে ছয় বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়।[১০০] এই প্রকল্পের অধীনে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতি ছয় হাজার জনের জন্য চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক সারাদেশে চালু করা হয়। ২০০৯-২০১৭ সাল পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় ১৩ হাজারের বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষায় কমিউনিটি ক্লিনিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দৈনন্দিন চিকিৎসা সেবাসহ আধুনিক চিকিৎসা মানুষের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছে। এই কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে জটিল রোগীদের উন্নত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে উঁচু পর্যায়ের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। এর ফলে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের তুলনায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি অর্জন করেছে। অন্যদিকে নির্ধারিত সময়ের আগেই (২০২১) সহস্র উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goal/MDG)-৪ (শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা) অর্জন করেছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ডা. মাখদুমা নার্গিস এই প্রকল্পের অনন্য ভূমিকা রাখেন। যার সুফল বর্তমান বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে প্রভাব ফেলছে।

আরেকজন অন্যতম নারী চিকিৎসক হলেন শিশু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. নাজমুন নাহার। ১৯৪৭ সালের ১২ এপ্রিল ঢাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবা আব্দুল লতিফ আইনজীবী ছিলেন। মায়ের নাম ছিল বেগম রওশন আরা। তিনি সুশিক্ষিত পরিবারে মানুষ হয়েছেন। তখন রক্ষণশীল সমাজ বিদ্যমান থাকলেও তাঁর পরিবার উদার ছিলেন। তাঁর বাবা তাঁকে চিকিৎসক হতে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। পড়াশোনা চলাকালীন তাঁর জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসলেও সে প্রস্তাব তাঁর বাবা ফিরিয়ে দিতেন। এমনকি

আত্মীয় স্বজনের মেয়েদের বিয়ে হলে তিনি তাদের কাছ থেকে অধ্যাপক নাজমুন নাহার কে দূরে রেখেছেন। মেয়ে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর বাবা বলতেন, 'মেয়েদের বেশি পড়াশোনা করা দরকার, কারণ তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত'।[১০১] এর ফলে শুধু তিনিই নন তাঁর পরিবারের অন্যান্য ভাই বোনও শিক্ষিত হয়েছেন।

এমন আধুনিক ও সুশিক্ষিত পরিবারে জন্ম গ্রহণের কারণে তাঁর চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ সহজ হয়েছে। ঢাকার বাংলা বাজার সরকারি বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ থেকে পাশ করার পর ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তাঁর সময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৪৫ জন ছাত্রী ভর্তি হয়। তিনি পূর্ববর্তী পরীক্ষার রেজাল্ট ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি হন। তখন ভর্তি পরীক্ষা হতো না। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করার পর ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম (জেনারেল প্রাকটিস) এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তৎকালীন আই.পি.জি.এম.আর. এর একজন অনারারি মেডিকেল অফিসার হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর তিনি এফ.সি.পি.এস. এবং এফ.আর.সি.এস. (এডিনবার্গ) ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে আই.পি.জি.এম.আর. এর শিশু বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হন। ১৯৮১ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিশু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হন। তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজেও সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিশু বিভাগের অধ্যাপক হন এবং ২০০৪ সালে অবসরে যান। ২০০৪-২০০৮ সাল পর্যন্ত বারডেমের ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি শিশুদের চিকিৎসার ওপর নানারকম গবেষণা করেন। তাঁর এই গবেষণা প্রবন্ধগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[১০২]

এ ছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কনফারেন্সে প্রবন্ধগুলো উপস্থাপন করেন [১০৩] এবং বাংলাদেশের শিশু ও নবজাতকদের নানা সমস্যার ওপর বিভিন্ন গবেষণা করেন,

> ১. Lumber puncture in neonate ২. Common infection of newborn in the neonatal ward of Dhaka Medical College Hospital ৩. Ascitis in Children ৪. Abdomen Pain in Children ৫. Common poisoning among Children of Bangladesh. [১০৪]

তাঁর এসব গবেষণা বাংলাদেশের শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে সহায়ক হয়। অধ্যাপক নাজমুন নাহার অন্যান্য স্বনামধন্য নারী চিকিৎসকের মতো শুধু চিকিৎসা সেবাই দেননি, সমাজ সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন। ছাত্রজীবনে ১৯৭০ সালে বরিশালে যে টর্নেডো হয় সেখানে তারা ত্রানসামগ্রী নিয়ে যান। পরবর্তীতে সমাজসেবামূলক কাজ অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত হন যেমন, মহিলা পরিষদ, সেন্ট্রাল কাউন্সিল সদস্য, দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সভানেত্রী, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সহ-সভানেত্রী, শিশু প্রতিরক্ষা ও প্রতিপালন কেন্দ্রের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ৬৯'এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

একই শিক্ষাবর্ষের আরেকজন নারী চিকিৎসক ডা. কাজী মিসবাহুন নাহার তামান্না। তিনি ১৯৪৭ সালের ৬ মার্চ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর বাবা কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস একজন সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিক ছিলেন এবং মা কাজী আজিজা ইদ্রিস সমাজকর্মী ও রাজনীতিক ছিলেন। তাঁর বাবা মা উভয়ই প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। তাদের পরিবারের সাথে তৎকালীন সময়ের প্রথিতযশা

সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গের (শহীদুল্লাহ কায়সার, সত্যেন সেন, রনেশ দাশগুপ্ত, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, সন্তোষ গুপ্ত, জহুর হোসেন চৌধুরী, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রমুখ) যোগাযোগ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর শৈশবকাল আধুনিক ও সাংস্কৃতিক পারিবারিক পরিমন্ডলে কেটেছে। ঢাকার কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি. এবং ইডেন কলেজ থেকে এইচ.এস.সি. পাশ করার পর ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তিনি মূলত তাঁর বাবার ইচ্ছাতেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সাধারণ কোনো বিষয়ে পড়ার, কিন্তু তিনি তাঁর বাবার ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেন। মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালীন তাঁকে প্রতিমাসে ৮০ টাকা করে দেওয়া হতো। এর মধ্যে ৪০ টাকা খাবার এবং বাকি টাকা অন্যান্য ক্ষেত্রে (বই, পোশাকপরিচ্ছদ, গাড়ি ভাড়া ইত্যাদি) খরচ হতো। সে সময় জীবনযাপন সাদাসিধে, সাবলীল হওয়ায় এই টাকায় চলে যেত। এ সময় মেডিকেল কলেজের অধিকাংশ নারী শিক্ষার্থী শাড়ী পড়তেন। সাধারণত ১০ টাকা থেকে ২৫ টাকা দামের পাবনা, টাঙ্গাইল, দেশীয় থান কাপড়ের শাড়ী পড়তেন।[১০৫] তৎকালীন সময়ের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই টাকা ছিল যথেষ্ট। মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালীন কাজী তামান্নসহ কাউকে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাছাড়া এ সময় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর জন্য বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির ব্যবস্থা থাকায় আর্থিক কারণে কারো চিকিৎসাশিক্ষা বাধাগ্রস্থ হয়নি, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু মেডিকেল কলেজে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত, স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানরা পড়তে আসতেন। দরিদ্র পরিবারের সন্তানের পক্ষে এই ধরনের কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নের পূর্বে তাদের বিজ্ঞানের ভিত বা প্রাক মেডিকেল প্রস্তুতি থাকা জরুরি। বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন করার জন্য অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় হয়। এই বিষয়ে পাঠ গ্রহণ ও বোঝার জন্য আলাদা বিশেষ অভিজ্ঞ, দক্ষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। দরিদ্র পরিবারের জন্য যা ব্যয়বহুল।

কাজী তামান্না স্বচ্ছল, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত পরিবারের সন্তান হওয়ায় তার পক্ষে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করা কষ্টকর হয়নি। তিনি এম.বি.বি.এস. পাশ করার পর ডা. কাদরীর অধীনে ২নং ওয়ার্ডে এবং ডা. ওয়াদুদ আহমেদ এর অধীনে সার্জিক্যাল আউট ডোরে ট্রেনিং নেন। এরপর মুজিবনগর সরকারের বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ সদ্য পাশ করা কাজী তামান্নাকে ন্যাশনাল হেলথ এন্ড ওয়েলফেয়ার বিভাগে কাজ করার পরামর্শ দেন এবং বিভাগীয় সচিব ডা. টি. হোসেনকে তাঁর নিয়োগের নির্দেশ দেন। অতএব ১৯৭১ সালের ২১ অক্টোবর মেডিকেল অফিসার হিসেবে যোগদান করেন ***[পরিশিষ্ট দেখুন-৪৪]***। তার কাজ ছিল মুক্তিযুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা করা এবং বিভাগীয় দপ্তরে বিভিন্ন স্থান থেকে ঔষধপত্র সংগ্রহ করার পর সেগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিতরণ করা। মুজিব নগর সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে তিনি একমাত্র নারী চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। যুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর সংস্থাপন সচিবের নির্দেশে ঢাকা মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন। আট বছর সরকারি চাকুরি করার পর বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় উপ-প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, অতিরিক্ত প্রধান ও প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা হিসেবে সাফল্যের সাথে কাজ করে ২০০৪ সালে অবসরে যান। বাবার ইচ্ছাতে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতি তাঁর বেশি ঝোঁক ছিল। বিশেষ করে নাটকের প্রতি তার অসম্ভব নেশা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত রবীন্দ্রনাথের 'রক্ত করবী', 'মুক্তধারা', 'তাসের দেশ', সমরেশ বসুর 'আর্বত' নাটকে মূল নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। সে সময় এই নাটকগুলো সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রাথের রচনার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে ঢাকায় সংস্কৃতি কর্মীদের ব্যাপক কর্মসূচি নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রত্যেকটিতে ডা. কাজী তামান্না অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সালে সত্যেন সেন ও রণেশ দাশগুপ্ত উদীচী গঠন করলে, তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে যুক্ত হন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত এই সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে রয়েছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতা উত্তরকালে ঢাকায় যে 'গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন শুরু হয় সেখানে তাঁর চিকিৎসা পেশা জীবনের পাশাপাশি থিয়েটার দলের সদস্য হিসেবে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে অনেক মঞ্চ নাটকে অভিনয় করেন। তিনি থিয়েটার ও নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং দুই বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া নিয়মিত বেতার ও টিভিতে অভিনয় করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিটিভিতে প্রথম যে নাটক 'বাংলা আমার বাংলা' প্রচার হয়, তাতে তিনি মূল নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। সে সময় রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যোগসূত্র ছিল। ফলে তিনি মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পাশাপাশি রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬০ এর দশকের প্রত্যেকটি প্রগতিশীল আন্দোলন তথা ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা আন্দোলন ও উনসত্তরের গনঅভ্যুত্থানে ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে সরাসরি যুক্ত হন। এসব আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ২৪ জুন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার সাথে চান্দিনা হয়ে ত্রিপুরা যান। সেখান থেকে আগারতলা হয়ে কলকাতা যান। কলকাতায় তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নাট্যবিভাগে যোগদান করেন। জুন মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বেতারের নাটক ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে ডা. কাজী তামান্না মুক্তিযুদ্ধে একজন চিকিৎসক ও নাট্যকর্মী হিসেবে ভূমিকা রাখেন। চিকিৎসক হিসেবে তিনি আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাদান করেন এবং নাট্যকর্মী হিসেবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মানুষের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করেন এবং পাকিস্তানিদের অত্যাচার নির্যাতন তুলে ধরেন। মুজিবনগর সরকারের প্রথম নারী মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৯ সালে তাঁকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' দেওয়া হয়।[১০৬] একজন নারী চিকিৎসকের জন্য এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতি বেশি আগ্রহ থাকায় চিকিৎসাশিক্ষার ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেওয়া সম্ভব হয়নি এবং তাঁর ইচ্ছাও হয়নি। অথচ তাঁর সহপাঠীদের অধিকাংশ উন্নত জীবনযাপন ও সুযোগসুবিধার আশায় বিদেশ চলে যান। তাঁর মতো সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্থ, দেশের প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধে বিশ্বাসী চিকিৎসকগণ বিদেশে সুযোগসুবিধা গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন অথবা বিদেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। তাঁর মতো চিকিৎসকগণ দেশের মানুষের চিকিৎসা সেবা দিয়ে আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন।

এভাবে দেখা যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের নারী চিকিৎসকগণ তৎকালীন রক্ষণশীলতার বেড়াজাল ছিন্ন করে পরিবার ও নিজ প্রচেষ্টায় সুচিকিৎসক হন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের পরিবার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে । কারণ তাদের অধিকাংশই পারিবারিক কোনো প্রতিবন্ধকতার স্বীকার হননি, বরং তাদের এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। কারণ পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞান তাদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। তাছাড়া আলোচ্য সময়ে নারীর জন্য চিকিৎসা পেশা ছিল অত্যন্ত সম্মানজনক। সুশিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত পরিবারগুলো তাদের কন্যা সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই বিষয়টি পূর্ববাংলায় প্রথম মুসলিম নারী চিকিৎসকের কর্ম ও জীবন বিশ্লেষনের মধ্য দিয়ে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম আরেকজন উল্লেখযোগ্য নারী চিকিৎসক হলেন অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী। তিনি বাংলাদেশের বরণ্য চিকিৎসকবৃন্দের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী না হলেও এই কলেজের শিক্ষার্থীদের যোগ্য চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা রাখেন। তিনি যখন জন্ম গ্রহণ করেন তখন পূর্ববাংলায় কোনো মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববাংলার প্রথম মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। ইংরেজ শাসনামলে বাঙালি মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেও এক উদার, উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত, আলোকিত পরিবারের সংস্পর্শে এসে চিকিৎসাশিক্ষায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ পান। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, কুসংস্কারে আবদ্ধ পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজে পরিবর্তনের সূচনা করে নারী জাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন। পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যায় যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তা পূর্বে ছিল কল্পনাতীত। বিশেষ করে, বাঙালি মুসলিম নারীদের পদচারণা ছিল খবুই যৎসামান্য। তথাকথিত ধর্মীয় বিধি নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ সমাজে চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁর পদচারণা ছিল এক নবজাগরণ। তিনি সমাজের কুসংস্কার আর সংকীর্ণতার বলয় ভেঙ্গে আর্ত মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং মানবসেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও কুসংস্কারকে ভেঙ্গে মানবকল্যাণমূলক সমাজ গঠনের যে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তা ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য এক দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ। পূর্ববাংলার নারীদের চিকিৎসাশিক্ষায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রদর্শিত আর্দশের পথে অগ্রসর হয়ে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নারী চিকিৎসকগণ নিরলস শ্রম দিয়ে আসছেন। তিনি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি চিকিৎসাকে শুধু পেশা হিসেবে নয়, মানব সেবার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অসংখ্য নারী আজ তাদের অসাধারণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

এই মহিয়সী নারী ১৯১২ সালের ১৫ অক্টোবর কাজী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল মাদারিপুর জেলার কালকিনি থানার গোপালপুর গ্রামে। তাঁর বাবা তৎকালীন প্রথিতযশা চিকিৎসক ডা. কাজী আব্দুস সাত্তার ১৮৯৫ সালে ঢাকা মেডিকেল স্কুল থেকে এল.এম.এফ. ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে কলকাতা থেকে 'সার্জন অব ইন্ডিয়া' কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেন। চিকিৎসা কাজে নিয়োজিত থাকায় ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়ান। সেই সূত্রে ডা. জোহরা বেগম কাজী পিতার কর্মস্থল ভারতের মধ্য প্রদেশের রাজনানগাওয়ে তাঁর প্রথম জীবন কাটান। তাঁর বাবা তাঁকে ও তাঁর বোন শিরিন কাজীকে মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ করতেন আর সুযোগ পেলেই অসুস্থদের সেবা শুশ্রূষা করতে বলতেন। শৈশব থেকেই তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল কন্যাদের মনে সেবাধর্মের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, নারীরা পর্দার আড়ালে জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় ধুকে ধুকে মারা যায়। তাদের জন্য নারী চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই সে সময় থেকে ঠিক করেন, তাঁর মতোই কন্যাদেরকেও চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তুলবেন। তিনি এই আশা পূরণ করার জন্য তাঁর কন্যাদের মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দেন। ক্ষুদ্র মানসিকতার মানুষেরা তাঁকে কটাক্ষ করে বলত, 'মেয়েদের খ্রিস্টান স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন, ওরা তো খ্রিস্টান হয়ে যাবে। তিনি নিরুৎসাহিত না হয়ে বরং দঢ়বদ্ধচিত্তে জবাব দেন, ওরা সাচ্চা মুসলমান হয়েই বেরোবে।'[১০৭] অবশেষে তাঁর কন্যারা তার স্বপ্ন পূরণ করে, যা তদের কাজের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। ১৯২৯ সালে জোহরা বেগম কাজী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম

মুসলিম নারী হিসেবে প্রথম নিয়মিত শিক্ষাবৃত্তি লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এরপর তিনি দিল্লির 'লেডি হার্ডিং মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন' এ ভর্তি হন। এশিয়া মহাদেশে এটিই নারীদের জন্য প্রথম মেডিকেল কলেজ। তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি মুসলিম ছাত্রী। মুসলিম ও খিস্ট্রান মেয়েদের জন্য নির্ধারিত কোটা ছিল। এখানে প্রতি বছর ২০ জন করে ছাত্রী ভর্তি করা হতো। ১৯৩৫ সালে তিনি এই কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাশ করেন এবং তাঁকে সম্মানজনক 'ভাইস রয়াস' পদকে ভূষিত করা হয়। এরপর কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তিনি সব সময় মনে করতেন অসুস্থ মানুষের কোনো জাত নেই। চিকিৎসা পেশা সার্বজনীন। তিনি চিকিৎসা সেবায় এই আর্দশের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। সর্বস্তরের মানুষের সেবা করেছেন। তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতাবাদী মানুষ ছিলেন। সকল ধর্ম বর্ণের মানুষকে এক সূত্রে গাঁথা মানবজাতি হিসেবে বিচার করে তিনি তাঁর মানবীয় সেবার ব্রতকে মহীয়ান করে তোলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রবাদ পুরুষ মহাত্মা গান্ধী পরিবারের সাথে তার যোগাযোগ ছিল। দরিদ্র অসহায় মানুষের জন্য গান্ধীজি যে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে অবৈতনিকভাবে কাজ করেছেন। তিনি গান্ধীজির অসাম্প্রদায়িক আদর্শে প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত হন।

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ডা. জোহরা বেগম কাজী ও তাঁর ছোট বোন ডা. শিরিন কাজী এবং বড় ভাই বিশিষ্ট কবি কাজী আশরাফ মাহমুদকে নিয়ে ভারত থেকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। দুই বোনই ঢাকা মেডিকেল স্কুলে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালে ডা. জোহরা বেগম কাজী ঢাকা মেডিকেল কলেজে যোগদান করেন। কঠিন পর্দাপ্রথার অন্তরালে মেয়েরা দিন দিন নিঃশেষিত হচ্ছিল। এরকম জটিল সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে কোনো কিছু করা কষ্টকর ছিল, কিন্তু সবধরনের জটিলতা মোকাবেলা করে মানুষের সেবায় এগিয়ে যান। তৎকালীন সময়ে নারী চিকিৎসকের অভাবে বাংলার অগণিত নারী ও শিশুরা বিনা চিকিৎসায় মারা যেত, যা তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি নারীদের চিকিৎসাশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবার মহান ব্রত নেন। তিনি যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন ছিলেন, তখন তাঁর কাছে পর্দানশীল নারীরা চিকিৎসার জন্য আসলেও তা সংখ্যায় নগণ্য ছিল। তিনি নারীদের হাসপাতালে আসার অনুপ্রেরণাদানে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে স্বাস্থ্য সেবার পরামর্শ দান করেন। সে সময়ের নারীরা মনে করত পর পুরুষের কাছে চিকিৎসা সেবা নেওয়ার চেয়ে মরণ ভালো। এই জাতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাস ভাঙ্গার ক্ষেত্রে এবং তাদের মনোভাবকে উন্নত ও আধুনিক করতে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হওয়ার পেছনে যে কারণ ছিল, সে সম্পর্কে তিনি বলেন,

> শৈশবে তখন আমি বাবার সাথে তাঁর কর্মস্থলের একটি বাড়িতে থাকতাম। সে সময় আমদের প্রতিবেশী একজন মা সন্তান প্রসবের সময় একেবারে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। বাবা আমাকে বলেন যে, এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে অবশ্যই আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি এভাবেই একজন বিশেষজ্ঞ নারী চিকিৎসক হবার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর স্বপ্ন স্বার্থক করতে আমার এই অর্জন।[১০৮]

অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী বরাবরই প্রচারবিমুখ নীরব কর্মী ছিলেন। অর্থ, যশ, সম্মান, প্রতিপত্তির লোভ তাঁকে স্পর্শ করেনি। তাঁর সুযোগ্য ব্যবস্থাপনায় বর্তমান বাংলাদেশ ও দেশের বাইরেও চিকিৎসকদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থান গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রথিতযশা চিকিৎসকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই তাঁর প্রত্যক্ষ শিক্ষার্থী হবার গৌরব লাভ করেন। এ ক্ষেত্রে যার নাম উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যায়, তিনি হলেন জাতীয় অধ্যাপক শাহলা খাতুন। তিনি তাঁর সহকারী ডাক্তার হিসেবে কাজ করেছেন। চিকিৎসাশিক্ষায় বিশেষ করে স্ত্রীরোগ ও প্রসুতিবিদ্যায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তা তিনি ডা. জোহরা বেগম কাজী কাছ থেকে পেয়েছেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে হাতে কলমে জটিল অপারেশন করা

শিখেছেন। অধ্যাপক শাহলা খাতুন বলেন, তখনকার দিনে লেডি ডাক্তার বলতে একজনকেই সবাই চিনতেন। তিনি স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিভাগের প্রধান[১০৯] এবং নিয়মানুবর্তি ছিলেন। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে সামান্যতম দেরি করে আসলেও প্রবেশের অনুমতি দিতেন না। পাঠ্য বিষয়কে অনেক সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দিতেন এবং তাঁদের হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন। শুধুমাত্র লেকচার প্রদানে সীমাবদ্ধ থাকতেন না। শিক্ষার্থীদের প্রায়োগিক জ্ঞানের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জটিল অপারেশন পরিচালনা করেন। জাতীয় অধ্যাপক শাহলা খাতুনের উপরি-উক্ত বক্তব্য থেকে তা বোঝা যায়। এটা তিনি করতেন যাতে কোনো ভুল চিকিৎসা না হয়। তিনি ব্লাড ব্যাংক সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। যে কোনো রোগী ভর্তির সময় রোগীর আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে রক্ত দেওয়ার অঙ্গীকার পত্র নিয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করতেন। হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় বিশ্রাম নিতেন না। জাতীয় অধ্যাপক শাহলা খাতুন তাঁর নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যের ব্যাপারে অবগত ছিলেন।[১১০]

তিনিই প্রথম নারী রোগীদের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে ঢাকা মেডিকেল কলেজে স্ত্রীরোগ ও প্রসুতিবিদ্যা বিভাগটি প্রতিষ্ঠা করেন, যা ইতিহাস হয়ে রয়েছে। তিনি প্রায়ই অসুস্থদের চিকিৎসা পদ্ধতির যৌক্তিকতা বোঝাতেন, যা কষ্টসাধ্য ছিল। তার সেবায় অসংখ্য নারী, শিশু, নবজাতক থেকে মৃত্যুপথযাত্রী সুস্থ হয়ে ওঠে । তিনি সমাজ সচেতন ছিলেন। তিনি এই অঞ্চলের নারীদের অধিক মা হওয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতেন। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ যে একটি দেশ বা বিশ্বের জন্য হুমকীস্বরূপ, তা তিনি সে সময়েই অনুভব করেন। তিনি বহু গরিব শিক্ষার্থীদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন। বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সহায়তা দিয়েছেন। সৎ শিক্ষক হিসেবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত করেননি। পরবর্তীতে মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি আরো কিছু হাসপাতাল তথা হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে অনারারি কর্নেল ছিলেন। তিনি তাঁর কর্মময় সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রীয় খেতাবে ভূষিত হন। ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে 'তঘমা-ই-পাকিস্তান' খেতাবে ভূষিত করেন। তিনিই প্রথম এই উচুঁ পর্যায়ের খেতাব লাভ করেন। তিনি পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করলেও কখনো বাঙালিত্বকে বিসর্জন দেননি। সারাজীবন অত্যন্ত সাদাসিধে নির্মোহ জীবনযাপন করে গিয়েছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবসেবা ও কল্যাণের প্রশ্নে অটল অবিচল থেকেছেন। তিনি চিকিৎসার মহান পেশায় নিয়োজিত থেকে যেমন অসংখ্য জটিল রোগে আক্রান্তদের সারিয়ে তুলেছেন, ঠিক তেমনি শিক্ষকতার মাধ্যমে গড়ে তুলেছেন বিপুল সংখ্যক কৃতি চিকিৎসক। যারা আজ দেশ বিদেশে বর্তমান বাংলাদেশের সুনাম অর্জন করার পাশাপাশি আর্ত-মানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক শাসনের শুরুর দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও চিকিৎসাশিক্ষা প্রবর্তনে ব্যাপক বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, অন্ধবিশ্বাস, অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার প্রভৃতি কারণে নারীরা সব ধরণের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হতো। কখনও কখনও তারা সুচিকিৎসার অভাবে মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করত। বিশেষ করে তৎকালীন সময়ের নারীরা সন্তান প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সময়ে নানারকম শারীরিক জটিলতার কারণে মৃত্যুবরণ করত। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের বাধার কারণে তারা সাধারণ শিক্ষা থেকে শুরু করে চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকত। কালক্রমে মা ও শিশু স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টি ব্যাপকভাবে গুরুত্ব পেতে থাকে। এ ক্ষেত্রে খ্রিস্টান নারী মেডিকেল মিশনারিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা পাশ্চাত্য চিকিৎসার ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেন এবং ভারতীয় নারীদের হাসপাতালে

যেতে উদ্বুদ্ধ করেন। প্রয়োজনে তারা শুধুমাত্র নারীদের জন্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রতি ভারতীয় নারীদের আস্থা জন্মাতে থাকে। পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রযুক্তি বিশেষ করে স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত চিকিৎসার পদ্ধতি হিসেবে অস্ত্রোপচার বা সার্জারির জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত নর্থ ইন্ডিয়া স্কুল অব মেডিসিন এর মেডিকেল মিশনারি এডিথ ব্রাউন বলেন,

> I recall a case where a young woman had a large tumor remvoed... her sister was envious of all the interest excited as she told them of the preparation and of the operating theatre... I was asked to see the sister and I found to her joy, that she too required an operation.[১১১]

পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের নানারকম কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা দূর হতে শুরু করে। সমাজের কিছুসংখ্যক রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ (রাধাকান্তদেব, রামকমল সেন) পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রহণে গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রচার ও প্রসারের ফলে ভারতীয় নারীদের পাশ্চাত্য চিকিৎসা গ্রহণে হাসপাতালে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে ঔপনিবেশিক ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজে (কলকাতা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, দিল্লি) নারীরা ভর্তি হতে শুরু করে। এ সময় ঔপনিবেশিক ভারত সরকার সাম্রাজ্যের এই অংশের (নারী) স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাই নারী চিকিৎসক সৃষ্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম একটি পরিকল্পনা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ভারতীয় নারীদের পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণে কঠোর কোনো সামাজিক বিধি নিষেধ ছিল না, বরং এ সময় সম্ভ্রান্ত পরিবারের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারীরা পরিবারের উৎসাহেই চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণ করেন। ফলে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে পূর্ববাংলায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে নারীদের ভর্তির ব্যাপারে কোনো সামাজিক, পারিবারিক ও আইনগত প্রতিবন্ধকতা ছিল না। এটা তখন সময়ের দাবি ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নারীরা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারলেও পূর্ববাংলার নারীরা মেডিকেল কলেজ না থাকার কারণে ভর্তি হতে পারছিল না। কেউ কেউ দিল্লি, কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতো, যা সবার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঢাকা মেডিকেল কলেজে পর্যালোচিত সময়ে যত নারী শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে প্রত্যেকে পারিবারিক ও নিজ ইচ্ছাতেই ভর্তি হয়েছে। পরিবার তাদের পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে। তারা পরিবারের সদস্যদের কাছে গর্বের বিষয় ছিলেন। তবে তখন কিছু কিছু পরিবারের রক্ষণশীলতা বিদ্যমান থাকায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ শিক্ষিত হলেও তারা তাদের কন্যা, বোন, এবং স্ত্রীদের উচ্চশিক্ষিত করতে আগ্রহী ছিল না। তাদের কাছে কন্যা সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত ও অর্থ উপার্জন করার চেয়ে ঘর সংসার করাকে একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করত। এসব পরিবার পুত্র সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করতে বেশি আগ্রহী ছিল। এসব পরিবারের মেয়েরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা এবং চিকিৎসাশিক্ষার মতো কারিগরি শিক্ষা নিতে পারেনি। এমনও দেখা যায় চিকিৎসক পিতা তার কন্যাকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখেন। অথচ কন্যা সন্তান পুত্র সন্তানদের মতো সুযোগসুবিধা পেলে চিকিৎসক বা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে সমাজে ভূমিকা রাখতে পারত। গবেষণায় পর্যালোচিত সময়ে সামাজিক ও পারিবারিক কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না, বরং এসব প্রতিবন্ধকতা ধীরে ধীরে দূর হতে থাকে। উপরন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসার আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ববাংলার সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সাধারণ

জনগণ অবগত হয়। আধুনিক চিকিৎসার অভাবে মা ও শিশু মৃত্যুর হার বেশি হওয়ায় এই অঞ্চলের নারীদের চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণ ছিল বাস্তবসম্মত দাবি। পূর্ববাংলার নারীরা যাতে উন্নত চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত হয়, তাদের জন্য নারী কোটাসহ বৃত্তি ও হোস্টেলের ব্যবস্থা করা হয়। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কম ছাত্রী ভর্তি হলেও পরবর্তীতে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ে ছাত্র ভর্তির চেয়ে ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বেশি এবং এম.বি.বি.এস. পাশ করা ছাত্রীর সংখ্যাও বেশি। এমনকি ছাত্রীরা শুধু সংখ্যাই বেশি নয়, শীর্ষস্থানগুলো তারা দখল করেছেন। ২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মেডিকেল কলেজগুলো থেকে পাশ করা শীর্ষ ১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন ঢাকা মেডিকেল কলেজের। তাঁর মধ্যে ৭ জনই ছাত্রী।[১১২] এর প্রধান কারণ নারীদের পড়াশোনার ব্যাপারে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা, পরিবারের ইচ্ছা ও বিয়ের বাজারে এই পেশার ব্যাপক চাহিদা ও জনপ্রিয়তা রয়েছে।[১১৩] আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নারী চিকিৎসক মানেই গাইনোকোলজিস্ট না। ঢাকা মেডিকেল কলেজের নারী চিকিৎসকদের কর্মময় জীবন তালিকা দেখে তা বোঝা যায় *[পরিশিষ্ট দেখুন- ৪২]*। গাইনোকোলজিস্ট হওয়ার চেয়ে অন্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার আগ্রহ ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গাইনোকোলজিস্টকে অনেক বেশি সময় ও শ্রম দিতে হয়। এর ফলে গাইনোকোলজিস্টদের সংখ্যা অন্যান্যদের চেয়ে কম। সে সময় সমগ্র পূর্ববাংলায় ছাত্রী সংখ্যা কম থাকার কারণে গাইনোকোলজিস্টদের সংখ্যা কম ছিল। সাম্প্রতিক সময়ের ২০০৭-২০১৬ সালের ১০ বছরের গবেষণার জরিপে দেখা যায় যে, পাশ করা নারী চিকিৎসকদের ৯১% স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে আগ্রহী। বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলে (এম.বি.ডি.সি.) নিবন্ধিত ৩৪৬৯৭ জন চিকিৎসকের তথ্য বিশ্লেষণ করে ব্রাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ ও আই.সি.ডি.ডি.আর.বি. গবেষকরা দেখেন, ৮৭% পুরুষ চিকিৎসকের মেডিসিন ও সার্জারি এবং ৯৬% নারী চিকিৎসকের প্রসুতি ও স্ত্রীরোগ বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে।[১১৪] আবার এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, একজন নারী গাইনোকোলজিস্ট যতটা স্বচ্ছন্দে চিকিৎসা সেবা দিতে পারেন, পুরুষ চিকিৎসক ততটা পারেন না। বর্তমান সময়ে এটা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় অধ্যাপক শাহলা খাতুন এর বিভিন্ন মন্তব্য থেকে তা জানা যায়। এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য পূর্ববাংলার জনসাধারণকে উন্নত চিকিৎসা সেবা দেওয়া এবং এই অঞ্চলে উন্নত চিকিৎসকের ঘাটতি পূরণ করা। গবেষণার পর্যালোচিত সময়ে দেখা যায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধিকাংশ (৮০%) চিকিৎসক উন্নত ও নিশ্চিত জীবন যাপনের আশায় বিদেশে চলে যায় এবং সেখানে তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। বিশেষ করে ১৯৭০ এর দশকে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে হেলথ পলিসি (NHSR Act 1973)[১১৫] পরিবর্তন সংক্রান্ত এ্যাক্ট পাশ হয়। এই এ্যাক্টের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে চিকিৎসকদের জন্য প্রচুর চাকুরির সুযোগ তৈরি হয়। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশের চিকিৎসকগন ইংল্যান্ডে যেতে শুরু করে। অথচ তৎকালীন পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশে তখন বিপুল সংখ্যক উচুঁ স্তরের চিকিৎসকের ঘাটতি বিদ্যমান ছিল। যারা থেকে গেছেন তারা নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সবার চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন। তারা শুধু দেশেই নন বিদেশেও চিকিৎসা সেবা দিয়ে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন। এমনকি বিদেশিদের সাথে প্রতিযোগিতা করে যোগ্যতা দিয়ে নিজেদের অবস্থান করে নিয়েছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের নারী চিকিৎসকগণের চিকিৎসা সেবার মান যে উন্নত তা চিকিৎসা সেবার কার্যক্রম থেকে বোঝা যায়। এই নারী চিকিৎসকগণ শুধু চিকিৎসা ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী ও মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমান সময়ে চিকিৎসা সেবা দিয়ে দেশ ও জনগণের সেবা

করে যাচ্ছেন। তাদের দ্বারা পরিচালিত চিকিৎসাসেবা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক চিকিৎসা পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে শহরে ছুটে আসতে হয়না। এই মেডিকেল কলেজের পাশ করা নারী চিকিৎসকদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক চিকিৎসা সেবা সকলের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের বেশ অগ্রগতি হয়েছে। তাদের আর্দশকে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের মেয়েরা চিকিৎসাশিক্ষা ও পেশাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। পরিবার তাদের অগ্রাধিকারকে প্রাধান্য দিচ্ছে। সমাজ ও পরিবারের সমর্থন এবং নিজেদের মেধার জোর থাকায় নারীদের চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন বাধাঁগ্রস্থ হচ্ছে না। বর্তমান সময়ে নারী চিকিৎসকের সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। নারী চিকিৎসকের এই সংখ্যাধিক্যকে অনেকেই ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন।[১১৬] এভাবে গাইনোকোলজিস্ট ও নারী চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি দেশের মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক। জাতীয় অধ্যাপক শাহলা খাতুন বলেন, 'মেডিকেল শিক্ষা ও পেশা চর্চার ক্ষেত্রে মেয়েরা অনেক বেশি নিবেদিত চিত্ত ও আন্তরিক। পরিবারের অনেক দায়িত্বপালন করার পর তারা ক্লাসে আসে, হাসপাতালে কাজ করে, ফাঁকি দেয় না। বর্তমান সমাজ এখানে মেয়েদের অনেক সমর্থন দিয়েছে। আমি চাই আরো মেয়ে এই পেশায় আসুক।'[১১৭]

তথ্যনির্দেশ

১. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১।

২. *রেজিস্ট্রার খাতা*, DMC Student Section, Dhaka Medical College, ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০।

৩. Dr. Debasis Bose, Dr. Sankar Kumar Nath, Dr. Jayanta K. Das (ed.), 175 *Years of Medical College Bengal,* Medical College Ex-Students' Association, Administrative Block, College Street, Kolkata 2009, p. 115.

৪. Mita Bhadra 'Indian Women in Medicine: An Enquiry Since 1880', *Indian Anthropologist,* Vol: 41, No. 1, 2011, p. 20.

৫. Geraldine Forbes, '*Women in Colonial India: Essays on Politics, Medicine and Historiography', D.C Publications,* New Delhi, 2005, উদ্ধৃত, Mita Bhadra 'Indian Women in Medicine: An Enquiry Since 1880', *Indian Anthropologist,* Vol: 41, No. 1, 2011, p. 20.

৬. Maneesha Lal, 'Purdah as Pathology: Gender and the Circulation of Medical Knowledge in Late Colonial India' in Sarah Hodges (ed.), *Reproductive Health in India: History, Politics, Controversies,* Orient Longman, New Delhi, 2006, pp. 85-114. উদ্ধৃত, Mita Bhadra; 'Indian Women in Medicine' *Indian Anthropologist,* p. 20.

৭. Chittabrata Palit, Aparajita Dhar (ed), *Medical History of India: Discipline, Disease, Death,* Kunal Books, New Delhi, 2019, p. 298.

৮. Ruth Compton Brouwer, *New Women for God: Canadian Presbyterian Women and India* Missions, 1876-1914, University of Toronto press, 1990, p. 113.

৯. Chittabrata Palit, Aparajita Dhar (ed), *Medical History of India,* pp. 296-97.

১০. উলিয়াম জ্যাকসন এলমস্লি বলেন, 'Is there no other key but that of education with which to open the door to the inner social life of India? We think there certainly is one other such key, and that key is female medical missions... the practice of medicine by a lady, for the prupose, not merely of curing, but christianizing her patients. This is a key that may be said to fit every lock, for we believe, that there are few, if any, homes into which the lady medicala missionary would not be heartily welcomed and blessed for her humane efforts. She would find an entrance where the educational missions would find the door closed. She would soften bigotry, remove prejudice dispel ignorance, drive away gloom, and obtrusively, but neverthless effectually, deposite the all-prevading leaven of the Gospel in numberless hearts and homes.' দেখুন, William Elmslie, *Medical Missions*; as Illustrated by some letters and notice of the late Dr. Elmslie, Edinburgh Medical Missionary Society, 1874 pp 191-92.

১১. Ruth Compton Brouwer, *New Women for God*, 1990, p. 7.

১২. *Report by E.G. Balfour,* Inspector-General Hospitals, Indian Medical Department to W. Hudleston, Chief Secretary to Government of India, 16 April 1872, quoted in Medical Mission at Home and Abroad, 3 January, 1879 p.47 উদ্ধৃত, Chittabrata Palit, Aparajita Dhar (ed), *Medical History of India,* p. 296.

১৩. Chittabrata Palit, Aparajita Dhar (ed), *Medical History of India,* p. 296.

১৪. William Elmslie, *Medical Missions*; p 191.

১৫. Chittabrata Palit, Aparajita Dhar, (ed), *পূর্বোক্ত,* p. 296.

১৬. Ambalika Guha, 'The 'Masculine' Female: The Rise of Women Doctors in Colonial India c. 1870-1940', *Social Scientist,* Vol. 44, No. 5/6, May-June 2006, p. 51.

১৭. *Proceedings of the Lieutenant Governor of Bengal,* General Department, Medical Branch, Progs 1-7, August 1867, উদ্ধৃত, Ambalika Guha, 'The 'Masculine' Female: The Rise of Women Doctors in Colonial India c.1870-1940', *Social Scientist,* Vol. 44, No. 5/6, May-June 2006, p. 51.

১৮. Ambalika Guha, 'The 'Masculine' Female: The Rise of Women Doctors in Colonial India c. 1870-1940', *Social Scientist,* Vol. 44, No. 5/6, May-June 2010, p. 51.

১৯. Antoinette Burton, 'Contesting the Zenana: The Mission to Make "Lady Doctor's for India" 1874-1885', *The Journal of British Studies,* Vol. 35, No. 3, July 1996, pp. 336-397.

২০. Chittabrata Palit, Aparajita Dhar (ed), *পূর্বোক্ত*, p. 297|

২১. Mridula Ramanna, *Health Care in Bombay Presidency* 1896-1930, Primus Books, New Delhi 2012, p. 5, উদ্ধৃত, Ambalika Guha, 'The 'Masculine' Female: The Rise of Women Doctors in Colonial India c. 1870-1940', *Social Scientist*, p. 52.

২২. Sujata Mukherjee, 'Medical Education and Emergence of Wemen Medics in Colonial Bengal, (Occasional Paper)' *Institute of Development Studies*, Kolkata, August, 2012 p.8.

২৩. বিনয় ভূষণ রায়, *চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস*, সাহিত্যলোক, ২০১২, পৃ. ২১০।

২৪. *ঐ*, পৃ. ২১১।

২৫. *ঐ*, পৃ. ২১২।

২৬. *ঐ*, পৃ. ২১৩।

২৭. *ঐ*, পৃ. ২১৪।

২৮. *ঐ*

২৯. *ঐ*

৩০. Letter from A.P. Macdonele to the DPI. dated 29 June 1883, BGDP, Education Branch, July 1883, No 4181G, উদ্ধৃত, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল : ইতিহাস ও ঐতিহ্য* ১৮৫৮-১৯৪৭, পৃ. ২৯৬।

৩১. Chandrika Paul 'The uneasy alliance: The work of British and Bengali Women Medical Professionals in Bengal 1870-1935', *PhD Dissertation,* University of Cincinnati, 1997, p. 92. উদ্ধৃত Ambalika Guha, 'The 'Masculine' Female: The Rise of Women Doctors in Colonial India c.1870-1940', *Social Scientist,* Vol. 44, 2016, p. 52.

৩২. Sujata Mukherjee. 'Women and Medicine in Colonial India: A case study of three women Doctors, *Proceedings of the Indian History Congress,* Vol. 66, (2005-2006), p. 1186.

৩৩. Sujata Mukherjee, Medical Education and Emergence of Wemen Medic's in Colonial Bengal, (Occasional Paper) *Institute of Development Studies,* Kolkata, August, 2012, p.10.

৩৪. Sujata Mukherjee. 'Women and Medicine in Colonial India: A case study of three women Doctors, *Proceedings of the Indian History Congress,* Vol. 66, (2005-2006), p. 1186.

৩৫. Sujata Mukherjee. 'Women and Medicine in Colonial India: A case study of three women Doctors, *Proceedings of the Indian History Congress,* Vol. 66, (2005-2006), p. 1187.

৩৬. এই প্রসঙ্গে আরো বলা হয় যে, 'The Indian medical women will miss all the advantages of such professional duties by their exclusion from the medical charge of important hospitals, or by being placed in an interior position there, for in the interior class of hospitals few cases of importance will ever go for treatment, and in the large and important hospitals, the major operations and other important duties will always be performed by the senior person in charge', দেখুন, Sujata Mukherjee, 'Women and Medicine in Colonial India: A case study of three women Doctors, *Proceedings of the Indian History Congress,* Vol. 66, (2005-2006), p. 1187.

৩৭. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০১।

৩৮. *ঐ*, পৃ. ৩০৫।

৩৯. 'স্যার চার্লস ইলিয়ট মন্তব্য করেন, 'চিকিৎসাশাস্ত্রে মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি তেমন কোনো অগ্রগতি লাভ করেনি। তবে এক্ষেত্রে বাংলার দৃষ্টান্ত খুব একটা অসন্তোষজনক নয়। আরো অগ্রগতি হওয়া উচিত ছিল। কলকাতা মেডিকেল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি লাভের জন্য মাত্র চারজন ছাত্রী পড়াশোনা করছে। অথচ ৫ বছরের কোর্সে এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই সরকারি বৃত্তি নিয়ে যে কেউই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে।... সার্টিফিকেট কোর্সে ছাত্রীর সংখ্যা মোট বিশ জন।' দেখুন, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *মিটফোর্ড হাসপাতাল*, পৃ. ৩০৪

৪০. ১৮৯৮ সালে বাংলার ডি.পি.আই তিনি মন্তব্য করেন, 'অতীতের মতো অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে বা মেয়েদেরকে পর্দা করে রাখা এখন নারী শিক্ষার প্রধান অন্তরায় নয়। বরং মেয়ে শিক্ষকের অভাব এবং মেয়েদের লাভবান স্বাধীন বৃত্তিতে অংশ নেয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিবন্ধকতাই সবচেয়ে বেশি দায়ী।... লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এরকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারনাও অনেককেই লেখাপড়া শেখা থেকে বিরত রাখে। এসব ছাড়াও আর্থিক দৈন্যতা দেশে মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতিকে মন্থর করে রেখেছে। অবশ্য সাম্প্রতিককালে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মেয়েরা লেখাপড়ায় এগিয়ে আসছে এবং জনগনও উৎসাহ প্রদান করছে।' দেখুন, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *মিটফোর্ড হাসপাতাল*, পৃ. ৩০৬।

৪১. Report of the Medical Committee on the Vernacular Medical Schools in Bengal-Dacca Medical School, BGDP, *Education Branch,* April 1894, No. 1-3, Bundle 17, উদ্ধৃত, শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *মিটফোর্ড হাসপাতাল*, পৃ. ৩০৭।

৪২. 'অত্রব্য মেডিকেল স্কুলে রমনীদের শিক্ষার নিমিত্ত একটি ক্লাস গত বৃহস্পতিবার হইতে খোলা হইয়াছে। তিনটি ফিরিঙ্গি যুবতী অমনি ভর্তি হইয়াছেন। মাসে ৭ টাকা করিয়া বৃত্তি ৬টি রমনীকে দিয়া ঐ স্কুলে পড়ান হইবে। লেডী ডাফরিন ফান্ডে এতঅর্থে বহু সহস্র টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল। সম্ভবত তাহা দ্বারাই এই কার্য আরম্ভ হইল। ইহাতে ফিরিঙ্গি মেয়েরা পড়ুন, অথবা জাতিভ্রষ্ট হিন্দুকামিনীরা পড়ুন, তাহাতে লাভলাভ সমান কথা', আরো দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, রবিবার ২৩ জুন ১৮৯৫, পৃ. ৬।

৪৩. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১০-৩১১।

৪৪. R. Nathan, Progress of Education in India 1867-1888, 1901-1902, Vol. 2, Government Printing Press, Calcutta, pp. 96-112. উদ্ধৃত, Mita Bhadra, 'Indian Women in Medicine: An Enquiry Since 1880, *Indian Anthropologist,* Vol. 41, No. 2011, p. 22.

৪৫. Shamshad and B.A. Dabla, 'A Sociological Perspective on Kashmiri Women in Medical Profession' *J.K. Practitioner,* Vol. 14, No.2, 2007, pp. 119-120.

৪৬. *ঐ*,

৪৭. একজন নারী চিকিৎসকের অভিব্যক্তি- 'In those days a lady doctor's life was like a missionary nun's. She was not supposed to marry. Her's was a dedicated life to serve the society. In those days no family would accept a doctor daughter. Nobody would even dare to marry a lady doctor. Naturally, relations and friends disliked my talking up the medical profession.' দেখুন, Dr. Debasis Bose, Dr Sankar Kumar Nath, Dr. Jayantta K. Das (ed.), 175 *Years of Medical College Bengal,* Medical College Ex-Students' Association, 2009, p. 116.

৪৮. *ঐ*

৪৯. *Report of the Health Survey and Development Committee, Survey,* Vol. 1, Government of India Press, Calcutta 1946, p. 64.

৫০. *ঐ*

৫১. *ঐ*

৫২. *ঐ*

৫৩. *ঐ*

৫৪. 'আতুঁড় ঘর'-মৃত শিশুদের মধ্যে শতকরা ১১ জন প্রসবের ৬ দিনের মধ্যেই আঁতুড় ঘরের দোষে মারা যায়। দেশের জন সাধারণ এতই কুসংস্কারাপন্ন যে, যে গৃহটি অন্য সকল কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত, যে গৃহ বাস্তবিক পক্ষে অব্যবহার্য্য তাহাই সময়মত আঁতুড় ঘরে পরিণত করা হয়। দেশ প্রচলিত প্রথানুযায়ী গর্ভবতী রমণী প্রসব সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে যমালয় সদৃশ আঁতুড় ঘরে নীত হয়। কোন পক্ষই কোন রূপ অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করে না। সম্ভবত; একটি মাত্র দরজা বিশিষ্ট, আলো-বাতাসহীন, স্যাঁতস্যেঁতে মেঝে বিশিষ্ট, ধোয়ায় ভরা, ছেড়া মাদুর, নোংরা কাঁথা, ন্যাকড়া ও আবর্জনা পূর্ণ ক্ষুদ্র ঘর আঁতুড় ঘরের জন্য নির্দিষ্ট হয়।

এই মাহাপাপের ফলস্বরূপ প্রতি বৎসর লাখে লাখে শিশু মায়ের কোল খালি করিয়া যাইতেছে। এই মরণ সহজেই নিবারণ করা যায়- সেজন্য চাই ইচ্ছা, চেষ্টা ও যত্ন। অন্যান্য দেশে শিশু মৃত্যু খুবই কমিয়া আসিতেছে আমাদের চৈতন্যোদয় হইবে কবে? আরো দেখুন, 'পূর্ব্বকালে সূতিকা ঘর কিরূপ ছিল', *স্বাস্থ্য সমাচার*, ৩১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৪৯, পৃ: ৩৯ ।

৫৫. *Report of the Health Survey and Development Committee, Survey,* Vol. 1, Government of India Press, Calcutta 1946, p. 63.

৫৬. *Report of the Health Survey and Development Committee,* Vol, IV, The Manager Government of India Press, New Delhi, 1946, p. 65.

৫৭. ভোর কমিটি সাধারণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ করে যে, 'The purpose that general education has in view is to develop the individual into a useful citizen the purpose of health education is to inculcate the principles of healthful living in order to secure the full co-operation of the individual in the maintenance of his own health. With general education the task of imparting instruction in health matter restricting the methods of appeal to the spoken word or to visual demonstration, education in its wider sense is essential in order to promote a general raising of the standard of culture in the community and to quicker the sense of civic responsibility of the individual'. দেখুন, *Report of the Health Survey and Development Committee, Survey,* Vol.I, p. 16.

৫৮. সোনিয়া নিশাত আমিন, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*, ১৮৭৬-১৯৩৯ (অনুবাদ: পাপড়ীন নাহার), বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০২, পৃ. ১৩৫।

৫৯. সাক্ষাৎকার, ডা. সাঈদ হায়দার, বয়সঃ ৯৫ (১৯২৫-২০২০), ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, তারিখঃ ২৫/২/২০২০।

৬০. *B Proceedings*, B. No. 126, SL. No. 100, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953.

৬১. *ঐ*

৬২. নোটস-অব-অর্ডার (Notes of order) এ আরো উল্লেখ করা হয়, 'It is stated by Vice-Principal Medical College, Dacca that it was practice in the Calcutta Medical College Hospital that sick male students of the medical college had been allowed to have a separate room with several beds in the hospital for their treatment. Following the above principle the sick male students of the Dacca Medical College have been allowed to have separate room with 8 beds in the hospital for their treatment.' দেখুন, *B Proceedings*, B. No. 126, SL. No. 100, List No. 109, *Health and Local-Self Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953.

৬৩. *ঐ*

৬৪. সাক্ষাৎকার, ডা. সাঈদ হায়দার, বয়সঃ ৯৫ (১৯২৫-২০২০), ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, তারিখঃ ২৫/২/২০২০।

৬৫. *Alumni Directory, Dhaka Medical College*, Dhaka Medical College Alumni Trust, 2002, p. 24.

৬৬. *ঐ*, p.31, এবং *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1946-52, East Bengal Government Press, 1954, p. 149.

৬৭. *Alumni Directory, Dhaka Medical College*, Dhaka Medical College Alumni Trust, 2002, p. 33.

৬৮. *ঐ*, pp. 36-37.

৬৯. সোনিয়া নিশাত আমিন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৪।

৭০. সাক্ষাৎকার, জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন, বয়সঃ ৮১ (১৯৩৯), ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৫৬-৫৭ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী, প্রাক্তন অধ্যাপক (ডিএমসি), চেয়ারপার্সন, গ্রীন লাইফ কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, তারিখঃ ২২/২/২০২০।

৭১. সারওয়ার আলী, *পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ*, প্রথমা, ২০১০, পৃ. ৩১।

৭২. Dr. Debasis Bose, Dr. Sankar Kumar Nath, Dr. Jayantta K. Das (ed.), 175 *Years of Medical College Bengal*, Medical College Ex-Students' Association, 2009, p. 121.

৭৩. সাক্ষাৎকার, জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন, বয়স ৮১ (১৯৩৯), ২২/২/২০২০।

৭৪. *ঐ*

৭৫. *Alumni Directory, Dhaka Medical College*, Dhaka Medical College Alumni Trust, 2002, pp.24.

৭৬. সাক্ষাৎকার, জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন, বয়সঃ ৮১ (১৯৩৯), তারিখঃ ২২/২/২০২০।

৭৭. *ঐ*

৭৮. *ঐ*

৭৯. শফিক হাসান, *চিকিৎসা সেবায় শাহলা খাতুন*, উৎস প্রকাশন, ২০১৫ পৃ. ৬২।

৮০. চিঠিতে প্রসুতি রোগী উল্লেখ করেন, '৪দিন প্রসব বেদনাসহ চলৎশক্তিহীন ও মৃতকল্প অবস্থায় গত ৯/৯/৫৬ তারিখে বৈকাল ৫ টায় আমি রাজশাহী সদর হাসপাতালের 'প্রসুতিকক্ষে' ambulance ও ষ্ট্রেচোর যোগে নীত হই। রাত্রি ৩ ঘটিকায় নিদারুন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া Duty রত nurse এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট Lady Doctor সাহেবাকে আহ্বান করি। নার্স জানাইলেন যে, Lady Doctor, নিদ্রামগ্ন আছেন। এ সময়ে তাঁহাকে জাগাইবার সাহস তাহার নাই, তৎপর আমি সজ্ঞাহীন হইয়া পড়ি। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে আমার জ্ঞানোদয় হয় এবং জানতে পারি একটি পুত্র সন্তান প্রসব হইয়া গিয়াছে। Duty রত সেই Nurseটি এবং আমার পাশের শয্যায় অপেক্ষাকৃত সুস্থ রোগীনীরা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। Lady Doctor আসেন নাই,

ইতি

রউফন নেছা খোন্দকার',

দেখুন, *Assembly Proceedings* (Official Report), *East Pakistan Assembly*, Third Session 1956, (17^{th} to 23^{nd} Sept.), East Pakistan Government Press, Dacca, 1957, p. 222.

৮১. *Assembly Proceedings* (Official Report), *East Pakistan Assembly,* First Session 1957, 14th to 17th March 1957, East Pakistan Government Press, Dacca, 1957, p. 248.

৮২. *Assembly Proceedings* (Official Report), *East Pakistan Assembly,* First Session 1957, 1th to 3rd April 1957, East Pakistan Government Press, Dacca, 1957, pp. 64-67.

৮৩. *ঐ*

৮৪. *ঐ*

৮৫. রহিম উদ্দিন উল্লেখ করেন, 'প্রত্যেক মহকুমায় মহকুমায় maternity building করা হচ্ছে। এত সুন্দর বাড়ী ঘর গভর্ণমেন্ট করতে পারত না। এর importance গভর্নমেন্ট মুখেই বলে কিন্তু কার্যত দেখি না। সেখানে ২/১টি নার্স আছে। Lady visitor এর কর্তৃব্য হলো টাউনে ঘুরে ঘুরে propaganda করা। তা হয় না। Lady visitor নাই। এই সমস্ত maternity প্রতিষ্ঠানগুলোকে গভর্নমেন্টের take up করা উচিত। এর ফলে মফস্বলের অনেক মেয়েদের প্রসব বেদনা ও যন্ত্রণা লাঘব করা যেত।' দেখুন, *Assembly Proceedings* (Official Report), *East Pakistan Assembly,* First Session 1958, 17th to 19th March 1958, East Pakistan Government Press, Dacca, 1958, p. 111.

৮৬. *Alumni Directory, Dhaka Medical College,* Dhaka Medical College Alumni Trust, 2002, pp. 24.

৮৭. ১. 'Meternal mobility in rural Bangladesh' published in *W.H.O.*

২. 'Pelvic information after intra uterine device' published in *American Journal of Obstetrics & Gyneacology,* 1980 December.

৩. 'Treatment of vaginal fungal infection' published in current *theraputics (American Research Journal).* দেখুন, মেহেরুন নেসা খানম, *বাংলাদেশের প্রখ্যাত মহিলা চিকিৎসকদের জীবনীমূলক নির্দেশিকা*, গবেষণা পত্র, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ৫৯।

৮৮. *ঐ*

৮৯. গবেষণামূলক কাজঃ

'Retroperitoneal Teratoma' *Bangladesh Paediatrics,* Vol: 1, No: 2, 1974.

'Gastro-enteristis in Infants' (*Contribution), Essentials of Medical Treatments* by Dr. N. Islam, Vol: 6, No: 6, 1974.

'Hereditory Anhydrotic Ectodermal Dysplasia', *BMJ,* Vol: 6, No: 3, 1978.

'Immunization' (*Contribution), Medical Diagnosis and Treatments* by Dr. N. Islam, 1980.

'Immunization of Children in Bangladesh 'Scientific Papers', *Commonwealth Medical* Association.

'Prevention of Rheumatic Fever', *Dhaka Shishu Hospital Journal,* Vol: 1, No: 1, 1983.

'Clinical Profile of Rheumatic Fever in some Hospitalized Children of Bangladesh', *Medical Research Council Bulletin,* Vol: 9, No. 1, 1985.

'Management of Convulsing Child', *Bangladesh Medical Journal,* Vol. 14, No: 1, 1985.

'Use of Rectal Diazepam in the Immediate Management of Convulsion in Children', *Bangladesh Journal of Child Health,* Vol: 10, No. 2, 1986.

'Community Medicine', *Dhaka Shishu Hospital Journal.*

'Hypertension in School Children', *Awaiting publication.'* দেখুন, মেহেরুন নেসা খানম, *বাংলাদেশের প্রখ্যাত মহিলা চিকিৎসকদের জীবনীমূলক নির্দেশিকা*, গবেষণা পত্র, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ৩৬।

৯০. সাক্ষাৎকার, নাজমুন নাহার রেনু, বয়সঃ ৯১ (১৯৩০), অধ্যাপক আফজালুন্নেসা এর স্বামী বদরুল আলম এর চাচাতো বোন, তারিখঃ ১৬/০১/২০২১।

৯১. Supy duty বা Supply duty হলো Supernumerary বা সংখ্যাতিরিক্ত। সাধারণত যথেষ্ট পদ না থাকলে Supy duty দিয়ে পোস্টিং দেওয়া হয়। দেখুন, *History of Services of Gazetted Officers,* Part-II, Corrected up to 1st july 1968, Bangladesh Government Press, 1975, pp. 603-799, (BFPO), *B Proceedings,* B No. 126, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1953.

৯২. অধ্যাপক আফজালুন্নেসা ও এম. আর মাহবুব (সম্পাদিত), *প্রথম শহীদ মিনারের স্থপতি: ডা. বদরুল আলম স্মারক গ্রন্থ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. শেষ।

৯৩. সাক্ষাৎকার, ডা. জাতীয় অধ্যাপক শাহলা খাতুন, বয়সঃ ৮১ (১৯৩৯), তারিখঃ ২২/২/২০২০।

৯৪. সাক্ষাৎকার, জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন, বয়সঃ ৮১ (১৯৩৯), তারিখঃ ৩/৮/২০১৮।

৯৫. শফিক হাসান, *চিকিৎসা সেবায় শাহলা খাতুন,* উৎস প্রকাশন, ঢাকা ২০১৫, পৃ. ৫৩।

৯৬. *ঐ*

৯৭. *ঐ*, পৃ. ৮৫।

৯৮. সাক্ষাৎকার, জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন, বয়সঃ ৮১ (১৯৩৯), তারিখঃ ৩/৮/২০১৮।

৯৯. গবেষণামূলক কাজঃ

'Successful abdominal pregnancy', *The Journal of Obstetrics and Gynaecology of India,* Vol. XXXVI, 1988, P. 93

'Krukenberg Tumour of the ovary', *Bangladesh Medical Journal,* Khulna Branch, Vol. XVIII, 1985, P. 28

'Femonising tumour of the ovary', *Bangladesh Journal of Obstetrics and Gynaecology,* Vol. 1 No: 2, 1986, P. 8

'Abdominal pregnancies (Extrauterine)' *Journal of Bangladesh College of Physicians and Sergeons,* Vol. 3, No: 1, 1985, P. 33

'Management of placenta previa' *Bangladesh Medical Journal,* Khulna Branch, 1978, P. 17

'Research on Menstrual Regulations', *Bangladesh Medical Journal,* Khulna Branch, Vol. XIV 1981

'Uterus didelphys and uterus bicornis with full term alive foetus with septate vagina and double cervix', *Bangladesh Medical Journal,* Khulna Branch, Vol. XVIII, 1985, P. 33

'Conjoined twin with normal labour', *Bangladesh Medical Journal,* Khulna Branch, Vol. XXI, 1988, P. 35

'Neuri lemmoma of uterus', *Bangladesh Medical Journal,* Khulna Branch, 1988, P. 33

'Huge Multinodular uterina fibroid', *Bangladesh Medical Journal,* Khulna Branch, Vol. XVI, 1983, P. 8

'Mammoth tumour of the ovary with amenorrhae', *Bangladesh Medical Journal,* Khulna Branch, Vol. XVI, 1983, P.11

'Acute problems in Gynaecology', *Bangladesh Medical Journal,* Khulna Branch, 1978, P. 33

'A huge ovariam cyst like ascitis', *Bangladesh Medical Journal,* Vol. XIX, 1986, P. 15 দেখুন, মেহেরুন নেসা খানম, *বাংলাদেশের প্রখ্যাত মহিলা চিকিৎসকদের জীবনীমূলক নির্দেশিকা*, গবেষণা পত্র, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯০, পৃ. ৫৫-৫৭।

১০০. সাক্ষাৎকার, ডা. মাখদুমা নার্গিস, বয়সঃ ৭৫ (১৯৪৫), ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৬২-৬৩ শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তন ছাত্রী, এডিশনাল সেক্রেটারি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, তারিখঃ ১৮/১২/২০২০।

১০১. সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক ডা. নাজমুন নাহার, বয়সঃ ৭১ (১৯৪৭), ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তন ছাত্রী, শিশু বিশেষজ্ঞ (ডি.এম.সি), বারডেম, তারিখঃ ২/৭/২০১৮।

১০২. গবেষণামূলক কাজ;

'Birth weight, length, head and chest circumference and Hb. level in normal new born', *Bangladesh Medical Rescarch Council Bulletin,* Vol. iv, No. 1, 1978.

'Post diarrhoel complication as they present', *Bangladesh Paediatrics,* Vol. 4, No. 1, 1979.

'Chronic myeloid Leukaemia in a 8 months old girl', *Bangladesh Paediatrics,* Vol. 6, No. 3,4, 1982.

'Maternal medication and its effect on the foetus', *Bangladesh Medical Journal* (Khulna Branch) Vol. xviii, No. 1, 1985.

'Presentation of acute glomerulonephritis- 30 Case Reports', *Bangladesh Journal of Child Health,* Vol 9, No :3, 1985

'Cat Scratch Disease–Case Report', *Dhaka Sishu Hospital Journal,* Vol : 2, No. 1, 1985

'Acute Diarrhoel: An evaluation of non host', *Journal in Children of Bangladesh, Bangladesh Journal of Nutrition, Vol. 2, No.2, June 1984*

'Acute upper respiratory tract infection of children', *Bangladesh Medical Journal,* Vol. 16, No. 2, 1987

'Acute Diarrhoel characteristics and determine its in paediatric population of Dhaka city', *Dhaka Shishu Hospital Journal,* Vol. 4, 1988, দেখুন, 'মেহেরুন নেসা খানম, *বাংলাদেশের প্রখ্যাত মহিলা চিকিৎসকদের জীবনীমূলক নির্দেশিকা*, পৃ. ২২-২৩।

১০৩. গবেষণামূলক কাজ;

'A review of Nephrotic syndrome in childhood.' (ন্যাশনাল সেমিনার, বাংলাদেশ ১৯৭৭)

'Cost Diarrhoeal complication as they present in the hospital.' (এশিয়ান প্যাসিফিক সোসাইটি ফর পেডিয়াট্রিক গ্যাস্ট্রোইনট্রোলজি, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৭৭)

'Clinical presentation of leukaemia in children.' (পোস্ট গ্যাজুয়েট মেডিসিন রিসার্চ, বাংলাদেশ, ১৯৭৯)

'Malignancy in childhood– 5 years follow up of 60 cases.' (কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জন, বাংলাদেশ, ১৯৮১ এবং পেডিয়াট্রিক কংগ্রেস অব নেপাল, ১৯৮৪)

'Chronic hepatities in children– Clinical presentaion.' (মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সেল, বাংলাদেশ, ১৯৮৪)

'Acute lower respiratory tract infection in children, Clinicoetiological Pattern– 100 case report.' (এশিয়ান কংগ্রেস অব পেডিয়াট্রিক, জাপান, ১৯৮৮)' দেখুন, মেহেরুন নেসা খানম, *বাংলাদেশের প্রখ্যাত মহিলা চিকিৎসকদের জীবনীমূলক নির্দেশিকা*, পৃ. ২২-২৩।

১০৪. *ঐ*

১০৫. সাক্ষাৎকার, ডা. কাজী মিসবাহুন নাহার তামান্না, বয়স: ৭৩ (১৯৪৭), ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তন ছাত্রী, মুজিবনগর সরকারের প্রথম নারী মেডিকেল অফিসার, মেহের টাওয়ার, ১৬৪ বীর উত্তম সিআর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫, তারিখ: ২৪/১২/২০২০।

১০৬. *শ্রদ্ধাঞ্জলি, অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী'র দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী*, ডা. জোহরা বেগম কাজী পরিষদ, ৭ নভেম্বর ২০০৯, পৃ. ৮।

১০৮. *ঐ*, পৃ. ৮।

১০৯. *ঐ*, পৃ. ৮।

১১০. জাতীয় অধ্যাপক শাহলা খাতুন বলেন, 'আমাদের ক্লাশ শুরু হত সকাল ৭ টায়। ৭ টার পর দরজা বন্ধ করে ক্লাশ করাতেন।... পড়তে এসে তাঁর কাছে নিয়মানুবর্তিতা, সময়ের মূল্যবোধ-এর গুরুত্ব ভালোভাবে অনুভব করতে পেরেছিলাম। ক্লাসে তিনি ছিলেন কঠোর। যে কোন বিষয়ের ওপর ব্যাপক আলোকপাত করে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন এবং সফলও হয়েছেন। আদর্শ শিক্ষক হিসেবে তাঁকে খুব ভয় পেতাম। ক্লাসে তিনি প্রমাণ করেছেন, শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমঅধিকারী। তিনি ক্লাশের ছাত্রছাত্রীদের সমান দৃষ্টি দিয়ে পড়াতেন। প্রশাসনিক সফলতার পাশাপাশি তিনি মেধাশক্তি দিয়েও ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করেছেন'। দেখুন, *শ্রদ্ধাঞ্জলি, অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী'র দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী*, পৃ. ৮।

১১১. *The Journal of the Association of Medical Women in india*, February 1912, p. 24, উদ্ধৃত, Kamlesh Mohan, 'Carving Identitites, Building Hospitals and Modernizing Motherhood: A Critical Review of Edith Brown's Life and Career', Chittabrata Palit, Aparajita Dhar (ed.), *Medical History in India*, p. 313.

১১২. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ১-২।

১১৩. *ঐ*

১১৪. *ঐ*

১১৫. 'NHS Reorganisation Act 1973: Change of government and a change of secretary of state led to the white paper on National Health Service reorganisation being published in August 1972. Integration between the NHS and social care was a central aim in the paper. The NHS Reorganisation Act 1973 received royal assent on 5 July 1973 and came into effect in 1974. The act gave effect to the reforms outlined in the white paper. It represented significant structural and administrative reform of the health system and outlined plans to unify the existing tripartite health system (comprising family practitioner services, hospital services and community services, established by the NHS Act 1946) with a unitary, integrated system.' দেখুন, National Health Service Reorganisation Act 1973, Chapter-32, Part-I,II,III, The Health Foundation Policy, navigator.health.org.uk.

১১৬. 'ছাত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন জন বলেন, 'ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডিন অধ্যাপক খান আবুল কালাম বলেন, 'মেধার জোরেই মেয়েরা সংখ্যায় বেশি ভর্তি হচ্ছে, বেশি পাশ করছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে জাতীয় মেধাক্রম তৈরি হচ্ছে। এতে ছাত্রীদের প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে, ঢাকা মেডিকেল কলেজকে দেশের সেরা মেডিকেল কলেজ বিবেচনা করা হয়। মেধাতালিকায় থাকা শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হয়। ভর্তি হওয়া ছাত্রের সংখ্যা ছাত্রীদের প্রায় অর্ধেক'।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আসাদুল ইসলাম বলেন এখনো পর্যন্ত বিষয়টিকে আমরা ইতিবাচক হিসেবে দেখছি। সরকার মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সেবার ওপর জোর দিয়েছে। সেক্ষেত্রে নারী চিকিৎসকের সংখ্যাধিক্য খারাপ কিছু নয়।' দেখুন, *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ.১-২।

১১৭. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ. ১-২।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবদান

সাধারণত চিকিৎসকদের রাজনীতিবিদ বা সমাজবিদ, সংস্কৃতি মনস্ক হিসেবে দেখা যায় না। তারা সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সেবা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। চিকিৎসাশিক্ষার ছাত্র হিসেবে নিজেকে যোগ্য চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনে পুরো সময় ব্যয় করতে হয়। চিকিৎসাশিক্ষা অন্য যেকোনো কারিগরি শিক্ষার চেয়ে ব্যতিক্রম। এই শিক্ষার সাথে মানুষের জীবন মরণ নির্ভরশীল। এই শিক্ষা গ্রহণে ছাত্রছাত্রীদের অনেক বেশি মনোযোগী ও সচেতন থাকতে হয়। তাদের ভুল শিক্ষা গ্রহণ একটি দেশের জনসাধারণের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। চিকিৎসাশিক্ষার ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, বরং এই জ্ঞান অর্জনের পর তা রোগীর ওপর প্রয়োগ, রোগমুক্তি ঘটানোই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত রোগীর শয্যা পাশে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে ক্লিনিক্যাল শিক্ষা নেওয়াটা অপরিহার্য। তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের জন্য সকাল সন্ধ্যা হাসপাতালে সময় দিতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে, চিকিৎসাশিক্ষার এই অধ্যয়নের বাইরে অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করা খুবই কঠিন। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু লক্ষ্য করা যায়। তারা চিকিৎসাশিক্ষার পাশাপাশি দেশের জাতীয় ও স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন পূর্ববাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটাপন্ন ছিল। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যে দেশ বিভাগের কারণে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে। চারদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা, তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের স্বৈরশাসন, অযাচিতভাবে দেশের ভাষা সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি ঘটনা পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে এক ধরনের সংকট সৃষ্টি করে। অন্যদিকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজের নানারকম সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং কলেজের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য সংগঠিত করার প্রয়োজনবোধ করে। এই বোধ থেকে বিভিন্ন মতাদর্শের বিশ্বাসী ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় ও তাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। প্রয়োজনের তাগিদেই কলেজের কিছুসংখ্যক ছাত্র চিকিৎসাশিক্ষা পাঠে মনোযোগী হওয়ার চেয়ে জাতীয় ও স্থানীয় সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এজন্য তারা কলেজের বাইরে তথা কেন্দ্রীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং তারা তৎকালীন পাকিস্তান শাসন আমলের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

রাজনীতি ছাড়াও মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা সংস্কৃতি কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয় এবং এটা প্রকাশ পায় যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের কথা ভেবে চিকিৎসাশিক্ষা গ্রহণ করা। সংস্কৃত মনস্ক ছাত্ররা কলেজে থাকাকালীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে শিক্ষাজীবন শেষে এই চর্চা অব্যাহত রাখেননি। মেডিকেল কলেজ জীবনের এই সংস্কৃত চর্চা তাদের আত্মতৃপ্তির যোগান দিত। চিকিৎসাশিক্ষার জটিল ও কঠিন অধ্যয়নের একঘেয়েমি থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পেত। যারা সংস্কৃত চর্চার সাথে যুক্ত থাকতেন এবং যারা এটা উপভোগ করতেন উভয়ের কাছেই ছিল আনন্দদায়ক। এই সংস্কৃত চর্চাকে কেন্দ্র করে

উদযাপিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা জাগ্রত হয়। এটা মেডিকেল কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীদের শুধু চিকিৎসাশিক্ষার অধ্যয়নের প্রতি মনোযোগী করেনি বরং দেশের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে এবং দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করে। এই ধরনের উপলব্ধী থেকেই তারা পূর্ববাংলা তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবদান রাখে।

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ পূর্ববাংলার প্রথম মেডিকেল কলেজ যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে একটি উঁচু স্তরের চিকিৎসক শ্রেণি গড়ে ওঠে। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকায় মিটফোর্ড হাসপাতাল (১৮৫৮) ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল (১৮৭৫) স্থাপিত হয়। এই স্কুল থেকে যারা পাশ করে বের হতেন তারা এল. এম. এফ. ডিগ্রি অর্জনকারী চিকিৎসক। তাদের ডিগ্রি স্নাতক পর্যায়ের ছিল না। তাদের উঁচু স্তরের চিকিৎসক হওয়ার জন্য কলকাতার প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজেগুলোতে যেতে হতো। ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাদের সেই আশা পূরণ ও কষ্ট দূরীভূত হয়। তারা কলকাতায় উচ্চতর ডিগ্রি না নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সংক্ষিপ্ত বা কনডেন্সড এম.বি.বি.এস. কোর্স সম্পন্ন করত। ফলে পূর্ববাংলার সাধারণ এম.বি.বি.এস. এবং কনডেন্সড এম.বি.বি.এস. চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবে তা জনসংখ্যার অনুপাতে অপ্রতুল। এই উঁচু স্তরের চিকিৎসকদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে সমগ্র পূর্ববাংলা এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হতো। এই প্রক্রিয়া চলমান ছিল ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে একটি মাত্র মেডিকেল কলেজ ছিল।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা এই চিকিৎসকের মধ্যে কেউ কেউ মেডিকেল কলেজের শিক্ষক, কেউ সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক, কেউ কেউ বিদেশে গমন করেন এবং অনেকেই প্রাইভেট প্রাকটিস করতেন। তৎকালীন পাকিস্তান শাসনামলে সরকারি চাকুরিতে চিকিৎসকদের অবস্থান দ্বিতীয় শ্রেণি হওয়ায় বেশিরভাগই প্রাইভেট প্রাকটিস করতে আগ্রহী ছিল। এভাবেই সারা পূর্ববাংলায় ঢাকাসহ জেলা সদরগুলোতে এই চিকিৎসক শ্রেণি ছড়িয়ে পড়ে উন্নত চিকিৎসা সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে।

চল্লিশের দশক পর্যন্ত পূর্ববাংলায় নিজস্ব কোনো উঁচু স্তরের চিকিৎসক শ্রেণি ছিল না। ঢাকা মেডিকেল কলেজে যারা প্রথম ব্যাচে ভর্তি হয়েছিল তারা পঞ্চাশের দশকে পাশ করে বের হন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা চিকিৎসকদের নিয়ে এই অঞ্চলে একটা নতুন সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব হয়। যারা তৎকালীন সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত চিকিৎসা সেবাদানসহ দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাদের কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা নিয়ে দেশের ধনী ব্যক্তিসহ দুঃস্থ, আর্ত পীড়িত, দরিদ্র সকলেই উপকৃত হয়েছে। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে উন্নত চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য, যা পূর্বে সম্ভব ছিল না। উপরন্তু দেশ বিভাগের ফলে কলকাতা মেডিকেল কলেজে পূর্ববাংলার ছাত্র এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে চাকুরিরত চিকিৎসকগণ পূর্ববাংলায় চলে আসেন। তাদের সম্মীলিত সংমিশ্রনে পূর্ববাংলায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী উঁচু স্তরের চিকিৎসক শ্রেণি গড়ে ওঠা সহজতর হয়। তারা এই দেশের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা এই চিকিৎসক শ্রেণি কেবল দেশই নয় বিদেশেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন আলোচনায় তা ফুটে উঠেছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের পাশ করা ছাত্রদের জীবন জীবিকা থেকে এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য

সেবায় তাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এই ব্যাচের অনেক ছাত্র বর্তমান বাংলাদেশের বিখ্যাত চিকিৎসক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তারা বিভিন্নভাবে দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টি করে। এখানে কেবলমাত্র ১০ জনের নাম এবং কে কোথায়, কি অবস্থানে ছিলেন তার তালিকা দেওয়া হলো,

ক্র.নং	নাম	পদবি	স্থান
১.	ডা. মীর্জা মাজহারুল ইসলাম ডি.জি.ও, এফ.আর.সি.এস. (ইংল্যান্ড) এফ.সি.পি.এস, এফ.আই.সি.এস. জেনারেল সার্জারি বিশেষজ্ঞ	অধ্যাপক প্রিন্সিপাল চিফ কনসালটেন্ট	ঢাকা মেডিকেল কলেজ " বারডেম
২.	ডা. এম. এ. হালিম এম. ফিল. (করাচি) এম.পি.এইচ. (যুক্তরাষ্ট্র) মাইক্রোবায়োলজি, বিশেষজ্ঞ	অধ্যাপক এবং অতিরিক্ত-সচিব, বাংলাদেশ সরকার সচিব, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়	
৩.	ডা. আশিকুর রহমান খান ডি.পি.এইচ. (লাহোর), এম. ফিল. (মাইক্রোবায়োলজি) জনস্বাস্থ্য ও মাইক্রোবায়োলজি বিশেষজ্ঞ	ভাইস প্রিন্সিপাল পরিচালক	সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এবং মিটফোর্ড হাসপাতাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল
৪.	ডা. মাজহার আলী কাদেরী এম.আর.সি.পি. (গ্লাসগো, লন্ডন) এফ.আর.সি.পি. (গ্লাসগো) এফ.সি.পি.এস. (বাংলাদেশ) ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ	অধ্যাপক প্রথম ভিসি	ঢাকা মেডিকেল কলেজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
৫.	ডা. আবু আহমেদ চৌধুরী এফ.আর.সি.এস. সার্জারি বিশেষজ্ঞ	অধ্যাপক	ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ
৬.	ডা. শামসুদ্দিন আহমেদ	অধ্যাপক (চক্ষু)	ঢাকা মেডিকেল, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ
৭.	ডা. এ. কে. মো: কফিলউদ্দিন	অধ্যাপক এমিরেটাস অধ্যাপক প্রাক্তন পরিচালক	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ নিপসম (Nipsom)
৮.	ডা. আবু সিদ্দিক মিয়া	অধ্যাপক (সার্জারি)	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ
৯.	ডা. এ. এফ. এম.শামসুল ইসলাম	অধ্যাপক (সার্জারি)	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ
১০.	ডা. মো: আবদুল মান্নান মেডিসিন বিশেষজ্ঞ	প্রাক্তন পরিচালক	আইপিজিএমআর

উৎস: *Alumni Directory, Dhaka Medical College,* Dhaka Medical College Alumni Trust, 2002, pp. 17-18

উপরি-উক্ত তালিকা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের বেশিরভাগই পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে চাকুরি করেন। এদের কেউ কেউ শুধু প্রাকটিস করেন, আবার বিদেশে বিদেশি সংস্থায় চাকুরি করেন। কেউ কেউ এম.বি.বি.এস. পাশ করার পর বিদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি

নিয়ে কোনো বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন। দেশ বিভাগের পর অধিকাংশ হিন্দু শিক্ষার্থী কলকাতা মেডিকেল কলেজে চলে যান এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। পূর্ববাংলার ছাত্ররা উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে তারা বর্তমান বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবায় নেতৃত্ব দেন এবং ভবিষ্যৎ চিকিৎসক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষক হয়ে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। এই উঁচু স্তরের চিকিৎসক শ্রেণির বেশিরভাগ চিকিৎসা সেবা ছাড়াও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে যুক্ত থেকে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছেন। প্রথম ব্যাচের পর পরবর্তী চব্বিশটি (১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৭০-৭১) ব্যাচ থেকে একই ধারাবাহিকতায় ছাত্ররা পাশ করে বের হয়ে বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেছেন এবং উন্নত চিকিৎসা সেবা দিয়ে এদেশের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের মান বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে ভূমিকা রেখেছেন। উল্লেখ্য বাকি ২৪টি ব্যাচের তালিকাও উল্লিখিত এলামনাই ডাইরেক্টরির ২০-১১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে। আলোচনা ও গবেষণার সুবিধার্থে প্রথম ব্যাচের পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের তালিকা দিয়ে সমগ্র চিকিৎসক শ্রেণির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। পূর্বে যেখানে আধুনিক চিকিৎসার অভাবে মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার বেশি ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশ করা চিকিৎসকদের চিকিৎসা সেবায় সে হার অনেকটা কমে আসে। উপরন্তু এ সময় থেকেই কঠিন ও জটিল রোগের চিকিৎসা শুরু হয় এবং অনেক রোগী এই চিকিৎসা সেবা নিয়ে আরোগ্য লাভ করেন। এভাবেই পূর্ববাংলা তথা বর্তমানে বাংলাদেশে অন্যান্য শ্রেণি তথা আইনজীবী, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবীর পাশাপাশি উন্নত চিকিৎসক শ্রেণি গড়ে ওঠে। যারা দেশের স্বাস্থ্যসেবাকে নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্ব দেয়। যাদের সেবার মাধ্যমে পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ ও জনজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তারা বর্তমান বাংলাদেশের অন্যান্য মেডিকেল কলেজে অনুরূপ চিকিৎসক শ্রেণি গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত থেকে দেশের চিকিৎসা সেবাকে আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে অবদান রেখেছেন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজ

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। চিকিৎসাশিক্ষার মতো কঠিন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও গান, নাটক, নৃত্য ও সাহিত্য প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা লক্ষ্য করা যায়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা শুধু ক্যাম্পাসে নয় সারা দেশে খ্যাতি অর্জন করে। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের এসব বিষয়ের প্রতি ঝোঁক থাকার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র আহমদ রফিক বলেন,

> কাঁরণ খুঁজতে চাইলে প্রথমে মনে হয় তখনকার মেডিকেল ছাত্র অনেকেরই মেধা ছিল নানাদিক আকর্ষিত। হয়তো অভিভাবকের ইচ্ছায় বা চাপে তাদের চিকিৎসাশিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ, নিজ চেতনার তাগিদে নয়। যে তরুণের আকর্ষণ সাহিত্যে বা নাটকে, সঙ্গীতে বা অভিনয়ে অথবা চারুকলায়, তাকে যদি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়, তাহলে ঐ বিষয়ের প্রতি সুবিচার তার পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে না। অথচ সেকালে বৈষয়িক বিবেচনায় মেধাবী তথা ভালো ছাত্রদের মেডিকেল কলেজে ভর্তি করাই ছিল রেওয়াজ, আর অভিভাবকদের প্রবণতা তখন সেদিকেই সর্বাধিক।[১]

ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র আহমদ রফিক এর উল্লিখিত উক্তি অনেকাংশেই সত্য। এই ধারা ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে লক্ষ্য করা যায় এবং পরবর্তী সময়েও তা প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানে এখনও রয়েছে। বর্তমানে অধিকাংশ অভিভাবক তাদের সন্তানকে আত্মত্যাগী চিকিৎসক করে গড়ে তোলার চেয়ে সামাজিক মানমর্যাদা, আর্থিক বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে চিকিৎসাশিক্ষায় ভর্তি করেন।

ফলে অনেক ছাত্রের অন্য বিষয়ে আগ্রহ থাকলেও অভিভাবকের ইচ্ছার কাছে তার সেই সুপ্ত ইচ্ছা হার মেনে যায় বা সুপ্ত অবস্থায়ই থাকে।

তৎকালীন সময়ে অনেক মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রী ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেও, এই শিক্ষার প্রতি কারো কারো তেমন কোনো আকর্ষণ ছিল না। চিকিৎসাশিক্ষার পাঠ অসমাপ্ত রেখেই অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে যান অথবা চিকিৎসাশিক্ষা ছেড়ে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। এর ফলে কেউ কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। উদাহরণস্বরূপ, বিশিষ্ট চলচিত্র পরিচালক, অভিনেতা, গীতিকার, সঙ্গীত পরিচালক খান আতাউর রহমান (১৯২৮-১৯৯৭)। তিনি ১৯৪৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে এক বছর লেখাপড়া করেন। তিনি দুর্দান্ত সাহসী ও মেধাবী এবং তিনি মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে মেডিকেল কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এসসি.তে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হয়ে নাটক, অভিনয়, সঙ্গীত চর্চা করে একজন সাংস্কৃতিক কর্মী ও সংগঠক হয়ে যান। ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছেড়ে দিয়ে একজন চলচিত্র নির্মাতা হওয়ার জন্য কলকাতা হয়ে বোম্বে চলে যান।[২] খান আতাউর রহমান এর প্রসঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র অধ্যাপক ডা. মীর্জা মাজহারুল ইসলাম বলেন,

> খান আতাউর রহমান ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। সে এনাটমি ক্লাসে পিছনের বেঞ্চে বসে গান গাইত। তখন ক্লাস হতো মিটফোর্ডে। একদিন ক্লাসের সময় গান গাওয়ার কারণে প্রফেসর পশুপতি বসু তাঁকে ধমক দিয়ে ক্লাস থেকে বের করে দেন। পরে সে মেডিকেল কলেজ ছেড়ে নাটক ও গানের জগতেই চলে যায়।[৩]

খান আতাউর রহমান এর মতো কিছুসংখ্যক ছাত্র চিকিৎসাশিক্ষায় সম্পূর্ণ মনোযোগ না দিয়ে সংস্কৃত চর্চার ভুবনে প্রবেশ করেন। সেখানে কেউ সাহিত্য সৃষ্টি, কেউ কেউ পোস্টার ব্যঙ্গচিত্র, দেওয়ালপত্রিকা, নাচ, গান, নাটক, খেলাধুলা, স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। অন্যদিকে মেডিকেল কলেজের কিছুসংখ্যক ছাত্র সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে তারা চিকিৎসাশিক্ষার পাঠ সমাপ্ত করেছেন। পরবর্তীতে চিকিৎসাশিক্ষার ওপর বিদেশে উঁচু ডিগ্রি নিয়ে দেশের খ্যাতিমান চিকিৎসক হয়েছেন। এটা তাদের জীবন জীবিকার প্রয়োজনেই করতে হয়েছে। আবার কিছু সংখ্যক ছাত্রের চিকিৎসাশিক্ষার প্রতি উদাসীনতা ছিল। তারা তাদের নিজ নিজ নেশা (রাজনীতি, লেখালেখি) ত্যাগ করতে পারেনি। তাদের পরীক্ষা দেবার বিষয়টি বার বার পিছিয়েছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ চিকিৎসক হওয়ার সম্ভাবনা বিলম্বিত হয়েছে। এই ধরনের ছাত্ররা পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়টি ততটা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেনি। চিকিৎসাশিক্ষা পাঠ নিয়ে সবসময় সময় কাটানো ছিল তাদের কাছে বিরক্তিকর, বরং তাদের কাছে অন্য বিষয়গুলো বেশি অগ্রাধিকার পেয়েছে। এর ফলে চিকিৎসাশিক্ষা পাঠশেষে চিকিৎসা জীবিকা তাদের ততটা উঁচুতে নিয়ে যেতে পারেনি বরং শুধুমাত্র প্রাকটিশনার হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও লেখক আহমদ রফিক বিষয়টিকে ব্যক্তিত্ব বিভাজনের তথা দ্বিচারিতার পরিণাম বলে মনে করেন। এই দ্বিচারি চেতনায় কেউ সফল, কেউ ব্যর্থ হয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে কিছু সংখ্যক ছাত্রের পক্ষে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার বাইরে অন্য কোনো ধরনের বিষয়ের প্রতি আগ্রহ থাকা উচিত নয়, এমন ছক বাধা গতানুগতিক শিক্ষাজীবন তাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়নি বলে তারা অন্যদিকে (সাহিত্য, অভিনয়) চলে যায়।[৪] দৃষ্টান্ত হিসেবে সরফুল আলম ও মনিরুল আলম এর নাম উল্লেখ করা যায়। মেডিকেল কলেজে সরফুল আলম এর অনবদ্য অভিনয় নাট্যানুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল। তাঁর কণ্ঠস্বর, ভাষা, নিখুত উচ্চারণ ও বক্তব্য উপস্থাপনের প্রতিভার পরিচয় দেন।

পরবর্তীতে যা তাঁকে চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে প্রচার মাধ্যম জগতে নিয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে ভয়েস অব আমেরিকার ঘোষক, সংবাদপাঠক হিসেবে জীবনধারা শুরু হয়।[৫]

একই গুণের কারণে আরেক মেডিকেল ছাত্র মনিরুল আলম চিকিৎসাবিজ্ঞানের পথ ছেড়ে পাকিস্তান রেডিও টিভিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। মেডিকেল কলেজে এই ধরনের ছাত্রদের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল বরং অধিকাংশ ছাত্রই সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল। ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক অধ্যয়নের ফাঁকে মনকে প্রশান্তি অথবা সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রকাশ করার জন্য এই অঙ্গনের সাথে যুক্ত থেকেছেন, যা তাদের চিকিৎসাশিক্ষা ও পেশার ক্ষেত্রে আরো উদ্যোমে কাজ করার উৎসাহ দিয়েছে।

তাছাড়া দেশ বিভাগের পর অনেক হিন্দুরা পাকিস্তান থেকে চলে যাওয়ায় অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ সর্বত্র একটা শূন্যতা বিরাজ করে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও স্থবিরতা দেখা যায়। এই অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা 'শিল্পী সংঘ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনটি তৎকালীন সাংস্কৃতিক শূন্যতা পূরণে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। দেশ বিভাগের পর এটিই ছিল পথিকৃৎ সংগঠন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে এরূপ একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা ছিল অবিস্মরণীয় উদ্যোগ। ১৯৪৬ ব্যাচের ছাত্র সাজেদুর রহমান মাস্তানার উদ্যোগে এরূপ একটি সংগঠন গড়ে উঠলেও একাধিক রাজনৈতিক মতের ছাত্র এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে বেশ কিছু নাটক মঞ্চায়ন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করা হয়। ধীরে ধীরে এই সংগঠনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মেডিকেল কলেজের শিক্ষকদের সংগঠন ছিল 'ডক্টরস ক্লাব'। সংগঠনটি মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টায় নাটক মঞ্চস্থ করে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। এই ক্লাবের উদ্যোগে মেডিকেল কলেজের প্রথম দিকে যেসব নাটক মঞ্চস্থ করা হয় তা কার্জন হল, মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট, লেকচার গ্যালারি আর নাটকের মহড়া চলত ছাউনির মতো ডক্টরস ব্যারাকে। এই ক্লাবের উদ্যোগে মঞ্চায়িত অন্যতম সফল নাটক হলো 'মানময়ী গালর্স স্কুল', 'মিশর কুমারী' (১৯৪৮), 'চকমকি' (১৯৪৯) এবং 'বিজয়া' প্রভৃতি। সে সময়ে নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নারী শিল্পী পাওয়া যেত না। তাই পুরুষরা নারীদের চরিত্রে অভিনয় করত।[৬] নারী চরিত্রে প্রায়ই চিকিৎসক মতিয়ার রহমান অভিনয় করতেন। তিনি পূর্ববাংলার প্রথম ছায়াছবি 'মুখ ও মুখোশে' অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলেন। অভিনয় ছাড়া নৃত্যের দিকেও তাঁর ঝোঁক ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী অধ্যাপক আফজালুন্নেসা উল্লেখ করেন যে, 'দন্ত চিকিৎসক ফখরুজ্জামান সবসময় নারী চরিত্রে অভিনয় করতেন। মেয়েদের পাওয়া যেত না বলে বাধ্য হয়েই উদ্যোগকারীরা পেশাদার মহিলা যাত্রা শিল্পীদের ভাড়া করত।'[৭]

১৯৪৯ সালের শেষ দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসেবে কোয়ালিশন ফ্রন্টের পক্ষ থেকে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেডিকেল কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।[৮] ইউনিয়নের বিভাগগুলোতে সাংস্কৃতিক সদস্যদের কোনো পদ ছিল না। সাহিত্য সম্পাদক ও বিনোদন সম্পাদক সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। রবীন্দ্র জয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বিচিত্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। ১৯৪৯-৫০ সালে প্রথম কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার পর নিয়মিত অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কলেজের ছাত্রদের সংস্কৃতিচর্চার বিকাশে সহায়ক হয়। ১৯৫০ সালে কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন রবীন্দ্র, নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তৎকালীন সময়ের সাহিত্য সম্পাদক

মোবারক হোসেন নজরুলের জীবন ও তাঁর জনপ্রিয় গান অবলম্বনে 'ছায়ানাটিকা' রচনা করেন। এতে অংশ নেন মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী তথা শাহজাহান হাফিজ, আবুল হাশেম, হাবীবুজ্জামান, কে. এম. সিরাজ, মনোয়ারা বিনতে রহমান, সৈয়দা ফিরোজা বেগম প্রমুখ ছাত্রছাত্রী। এই অনুষ্ঠান অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[৯]

এনাটমির ডেমনস্ট্রেটর এস. এ. খান 'নির্বাক' নামে একটি নাটক লিখেন। এই নাটকের মধ্য দিয়ে একজন চিকিৎসকের জীবন চিত্র তুলে ধরা হয়। নাটকটি সফলভাবে মঞ্চস্থ করায় দর্শকদের ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেন।[১০] ছাত্র ও শিক্ষক যৌথভাবে নাটক রচনা, মঞ্চায়ন ও অভিনয়ের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন ডা. শামসুল আজম, ডা. এস. এ. খান, ডা. এস. এ শাকুর প্রমুখ। পরবর্তীতে তারা জীবন জীবিকার প্রয়োজনে সংস্কৃতি চর্চা ছেড়ে চিকিৎসা পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। স্বাভাবিকভাবেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ নাটকে সেরা ছিল। এই কলেজে বছরে তিনটি নাটক হতো, একটা করত ছাত্ররা, অন্যটি জুনিয়র চিকিৎসক এবং তৃতীয়টি সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত হতো। সে সময় নারী ডাক্তারদের পাওয়া যেত না বলে কখনো কখনো ডাক্তারদের নাটকে নার্সরা নারী চরিত্রে অভিনয় করত।[১১] মঞ্চ নাটকের মঞ্চ তৈরি করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন ড্রপসিন, ঘরবাড়ি, বাগান, যুদ্ধ শিবিরের সিন, সাইড উইং ইত্যাদি মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাই তৈরি করত। এসব তৈরির জন্য কাঠ, কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী কিনতে জিঞ্জিরা বাজার, ইসলামপুর, চকবাজার যেত। নাটকের মঞ্চ সাজাতে এবং উইন্ডস্ক্রিনের সফল অঙ্কন ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র বদরুল আলম (অধ্যাপক, শিশু বিশেষজ্ঞ) এর হাতের স্পর্শে ফুটে উঠত। ডিজাইন ও ছবি সবই তিনি করে দিতেন।[১২]

১৯৫১ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকালে বার্ষিক নাট্যাভিনয়ের জন্য তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'দীপান্তর' নাটক নির্বাচন করা হয়। কার্জন হলে নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। নাটক পরিচালনায় ছিলেন শফিকুর রসুল, আবুল হাশেম ও শাহজাহান হাফিজ এবং অভিনয় করেন মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা (আবুল হাশেম, নুরন্নাহার, শফিকুর রসুল, জিয়া হাসান, পারভীন ও রেখা)। নাটকটি দর্শকদের এতটাই মুগ্ধ করে যে, নাটকটি দর্শকদের অনুরোধে দ্বিতীয় দিনে অভিনীত হয়। অন্যদিকে ১৯৫৭ সালে মেডিকেল কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের আরেকটি নাটক 'আরোগ্য নিকেতন' মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটকে তিনজন নারী চিকিৎসক অভিনয় করেন। তারা হলেন ডা. রোকেয়া, ডা. আফজালুন্নেসা এবং ডা. আবেদা। সুতরাং নাটকে অভিনয়, পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র, শিক্ষকগণ নৈপুণ্য ও আন্তরিকতার পরিচয় দেন। চিকিৎসাশিক্ষায় অধ্যয়নে মনোযোগ দেওয়া অথবা খ্যাতিমান চিকিৎসক হওয়ার প্রবল ইচ্ছার চেয়ে নাটকে অভিনয় করা তাদের প্রবল আকর্ষণ ছিল। কারো কারো নাটকপ্রিয়তা ছিল এক ধরনের নেশা।[১৩]

অভিনয় ছাড়াও নৃত্যের দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের আগ্রহ ছিল। এজন্য একটি নাচের দল গঠন করা হয়। নাচের দলটি ডা. সাজেদুর রহমান মাস্তানা পরিচালনা করত। এই দলে কয়েকজন ছাত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারা হলেন তাজ, রোজি, আয়েশা মঞ্জু এবং অঞ্জলি। তিনি ছাত্রীদের বাড়ি গিয়ে বিনা পয়সায় নাচ শেখাতেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নাচের দল নিয়ে যেতেন এবং নাচ পরিবেশন করতেন। এই কাজে ডা. বদরুল আলম তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে তাঁর পরিচালনায় ঢাকা শহরে প্রথম 'মহুয়া' নামে নৃত্যনাট্য প্রযোজনার গৌরব অর্জন করে।[১৪]

গানের ক্ষেত্রেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের বিশেষ ঝোঁক ছিল। ঢাকার নিয়মিত গায়ক হিসেবে শাহজাহান হাফিজ রেডিও পাকিস্তানে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তাঁর মতো

আরো অনেকে তথা ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৫২ ব্যাচের ছাত্র ফজলুল করিম, এম. এ. কাদের সুকণ্ঠ গায়কের স্বীকৃতি পান। পরবর্তীতে তাঁরা দুইজনই চিকিৎসা পেশাগত কারণে সঙ্গীতের চর্চা ধরে রাখেননি। চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের উক্ত সঙ্গীত শিল্পীদের মতো ষাটের দশকের সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মাহবুব রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান। পঞ্চাশের দশকের সাথে ষাটের দশকের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ছিল। এ সময়ে নাটক, গান, নৃত্যে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ কম থাকলেও ষাটের দশকে তা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ১৯৬৪ ব্যাচের কাজী মিসবাহুন নাহার তামান্না, স্নিগ্ধা চক্রবর্তী, ফওজিয়া মোসলেম প্রমুখ রক্ত করবী, তাঘের ঘর, নাটক ও গান পরিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে নৃত্যশিল্পী হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৬৩ ব্যাচের ছাত্রী ডালিয়া ও ডালিয়া সালাউদ্দিন সুনাম অর্জন করেন। তারা যেমন কলেজে তেমনি ঢাকার বাইরে আয়োজিত নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। এ সময় পূর্বের মতো সামাজিক বাধা নিষেধ ছিল না। পরবর্তীতে তারাও পেশাগত কারণে নৃত্যের চর্চা ধরে রাখেননি।[১৫]

ষাটের দশকের শুরুতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল এবং রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিচারে তাৎপর্যপূর্ণ। তৎকালীন পাকিস্তান সামরিক শাসক রবীন্দ্র রচনাবলী, গান, নাটকের ওপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। ১৯৬৫ সালে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেতার, টেলিভিশনে প্রচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র রচনাবলীর ওপর সরকারের এরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপের মধ্যদিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে আঘাত করে। ১৯৬৭ সালে আইয়ুব খান রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের পক্ষে ঢাকার সাংস্কৃতিক মহলের ওপর চাপ পড়ে। তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকের ছাত্রদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় কলেজ প্রাঙ্গনে সাত দিনব্যাপী শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়। গান, নাটক, আলোচনা সভার পাশাপাশি আলোকচিত্র ও পুস্তক প্রদর্শনী করা হয়। নানা বৈচিত্রের এই অনুষ্ঠান ব্যাপক দর্শক শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাচেতনা পূর্ববাংলার জনসাধারণের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করে এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে মুছে ফেলে উর্দু সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র চলে, তা ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ উপলব্ধী করতে পেরেছিল। বস্তুত, এই অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের অবস্থান বুঝিয়ে দেয় যে, রবীন্দ্রনাথের ওপর এরূপ বিরূপ ভাব মানে বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আঘাত।[১৬]

প্রতিবছর ছাত্র ইউনিয়ন বার্ষিক পুর্নমিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠী ও শিক্ষকদের সাথে দেখা করার সুযোগ পান। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রমুখদের আমন্ত্রণ করা হতো। এ সময় বিভিন্ন ধরনের যেমন, আলোকচিত্র, চিত্রকলা, বিভিন্ন বিভাগের ফিল্ম শো, ঔষধ, মেডিকেল বই প্রদর্শনী, মেডিকেল চার্ট, ছাত্রদের দ্বারা ডেমনস্ট্রেশন, সেমিনার ইত্যাদি প্রদর্শন করা হতো। এটা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীদের জন্য খুবই উপভোগ্য এবং শিক্ষনীয় বিষয় ছিল। ১৯৬৫-৬৬ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*-তে উল্লেখ করা হয় যে,

> As in the previous years the highlight of the students extra curricular activities, the annual reunion festival was the main function and proved to be outstanding success.[১৭]

১৯৬৮-৬৯ সালে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে কলেজের বার্ষিক পুর্নমিলনী এবং বার্ষিক খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়নি। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা সাহিত্য চর্চার দিক দিয়েও পিছিয়ে ছিল না।

ব্যক্তিগত মনের ইচ্ছা থেকে সাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হন। অর্থযশের উদ্দেশ্যের চেয়ে সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যটাই বড় ছিল। উদাহরণস্বরূপ সাজেদুর রহমান মাস্তানার 'কুয়াশা'। এই কলেজের ছাত্রদের সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম কৃতিত্ব হলো প্রথম কলেজ ম্যাগাজিন (১৯৫০) প্রকাশ করা। নির্বাচিত ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে এই ম্যাগাজিন প্রকাশে সর্বাধিক অবদান রাখেন এর সম্পাদক তথা পঞ্চম বর্ষের ছাত্র মোবারক হোসন। এই ম্যাগাজিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল চিকিৎসা ও সাহিত্যবিষয়ক রচনা বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশ করা। ম্যাগাজিনটিতে চিকিৎসা বিষয়ক যেসব লেখা সম্পাদকীয় নিবন্ধে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেগুলো হলো রোগ, রোগী, চিকিৎসা সেবা, মানবিক চেতনা ইত্যাদি। এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এসব লেখায় সোস্যাল মেডিসিন তথা কমিউনিটি মেডিসিনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা বিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর গুরুত্ব শুধু মেডিকেল সিলেবাসই নয়, রাষ্ট্রীয় জাতীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অনুধাবন করা হয়। এই ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখাগুলো আজও যুগোপযোগী হয়ে আছে। সমাজ পরিবর্তনের জন্য তা অপরিহার্য দিক নির্দেশনা দেয়।[১৮]

ম্যাগাজিনটির সাহিত্য বিভাগে তিনটি লেখা ছিল। তৃতীয়বর্ষের ছাত্র বজলুর রহমান এর প্রবন্ধ পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ধারা, প্রথম বর্ষের ছাত্র আহমদ রফিক এর কবিতা 'সংকেত' এবং সম্পাদক মোবারক হোসেন এর গল্প 'পোস্ট মর্টেম'। এ ছাড়া ম্যাগাজিনটিতে চতুর্থবর্ষের ছাত্র এ. রশিদ এর তোলা একটি আলোকচিত্র হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের ক্রোধের কারণ হয়ে ওঠে, কারণ ছবিতে দেখা যায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তা ধরে হেটে চলেছে একজন দরিদ্র রোগী। ছবির নিচে শয্যা বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়।[১৯]

ম্যাগাজিনের যুক্তিনির্ভর ও বাস্তবসম্মত লেখার মধ্য দিয়ে তরুণদের আবেগ, অনুভূতি প্রকাশ পায়। এটি কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভাবমূর্তি যেমন ক্ষুণ্ন করেছে তেমনি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের জনবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক নীতির ওপর আঘাত পড়েছে। এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন কলেজ ও হাসপাতালের সমস্যাগুলো কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপরি-উক্ত মন্তব্য থেকে তা বোঝা যায়। কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কলেজ ও হাসপাতাল সুসজ্জিত ছিল না। নানারকম বৈজ্ঞানিক, মেডিকেল যন্ত্রপাতি, নমুনা, বিভিন্ন ওয়ার্ডে শয্যার ঘাটতি থাকায় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করতে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এর ফলে ম্যাগাজিনটি প্রিন্সিপাল টি. আহমেদ এর সুপারিশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তৎকালীন সময়ের ছাত্রদের ধারণা এটা কলেজের প্রিন্সিপাল নিজের পদ ধরে রাখার জন্য ও শাসকবর্গকে খুশি করার জন্য নিষিদ্ধ করে।[২০]

১৯৪৭ ব্যাচের ছাত্র মঈদুর রহমান এর সাহিত্য পত্রিকা *'খাপছাড়া'* এবং ১৯৪৮ ব্যাচের ছাত্র আলিম চৌধুরী ও আহমদ কবির এর সম্পাদিত *'যাত্রিক'* দুইটিই উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকা ছিল। তাদের এই দুই সাহিত্য পত্রিকা এমন সময় প্রকাশিত হয়েছিল, যখন ঢাকায় সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যা খুবই অল্প। পত্রিকা দুইটি উন্নতমানের হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য মহলে তেমন আলোচিত হয়নি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি মঈদুর রহমান এর একটি গল্প গ্রন্থ *ময়ুরের পা* প্রকাশিত হয়। তাঁর গল্পগুলো উন্নতমানের হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থটি নিয়ে বড় কোনো আলোচনা হয়নি। তাছাড়া প্রচারণায়ও দুর্বলতা ছিল।[২১]

পরবর্তীকালে ১৯৫১ ব্যাচের ছাত্র সালেহ আহমেদ, জামালউদ্দিন, তোবারক হোসেন, সাহিত্যিক হিসেবে কিছুটা পরিচিতি পান। জামাল উদ্দিন ও সালেহ আহমেদ এর কবিতা, প্রবন্ধ মেডিকেল কলেজের বাইরের একাধিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জামাল উদ্দিন পেশার টানে বিদেশ চলে গেলে সাহিত্যচর্চা আর করতে পারেননি। অপরদিকে কথা সাহিত্যিক তোবারক হোসেন কলেজ ম্যাগাজিনে লেখা ছাড়াও দুই একটি গল্প কলেজের বাইরে প্রকাশিত হয়। তাঁর সাহিত্য জীবনের পরিণতিও জামাল উদ্দিন এর মতো ঘটে। চিকিৎসা পেশার কারণে লেখক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। মেডিকেল কলেজের পড়াশোনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য জগত থেকে বিদায় নেন।[২২]

পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে জাহাঙ্গীর খালেদ কলেজের দেওয়ালপত্রিকা ছাড়াও কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে তাঁর বেশ কিছু লেখা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং কথা সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখার মানও অন্যান্য সমকালীন সাহিত্যিকদের মতো ছিল। পঞ্চাশের দশকে যেসব মেডিকেল ছাত্র সাহিত্যকর্মের সাথে যুক্ত ছিলেন তারা হলেন সাঈদ হায়দার, বদরুল আলম, আবদুল মানাফ, শামসুল হক, হোসেন রেজা, মোয়াজ্জেম হোসেন, মোস্তফা প্রমুখ। এদের অধিকাংশই সাহিত্যচর্চা ধরে রাখেননি। ১৯৫৯ সালে সাঈদ হায়দার এর *রোগ নিরাময় সুস্থ জীবন* নামে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তিনি পরবর্তীকালে চিকিৎসা বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক এবং আত্মজীবনী তথা স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ *পিছু ফিরে দেখা* রচনা করেন। তাঁর এই গ্রন্থটি অনেক তথ্যবহুল ও তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই গ্রন্থে সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ভাষা আন্দোলন, মেডিকেল কলেজ, ব্যারাক বিষয়ক সমকালীন অনেক অজানা তথ্য রয়েছে। উল্লেখ্য তাঁর লেখা অন্যান্য গ্রন্থের সংখ্যা ২৫টি।[২৩] তবে তাঁর এই গ্রন্থগুলোর বেশির ভাগই পাকিস্তান শাসনামলের অবসানের পর তথা স্বাধীন বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে বাংলা একাডেমির একুশে পদক ও জাতীয়ভাবে রবীন্দ্রপদকপ্রাপ্ত লেখক, গবেষক, ভাষা সংগ্রামী, কলেজের ৪৯ ব্যাচের ছাত্র আহমদ রফিক স্বাধীন বাংলাদেশের সাহিত্য জগতের এক সফল লেখক। তিনি একাধিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথে জড়িত। তিনি রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্র ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯৭৯ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯২ সালে অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৯৫ সালে সাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পান। জাতীয় পর্যায়ে তিনি রবীন্দ্রপদক লাভ করেন এবং কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে "রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য" উপাধি পেয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ১০০টি।[২৪]

অপরদিকে ছাত্রাবাস বা মেডিকেল ব্যারাক প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই মেডিকেল ছাত্রদের মধ্যে দেওয়ালপত্রিকা লেখার আগ্রহ দেখা যায়। ১৯৪৯-৫০ সালে প্রথম কলেজ ইউনিয়নের সাহিত্য বিভাগের পরিচালনায় সাপ্তাহিক দেওয়ালপত্রিকা '*অভিযাত্রী*' প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন এফ. এম. শামসুল আলম। দেওয়ালপত্রিকাটি ছাত্রদের মধ্যে অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এই ধরনের সাহিত্য চর্চায় আরো যারা অংশ নেন তারা হলেন, ইয়াহিয়া, ইহসান আলী খন্দকার, বদরুল আলম, এ. রশিদ, বজলুর রহমান, আসাদুজ্জামান, মনিরুজ্জামান বা সাঈদ হায়দার প্রমুখ। ডা. আ. ক. ম. আখতারুজ্জামান এর তথ্য থেকে জানা যায়, ষাটের দশকে 'কার্টুন', 'দেওয়ালপত্রিকা', 'মিকচার', 'শনিবারের সাহিত্য', সত্তর ও আশির দশকে 'আলোচনাচক্র', 'উষসী', 'প্র্যাক্সিস অধ্যয়ন কমিটি', 'সাংস্কৃতিক সংসদ', 'বিপরীত স্রোত', 'ব্রতী', 'শাপলা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[২৫] এগুলো যেমন ছিল ছাত্রদের সাহিত্য প্রচেষ্টা প্রকাশের মাধ্যম, তেমনি স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ প্রকাশের, সমালোচনা প্রকাশের মাধ্যম। এ ক্ষেত্রে দেওয়ালপত্রিকার প্রতিবাদী রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল।

তাই ১৯৫০ এর দশকের পর ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে দেওয়ালপত্রিকা প্রকাশ করে ঐতিহ্য রক্ষা করার চেষ্টা করেন। ১৯৫০ ব্যাচ এর ছাত্র আবুল মানাফ ছাত্রজীবনের শুরুতে মেডিকেল ব্যারাকে নীশিথ রাতের 'দেওয়ালপত্রিকা' সম্পাদনা করে সহপাঠীদের প্রশংসা অর্জন করলেও তৎকালীন সময়ে সাহিত্য কর্মে মনোযোগী হননি। এ ছাড়া হুমায়ূন হাই (১৯৪৯), শামসুল হক (১৯৫৩), মোয়াজ্জেম হোসেন মোস্তফা প্রমুখ মেডিকেল ছাত্রের ছাত্রজীবনে লেখার হাত থাকলেও পেশাগত কারণে তা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি, কারণ তাদের ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য চর্চারও অবসান ঘটে।[২৬]

মেডিকেল কলেজের কিছুসংখ্যক ছাত্র অঙ্কনে দক্ষ ছিলেন। আহমদ রফিক ঢাকা মেডিকেল কলেজের এই ছাত্রদের 'আঁকিবুকির' নিপুণ পটুয়া বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৭] রেখা ও রঙে এরা নৈপূণ্যতার পরিচয় দেন। এই পটুয়া ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন জিয়া হাসান, বদরুল আলম, নুরুল ইসলাম প্রমুখ। পোস্টার ব্যানার ফেস্টুনেই কেবল তাদের নৈপূণ্য সীমাবদ্ধ ছিল না, কলেজ ছাত্রদের মঞ্চস্থ প্রতিটি নাটকের দৃশ্যপট আঁকা থেকে সাজসজ্জার সবকিছুতে এসব পটুয়াদের হাত ছিল। তাই কখনও মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য বাইরের কোনো শিল্পীকে আনতে হয়নি। সবকাজ মেডিকেল ছাত্ররাই নিজ হাতে শেষ করত। শুধু মঞ্চসজ্জাই নয়, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনসহ তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষার প্রকাশ ঘটাতে পটুয়াদের আঁকা ও লেখা, পোস্টারের ফেস্টুনে মেডিকেল চত্বর, ব্যারাক পরিপূর্ণ হয়ে যায়।[২৮]

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের এসব শিল্পকর্ম ও সাহিত্যচর্চা ধরে না রাখার কারণ হলো পেশাগত ব্যস্ততা এবং সাহিত্য মহলে তাদের লেখা তেমন স্বীকৃতি না পাওয়া। এই ব্যাপারে তাদের ধারণা মেডিকেল কলেজের ছাত্র হওয়ার কারণে প্রাপ্য মর্যাদা পাননি। এসব কারণের পাশাপাশি ছিল সাহিত্যচর্চার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য যে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল তার অভাব। তাদের সাহিত্যের প্রতি ছিল উদাসীনতা ও অমনোযোগিতা। আবদুল কাদের, আহমদ রফিক, সাঈদ হায়দার, এম. এ. করিম এর মতো কিছু সংখ্যক ছাত্র ছাড়া অধিকাংশই ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথে সাহিত্য চর্চারও অবসান ঘটান। ছাত্রজীবন শেষে চিকিৎসক জীবনে পৌঁছে পেশাগত ব্যস্ততার জন্যই সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কিছুসংখ্যক তাদের এই ধারা অব্যাহত রাখেন একান্তই তাঁদের মানসিক ইচ্ছার কারণে। এভাবেই শুধু সাহিত্যচর্চা নয়, গান, নাটক, নৃত্য প্রতিটি ক্ষেত্রে পেশাগত ব্যস্ততার কারণে ছাড় দিতে হয়েছে। পরবর্তীকালে তারা সফল চিকিৎসক হিসেবে সমাজে, রাষ্ট্রে পরিচিতি লাভ করেন। চিকিৎসা সেবা দিয়ে সবার মন জয় করেন।

খেলাধুলা

মেডিকেল কলেজের ছাত্র হলেও এ ক্ষেত্রে তাদের অবদান ছিল উল্লেখ করার মতো। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, এ্যাথলেটিকস, টেনিস, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, পিংপং, দাবাসহ বিভিন্ন খেলায় কলেজের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করত, যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ছিল। ১৯৫০ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ক্রিকেট দল আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় ট্রফি জয় করে। এই কলেজের প্রথম ছাত্র ইউনিয়নের এ্যাথলেটিক্স সেক্রেটারি মাজহারুল ইসলাম দামাল এর পড়াশোনার চেয়ে ক্রিকেটের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেশি ছিল। তৎকালীন পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বার্মা সফরকারী 'এ' ক্রিকেট দলে উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলেন। তাঁকে ক্রিকেটের অন্যতম ব্যক্তিত্ব মনে করা হয় বলেই ১৯৭৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর

বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ‘দামাল সামাল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট’ নামে প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লীগ চালু করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসেবে দামাল এর ক্রিকেট খেলার এই নৈপূণ্যতা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁর ব্যাটিং নৈপূণ্যতার পাশাপাশি ১৯৪৯ ব্যাচের ছাত্র সাঈদ আহমেদ এর ব্যাটিং, ভি.পি. গাঙ্গুলির বোলিং, শামসুল ইসলাম এর স্কিপারের কথা জানা যায়।[২৯]

১৯৫৯-৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্যাল এডুকেশন এর ডিরেক্টর আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতার জন্য কলেজে ১১ তম ক্রিকেট ও ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা কোনো ট্রফি জয় করতে না পারলেও তারা পেশাদার খেলোয়াড়দের মতো পুরো উদ্যম নিয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করে।[৩০] অনুরূপভাবে ১৯৬০-৬১ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণীতে* ক্রিকেট খেলা পূর্বের বছরের মতো একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়,

> In the Inter-Collegiate competitions, organised by the Director of Physical Education, University of Dacca, the College teams participated and played the games in true sporting spirit and though in Cricket, they reached the semi-finals, they could not lift any trophies.[৩১]

১৯৬৩-৬৪ সালে মেডিকেল কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ক্রিকেট টিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশীপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন এবং ট্রফি লাভ করেন। আবার ১৯৬৪-৬৫ সালে *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী* থেকে জানা যায় যে,

> Students of the College were awarded Dacca University ‘Blue’ in Athletics and Cricket.[৩২]

ক্রিকেট ছাড়াও ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ফুটবল খেলায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। চল্লিশের দশকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফুটবল দলে কৃতি খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় হলেন, আখতারুজ্জামান, মীর্জা মাজহারুল ইসলাম, আবু তাহের চৌধুরী, মোঃ সোবহান, সাঈদ আহমেদ, নওয়াব হোসেন, সুজাউদ্দৌলা, সাইফউদদৌলা প্রমুখ। এই কলেজের ছাত্র ফজলুর রহমান খান কলকাতা মোহামেডান দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি এফ. আর. খান. নামে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল।[৩৩] ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রথমবারের মতো স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডি. এন. দত্তের ব্যাপক প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত উৎসাহের কারণে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নতুন হোস্টেলের উত্তর দিকে নিজস্ব একটি বড় ফুটবল খেলার মাঠ হয়। এই মাঠে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত সন্ধ্যায় খেলাধুলা করত।[৩৪] ১৯৬৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্রিকেট, ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন হয়।

ব্যাডমিন্টনে নজরুল ইসলামের খ্যাতি শুধু আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। গোটা প্রদেশের অন্যতম প্রধান ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ছিলেন। এ ছাড়া হকি, ভলিবল, টেনিস, বাস্কেটবল, দাবা, ক্যারাম ইত্যাদি খেলায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা কৃতিত্বের পরিচয় রাখেন। পঞ্চাশের দশকে এই কলেজের ছাত্র আকমল, ফ্যান্সি, মনসুর দাবায় জাতীয় পর্যায়ে পরিচিতি লাভ করেন। ক্যারাম প্রতিযোগিতায় একক ও যৌথ উভয় ক্ষেত্রেই অমিতাভ মন্ডল চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র মাসুদুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান বাস্কেটবল টিমের সদস্য ছিলেন।[৩৫] তিনি পূর্ব পাকিস্তান বাস্কেটবল টিমের দলপতি মনোনীত হন এবং পাকিস্তান দলের সঙ্গে রোম অলিম্পিকে যোগ দেন। ১৯৬৪-৬৫ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী* থেকে জানা যায় যে,

> One of the students of the College had the distinction of running with the Olympic Torch from the Lahore Airport to the Lahore Town Hall, when the said Torch was on its way from Greece to Tokyo and passed through Pakistan.[৩৬]

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা শুধু খেলাধুলায়ই নয়, বডি বিল্ডিংয়েও সেরা কৃতিত্বের পরিচয় রাখেন। ১৯৬৪-৬৫ সালে এই কলেজের ছাত্র নাসির উল্লাহ প্রাদেশিক বডি বিল্ডিং এবং সেরা বডির প্রতিযোগিতায় 'মি: ইস্ট পাকিস্তান' খেতাব অর্জন করেন এবং পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত সমস্ত পাকিস্তান (পূর্ব এবং পশ্চিম) প্রতিযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন।[৩৭]

তৎকালীন সময়ে কলেজের বার্ষিক এথলেটিক প্রতিযোগিতার দিনটি খুবই উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক ছিল। কখনও কখনও এই প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান স্বাস্থ্যমন্ত্রী, আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হতো। উদহারণস্বরূপ ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডি. এন. দত্ত এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের এক বার্ষিক প্রতিযোগিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক এথলেটিকস প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অনেক উদীয়মান ক্রীড়াবিদদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক এথলেটিক খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ পান। এ ছাড়া সে সময়ের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো কলেজের ছাত্রীদের ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ। এ প্রসঙ্গে ১৯৬৩-৬৪ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণীতে* উল্লেখ করা হয়,

> The Annual Atheletic Sports of the College was held on the Dacca University ground and proved to be very popular and enjoyable event, particularly as large number of contestants were the girl students.[৩৮]

এই প্রতিযোগিতার দিনটিতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী, দর্শনার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথি অংশগ্রহণ করার কারণে অনেক আনন্দদায়ক ও স্মরণীয় ছিল, কেননা তাদের আনন্দ দানের জন্য অনেক ধরনের খেলার আয়োজন করা হতো। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় কলেজের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করত। ১৯৬২-৬৩ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার অর্জন করে এবং লাহোরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের অলিম্পিকে কলেজের এক ছাত্র পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার অর্জন করে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্যাল এডুকেশন বিভাগ আয়োজিত আন্তঃকলেজ ও আন্তঃহল প্রতিযোগিতায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ দল অংশগ্রহণ করে এবং কোনো ট্রফি জয় না করলেও তারা সত্যিকার খেলোয়াড়ের চেতনা নিয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করে। পাকিস্তানের চিকিৎসাশিক্ষার ইতিহাসে কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় কৃতিত্বটি ছিল সফলভাবে প্রথম 'আন্তঃমেডিকেল কলেজ এথলেটিক স্পোর্টস এন্ড গেমস' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। এখানে প্রদেশের অন্যান্য সব মেডিকেল কলেজ থেকে অনেক বড় বড় দল অংশগ্রহণ করে। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী উভয়ই আলাদাভাবে এথলেটিক চ্যাম্পিয়নশীপ জয় করে। এই আন্তঃমেডিকেল কলেজ স্পোর্টস উদ্বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক লে. কর্নেল এস. এ. মল্লিক এবং সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থসচিব কফিলউদ্দিন চৌধুরী। উক্ত খেলাধুলা আয়োজনে বেশিরভাগ তহবিল সরবরাহে পূর্ব পাকিস্তানের ফিজিক্যাল এডুকেশন এর পরিচালকের দপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে ১৯৬৬ সালে মাসুদুর রহমান কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের স্পোর্টস সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়ে প্রথম 'আন্তঃমেডিকেল কলেজ স্পোর্টস' এর আয়োজন করে। এ সময় সিলেট মেডিকেল কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয় এবং ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ রানার আপ হয়। এ ক্ষেত্রে মহিলা খেলোয়াড়দের মধ্যে লাহোরের ফাতেমা জিন্নাহ মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধিরা

ছিলেন অসাধারণ। মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটি সেক্রেটারি ও সদস্যগণ এসব খেলাধুলার আয়োজন করেন। কমিটির সভাপতি ছিলেন কলেজের প্রিন্সিপাল এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট।[৩৯] এভাবে দেখা যায়, চিকিৎসাশিক্ষার জটিল পড়াশোনার পাশাপাশি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা খেলাধুলায়ও অংশগ্রহণ করত। এর ফলে তাদের দৈহিক ও আত্মিক উন্নতি হতো। একটানা পড়াশোনার এক ঘেয়েমি কাটাতে এবং শরীর ও মনকে সুস্থ, প্রশান্তিময় করে তুলতে এর বিকল্প আর কিছু ছিল না, যা তাদের চিকিৎসাশিক্ষার অধ্যয়নকে আনন্দময় করে তুলতো এবং সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহ তথা অনুপ্রেরণা দিত।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের অবদান

ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে কলেজে কোনো সংগঠিত ছাত্র সংগঠন ছিল না। ১৯৪৬ সালে মেডিকেল কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে অনেক সময় লেগে যায়। তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা, অসহিষ্ণুতা এবং মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভর্তিকৃত প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের জন্য কোনো ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা হয়নি। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস, পলাশী ব্যারাক, আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি, তথা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। ফলে তাদের মধ্যে ছাত্রজীবনের সংহতি ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা সম্ভব হয়নি। দেশ বিভাগের পর কলেজের প্রশাসনিক অবস্থার তেমন কোনো উন্নয়ন না ঘটলে কলেজের বিদেশি প্রিন্সিপাল ই.জে. মন্টেগোমারির প্রচেষ্টায় ছাত্রদের জন্য মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে বাঁশের ছাউনির অস্থায়ী ছাত্রাবাস তৈরি করা হয়। এই বাঁশের ছাউনির ছাত্রাবাস বা মেডিকেল ব্যারাককে কেন্দ্র করে ছাত্ররা একসাথে থাকার সুযোগ পায়। পরবর্তীকালে এদেশীয় মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের কলেজ পরিচালনায় অবহেলার কারণে ছাত্রদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যাহত হয়। বিশেষ করে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ব্রিটিশ জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল, ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিল এবং পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল ঢাকা মেডিকেল কলেজকে স্বীকৃতি দেয়নি। এ ছাড়া শুরুর দিকে কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা, মেডিকেল সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, নমুনা, জাদুঘরের অভাব পূরণ এবং ছাত্রছাত্রীদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধিতে কর্তৃপক্ষের তেমন নজর ছিল না। এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

ছাত্রদের ক্ষোভ অসন্তোষ শুধু কলেজ কর্তৃপক্ষের ওপরই ছিল না। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তথা তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে, তা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সংবেদনশীল মনকে স্পর্শ করে। তাই ভাষা, সংস্কৃতি ও অনুরূপ বিষয় নিয়ে সাধারণ ছাত্রসমাজের পাশাপাশি মেডিকেল ছাত্ররাও সচেতন হয়ে ওঠে। মেডিকেল কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই তাদের কঠিন ও জটিল পড়াশোনার চাপের মধ্যেও এসব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। তারা সব ধরনের সমস্যার প্রেক্ষাপটে কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠনের অভাব অনুভব করেন। কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন নিয়ে প্রিন্সিপালের সাথে ছাত্রদের বিরোধ বাধে। এর ফলে কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের প্রক্রিয়া বিলম্ব হয়।[৪০]

বাধ্যতামূলক এই আপোসের মাধ্যমেই নির্বাচনের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয় এবং নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, তা না হলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো না, ছাত্র ইউনিয়নও গঠিত হতো না। ১৯৪৯-৫০ সালে নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রথম ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয়।

এ সময় ছাত্ররা গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের চিন্তা মাথায় নিয়ে যুক্তফ্রন্টের নীতি অবলম্বন করে গণতন্ত্রী, বাম, মধ্যপন্থী ছাত্রদের সমন্বয়ে তাদের নির্বাচনি জোট 'কোয়ালিশন ফ্রন্ট' গঠন করেন। এরাই অসাম্প্রদায়িক সার্বজনীন চেতনায় বিশ্বাসী ছিল এবং নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়ী হয়।[৪১]

এ সময় প্রথম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন নাজির আহমেদ এবং প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন আবু সিদ্দিক মিয়া, স্পোর্টস সেক্রেটারি হিসেবে দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় আবু তাহের চৌধুরী, সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক সাহিত্য কর্মী মোবারক হোসেন, কমনরুম সেক্রেটারি আলী আজমল এবং অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি কৃতি ক্রিকেটার মাজহারুল ইসলাম দামাল (জাতীয় পর্যায়ের ক্রিকেটার)। কলেজের প্রথম ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনি প্রচারণা সম্পর্কে আহমদ রফিক বলেন, 'নির্বাচনি প্রচারণা ছিল একটি কারিগরি শিক্ষায়তনের ছাত্রদের পক্ষে অত্যন্ত উচ্চমানের — যেমন বৈচিত্র্য তেমনি সাংস্কৃতিক মননশীলতায় ও মূল্যবোধের প্রকাশে। বিচিত্রানুষ্ঠানের উচ্চমানে পরিচিতিপত্রের অভিনবত্বে, পোস্টারের বর্ণচিত্রে, কোয়ালিশন ফ্রন্টের সম্ভাব্য জয়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। গতানুগতিকতার উর্ধ্বে তাদের প্রচারণার বৈশিষ্ট্যই তার প্রমাণ'।[৪২] এ সময় নির্বাচনি প্রচারণার কৌশল হিসেবে বিমান থেকে কলেজ এবং মেডিকেল ব্যারাকে প্রচারপত্র ফেলা হয় এবং কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনের মাধ্যমে ঢাকাতে প্রথম ম্যাগনেটিক টেপ ব্যবহার করা হয়।[৪৩] কোয়ালিশন ফ্রন্টের জয়ের পিছনে ছিল বিচিত্র প্রচারণা, প্রার্থী মনোনয়ন ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রকাশ। এই ফ্রন্টের সোস্যাল সার্ভিস সেক্রেটারি পদপ্রার্থী রাধাকৃষ্ণ ভৌমিককে মনোনয়ন ও তাঁর বিজয়, তা প্রমাণ করে। তাদের এই উদারগণতান্ত্রিক চেতনার কারণে বিভিন্ন মতবাদের ছাত্রদের এক মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে।[৪৪]

১৯৫১ সালে কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। এ সময় নির্বাচনি দল গঠন ছিল মিশ্র প্রকৃতির। নির্বাচনে পায়োনিয়ার পার্টি ও প্রগ্রেসিভ পার্টি অংশ নেয় এবং দুই একজন সতন্ত্র প্রার্থী। পায়োনিয়ার পার্টি থেকে সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে যথাক্রমে গোলাম মাওলা এবং শরফুদ্দিন আহমেদ ছিলেন। অন্যদিকে তাদের বিরুদ্ধে বামরাজনীতি প্রভাবিত দল প্রগ্রেসিভ পার্টির প্রার্থী ছিলেন যথাক্রমে সিনিয়র বামপন্থী ছাত্র খালেক নেওয়াজ ও আব্দুল আলিম চৌধুরী। নির্বাচনে পায়োনিয়ার পার্টির গোলাম মাওলা সহ-সভাপতি এবং শরফুদ্দিন আহমেদ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জয়ী হন। বিনোদন সম্পাদক হিসেবে তৎকালীন কলেজ ছাত্র ও খ্যাতিমান রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী শাহজাহান হাফিজ, সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে ১৯৪৯ ব্যাচের ছাত্র জাকির হোসেন জয়লাভ করেন এবং সাহিত্য বিভাগে সদস্য নির্বাচিত হন এ.কিউ.এম. বদরুদ্দোজা চৌধুরী। অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী কেবলমাত্র একজন সফল চিকিৎসকই ছিলেন না, তিনি রাজনীতিতেও সফল হয়েছিলেন। কারণ স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সাংসদ, মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এবং বি. এন. পি'র মহাসচিব হন।[৪৫] অ্যাথলেটিক সেক্রেটারি হিসেবে ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন ও পিংপং খেলোয়াড় নজরুল ইসলাম নির্বাচিত হন। তিনি রাজনীতির প্রতি নিরাসক্ত হলেও খেলার প্রতি আসক্ত ছিলেন।

তৎকালীন সময়ে নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচকমন্ডলী ছাত্রদের ভোটদান প্রবণতা ও নির্বাচনে বিজয়ের জন্য প্রার্থী ছাত্রদের যোগ্যতা তুলে ধরা হতো। সাধারণত মেধাবী ছাত্র এবং বিশেষ গুণসম্পন্ন (যেমন, সঙ্গীত, সাহিত্য, অভিনয়, চিত্রকলা, খেলাধুলা ইত্যাদি) বিশিষ্ট ছাত্র ভোটারদের সমর্থন পেত।

রাজনৈতিক মতাদর্শ সেসব ক্ষেত্রে সহায়ক উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়, যা প্রথম ও দ্বিতীয় নির্বাচনের বিজয়ীদের উল্লিখিত পরিচিতি থেকে বোঝা যায়। বিশেষ করে বিভিন্ন বিভাগে সেক্রেটারি পদে যারা নির্বাচিত হন তারা ছিলেন সাংস্কৃতিক গুণের অধিকারী। যারা ভালো ছাত্র হিসেবে নির্বাচিত হন, তারা বিনয়, ভদ্রতার গুণে নির্বাচক ছাত্রদের সমর্থন পান। আবার কারো কারো ব্যবহার ও আচরণই ছিল ছাত্রদের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তার কারণ। এ ছাড়া যে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের কর্মী হলেও নিঃস্বার্থ ও ত্যাগী রাজনৈতিক মনোভাব থাকায় নির্বাচনে জয়ী হয়।[৪৬] ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিই নির্বাচনে প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে ওঠে। তৎকালীন সময়ে ভোটারদের কাছে প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য মঞ্চ বানিয়ে প্রত্যেক প্যানেলের পক্ষ থেকে একটা ভ্যারাইটি শো করা হতো। এক প্যানেল নির্বাচনের দুইদিন আগে সন্ধ্যার সময় অনুষ্ঠান করত, অন্য প্যানেল নির্বাচনের আগের দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান করত। ভ্যারাইটি শোতে প্যানেলের সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্য প্রার্থীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হতো। পরিচয় পর্বে সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীকে এক বছরের পরিকল্পনা ও কর্মসূচি সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে হতো।[৪৭]

সে সময়ে ছাত্রদের পারস্পারিক সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যকার সুসম্পর্ক অটুট থাকত, যা নির্বাচনি প্রচার অভিযানের সময় এর প্রভাব পড়ে। এই প্রসঙ্গে মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র আহমদ রফিক তাঁর *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

> এক বিকেলে সবারই চোখে পড়ে ব্যারাক থেকে নির্বাচনি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী হুমায়ূন হাই এবং এ. কে. এম. সিরাজ একই সাইকেলে চড়ে নির্বাচনি প্রচারে বের হচ্ছেন। ওরা যাচ্ছিলেন ইকবাল হলে। তাই দেখে প্রোগ্রেসিভ পার্টির নেতারা হতবাক।[৪৮]

অন্যদিকে এ সময়ের নির্বাচন ও নির্বাচনের পরিবেশ ছিল সুষ্ঠু ও সুন্দর। তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন ছিল সবার জন্য অনুকরণীয়। মেডিকেল কলেজের নির্বাচন দেখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পর্যবেক্ষক হিসেবে কিছু ছাত্র পাঠানো হতো। নির্বাচনের প্রচার অভিযান চলার আগে দুই প্যানেলের সাথে সমঝোতা হতো এই শর্তে যে, কেউ কারো পোস্টার ফেলবে না, ছিড়বে না অথবা একজনের পোস্টারের ওপরে অন্য জনের পোস্টার লাগাবে না। কেউ কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করবে না। নিজেদের প্রার্থীর মিথ্যা গুনগান করা যাবে না। প্রচারণার মাইক খুব জোরে বাজিয়ে ছাত্রদের পড়াশোনার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা যাবে না। এই কঠিন শর্ত আরোপ এবং তা মেনে চলার কারণে নির্বাচনে পরিবেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। কোনো রকম বিশৃঙ্খলার সুযোগ ছিল না। এভাবেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তৎকালীন সময়ের কলেজের দ্বিতীয় নির্বাচন (১৯৫১) অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন ঐতিহাসিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এই ইউনিয়নই নেতৃত্ব দেয়, যা এই অধ্যায়ের ভাষা আন্দোলন অংশে আলোচনা করা হয়েছে। এই ইউনিয়নের সহ-সভাপতি গোলাম মাওলা ও সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিন আহমেদ ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ ছাড়া কলেজের সকল ছাত্র সম্মিলিতভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তৎকালীন প্রাক্তন ছাত্র আহমদ রফিক বলেন, 'দ্বিতীয় ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকালে সংঘটিত ঐতিহাসিক একুশের ভাষা আন্দোলনের সময় দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক বা বিভিন্ন পন্থার ছাত্রদের একাত্ম হয়ে কাজ করতে'।[৪৯]

পরবর্তী নির্বাচন ও প্রার্থীর জয় পরাজয় একই পদ্ধতির ওপর নির্ভর করত, যা তৃতীয় নির্বাচনে লক্ষ্য করা যায়। এ সময় রাজনৈতিক মতাদর্শের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা প্রভাব ফেলে। এই নির্বাচনে সহ-

সভাপতি পদে বামপন্থী মোহাম্মদ জাহেদ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে জাহেদ প্যানেলের প্রার্থী হুমায়ূন হাইকে পরাজিত করে অভিনয়, বক্তৃতায় পারদর্শী জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আবুল হাশেম জয়লাভ করেন। তিনি বামপন্থী ছিলেন না। তিনি মূলত তাঁর কাজের গুণাবলী ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে ছাত্রদের সমর্থন আদায় করেন।[৫০]

এদিকে ভাষা আন্দোলনের পর বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন থাকার কারণে একদিকে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' নামক বামপন্থী প্রভাবিত ছাত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বামপন্থী ও গণতন্ত্রীদের ঐক্য অবস্থা পরিবর্তিত হয়। এই রাজনৈতিক মেরুকরণ মেডিকেল ছাত্রদেরও প্রভাবিত করে। সেজন্য কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচন ঘিরে মতাদর্শগত ভিত্তিতে ছাত্রদের দল গড়ে ওঠে। যেমন, বামপন্থী দল 'অগ্রণী' এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ সমর্থিত দল 'অভিযাত্রী', তবে এই দলে ছাত্রলীগ ছাড়াও অন্যান্য ছাত্র সংগঠন ছাত্রশক্তি (তমুদ্দুন মজলিশের ছাত্রসংগঠন), মুসলিম লীগের সমর্থক ছাত্র, অবাঙালি ছাত্র এবং কিছুসংখ্যক রাজনীতি নিরপেক্ষ ও মধ্যপন্থী ছাত্র ছিল। পাকিস্তান সরকার বিরোধী আওয়ামী মুসলিম লীগ (মাওলানা ভাসানী, সভাপতি), পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা মুসলিম লীগ, রক্ষণশীল চিন্তার ছাত্র বা ইসলামপন্থি ছাত্রশক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মিশ্র রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। এর পেছনে অন্যতম কারণ ছিল একক দলের সাংগঠনিক শক্তির দুর্বলতা এবং বামবিরোধিতা। এ ছাড়া মূল সংগঠনের রাজনৈতিক চরিত্রের মধ্যে বহুচারিতা লক্ষ্য করা যায়।[৫১] স্বাভাবিকভাবেই এই রাজনৈতিক মতভেদ আওয়ামী সমর্থিত ছাত্রদের মধ্যে প্রভাব ফেলে। এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ফলে পরিস্থিতি মেডিকেল কলেজে আওয়ামী সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের সুদৃঢ় সাংগঠিনক ভিত্তি তৈরির অনুকূল পরিবেশ ছিল না।

১৯৫৩ সালে তৃতীয় (১৯৫২-৫৩) ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনের সময় এই রাজনৈতিক মেরুকরণের সূচনা হলেও চতুর্থ ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনের সময় (১৯৫৩-৫৪) এর সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। ছাত্র সমাজ রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে চিন্তাভাবনায় বিভক্ত হলেও ছাত্রদের সম্পর্ক পারস্পারিক বিদ্বেষে পরিণত হয়নি এবং ব্যারাকের পরিবেশ খারাপ হয়ে যায়নি।[৫২] তার প্রমাণ 'অভিযাত্রী' দলের প্রার্থী আবুল হাশেম সহ-সভাপতি পদে জয়ী হন এবং 'অগ্রনী' দলের বামপন্থী প্রার্থী আবদুল হালিম সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী হন। ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে মেডিকেল কলেজের ছাত্র রাজনীতিতে বামপন্থার প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এ সময় থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বামরাজনীতির প্রতি ছাত্রসমাজের বিশেষত মেধাবী ছাত্রদের সাধারণভাবে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এর কারণ জানতে হলে পঞ্চাশের দশকের পূর্ববর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট জানা দরকার। দেশ বিভাগের পর দেশে রাজনৈতিক, সামাজিক অস্থিরতা ও নৈরাজ্যের পাশাপাশি শাসকশ্রেণির অযোগ্যতা, রক্ষণশীলতা, উর্দুপ্রীতি, সম্প্রদায়বাদী চেতনা, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবেশকে অস্থির ও অসুস্থ করে তোলে। একদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তুর মিছিল, অন্যদিকে চোরাচালান, খাদ্য সংকট, আকস্মিক লবন সংকট, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন, কাপড়, কেরোসিন, চিনি, তেল, লবণ ইত্যাদির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে, যা ছাত্রসমাজকেও স্পর্শ করে। সে সময় সুশাসন ও মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসার দাবিতে যুবলীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে বরিশাল, ময়মনসিংহ, ঢাকার একাধিক অঞ্চলে মিছিল ও আন্দোলন

হলে পুলিশ ব্যাপক নির্যাতন চালালেও এই আন্দোলন ব্যাপক সাড়া জাগায়। অন্যদিকে একই সময়ে জমিদারি প্রথা বিলোপে বিলম্ব, নব্য জোতদারদের অত্যাচার সর্বোপরি তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের অত্যাচার নির্যাতনের ফলে রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনায় বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। মুসলিম লীগ সরকারের এসব অত্যাচার নির্যাতনের শিকার হন কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক আন্দোলনের নেতাকর্মী। তার প্রমাণ পূর্ববঙ্গের জেলখানাতে আটক নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতনের ফলে তাদের করুণ মৃত্যু। বিশেষ করে ১৯৫০ সালে রাজশাহী জেলে আটক খাপড়া ওয়ার্ডে গুলি করে কমিউনিস্ট ও তেভাগা আন্দোলনের কৃষক রাজবন্দীদের হত্যা করা হয়।[৫৩] তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্র (১৯২৫-২০০২) ও কৃষক আন্দোলনের নেতা কর্মীদের ওপর যে অমানসিক নির্যাতন চালানো হয়, যার মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগ সরকারের মধ্যযুগীয় সামন্ত চরিত্র ফুটে ওঠে।[৫৪] উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে তিনি (ইলা মিত্র) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। পূর্ববাংলায় যখন কৃষকদের ওপর এমন দমন পীড়ন, অত্যাচার, নির্যাতন চালানো হয়, তখন তার প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের ওপর পড়ে। তৎকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ছিল স্বচ্ছল কৃষক পরিবারের সন্তান। স্বাভাবিকভাবেই পূর্বোক্ত আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের স্পর্শ করে। অন্যদিকে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ভাষা, শিক্ষা সমস্যা, সরকারি স্বেচ্ছাচার, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ধর্মঘট ইত্যাদি নানা বিষয়সহ মেডিকেল কলেজের নিজস্ব সমস্যা নিয়ে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের প্রতিবাদী যাত্রা ভাষা আন্দোলনের সাথে এসে মিশে। এই ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় মেডিকেল কলেজের বামপন্থী ছাত্রসংগঠন যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। একুশের ভাষা আন্দোলনের তাৎক্ষণিক উত্তেজনা শেষ হওয়ার পর ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম ‘শহীদ দিবস’ উদযাপন গোটা দেশ জুড়ে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি ও তৎপরতার উৎস হয়ে ওঠে। এটা যেমন ছাত্র রাজনীতিতে, তেমনি জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে। বাম রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত ‘ছাত্র ইউনিয়ন তথা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (এপসু)’ ছাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। আহমদ রফিক বলেন, ‘বাম মতাদর্শের বিভাগপূর্ব সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের অনিবার্য মৃত্যু নিশ্চিত করে এবং বিকল্প ছাত্র সংগঠন হিসেবে জন্ম নেয় ছাত্র ইউনিয়ন (এপ্রিল, ১৯৫২)’।[৫৫]

স্বাভাবিকভাবে পূর্ববাংলার ছাত্ররা প্রতিবাদী, অসাম্প্রদায়িক সংগঠনের অপেক্ষায় ছিল। নবগঠিত ছাত্র ইউনিয়নের মতাদর্শগত প্রভাব দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বাম ছাত্র রাজনীতির অন্যতম ঘাঁটি ছিল মেডিকেল ব্যারাক।[৫৬] এখানকার ছাত্রদের মধ্যে এর মতাদর্শগত প্রভাব ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। একুশের আন্দোলনের পর পড়ুয়া ছাত্র, সংস্কৃতিমনস্ক ছাত্র, মেধাবী বা রাজনীতি নিরপেক্ষ ছাত্রদের একাংশ ক্রমেই প্রগতিশীল রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে। উল্লিখিত আন্দোলনসহ ছাত্র আন্দোলনের প্রভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে যে ছাত্র ইউনিয়ন আত্মপ্রকাশ করে তার সংগঠনগত ভিত তৈরিতে ছাত্ররাই এগিয়ে আসে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক প্রগতিবাদী ছাত্র নেতা ও যুবলীগের নেতৃস্থানীয়রা (আবদুল মতিন, আবদুস সাত্তার, কাজী আনোয়ারুল আজিম প্রমুখ) ছাত্র ইউনিয়ন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে মেডিকেল কলেজের মতো কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের পক্ষে জাতীয় পর্যায়ের ছাত্র সংগঠনে নিয়মিত তৎপর হওয়া বাস্তব অসুবিধা সত্ত্বেও একাধিক ছাত্র কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের সাংগঠনিক তৎপরতার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাছাড়া উপরিউল্লিখিত কারণ ছাড়াও ঢাকা

মেডিকেল কলেজের ছাত্র রাজনীতিতে বামপন্থীদের প্রাধান্য বৃদ্ধির আরেকটি কারণ হলো ১৯৪৯ সাল থেকে পরবর্তী কয়েক বছর মেডিকেল কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্রদের মধ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক আদর্শের বিশ্বাসী ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য।[৫৭]

এ সময় মেডিকেল কলেজের পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ইউনিটে কলেজের ছাত্রদের বাম মতাদর্শে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। কলেজে এই ছাত্র ইউনিয়ন ইউনিটের সভাপতি ছিলেন খোন্দকার মোহাম্মদ আলমগীর ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসহাক। উল্লিখিত রাজনৈতিক মেরুকরণ ও বাম মতাদর্শের প্রভাব বৃদ্ধির কারণে পঞ্চম কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন (১৯৫৪-৫৫) নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কবির উদ্দিন আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে খোন্দকার মোহাম্মদ আলমগীর নির্বাচিত হন। একই রাজনৈতিক প্রভাবের ধারায় ১৯৫৫-৫৬ সালে সহ-সভাপতি পদে আবদুল হালিম এবং সাধারণ সম্পাদক পদে শামসুর রহমান নির্বাচিত হন। পরবর্তী বছর তথা ১৯৫৬-৫৭ সালে সহ-সভাপতি পদে 'অভিযাত্রীর' প্রার্থী নুরুল ইসলাম এবং 'ছাত্রশক্তির' মকসুদুর রহমান সাধারণ সম্পাদক পদে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন। তাদের জয়ের একমাত্র কারণ ছিল ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি। এই নির্বাচনের বিজয় প্রসঙ্গে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকা খবর প্রচার করে।[৫৮]

অভিযাত্রীর এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকেনি। ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন খন্দকার মোহাম্মদ আলমগীর। স্বাভাবিকভাবেই মেডিকেল কলেজের ছাত্র রাজনীতিতে বামপন্থার প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে। একই সঙ্গে জাতীয় ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে অষ্টম (১৯৫৮-৫৯) ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে দুই বাম মতাদর্শের প্রার্থী আনোয়ারুল ইসলাম সহ-সভাপতি এবং জাহাঙ্গীর খালেদ সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, ১৯৫৮ সালে এই দুইটি সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে 'অগ্রগামী' ও 'অভিযাত্রিক' রাখা হয়। তারা দুইজনই পরস্পর বিরোধী হওয়ায় এবং সাধারণ ছাত্রদের মনোরঞ্জনে পারদর্শী না হওয়ায় পরবর্তী নির্বাচনে তথা নবম নির্বাচনে (১৯৫৯-৬০) এর প্রভাব পড়ে। এই বছর সহ-সভাপতি পদে ছাত্রশক্তির মকসুদুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে বাম রাজনীতির নিষ্ঠাবান কর্মী আব্দুল লতিফ মল্লিক নির্বাচিত হন। তিনি দক্ষ সংগঠক ও পরিশ্রমী কর্মী ছিলেন বিধায় পরবর্তী বছর তথা ১৯৬১-৬২ সালের নির্বাচনে তাঁর দল থেকে সহ-সভাপতি পদে আহমেদ জামাল এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিজয়ী হন। এ সময় একদিকে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, অন্যদিকে কলেজের প্রিন্সিপাল লে. কর্নেল এম. এম. হক এর কঠোরভাবে কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালনার কারণে ছাত্রদের নিজস্ব দাবিদাওয়া আদায় ও জাতীয় রাজনীতিতে তাদের কর্মকাণ্ড সফল হতে পারেনি। এরূপ পরিস্থিতিতে পরবর্তী বছর 'অভিযাত্রী' দলের পক্ষ থেকে সহ-সভাপতি পদে সিদ্দিকুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে শেখ হায়দার আলী নির্বাচিত হন। তারাও তেমন কোনো সফলতা অর্জন করতে পারেননি। এর ফলে ১৯৬৩-৬৪ সালের নির্বাচনে কট্টর বামপন্থী হিসেবে পরিচিত এইচ. এম. নূরুল আলম সহ-সভাপতি পদে এবং জাফর উল্লাহ চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। এ সময় জাতীয় ক্ষেত্রে যেমন সমস্যা, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নানারকম সমস্যা ছিল। বিশেষ করে মেডিকেল কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসকদের যথাক্রমে অটোমেশন প্রথা বাতিল (কোনো ছাত্র তিনবার এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় ফেল করলে তাঁকে বহিষ্কার করা হতো), ইন্টার্নিশিপ ব্যবস্থা, বেতনভাতা, শ্রেণিগত মর্যাদাসহ নানারকম সমস্যা বিদ্যমান ছিল। এসব সমস্যার দিকে কলেজ ও হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ নজর দেননি। ছাত্র ও চিকিৎসকদের ক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাদের নেতৃত্বে ছাত্রদের ইন্টার্নিশিপ ব্যবস্থা প্রবর্তন,

সরকারি চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দানের দাবিতে ক্যাম্পাসে আন্দোলন তীব্র আকর ধারণ করে। এমনকি আন্দোলন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাতের পর্যায়ে চলে যায়। তারপরও দাবি আদায় করা সম্ভব হয়নি।[৫৯]

এই দাবিদাওয়ার ধারা পরবর্তী ইউনিয়ন নির্বাচনকেও প্রভাবিত করে। ১৯৬৪-৬৫ সালের নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে মীর্জা আবদুস সোবহান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে সারওয়ার আলী নির্বাচিত হন। তাদের নেতৃত্বেও আন্দোলন চলমান ছিল। ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাজনীতির সাথে বাইরের রাজনীতি পূর্বের চেয়ে আরো ঘনিষ্ঠ হয়। বিশেষ করে মেডিকেল কলেজের বামপন্থী ছাত্রদের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়, কারণ ১৯৬৩ সালে মেডিকেল কলেজের ছাত্র সারওয়ার আলী ক্যাম্পাস বহির্ভূত কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। এ ছাড়া আবদুল লতিফ মল্লিক কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের সংস্কৃত শাখার সহ-সভাপতি হিসেবে এবং আহমেদ জামালসহ আরো অনেকে কাজ করেন। মীর্জা আবদুস সোবহান ও সারওয়ার আলী'র সময় (১৯৬৪-৬৫) থেকে মেডিকেল কলেজের ছাত্র রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ও গঠনগত বিস্তার ঘটে এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে এর পরিণতি ঘটে। এ সময় ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনের চিরাচরিত দুই দলীয় (অগ্রনী বা অগ্রগামী, অভিযাত্রি বা অভিযাত্রিক) ভিত্তির পরিবর্তে ত্রিদলীয় ভিত্তি গড়ে ওঠে। এর কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাম রাজনৈতিক বিভাজনের (মস্কোপন্থী-চীনপন্থী) কারণে পূর্ব পাকিস্তানের বাম রাজনীতিতেও মতাদর্শগত বিভাজন ঘটে। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপ ও মেনন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। এটা ঢাকা মেডিকেল কলেজের বামপন্থী ছাত্রসংগঠনকে (মেনন গ্রুপ ও মতিয়া গ্রুপ) বিভক্ত হতে প্রভাবিত করে। ১৯৬৫-৬৬ সালের কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র আশফাক আহমেদ এর নেতৃত্বে ছাত্র ইউনিয়ন 'মেনন গ্রুপ' 'অগ্রগামী' ব্যানারে নির্বাচন করে। অন্যদিকে মতিয়া গ্রুপের সমর্থক ছাত্ররা ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া গ্রুপ নামে নির্বাচনি প্রতিযোগিতা করে। বামপন্থীর এই বিভাজনের কারণে অগ্রগামীর পক্ষ থেকে সহ-সভাপতি পদে নাসির উল্লাহ জয় লাভ করেন। তিনি মূলত বডি বিল্ডারের মতো ব্যক্তিগত পরিচিতির কারণে জয় লাভ করেন। সাধারণ সম্পাদক পদে অভিযাত্রীর পক্ষ থেকে সোলেমান মন্ডল জয়লাভ করেন।[৬০]

বামপন্থীদের মতাদর্শ বিভাজন ও মেরুকরণের কারণে বামশক্তি বিশেষ করে বাম ছাত্রশক্তিকে দুর্বল করে তোলে। যার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই বামবিরোধী ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাজনীতির শক্তি বৃদ্ধি করে। এই কারণে ১৯৬৬-৬৭ সালে কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে অভিযাত্রীর পক্ষ থেকে সহ-সভাপতি পদে আবদুল মান্নান ও সাধারণ সম্পাদক পদে চৌধুরী ফখরুল ইসলাম জয়ী হন অর্থাৎ প্রথম দুইটি আসনেই অভিযাত্রী দলের প্রার্থী বিজয়ী হয়। এই নির্বাচনের ফলাফল দেখে মেডিকেল কলেজের বামপন্থী ছাত্রসংগঠন পরবর্তীতে যৌথভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাদের এই বিচক্ষণতা সুফল বয়ে আনে। ১৯৬৭-৬৮ সালের নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়নের মতিয়া গ্রুপ এর প্রার্থী রহুল হক সহ-সভাপতি এবং ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ তথা 'অগ্রগামী'র সমর্থন নিয়ে আশিকুল আলম সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী হন। এ সময় তাঁরা মেডিকেল কলেজের নিজেদের কিছু দাবি আদায়ে তৎপর হন। বিশেষ করে ছাত্র ও সদ্য পাশ করা চিকিৎসকদের প্রধান দাবি ইন্টার্নিশিপ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং গণমুখী চিকিৎসা প্রবর্তন।[৬১] ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর স্বাস্থ্যব্যবস্থায় দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য ছিল। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রাদেশিক সরকারের অধীনে থাকলেও তা নিয়ন্ত্রণ করত কেন্দ্রীয় সরকার। তখন স্বাস্থ্য বাজেটের সামান্য অংশই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হতো। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্র ও চিকিৎসকদের জন্য ইন্টার্নিশিপ ট্রেনিং পদ্ধতি প্রবর্তনে বিলম্বের

বিষয়টি তাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের পাশ করা চিকিৎসকগণ সকলেই বেতনসহ ১ বছরের প্রশিক্ষণের সুযোগ পেলেও পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসকগণ তা থেকে বঞ্চিত ছিল। ১৯৬০ সালে আন্দোলনের মাধ্যমে চিকিৎসকের প্রশিক্ষণের অধিকার আদায় করা হলেও বেতনভাতা ছিল তাদের প্রায় অর্ধেক। এ সময় (১৯৬৭-৬৮) মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে পুনরায় দাবি জানানো হলেও তা আদায় করা সম্ভব হয়নি। এদিকে ১৯৬৮-৬৯ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এই ব্যাপারে ১৯৬৮-৬৯ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী* থেকে জানা যায় যে,

> But as the Annual Election of the students union was postponed for the year 1968-69, Annual Re-union Festivals and Annual Sports of the College could not be held during the session.[৬২]

এই প্রসঙ্গে ১৯৬৩ ব্যাচের ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ওয়াজেদুল ইসলাম বলেন, ‘ঐ বছরের টালমাটাল রাজনৈতিক অবস্থাই এজন্য দায়ী। এরপরতো একাত্তরের রনাঙ্গনে ছাত্র জনতার অনিবার্য উপস্থিতি সমাজের সুস্থির পরিবেশ নষ্ট করে দেয়, সব স্বাভাবিক হিসাব নিকাশ ভন্ডুল করে ফেলে। সেক্ষেত্রে কলেজ সংসদ নির্বাচনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।’[৬৩]

১৯৬৯-৭০ সালে কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উনসত্তরের ছাত্র আন্দোলন, গণআন্দোলনের কারণে এই নির্বাচনও বাম প্রভাবিত দল অগ্রগামী ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ প্যানেল জয়লাভ করে। এ সময় শহীদুল ইসলাম সহ-সভাপতি ও মাহবুবুর রহমান (ছাত্র ইউনিয়ন, মতিয়া গ্রুপ) সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। জাতীয় রাজনীতি ও কলেজের উন্নয়নে কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে তা আলোচনা করা হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনের ফলাফল দেখে বোঝা যায় যে, এই কলেজে বামরাজনীতির প্রাধান্য ছিল। সাধারণত কলেজের ছাত্রজীবনের শুরু থেকে যারাই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন তারাই বাম প্রভাবিত ছাত্র ছিল। বলা হয়, মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসেবে কেউ কেউ এই রাজনীতি দ্বারা এতটাই প্রভাবিত ছিল যে, পড়াশোনা, নিজের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন তুচ্ছ হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখেই চলে যায়। বামপন্থী ছাত্র হিসেবে আলী আজমল ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি অন্যান্য মেডিকেল ছাত্রদের সাথে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে যেয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন। সেখানে থেকে অনেক দেরিতে মুক্তি পান। এরপর নানা জটিলতার কারণে চিকিৎসাশিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেননি। আবার কিছু সংখ্যক ছাত্রকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে মেডিকেল কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর ফলে তাদের চিকিৎসক হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। দৃষ্টান্ত হিসেবে শামসুল হুদা, আমজাদ হোসেন ও আবদুল হাই এর নাম উল্লেখ করা যায়। কারণ তারা ১৯৪৮ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবিদাওয়া আদায়ের পক্ষে আন্দোলন সংগঠিত করা এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের নানা অগণতান্ত্রিক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে আইনসংগত সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়।[৬৪] মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর নির্যাতনমূলক স্বৈরাশাসনের কারণে কলেজ ইউনিয়ন এদের কলেজে পুনরায় প্রবেশের পক্ষে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। তাছাড়া কলেজের প্রিন্সিপাল টি. আহমেদ পাকিস্তান শাসক শ্রেণিকে সমর্থন করত। আবার কেউ কেউ সময় নষ্ট করলেও পেশাগত জীবন বা বৈষয়িক জীবন নষ্ট হয়ে যায়নি। এ ক্ষেত্রে বামপন্থী ছাত্রকর্মী

মোহাম্মদ জাহেদ (১৯৪৭), মঞ্জুর হোসেন, ফজলুল করিম শাহ, নওয়াব হোসেন, ফরিদুল হুদা, ফজলুল করিম, মহিউদ্দিন আহমেদ (১৯৪৮), আলী আসগর, আহমেদ কবির, আবদুল জব্বার (শহীদ), গোলাম মর্তুজা, আবদুস সালাম (১৯৪৯ ব্যাচ) এর চিকিৎসাশিক্ষা পাঠের মেয়াদ রাজনৈতিক কারণে বিলম্বিত হলেও ছাত্রজীবন একেবারে নষ্ট হয়নি।[৬৫] এই প্রসঙ্গে আহমদ রফিক ১৯৪৯ ব্যাচের ছাত্র আবদুস সালাম সম্পর্কে বলেন,

> ১৯৪৯ সনের বামপন্থী ছাত্র আবদুস সালাম ঐ বছরের শেষ দিকে কলকাতায় ভারতীয় বামপন্থীদের আয়োজিত 'নিখিল ভারত শান্তি সম্মেলনে' যোগ দিতে গিয়ে পুলিশী তৎপরতার শিকার হয়ে পায়ের গোড়ালি ভেঙ্গে মাস দুই তিন সেখানে আটক থাকেন। তাই তাঁর কলেজে আসা, ক্লাস করা সবই বিলম্বিত হয়।[৬৬]

আবার কারো কারো সংস্কৃতি চর্চার সাথে যুক্ত থাকার কারণে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করতে বিলম্ব হয়। উদাহরণস্বরূপ, বামপন্থী ছাত্র আবদুল কাদির খান প্রমুখ। তবে কিছুসংখ্যক ছাত্র রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তাদের চিকিৎসাশিক্ষা পুরোপুরি সার্থক হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ তারা প্রাকটিস না করে বহুজাতিক কোম্পানিতে, গবেষণাগারে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করেন। এ ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ ১৯৫৯ ব্যাচের বামপন্থী ছাত্র সারওয়ার আলীর নাম উল্লেখ করা যায়। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে তাঁর চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় পাশ করতে বিলম্ব হয়। মেডিসিন ও সার্জারিতে পাশ করলেও গাইনি বিষয়ে কৃতকার্য হতে পারেননি। তিন মাস পর পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রি লাভ করেন।[৬৭] তৎকালীন সময়ে সদ্য উত্তীর্ণ চিকিৎসকদের সরকারি চাকুরিতে অবারিত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এই চাকরির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল না। সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে কাজ করার আকাঙ্খা ছিল। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজের রেডিওগ্রাফি বিভাগের ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডা. ফজলুল করিম এর অধীনে একটি নতুন আবিষ্কৃত গবেষণায় রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট হিসেবে ৬ মাস কাজ করেন। এরপর জগন্নাথ কলেজের মেডিকেল অফিসার হিসেবে চাকুরি করেন। তাঁর এই নিয়োগে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের আপত্তি ছিল। এরপর নবগঠিত ডায়াবেটিক পুনর্বাসন কেন্দ্রে কয়েক মাস চাকুরি করেন। ১৯৬৮ সালে অধ্যাপক ফজলে রাব্বী'র চেম্বারে তাঁর সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। এই প্রসঙ্গে সারওয়ার আলী তাঁর *পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ* গ্রন্থে বলেন,

> ...ডাক্তারি শিক্ষায় ছাত্র আন্দোলনের কারণে যথেষ্ট অবহেলা হয়েছে। সন্ধ্যায় অধ্যাপক ফজলে রাব্বীর বায়তুল মোকাররমের চেম্বারে তাঁকে সাহায্য করি। তাঁর সঙ্গে হাউস কলেও যাই। তিনি রোগী দেখেন, আমি তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রেসক্রিপশন লিখি। অবশেষে ১৯৬৮ সালে ডা. রাব্বীর সুপারিশে ফাইজারের নতুন ফ্যাক্টরিতে খণ্ডকালীন মেডিকেল অফিসারের চাকুরি পাওয়া গেল।[৬৮]

দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে ফাইজারের খণ্ডকালীন চিকিৎসক থেকে এসিসট্যান্ট মেডিকেল ডিরেক্টর হন এবং ১৯৯০ সালে মেডিকেল ডিরেক্টর হন। মেডিকেল ডিরেক্টরের দায়িত্ব হলো গবেষণার সমন্বয় সাধন, ঔষধের সব প্রচার সামগ্রীর এথিকাল মানরক্ষা ও বিক্রয় প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ। এরপর ১৯৯৩ সালে ফাইজার ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড রেনাটা লিমিটেডে রূপান্তারিত হলে তাঁর নতুন পদবি হয় 'ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর।' এ ক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব হলো ফাইজারের আবিষ্কৃত নতুন ঔষধ বাংলাদেশে আমদানি করে বিতরণ ও বিক্রির জন্য তাদের অফিস পরিচালনা করা। এভাবে তিনি (সারওয়ার আলী) চিকিৎসা পেশা থেকে ঔষধ বিপণন ও বিতরণ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করেন।[৬৯]

কিছু সংখ্যক ছাত্র মেডিকেলের পড়া সমাপ্ত করতে পারেনি। এই ছাত্ররাই ঢাকা মেডিকেল কলেজে বাম রাজনীতির সূচনা করে। এই ধরনের রাজনৈতিক ছাত্রের সংখ্যা শুরুর দিকে কম হলেও এদের সমর্থক

সংখ্যা কম ছিল না। পরবর্তীতে এসব ছাত্রের সংখ্যা আরো বেড়েছে। এই সমর্থক শ্রেণির মধ্যে যেমন মেধাবী ছাত্র ছিল, তেমনি রাজনৈতিক তত্ত্ব অধ্যয়নে আগ্রহী ছাত্র, মানবিক আদর্শের টানে বাম রাজনীতির সমর্থক ছাত্র ছিল। প্রধানত তাদের অবদানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাসের ব্যারাক নাম স্বার্থক হয়ে ওঠে। মেডিকেল ব্যারাকের পরিবেশ বাম রাজনীতির জন্য সহায়ক হয়ে ওঠে। মেডিকেল কলেজের শুরুর দিকে এমন ধারণা প্রচলিত ছিল যে, মেডিকেল ব্যারাক বাম রাজনীতির নিরাপদ আশ্রয়।[৭০] তৎকালীন সময়ে মুসলিম লীগ সরকারের পুলিশবাহিনী যখন বামপন্থী মতাদর্শের ছাত্রদের ওপর দমনপীড়ন চালায় তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল, হোস্টেল এবং পুরান ঢাকার বাম ছাত্র নেতানেত্রীসহ অন্যান্য মতাদর্শের ছাত্রনেতারা মেডিকেল কলেজের বাঁশের ছাউনির হোস্টেলে তথা ব্যারাকে আশ্রয় নিত। এমনকি ব্যারাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের ছাত্রের উপস্থিতি সত্ত্বেও বামনেতাদের নিরাপত্তার অভাব ঘটেনি। মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস হওয়ায় পুলিশ তল্লাশি করার প্রয়োজনবোধ করত না। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী ছাত্র মুনীর চৌধুরী, গণিতের ছাত্র ও কমিউনিস্ট পার্টির ঢাকা জেলা সদস্য মোহাম্মদ ইলিয়াস সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছেড়ে মেডিকেল কলেজের ব্যারাকে আশ্রয় নেন। এ ছাড়া বামরাজনীতির সমর্থক আবদুল কাদির খান কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রনেত্রী নাদেরা বেগমকে মেডিকেল ব্যারাকে আশ্রয় দেন এবং এখান থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেন। ব্যারাকে দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল রাজনীতির প্রাধান্য থাকলে বাম রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছাত্রদের পক্ষে নির্বিবাদে বসবাস করা এবং সক্রিয় রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট থাকা সম্ভব হতো না।[৭১]

তৎকালীন পাকিস্তান আমলের শুরুর দিকে বামরাজনীতির অবস্থা প্রতিকূলে ছিল। তখনকার রাজনৈতিক পরিবেশে কমিউনিস্টি পার্টির সদস্যদের ওপর জেলখানার ভেতরে বাইরে অমানসিক নির্যাতন হতো। তার প্রমাণ পঞ্চাশের দশকের নাচোল বিদ্রোহ,নানকার বিদ্রোহ, তেভাগা বিদ্রোহ ও হাজং বিদ্রোহের মতো কৃষক আন্দোলনের নেতাকর্মী দ্বারা জেলখানা পূর্ণ ছিল। জেলখানার ভেতর তাদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালানো হতো। এই কৃষক আন্দোলনের বেশির ভাগ নেতাকর্মী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন।[৭২] এই অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ হয়নি, আন্দোলন হয়নি, এমনকি সংবাদপত্রে গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়নি। কারো মতে, পাকিস্তানি শাসকবর্গের এই অত্যাচার, নির্যাতন ফ্যাসীবাদী চরিত্রের। ইটালির ফ্যাসিবাদীরা যেমন কমিউনিজম বিরোধী ছিল। সমাজতন্ত্রকে নির্মুল করার জন্য সমাজতন্ত্রীদের সভাসমিতি ও কার্যক্রমের ওপর আক্রমণ চালাতো এবং প্রকাশ্যে সমাজতন্ত্রী নেতা কর্মীদের ভীতি প্রদর্শন ও হত্যা করা হতো। তাদের কর্মসূচি ছিল অগণতান্ত্রিক বিপ্লববাদী তথা উগ্র জাতীয়তাবাদী। এটা তৎকালীন পাকিস্তান আমলের মুসলীম লীগ সরকার পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের বাম বা কমিউনিস্ট নেতাদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন করে প্রমাণ করে।[৭৩]

এমন এক স্বৈরাচারী রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যেও পূর্ববাংলার প্রথম প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজের বামপন্থী ছাত্ররা নিষ্ক্রিয় ছিল না। উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বামপন্থী ছাত্ররা ক্ষুদ্র পরিসরে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। বিশেষ করে রাজশাহীর কেন্দ্রীয় কারাগারের খাপড়া ওয়ার্ডে আটক কমিউনিস্ট নেতাদের ওপর গুলি চালিয়ে হত্যা করা হলে এর বিরুদ্ধে মেডিকেল ব্যারাকের বাঁশের ছাউনির কমনরুমে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সভা সভাপতিত্ব করেন মেডিকেলের ছাত্র আবদুস সালামসহ আরো কয়েকজন বামপন্থী ছাত্র।[৭৪]

১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধেও কোনো প্রতিবাদ হয়নি। ছাত্ররা প্রতিবাদ জানালেও তা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে পারেনি। এ সময় মেডিকেল কলেজের ছাত্র, চিকিৎসক,

নার্সরা দাঙ্গায় আহতদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। একই বছর মূলনীতি কমিটির অগণতান্ত্রিক প্রস্তাবের প্রতিবাদে ঢাকার বার লাইব্রেরিতে আতাউর রহমান খান এর সভাপতিত্বে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শরফুদ্দিন আহমেদ, আলিম চৌধুরী, আবদুস সালাম, আহমেদ কবির, আবদুল মানাফ, মোজাম্মেল হক উপস্থিত ছিলেন।[৭৫]

এ সময় মেডিকেল কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্রদের মধ্যে বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী ছাত্রদের সংখ্যা বেশি ছিল। এই ব্যাচের (১৯৫০) কবির উদ্দিন, মাহমুদ, খোন্দকার মোহাম্মদ আলমগীর প্রমুখ ছাত্রদের নিয়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শের একটি ছাত্র গ্রুপ গঠন করা হয়। এরাই ব্যারাকে বাম রাজনীতির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরবর্তীতে এদের ঘিরে একটি বড় সমর্থন শ্রেণি গড়ে ওঠে। এটাই ছিল ব্যারাকে বামরাজনীতির শক্তি। পরবর্তী বছর গুলোতে এই ধারা অব্যাহত থেকেছে। এদের কেউ কেউ গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন, আবার কেউ কেউ সমর্থকের মতো মতাদর্শগত বিশ্বাস নিয়ে পার্টির সঙ্গে যুক্ত না থেকেও একই ধারায় কাজ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ১৯৫৩ ব্যাচের মেডিকেলের ছাত্র সাদেক চাপাইনবাবগঞ্জের তেভাগা আন্দোলনের সময় কমিউনিস্ট নেতা রমেন মিত্রের সমর্থক হয়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর সমর্থক রূপেই বামরাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হন।[৭৬] এমনকি মেধাবী ছাত্রদের একটি বড় অংশ এই রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী ছিল। এই প্রসঙ্গে আহমদ রফিক বলেন,

> মুসলমান সম্প্রদায়, বিরাজমান সামাজিক রক্ষণশীলতার কারণে বাম মতাদর্শের প্রতি সাধারণ সামাজিক সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও ক্ষেত্র বিশেষে তাদের নিঃস্বার্থ ত্যাগের প্রতি এবং বিশেষভাবে বাম ছাত্রশক্তির প্রতি এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ স্পষ্টতই দেখা যেতো। একই কারণে ছাত্ররাজনীতির প্রতি আপত্তি প্রকাশের মধ্যে অভিভাবকের এমন ধারণাও সত্য ছিল যে, মেধাবী ছাত্ররাই বাম মতাদর্শে অনুসারী হয়ে ওঠে।[৭৭]

মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বর্ষের বহুছাত্র এই ধরনের সমর্থক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলেও মধ্যপন্থীদের প্রাধান্য ছিল। কলেজে বামপন্থী ও তার অনুসারীদের প্রাধান্যের ক্ষেত্রে তারা মোট ছাত্রদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন না বরং তারা একক মতাদর্শগত বিচারে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। সাধারণত সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ বিশ্বাসী ও উদারমনা ছাত্ররা এই ধারায় চলার কারণে বামপন্থী ছাত্রগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। শুধু মতাদর্শগত দিক থেকে নয়, ব্যারাকের ছাত্ররাজনীতিতে বামপন্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবের বিষয় কেবল ছাত্র এলাকা ছাড়াও ঢাকার রাজনৈতিক মহলেও স্বীকৃত ছিল। তাই তৎকালীন সময়ে মেডিকেল ব্যারাক বামরাজনীতির নিরাপদ ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে,[৭৮] যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মেডিকেল ব্যারাকে কেবল বামপন্থী ছাত্র সংগঠনই ছিল না, কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনের সময় উপরিউল্লিখিত ‘অভিযাত্রী’ দল গঠন থেকে তা বোঝা যায়। মেডিকেল ব্যারাকের ছাত্ররা নানান মতাদর্শ ও আদর্শ হীনতায় ছিল। যেমন, কেউ গণতন্ত্রী, কেউ উদারগণতন্ত্রী, কেউ সমাজতন্ত্রী, কেউ জাতীয়তাবাদী (গণতন্ত্রী), কেউ মুসলিম লীগপন্থী তথা তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সমর্থক, কেউ ইসলামপন্থী, কেউ রক্ষণশীল, কেউ তমুদ্দুন মজলিশ, আবার কেউ কেউ রাজনীতির প্রতি আকর্ষণহীন কিছু সংখ্যক মেধাবী ছাত্র ক্যারিয়ার ভিত্তিক ছাত্রজীবনে বিশ্বাসী ছিল বলে পড়ুয়া ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে এরা জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যুতে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সমর্থন দেন। তারাও ভাষা আন্দোলন, ষাটের দশকের আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন।[৭৯]

দেশ বিভাগের পর কলকাতা মেডিকেল কলেজ থকে আসা যেসব ছাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়, তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক হয়ে ওঠে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের পূর্ববাংলায় তথা পূর্ব পাকিস্তানে জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ ও রক্ষণশীল এবং চরম স্বৈরাচারী শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মুসলিম লীগের প্রতি আগ্রহ কমে যায়। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ১৯৪৫ ব্যাচের ছাত্র সাঈদ হায়দার, নাজির আহমেদ উদার গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী হলেও বাম রাজনীতির সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল। অন্যদিকে কেউ কেউ আওয়ামী মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আকর্ষণে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির নিরিখে তাদের রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ ঘটান। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন ১৯৪৮ ব্যাচের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আলীম চৌধুরী। তিনি রাজনৈতিকভাবে ছাত্রলীগপন্থী হলেও মুক্তচেতনার অধিকারী ছিলেন। ১৯৪৭ ব্যাচের মতিয়ার সহ তাঁর ব্যাচের আরো একাধিক ছাত্র যেমন, আবদুল আজিজ, নওশের আলী, মহিউদ্দিনি খান, প্রমুখ একই রাজনীতির সমর্থক ছিলেন। পরবর্তী ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে শামসুল আলম, খুরশিদ উদ্দিন প্রমুখ কিছুসংখ্যক ছাত্র কলেজ ইউনিয়নে ছাত্রলীগ সমর্থকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। এরা কলেজ ও হাসপাতালের ছাত্র চিকিৎসকদের সমস্যা সমাধান এবং তাদের দাবিদাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে অংশ নিলেও জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এরা দুইজন ছাত্রজীবন শেষ করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে তাদের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাদের অনুসারীদের সংগঠিত করার কাজে ভূমিকা রাখেন। আবার তাদের মতোই তমুদ্দুন মজলিশের ছাত্রসংগঠন তথা ছাত্রশক্তির মকসুদুর রহমান, শাহাদত হোসেন শরীফ এবং রকিবুর রেজা চৌধুরী মেডিকেল ব্যারাকের ছাত্রদের মধ্যে তাদের মতাদর্শগত ভিত গড়ে তোলার চেষ্টা করে।[৮০]

উপরি-উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ছাত্রলীগ সমর্থকদের শক্তি ও সমর্থন তুলনামূলকহারে বেশি ছিল। ছাত্রশক্তি ও ছাত্রলীগ ছাত্ররা ভিন্ন মতাদর্শ হওয়া সত্ত্বেও বামদের বিরোধিতা করার জন্য একসাথে কাজ করেছেন। কলেজ ইউনিয়ন নির্বাচনে এরা 'অভিযাত্রী' ব্যানারে আর বাম মতাদর্শ ছাত্ররা 'অগ্রনী' নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, যা এই অংশের আলোচনার প্রথম দিকে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ব্যারাকে বিভিন্ন মতাদর্শের ছাত্র থাকলেও তাদের মধ্যে বৈরিতা বা বিরোধ ছিল না, যা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে চিন্তা করা যায় না। মেডিকেল ব্যারাকে অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার প্রভাব এতটাই প্রখর ছিল যে, রক্ষণশীল ছাত্র সংগঠন বিদ্যমান থাকলেও তারা প্রভাব খাটাতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৯নং ব্যারাকের ৫নং কক্ষের ছাত্র আলী আজগর বলেন,

> রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন আমি দেখি নাই, তবে ব্যারাক ছিল আমাদের শান্তি নিকেতন। ... মেডিকেল কলেজের প্রথম ছাত্র ইউনিয়নের সমাজকল্যান বিভাগের সদস্য ছিল রাধাকৃষ্ণ ভৌমিক। আমরা একই সাথে মিলেমিশে পূজা, মিলাদ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করতাম। আমাদের মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল না।[৮১]

মূলত অভিসন্দর্ভের আলোচ্য সময়ের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল উন্মুক্ত। রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও বিরোধ ছিল না। জাতীয় ও স্থানীয় সমস্যার সময়ে সব মতাদর্শের ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধভাবে দাবি আদায়ে তৎপর হতো। এটাই ছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

ভাষা আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের অবদান

ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই আন্দোলনের সূচনালগ্ন (১৯৪৭) থেকে প্রতিটি পর্বে এই কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে, তা অনেকের কাছে অজানা। অভিসন্দর্ভের এই অংশে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তথা পটভূমিতে না গিয়ে এই আন্দালনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান কতটুকু তা তুলে ধরা হয়েছে। চিকিৎসাশিক্ষা কারিগরি অন্য যে কোনো শিক্ষার চেয়ে ব্যতিক্রম। চিকিৎসাশিক্ষার মূল বিষয় হলো মানুষের সুস্থতা তথা অসুস্থ মানুষকে সুচিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করা ও জীবন রক্ষা করা। স্বাভাবিকভাবেই তাত্ত্বিক শিক্ষার চেয়ে হাতে কলমে ব্যবহারিক শিক্ষা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসাশিক্ষায় তাত্ত্বিক পড়াশোনার পাশাপাশি রোগীর পাশে বসে তার রোগ, ঔষুধ প্রয়োগ, এর কার্যাকারিতাসহ সব কিছু পর্যবেক্ষণ তথা ক্লিনিক্যাল শিক্ষার ওপর সুচিকিৎসক হওয়া নির্ভর করে। প্রতিটি ক্লাশে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে উপস্থিত থাকা অত্যন্ত জরুরি ছিল। অন্যথা ভবিষ্যতে সুচিকিৎসক হওয়া সম্ভব নয়। সুচিকিৎসক হতে না পারলে কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর ভবিষ্যতে তাঁর ক্যারিয়ার গড়াও সম্ভব নয়। ফলে চিকিৎসাশিক্ষার মতো জটিল কঠিন বিষয়ের বাইরে অন্য কিছুতে সময় দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আন্দোলনে জড়িত হলে তাদের ভবিষ্যৎ সুন্দর জীবন নষ্ট হতে পারে জেনেও মেডিকেল কলেজের অনেক ছাত্র দেশাত্মবোধের নৈতিক কর্তব্যবোধ থেকে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সুসংগঠিত হয়ে যোগদান করে। এর ফলে এই আন্দোলনের বিস্তার ব্যাপক হয়। ডা. শরফুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তাদের মনোভাবটি এ রকম ছিল যে, শিক্ষাজীবন শেষে চাকুরি না করে প্রাইভেট প্রাকটিস করে জীবন নির্বাহ করা যাবে।'[৮২]

১৯৪৭ সালের নভেম্বর ডিসেম্বর থেকে পূর্ববঙ্গে ভাষা বিষয়ক বিক্ষোভের সূচনা হয়। এই বছরের ডিসেম্বর মাসে ক্ষমতাসীন সরকারের সহযোগিতায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে পুরান ঢাকার উর্দুভাষী অধিবাসীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজের অস্থায়ী পলাশী ব্যারাকের ছাত্রাবাসের সামনে মিছিল নিয়ে আসলে কলেজের ছাত্ররা তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। এর ফলে কলেজের অনেক ছাত্র আহত হয়। ভাষার প্রশ্নে প্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ সংগ্রামে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা সাহসের সাথে অংশগ্রহণ করে। এই ব্যাপারে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডা. সাঈদ হায়দার বলেন,

> ... মুহূর্তে প্রতিরোধ এলো, মিছিলের অগ্রগতিকে বাধা দিতে বেরিয়ে এলো মেডিকেল ছাত্ররা, শুরু হলো খণ্ড যুদ্ধ। .... মেডিকেল ছাত্রদের অনেকেই সেদিন আহত হয়েছিল, কেটে ছিড়ে গিয়েছিল তাদের অঙ্গ প্রতঙ্গ, কিন্তু দৃঢ় মনোবল নিয়ে তারা সেদিন ভাষা ও সংস্কৃতির শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিল, দুর্জয় সাহস আর ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ নিয়ে।[৮৩]

১৯৪৭ সালের ভাষা আন্দোলনের সূচনা হলেও তা ১৯৪৮ সালে সুনির্দিষ্ট আন্দোলনের রূপ নেয়। একই বছরের (১৯৪৮) ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি, উর্দুর সাথে বাংলাকে গণপরিষদের তৃতীয় ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা মুসলিম লীগের সদস্যদের বিরোধিতার কারণে বাতিল হয়ে যায়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ফেব্রুয়ারি মাসের (২৬, ২৮, ২৯) বিভিন্ন সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হয় ও ধর্মঘট পালিত হয়। উক্ত সভা ও ধর্মঘটে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তারা ক্লাস বর্জন করে রাস্তায় নেমে এসে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেয় এবং পথ সভায় বক্তব্য রাখেন।[৮৪]

একই বছরের (১৯৪৮) ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে তমুদ্দুন মজলিশ ও মুসলিম ছাত্রলীগের এক যৌথসভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। এই পরিষদে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র মীর্জা মাজহারুল ইসলাম অন্তর্ভুক্ত হন। শুরুর দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিজস্ব কোনো ছাত্রাবাস না থাকায় তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলে থাকতে হয়েছে। মেডিকেল কলেজে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল। তিনি খেলাধুলা, লেখাপড়া ও রাজনীতিতে সক্রিয় ছিল। সেই কারণেই মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে ছাত্রদের সংগঠিত করে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি ছাড়াও এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বদরুল আলম, আবু সিদ্দিক মিয়া, আবদুল মান্নান, আবদুল হাই তারা আন্দোলনের শুরুর দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আন্দোলন সংগঠনে তাঁকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন।[৮৫] ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারির সভায় সরকারের ভাষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে ১১ মার্চ সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট পালনের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা সফল করার জন্য ঢাকার ছাত্র নেতারা নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও যথেষ্ট সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে। অলি আহাদ প্রমুখ নেতার সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জসিমুল হক, আবু সিদ্দিক মিয়া, এম.আই. চৌধুরী, মোঃ আলী আসগর প্রমুখ হাইকোর্ট ও সেক্রেটারিয়েটের প্রথম গেটের সামনে অবস্থান নেয়। অন্যান্যরা পলাশী ও নীলক্ষেত ব্যারাক, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ অঞ্চলের পিকেটিং এর উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করে।[৮৬]

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা কেবল ভাষা আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেনি বরং উর্দু শিক্ষার পক্ষে যারা প্রচারণা পরিচালনা করে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দুভাষী অধ্যাপক ড. সাদানির বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বেতারে আপত্তিকর বক্তৃতা দেবার প্রতিবাদে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা তাঁর পদচ্যুতির দাবি জানানোর জন্য সভার আয়োজন করে।[৮৭] পরবর্তীকালে এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তার বিরুদ্ধে অন্যান্য ছাত্রদের মতো ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে মেডিকেল কলেজের মাহফুজ হোসেন, মীর্জা মাজহারুল ইসলাম, আহমেদ ফজলুল মতিন, আবু ছিদ্দিক, আবদুল মান্নান প্রমুখসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাও প্রতিবাদ করে। এই কারণে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ২২ ও ২৩ মার্চ ছাত্র সমাবেশ করে। মূলত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তৃতা শুনতে যাওয়া ছাত্ররাই ব্যারাকের অন্য সহপাঠীদের সাথে নিয়ে পরবর্তী একুশের আন্দোলন গড়ে তোলে।[৮৮]

১৯৪৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিশেষ কোনো আন্দোলন না হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র সমাজ ভাষার প্রশ্নে প্রস্তুত ছিল। বিভিন্ন সময়ে তারা তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের যেসব ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলে থাকত তাদের উদ্যোগে এই হল থেকে উর্দুভাষী ছাত্রদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে এবং সফল হন। এ সময়ের মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের কর্মতৎপরতা নিয়ে আ. জা. ম. তকীয়ুউল্লাহ বলেন,

> ... ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনসহ ছাত্র আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ পর্যন্ত পুরো আন্দোলনকে প্রানবন্ত রাখতে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৯-১৯৫১ সালের আন্দোলনে মেডিকেল কলেজের ছাত্র আবদুল হাইসহ অনেকেই গ্রেপ্তার হন এবং তাদের কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তৎকালীন সময়ের মেডিকেল কলেজের ছাত্র মোবারকেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[৮৯]

এ সময়ের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ভাষা চেতনা এত গভীর ছিল যে, তারা উর্দু ভাষা সংশ্লিষ্ট কোনো কিছুকে ছাড় দিতেন না। ১৯৫১ সালের আগস্ট মাসে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল টি. আহমেদ (১৯৪৮-১৯৫১) কলেজে 'নাজমা ও নুরী' নামে একটি উর্দু নাটকের মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হন এবং নাটকটি মঞ্চস্থ করতে বাধা দেন। ফলে পুরো আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়।[৯০] ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে।

একই বছরের ৩১ জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরিতে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, তমদ্দুন মজলিশ, ইসলামি ব্রাদারহুড, যুবলীগ ইত্যাদি সংগঠনের প্রতিনিধি ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা মেডিকেল স্কুল, জগন্নাথ কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র নেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন শরফুদ্দিন আহমেদ, আহমদ রফিক, মোঃ আলী আসগর, মোজাম্মেল আবদুল সালামসহ প্রমুখ। এই আলোচনা সভায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ বা 'All Parties Committee of Action' গঠিত হয়।[৯১] প্রতিটি সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এই পরিষদ গঠন করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে গোলাম মাওলাকে সদস্য মনোনীত করা হয়। এই মনোনয়নে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে নেওয়া হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে শুধু একজন প্রতিনিধি সহ-সভাপতি গোলাম মাওলাকে নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে এই সভায় উপস্থিত ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র আহমদ রফিক বলেন,

> হয়তো উপস্থিত রাজনীতিক ও ছাত্রনেতারা ভেবেছিলেন মেডিকেল কলেজের মতো কারিগরি শিক্ষায়তনের তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্ররা তাদের কর্মব্যস্ততার মধ্যে আন্দোলনে কতটাই বা সময় সহায়তা দিতে পারবেন। কিন্তু এই ধারণা যে সর্বতোভাবে ভুল একুশের আন্দোলনে তার প্রমাণ মিলেছিল।[৯২]

ভাষা আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের নেতৃত্বকে ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন স্বীকার করেন। ১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে যে ছাত্রসভা হয়, সেখানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অনেক ছাত্র অংশগ্রহণ করে। উক্ত সভায় একুশ ফেব্রুয়ারিতে দেশব্যাপী হরতাল, বিক্ষোভ, সভা ও মিছিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ তা সমর্থন করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা উপলব্ধি করে যে, পুরান ঢাকার উর্দুভাষীদের ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে না পারলে এই আন্দোলনকে স্বার্থক ও সফল করা কষ্টকর হবে। তাই ১৯ ফেব্রুয়ারি কলেজ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি গোলাম মাওলার পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিন কাদের সর্দার এর বাসায় গিয়ে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে তাঁর সমর্থন আদায় করেন। পুরান ঢাকার জনগণ বিশেষ করে কাদের সর্দার যদি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত না দিতেন, তাহলে তাদের পক্ষে আন্দোলনে যাওয়া খুবই কঠিন ছিল।[৯৩] সে সময়ের সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিন আহমেদ তা উল্লেখ করেন। তারা এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। কারণ ঢাকার প্রভাবশালী উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী যখন

বাংলাকে সমর্থন করবে, তখন পূর্ববাংলার জনগনের ওপর মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা পরিবর্তন করতে শাসক শ্রেণিকে বাধ্য করা হয়। বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ও কিছু প্রাণের বিনিময়ে মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা শুধু সভা ও মিছিলে অংশগ্রহণ করে কর্তব্য শেষ করেননি। তারা মেডিকেল ব্যারাকের ছাত্রদের একুশে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি বাস্তাবায়ন করতে আহ্বান জানান। তাই একুশে ফেব্রুয়ারিকে সফল করে তুলতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হলের মতো মেডিকেল ব্যারাকেও ব্যস্ততা বেড়ে যায়। পোস্টার লেখা, চাঁদা তোলা, ইস্তেহার ছাপার জন্য প্রেসে যাওয়া ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকে। মেডিকেল কলেজের যেসব ছাত্র পোস্টার লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তারা হলেন, জিয়া হাসান, নুরুল ইসলাম, বদরুল আলম, ফজলে রাব্বি, জাকির হোসেন, মশাররফুর রহমান প্রমুখ।[৯৪]

১৯৫২ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ছাত্রদের কর্মতৎপরতা বন্ধ করার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য হল হোস্টেলের ছাত্রদের মতো মেডিকেল ব্যারাকের ছাত্ররা নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এই দিন মেডিকেল ব্যারাকের এক ছাত্র সমাবেশে আবুল হাশেম, আলিম চৌধুরী, মনজুর হোসেন, প্রমুখ ছাত্র বক্তৃতা দেন। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ২০ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মেডিকেল ব্যারাকের ছাত্র ডা. সাঈদ হায়দার বলেন,

> বায়ান্নর ২০ ফেব্রুয়ারি একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিকেল। মেডিকেল ছাত্রাবাসের প্রতিটি ছাত্রকর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের অধিকাংশ ছিল ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে শহরে সরকার আরোপিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে।[৯৫]

১৪৪ ধারা জারির পর সার্বিক পরিস্থিতি ও পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ৯৪, নবাবপুর রোড, আওয়ামী লীগের অফিসে প্রধান নেতা আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি গোলাম মাওলা অংশগ্রহণ করেন। মেডিকেল ব্যারাকের সচেতন ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অন্যদিকে মেডিকেল ব্যারাকের ছাত্র আহমদ রফিককে সর্বদলীয় পরিষদের ওপর নজর এবং যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে গিয়ে সাধারণ ছাত্রদের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ছিল।[৯৬]

এ রকম অবস্থায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে পুলিশ বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং তথা বর্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে অবস্থান নিতে থাকে।[৯৭] উল্লেখ্য, এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ, লাইব্রেরি, প্রশাসনিক ভবন, শ্রেণিকক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক অংশে ছিল, অন্য অংশ ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধীনে ছিল, কারণ তখনও ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিজস্ব ভবন ছিল না। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশটি ১০ লক্ষ রুপির বিনিময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এই কারণেই মেডিকেল কলেজ থাকা সত্ত্বেও এই এলাকাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর বলা হতো। তাছাড়া মেডিকেল কলেজ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফ্যাকাল্টির অধীনে। ১৯৫৫ সালে হাসপাতালের পাশেই মেডিকেল কলেজের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়।

যাহোক, ছাত্ররা একত্রিত হয়ে কলা ভবনের সামনে হাজির হতে থাকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা সবাই হাসপাতাল প্রাঙ্গনের পূর্বে আমতলা ও মধুর ক্যান্টিনের সামনে হাজির হয়। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের সাথে মিলিত হয়। আমতলার সভার বিবরণ অনেকেরই জানা। সেই বিবরণে না গিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের এই সভায় অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কলেজের ৪৭ ব্যাচের ছাত্র মতিয়ার রহমান এই দিনটির অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান,

> আমতলার মিটিং এ ছিলাম, এখান থেকে ১০ জন করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে যেসব ছাত্র বের হচ্ছিল তার এক ব্যাচে আমিও ছিলাম। ভাগ্যক্রমে পুলিশের বেষ্টনী থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে মেডিকেল কলেজের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম।[৯৮]

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ছাত্ররা পুলিশ কর্ডন ভেঙ্গে মেডিকেল ব্যারাকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে পুলিশ কাঁদানো গ্যাস ছুড়ে, লাঠিচার্জ করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং পুরো এলাকার চেহারা পাল্টে যেতে থাকে। আমতলা, মধুর ক্যান্টিনে দুইএকজন ছাত্র থাকলেও মেডিকেল ব্যারাক প্রাঙ্গন ভরে যায়। এ সময় ব্যারাক প্রাঙ্গনেও স্লোগান চলতে থাকে এবং এসেম্বলি ভবন ঘেরাও করে এম. এল.এ.-দের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করতে চেষ্টা করা হয়। এরই মধ্যে পুলিশ ব্যারাকের সামনে অবস্থান নিলে নিরস্ত্র ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। ২১ ফেব্রুয়ারির দুপুরের দিকে ব্যারাক প্রাঙ্গনে মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংখ্যা বেশি ছিল। ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আহমদ রফিক জানান, ‘তারাই তৎপর ছিল সবার চেয়ে বেশি।’[৯৯] এ সময় মেডিকেল কলেজের বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র মানিকগঞ্জের এম. এল. এ আওলাদ হোসেনসহ কয়েকজন এম. এল. এ কে ব্যারাক প্রাঙ্গনের ছয় নম্বর ছাউনিতে নিয়ে আসেন এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে পরিষদে প্রস্তাব আনার অঙ্গীকার আদায় করেন।[১০০]

এরকম বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ৩:১০ থেকে ৩:৩০ মিনিটের দিকে তৎকালীন অবাঙালি জেলা প্রশাসক এ. এইচ. কোরেশীর নির্দেশে পুলিশ মেডিকেল কলেজের ব্যারাকের সামনে সমবেত ছাত্রদের ওপর দু দফায় ২৭ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে। এই গুলিবর্ষণে কয়েকজন ছাত্র, সাধারণ মানুষ শহীদ হয়। এটাই ছিল পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ছাত্রদের ওপর প্রথম গুলিবর্ষণ। এ সময় মেডিকেল ব্যারাককে কেন্দ্র করে ভাষার লড়াই ছিল যেমন সাহসী, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত। মেডিকেল ব্যারাক পরিণত হয় ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। গুলিবর্ষণে শহীদ হবার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণ যুক্ত হতে থাকে। তাদের সংখ্যাই ছিল বেশি। ভাষা আন্দোলনের ফলে প্রবল যে গতিবেগ সঞ্চার হয়, তা সরকারের প্রশাসনিক ভিতকে দুর্বল করে দেয়। মেডিকেল ব্যারাক প্রাঙ্গনের এই কর্মতৎপরতায় মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের প্রাধান্য ছিল। তারা এই লড়াইকে সহজভাবে নেয়। এ সময় পুলিশের গুলিতে ব্যারাক প্রাঙ্গনে শহীদদের মধ্যে ছিলেন মাথায় গুলিবিদ্ধ রফিকউদ্দিন, উরুতে গুলিবিদ্ধ আবুল বরকত, তলপেটে গুলিবিদ্ধ আবদুল জব্বার। শহীদ রফিক উদ্দিন এর মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ঢাকা মেডিকেল কলেজের তৎকালীন সময়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ও ১৮ নম্বর ছাউনির ১০ নম্বর কক্ষের বাসিন্দা হুমায়ূন কবির স্বচক্ষে দেখেন এবং হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যান।[১০১] অনুরূপভাবে একই ঘটনা সম্পর্কে মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের আরেক ছাত্র মশাররুফ প্রত্যক্ষ করেন এবং শহীদ রফিক উদ্দিনের মাথার মগজটি তিনি দুই হাতে তুলে নেন।[১০২]

মেডিকেল ব্যারাকের ছাত্ররা আহত ও নিহতদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আহতদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া এবং শহীদদের লাশ মর্গে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করেন কলেজের শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, এমনকি ওয়ার্ডবয়সহ সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী। মেডিকেল কলেজের কোনো ছাত্র শহীদ না হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও ব্যারাক প্রাঙ্গন আন্দোলনের প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। আন্দোলনের নেতৃত্ব তাদের ওপর এসে পড়ে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে ছাত্ররা আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি দেওয়া, প্রচারকার্য পরিচালনা, পরস্পর যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ আন্দোলনের সার্বিক সমন্বয় সাধনের কাজটি সম্পন্ন করে। এই প্রসঙ্গে ভাষা সৈনিক ও ১৯৫০-৫২ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল মতিন বলেন,

> ভাষা আন্দোলনের গুলিবর্ষণের পর ঢাকা শহর ও সমগ্র দেশের ছাত্রদের ও তাদের সমর্থক জনগণের মধ্যে পরিব্যপ্ত হয়ে গেলেও সে সময় আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ তথা কলেজের বাঁশের ব্যারাকের ছাত্রাবাসে। তা যদি না হতো তাহলে ভাষা আন্দোলন এত সুশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত না হতে পারতো। গুলি চালনার পরপরই মেডিকেল হোস্টেলের আমগাছগুলিতে বাঁধা মাইকের হর্ন থেকে প্রচারই জানিয়ে দিয়েছিল ছাত্রদের ওপর নির্মম, বর্বর ও আকস্মিক গুলিবর্ষণের খবর। তাদের দেখাদেখি পরে ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ্ হল এবং আরো কিছু জায়গায় মাইক বেঁধে প্রচারের পদ্ধতি চালু হয়েছিল।[১০৩]

মেডিকেল কলেজের মাইকের মাধ্যমে গুলিবর্ষণের খবর প্রচার করা হলে ঢাকা শহরবাসী জনগণের পক্ষে জানা সম্ভব হয়। ফলে ছাত্রাবাস ও ইমার্জেন্সিতে সাধারণ মানুষের ঢল নামে। সাধারণ মানুষের এই উপস্থিতি দেখে কয়েকজন ছাত্র ভাষা সৈনিক আবদুল মতিনকে ২২ ফেব্রুয়ারি জানাজা প্রদানের কর্মসূচি দিতে আহ্বান জানান। ফলে ভাষা আন্দোলন মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গন থেকে ছাত্রাবাস, নীলক্ষেত, পলাশী ব্যারাক, পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জ তথা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে।[১০৪]

গুলিবর্ষণের পর আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণের জন্য ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে মেডিকেল কলেজ ব্যারাকে (হোস্টেল) সহ-সভাপতি গোলাম মাওলাকে আহ্বায়াক করে একটি নতুন সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ২০ ফেব্রুয়ারির সর্বদলীয় সভার সিদ্ধান্ত ছিল ছাত্রদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সর্বদলীয় পরিষদ বিলুপ্ত হবে। সেজন্যই নতুন আহ্বায়ক মনোনয়ন কিন্তু নতুন আহ্বায়াক (গোলাম মাওলা) মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও নতুন সদস্য নিয়ে নতুন পরিষদ গঠন করা হয়নি। তাই পুরানো সদস্যদের অনেকে আন্দোলনের দ্বিতীয় দিন থেকে যাওয়া আসা শুরু করে। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অনুপস্থিত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা।[১০৫]

সংগ্রাম পরিষদ গঠনের পর আন্দোলনের গতি সঞ্চার হয়। মেডিকেল কলেজের সকলপন্থী ছাত্ররা একতাবদ্ধ হয়ে সম্মিলিতভাবে একুশের আন্দোলনকে স্বার্থক করে তুলে, কেননা শহীদদের মৃতদেহ, কবর ও পরিচয় এই কলেজের ছাত্রদের দ্বারা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। দুইজন মেডিকেল কলেজ ছাত্র ভাষা শহীদদের মৃতদেহ শনাক্ত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন, তারা হলেন বামপন্থী ছাত্রনেতা খোন্দকার আলমগীর এবং আমীর আহসান। শহীদদের মৃতদেহ লুকিয়ে রাখা সত্ত্বেও সামরিক বাহিনীর লোকজন হাসপাতাল ঘেরাও করে লাশগুলো নিয়ে যায়। সকালে কারফিউর সময় পার হওয়ার সাথে সাথে উল্লিখিত দুইজন ছাত্র আজিমপুর কবরস্থানে চলে যায়। শহীদদের রক্তমাখা কাপড় ও ব্যান্ডেজ ইত্যাদি কবরস্থানের একটি ঘর থেকে উদ্ধার করেন এবং কবরগুলোকে চিহ্নিতকরণ করেন। এই খবরটি সলিমুল্লাহ হলের মাইকে ঘোষণা দেওয়া হলে রক্তমাখা ব্যান্ডেজ ও কাপড়ের টুকরো নিয়ে এক

শোভাযাত্রা হয়। এই শোভাযাত্রায় ছাত্রদের পাশাপাশি সাধারণ জনসাধারণসহ বহু সরকারি কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন, তবে এই মিছিলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বেশিরভাগ ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে যেমন ছিল রাজনীতি সচেতন ছাত্র, তেমনি ছিল রাজনীতিতে অনাগ্রহী পড়াশোনায় একনিষ্ঠ ছাত্র, সাধারণ ছাত্র।[১০৬] এই প্রসঙ্গে ভাষা সৈনিক এম. আর. আখতার মুকুল বলেন,

> মেডিকেল কলেজের দু'জন ছাত্র দুঃসাহসিক কাজ করে বসলো। কারফিউর মধ্যে এরা সৈন্যদল চলে যাবার পর এই দুই জন ছাত্র শহীদদের কবরগুলো চিহ্নিত করে এলো। এই জন্যই পরবর্তীকালে ছাত্রসমাজ প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আজিমপুর গোরস্থানে এই কবরগুলো জিয়ারত ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে সক্ষম হচ্ছেন।[১০৭]

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজে একটি ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ভাষা আন্দোলনে যারা আহত হয়েছিল, তাদের চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের জন্য প্রচুর রক্তের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু হাসপাতালের কোথাও রক্ত ছিল না। রক্তের প্রয়োজন মেটাতে রক্ত সংগ্রহের জন্য ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র, শিক্ষকদের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় রক্ত সংগ্রহ অভিযান ও ব্লাড ব্যাংক স্থাপন করা হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রথম ব্লাড ব্যাংক স্থাপনের চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয় এবং বিনামূল্যে রক্ত প্রদানের ব্যবস্থা চালু হয়।[১০৮] বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রক্তদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। *সাপ্তাহিক সৈনিক* জানায় যে,

> আজকের হত্যাকান্ডে আহতবন্ধুরা রক্তের অভাবে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মরতে বসেছে। আপনি দয়া করে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত দান করে বাঁচান।[১০৯]

এক শোকাবহ ঘটনার মধ্য দিয়ে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এই ব্যাংক দেশের নানা দুর্যোগের সময় ইমার্জেন্সি রোগীদের সেবায় বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৯ সালে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে আহতদের চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক বিভিন্ন হাসপাতালে রক্ত সরবরাহ করে। *দৈনিক আজাদ* জানায়,

> সেনাবাহিনী ও ই. পি. আর এর জোয়ান এবং নাগরিকগণ সোমবারের ঘূর্ণিঝড়ে আহতদের চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক আগ্রহ সহকারে রক্ত দান করিতেছে। গত দুই দিনে ব্লাড ব্যাংকে ৭৯ জন রক্তদান করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে ১৬ জন সেনাবাহিনীর জোয়ান ও ১০ জন ই.পি. আর বাহিনীর লোক এই পর্যন্ত রক্ত দিয়াছেন। ব্লাড ব্যাংক সংগৃহীত এই রক্ত বিভিন্ন হাসপাতালের প্রয়োজনে ব্যয় হইতেছে।[১১০]

অপরদিকে ভাষা শহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য শহীদ মিনার নির্মাণের কথা চিন্তা করা হয়। ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের এক রাতের শ্রমে নির্মিত হয় প্রথম শহীদ মিনার। প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা, স্থান নির্বাচন এবং প্রাথমিক উদ্যোগের পুরোটাই ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সম্মিলিত শ্রমের ফসল। ব্যারাকের রাজনীতি সচেতন কয়েকজন ছাত্রের উদ্যোগে প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। এই কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সহ-সভাপতি গোলাম মাওলা ও সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিন আহমেদ এর অনুরোধে 'শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' প্রথম শহীদ মিনারের নকশা অংকন করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচ (১৯৪৬) এর ছাত্র বদরুল আলম। তিনি ভিক্টোরিয়া পার্কের সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিস্তম্ভের আদলে একটি নকশা করেন। তাঁর এই নকশা অনুযায়ী শহীদ মিনার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গন থেকে সংগ্রহ করা হয়। কলেজ সম্প্রসারণের জন্য সংরক্ষিত ইট, বালু, সিমেন্ট মোতালেব কন্ট্রাক্টর ও ঢাকার পিয়ারু সর্দারের গুদাম থেকে সংগ্রহ করা হয়। প্রয়োজনীয় এই উপকরণ সংগ্রহের পাশাপাশি রাজমিস্ত্রীও জোগাড় করা হয়। উপকরণ সংগ্রহসহ সকল কার্যক্রম ঢাকা মেডিকেল কলেজের

ছাত্রদের একক শ্রম আর সাধনার ফসল। মেডিকেল কলেজের ব্যারাকে অবস্থানরত প্রায় সকল ছাত্ররাই নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। ভাষা সংগ্রামী, শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান 'ভাঙ্গাগড়ার শহীদ মিনার' নামে একটি প্রবন্ধে শহীদ মিনার নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণকারীদের নাম উল্লেখ করেন। তারা হলেন, আবদুর রশিদ, আবদুস সামাদ, আবদুস সালাম, আবুল হাশিম, আলী আসগর, আলমি চৌধুরী, আশেক, আসাদুজ্জামান, আহমদ রফিক, ইসমাইল, কবির, কাজী আনওয়ারুল হক, কাদের, গোলাম মওলা, জহুরুল হক, জাহেদ জিয়া জেকো, তাহের, নওয়াব হোসেন প্রধান, ফজলুল মতিন, ফরিদুল হুদা, বদরুল আলম, মকসুদ, মনজুর হোসেন, মর্তুজা মামুনূর রশীদ, রাব্বি, শরফুদ্দিন আহমদ, শাহজাহান, সাঈদ হায়দার, সিরাজ জিন্নাহ, হাবিবুর রহমান, হুমায়ূন আবদুল হাই।[১১১] সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণে প্রথম শহীদ নির্মাণ করা হয়। শহীদ মিনারের ভিত ছিল পাঁচ ফুট গভীর, পাদদেশে ছয় ফুট লম্বা, ছয় ফুট চওড়া এবং ১১ ফুট উচ্চতা।[১১২] প্রথম শহীদ মিনারের স্থপতি নকশাকার মেডিকেল কলেজের ১ম ব্যাচের ছাত্র বদরুল আলম বলেন,

> রাতেই ইট, বালি, সিমেন্ট রাজমিস্ত্রী জোগাড় হয়ে গেল। ভোর পাঁচটার মধ্যে ১০ ফুট উঁচু ও ৬ ফুট প্রস্থের শহীদ মিনার তৈরি হলো। ২৩ ফেব্রুয়ারি সেই রাতে হোস্টেলের সবাই অংশগ্রহণ করেছিল শহীদ মিনারটি তৈরি করতে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হতো না।[১১৩]

অপরদিকে শহীদ মিনার নির্মাণের সাথে যুক্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজের আরেকজন ছাত্র ডা. সাঈদ হায়দার বলেন,

> উচ্চারণের সব দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে, প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বা রাজনৈতিক বা সামাজিক বা সাংস্কৃতিক দলের কর্মীদের কোনো অবদান ছিল না।[১১৪]

প্রথম শহীদ মিনারের পরিকল্পনা, নকশা ও নির্মাণে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের যেমন একক অবদান ছিল, তেমনি এটা উদ্বোধনের ক্ষেত্রেও সকল কৃতিত্ব মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের। একজন ভাষা শহীদের পিতাকে দিয়ে প্রথম শহীদ মিনার উদ্বোধনের চিন্তা ও বাস্তবায়ন পুরোটাই ছিল মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সফল উদ্যোগ। ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর এর পিতা অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা মাহবুব রহমান। ২৬ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন *দৈনিক আজাদ* এর সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। তিনি একুশে ফেব্রুয়ারিতে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে মুসলিম লীগের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। নেতৃস্থানীয় কাউকে দিয়ে উদ্বোধনের এই সিদ্ধান্তটিও ছিল যথার্থ ও বাস্তবসম্মত।[১১৫] আবুল কালাম শামসুদ্দিন এর মতো আরো একজন এম.এল.এ. আব্দুল হামিদ মুসলিম লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। তিনি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, 'আমি আজ থেকে আর মুসলিম লীগে নাই।'[১১৬] তারা নৈতিকতাবোধ থেকে ব্যবস্থাপক পরিষদ ও মুসলিম লীগের সদস্যপদ ত্যাগ করে ছাত্রদের ওপর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান, যা ভাষা আন্দোলনকে আরো ফলপ্রসু করে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের নির্মিত প্রথম শহীদ মিনার আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। এটা হয়ে ওঠে বাঙালি জাতির প্রেরণার উৎস ও আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক। ২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই শহীদ মিনারে জনসাধারণের সমাগম হতে থাকে। নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সবাই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে থাকে। প্রথমদিকে এই আন্দেলন ছিল ছাত্র আন্দোলন, কিন্তু কালক্রমে তা গণআন্দোলনে পরিণত হয়। এটাই ছিল প্রথম শহীদ স্তম্ভের অন্তর্নিহিত শক্তি। এই সম্মোহনী শক্তি অনুমান করতে পেরেই গণবিরোধী মুসলিম লীগ সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় প্রথম শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেলে। প্রথম শহীদ

মিনার ভেঙ্গে ফেলার পর এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। বাংলা ভাষার প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি বাঙালির হৃদয়ে আরো জোরালো হয়ে ওঠে। সেই চেতনার শক্তি জাতীয় জীবনের সব সংকট ও সংগ্রাম আজও বাঙালিদের প্রেরণা ও সাহস যোগায়। এটা প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের 'প্রতীক' হয়ে আছে। প্রথম শহীদ মিনারের উত্তরসুরি হয়ে আজকের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। তাই মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ একটি মহৎ অর্জন। মেডিকেল ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও দেশ, জাতি তথা জাতীয় সংকটে শুধু চিকিৎসক হিসেবে নয়, সচেতন রাজনীতিবিদ, দেশপ্রেমিক হিসেবে যে ভূমিকা রাখতে পারেন, তা ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা প্রমাণ করেন, কারণ ভাষা আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক চেতনার ঊর্ধ্বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মতো মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের ব্যাপক অংশগ্রহণের পেছনের প্রধান কারণ ছিল মাতৃভাষার অধিকার রক্ষা করা, এ ক্ষেত্রে আবেগ, নীতিবোধ মূল ভূমিকা পালন করেছে। মেডিকেল কলেজের পড়াশোনায় একনিষ্ঠ ছাত্র, অরাজনৈতিক ছাত্র মাতৃভাষার অধিকার রক্ষায় দেশাত্মবোধের আবেগ থেকে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। তারা এটা উপলব্ধী করতে পেরেছিল ভাষার ওপর আঘাত মানে অস্তিত্বের ওপর আঘাত। এই প্রসঙ্গে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে (১৯৪৮) যুক্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র এম. আই. চৌধুরী বলেন,

> চিকিৎসা পেশার আদি শপথ অনুযায়ী আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে তখনও জড়িত ছিলাম না, এখনও নেই। মাতৃভাষার জন্য মনের আবেগে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলাম। যার জন্য পুলিশের লাঠি পিটুনি ও ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের খানা খেতে হয়েছিল।[১১৭]

ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির বিকেল পর্যন্ত অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের অবদান ছিল উল্লেখ করার মতো। তবে গুলিবর্ষণের পর ২১ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে সকল কৃতিত্বের একমাত্র দাবিদার ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা। এই কলেজের ছাত্রদের অবিস্মরণীয় ও অমর সৃষ্টির কারণেই আজকের শহীদ মিনার বাঙালি জাতির প্রাণের মিনার। তাদের কৃতিত্বের কথা তেমনভাবে প্রচার না হওয়ায় অনেকে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।[১১৮] তাদের এই অবদানের কথা তেমন প্রচার বা স্বীকৃতি না পেলেও ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের কৃতিত্বের কথা স্বীকার করে বলেন,

> ভাষা আন্দোলনের অমূল্য কীর্তি শহীদ মিনারের প্রথম স্মৃতিস্তম্ভ মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের অবদান। ভাষা-আন্দোলনের শহীদ এবং আন্দোলনের হাজারো সহকারীদের স্মৃতি অম্লান রাখার জন্য বর্তমান শহীদ মিনারের কাছে ২৩ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজ ছাত্ররা এক রাত্রের মধ্যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে যে কাজটি সম্পন্ন করেছিল তা আজও বাঙালি জাতির কাছে অমর হয়ে আছে। আজ বাংলাদেশের সকল ছাত্র প্রতিষ্ঠানে ভাষা শহীদদের স্মরণে ছাত্ররা ঐ একই প্রকার স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে রেখেছে।[১১৯]

ষাটের দশকের ছাত্র আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের অবদান

১৯৬০ এর দশকের ছাত্র আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। জেনারেল আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে শাসন ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করতে রাজনীতি, শাসনতান্ত্রিক, বৈদেশিক ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে এক অগণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। তিনি সংবিধান বাতিল, আইনসভাকে বিলুপ্ত, ইলেকটিভ বডিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার (EBDO) ও দ্য পাবলিক ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার (PODO) অধ্যাদেশের মাধ্যমে রাজনীতি চর্চার সুযোগ বন্ধ, মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব, রাজনীতিবিদদের ওপর দমননীতি প্রয়োগ এবং ছাত্র ও

ছাত্ররাজনীতির ওপর অযাচিত হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। ফলে সামরিক শাসনের প্রতি জনসাধারণের ক্ষোভ থাকলেও ছাত্ররাই প্রথম এর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে রাজপথে নেমে আসে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা সাহস ও উদ্দীপনা নিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া ছাত্র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন শুরু হলে তৎকালীন ছাত্র নেতৃবৃন্দের অনেকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য মেডিকেল কলেজের বকশী বাজারের হোস্টেলে আশ্রয় নিতেন। আন্দোলনের কর্মসূচি এই কলেজ হোস্টেল থেকে নির্ধারিত হতো।

মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা শহীদ দিবস উদযাপন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবাদের সূচনা করে। নানাবিধ নিষেধের মধ্যে ছাত্ররা শহীদ দিবস উদযাপন করত। এ সময় প্রধান রাজনৈতিক কৌশল ছিল প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক দাবিতে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। একুশের সঙ্গে জনমনে যে আবেগের সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে শাসকেরা এই অনুষ্ঠান পালনে বাধা দেওয়ার ঝুঁকি নিবে না। একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস উদযাপনের জন্য শহীদ মিনার সাজানোর দায়িত্ব ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের ওপর ছিল।[১২০]

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা প্রতিবছর ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে শহীদ মিনার ফুলে ফুলে সজ্জিত করত এবং পরের দিন ২১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতাদের হাতে বুঝিয়ে দিতেন। এ সময় শহীদ মিনারে নানা সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতারা জনসমাবেশে রাজনৈতিক বিষয় তথা ভাষার অধিকার, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা নিয়ে বক্তৃতা দিতেন। এসব বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সামরিক শাসনের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ করে। ১৯৬১ সালে পরোক্ষভাবে হলেও শহীদ দিবস উদযাপনের মধ্যদিয়ে ফুটে ওঠে। শহীদ দিবস যথাযথভাবে প্রতিবাদ দিবস হিসেবে উদযাপনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি তাদের কর্মীদের উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালের ১২ জানুয়ারি ৫ দফা দাবি উত্থাপনের নির্দেশ জারি করে। উক্ত দাবিদাওয়ার মধ্যে ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা প্রচলন, ২১ ফেব্রুয়ারির দিন ছুটি ঘোষণা এবং শহীদ মিনার নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।[১২১]

এ সময় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন শহীদ দিবস উদযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোর (ঢাকা হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক হল) পক্ষ থেকে দেওয়াল পত্রিকা যেমন টানানো হয়, তেমনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 'পদক্ষেপ' নামের দেওয়াল পত্রিকা টানানো হয়। এ উপলক্ষ্যে আহুত সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের সঙ্গে মেডিকেল কলেজের তৎকালীন বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থক কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর খালেদ এবং সাধারণ সম্পাদক লতিফ মল্লিক অংশগ্রহণ করেন। সামরিক শাসন আমলের ছাত্র আন্দোলনের আরেকটি কৌশল হলো সাংস্কৃতিক সংগঠন ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধি করা। এটি প্রতিবাদি রাজনৈতিক চেতনা প্রকাশের মাধ্যম ছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলতে রবীন্দ্র জন্মশর্তবার্ষিকী, পহেলা বৈশাখ এসব অনুষ্ঠান উদযাপনের ক্ষেত্রে নানারকম বাধা আসত।[১২২]

এসব বাধাবিপত্তি আসলেও তৎকালীন সময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৯৬১ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন (সংসদ) তিন দিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালন করে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল। শাসকপক্ষের কাছে এই অনুষ্ঠান মোটেও ফলপ্রসু হয়ে ওঠেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির ধর্মভিত্তিক ভাবাদর্শ রক্ষার স্বার্থে এই অনুষ্ঠান উদযাপন ছিল তার বিপরীত ভাবাদর্শের তথা অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ।

শাসকেরা বাঙালি সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানে, তা প্রতিরোধে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠেন। এসব বাধা সত্ত্বেও ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং গোপীবাগ ভিত্তিক দুইটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে এই শতবার্ষিকী উদযাপিত হয়। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজ একটি শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত হয়।[১২৩] কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র জহুরুল মাওলা এবং ডা. শিশির মজুমদার জানান যে,

> ... সব মিলিয়ে অনুষ্ঠান এতই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে যে, দর্শক শ্রোতাদের অনুরোধে তা নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যায়নি। দুইদিনের জন্য নির্ধারিত অনুষ্ঠান সাত দিন পর্যন্ত টেনে নিতে হয়।[১২৪]

অনুষ্ঠান নিরাপদে সম্পন্ন হলেও একেবারে নির্বিঘ্ন ছিল না। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা কে বা কারা অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা, তাদের রাজনৈতিক পরিচয় জানার চেষ্টা করে। এ সময় কলেজে বামপন্থী ছাত্রদের প্রাধান্য থাকায় অনুষ্ঠানের উদ্যোগ ও পরিচালনায় বামপন্থী দল 'অগ্রগামী' ছিল। ১৯৬২ সালের সামরিক শাসন ও হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সম্পৃক্ততা ছিল। একই বছরের ৩১ জানুয়ারি রাত ২ টায় ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে মধুর ক্যান্টিনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সালে ছাত্র ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে বামপন্থী নেতা আহমেদ জামাল উপস্থিত ছিলেন। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন ছাত্রলীগের শেখ ফজলুল হক মনি এবং সিরাজুল আলম খান। আন্দোলনের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন মোহাম্মদ ফরহাদ। এজন্য তাঁকে বাষট্টির ছাত্র আন্দোলনের মতিস্ক বলা হয়।[১২৫] তিনি ধর্মঘটের প্রথম পোস্টার লিখেছিলেন। এ সময় ছাত্র আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন অফিস। তাই বৈঠকের পর নেতৃবৃন্দ ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে চলে আসত। এখান থেকেই আন্দোলনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কলেজ ও হলগুলোতে পৌঁছে যেত। মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের এই অফিস থেকেই পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি বিষয়ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংগঠিত শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।[১২৬]

উল্লিখিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ঢাকা মেডিকেল কলেজ ভবন ও হোস্টেল সামরিক শাসন বিরোধী পোস্টারে ভরে যায়। পোস্টার লিখনেও মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সালে সর্বত্র সফল ধর্মঘট পালিত হলেও সামরিক শাসন অবসানের লক্ষ্যে আমতলায় সভা ও মিছিল হয়। এই সভা ও মিছিলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অনেক বামপন্থী ছাত্র যোগ দেয়। এ সময় কলেজের সাধারণ ছাত্রদের মেডিকেলের ক্লাস বাদ দিয়ে সভা ও মিছিলে অংশগ্রহণ নিত্য নৈর্ম্যত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশের লাঠিচার্জের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আন্দোলন থেকে বিরত থাকেনি। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র হিসেবে এসব সভায় অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে সারওয়ার আলী বলেন,

> ... সবে তৃতীয় বর্ষের ক্লিনিক্যাল ক্লাস শুরু হয়েছে অথচ আমার ওয়ার্ডে অনুপস্থিতি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয় এবং পড়াশোনা লাটে ওঠে।[১২৭]

১৯৬২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা দিলে প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। এই বিক্ষোভ সমাবেশে ছাত্রদের পাশাপাশি পুরান ঢাকার সাধারণ জনগণও অংশগ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সুসংগঠিত দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১২৮] বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও সেনাপুলিশের কঠোর দমননীতির কারণে আন্দোলন স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে

একই বছর মার্চ মাসে আবার আন্দোলন শুরু হলে অনেক ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র আহমেদ জামাল, খলিলুল্লাহ, জহুরুল মওলা প্রমুখ ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে গ্রেফতার এড়ানো সম্ভব হয়। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল (১৯৫৯-৬২) লে. কর্নেল এম. এম. হক পুলিশ বাহিনীকে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেননি। এই সুবিধার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রনেতা (সিরাজুল ইসলাম, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সাঈফ উদ্দিন মানিক, কাজী জাফর, রাশেদ খান মেনন, মোহাম্মদ ফরহাদ) নিরাপত্তার প্রয়োজনে আশ্রয় নিত।

এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের আরেকটি দায়িত্ব ছিল কারাগার থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা রাজনৈতিক নেতা, কর্মীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা। জিতেন ঘোষ, সত্যেন সেন, আবদুস সামাদ আজাদ, মাওলানা ভাসানী প্রমুখ নেতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্র সারওয়ার আলী ও তাজুল তাদের দেখাশোনা করেন। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের (ডা. ফজলে রাব্বী, ডা. আলীম চৌধুরী, ডা. কে. এস. আলম) চেম্বারে আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক নেতাদের চিকিৎসা করা হতো। এভাবে মেডিকেল কলেজের ছাত্র, চিকিৎসকগণ, তাদের অবস্থান থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন।

১৯৬২ সালের জুন মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে সামরিক শাসনের অবসান করে পরোক্ষ নির্বাচনের বিধি রেখে সংবিধান ঘোষিত হয়, কিন্তু সামরিক শাসকরাই দেশ পরিচালনা অব্যাহত রাখে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ, রাজনৈতিক নেতারা প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রকে প্রত্যখান করে এবং শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেন এবং কয়েকদিন ধর্মঘট ও মিছিল হয়। এ সময় বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন স্থবির হয়ে গেলেও প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য যে শরীফ কমিশন গঠন করেন, তা ছাত্ররা বর্জন করে। শরীফ কমিশনের প্রতিক্রিয়াশীল রিপোর্ট প্রকাশের পর ছাত্র আন্দোলনে পুনরায় গতিবেগ সঞ্চার করে। শরীফ কমিশনের রিপোর্টে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার জন্য একটি অভিন্ন বর্ণমালা, উর্দুভাষাকে গুরুত্ব প্রদান, সার্বজনীন ও অবৈতনিক শিক্ষার বিরোধিতা এবং ডিগ্রি কোর্সকে তিন বছর করার সুপারিশ করা হয়। শরীফ কমিশন বিরোধী আন্দোলনের প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ অংশগ্রহন না করলেও আগস্ট মাস থেকে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই আন্দোলনে যোগ দেয়। এ সময় মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা সভাগুলোতে যোগদান করে। ১৭ সেপ্টেম্বর হরতাল ঘোষণা হলে, ঐ দিন পিকেটিং ও বিক্ষোভ মিছিলের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ও গুলিবর্ষণে ওয়াজিউল্লাহ্ নামে একজন বালকসহ চারজন নিহিত হয়। এর ফলে আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে, তবে এই আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়নি এবং আইয়ুব খানকে পদচ্যুত করা যায়নি। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে রাজনীতিবিদরা আশ্রয় নিত এবং বিভিন্ন বৈঠক হতো।[১২৯] সামরিক শাসনের দমননীতির বিরুদ্ধে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সঙ্গে একাত্ম হয় কেবল পূর্বসুরীদের ঐতিহ্য থেকেই নয় বরং নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে।[১৩০] চিকিৎসাশিক্ষা বিষয়ক না হলেও তারা এটাকে গোটা ছাত্রসমাজের সমস্যা তথা সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা হিসেবে উপলব্ধি করে।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যখন নির্যাতন নিপীড়ন দ্বারা এই ছাত্র আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ, তখন তারা জনচেতনা অন্যদিকে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে কাশ্মীরের হযরত বলে এক বিভ্রান্তিকর সংবাদকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। ৪ জানুয়ারি থেকে ১০ জানুয়ারি

পর্যন্ত হিন্দু, মুসলমান দাঙ্গা ঢাকা শহর ও আদমজী পাটকল শিল্পের শ্রমিক এলাকায় ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ যুক্তভাবে এই দাঙ্গা নিরসনে অগ্রসর হয়। এই দুই ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের রক্ষায় তৎপর হয়ে ওঠে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের বেশ কয়েকজন ছাত্র এই প্রতিরোধের সাথে জড়িত ছিলেন। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের (সংসদ) বামপন্থী সমর্থক দল 'অগ্রগামী'র কর্তৃত্ব ছিল। এই প্রসঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ডা. সারওয়ার আলী বলেন,

> আমরা কয়েকজন র‍্যাংকিন স্ট্রীটের মুখলেসুর রহমান (সিদু ভাই) এর বাসায় আস্তানা গাড়ি। সারাদিন ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ কর্মীরা নারিন্দা, মদনমোহন বসাক লেন, ঠাটারী বজারের সশস্ত্র কসাই ও গুন্ডাদের মোকাবিলা করে হিন্দু পরিবারগুলোকে রক্ষা করতে তৎপর হয়। পাহারা বসাই জগন্নাথ হলে।[১৩১]

জাতীয় দুর্যোগের এই পর্যায়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা যেমন সরাসরি দাঙ্গা প্রতিরোধের সাথে জড়িত ছিল, তেমনি মেডিকেল কলেজের ছাত্র, চিকিৎসক ও নার্সরা গভীর আন্তরিকতার সাথে দাঙ্গায় আহতদের চিকিৎসাসেবা ও পুর্নবাসনের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

১৯৬৪ সালে ২২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিলে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ তা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যাঞ্চেলর হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খান এর কাছ থেকে সনদ নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এই সংক্রান্ত ছাত্রবিক্ষোভে পুলিশ ব্যাপক দমননীতি চালালে আন্দোলন তীব্র হয় এবং সমাবর্তন অনুষ্ঠান ভণ্ডুল হয়। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো ছাত্রের এম. এ. ডিগ্রি কেড়ে নেওয়া হয় এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রনতোকে (আবদুর রাজ্জাক, রাশেদ খান মেনন, জাকির আহমেদ, বদরুল হক, সিরাজুল ইসলাম, আলী হায়দার, ওবায়দুর রহমান প্রমুখ) বহিষ্কার করা হয়। এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করা হলে জয়লাভ করেন। ছাত্রদের এই বিজয় মিছিলেও পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা এই বিজয় মিছিলে অংশগ্রহণ করলে পুলিশের লাঠিচার্জ দ্বারা আহত হয়। এদিকে সরকার বিচারপতি হামিদুর রহমানকে প্রধান করে ছাত্রদের সমস্যাবলী নিরসনে একটি কমিশন গঠন করে, যা 'হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন' নামে পরিচিত। এই কমিশন সম্পর্কে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডা. সারওয়ার আলী জানান,

> ষাটের দশকে হামুদুর রহমান কমিশনের কাছে ছাত্রদের বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানালে, কমিশনের সচিব আমাদের জানায় এর কোনো প্রয়োজন নেই। দেশের মৎসম্পদনীতি প্রণয়নের জন্য মাছদের কাছ থেকে সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।[১৩২]

১৯৬৪ সালের শেষের দিকে প্রদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এই কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করে। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা তাদের ক্লাস বাদ দিয়ে এবং জটিল ও কঠিন পাঠ্যবই একপাশে সরিয়ে রেখে আন্দোলনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে। আন্দোলনের আরো বিস্তার ও ঐক্যবদ্ধ তৎপরতা ঘটাতে ঢাকার প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতারা সম্মিলিতভাবে ৬ সেপ্টেম্বর আইয়ুব বিরোধী ২২ দফা প্রণয়ন করে। এই ২২ দফায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মূল সমস্যাগুলো স্থান পায়। বিশেষ করে মেডিকেল কলেজের স্বায়ত্তশাসন, অটোমেশন প্রথা বাতিল ছিল প্রধান দাবি, যা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সে সময়ের কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৪-৬৫) ডা. সারওয়ার আলী'র সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়।[১৩৩] তাছাড়া ২২ দফা ছাত্র স্বার্থ

সংশ্লিষ্ট হলেও এতে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, রাজবন্দীদের মুক্তি প্রভৃতি রাজনৈতিক ইস্যু প্রাধান্য পায়। সে সময় থেকেই ছাত্রদের স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ ঐক্যবদ্ধসুত্রে আবদ্ধ হয়। ২২ দফাকে কেন্দ্র করে ছাত্ররা ১৭ সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' পালন করলে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে।

এদিকে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রী নামে এক অভিনব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। ইউনিয়ন ও জেলা পরিষদের সদস্যরা মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য ছিলেন। ঢাকা নগরে জনসংখ্যার ভিত্তিতে মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হতো। এই মৌলিক গণতন্ত্রীরা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ভোটার গণ্য হতেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ, আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল এবং বকশিবাজার নিয়ে একটি নির্বাচনি এলাকা ঘোষিত হয়। ছাত্রদের পক্ষ থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চতুর্থবর্ষের ছাত্র আশফাক আহমেদকে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং সে বিজয়ী হয়। এই বিজয় ছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের জন্য সতর্ক সংকেত। এই প্রসঙ্গে ডা. সারওয়ার আলী বলেন,

> পূর্ববাংলার সাধারণ যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী এবং তারা যাকে মনোনয়ন দিবেন, সে নির্বাচিত হবে তা তৎকালীন পাকিস্তান সরকারকে বোঝানোর জন্য ওয়ারনিং দেওয়া হয়।[১৩৪]

গভর্নর মোনায়েম খান ঐক্যবদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার জন্য এন. এস. এফ (ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন) নামে কুখ্যাত সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠন করেন। এই সংগঠন সরকারি সমর্থনের জোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে হামলা চালাতো। ইতিমধ্যে ১৯৬৫ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন দল মতাদর্শের নামে দুই দলে (মতিয়া ও মেনন) বিভক্ত হয়ে পড়ে। এটা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের স্পর্শ করলেও কলেজে এন.এস.এফ. এর অবস্থান দুর্বল ছিল, বরং হরতাল ও বিক্ষোভে ঢাকা মেডিকেল কলেজের দুই ছাত্র ইউনিয়নই ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করে। এই ঐক্যবদ্ধতার কারণেই এন.এস.এফ. ছাত্র সংগঠন ঢাকা মেডিকেল কলেজে কোনো অবস্থান নিতে পারেনি।

হরতাল, বিক্ষোভ, মিছিল সমাবেশের মধ্য দিয়ে ছাত্র আন্দোলন চরম পরিণতি লাভ করে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে তিন ছাত্র সংগঠন (ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া, মেনন দল) তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ছাত্রসংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। ছাত্ররা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে শুধু রাজপথেই নেমে আসেনি, তারা ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ডাকসু কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১১ দফা দাবি ঘোষণা করেন। ১১ দফার প্রথম দফায় ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত ও অন্যান্য অধিকার সংক্রান্ত ১৭টি দাবির মধ্যে মেডিকেল কলেজ সংক্রান্ত একটি দাবি ছিল। সেটি হলো মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করাসহ মেডিকেল ছাত্র ও নার্সদের সকল দাবি মেনে নেওয়া। ১১ দফা ছিল ছাত্রসমাজসহ দেশের সকল শ্রেণির মানুষের আর্থ-সামাজিক দাবি। তাই এই দফার পক্ষে কৃষক, শ্রমিক তথা সাধারণ শ্রেণির মানুষের ব্যাপক সমর্থন ছিল, যা ছাত্র আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করে। ১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে ছাত্রদের ১১ দফা ভিত্তিক গণআন্দোলন বাংলাদেশের স্বাধীকার তথা স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপটে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে।[১৩৫]

আইয়ুব বিরোধী ছাত্র জনতার আন্দোলন পুলিশ ও সেনাবাহিনী দমন করার চেষ্টা করে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আউটডোর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যানেক্স ভবনের সামনের রাস্তায় পুলিশ বাহিনী অবস্থান নেওয়ার কারণে মেডিকেল ও হলের ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষ লাগত। এরূপ পরিস্থিতিতে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২০ জানুয়ারি ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল শুরু হলে পুলিশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনের মিছিলে লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ করে। এর ফলে মেনন দলের ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আসাদুজ্জামান গুলিবিদ্ধ হলে তাঁকে হাসপাতালের ৮ নং ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়, কিন্তু তিনি চিকিৎসার পূর্বেই মারা যান। আসাদের মৃত্যুতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সে সময়ের মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আশিকুল আলম এর নেতৃত্বে শহীদ আসাদের রক্ত মাখা শার্ট নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে প্রথম প্রতিবাদী শোক মিছিল বের করা হয় এবং ২১ জানুয়ারি সমগ্র দেশে হরতাল পালনের আহ্বান জানানো হয়।[১৩৬]

শহীদ আসাদের লাশ নিয়ে যাতে বড় ধরনের আইয়ুব শাসন বিরোধী আন্দোলন হতে না পারে সেজন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ই.পি.আর. ও পুলিশ বাহিনী ঘিরে ফেলে এবং বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এত বাধাবিপত্তির মধ্যেও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেয়। তারা শহীদ আসাদের লাশ গোপন করে রাখে। অবশেষে শহীদ আসাদের শোকার্ত পরিবারের অনুরোধে একই দিন রাতে ৩ টায় মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের তত্ত্বাবধানে ট্রাকযোগে মৃতদেহ গ্রামের বাড়ি শিবপুরে পাঠানো হয় এবং পারিবারিক কবরস্থানে লাশ দাফন করা হয়। এ ক্ষেত্রে মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শুধু চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেনি, তারা আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তৎকালীন পাকিস্তান শাসন আমলে এই অঞ্চলের জনসাধারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, চিকিৎসা, তথা সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার হন। তাই মেডিকেল কলেজের ছাত্র হলেও একজন সামজ সচেতন, মানুষ হিসেবে দেশাত্মবোধ থেকে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

এ সময় *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় আসাদের নিহত হবার ঘটনাটি সামগ্রিকভাবে তুলে ধরে। এই পত্রিকায় 'আসাদের মন্ত্র - জনগণতন্ত্র' শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১৩৭] অন্যদিকে শহীদ আসাদকে নিয়ে শামসুর রহমান এর রচিত 'আসাদের শার্ট', 'আমরা ফিরে আসছি' (২১.১.৬৯) কবিতা জনচেতনা জাগাতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, লেখক, আহমদ রফিক বলেন,

> সময় ও ঘটনা দুইয়ে মিলে এভাবেই ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। সে ঐতিহ্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের ধারাবাহিক রাজনৈতিক তৎপরতা ঘিরে প্রকাশ পায়। আর পায় বলেই ষাটের দশকে পৌঁছে রাজনীতিতে আসক্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজের পরবর্তী প্রজন্মের কাউকে কাউকে দেখি, কারো কারোর কথা শুনি গর্ব ও অহংকারের সঙ্গে, এ কলেজেরই ছাত্র হিসাবে।[১৩৮]

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির মতো ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারির ছাত্র আন্দোলনে আসাদের নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় গণআন্দোলনে পরিণত হয়। পূর্ববাংলার তথা পূর্ব পাকিস্তানের বিপুলসংখ্যক জনগণের অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে তা গণঅভ্যুত্থানের চরিত্র অর্জন করে। ছাত্র সংগ্রাম কমিটি তিন দিনের শোক দিবস ঘোষণা করে। একই বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসহ সাধারণ জনগণকে আরো ক্ষুব্ধ করে তোলে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের ব্যাপক রাজনৈতিক সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সাথে এই

মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন দুই ছাত্রকে অভিযুক্ত করা হয়। তারা ছিলেন পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর মেডিকেল কোরের অফিসার। তারা হলেন মেজর শামসুল আলম ও ক্যাপ্টেন খুরশীদউদ্দিন আহমদ। একের পর এক ঘটনা পরিস্থিতিকে অবনতির দিকে নিয়ে যায়।

আসাদ হত্যার পরপরই একই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারির সময় মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা তাদের পূর্বসুরীদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সতর্কতার সাথে 'শহীদ দিবস' পালনের প্রস্তুতি শুরু করে। তারা উনসত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মতো মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আসাদ হত্যার পরপরই অন্যান্যদের হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রআন্দোলন গণআন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। তার পরিণামে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। অন্যদিকে স্বাধীণ বাংলাদেশের সম্ভাবনা তৈরি হয়। এখানেই ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সাথে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির গণআন্দোলনের ব্যাপক পার্থক্য । ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন গনঅভ্যুত্থানের চরিত্র লাভ করে, কিন্তু একুশের আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। প্রধানত সাংগঠিনক দুর্বলতা ও গণস্বার্থ বিষয়ক দাবির অনুপস্থিতি এবং নতুন কিছু ঘটনার উপস্থিতি (যেমন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা)।

এই পার্থক্যের কারণেই উনসত্তরের ছাত্রআন্দোলন গণআন্দোলন থেকে তীব্র আকার ধারণ করে গণঅভ্যুত্থানে পরিণতি লাভ করে। যার মাধ্যমে আইয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়, তবে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে পদত্যাগ করতে হয়নি। এমন একটি আন্দোলনে মেডিকেল কলেজের মতো কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের অংশগ্রহণ, ক্ষেত্রবিশেষে নেতৃত্বদানের মতো ভূমিকা গ্রহণ করতে পারা নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। আসাদ হত্যার দুইদিন আগে ১১ দফা 'দাবি দিবস' পালন উপলক্ষ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা কালো পতাকা উত্তোলন এবং কালো ব্যাজ ধারণ করেন। ছাত্ররা তাদের দাবিদাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রিন্সিপালের নিকট অর্পণ করেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার সভায় যোগ দেন।[১৩৯] ১১ দফা উনসত্তরের গণআন্দোলনের চরম পরিণতি গণঅভ্যুত্থানের প্রেরণা।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের নিজস্ব দাবিদাওয়া

মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি কলেজের নিজস্ব সমস্যা নিয়েও প্রতিবাদী আন্দোলন করে। তৎকালীন পাকিস্তান শাসনামলে মেডিকেল কলেজের ছাত্র, চিকিৎসক সংক্রান্ত কলেজ ও হাসপাতালে অবকাঠামোগত নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে অন্যতম সমস্যা ছিল সরকারি চিকিৎসকদের নিম্নস্তরের বেতনের হার। ১৯৫০ এর দশক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি চিকিৎসকগণ তাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য দাবি জানায়। তৎকালীন সরকার তাদের দাবিদাওয়া পূরণ করার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় স্মারকলিপি পেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই বিষয়টি পূর্ববাংলার তথা পূর্ব পাকিস্তান মেডিকেল সার্ভিস (আপার) এবং পূর্ব পাকিস্তান সাব-এসিস্ট্যান্ট সার্জনদের যুক্তফ্রন্টের অধিবেশনে বিবেচনা করা হয় এবং দাবি পূরণের জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সরকারি চিকিৎসকগণ এর সাথে যুক্ত থাকায় কলেজের ছাত্ররাও সমর্থন করে। একই বছরের ৩ ডিসেম্বর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পার্লামেন্টে চিকিৎসকদের চাকুরি সংক্রান্ত একটি বিল পাশ করে। এই ব্যাপারে *ঢাকা প্রকাশ* জানায়,

> অদ্য প্রাতে পার্লামেন্টের অধিবেশন শেষ হওয়ার পূর্বে যে সাতটি বিল পাশ করা হইয়াছে ৩২ বৎসরের কম বয়স্ক ডাক্তারদের ৩ বৎসর বাধ্যতামূলক সরকারি চাকুরি করার বিল অন্যতম। সামরিক ও বেসামরিক বিভাগে ডাক্তারদের অভাবের দরুন এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করা হয়।[১৪০]

তাই পাকিস্তান সরকার মেডিকেল প্রাকটিশনার্স আইন (চিকিৎসা ব্যবস্থা আইন) কার্যকর করার জন্য চিকিৎসকদের নাম রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক করে। অন্যথা চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৪১]

পাকিস্তান সরকার চিকিৎসকদের নাম রেজিস্ট্রি ও তাদের বাধ্যতামূলক সরকারি চাকুরি করতে আইন পাশ করলেও তাদের বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বরং পরবর্তীকালে এই বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করতে হয়। একই বছর (১৯৫০) ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা নতুন কলেজ কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। দুই বিদেশি প্রিন্সিপালের (মেজর ডব্লিউ. জে. ভারজিন, ই.জি. মন্টেগোমারি) পর কলকাতার খ্যাতিমান চিকিৎসক চক্ষু বিশেষজ্ঞ টি. আহমেদ প্রিন্সিপাল (১৯৪৮-১৯৫২) হন। তিনি বাঙালি হলেও রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে রক্ষণশীল প্রকৃতির ছিলেন। তিনি মেডিকেল কলেজের উন্নয়নে অনেকটা উদাসীন ছিলেন। চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতিমান হলেও প্রশাসক হিসেবে দক্ষ ছিলেন না। তিনি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের যথাক্রমে প্রিন্সিপাল ও সুপারিনটেনডেন্ট এর দায়িত্ব পালনকালে যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেননি। কলেজ ও হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য এবং প্রতিষ্ঠান দুইটিকে আধুনিক মানসম্মত করার জন্য যে পরিমাণ শ্রম ও সময় ব্যয় করা দরকার ছিল তা করতে ব্যর্থ হন। এজন্য কলেজ ও হাসপাতালের বহুমুখী উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি অর্থ বরাদ্দ ও মেধাবী চিকিৎসকদের উচ্চশিক্ষার জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় বিদেশে পাঠাতে পারেননি। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের মেডিকেল প্রশাসকগণ তা যথার্থভাবেই করতে পেরেছিল। এমনও দেখা যায় যে, পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রদের নামে ব্যয় করা হয়, যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যাপক টি. আহমেদ মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের প্রতি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে নিপীড়নমূলক নীতি গ্রহণ করেন। তাদের প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব পোষণ করেননি। এর প্রধান কারণ তাঁর সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতা ও ব্যক্তিগত অহমবোধ। উপরন্তু, ছাত্রদের প্রতি তাঁর আচরণও শিক্ষকসুলভ ছিল না। তিনি প্রিন্সিপাল থাকাকালীন এই কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে (শামসুল হুদা, আমজাদ হোসেন ও আবদুল হাই) কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়।[১৪২] কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ফেরত ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডা. সাঈদ হায়দার বলেন 'ডা. টি. আহমেদ এর তিন বৎসরাধিক অবস্থানকালে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রিন্সিপাল ছাত্র সম্পর্কের অবনতি ঘটে'।[১৪৩] এর ফলে কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং স্বীকৃতি পেতে বিলম্ব হয়। মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম অব্যবস্থাপনায় চলতে থাকে। এজন্য তার প্রশাসনিক কাজের অদক্ষতা ও বিবেক বর্জিত কাজকে দায়ী করা হয়। এই ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ হতে থাকে।[১৪৪]

তিনি কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ম বহির্ভূত কিছু নিয়োগ দেন, যা জনসাধারণ ও কলেজের ছাত্ররা মেনে নিতে পারেননি। উপরন্তু তিনি কলেজের প্রথম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রগতিশীল লেখার জন্য সংখ্যাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এ ছাড়া ছাত্রদের শিক্ষা বিষয়ক দাবি, আবাসন সমস্যা, কলেজে স্থান সমস্যা, কলেজের স্বীকৃতি, অটোমেশন প্রথা বাতিল এবং হাসপাতালের সম্প্রসারণ নিয়ে প্রিন্সিপালের সঙ্গে ছাত্রদের মতবিরোধ চরমে ওঠে। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের এই দাবিগুলো ভিত্তিহীন ছিল না। তাদের দাবিগুলোর সাথে সদ্য পাশ করা চিকিৎসকদের কিছু কিছু দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে

দাবিদাওয়া নিয়ে তাদের পক্ষে আন্দোলন করা সম্ভব ছিল না। ফলে একদিকে নতুন মেডিকেল কলেজের নানা সমস্যা তথা স্থানের অভাবে হাসপাতালের মূল ভবনে কলেজের কাজ সম্পন্ন করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে হাসপাতালের মূল ভবনের পূর্বাংশ (আর্টস বিল্ডিং) উদ্ধার করে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানো, কলেজ ভবন ও নতুন লেকচার গ্যালারি নির্মাণ ইত্যাদি নানা সমস্যা সমাধানের দিকে অধ্যাপক টি. আহমেদ নজর দেননি। পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল তাঁর সময়কালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ কয়েকবার পরিদর্শন করে নানা রকম ত্রুটি বিচ্যুতি অভাব অভিযোগ তুলে ধরেন এবং সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনা দেন। এসব সমস্যা সমাধানের সাথে কলেজের স্বীকৃতি ও ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল। ১৯৫১ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অব্যবস্থা নানা অভাব, অভিযোগ সম্পর্কে জানা যায়।[১৪৫]

এদিকে ১৯৫৩ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের স্বীকৃতির দাবিতে কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট, হরতাল পালন করে এবং এক শোভাযাত্রা বের করে। কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি গোলাম মওলার সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভায় আলিম চৌধুরী, মনজুর হোসেন, আলমগীর প্রমুখ ছাত্রনেতা উপস্থিত ছিলেন। ছাত্ররা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করায় হাসপাতালের আউটডোর বিভাগ, ইমার্জেন্সি বিভাগ, সাধারণ ওয়ার্ড, ইনডোর বিভাগে তারা অনুপস্থিত ছিল। আউটডোর বিভাগটি ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হতো। ছাত্রদের অনুপস্থিতির কারণে এই বিভাগে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রায় শতাধিক রোগী বিনা চিকিৎসায় থাকে। অন্যান্য বিভাগেও ছাত্রদের অনুপস্থিতির কারণে চিকিৎসকগণকে তাদের নির্ধারিত কার্যক্রম পরিবর্তন করতে হয়। এমনকি কলেজের আসন্ন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য যে বিশেষ টিউটোরিয়াল ক্লাস নেওয়া হতো, তাতেও উপস্থিতি ছিল না বরং অন্যান্য ক্লাসে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে। উক্ত ধর্মঘটকে সফল করার জন্য কলেজের সাতজন ছাত্র নিয়ে একটি অনুমোদন সাবকমিটি গঠন করা হয়। এই ব্যাপারে *ঢাকা প্রকাশ* জানায় যে,

> সভায় জনাব আলিম চৌধুরী, জনাব মনজুর হোসেন, জনাব আলমগীর প্রমুখ কয়েকজন ছাত্রনেতা ধর্মঘটের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সভাশেষে কলেজে ছাত্রদের এক মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রাটি বিভিন্ন প্রচার পত্রসহ এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজকে অনুমোদন (স্বীকৃতি) দিতে হইবে; পূর্ববঙ্গের প্রতি বিমাতালুভ ব্যবহার চলিবে না, ছাত্র দাবি মানতে হবে, মেডিকেল কাউন্সিলের স্বৈরাচার চলবে না, পুলিশ জুলুম চলবে না, মেডিকেল কাউন্সিলের পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধি পদত্যাগ করা ইত্যাদি ধ্বনিসহকারে সমগ্র শহর পরিভ্রমণ করে।[১৪৬]

পরবর্তীতে অধ্যাপক টি. আহমেদ এর মতো অধ্যাপক নওয়াব আলী, এ. কে. এম. আবদুল ওয়াহেদ, অধ্যাপক মোহাম্মদ রেফাতউল্লাহ, অধ্যাপক হাবীব উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক এ. কে. এম. শামসুদ্দিন প্রমুখ প্রিন্সিপাল প্রশাসক হিসেবে যোগ্যতা বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেননি। তাদের প্রশাসনিক দক্ষতা, যোগ্যতা, বিচক্ষণতার অভাবে কলেজে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে রক্ষণশীল চিন্তাচেতনা ও মানসিকতা অনেকাংশে দায়ী ছিল। কেউ বিষয়টিকে অবহেলা করেছেন, কেউ দুর্বলচিত্তের হওয়ার কারণে অবাঙালি আমলাদের দাপটের মুখে পিছু হটেছেন। পাকিস্তান সরকারের অনীহার বিরুদ্ধে যে লড়াই চালানোর দরকার ছিল, পদ হারানোর আশঙ্কায় তা করেননি। এজন্য ছাত্ররা কলেজের লক্ষ্য ও উন্নয়নের জন্য আন্দোলন করে এবং সমস্যা সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ দিতে থাকে।

মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের কলেজের উন্নয়নের প্রতি যেমন অবহেলা ছিল, তেমনি তৎকালীন পাকিস্তান শাসক শ্রেণির পূর্ববাংলার স্বাস্থ্যন্নয়নের প্রতি চরম অবহেলা ছিল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তা

ফুটে ওঠে। এই পরিকল্পনায় মেডিকেল ও জনস্বাস্থ্যকে অবহেলা করা হয়েছে। এই খাতে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ মোট পরিকল্পনার অর্থাৎ ১১.৬০ কোটি টাকার মাত্র ২.৪৮ ভাগ। অথচ তৎকালীন সময়ে ভারত ও চীনে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ৪.৮ এবং ৭.২ ভাগ তাদের স্বাস্থ্যখ্যাতে বরাদ্দ করা হয়। এ ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা মেডিকেল ও জনস্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ অল্প একটি অবিবেচনামূলক পরিকল্পনা ছিল। অর্থ বরাদ্দ পরিকল্পনা গ্রহণের সময় নিখিল পাকিস্তানের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং এই ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমতা না থাকায় উক্ত পরিকল্পনায় পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান মারাত্মকভাবে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া এই পরিকল্পনা প্রস্তুতের সময় পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের (পূর্বাঞ্চল শাখা) ও প্রাদেশিক সরকারের দেওয়া স্কিমকে অগ্রাহ্য করা হয়। তাই পূর্বাঞ্চল শাখার সভাপতি ডা. মোহাম্মদ হোসেন পরিকল্পনা সংশোধনের দাবি করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে মেডিকেল ও জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল অগ্রগতি হলেও পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বিভাগ পূর্বকালীন স্তরে থেকে যায়। অথচ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তানকে সব ধরনের সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে মেডিকেল পোস্ট গ্রাজুয়েট সকল প্রতিষ্ঠানই পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে ৬টি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হলেও পূর্ব পাকিস্তানে একটি মাত্র মেডিকেল কলেজ ছিল। উপরন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে চিকিৎসাশিক্ষা একটি স্তরে অর্থাৎ মেডিকেল কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল স্কুল এই দুইটি স্তরে শিক্ষা দেওয়া হয়। মেডিকেল এসোসিয়েশন এর পূর্বাঞ্চল শাখার সভাপতি ডা. মোহাম্মদ হোসেন উল্লেখ করেন, পৃথিবীর কোথাও মেডিকেল শিক্ষায় এরূপ শ্রেণিবিন্যাস নেই।[১৪৭] নিম্নে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো,

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

বিষয়ের নাম	**পূর্ব পাকিস্তান ১৯৫৫-১৯৬০**	**পশ্চিম পাকিস্তান ১৯৫৫-১৯৬০**
১. হাসপাতালের বেড	৫৫৮৯-৯৯৮৯	১৭৬১৪-২২১১১
২. মেডিকেল কলেজ	১-২	৬-৬
৩. ডাক্তার	৬৩৯৩	৮৫০০
৪. নার্স ট্রেনিংসিট	১৭০	৫৩০
৫. মিডওয়াই ট্রেনিং সেন্টার	১০	১৩০
৬. হেলথ ভিজিটার্স ট্রেনিং সেন্টার	১	৩
৭. মাতৃসদন	২২-৪২	১১৮-১৫৪
৮. গড়ে মেডিকেল গ্রাজুয়েট	৬০-৬০	৪০০-৫০০
৯. লোকসংখ্যা	৪.২ কোটি	৩.২ কোটি

উৎস : *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ জুন ১৯৫৬, পৃ. ১

উপরি-উক্ত তালিকা থেকে বোঝা যায় যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান ছিল। প্লানিং বোর্ড আঞ্চলিক ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ না করে নিখিল পাকিস্তানের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করে স্বাস্থ্যখাতের এই পরিকল্পনা করে, উক্ত তালিকার পরিসংখ্যানে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই কারণে পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাসাম্যের নীতি অনুসরণ করা হয়নি, বরং পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে চিকিৎসাশিক্ষায় সামগ্রিক ব্যয়, স্নাতকোত্তর মেডিকেল ট্রেনিং, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণা, নার্সেস শিক্ষা, হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় উপেক্ষা করা হয়। এই কারণে পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের পূর্বাঞ্চল শাখার সভাপতি ডা. মোহাম্মদ হোসেন আপত্তি জানান। তিনি প্লানিং বোর্ডের পঞ্চবার্ষিকী (১৯৫৫-৬০) পরিকল্পনায় মেডিকেল সম্পর্কিত বিষয়ের তীব্র সমালোচনা করেন। প্লানিং বোর্ড কর্তৃক মত প্রকাশ করা হয় যে, প্রাদেশিক সরকারের অধীনে কিছুসংখ্যক চিকিৎসকের পদ খালি থাকায় পূর্ব পাকিস্তানে চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে এই পদে চাকুরি করার মতো চিকিৎসক নেই, কিন্তু প্রদেশের প্রায় ২৫০০ চিকিৎসক জাতীয় পরিকল্পনায় কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল।[১৪৮] পশ্চিম পাকিস্তানে কিছুসংখ্যক বাঙালি চিকিৎসক চাকুরি করত। অথচ পূর্ব পাকিস্তানে চিকিৎসকের অভাব আছে বলে অভিযোগ করা হয়। প্রাদেশিক সরকারের কিছুসংখ্যক চিকিৎসকের পদ খালি থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি, বরং এই প্রদেশে চিকিৎসক নেই বলে অপপ্রচার চালানো হয়। এই প্রসঙ্গে মেডিকেল এসোসিয়েশনের পূর্বাঞ্চল শাখার সভাপতি ডা. মোহাম্মদ হোসেন বলেন,

> প্লানিং বোর্ডের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে ডাক্তারের সংখ্যা অত্যন্ত কম বলিয়া এই প্রদেশে কোনো পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যায় না। সুতরাং এই প্রদেশের নয়া পরিকল্পনার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা যায় না।[১৪৯]

প্লানিং বোর্ডের এই অভিমত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে মেডিকেল খাতে যে সামান্য অর্থ বরাদ্দ করা হয় তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে চিকিৎসকের অভাব ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের এরূপ পরিকল্পনা পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসক দ্বারা পূরণ করা হয়, ডা. মোহাম্মদ হোসেন এর বক্তব্য থেকে তা বোঝা যায়।[১৫০] মেডিকেল এসোসিয়েশন (পূর্বাঞ্চল শাখা) মেডিকেল সার্ভিস জাতীয়করণের পক্ষে ছিল। পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল পূর্ব পাকিস্তানের মেডিকেল স্কুলগুলোকে কলেজে রূপান্তরের পক্ষে মত প্রকাশ করলেও পঞ্চবার্ষিকীর পরিকল্পনায় উল্লেখ ছিল না। এর ফলে ঢাকা মেডিকেল কলেজে সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সের ছাত্রের সংখ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কলেজের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়নে তা ব্যাঘাত ঘটায়। প্লানিং বোর্ড পূর্ব পাকিস্তানের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্নয়নের কোনো ব্যবস্থা রাখেনি। যতটুকু করা হয় তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের পূর্বাঞ্চল শাখা প্লানিং বোর্ডকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৬০) উল্লিখিত বিষয় পরিবর্তনের দাবি জানায়। এ ক্ষেত্রে সভাপতি ডা. মোহাম্মদ হোসেন বলেন, পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের পরিকল্পনা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে গ্রহণ করা উচিত বলে দাবি জানান। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে মোট ২৩ কোটি রুপি ব্যয় হবে এবং এর দ্বারা প্রদেশে প্রতি ৩০০০ লোকের জন্য একটি করে শয্যা থাকবে। সর্বোপরি এই পরিকল্পনা সরকারি পরিকল্পনা হতে উন্নতর। এই পরিকল্পনায় দরিদ্র ব্যক্তিরাই উপকৃত হবে।[১৫১] এরূপ পরিস্থিতিতে সভাপতি পূর্ব পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করে নিম্নের ৮ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে এই মূলনীতিসমূহ সমর্থন করেন,[১৫২]

১. স্বাস্থ্য বিভাজনসমূহকে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য শাখাসমূহ বিভক্ত করার পদ্ধতি বাতিল করা এবং উভয় বিভাগকে একত্রিত করে অল্প খরচে অধিকতর কর্মদক্ষতা প্রদান করা।

২. মেডিকেল স্কুলসমূহ বিলোপ করে এর স্থলে মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাশিক্ষায় মানসম্মত পদ্ধতি দ্বারা এই শিক্ষার বিভিন্ন মানের শিক্ষা পদ্ধতি বিলোপ করা।

৩. রোগ প্রতিরোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।

৪. রেডিওলজি এবং প্যাথলজির সাহায্যে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রত্যেক গ্রামবাসীর জন্য সহজলভ্য করা।

৫. ইতিপূর্বে প্রতি ১৪,০০০ লোকের জন্য একটি শয্যা দেওয়ার যে হার প্রচলিত ছিল, তা বৃদ্ধি করে প্রতি ৩০০০ ব্যক্তির জন্য একটি করে শয্যা দেওয়ার হার নির্ধারিত করা।

৬. ট্রপিক্যাল মেডিসিন, হাইজিন ইনস্টিটিউট, ডেন্টাল কলেজ, লেপ্রোত্রসাইলাস এবং ভ্যাকসিন ল্যাবরেটরির ন্যায় অত্যাবশক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করা।

৭. মহামারী কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্র বিকেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের দ্বারা অপসারণ করা।

৮. জনগণের সহযোগিতা লাভের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।

উপরি-উক্ত ৮ দফা ছাড়াও এই পরিকল্পনায় ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, আমাশয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একজন চিকিৎসক এবং দক্ষ সহকারীর সমন্বয়ে একটি চিকিৎসক দলসহ প্রত্যেক দুইটি থানার জন্য একটি চিকিৎসালয়, এক্স-রে যন্ত্র, মাইক্রোস্কোপ ও যক্ষ্মা ইউনিটসহ প্রত্যেক থানায় ২০টি শয্যার একটি চিকিৎসালয়, কতিপয় বিশেষজ্ঞসহ প্রত্যেক মহকুমার জন্য ৫০টি শয্যার চিকিৎসালয়সমূহ এবং যে সমস্ত জেলায় কোনো মেডিকেল কলেজ নেই, সেখানে ২০০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। এই সমস্ত হাসপাতালে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ন্যায় সুযোগসুবিধা থাকার কথা উল্লেখ করা হয়। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মেডিকেল ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং জেলা ভিত্তিতে জনসাধারণের জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা এসোসিয়েশনের পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়।

একই বছরের ৫ জুলাই পাকিস্তান প্লানিং বোর্ডের সদস্য মফিজউদ্দীন আহমদ করাচিতে এক বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দেন। পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসার জন্য ১৪ কোটি রুপি ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং এটা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত মোট ব্যয়ের অর্থের শতকরা ৩৪ ভাগ এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেডিকেল ব্যবস্থা সংক্রান্ত অংশটুকু পূর্ব পাকিস্তানের সরকারের অনুমোদন ক্রমেই তৈরি করা হয়। তাঁর এই বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ডা. আহমদ বলেন, 'তাহা সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, প্রাদেশিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।'[১৫৩] তিনি পূর্ব পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সুপারিশ অনুযায়ী পরিকল্পনা সংশোধনের জন্য প্রাদেশিক সরকারের কাছে আবেদন জানান।

অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে ৮টি প্রস্তাব করা হয় তা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যুক্ত করার জন্য উত্থাপন করা হয়, তার মধ্যে অন্যতম একটি প্রস্তাব ছিল মেডিকেল স্কুলগুলোকে বিলোপ করে কলেজে রূপান্তর করা। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা এই প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায় এবং তা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে *দৈনিক ইত্তেফাক* জানায়,

> প্রদেশের মেডিকেল স্কুলকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া কলেজের পর্যায়ে উন্নিত করা, এল.এম.এফ ছাত্র ও ডাক্তারদের সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস কোর্সে ভর্তি, ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং অন্যান্য দাবি আদায়ের জন্য অদ্য (মঙ্গলবার) হইতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাঁচজন ছাত্র অনশন ধর্মঘট শুরু করিবেন।[১৫৪]

দীর্ঘ আটবছর ধরে মেডিকেল স্কুলের ছাত্ররা তাদের দাবি পূরণের জন্য আন্দোলন করে আসছিল। ১৯৫০ সালে প্রবল আন্দোলনের চাপে মুসলিম লীগ সরকার আংশিক স্বীকার করে নিলেও পরবর্তীকালে নানা অজুহাতে তাদের দাবি উপেক্ষা করতে থাকে। মেডিকেল ছাত্রদের সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি আখতার উদ্দিন আহমেদ, ১৯৫৬ সালের বাজেট অধিবেশনের সময় সরকারকে বিষয়টি মনে করিয়ে দেন। সরকারকে বাজেট অধিবেশনে লিখিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের ন্যায্য দাবি তথা ৫ বছরের মধ্যে সমস্ত মেডিকেল স্কুলগুলোকে মেডিকেল কলেজে পরিণত করা এবং পরবর্তী বছর হতে এল.এম.এফ. ডাক্তারদের সরাসরি সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সে ভর্তি করার পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া। দাবিগুলো পূরণ না হলে সমগ্র পূর্ববঙ্গে ব্যাপক আন্দোলন হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার দাবি পূরণে বিলম্ব করলে মেডিকেল স্কুলের ছাত্ররা অনশন, ধর্মঘট শুরু করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা এটাকে যুক্তিসঙ্গত মনে করেননি। ইতিমধ্যে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে ময়মনসিংহের লিটল মেডিকেল স্কুলে প্রদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র প্রতিনিধি এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও স্কুলসমূহের ছাত্র প্রতিনিধিদের যুক্ত সভায় এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং চিকিৎসাশিক্ষা সমন্বয় সাধন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির আহ্বায়ক জালাল উদ্দিন হায়দার (ঢাকা মেডিকেল স্কুলের সাধারণ সম্পাদক) সংবাদপত্রে সম্মেলনের বিষয়বস্তু প্রকাশ না করে ছাত্র ও জনসাধারণকে অবগত করা থেকে বিরত থাকেন। উপরন্তু ভাসানীর সভাপতিত্বে ও মেডিকেল এসোসিয়েশনের উপস্থিতিতে সর্বসম্মত পন্থা গ্রহণ না করে ধর্মঘট, অনশন করার সিদ্ধান্ত ছিল পূর্ব প্রতিশ্রুতিকে অমান্য করা। উপরন্তু মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান চিকিৎসাশিক্ষা বিষয়ক নীতি ঘোষণা করেন এবং যথোপযুক্ত আশ্বাস প্রদান করেন। এমতাবস্থায় তারা উভয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ ও ছাত্রদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের কামনা করে। তারা স্কুলগুলোকে কলেজে রূপান্তরে একমত হলেও কি উপায়ে এল.এম.এফ. ডাক্তারগণ সংক্ষিপ্ত (কনডেন্সড) এম.বি.বি.এস. কোর্স সম্পন্ন করবে সেই সম্বন্ধে এক বিবৃতি দেন। সে সময়ের *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকা থেকে তা জানা যায়।[১৫৫]

এম.বি.বি.এস. ও সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. পাশ করা চিকিৎসকদের মধ্যে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের আই.এসসি. পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পাঁচ বছরের এম.বি.বি.এস. কোর্সে ভর্তি হতো। অন্যদিকে এল.এম.এফ. চিকিৎসকগণ প্রবেশিকা পরীক্ষা তথা মেট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার পর তিন বছরের এল.এম.এফ. কোর্সে ভর্তি হয়। এরপর তাদের দাবি অনুযায়ী সরাসরি দুই বছরের সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সে ভর্তি হলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে মেডিকেল কলেজের এম.বি.বি.এস. ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সমকক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, যা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তারা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ের ওপর দীর্ঘ পাঁচ বছরের কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যয়নের মাধ্যমে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি অর্জন করেন। তাই ঢাকা মেডিকেল কলেজের নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রদের দাবির প্রতি আপত্তি জানান। এই বিবৃতিতে মেডিকেল কলেজের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের মধ্যে কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক (১৯৫৩-৫৪) আবদুল হালিম, প্রাক্তন সহ-সভাপতি (১৯৫৩-৫৪) আবুল হাশেম, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক (১৯৫৪-৫৫) মোহাম্মদ খোন্দকার উদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন সাহিত্য সম্পাদক মকসুদুর রহমান, প্রাক্তন সমাজ সেবা সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, প্রাক্তন সহ-সভাপতি মোহাম্মদ জাবেদ, পঞ্চম বর্ষের ছাত্র লুৎফর রহমান চৌধুরী, নুরুল আলম স্বাক্ষর করেন।[১৫৬]

উল্লিখিত দাবির ভিত্তিতে মেডিকেল স্কুলের ছাত্ররা মুসলিম লীগ সরকার ও যুক্তফ্রন্টের আমলে ক্রমাগত আন্দোলন করতে থাকে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাদের দাবি স্বীকার না করলেও আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা ক্ষমতা লাভ করার পরপরই সমগ্র প্রদেশের মেডিকেল স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে নেয়। তা সত্ত্বেও কিছুসংখ্যক এল.এম.এফ. পাশ করা মেডিকেল ছাত্র অযৌক্তিক দাবির ভিত্তিতে অনশন, ধর্মঘট করায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী ও জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, কারণ তারা দুই বৎসরের সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সে ভর্তি হওয়ার দাবিতে ধর্মঘট করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা তিন বছরের সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. এর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক সরকার এক প্রেসনোট জারি করেন। এই নোটে বলা হয় যে,

> সরকার আগামী ৬ বৎসরের মধ্যে প্রদেশের মেডিকেল স্কুলগুলি মেডিকেল কলেজে উন্নীত করিবেন। ইহা ছাড়াও মেডিকেল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সে ভর্তির অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।[১৫৭]

অন্যদিকে এই প্রসঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অটোমেশন কমিটির আহবায়ক আবদুল কাদের এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি সমর্থন এবং সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স তিন বছর করার দাবি জানান।[১৫৮]

একই বছর (১৯৫৬) নিজেদের সমস্যা, দাবিদাওয়ার পাশাপাশি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৭ জন ছাত্রনেতা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন পদ্ধতি প্রসঙ্গে যুক্ত নির্বাচন না পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসৃত হবে, সেটি নির্ধারণের জন্য পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক পরিষদে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। তারা জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করার জন্য যুক্ত নির্বাচনকে একমাত্র উপায় বলে উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তারা বলেন,

> আমরা পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক পরিষদের সকল সদস্যকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন পরিষদের নির্ধারিত আলোচনায় যুক্ত নির্বাচন সমর্থন করে।[১৫৯]

তখন জাতীয় ক্ষেত্রে যেমন সমস্যা ছিল তেমনি মেডিকেল কলেজের মতো চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও সমস্যা ছিল। এর মধ্যে মেডিকেল কলেজের অন্যতম সমস্যা ছিল ইন্টার্নিশিপ ব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষা, সরকারি চাকুরিদের বেতনভাতা, শ্রেণিগত মর্যাদা, অবকাঠামোগত সমস্যা ইত্যাদি। এ সময় প্রাদেশিক সরকার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরীন অবস্থা উন্নয়নের জন্য কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার হাসপাতালের ইন্টার্নি চিকিৎসকদের প্রতি মাসে ৭৫ রুপি ভাতা এবং জুনিয়র হাউস অফিসারদের ১০০ রুপি সম্মানী দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৬০] এই সমস্ত চিকিৎসকগণের দীর্ঘদিনের যেসব দাবিদাওয়া, তার আংশিক পূরণ হওয়ায় আশা করা হয় যে, তাঁরা হাসপাতালের কাজের উন্নতি বিধানের জন্য যথাসাধ্য মনোযোগী হবেন। দুর্গত মানবতার স্বার্থে হাসপাতালের কাজের পরিবেশ উন্নতি বিধান একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তারা ভাতা আদায়ের জন্য ধর্মঘট করলে হাসপাতালের কাজের ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষ করে রোগীরা বিনা চিকিৎসায় থাকে এবং ভোগান্তির সম্মুখীন হয়, তবে তাদের পূরণকৃত ভাতার পরিমাণ যৎসামান্য ছিল।

এদিকে একই বছরের নভেম্বর মাসে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা হোস্টেলে অবস্থানকারী ছাত্রদের সিট ভাড়া ও কলেজের বেতন হ্রাসের দাবিতে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলেজের প্রিন্সিপাল ও হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. নওয়াব আলী ছাত্রদের

জানান, তাদের দাবিদাওয়া সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি পূরণের জন্য নিম্নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে,[১৬১]

১. মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশের নিম্নহার, শিক্ষার মান, ছাত্রশিক্ষক সম্পর্ক, ছাত্রদের শান্তি, বিনোদন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা এবং প্রথম বর্ষে যে রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয় এবং পরীক্ষা প্রথম বর্ষ কিংবা দ্বিতীয় বর্ষের শেষে গ্রহণ, ফার্মাকোলজি পরীক্ষা কোর্স সমাপ্তির পর তৃতীয় বর্ষের শেষে গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করে সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন।

২. এম. এম. এফ. কোর্সকে এম.বি.বি.এস. কোর্সের সাথে সংযুক্ত করা। এম.এম.এফ. কোর্সের ছাত্রদের ক্লাস এম.বি.বি.এস. ক্লাসে গ্রহণ। সকল এম.এম.এফ. ডাক্তারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী ফাইনাল এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় মেডিসিন, সার্জারি, মিডওয়াইফারি তথা এই তিনটি বিষয়ে পরীক্ষা দানের সুযোগ দেওয়া। এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩. ফাইনাল এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইন্টার্নি হিসেবে কাজ করার পূর্বেই ছাত্রদেরকে পূর্ব পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলে নাম রেজিস্ট্রি করার সুযোগ দেওয়া। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাঁদেরকে ইন্টার্নি হিসেবে ৬ মাস কাজ করতে হবে।

৪. কলেজ ভবনের এসেম্বলি হল সাময়িকভাবে কমনরুম হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৫. ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল হতে মেডিকেল কলেজের নবনির্মিত হোস্টেলের সিট ভাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নব-নির্মিত হোস্টেলের সিট ভাড়ার সমান হবে।

৬. বলা হয় যে, সরকারি হোস্টেলসমূহে অবস্থানরত ছাত্রীদের সিট ভাড়া মওকুফ করা হয়েছে। এটা যদি সত্য হয়, তবে মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের হোস্টেলের সিট ভাড়াও মওকুফ করা।

৭. সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্সের ছাত্রদের বেতন বার্ষিক ৪০০ টাকা হতে হ্রাস করে ৩০০ টাকা করা। এম.বি.বি.এস. পরীক্ষার্থীদের ন্যায় সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষার্থীদের কম্পার্টমেন্টাল ফি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া।

৮. কলেজ ইউনিয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দের উদ্দেশ্যে আগামী বছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯. মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে এক সপ্তাহের মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নের জন্য অফিস রুম এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য কেবিনের ব্যবস্থা করা।

১০. প্রায় পক্ষকালের মধ্যে খেলার মাঠ, টেনিসকোর্ট, বাস্কেট বল মাঠ, প্যাভালিয়ন ও ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থা করা। আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে ক্যান্টিন ও কলেজের কমনরুমের জন্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা এবং ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেলের জন্য ভৃত্য, ওয়ার্ডবয় ও দারোয়ান নিয়োগ।

১১. ইন্টার্নিদের ভাতা বৃদ্ধি করে ১৫০ টাকা নির্ধারণ ও জুনিয়র হাউস ফিজিশিয়ানের পদ বিলোপের দাবি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে চিকিৎসাশিক্ষা এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উন্নয়ন নির্ভর করছিল, কেননা চিকিৎসাশিক্ষা ও চিকিৎসকদের অবস্থার অনেক অবনতি হয়। এর অন্যতম কারণ চিকিৎসাশিক্ষা সংক্রান্ত নীতির অভাব, সমন্বয়হীনতা, কলেজের উন্নয়নের অভাব তথা আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জামের অভাব, উপযুক্ত বই-পুস্তকের অভাব, শিক্ষক নিয়োগে যথেচ্ছা নীতি গ্রহণ, চিকিৎসকদের যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত পদমর্যাদার অভাব (দ্বিতীয় শ্রেণির চাকুরি), মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যথেষ্ট সংখ্যক ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীদের অভাব। এর ফলে কলেজ ও হাসপাতালের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই চিকিৎসাশিক্ষা ও চিকিৎসা পেশার উন্নতির জন্য পূর্ব পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের প্রস্তাব অনুযায়ী যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন,

> ইহা কার্যকরী হইলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যুগান্তর প্রতিষ্ঠা হইবে। বিশেষ করে ডাক্তারদের বহুবিদ সমস্যা সমাধান হইবে।[১৬২]

পাকিস্তান সরকার যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে, তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্রলীগ শাখা সভাপতি আবদুল কাদের এর সভাপতিত্বে কার্যকরী কমিটির এক সভা হয়। উক্ত সভায় মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় এবং নিম্নের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়,[১৬৩]

১. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হতে এম.এম.এফ. প্রথা তুলে দিয়ে উক্ত কোর্সের ছাত্রদের এম.বি.বি.এস. পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দান।
২. যথাশীঘ্র সম্ভব মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের যাবতীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ।
৩. কনডেন্সড কোর্সের ছাত্রদের নিকট হতে অতিরিক্ত বেতন গ্রহণ না করা।
৪. কনডেন্সড কোর্স শব্দটির পরিবর্তে 'ডিগ্রি কোর্স' শব্দটি ব্যবহার।
৫. প্রথম বার্ষিক এম.বি.বি.এস. কোর্স হতে 'কেমিস্ট্রি' বিষয়টি বিলোপ।
৬. ফার্মাকোলজি বিষয়টির পরীক্ষা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণিতে গ্রহণ।
৭. মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি।
৮. মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সিট ভাড়া হ্রাস।
৯. মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্নত ধরনের ২টি ব্যায়ামাগার ও ২টি খেলার মাঠের বন্দোবস্ত করা।
১০. ঢাকা মেডিকেল কলেজের কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীকে করাচি মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের সমান বেতন দান।
১১. উন্নত ও আধুনিক প্রয়োজনীয় চিকিৎসার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা।

একই বছরের অক্টোবর মাসে আবদুল কাদের (সভাপতি, ছাত্রলীগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ) এর সভাপতিত্বে আরেকটি সভা হয়। সভায় সভাপতি ছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মেসার্স মোফাজ্জারুল ইসলাম, কাজী খলিলুর রহমান, মোসাফিজুর রহমান চৌধুরী, রুহুল আমিন চৌধুরী, সফিকুর রহমান, এস. এস. হুদা, আমিনুল হক, আবদুর রকীব এবং বিশিষ্ট ছাত্রনেতা। এই সভায়ও কলেজের শিক্ষার্থীদের নানা প্রকার অভাব অভিযোগের ভিত্তিতে নিম্নের আরেকটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলোর সাথে প্রথম সভার উল্লিখিত প্রস্তাবের যথেষ্ট মিল থাকলেও নতুন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১৬৪] এ সময় (১৯৫৭) ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের বিরুদ্ধে কখনও কখনও ভিত্তিহীন

অভিযোগ আনা হলে তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানানো হয়। এ ক্ষেত্রে কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।[১৬৫] ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা কলেজের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি তারা নিজেদের কাজ ও দায়িত্ব কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন।

১৯৫৯ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী লে. জেনারেল বারকী ঘোষণা করেন পাকিস্তান সরকার প্রাদেশিক মিউনিসিপাল ও জেলা বোর্ড পরিচালিত হাসপাতালের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও দেশের চিকিৎসাশিক্ষাকে কেন্দ্রীয়করণের ইচ্ছা পোষণ করেন। স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন শাখাকে সম্মিলিত করে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার তত্ত্বাবধানে আনা উচিত বলে উল্লেখ করেন এবং চিকিৎসাশিক্ষার মানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সে সময় পাকিস্তানের কোনো কোনো মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাশিক্ষার মান আশানুরূপ ছিল না, যা তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ (নিশাত মেডিকেল কলেজ, লিয়াকত মেডিকেল কলেজ) পরিদর্শনকালে উল্লেখ করেন। পাকিস্তানের সকল মেডিকেল কলেজকে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন এবং একজন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল এর নিয়ন্ত্রণাধীন আনার চেষ্টা করেন এবং চিকিৎসাশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য একটি একাডেমিক কাউন্সিল নিয়োগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি মেডিকেল অফিসারদের মধ্যে যে তিনটি শ্রেণি বিভাগ ছিল তা বাতিল করা এবং কেবলমাত্র একটি শ্রেণিই থাকা উচিত বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয়করণের পর এক কলেজে নিয়োজিত চিকিৎসককে অন্য কলেজে বদলী করা যাবে।[১৬৬] তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনকালে উল্লিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করলেও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজের ব্যাপারে কোনো কিছু উল্লেখ করেননি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ইতিমধ্যে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল ও ব্রিটিশ জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃতি পেলেও নানা ধরনের সমস্যা বিদ্যমান ছিল। ছাত্রদের এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর খালেদ ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল লতিফ মল্লিক এর সময়ে (১৯৫৯-৬০) ছাত্র চিকিৎসকদের যৌথ প্রচেষ্টায় চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের (ইন্টার্নি) কিছু অধিকার আদায় করা হলেও বেতনভাতা খুবই নিম্ন হারের ছিল। তাই পুনরায় আন্দোলনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজসহ প্রদেশের সমস্ত মেডিকেল কলেজের ইন্টার্নি চিকিৎসকগণ ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে সাত দিনব্যাপী ধর্মঘট করে। তাদের এই দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রদেশের সমস্ত মেডিকেল কলেজের (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, মোমেনশাহী মেডিকেল কলেজ) শিক্ষার্থীগণ একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। ঢাকা ও সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সরকারি চিকিৎসকগণ ধর্মঘটে যোগদান না করলেও ইন্টার্নিদের দাবির প্রতি সহানুভূতি দেখান। ইন্টার্নি চিকিৎসকদের সমর্থনে ঢাকা ও সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীগণ ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে এক সভায় মিলিত হয়। কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি নুরুল আলম এর সভাপতিত্বে নিম্নে ৫ দফা দাবি আদায়ের জন্য এক বিরাট মিছিল বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ এবং প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ইন্টার্নি চিকিৎসকদের নিম্নের ৫ দফা দাবির মধ্যে ছিল,[১৬৭]

১. ইন্টার্নি চিকিৎসকদের মাসিক ভাতা আড়াইশত টাকা।
২. নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত।
৩. চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেণির সরকারি অফিসারের মর্যাদা দান।

৪. চিকিৎসকদের চিকিৎসা ব্যবস্থা।

৫. কোয়ার্টার দানের ব্যবস্থা।

ছাত্র, চিকিৎসকদের ক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে নুরুল আলম (সহ-সভাপতি, কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন) ও জাফরউল্লাহ্ চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক, কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন) এর নেতৃত্বে সরকারি চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দানের দাবিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে, কিন্তু দাবি আদায় করা সম্ভব হয়নি। সরকার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এই প্রসঙ্গে *দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা* থেকে জানা যায়,

> প্রদেশের ইন্টার্নি চিকিৎসক ও নতুন পাশ করা ডাক্তারদের ক্রমাগত ধর্মঘটের ২২ দিন অতিবাহিত হয়। ধর্মঘটীদের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সরকার এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।[১৬৮]

একই বছরের (১৯৬৩) ডিসেম্বরে ধর্মঘটী ইন্টার্নি চিকিৎসকদের কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত এক ইশতেহারে বলা হয়, এল.এম.এফ. ইন্টার্নিদের জন্য মাসিক ১৫০ টাকা এবং এম.বি.বি.এস. ইন্টার্নিদের জন্য মাসিক ২৫০ টাকাসহ তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং আবাসিক সুযোগসুবিধা প্রদান, কেবলমাত্র পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের চাকুরি ২৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারের সেক্রেটারির সমান বেতন অর্থাৎ মাসিক ২৫০০ টাকা প্রদান, পূর্ব পাকিস্তান লোয়ার হেলথ সার্ভিসের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণির পদমর্যাদা দান ও আপার সার্ভিসের চিকিৎসক ও সহযোগী অধ্যাপকদের জন্য প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদাসহ নিম্নতম মাসিক বেতন ৩৫০ টাকা প্রদানের দাবি জানানো হয়। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এক প্রেসনোটে তাদের দাবিদাওয়াকে অতিরঞ্জিত ও বিকৃত করে তুলে ধরে অযৌক্তিক ও অবাস্তব প্রমাণের চেষ্টা করে। যাতে করে জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। প্রেসনোটে ইন্টার্নিদের মাসিক ভাতা ১১০০ টাকা, মেডিকেল কলেজ অধ্যাপকদের মাসিক বেতন বাবদ ৭০৫০ টাকা অথবা ৮০৫০ টাকা এবং কারিগরি ভাতা, প্রাইভেট প্রাকটিস না করার ভাতা এবং অধ্যাপনার ভাতা সংক্রান্ত দাবিদাওয়া সম্পর্কে বলা হয় যে, একই ব্যক্তিকে একই সঙ্গে ঐ সমস্ত সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে না বলে উল্লেখ করা হয়।[১৬৯]

একদিকে ছাত্র, চিকিৎসকদের দাবিদাওয়া পূরণে সরকারের অবহেলা, অন্যদিকে ইন্টার্নি চিকিৎসকদের ধর্মঘটের কারণে রোগীদের দুরবস্থায় পড়তে হয়। তারা ঐচ্ছিক ভিত্তিতে কাজ করলেও হাসপাতালের কার্যক্রম তাদের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করত। ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে সার্জারি, চক্ষু, কান, নাক ও গলা বিভাগে কোনো অস্ত্রোপচার হয়নি। স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত ইমার্জেন্সি বিভাগে চিকিৎসকের অভাবে চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রসুতি ও স্ত্রীরোগ রোগীদের দুর্ভোগের শিকার হন। আউটডোরে চিকিৎসকের সংখ্যা কম থাকায় কেবলমাত্র বিশেষভাবে রোগাক্রান্ত রোগীদের ভর্তি করা হয়। চর্ম ও যৌন রোগ বিভাগে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক ব্যতীত কোনো চিকিৎসক ছিল না। ফলে সার্জিক্যাল আউটডোর ওয়ার্ডবয়রা ছোটখাট অস্ত্রোপচার ও প্লাস্টার লাগায়। মূলত হাসপাতাল কিছুসংখ্যক সরকারি চিকিৎসক দ্বারা পরিচালিত হয়। অথচ কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকদের একটি বড় অংশ ছিল ইন্টার্নি চিকিৎসক।

ইন্টার্নি চিকিৎসকদের অনুপস্থিতির কারণে হাসপাতালের অচলাবস্থার সৃষ্টি হলেও তাদের দাবিগুলো আদায়ের জন্য ধর্মঘটের যৌক্তিকতা ছিল। এটা তাদের জীবন জীবিকার জন্য অত্যন্ত জরুরি। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাদের দাবিগুলোর প্রতি সচেতন হলে এই ধর্মঘট ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হতো না। ছাত্র

ও চিকিৎসকদের দাবিগুলো যাতে পূরণ করা সম্ভব না হয়, সেজন্য সরকার কর্তৃক তাদের দাবিগুলোকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। অথচ সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত এক ইশতেহার বলা হয়, সরকার দাবিগুলো মেনে নিলে তারা দায়িত্বপালনে এগিয়ে আসবে।[১৭০]

১৯৬০ এর দশকে বোঝা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে বিপুলসংখ্যক চিকিৎসক প্রয়োজন। রোগীর সংখ্যা এবং এর ব্যাপকতার দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক গুরতর। পশ্চিম পাকিস্তানে এম.বি.বি.এস. চিকিৎসকের সংখ্যা ২৭০০ জন আর পূর্ব পাকিস্তানে ১৫০০ জন। পশ্চিম পাকিস্তানে যেখানে বছরে ৩১৮ জন এম.বি.বি.এস. ডাক্তার পাশ করে বের হয়, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে বছরে ১৫১ জন ডাক্তার পাওয়া যায়। এই হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতি ১০,০০০ লোকের জন্য একজন মাত্র চিকিৎসক ছিল।[১৭১] অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে ৫,০০০ লোকের জন্য একজন চিকিৎসক। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা অনুপাতে এই সংখ্যা সন্তোষজনক ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এই দুরবস্থার প্রতিকার ও চিকিৎসকদের সমস্যা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন দেখা দেয়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ১৯৪৬-১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে কেবলমাত্র একটি মাত্র মেডিকেল কলেজ তথা ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছিল। দীর্ঘ ১১ বছরে আর কোনো মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়নি। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে রাজশাহী (১৯৫৯), চট্টগ্রাম (১৯৫৮), সলিমুল্লাহ (১৯৬২), সিলেট (১৯৬২) ও ময়মনসিংহ (১৯৬২) মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়।

স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে চিকিৎসক সংখ্যা কম ছিল। তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের ২০০০ চিকিৎসক বিদেশে কর্মরত ছিলেন। তারা সুযোগ পেলেই বিদেশে চাকুরি করতে আগ্রহী ছিল। ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ বিদেশে চাকুরির সন্ধান করেন, কারণ পাকিস্তানের চেয়ে বিদেশে সুযোগসুবিধা, সম্মানী বেশি ছিল। উপরন্তু এই অঞ্চলের চিকিৎসকগণ নানা রকম সুযোগসুবিধা, সম্মানী ও উঁচু পদমর্যাদার দিক থেকে বঞ্চিত ছিল। এসব সমস্যা সমাধানে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার নজর দেয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা বিদেশে চলে যেত। তবে কেউ কেউ দেশ মাতৃকার টানে, বিবেক ও মানবতা বোধ থেকে বিদেশের লোভনীয় চাকুরি ছেড়ে দেশে চলে আসেন, তবে তাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এই প্রসঙ্গে ১৯৫৯ ব্যাচের ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ডা. সারওয়ার আলী বলেন,

> আমার মেডিকেল কলেজের সহপাঠীদের ৮০ শতাংশ স্নাতক হওয়ার পর যুক্তরাজ্যে পাড়ি দিয়েছে।[১৭২]

চিকিৎসাশিক্ষার ব্যয় অত্যধিক এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ব্যয় বহন করা অসম্ভব। চিকিৎসাশিক্ষাকে মেধাবী ছাত্রদের পক্ষে সহজ করার জন্য বৃত্তির সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, বই ও যন্ত্রপাতি ধার দেওয়ার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য ছাত্রবৃত্তির অর্থের পরিমাণ ও হাসপাতালে কাজ করার জন্য মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য দাবি করা হয়। পূর্বে ছাত্রদের হোস্টেল খরচ ছিল ১০ রুপি আর বৃত্তির পরিমাণ ছিল ২০ রুপি। ১৯৬০ এর দশকে হোস্টেল খরচ ১০০ রুপিতে বৃদ্ধি পায়।[১৭৩] তাছাড়া চিকিৎসাশিক্ষার শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিন পড়াশোনার সাথে সংযুক্ত থাকতে হয় এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়। কাজেই শিক্ষা শেষে ভালো সুযোগ লাভ করা তাদের পক্ষে যদি সম্ভব না হয় তাহলে তাদের এবং অভিভাবকের পক্ষে হতাশা বোধ করা স্বাভাবিক। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী স্বচ্ছল কৃষক, শিক্ষক, চাকুরিজীবী, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ পরিবার থেকে আসে। সাধারণভাবেই

শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে ১৯৫৫ ব্যাচের ছাত্রী জাতীয় অধ্যাপক শাহলা খাতুন বলেন,

> তখন চিকিৎসা পেশা দ্বিতীয় শ্রেণির চাকুরি ছিল। পরিবারের সবাই প্রথম শ্রেণির চাকুরি করায় আমি দ্বিতীয় শ্রেণি চাকুরি করব- এটা নিয়ে অনেকের আফসোস ছিল।[১৭৪]

১৯৬০ এর দশকে অন্যান্য কারিগরি বিভাগ অপেক্ষা মেডিকেল বিভাগের শিক্ষার্থীদের সুযোগসুবিধা কম হওয়ায় অভিযোগ করা হয় এবং তা প্রতিকারের জন্য সভা, মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন, ধর্মঘটের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। চিকিৎসাশিক্ষার ছাত্ররা সেবার আদর্শ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে নিজেদের পেশার মর্যাদাকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাদের পেশা অন্য যেকোনো পেশার চেয়ে আলাদা। তাদের সুচিকিৎসার ওপর মানুষের সুস্থতা নির্ভর করায় সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। অথচ চিকিৎসকদের সমস্যাকে যদি বাড়িয়ে তোলা হয় বা সমাধান না করা হয় তাহলে তাদের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না। চিকিৎসক হওয়ার জন্য যে পরিমাণ শ্রম, মেধা, অর্থ, সময় ব্যয় করতে হয় এবং কৃতিত্বের সাথে পাশ করার পর যদি তারা দেখতে পায় যে, চিকিৎসাশিক্ষা তাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে পারছে না, তখন তাদের নিকট বিষয়টি বিরূপ হতে পারে। চিকিৎসকদের উল্লিখিত ধর্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করা থেকে তা সহজে বোঝা যায়। অথচ তাঁরা ধর্মঘট পালন করলেও প্রাদেশিক সরকার তাদের অভাব অভিযোগ পূরণের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাই প্রাদেশিক স্বাস্থ্য বিভাগের সকল চিকিৎসক তাদের দাবি আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় কাজে যোগদানে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। ডাক্তারদের কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের ইশতেহারে উপরি-উক্ত ধর্মঘটের কারণ উল্লেখ করে বলা হয় যে, চিকিৎসকদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে প্রাদেশিক গভর্ণরের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশের এক মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। ফলে সরকারি চিকিৎসকদের মধ্যে চরম নৈরাশ্য ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।[১৭৫]

এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সমস্যা বিবেচনা করার জন্য হাইকোর্টের একজন বিচারপতি নিয়ে একটি কমিশন গঠন করেন। সরকারি চাকুরিরত চিকিৎসকদের বেতন ও পদমর্যাদার বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের উঁচু পর্যায়ে একটি কমিটি কর্তৃক বিবেচনা করা হয়।[১৭৬] এসব দাবিদাওয়ার পাশাপাশি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা পরীক্ষক নিয়োগের ব্যাপারেও তাদের কথা বলার অধিকার দাবি করেন। এমনকি তারা বিশেষ কতিপয় অধ্যাপককে নিয়োগ করা হলে পরীক্ষাদানে অস্বীকৃতি জানান। এই ব্যাপারে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা থেকে জানা যায় যে,

> ... তারা দুজন প্রবীন অধ্যাপকের লেকচার জানতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তাদের ওপর চাপ দিয়ে তাদের নিকট থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে, তারা তাদের ক্লাশ নিবে না।[১৭৭]

তৎকালীন সময়ে কয়েকজন পরীক্ষকের লক্ষ্য হলো মৌখিক পরীক্ষায় জটিল ও অস্বাভাবিক প্রশ্ন করে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীকে অকৃতকার্য করা। নির্বাচিত কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন (১৯৬৩-৬৪) এই পরীক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের সাথে কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। একই বছরের শেষের দিকে সরকার ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ বন্ধের ঘোষণা দেন এবং ছাত্রদের কলেজ হোস্টেল ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। ছাত্ররা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কাজে যথাযথভাবে চালু রাখার পথে বাধাদান ও হস্তক্ষেপ করে। এজন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১৭৮] এই প্রসঙ্গে সরকার কর্তৃক এক প্রেসনোট দেওয়া হয়।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তান মেডিকেল সমিতি এক বার্ষিক সম্মেলনে সরকারের এই সিদ্ধান্তকে নিন্দা করে এবং তা পরিবর্তনের জন্য আহ্বান জানান।[১৭৯] মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ওয়াজেদুল ইসলাম এর তথ্য মতে, একই বছর মেডিকেল শিক্ষাব্যবস্থার ত্রিমুখী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু করেন।[১৮০] এই ত্রিমুখী নিয়ন্ত্রণ হলো মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের শিক্ষক ও চিকিৎসকদের চাকুরির সার্বিক নিয়ন্ত্রণের কর্তা হলো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, চিকিৎসা সংক্রান্ত আচরণবিধি, পাঠ্যক্রমের নিয়ন্ত্রক মেডিকেল কাউন্সিল এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার মূল নিয়ন্ত্রক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ছিল এক চরম অব্যবস্থা। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটিকে পড়াশোনার চাপের সঙ্গে কঠোর নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। ছাত্র ও চিকিৎসকরা এই জাতীয় অবস্থার নিরসন ও জটিলতামুক্ত শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানায়। কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের দরুণ এসব সমস্যার সমাধান হয়নি। জাতীয় রাজনীতির বিষয়ে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট আগ্রহ ও সচেতনতা থাকলেও, তারা প্রত্যাশা করে কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন শিক্ষা জীবনের সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তাই কলেজের তথা স্থানীয় সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখা জরুরি ছিল।

১৯৬৩-৬৪ সালের কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন এই সমস্ত দাবিদাওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হলে বামপন্থী দল 'অগ্রগামী'র জনপ্রিতা আরো বৃদ্ধি পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৬৪-৬৫ সালের কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে বামপন্থী মীর্জা আবদুস সোবহান সহ-সভাপতি এবং সারওয়ার আলী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সারওয়ার আলী মতাদর্শগত বিশ্বাস ও কাজে একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তাই ছাত্র, চিকিৎসকের দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে আন্দোলনে পিছু হটেননি। এই প্রসঙ্গে সারওয়ার আলী বলেন,

> সংসদ (ইউনিয়ন) মেয়াদকালে ছাত্রদের শিক্ষা ও বাসস্থানের সমস্যা সমাধানে তৎপর থাকতে হয়েছে,কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দাপটের সঙ্গে আলোচনা, এমনকি ধর্মঘট ঘোষণা করতে হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস জন্মেছিল, জাতীয় রাজনীতির বিষয়ে ছাত্রছাত্রীর আগ্রহ থাকলেও তাদের শিক্ষার পরিবেশ ও অন্যান্য ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কাজ না করলে নিজের কিংবা সংগঠনের জনপ্রিয়তা রক্ষা করা যায় না।[১৮১]

এ সময় গনমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 'গনমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থা' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মেডিকেল এসোসিয়েশন এর তৎকালীন সভাপতি ডা. কে. এ. মনসুর ইনস্টিটিউশনাল বা জিওগ্রাফিক্যাল প্রাকটিসের প্রস্তাব দেন। তাঁর মত ছিল, ডাক্তার ও অধ্যাপকগণ সন্ধ্যায় মেডিকেল কলেজের চেম্বারে প্রাকটিস করবেন এবং উপার্জনের নির্ধারিত অংশ হাসাপাতাল লাভ করবে এবং তা হাসপাতালের কাজে ব্যবহৃত হবে।[১৮২] তার এই প্রস্তাবকে মেডিকেল এসোসিয়েশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ডা. আলীম চৌধুরী বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, 'জিওগ্রাফিকাল প্রাকটিস উইল বি হিস্টোরিকাল ব্লান্ডার।'[১৮৩] তার মতকে ডা. ফজলে রাব্বী সমর্থন করেন। এর ফলে সরকারি হাসপাতলে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তীকালে ১৯৬৭-৬৮ সালে কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের নব নির্বাচিত সহ-সভাপতি বামপন্থী দলের রুহুল হক (মতিয়া গ্রুপ) এবং সাধারণ সম্পাদক অগ্রগামীর আশিকুল আলম (মেনন গ্রুপ) এর নেতৃত্বে 'গনমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থা' প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করে। ইতিমধ্যে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের পূর্বাঞ্চল শাখার দ্বাদশ সম্মেলনে চিকিৎসকদের বিভিন্ন সমস্যা ও বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়,

প্রথমত তারা বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্সপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের বেতনের হার সম্পর্কে দাবিদাওয়া পেশ করে।

দ্বিতীয়ত, বিভাগীয় প্রশাসনিক কাজে চিকিৎসকদের নিয়োগ এবং

তৃতীয়ত, চিকিৎসক ও অন্যান্য কারিগরি বিভাগে বেতনের হারের বৈষম্য, এই বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের চিকিৎসকরা যে ধরনের সুযোগসুবিধা ভোগ করত পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসকরা সে ধরনের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে চিকিৎসকদের বিভাগীয় প্রশাসনিক কাজে নিয়োগ করা হলেও পূর্ব পাকিস্তানে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। এই অঞ্চলের চিকিৎসকদের অভাব অভিযোগ কর্তৃপক্ষের উপেক্ষা করার মতো ছিল না। তাই চিকিৎসকদের সাথে কর্তৃপক্ষের যে বিরোধ এবং দাবিদাওয়া ছিল, তা সম্মেলনের মাধ্যমে সমাধান করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।[১৮৪]

১৯৬৯ এর জুন মাসে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ইন্টার্নি চিকিৎসগণ উন্নততর মর্যাদা, পারিশ্রমিক বৃদ্ধি, স্বায়ত্তশাসিত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে প্রতীকী ধর্মঘট পালন করেন। এই ধরনের দাবি ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশক থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে আসছিল। কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের উদাসীনতার কারণে উল্লিখিত কোনো দাবি পূরণের চেষ্টা করা হয়নি। অথচ প্রতিবছর নতুন নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবার কারণে ছাত্রসংখ্যা ও ইন্টার্নি চিকিৎসকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পায়নি। এই অবস্থায় ১৯৭০ সালে 'ইন্টার্নিশিপ প্রথা বাতিলের খবর' প্রকাশিত হবার পর মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কলেজ ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ মিছিল করে। তারা ইন্টার্নিশিপ প্রথা ও গণমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে রাজপথে স্লোগান দেয় এবং এই দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘট আহ্বান করে। এ ছাড়া ১৯৫০ ও ১৯৬০ এর দশকের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বিরাজমান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও চিকিৎসকগণ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এই আন্দোলন কঠোরভাবে দমনের চেষ্টা করেন। কলেজের ছাত্র ওয়াজেদুল ইসলাম খান, হাফিজুর রহমান, আবদুল হক এবং পঞ্চম তথা শেষ বর্ষের ছাত্র শফিউল হাসানসহ প্রমুখদের গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে ছাত্র, চিকিৎসক সংগ্রাম পরিষদ প্রদেশব্যাপী মেডিকেল কলেজগুলোতে ধর্মঘটের ডাক দেন। কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। সরকার প্রদেশের সকল মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। অথচ ছাত্র, চিকিৎসকদের দাবিগুলো ছিল যৌক্তিক। সদ্য পাশ করা চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ জনচিকিৎসার স্বার্থে যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি সর্বস্তরের মানুষের কাছে চিকিৎসাসেবা নিয়ে যাওয়ার জন্য গণমুখী চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা জরুরি ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান বলেন, 'কর্তৃপক্ষের এই জাতীয় উদ্ভট ও অযৌক্তিক দমননীতির পিছনে তৎকালীন স্বাস্থ্যসচিব কর্নেল এম. এম. হক এর অহমবোধ কাজ করেছে।'[১৮৫] অবশেষে ছাত্রদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে এই বছরের (১৯৭০) শেষের দিকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ইন্টার্নিশিপ প্রশিক্ষণের দাবি মেনে নেয়।

একই বছর (১৯৭০) মেডিকেল কলেজের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীসহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা বেতনবৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন ও ধর্মঘট পালন করে। কর্মচারীদের এই আন্দোলনের সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা সম্পৃক্ত ছিল। ১৯৫০ এর দশক থেকেই কলেজের ছাত্ররা এই আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এর কারণে কয়েকজন বামপন্থী ছাত্রদের (আমজাদ হোসেন, আবদুল হাই প্রমুখ) কে বহিষ্কার করা হয়। তখন তাদের প্রতি এই

অবিচারের প্রতিকার চাওয়ার মতো কোনো রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। ১৯৭০ এর দশকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। এ সময় গ্রেফতারকৃত ছাত্র, চিকিৎসকদের মুক্তির জন্য প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ মিছিল হয় এবং তৎকালীন পাকিস্তান সরকারকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়। মূলত কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র, চিকিৎসক, শিক্ষকদের পক্ষে আন্দোলন সংগঠিত করে। পাশাপাশি অন্যান্য মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও বিভিন্ন দাবি নিয়ে ধর্মঘট পালন করে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা তৎকালীন স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের জনমানুষের সমস্ত অধিকার আদায়ের জন্য একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়।

জনকল্যাণমূলক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ

প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসেবামূলক ত্রাণকাজে তাঁদের ভূমিকা ছিল। কলেজের শিক্ষার্থীরা তাদের সীমিত সামর্থ্য নিয়ে সেবার হাত প্রসারিত করে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ায়। ১৯৫৪ সালের ভয়াবহ বন্যা, ১৯৬৯ সালের ডেমরার টর্নেডো, ১৯৭০ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়। এ ছাড়া ১৯৫৯ সালে ঢাকায় কলেরার প্রাদুর্ভাব হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় কলেরার ভ্যাকসিন দেয়। পরে গবেষণায় প্রকাশ পায় এই ধরনের কলেরার লাইভ ভ্যাকসিন বিশেষ কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই।[১৮৬] এই ব্যাপারে ১৯৫৯-৬০ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী* থেকে জানা যায়,

> The students of the College including female students rendered very active and invaluable service in the mass inoculation and vaccination campaign organised by the government in and around Dacca.[১৮৭]

১৯৬৯ সালের ঘূর্ণিঝড়ে আহত লোকদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। আহতদের চিকিৎসা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছয়টি ওয়ার্ড তৈরি করা হয়। *দৈনিক আজাদ পত্রিকা* থেকে জানা যায় যে,

> প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান মহাখালী হইতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গমন করিয়া উক্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ঘূর্ণিঝড়ে আহতদের দেখিবার উদ্দেশ্যে ছয়টি ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন।[১৮৮]

১৯৭০ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচণ্ড শক্তিধর ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। উপকূলীয় চরাঞ্চলগুলো সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয় এবং প্রচুর প্রাণহানি ঘটে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তেমন কোনো ত্রানসামগ্রী বিধ্বস্ত এলাকায় পাঠানো হয়নি। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রী ত্রাণসামগ্রী নিয়ে বিধ্বস্ত এলাকায় যায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী ডা. নাজমুন নাহার বলেন,

> ডেমরার টর্নেডো, বন্যায় তাঁরা দুর্গতদের সহায়তায় এগিয়ে যান। ১৯৭০ সালের বরিশালে যে টর্নেডো হয় সেখানে তারা ত্রানসামগ্রী নিয়ে যান।[১৮৯]

এ ছাড়া বেসরকারিভাবে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য বাংলা একাডেমিতে দুর্যোগ নিরোধ আন্দোলন কমিটি ও পরে 'বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' নামে শিল্পী সাহিত্যিকদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৫৯ ব্যাচের ছাত্র ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি (১৯৬৩) ডা. সারওয়ার আলী। তারা ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সমর দাসের সুরারোপিত 'কাঁদো বাংলার মানুষ আজিকে কাঁদো' গান গেয়ে গেয়ে অর্থ

সংগ্রহ করেন। ঘূর্ণিঝড়ে দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য তারা জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও বিশিষ্ট চলচিত্র তারকাদের নিয়ে ঢাকা স্টেডিয়ামে মঞ্চ তৈরি করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠান আয়োজনের টিকেট বিক্রি করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা হয়। রেডক্রসের কাছ থেকেও বেশ কিছু ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী নিয়ে নোয়াখালীর উপকূলীয় চর ও দ্বীপগুলোতে বিতরণ করা হয়।

এভাবে দেখা যায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র, চিকিৎসকগণ কেবল চিকিৎসক হিসেবে সেবা করেননি, বরং তারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্ত মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাঁদের এই ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার, যা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও অব্যাহত রয়েছে। তাঁর প্রমাণ ১৯৮৮ সালের শতাব্দীর দীর্ঘতম বন্যায় আক্রান্তদের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করতে গিয়ে ডা. মোঃ শাহরিয়ার নৌকাডুবিতে প্রাণ হারান।[১৯০]

মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের অবদান

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে ষাটের দশকের স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠিত স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই যুদ্ধে সাধারণ জনগণ ও অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতো ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র, প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসক অংশগ্রহণ করে। দেশাত্মবোধ থেকেই তাদের অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে অনেকে শহীদ হয়েছেন এবং অনেকে বিজয়ের সাফল্য নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। এদের সাহসী আত্মত্যাগ এবং নিঃস্বার্থ ভূমিকা নিঃসন্দেহে জাতীয় ইতিহাসের অংশ। তাই অভিসন্দর্ভের এই অংশে সর্বস্তরের মানুষের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের ইতিহাসে না গিয়ে কেবলমাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসকদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র, শিক্ষক ও চিকিৎসক বহুমাত্রিক ধারায় অংশগ্রহণ করেছেন। কলেজের ছাত্রদের কেউ কেউ সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। কলেজ থেকে পাশ করা চিকিৎসকদের একটি অংশ অন্যান্য হাসপাতাল ও সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরে কর্মরত থেকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করেছেন, কেউ কেউ প্রত্যক্ষ যুদ্ধের বাইরে সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড তথা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও বাঙালিদের চিকিৎসা করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এই কাজের গুরুত্ব অনেক। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র, শিক্ষক ও চিকিৎসকগণ মুক্তিযুদ্ধে তিনভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। ডা. সারওয়ার আলী বলেন,

> ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও চিকিৎসকগণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল ব্যাপক বহুমুখী ও নানামাত্রায় বিস্তৃত কর্মকান্ড। এর প্রতিটি শাখায় তাদের ভূমিকা লক্ষ্য করা গেছে।[১৯১]

অপরদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডা. শিশির কুমার মজুমদার ও ডা. আখতারুজ্জামানের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় যে, তাদের পরিচিত যেসব ছাত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শামসুল হাসান, এ. কে. এম. আলাউদ্দিন, অশোককুমার সাহা, শফিউদ্দিন আহমেদ, হেলাল, জিল্লুর রহিম ডালু, মোয়াজ্জেম হোসেন, সেলিম আহমেদ, আলি হাফিজ, আবু ইউসুফ জিয়া, ইকবাল আহমেদ, মুজিবুল হক, মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন, মোজাফফর, আমজাদ হোসেন, ওয়ালি, ওসমান, গোলাম কবির, নুরুজ্জামান শাহাদাত প্রমুখ।[১৯২] তারা ঢাকা শহরে কমান্ডের তত্ত্বাবধানে

থেকে যুদ্ধ করেন। ফলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের দ্বারা কলেজের রাজাকারদের ওপর হামলা চালানো হয়। কলেজের কয়েকজন ছাত্র মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কলেজ হোস্টেলের ১০৭ নম্বর কক্ষে ও ২১৯ নং কক্ষে রাজাকার ঘাঁটিতে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে দুইজন রাজাকার নিহত হয় এবং অন্যান্যরা পালিয়ে যায়। এদের একজন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মুক্তিযোদ্ধাদের গুলিতে নিহত হয়।[১৯৩]

মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে, হাসপাতাল মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও চিকিৎসকদের জন্য নিরাপদ। এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। পাকিস্তানি সেনা ও স্থানীয় রাজাকার, আলবদর, এতটাই নিষ্ঠুর ছিল যে, কোনো নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করেনি। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী নীপা লাহিড়ী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে যাওয়ার পথে ফতুল্লায় নিহত হন। এই কলেজের আরেক ছাত্র বামপন্থী ছাত্রসংগঠন অগ্রগামীর সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম কলেজ হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের কাজে সহায়তা করার জন্য রাতে হোস্টেলে না যেয়ে ক্যানসার ওয়ার্ডে ঘুমাতেন। স্থানীয় স্বাধীনতা বিরোধী কয়েকজন ছাত্রের সহায়তায় ১১ ডিসেম্বর রাজাকারের দল তাঁকে তুলে নিয়ে যায় এবং রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে নির্মমভাবে হত্যা করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ডা. সারওয়ার আলী বলেন,

> সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার থেকে নিয়ে গিয়ে ডা. শামসুদ্দিন আহমেদ-কে হত্যা করা হয় এবং তাঁর সহপাঠী প্রিন্সিপাল কর্নেল জিয়াউর রহমানকে দপ্তর থেকে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে।[১৯৪]

আন্তর্জাতিক আইনে স্থায়ী ও ভ্রাম্যমান চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা নিষিদ্ধ। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ শত্রুর হাতে পড়লে আহতদের পুরোপুরি চিকিৎসা প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের কাজ অব্যাহত রাখার সুযোগ দিতে হবে।[১৯৫] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিরা এই নিয়ম রক্ষা করেনি।

উপরি উল্লিখিত ছাত্র ছাড়াও ঢাকা মেডিকেল কলেজের অনেক ছাত্র অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন সেক্টরে বা বিভিন্ন বাহিনীতে (মুক্তিবাহিনী, মুক্তিফৌজ, বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স, জেড ফোর্স) গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে সাখাওয়াত হোসেন তনু, পঞ্চম বর্ষের মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, এ. জে. এম. মাহমুদ ও শামসুদ্দিন আহমেদ, হাবীব ইব্রাহীম, তৃতীয় বর্ষের রহিমউল্লাহ খান, দ্বিতীয় বর্ষের এম. এ. হাসান, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন বা মবিন খান এর মতো ছাত্ররা বাংলাদেশ সরকারের নিয়মিত গেরিলা বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেন।[১৯৬] সীমিত এই তথ্যের ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, দেশাত্মবোধ থেকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের অনেক শিক্ষার্থী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এই আবেগ থেকেই প্রথম বর্ষের ছাত্রী নীপা লাহিড়ী যুদ্ধে যাওয়ার পথে শহীদ হন এবং একই বর্ষের হাসান শহীদ, হুমায়ূন ফরিদী পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের অনেক শিক্ষার্থী কলেজ থেকে পাশ করার পর পাকসেনাবাহিনীতে সামরিক সদস্যদের মতো 'আর্মি মেডিকেল কোর' এ যোগদান করেন। পাকবাহিনীর অনেক বাঙালি চিকিৎসক পাকবাহিনী ছেড়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্কোয়াড্রন লীডার ১৯৪৮ ব্যাচ এর মোহাম্মদ শামসুল হক, ১৯৫০ ব্যাচ এর মেজর শামসুল আলম, ১৯৫৬ ব্যাচ এর ক্যাপ্টেন আবদুল লতিফ মল্লিক, ক্যাপ্টেন নুরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন আবদুল মান্নান, লে. আখতার প্রমুখ অফিসারবৃন্দ বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত ছিলেন। ক্যাপ্টেন ডা. আবদুল লতিফ মল্লিক ৯ নম্বর

সেক্টরে মেজর জলিল এর বাহিনীতে যোগ দেন। পাকসেনারা তাঁর ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালালেও প্রাণে বেঁচে যান। এ ছাড়া বরিশালে পাকবাহিনীর আক্রমণের সময় ক্যাপ্টেন নজিব আহমেদ, ক্যাপ্টেন সিরাজুল ইসলাম এবং ডা. কায়সার প্রমুখ আহতদের চিকিৎসা সেবা দান করেন। এদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ক্যাপ্টেন খুরশীদ বীর উত্তম এবং লে. আখতার বীর প্রতীক খেতাব পান।

অন্যদিকে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের যেসব সেনা অফিসার পাকবাহিনীর কর্মস্থল থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারেননি তাদেরকে পাকসেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে। তারা হলেন ডা. লে. কর্নেল এ. এফ. জিয়াউর রহমান, ডা. লে. কর্নেল এন. এ. এম. জাহাঙ্গীর, ডা. মেজর এ. কে. এ আসাদুল হক, ডা. লে. আমিনুল হক, ডা. মেজর রেজাউর রহমান প্রমুখ। তাদের সবাই ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাদের সম্পর্কে *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ চিকিৎসক* গ্রন্থ থেকে বিস্তারিত জানা যায়।[১৯৭]

তাদের কাছে সবকিছুর উর্ধ্বে ছিল দেশের সম্মান, স্বাধীনতা, কর্তব্যবোধ। যুদ্ধকালীন সময়ে তারা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা, খাদ্য, ঔষধ দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেন। তাই পাকিস্তানি সেনারা বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যা করে, কারণ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী একটি জাতির সংস্কৃতি ও বুদ্ধিমত্তাকে উৎখাত করে নিজেদের শাসন ও শোষণ চিরস্থায়ী করার জন্য পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। তাদের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের উপরি-উক্ত তিনজন (লে. কর্ণেল এ. এফ. জিয়াউর রহমান, ডা. লে. কর্ণেল এন. এ. এম. জাহাঙ্গীর এবং ডা. রেজাউর রহমান) প্রাক্তন ছাত্র তথা চিকিৎসক পাকবাহিনীর বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রথম পর্বের শিকার হন। বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রথম পর্ব ছিল **১৯৭১** সালের ২৫ মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত। তাঁরা শহীদ হন পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যার অংশ হিসেবে। চিকিৎসক হিসেবে একজন বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধে তিন ধরনের ভূমিকা রাখার সুযোগ পান। একদিকে তারা বুদ্ধিমত্তা, পরামর্শ দিয়ে অন্যদিকে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং চিকিৎসা সেবা দিয়ে সহযোগিতা করেন। এজন্য পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকসহ অন্যান্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকদের ওপর পাকিস্তান বাহিনীর ক্ষোভ ছিল। উপরন্তু তাদের মতো মেধাবী চিকিৎসক বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাতে আরো অবদান রাখার সম্ভাবনা ছিল বা দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হতো, এটা ভেবেই পাকিস্তানিরা তাঁদের হত্যা করে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা অনেক চিকিৎসক ভারতে গিয়ে বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ঐ সমস্ত চিকিৎসকদের অনেকে সংগঠক হিসেবে কেন্দ্রে, অনেকে সীমান্তে আবার অনেকে শরনার্থী শিবিরে চিকিৎসা সেবার কাজ করেন। আবার অনেকে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। চিকিৎসা সেবা ছাড়াও কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা বা শরনার্থীদের জন্য চিকিৎসা সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি অথবা অর্থ সংগ্রহের মতো গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব পালন করেন। আবার কয়েকজন সীমান্ত সংলগ্ন সেবা কাজের উপযোগী হাসপাতাল স্থাপন করেন।

এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক একক ব্যক্তি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সীমান্ত অতিক্রম করেন। কেউ কেউ ছাত্র ইউনিয়ন, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠিত মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়।[১৯৮] **১৯৭১** সালের এপ্রিলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা নানা দলে বিভক্ত হয়ে দেশ ত্যাগ করে আগরতলায় যায়। প্রথম দলটির সঙ্গে ডা. সারওয়ার আলীসহ ডা. সৈয়দ খলিলুল্লাহ্, রণেশ দাসগুপ্ত, সাইফউদ্দিন মানিক, পংকজ ভট্টাচার্য্য, মতিউর রহমান, আবুল হাসনাত ও কয়েকজন কৃষক আন্দোলনের কর্মী ছিলেন।[১৯৯] এ ছাড়া ডা. সারওয়ার আলীর স্ত্রী ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না তাদের কয়েকমাসের কন্যা সন্তানকে নিয়ে

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি শরনার্থী শিবিরে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন এবং নারী আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে জনমত তৈরি ও শরনার্থীদের মনোবল বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতীয় নারী সংগঠকদের সাথে যোগাযোগ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সাহায্য ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করেন। এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আগরতলার ক্রাফট হোস্টেলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুকদের মেডিকেল চেক আপ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা দিতেন।

অনুরূপভাবে ডা. মাখদুমা নার্গিসের সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আরেক জন প্রাক্তন ছাত্রী ডা. ফওজিয়া মোসলেম একই বাসস্থানে থাকতেন। তাঁর স্বামী সাইফউদ্দিন মানিক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। এই বাসায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সঙ্গে পার্টির সদস্যদের মধ্যে যারা সপরিবারে দেশ ত্যাগ করেন, তাদের কয়েকজনের জন্য এই বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পূর্ব থেকেই সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে তাঁর একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তিনিও ছোট কন্যা সন্তানকে নিয়ে আগরতলায় চলে আসেন। এখানে তাঁর দায়িত্ব ছিল মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পের চিকিৎসক হিসেবে চিকিৎসা ক্যাম্প পরিচালনা করা। ছোট কন্যা সন্তানকে সাথে নিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেন। এ ছাড়া ত্রানসামগ্রী সংগ্রহ করার কাজে সহায়তা করেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি এই কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার। ছাত্রজীবন থেকেই তারা সংগ্রামী চেতনা নিয়ে দেশ সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

ডা. সারওয়ার আলী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন। তিনি আগরতলা থেকে কলকাতা ও দিল্লি যান। ভারতে অবস্থানকালীন সময়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য দায়িত্বও পালন করেন। বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে যে শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও বাংলাদেশের গণহত্যার বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতার সপক্ষে তাদের সমর্থন আদায়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের একটি প্রতিনিধিদল সেখানে পাঠানো হয়। এটি ছিল বাংলাদেশ সরকারের প্রথম প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন আবদুস সামাদ আজাদ, ন্যাপের যুগ্ম সম্পাদক দেওয়ান মাহবুব এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও কমিউনিস্ট পার্টির ডা. সারওয়ার আলী। এই সম্মেলনে প্রতিনিধিদের ভূমিকা সম্পর্কে ডা. সারওয়ার আলী বলেন,

> দুটি পৃথক অধিবেশনে আবদুস সামাদ আজাদ ও আমি বাংলাদেশের গণহত্যার ভয়াবহতা তুলে ধরে স্বাধীনতা ছাড়া যে, এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই, সে বিষয়টি অবহিত করি। সম্ভবত বক্তৃতায় আবেগের অতিরিক্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। সভা সমাপ্তির পর অনেকে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করেন।[২০০]

এই সম্মেলনে তারা শুধু বাংলাদেশের গণহত্যার চিত্রই তুলে ধরেননি বরং বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর মুদ্রিত 'বাংলাদেশ শ্বেতপত্র' শিরোনামের পুস্তক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অনেক আগ্রহের সাথে তাদের কথা শোনেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমে বাংলাদশের গণহত্যার বিষয়টি প্রচারিত হওয়ায় পশ্চিম ইউরোপের সব প্রতিনিধি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে মত দেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেস, নামিবিয়ার মুক্তি সংগ্রাম ও সাহারা অঞ্চলের শীর্ষ নেতারা উৎসাহ দেখান। এরপর তারা বুদাপেস্টের সম্মেলনের পর পোল্যান্ড ও পূর্ব জার্মানিতে বাংলাদেশের গণহত্যার ভয়াবহতা ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি তুলে ধরেন। পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে তাদের এই আলোচনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে দৃঢ় সমর্থন লাভে সহায়ক হয়।

এরূপ পরিস্থিতিতে তারা সম্মেলনের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে স্বাক্ষর গ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। এজন্য তারা একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেন এবং উক্ত প্রস্তাবে নির্বাচনের রায় অস্বীকার করা, গণহত্যা এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বাধীনতা ছাড়া যে কোনো বিকল্প পথ নেই ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়। প্রথমদিকে সিপিআই ও কংগ্রেসের তরুণ নেতারা আপত্তি জানালেও পরবর্তীতে তারা তা মেনে নেন। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডা. সারওয়ার আলী সিপিআই এর সাধারণ সম্পাদক ভূপেশ গুপ্তকে এই সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের বুকলেটটি দেখান এবং সিপিআই এর অবস্থান জানান। ভূপেষ গুপ্ত সিপিআই ও কংগ্রেসের তরুণ কর্মীদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে মত দেন এবং এটি পার্টির সিদ্ধান্ত বলে জানান। ফলে তারা বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৭০টি স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসহ পশ্চিম ইউরোপের সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয়। আকাশবানী থেকে ডা. সারওয়ার আলী'র বক্তব্য প্রচারিত হয়। এই অভিযান সফল করার ক্ষেত্রে আবদুস সামাদ আজাদ, দেওয়ান মাহবুব ও ডা. সারওয়ার আলী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ডা. সারওয়ার আলী শুধু বুদাপেস্ট সম্মেলনই নয়, তিনি কলকাতায় অল্পসময় অবস্থানকালেও বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা, অত্যাচার, নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন।[২০১]

ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে ডা. সারওয়ার আলী মুক্তিযুদ্ধের সময়ে উল্লিখিত ভূমিকা ছাড়াও আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। যেমন, মুক্তিযোদ্ধাদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া, তাদের শারীরিক যোগ্যতা নিরুপণ করা, মনোনীত মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দেওয়া। এজন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের জন্য অস্ত্র চালনার আগে মনোনীত মুক্তিযোদ্ধারা আগরতলার উপকণ্ঠে বরদলী বিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পে অবস্থান নেয়। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের রাজনীতি ও যুদ্ধের নানা কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।[২০২]

এদিকে দেশের বাইরে কর্মরত বা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বসবাসরত পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসকগণ একদিকে স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনে বা অর্থ সংগ্রহের জন্য কাজ করেছেন, অন্যদিকে কেউ কেউ স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশ থেকে দেশে চলে আসেন। তাদের কেউ সরাসরি রণাঙ্গন, সীমান্তে এসে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। তেমনি একজন হলেন ডা. জাফরউল্লাহ্ চৌধুরী। তিনি ১৯৬৭ সালে ইংল্যান্ডের রয়েল কলেজ অব সার্জনস থেকে এফ.আর.সি.এস প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চূড়ান্ত পর্ব শেষ না হতেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য দেশে ফিরে আসেন। তিনি ইংল্যান্ড থেকে প্রত্যাবর্তন করে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য ২নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফের সহযোগিতায় আগরতলার বিশ্রামঘরের মেলাঘরে ৪৮০ শয্যাবিশিষ্ট প্রথম ফিল্ড হাসপাতাল 'বাংলাদেশ হাসপাতাল' গড়ে তোলেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডা. মবিন, ডা. কামরুজ্জামান, (কমিউনিটি হাসপাতালের চেয়ারম্যান), সুলতানা কামাল (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা), সাঈদা কামাল (চিত্রশিল্পী), ডালিয়া সালাউদ্দিন আখতার প্রমুখ। ডা. জাফরউল্লাহ্ চৌধুরী ও ডা. মোবিন ইংল্যান্ড থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন, সে সম্পর্কে জাহানারা ইমাম তাঁর *'একাত্তরের দিনগুলি'* গ্রন্থে উল্লেখ করেন।[২০৩]

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডা. জাফরউল্লাহ্ গ্রামীন জনসাধারণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের কাজ শুরু করেন। এজন্য তিনি ফিল্ড হাসপাতালটিকে কুমিল্লাতে স্বাধীন দেশের প্রথম হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলেন। পরবর্তীতে ঢাকার ইস্কাটনে হাসপাতালটি পুনঃস্থাপিত হয়। গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু রূপে গড়ে তোলার জন্য 'চলো গ্রাম যাই' স্লোগান নিয়ে হাসপাতালটিকে ঢাকার অদূরে সাভারে 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র'

নামে স্থানান্তর করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হাসপাতালটির নামকরণ করেন এবং হাসপাতালের জন্য ৩১ একর জমি প্রদান করেন। এই গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্বাধীন বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং এর স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭৭ সালে তিনি স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন।

ডা. জাফরউল্লাহ্ চৌধুরীর মতো কোনো কোনো চিকিৎসক একক চেষ্টায় স্বাধীনতাযুদ্ধের সংশ্লিষ্ট কাজে অংশগ্রহণ করেন। তার অন্যতম উদাহরণ হলো ডা. হুমায়ূন হাই। পাকবাহিনী চট্টগ্রাম শহর আক্রমণ করলে তিনি অনেক কষ্ট করে কুমিল্লা হয়ে আগরতলা যান। সেখানে তিনি জেড ফোর্সের ব্রিগেডের প্রধান মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ করেন। এ ছাড়া আওয়ামী মতাদর্শে বিশ্বাসী ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের অনেকে দলীয় তত্ত্বাবধানে বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী দলীয় তত্ত্বাবধানে কাজ করেছেন। অন্যদিকে, ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ডা. কাজী মিসবাহুন নাহার তামান্না অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে প্রথম নারী মেডিকেল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, যা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্যদিকে পাকিস্তানের চিকিৎসকদের জাতীয় সংগঠন পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশন এর দুইটি শাখা– পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল শাখা। পি.এম.এ. এর বিধি অনুযায়ী এম.বি.বি.এস. পাশ করার এক বছর পর মেডিকেল এসোসিয়েশনের সাধারণ সদস্যপদ দেওয়া হতো। পি.এম.এ. এর পূর্বাঞ্চল শাখা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রগতিশীল চিকিৎসকদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তাদের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডা. এস. আই. এম. জি মান্নান, ডা. আবুল কাসেম ও ডা. আলিম চৌধুরী প্রমুখ। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের পূর্বাঞ্চল শাখার সাধারণ-সম্পাদক ডা. সারওয়ার আলী, সভাপতি ডা. তৈয়ব আলী, কোষাধ্যক্ষ ডা. হুমায়ূন কবির এবং ডা. আলীম চৌধুরী নিখিল পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক মনোনীত হন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ডা. শিশির কুমার মজুমদার, ডা. ওয়াজেদুল, ডা. সারওয়ার আলী পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশনের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসয়েশন' (বি. এম. এ.) নাম রাখেন।[২০৪] নাম পরিবর্তন ও নতুন করে চিকিৎসা সেবামূলক সংগঠন বি. এম. এ. তৈরির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় স্বনামখ্যাত কবি প্রাবন্ধিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় অনুষ্ঠিত এক সভায়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে এই সংগঠনের প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধে অংশগ্রহণে ইচ্ছুকদের অস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, মুক্তিযোদ্ধাদের 'ফার্স্ট এইড' (প্রাথমিক চিকিৎসা) প্রশিক্ষণ দান এবং সেই সঙ্গে তাদের চিকিৎসা সেবা দান, শরনার্থীদের চিকিৎসা ও ত্রানসামগ্রী দানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করা। তাই বি. এম. এ. এর আহ্বানে কলকাতার চিকিৎসক ও সুধী সমাজ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এমনকি তাঁরা নিজ উদ্যোগে স্থানীয় চিকিৎসক এবং ঔষধ ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি বি. এম. এ. এর মানবিক কর্মকাণ্ডে উদার সহায়তার জন্য আহ্বান জানান। বি. এম. এ. এর প্রধান কার্যালয় কলকাতা ও আগরতলায় স্থাপন ছাড়াও সীমান্ত এলাকায় এবং শরনার্থী শিবির সংলগ্ন স্থানে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে চিকিৎসা সেবা ও সামরিক সহায়তা দানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কলকাতা কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ছিলেন ডা. শিশির কুমার মজুমদার ও ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান এবং আগরতলা কার্যালয়ের দায়িত্বে ছিলেন ডা. সারওয়ার আলী *[পরিশিষ্ট দেখুন-৪৫]*। এ সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান হতে আগত চিকিৎসক বা ছাত্রদের কর্মকর্তা হিসেবে নিবন্ধিত করে কলকাতা, আগরতলাসহ বনগাঁ, মালদা, মেঘালয় প্রভৃতি ক্যাম্পে পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়।

এরকম অবস্থায় চিকিৎসকগণ একদিকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করে অন্যদিকে প্রয়োজনে ক্যাম্পগুলোতে থেকে চিকিৎসা সেবা ও ত্রাণ কাজে সময় ও শ্রম ব্যয় করেন। এদের মধ্যে উল্লেখ করার মতো চিকিৎসকগণ হলেন, ডা. রবিউল হক, ডা. সৈয়দ খলিলউল্লাহ, ফওজিয়া মোসলেম, স্নিগ্ধা চক্রবর্তী, সত্যেন আদিত্য। চিকিৎসা সেবা দানের কাজ ছাড়াও বি. এম. এ. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ঔষধপত্র, সার্জিক্যাল সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করে। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি চিকিৎসকগণ এই সংগঠনকে নানাভাবে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ডা. সারওয়ার আলী মুক্তিযুদ্ধকালে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় কিছু বাড়তি সুবিধা পান। সে সময় তারা বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের নামে সর্বভারতীয় মেডিকেল এসোসিয়েশন ও রেডক্রসের কাছে শরণার্থীদের জন্য ঔষধ ও যন্ত্রপাতির জন্য আবেদন করেন এবং তাদের সুত্রে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করেন। সে সময় কলকাতায় অবস্থানরত ডা. শিশির কুমার মজুমদার উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন।[২০৫]

কেউ কেউ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কথা শুনে বিদেশ থেকে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং দেশে ফিরে সরকারি হাসপাতালে যোগ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা ও সহযোগিতা করে স্বাধীনতা যুদ্ধে পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জহুরুল মাওলা চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যোগ দেবার পর ২৫ মার্চ গণহত্যার ইংগিত পেয়ে সেখান থেকেই চিকিৎসা সেবা দেওয়ার মনস্থ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন দল তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখত। ফলে তিনি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত চিকিৎসা, ঔষধপত্র ও অর্থ সহায়তা করেন।[২০৬]

আবার কোনো চিকিৎসক দেশের অভ্যন্তরে নিজ কর্মস্থল থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা ও সহায়তা করার চেষ্টা করেন। তেমনি একজন চিকিৎসক হলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৫০ ব্যাচের ছাত্র শল্য চিকিৎসক অধ্যাপক কবির উদ্দিন আহমেদ। তিনি ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি সবসময় প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার সাথে জড়িত ছিলেন। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তার মনোজগতে যে চিন্তাচেতনার ব্যাপ্তি ঘটে তারই ধারাবাহিকতায় রাজনীতি, গণআন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ তাঁকে আকর্ষণ করে। সে কারণে তিনি নীরবে নিভৃতে দেশ, মাটি ও মানুষের জন্য কাজ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি চড়পাড়া ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা থাকলেও পরিবারের কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে ১৯৭১ সালে অস্ত্রের মুখে দাঁড়িয়েও অধ্যাপক কবির উদ্দিন আহমেদ তাঁর সহযোগী সার্জনদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে দেশের ভেতরে থেকে মানবতার সেবা দান করেন। ২৫ মার্চ এর পর পাক সেনারা ময়মনসিংহ শহরে প্রবেশ করে হাসপাতাল ঘিরে ফেলে। এরপর গুলি চালানোর জন্য কবির আহমেদসহ বাঙালি ডাক্তার কর্মচারীদের লাইন করে দাড় করানো হয়। বাঙালি, বিহারি দাঙ্গার সময় (২৫ মার্চ এর পর) উর্দুভাষী অধ্যাপক বারীর পরিবারকে ডাক্তাররা হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে লুকিয়ে রেখে জীবন রক্ষা করায় কবির উদ্দিন আহমেদসহ বাঙালি ডাক্তাররা বেঁচে যান। এ সময় তিনি একদিকে পরিবারের দেখাশোনা, অন্যদিকে আহত মুক্তিযোদ্ধা, ইস্ট পাকিস্তান বাঙালি রেজিমেন্ট, বাঙালি, বিহারি, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ তথা সব মানুষের সেবা করেন। মাঝে মাঝে প্রায়ই তাঁকে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির সেনানিবাসে আহত মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তানিদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো। ১০ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ স্বাধীন হলে কবির উদ্দিন আহমেদ আবারও প্রাণে বেঁচে যান। এই ঘটনা প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রী তসলিমা কবির বলেন,

> ময়মনসিংহ ১০ তারিখ স্বাধীন না হলে আলবদর, রাজাকারদের শিকার হতো কবির ও তাঁর সহকারী সার্জনরা, সেই তালিকায় অন্যান্যদের সাথে কবিরের নামও লিপিবদ্ধ ছিল।[২০৭]

মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সবচেয়ে বেশি সংগঠিত ছিল। এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক ডা. ফজলে রাব্বী। ১৯৩২ সালে ২২ সেপ্টেম্বর পাবনা জেলার সাতিয়ানী থানার হেমায়েতপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইংল্যান্ড থেকে দুইবার এম. আর. সি. পি. ডিগ্রি লাভ করে দেশে আসেন। অত্যন্ত অল্প সময়ে এবং অল্প বয়সে পেশাগত ক্ষেত্রে নিজেকে সফল ও জনপ্রিয় চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হন। ছাত্র জীবনে তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন এবং প্রথম শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে মেডিকেল কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের সাথে তাঁরও অবদান ছিল। মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক হিসেবে সরকারি চাকুরি করলেও রাজনীতিতে জড়িত ছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনিই প্রথম গণমুখী চিকিৎসার কথা চিকিৎসক ও ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, 'চিকিৎসা ও সেবা গ্রামের প্রতিটি ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে।'[২০৮] তাঁর এই বক্তব্য পশ্চিমাগোষ্ঠীর নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। সে সময় থেকে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা বিভিন্ন চিঠি ও জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের (ডা. আলীম চৌধুরী, ইতিহাসের অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমেদ) সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ সময় তিনি আহত মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সাহায্য করতেন। তিনি তাঁর আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে ব্যয় করেন। তিনি শুধু মুক্তিযোদ্ধাই নয়, পাকবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নির্যাতনের শিকার নারীদের গোপনে নানারকম সাহায্য করেন। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। মানবিক গুণ ছিল বলেই যুদ্ধকালীন সময়ে (১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১) অবাঙালি রোগীদের ফিরিয়ে না দিয়ে চিকিৎসা করেন। এই ব্যাপারে তিনি বলেন, 'অ-বাঙালি হলেও সে মানুষ এবং অসুস্থ আর আমি তার ডাক্তার।'[২০৯] তিনি অ-বাঙালিদের প্রতি মানবিকতা দেখালেও তাঁর প্রতি পাকিস্তানিরা মানবিকতা দেখায়নি। এদেশের রাজাকার, আলবদরের সহায়তায় পাকসেনারা তাঁকে রায়ের বাজার ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর পেছনে ইটখোলায় নির্মমভাবে হত্যা করে।

অপরদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সহযোগী অধ্যাপক ডা. এ. এফ. এম. আলীম চৌধুরীও মুক্তিযুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি ১৩৩৩ (১৯২৩) বাংলা সালের ১ বৈশাখ কিশোরগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে কিশোরগঞ্জ হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৪৮ সালে কলকাতা ইসলামিক কলেজ থেকে আই.এসসি. পাশ করেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাশ করার পর এই কলেজেই যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে রয়েল কলেজ অব সার্জনস অব ইংল্যান্ড থেকে ডি. ও. ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে, সিনিয়র হাউজ অফিসার (চক্ষু) হিসেবে রয়েল আই এন্ড ইয়ার হসপিটাল, ব্রাডফোর্ড, রেজিস্ট্রার হিসেবে লন্ডনে হুইপস এস হসপিটাল এবং সেন্ট জেমস হসপিটালে কর্মরত ছিলেন। দেশে আই. পি. জে. এম. আর. (পিজি হসপিটাল), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজ এবং কুমুদিনী হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। সংগঠক হিসেবে তিনি তৎকালীন পাকিস্তান মেডিকেল এসোসিয়েশন, পাকিস্তান চক্ষু চিকিৎসক সমিতি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান ইত্যাদির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এমনকি ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর অবদান ছিল। তিনি ছিলেন এর আহ্বায়ক ও প্রথম সম্পাদক। এসব সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে তিনি সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এসব

প্রতিষ্ঠানের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তাঁর সাংগঠনিক তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। পাকিস্তান আমলে আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের সংঘবদ্ধ করা এবং যোগযোগ রক্ষা, অর্থ সাহায্য দেওয়া ছিল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে ডা. আলীম চৌধুরী মিটফোর্ড মেডিকেল কলেজে কর্মরত থাকলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করার জন্য নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজে সময় কাটাতেন। তিনি চাঁদা তুলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ঔষধের ফ্যাক্টরি ঘুরে ঘুরে গাড়ির বনেট ভর্তি করে ঔষধ সংগ্রহ করেন এবং তা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিতেন। তিনি একটি গোপন হাসপাতালে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত চিকিৎসা দেন। এই কারণে অধ্যাপক ফজলে রাব্বী এর মতো তিনিও রাজাকার, আলবদর তথা ঘাতকদের নজরে পড়ে যান। তাই পাক সেনাবাহিনী পরাজয় নিশ্চিত জেনে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যার জন্য যে নীল নকশা প্রণয়ন করে তিনি তারই নির্মম শিকার হন। কুখ্যাত রাজাকার মাওলানা মান্নান ১৫ ডিসেম্বর রাজাকার, আলবদরদের নিকট তাঁকে তুলে দেন এবং তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সাথে শহীদ ডা. আলীম চৌধুরীর বিকৃত লাশ পাওয়া যায়। তাঁর লাশের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী শ্যামলী চৌধুরী বলেন,

> আলীমের হাতদুটো নারকেলের দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাধা ছিল। চোখ বেঁধেছিল যে গামছা দিয়ে তা গলায় এসে ঠেকেছিল। কপালের বা দিকে বেয়নটের গভীর ক্ষত। বুকে অসংখ্য গুলি। তলপেটের বা দিকে বেয়নটের আঘাত। সব মিলিয়ে ক্ষতবিক্ষত বিভীষিকাময় এক চেহারা।[২১০]

এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত অনেক তরুণ চিকিৎসক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অথবা নিজ চেম্বারে চিকিৎসা সেবা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেন। এজন্য ঘাতক আলবদর ও পাক সেনাদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হন। এদের অধিকাংশই স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করেছেন। এসব শহীদ চিকিৎসকদের মধ্যে ডা. হুমায়ূন কবির, ডা. আজহারুল হক, ডা. হাসিময় হাজরা।

১৯৭১ সালে হুমায়ূন কবির সদ্য এম.বি.বি.এস. পাশ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্নি করছিলেন। তিনি মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়ই রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। তিনি মেডিকেল কলেজের প্রগতিবাদী ছাত্র সংগঠন অগ্রগামীর সভাপতি ছিলেন। বাম রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় বিভিন্ন সভা, শোভাযাত্রায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ছাত্রসমাজে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। এই পরিচিতিই তাঁকে পাক হানাদার বাহিনীর কাছে চিহ্নিত শত্রুতে পরিণত করে।

মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসহ বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা করেন। অন্যদিকে আজহারুল হক ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী সার্জন। তিনিও গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতেন। এ সময় ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় কারফিউ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরার জন্য আলবদর, আলশামস বাহিনী চেষ্টা চালায়। এরকম পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ১৫ নভেম্বর হাতিরপুল এলাকা থেকে তাদের দুইজনকে একসাথে রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। পরের দিন নটরডেম কলেজের ডোবা থেকে দুইজনের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে মেডিকেল কলেজের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সন্ধ্যার মধ্যে জানাজা দিয়ে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।[২১১] উল্লিখিত দুইজনের মতো ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইন্টার্নি চিকিৎসক হাসিময় হাজরার মৃত্যু হয়।

১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চ পাকবাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ সারা দেশবাসীর সাথে হাসিময় হাজরাকে হতবাক করে। তাই আহত, মুর্মূর্ষু, গুলিবিদ্ধ মানুষের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। দেশের ভেতরে থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে কাজ করার আগ্রহ দেখান। দেশের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় ২ মে পিজি হাসপাতালে তাঁর সহপাঠী কয়েকজন বিদেশি বন্ধুর সাথে দেখা করতে যান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে তাদের সাথে ডা. হাজরার তর্ক বিতর্ক হয়। পরে জানা যায়, ঐ বিদেশি বন্ধুদের কেউ একজন পাকবাহিনীকে বলে দেয় তিনি বাঙালি, হিন্দু ও পাকিস্তানের শত্রু। এরপর থেকে তাঁর আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় ঐ দিনই পাকসেনারা তাঁকে হাসপাতাল থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং অনেক শারীরিক অত্যাচার ও নির্যাতনের পর নির্মমভাবে হত্যা করে।

এই কলেজের অনেক ছাত্র, চিকিৎসক অন্য জায়গায় কর্মরত থেকে পাকবাহিনীর বর্বতার কারণে শহীদ হন। এই শহীদদের মধ্যে রয়েছেন ডা. সুলেমান খান, ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা, ডা. আবদুল জব্বার, ডা. নওশের আলী। এদের মধ্যে ডা. মোহাম্মদ মোর্তজার আদিনিবাস পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায়। দেশ বিভাগের পর কলকাতা মেডিকেল কলেজ ছেড়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হন। এম.বি.বি.এস. পাশ করার পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসক হিসেবে যোগ দেন। একজন চিকিৎসক হলেও বাংলা, ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি বার্নাড শ'য়ের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে জীবনের মূল সত্য জানার জন্য ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, মার্কসবাদ ইত্যাদি বিষয়ে পড়াশোনা করেন। তার মতে, মার্কসবাদই সত্যের সন্ধান দিয়েছে। তিনি ধর্মীয় বাহ্যিক আড়ম্বরের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন পশ্চিমবঙ্গের বিধান রায়ের মতো চিকিৎসক হবেন। ছাত্রাবস্থায় হাসপাতালের দায়িত্ব পালনের সময় রোগীদের ইতিহাস নিতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে, সমাজের মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন না হলে চিকিৎসক হয়ে মানুষের প্রকৃত দুর্দশা মোচন করা সম্ভব না। এই দেশের অধিকাংশ মানুষই দারিদ্র্যের শিকার। কাজেই ডাক্তার হয়ে তাদের পথ্য নির্বাচন করলেও এই মানুষদের প্রকৃত রোগের সমাধান হয় না। ডাক্তাররা হয়তো সামগ্রিকভাবে রোগের উপশম করতে পারে, কিন্তু এই চিকিৎসা অর্থহীন। এই সমাজের প্রকৃত চিকিৎসা না হলে চিকিৎসক হয়ে লাভ নেই।[২১২] তাই মেডিকেল সায়েন্স রেখে দীর্ঘ ১৬ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, দেশের সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনে কিছু অবদান রাখবেন বলে। এই রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার জন্য তিনি সবার কাছে যথেষ্ট পরিচিত হয়ে ওঠেন, যা আলবদরদের নজরে পড়ে যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে ১৪ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর নীল নকশা অনুযায়ী আলবদর বাহিনী তাঁকে হত্যা করে। তিনি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রাজাকার, আলবদরদের দৌরাত্ম্য ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককে পাকবাহিনী নিয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গেছেন এবং তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

অন্যদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৪৮ ব্যাচ এর ছাত্র ডা. নওশের আলী নিছক অসাবধানতার কারণে শহীদ হন। আবার চাঁদপুর নিবাসী ডা. সুলেমান খান ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৫৮ ব্যাচের ছাত্র। এম.বি.বি.এস. পাশ করার পর টঙ্গি জুট মিলে মেডিকেল অফিসার হিসেবে চাকুরি করেন এবং সন্ধ্যা বেলা গোপীবাগ রাশেদ মেডিকেল ফার্মাসিতে প্রাইভেট প্রাকটিস করেন। ছাত্রজীবনে বাম রাজনীতি মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং ষাটের দশকে ছাত্র আন্দোলনের একনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী ছিলেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর এই পরিচিতি থাকার কারণে ২৫ এপ্রিল

রাতে গ্রামের বাড়িতে মুসলিম লীগের সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত হন। দুর্বৃত্তদের আক্রমন সম্পর্কে তাঁর ভাই হাশেম খান বলেন,

> ... রাইফেলটা তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এই দুগা না অন্য দুগা'। তারপরই ফিসফিসিয়ে রাইফেলধারীকে বলল এ ডাক্তার, এটাই ডাক্তার। বড় ভাই উঠে দাড়ালেন (ডাক্তার) এবং বললেন টাকা দিচ্ছি কিন্তু মেয়েদের ...। তাঁর কথা শেষ হলো না। রাইফেল গর্জে উঠলো।[২১৩]

এভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত ঢাকা মেডিকেল কলেজের একাধিক ছাত্র ও চিকিৎসক নিছক সন্দেহের কারণে পাকবাহিনীর বর্বরতার শিকার হন। আবার ক্ষেত্র বিশেষে তাদের ছাত্রজীবনের রাজনৈতিক পূর্ব পরিচয় তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মেডিকেল কলেজ বা হাসপাতালে কর্মরত সরকারি চিকিৎসক ছাড়াও ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র প্রাইভেট প্রাকটিসরত চিকিৎসকদের অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা অর্থ সাহায্য ও তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষ অংশগ্রহণের কারণে বেশ কিছুসংখ্যক চিকিৎসক আলবদর, রাজাকার বা পাকবাহিনীর হাতে প্রাণ দেন। এভাবে দেখা যায় যে, সব মিলিয়ে শহীদ চিকিৎসকদের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্র, চিকিৎসকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি *[পরিশিষ্ট দেখুন-৪৬]*। আবার ঢাকা মেডিকেল কলেজের শহীদদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ এই মেডিকেল কলেজ অন্যান্য মেডিকেল কলেজের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে এই কলেজ থেকে পাশ করা চিকিৎসকের সংখ্যা বেশি ছিল, কেননা ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে ১টি মাত্র মেডিকেল কলেজ ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতাদের পাশাপাশি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে তাদের পরিচিতিই বেশি ছিল।

এই কলেজ থেকে পাশ করা চিকিৎসকদের হত্যার অন্যতম উদ্দেশ্য দেশের বুদ্ধিজীবী শ্রেণির একটা অংশকে ধ্বংস করা। রাজাকার, আলবদর, আলশামস এর সহায়তায় পাকবাহিনী কর্তৃক দেশের বরণ্য চিকিৎসকদের হত্যা ছিল হিটলারের নাৎসি বাহিনীর ইহুদি নিধনের মতো। পাকবাহিনী পরাজয় নিশ্চিত ভেবে এই দেশকে মেধাশূন্য করার জন্য দেশের সবচেয়ে মেধাবী সন্তানদের হত্যা করে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তি বাঙালি জাতির সংস্কৃতি ও বুদ্ধিসত্তাকে উৎখাত করে নিজেদের শাসন শোষণ চিরস্থায়ী করার জন্য বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা করে। তারা একদিকে বাংলার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, অন্যদিকে এগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিবর্গকে শেষ করে দেওয়ার জন্য নানারকম অত্যাচার নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যাযজ্ঞ চালায়। চিকিৎসকসহ বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগই মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণের পাশে ছিল। এই সহায়তার কারণে পাকিস্তান সরকারের ধারণা হয় যে, তাদের সাহায্য সহযোগিতার কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসকবৃন্দ এই বুদ্ধিজীবীদেরই অংশ। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সংজ্ঞায়িত করলে দেখা যায় যে, যে কোনো দেশের চিন্তাচেতনার দিক দিয়ে অগ্রসর শ্রেণিই বুদ্ধিজীবী। সাধারণ অর্থে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, আমলা, কূটনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, যারা বিভিন্ন বুদ্ধিভিত্তিক পেশায় নিয়োজিত তাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয়। এরা সমাজের গুরত্বপূর্ণ অংশ। তারা অন্যায় অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে যার যার অবস্থান থেকে প্রতিবাদ জানান। এর দ্বারা আপামর জনতা অনুপ্রাণিত হয়। এর ফলে সমাজ, রাষ্ট্র ও দেশ উপকৃত হয়। একটি দেশ ও জাতিকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করতে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। ১৯৪৬ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা চিকিৎসকগণ যখন বিদেশ থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ছাত্রছাত্রীদের উন্নতমানের চিকিৎসাশিক্ষা এবং উন্নত চিকিৎসা দিয়ে

সাধারণ মানুষের সেবা দান করেন তথা দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে থাকেন, তাদের হত্যা করা ছিল একটি দেশের চিকিৎসাশিক্ষা ও ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তোলা। অন্যদিকে চিকিৎসক হিসেবে তাদেরও বিশ্বাস ছিল যে, তাদের কেউ ক্ষতি করবে না। চিকিৎসকের কাছে কোনো শত্রুমিত্র নেই। সবার কাছে একজন চিকিৎসকের প্রয়োজন আছে। তাই দেখা যায়, অধ্যাপক ডা. ফজলে রাব্বী ও অধ্যাপক আলীম চৌধুরীর মতো চিকিৎসকগণ মানবিকতার কারণে একদিকে অ-বাঙালিদের চিকিৎসা করেছেন, অন্যদিকে মাওলানার মতো আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিয়েছেন। তারা চিকিৎসক হিসেবে অসুস্থ, আশ্রয়হীন, অসহায়কে মানুষ হিসেবে গণ্য করেছেন। ঘাতক আলবদর, আলশামস, পাকবাহিনী তা মনে করেননি, বরং তারা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে এদেশের গুণী চিকিৎসকগণকে হত্যা করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উঁচু স্তরে চিকিৎসক তৈরির মধ্য দিয়ে এই পূর্ববাংলায় একটি নতুন সামাজিক শ্রেণি সৃষ্টি হয়। পূর্বে আইনজীবী, ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবী, স্বচ্ছল কৃষক শ্রেণি থাকলেও উচ্চ শ্রেণির চিকিৎসক ছিল না। এই শ্রেণি পূর্ববাংলার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল, মেডিকেল স্কুল, মেডিকেল কলেজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা তাদের চিকিৎসা সেবার দ্বারা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতালকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি সমাজ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। তাদের নির্দেশিত চিকিৎসা সেবা রোগীদের দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল, ময়নাতদন্তের মাধ্যমে দেশের চিকিৎসক এবং আইন ও সুষ্ঠু বিচারকার্য সম্পন্ন হতে ভূমিকা রাখে। তারা দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নে সরকারকে নানা রকম পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেন। এর ফলে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। চিকিৎসাশিক্ষার মতো কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বে তারা স্থানীয় এবং জাতীয় সমস্যা সমাধানে সজাগ ছিলেন। ১৯৫০ এর দশক থেকে কলেজের নানা রকম সমস্যা, কলেজের স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপারে তারা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং তাদের আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ উক্ত সমস্যার সমাধান এবং কলেজকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। এ ছাড়া ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ১৯৬০ এর দশকের বিভিন্ন আন্দোলনে এই মেডিকেল শিক্ষার্থীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। পাকিস্তান শাসনামলে এই অঞ্চলে জনসাধারণ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, চিকিৎসা ও শিক্ষা তথা সব ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন। তাই মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী হলেও সমাজ সচেতন মানুষ হিসেবে নৈতিকতাবোধ, দেশাত্ববোধ থেকে এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণের কৃতিত্ব কেবলমাত্র এই মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের, যা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, ভাষা সৈনিকগণ স্বীকার করেন। মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের এই ধরণের দুঃসাহসিক কাজে অংশগ্রহণ প্রসংশার দাবি রাখেন। তারা কেবল চিকিৎসা সেবা দিয়ে মানুষের সেবা করেননি বরং দেশের সংকটে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশ ও মানুষের সেবা করেছেন। তারা মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাদের কেউ সরাসরি অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছেন, আবার কেউ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা, অর্থ ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছেন। অতএব তারা চিকিৎসক হিসেবে চিকিৎসা সেবা দিয়ে মানুষের রোগ প্রতিকার করার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে জীবন দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছেন। এই মেডিকেল কলেজের শহীদ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও চিকিৎসকদের তালিকা তা প্রমাণ করে।

তথ্যনির্দেশ

১. আহমদ রফিক, *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ ১৯৪৭-১৯৭১*, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩, পৃ. ৩।

২. ফখরুল আলম, *আমাদের চলচিত্র*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৭৮।

৩. অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *ঢাকা মেডিকেল কলেজ : সেবা সংগ্রাম ঐতিহ্য*, গৌরব প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ১৯।

৪. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*।

৫. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮১।

৬. নারী চরিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্র মীর্জা মাজহারুল ইসলাম বলেনম ‘ঢাকা মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় প্রিন্সিপাল ই. জি. মন্টেগোমারি ১৯৪৭ সালে যোগদান করেন। তাঁর আমলে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমাদের এক সতীর্থ বন্ধু মেয়ে সেজে মঞ্চে নাচের আসরে অংশগ্রহণ করেছিল। এতে তিনি রাগে লাল হয়ে যায়। আমাকে ডেকে কড়া ভাষায় ধমক দিয়ে এর কারণ জানতে চান। আমি আসল ঘটনা অর্থাৎ আমাদের ছেলে বন্ধুটি মেয়ে সেজে নাচানোর কথা বলতে সে সাথে সাথে হেসে বলে ‘ওয়ান্ডারফুল’। দেখুন, অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *ঢাকা মেডিকেল কলেজ : সেবা সংগ্রাম ঐতিহ্য*, গৌরব প্রকাশন, ২০১৮, পৃ. ১৯।

৭. অধ্যাপক আফজালুন্নেসা, এম. আর. মাহবুব (সম্পাদিত), *প্রথম শহীদ মিনারের স্থপতি ডা. বদরুল আলম স্মারকগ্রন্থ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৭।

৮. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৭।

৯. *ঐ*

১০. *ঐ*

১১. *ঐ*, পৃ. ৪৭।

১২. অধ্যাপক আফজালুন্নেসা, এম. আর. মাহবুব (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬।

১৩. ‘শফিকুর রসুলকে বহুদিন দেখেছি বেশির ভাগ অবধি হাসপাতালের করিডোর দিয়ে পায়চারি করতে। না, ওয়ার্ডে রোগী পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নয়, বরং দু’একজন পাশল ছাত্রবন্ধুর সঙ্গে নতুন নাটক নতুন আঙ্গিকে নাটক প্রযোজনা নিয়ে আলোচনা করতে।... তুলনায় চিকিৎসা পেশা বুঝি ছিল তার দ্বিতীয় লক্ষ্য, সেখানে পৌছানো দরকার, কিন্তু না পৌছালেও বোধ হয় চলে।’ দেখুন, আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫।

১৪. অধ্যাপক আফজালুন্নেসা, এম. আর. মাহবুব (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬ এবং আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৩।

১৫. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮।

১৬. *ঐ*

১৭. *Annual Report for 1965-66, University of Dacca*, p. 99.

১৮. ম্যাগাজিনের লেখায় উল্লেখ করা হয় ‘আজ মানুষ খুঁজতে আরম্ভ করেছে কেন মানুষের এই রোগ .... সামাজিক ও পারিবারিক কোন কারনে তাঁর vitality নষ্ট হয়েছে, ... অনাহারে কিভাবে তার শরীর অসার হয়েছে, কেন সে অনাহারে, কে তার জন্য দায়ী। অর্থাৎ এমনি করে স্তরের পর স্তর দুর্ভোগ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে জন্ম দিচ্ছে মানুষের মহা মূল্যবান social medicine .... আজ social medicine-এ শিক্ষা দিয়েছে, আসলে মানুষই বড় শত্রু, রোগজীবানু নহে। দেখুন, আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪।

১৯. ‘হাসপাতালে কোনো বেড খালি নেই বলে নিরাশায় ভগ্ন মনে সে অজানা ভবিষ্যতের পথে মৃত্যুর কাল সমুদ্রে। জনসাধারনের সরকার দয়া করে এতটুকু করুনা করে কিছু বেড বাড়ালেই এই দুর্ভাগ্যের জায়গা হতে পারে হাসপাতালে রোগ মুক্তি সংগ্রামের আদি-বর্তমান ও ভাবীকালের মনুষ্যসম্পদে।’ *দেখুন*, আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬০।

২০. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫।

২১. *ঐ*, পৃ. ৮৯।

২২. *ঐ*

২৩. অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৬।

২৪. *ঐ*, পৃ. ৯০-৯৪।

২৫. *ঐ*, পৃ. ৯৪।

২৬. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯১।

২৭. *ঐ*, পৃ. ৯২।

২৮. *ঐ*, পৃ. ৯৩।

২৯. অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*।

৩০. *Annual Report for* 1959-60, *University of Dacca*, Dacca University Press, Ramna, Dacca, p. 103.
৩১. *Annual Report for* 1960-61, *University of Dacca*, Dacca University Press, Ramna, Dacca, p. 106.
৩২. *Annual Report for* 1963-64, *University of Dacca*, Dacca University Press, Ramna, Dacca, p. 112.
৩৩. *Annual Report for* 1964-65, *University of Dacca*, Dacca University Press, Ramna, Dacca, p. 9.
৩৪. অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭১।
৩৫. *Annual Report for* 1956-57, *University of Dacca*, Dacca University Press, Ramna, Dacca, p. 65.
৩৬. *Annual Report for* 1964-65, *University of Dacca*, Dacca University Press, Ramna, Dacca, p. 9.
৩৭. *ঐ*, p. 91.
৩৮. *Annual Report for* 1963-64, *University of Dacca*, Dacca University Press, Ramna, Dacca, p. 112.
৩৯. *Annual Report for* 1966-67, *University of Dacca*, Dacca University Press, Ramna, Dacca.
৪০. এ বিষয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে প্রাক্তন ছাত্র সাঈদ হায়দার বলেন, 'ছাত্র সংসদের সভাপতি হবেন ছাত্র। আমাদের এ দাবি টেকেনি এবং শেষপর্যন্ত চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী প্রিন্সিপাল সাহেবকেই সভাপতি রেখে সংগঠনের গঠনতন্ত্র তৈরি করা হয়।' দেখুন, আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১।
৪১. *ঐ*
৪২. *ঐ*, পৃ. ৬২।
৪৩. ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২।
৪৪. *ঐ*
৪৫. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৯।
৪৬. *ঐ*, পৃ. ৭১।
৪৭. ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৪।
৪৮. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭০।
৪৯. *ঐ*, পৃ. ৭২।
৫০. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৫।
৫১. বহুচারিতার কারণ হিসেবে মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র আহমদ রফিক উল্লেখ করেন, 'আওয়ামী মুসলিম লীগে যেমন ছিল ভাসানী পন্থী বাম ও উদারগণতন্ত্রীদের উপস্থিতি তেমনি ছিল সোহরাওয়ার্দী সমর্থিত মার্কিনপন্থী গণতন্ত্রীদল, ছিল মার্কিনপন্থী রক্ষণশীল ও সম্প্রদায়বাদী খোন্দকার মোশতাক প্রমুখ সমর্থকবৃন্দ। আর বহুচারিতা সংগঠনের দুর্বলতা প্রমান করে।' দেখুন, আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫।
৫২. *ঐ*, পৃ. ৭৩।
৫৩. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৭-১১৯।
৫৪. *ঐ*, পৃ. ১১৯।
৫৫. *ঐ*, পৃ. ১৭৭।
৫৬. *ঐ*
৫৭. *ঐ*, পৃ. ৭৩।
৫৮. 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোট গণনার পর ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে। নির্বাচনে 'অভিযাত্রী' দল বিপুল ভোটের পার্থক্য রাখিয়া ২০টি আসনের সব কয়টি আসনই দখল করে। মেডিকেল কলেজ ইউনিয়নের ইতিহাসে ইউনিয়নের সব কয়টি আসন একই দল দ্বারা দখল করা এইবারই প্রথম। নির্বাচিত সহ-সভাপতি জনাব নুরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জনাব মকসুদুর রহমান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অপেক্ষা যথাক্রমে ১০০ ও ১৬৯ ভোট বেশি পাইয়া বিজয়া হইয়াছে। প্রমোদ বিভাগের সদস্য মিস হালিদা খানমের পক্ষে সর্বাধিক ভোট গৃহীত হইয়াছে।' *দেখুন*, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ নভেম্বর ১৯৫৭, শেষ পৃষ্ঠা।
৫৯. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৭৬।
৬০. *ঐ*, পৃ. ৭৭।

৬১. *ঐ*, পৃ. ৭৮।

৬২. *Annual Report for* 1968-69, *University of Dacca,* Dacca University Press, Ramna, Dacca, p. 103.

৬৩. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৮।

৬৪. *ঐ*, পৃ. ১০৫।

৬৫. *ঐ*, পৃ. ১০৮।

৬৬. *ঐ*, পৃ. ১০৮।

৬৭. সারওয়ার আলী, *পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ*, প্রথমা, ২০১০, পৃ. ৩৩।

৬৮. *ঐ*, পৃ. ৮২।

৬৯. *ঐ*, পৃ. ২৪৪।

৭০. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪।

৭১. *ঐ*

৭২. *ঐ*, পৃ. ১১৯।

৭৩. *ঐ*

৭৪. *ঐ*

৭৫. *ঐ*

৭৬. *ঐ*, পৃ. ১১১।

৭৭. অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪২।

৭৮. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১০।

৭৯. *ঐ*

৮০. *ঐ*, পৃ. ১১৩-১১৪।

৮১. *ঐ*, পৃ. ৮০।

৮২. *ঐ*

৮৩. সাঈদ হায়দার, *পিছু ফিরে দেখা*, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ২৭।

৮৪. অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫।

৮৫. *ঐ*, পৃ. ৮৩।

৮৬. ধর্মঘট পালন প্রসঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র সাঈদ হায়দার তার '*পিছু ফিরে দেখা*' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, '১১ মার্চ প্রতিবাদ দিবসে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পিকেটিং এর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ স্থান ছিল রেলওয়ে ওয়ার্কশপ। এই ওয়ার্কশপের পিকেটিংয়ে অংশ নিয়েছিলেন মেডিকেল কলেজের দুধর্ষ বামপন্থি ছাত্রকর্মী আমজাদ হোসেন ও আব্দুল হাই। ১১ মার্চের প্রতিবাদ দিবসে পুলিশের যথেষ্ট লাঠিচার্জ চলে একাধিক স্থানে। ছাত্ররা শুধু নির্যাতনের শিকারই হননি পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল অনেক ছাত্রকে। মেডিকেল কলেজের যেসব ছাত্র সেদিন গ্রেপ্তার হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিলেন মো: আলী আসগর, এম. আই চৌধুরী, জসিম উদ্দিন, এম. এ. বারী, ফরিদুল হুদা প্রমুখ ছাত্রকর্মী', দেখুন, সাঈদ হায়দার, *পিছু ফিরে দেখা*, পৃ. ২৬৯।

৮৭. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬।

৮৮. *ঐ*, পৃ. ১২৮।

৮৯. অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯।

৯০. শরফুদ্দিন আহমদ বলেন যে, 'তাঁদের ছাত্রবন্ধু হাবীবুর রহমান জোরই নাকি অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য অনেক ছাত্রকে তাতিয়ে তুলেছিল। ডাইনিং হলে খেতে খেতে নাটক দেখার প্রসঙ্গ ওঠায় জোরেই চীৎকার করে বলে ওঠেন : "কিসের ড্রামা"? উপস্থিত সবাই সমস্বরে তাঁর কথায় সমর্থন জানান। খাওয়ার পর পরিকল্পনা নেওয়া হয় কীভাবে হলঘর অন্ধকার করে দিয়ে নাটকের অনুষ্ঠান পণ্ড করতে হবে।' দেখুন, আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৯।

৯১. *ঐ*, পৃ. ১৩০।

৯২. *ঐ*, পৃ. ১২৯।

৯৩. অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৯।

৯৪. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩১।

৯৫. সাঈদ হায়দার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৭।

৯৬. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩২।

৯৭. *ঐ*, পৃ. ১৩৩।

৯৮. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৫।

৯৯. *ঐ*

১০০. *ঐ*, পৃ. ১৩৬।

১০১. 'গুলিচালনা স্বচক্ষে দেখেছি। বিকেল ৩টার দিকে মেডিকেল হোস্টেলের গেটের কাছে একজনকে শহীদ হতে দেখেছি। আর মাথার খুলি উড়ে যাওয়া একজন শহীদের লাশ আমরা ধরাধরি করে প্রথমে ইমারজেন্সিতে পরে এনাটমির হলের বারান্দা নিয়ে আসি। ... প্রথমে বুঝতে পারিনি ওরা গুলি চালিয়েছে। মনে হয়েছিল টিয়ারগ্যাস শেল ছুটছে, তাকিয়ে দেখি ১৭ নম্বর ব্যারাকের পূর্বদিকে পড়ে আছে একটি ছেলে। ততক্ষণে আরো কয়েকজন এগিয়ে এসেছেন। সঙ্গীদের মধ্যে মশাররুফ রহমান খানের কথাই মনে আছে। সে লাশের মগজটা তুলে নেয় দুই হাতে।' দেখুন, আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৮।

১০২. '...ছুটে গিয়ে পাশে বসে দেখি, ওর মাথায় গুলি লেগে ব্রেইনটা ছিটকে পড়েছে। দুই হাতে ব্রেইনটা বসে তুলে ওর পাশে রাখি। কয়েকজন ছুটে যায় স্ট্রেচার আনতে। ওকে প্রথমে হাসপাতালে, পরে এনাটমি হলের পেছনের বারান্দায় নিয়ে লুকিয়ে রাখি। ইচ্ছা, পরদিন ওর ডেডবডি নিয়ে মিছিল করবো। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আলমগীর ও আরো কয়েকজন লাশের পাহারায় ছিল অনেক রাত পর্যন্ত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে লাশ নিয়ে যায়।' দেখুন, আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৮।

১০৩. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০।

১০৪. *ঐ*

১০৫. *ঐ*, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

১০৬. *ঐ*, পৃ. ১৫০।

১০৭. এম. আর আখতার মুকুল, *বায়ান্নোর জবানবন্দী*, সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৭, পৃ. ৩১।

১০৮. অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৪।

১০৯. *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১১০. *দৈনিক আজাদ*, ১৭ এপ্রিল ১৯৬৯, পৃ. ১।

১১১. অধ্যাপক ডা. আফজালুন্নেসা, এম. আর. মাহবুব (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২।

১১২. অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৯।

১১৩. অধ্যাপক ডা. আফজালুন্নেসা, এম. আর. মাহবুব (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৮।

১১৪. *ঐ*, পৃ. ৩৪।

১১৫. অলি আহাদ বলেন, '... রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় প্রশ্নে তাঁর সাথে আমাদের মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্বীকার করতেই হয় যে, তাঁর সাহিত্যিক মন সঠিক মুহূর্তেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং সর্বপ্রকার আত্মস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে তিনি এই সংগ্রামী চেতনার সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। সত্যাশ্রয়ী ও হৃদয়বান মানুষেরা এভাবেই ইতিহাসের অগ্রযাত্রায় নিজেদের অবদান রাখেন।' দেখুন, অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি* ১৯৪৫-১৯৭৫, ৪র্থ সংকলন, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, পৃ. ১৪০।

১১৬. অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৭।

১১৭. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬।

১১৮. অধ্যাপক ডা. আবদুল কাদের বলেন, '... দুঃখ হলেও সত্যি যে, এই অবদানের স্বীকৃতি নেই। যদিও ঢাকা মেডিকেল কলেজই এ আন্দোলনের আতুরঘর তথাপি রাজনীতিবিদদের একুশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভাষণে, পত্রপত্রিকার প্রবন্ধ, রেডিও, টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ভাষা আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভূমিকা, মেডিকেল কলেজের নামটি খুঁজে পাওয়া দুস্কর; পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় বৃহত্তর স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। এ যেন ক্ষুদ্রকে অবজ্ঞা করে সত্যকে আড়াল করারই প্রয়াস।' দেখুন, অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৬।

১১৯. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০-১১।

১২০. ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৫৯ ব্যাচের ছাত্র সারওয়ার আলী বলেন, 'ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ১৯৬০ সালে আমাদের ছাত্ররাজনীতির প্রথম কর্তব্য স্থির হলো শহীদ মিনারের জন্য ফুল সংগ্রহ করা। ... কেবল শীতকালীন ফুল দিয়েই শহীদ মিনার সাজাতেন, মেডিকেল কলেজের ছাত্র নেতারা বিশেষ করে আহমেদ জামান, ইব্রাহিম খালেদ, মকসুদুর রহমান ও নুরুল আলম। দেখুন, সারওয়ার আলী, *পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩৫।

১২১. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৪।

১২২. '১৯৬০ সালে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনার সময় ইসলামী ছাত্র সংগঠনের ছাত্ররা হামলা চালায়।' দেখুন, আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৫।

১২৩. *ঐ*, পৃ. ১৯৭।

১২৪. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৮।

১২৫. সারওয়ার আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯।

১২৬. এ প্রসঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র জহুরুল মাওলা বলেন, 'আহমেদ জামান ভাই (সহ-সভাপতি, ১৯৬১-৬২) ছাত্র সংসদ বা ছাত্র ইউনিয়ন) নুরুল আলম প্রমুখের সময় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমাদের জয় ক্যাম্পাসে বাম-রাজনীতির ভিত আরো শক্তিশালী করে তোলে। তখনকার মেডিকেল ছাত্রসংসদের অফিস ছিল কলেজের সিড়ির নীচের একটা রুমে। কিন্তু এখানেই এ দেশের তদানীন্তন রাজনীতির অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়'। দেখুন, আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৯।

১২৭. সারওয়ার আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯।

১২৮. মোহাম্মদ হাননান তাঁর '*বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'ঢাকা মেডিকেল কলেজের সুসংগঠিত দল সমগ্র মিছিলের গতিপথ পরিবর্তন করে নাজিমউদ্দিন রোড দিয়ে পুরোনো ঢাকায় মিছিল চলে এলে সাধারণ মানুষ এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। সঙ্গে, সঙ্গে এখানে অনির্ধারিত হলেও হরতাল পালিত হয়ে যায়।' দেখুন, আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৯।

১২৯. 'ষাটের দশকের মেডিকেল হোস্টেলের রাজনৈতিক ছাত্রগণ তাঁদের ব্যারাকবাসী পূর্বসুরী ছাত্রদের ঐতিহ্য, অনুসরণ করেছেন। যেমন রাজনীতিকদের নিরাপদ আশ্রয় দানের ক্ষেত্রে, তেমনি হোস্টেল কক্ষে বৈঠকের নিয়মিত ব্যবস্থাপনা করে। দেখুন, আহমেদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৩।

১৩০. আহমেদ রফিক, *পূর্বোক্ত।*

১৩১. সারওয়ার আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৬।

১৩২. *ঐ*, পৃ. ৪৭।

১৩৩. সাক্ষাৎকার, ডা. সারওয়ার আলী, বয়সঃ ৭৭ (জন্মঃ ১৯৪৩), ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৫৯ ব্যাচের ছাত্র ও ১৯৬৪-৬৫ সালের কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি (১৯৬৩), বি. এম. এর মহাসচিব (১৯৭২-৮৫), বর্তমানঃ বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির যুগ্ম মহাসচিব, বারডেম হাসপাতাল ও ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজের নির্বাহী, তারিখ : ৬/৪/২০২০।

১৩৪. *ঐ*

১৩৫. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*।

১৩৬. '... আশিকুল আলমের নেতৃত্বেই রফিকুল হাসান জিন্নাহ্‌, আমিনুল হাসান রিন্টু, কবির, সিরাজ, ফ্রান্সিস রোজারিও, ফওজিয়া মোসলেম, নিলুফার সুলতানা নীলা, রেখা, নেলীসহ মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রথম কালো পতাকা উত্তোলন করে এবং প্রথম প্রতিবাদ সমাবেশ ও এক বিরাট শোকমিছিল বের করে।' দেখুন, আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৯।

১৩৭. *দৈনিক আজাদ*, ২১ জানুয়ারি ১৯৬৯।

১৩৮. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১০।

১৩৯. *ঐ*, পৃ. ২১৩।

১৪০. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৫০, পৃ. ২।

১৪১. 'কোনো প্রাদেশিক মেডিকেল কাউন্সিলে রেজিস্ট্রার্ড অথবা রেজিস্ট্রার্ড হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন সে সমস্ত পাকিস্তানি নাগরিকের বয়স ১৯৫০ সালের ১৪ জানুয়ারির মধ্যে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের করাচীস্থ স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের অফিসের এ্যালোকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট তাঁহাদের নাম রেজিস্ট্রি করিতে হইবে। এই সমস্ত ব্যক্তির পাশের তারিখ, চিকিৎসা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা এবং প্রাসঙ্গিক বিবরণ রেজিস্ট্রি ডাকে সরকারের নকিট পাঠাইতে হইবে অন্যথা তাঁহারা আইনানুযায়ী দন্ডিত হইবেন।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৫০, পৃ. ২।

১৪২. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৩।

১৪৩. *ঐ*

১৪৪. 'পূর্ববঙ্গের গৌরব নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী ও অব্যবস্থা সম্পর্কে নানাকথা শোনা যায়। প্রকাশ, উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের কর্ম-অকুশলতা ও অবিচারের জন্যই কলেজের ও হাসপাতালের কার্যে নানারূপ বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। যেসব অভিযোগ ইতিমধ্যে আমাদের গোচরে আসিয়াছে তন্মধ্যে নিম্নোদ্ধৃতগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ–

১. ডা. নওয়াব আলী আহমেদ-এর উক্ত কলেজের রেজিস্ট্রার পদে নিয়োগের আদেশ গোপন করিয়া একজন জুনিয়র ডাক্তারকে ঐ পদে স্থাপন;

২. ডা. এম রহমানের রেসিডেন্ট সার্জন পদে নিয়োগ ও বিশেষ কারণে তাঁহার যথার্থ কর্তব্য সম্পাদনে অসুবিধা;

৩. ডা. সাহাদাত আলী খাঁর ১৯৫০ সনের ৩০শে অক্টোবর তারিখে 'এনাটমী' শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ এবং অজ্ঞাত কারণে ঐ আদেশ বাতিল হইয়া ১৯৫০ সনের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে অপর একজন সম্পূর্ণ নতুন ডাক্তারের উক্ত পদে বিশেষ নিয়োগ;

৪. চারজন আর. এম. ও-র মধ্যে জরুরি কার্যে নিযুক্ত তিন জনের হাসপাতালের বাহিরে থাকিতে বাধ্য হওয়া প্রভৃতি। জনসাধারণ আশা করেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।' দেখুন, *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫০, পৃ. ৩।

১৪৫. 'ঢাকা মেডিকেল কলেজের নানা অব্যবস্থা সম্পর্কে কতকগুলি অভিযোগপত্র পাওয়া গিয়েছে। পত্রগুলিতে যে সকল অভিযোগের অবতারনা করা হইয়াছে সেগুলি বিশেষভাবে গুরুতর ও অনুধাবনযোগ্য। অভিযোগকারিগণ আরও বলিতেছেন যে, মেডিকেল কলেজ ও তৎসংশ্লিষ্ট হাসপাতালে সম্পূর্ণ দলীয় ব্যবস্থা এবং স্বেচ্ছাচারের রাজত্ব চলিতেছে। মেডিকেল স্কুল ও মিটফোর্ড হাসপাতালেও অনুরূপ অব্যবস্থা কিনা তাহাই বা কে বলিবে। যাহা হউক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সম্পর্কিত অভিযোগ সত্য হইলে আশঙ্কা ও পরিতাপের বিষয়। হাজার হাজার মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন যেখানে একমাত্র প্রশ্ন, সেখানে যদি দলাদলীর স্বার্থদ্বন্দ্ব চলিতে থাকে তবে ভবিষ্যত তমসাচ্ছন্ন।' *দেখুন, ঢাকা প্রকাশ*, ৭ জানুয়ারি ১৯৫১, পৃ.২।

১৪৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৫৩, পৃ. ২।

১৪৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ জুন ১৯৫৬, পৃ. ৬।

১৪৮. *ঐ*

১৪৯. *ঐ*

১৫০. *ঐ*

১৫১. *ঐ*

১৫২. *ঐ*

১৫৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ জুলাই ১৯৫৬, পৃ. ৬।

১৫৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ জুলাই ১৯৫৬, পৃ. ৬।

১৫৫. 'স্কুলের ছাত্রদের দাবি যে, তাঁহারা সরাসরি দুই বৎসরে সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. ভর্তি হইতে চান। ইহাতে তাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে ৬ বৎসরের কোর্সে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি পাইতে চান। তদুপরি তাঁহাদের মাত্র একবার ৬টি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দিতে হয়। অন্যদিকে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের প্রথমে আই. এস. সি দুই বৎসর। তারপর মেডিকেল কলেজে সাড়ে পাঁচ বৎসরের কোর্সে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি পরীক্ষায় ১০ টি বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে হয়। সুতরাং দাবি অনুযায়ী ব্যবস্থা হইলে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের দেড় বৎসরের কোর্স বেশী অধ্যয়ন করিতে হইবে এবং এই অসাম্যের জন্য তাহাদের ব্যবহারিক জীবনে উক্ত সময়ের পশ্চাতে রহিতে হইবে। উপরি-উক্ত বিষয় সমূহের বিচার-বিবেচনার পরে সরকার এল. এম. এফ পাশ ডাক্তারদের জন্য সরাসরি তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত কোর্সের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। সর্বশেষ আমরা সংগ্রামী স্কুল ভাইদের ছাত্র ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহারের অনুরোধ করিতেছি।' *দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬, পৃ. ৬।

১৫৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬, পৃ. ৬।

১৫৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬, পৃ. ১।

১৫৮. 'মেডিকেল কলেজ আরও ১০ টা হউক, ইহা ইচ্ছা প্রদেশব্যাপী কামনা করে। সেই সাথে আমরা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও একমত। তবে মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের কোর্স আই. এস. সি. সহ সাড়ে সাতবছর এবং মেডিকেল স্কুলের কোর্স ৪ বছর। কাজেই নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে এল.এম.এফ ডাক্তারগণকে সাড়ে তিন বছরের কোর্সে মেডিকেল কলেজে পড়িতে দেওয়া উচিত এবং এই ব্যাপারে এমন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন, যাহাতে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা না হয়।' দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬, পৃ. ১।

১৫৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬, পৃ. ৬।

১৬০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ নভেম্বর ১৯৫৬, পৃ. ১।

১৬১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ জানুয়ারি ১৯৫৭, পৃ. ৩।

১৬২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭, পৃ. ২।

১৬৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, পৃ. ৫।

১৬৪. 'প্রস্তাবগুলো হলো,

১. প্রথমবর্ষ এম.বি.বি.এস.-এর ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেলে স্থান দেওয়ার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ।
২. কলেজের ছাত্রদের বেতন ধার্য।
৩. হোস্টেলে সিট রেন্ট কমিয়ে বছরে ৪০ টাকা।
৪. প্রথম বার্ষিক এম.বি.বি.এস. পরীক্ষা হতে কেমিস্ট্রির বিলুপ্তি সাধন।
৫. ইন্টার্নি ডাক্তারদের ৬ মাস ইন্টার্নি কোর্স শেষ করার সাথে সাথে হোস্টেল হতে ভিন্ন স্থানে আবাসস্থান দান।
৬. ডেমনস্ট্রেটরদের বেতন বৃদ্ধি।
৭. মেডিকেল কলেজের শিক্ষকদের জন্য ফ্রি বাসস্থানের ব্যবস্থা।
৮. মেডিকেল কলেজের চতুর্থর শ্রেণির কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি।
৯. কনডেন্সড কোর্সের পরিবর্তে ডিগ্রি কোর্স শব্দটির প্রচলন এবং কনডেন্সড চিকিৎসকদের বেতন এই কলেজের ছাত্রদের অনুরূপকরণ।
১০. এম.এম.এফ ছাত্রদেরকে এম.বি.বি.এস. কোর্সে সামিল করা।
১১. মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্টকে হোস্টেলের কম্পাউন্ডে ফ্রি ও সুসজ্জিত একটা কোয়ার্টার তৈরি করে দেওয়া এবং এস. এম হলের প্রভোস্টের সমান ক্ষমতা ও মর্যাদা দান।
১২. মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুইটি খেলার মাঠ ও দুইটি আধুনিক ধরনের ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থা করা।

১৩. মেডিকেল কলেজের কোর্স ও সিলেবাস আধুনিক ও উন্নতকরণ, একজন পরীক্ষককে পরপর তিনবার এবং বেশি কোনো কলেজ পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত না করা।

১৪. মেডিকেল কলেজকে আধুনিক ও উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা এবং কলেজের ছাত্রদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আরো বৃত্তি মঞ্জুর করার দাবি জানানো হয়।' *দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৪ অক্টোবর ১৯৫৭, পৃ. ৩।

১৬৫. *ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রসঙ্গে*, '২৯ শে অক্টোবর ঢাকার কোন একটি পত্রিকায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১৫ নং ওয়ার্ডের মহিলা রোগীদের প্রতি কতিপয় মেডিকেল ছাত্রের আপত্তিকর ব্যবহার প্রদর্শন সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়, গতকল্য বৃহস্পতিবার ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের এক সাধারণ সভায় উহা আজগুবী, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং উক্ত পত্রিকার বিরুদ্ধে কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি জনাব আবদুল হালিম। এই ভিত্তিহীন সংবাদের প্রতিবাদে মেডিকেল ছাত্রগণ গতকল্য প্রতীক ধর্মঘট পালন করে।' *দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক*, ১লা নভেম্বর ১৯৫৭, পৃ. শেষ।

১৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৮ মার্চ ১৯৫৯, পৃ. ৩।

১৬৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ নভেম্বর ১৯৬৩, শেষ পৃষ্ঠা।

১৬৮. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৬৩, শেষ পৃষ্ঠা।

১৬৯. *দৈনিক আজাদ*, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১, শেষ পৃষ্ঠা।

১৭০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৬৩, শেষ পৃষ্ঠা।

১৭১. *দৈনিক আজাদ*, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৩, শেষ পৃষ্ঠা।

১৭২. সারওয়ার আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৮।

১৭৩. *দৈনিক আজাদ*, ২৬ নভেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১, শেষ পৃষ্ঠা।

১৭৪. সাক্ষাৎকার, জাতীয় অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন, বয়স: ৮২ (জন্ম: ১৯৩৯) ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী (১৯৫৫-৫৬), চেয়ারম্যান, গ্রীন লাইফ কলেজ ও হসপিটাল, তারিখ: ২২.২.২০২০।

১৭৫. *দৈনিক আজাদ*, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৬৩, শেষ পৃষ্ঠা।

১৭৬. *দৈনিক আজাদ*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১।

১৭৭. *দৈনিক আজাদ*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১।

১৭৮. 'মেডিকেল কলেজে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা চলতে থাকার ফলে সরকার যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ... মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টরকে লাঞ্ছিত ও প্রহার করে। সর্বোপরি শুধু যে, নয়া মেডিকেল গ্রাজুয়েটগণই হাউজ ফিজিশিয়ান ও হাউস সার্জন হিসেবে তাদের কর্তব্য পালনে বিরত থেকেছিলেন, মেডিকেল ছাত্রগণ ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রায় ৭০০ রোগীকে দেখাশোনা করার ব্যাপারে ডাক্তারদের বাধাদান করেন। অধুনা স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণও উচ্ছৃঙ্খল আচরণে প্রবৃত্ত হয়। ... এই ধরনের অবাধ্যতা ও গুণ্ডামি চলতে থাকায় এবং মেডিকেল ছাত্রগণ এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করায়, সরকার শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনসাধারণের স্বার্থে হাসপাতালের কাজ অবাধে চালু রাখার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।' *দেখুন, দৈনিক আজাদ*, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১।

১৭৯. *দৈনিক আজাদ*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৬৩।

১৮০. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২০৩।

১৮১. সারওয়ার আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৩।

১৮২. *ঐ*, পৃ. ১৪৮।

১৮৩. *ঐ*, পৃ. ১৪৮-১৪৯।

১৮৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯৬৫।

১৮৫. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৪।

১৮৬. সারওয়ার আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১।

১৮৭. *Annual Report for* 1959-60, *University of Dacca*, Dacca University Press, Ramna, Dacca, p. 103.

১৮৮. *দৈনিক আজাদ*, ২৫ এপ্রিল ১৯৬৯, পৃ. ১, ৪।

১৮৯. সাক্ষাৎকার, অধ্যাপক ডা. নাজমুন নাহার (শিশু বিশেষজ্ঞ), বয়স: ৭২ (জন্ম: ১৯৪৭), ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্রী (১৯৬৪-৬৫), বারডেম, তারিখ: ২/৭/২০১৮।

১৯০. অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম. আর. মাহবুব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪।

১৯১. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৭।

১৯২. *ঐ*

১৯৩. *ঐ*

১৯৪. সারওয়ার আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯১।

১৯৫. ড. শাহ আলম, *সমকালীন আন্তর্জাতিক আইন*, নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩৫৯।

১৯৬. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১৭।

১৯৭. প্রকৌশলী ইফতিখার কাজল (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ চিকিৎসক স্মৃতিকথা*, প্রথম খণ্ড, রক্তঋণ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩১-৫৫।

১৯৮. আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২১।

১৯৯. সারওয়ার আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯২।

২০০. *ঐ*, পৃ. ১০১।

২০১. 'থিয়েটার রোডে মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের সদর দপ্তরের সামনে একটি স্থায়ী মঞ্চ থেকে তৎকালীন জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা কবরী ও আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়। কবরী আবেগপূর্ণ পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা, নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সংবাদপত্রে প্রচার লাভ করে।' *দেখুন*, সারওয়ার আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৭

২০২. *ঐ*, পৃ. ১০৯।

২০৩. '... চেনা হয়ে উঠেছে ডা. জাফরউল্লাহ্ চৌধুরী, ডা. এম এ মোবিন। এরা দু'জনে ইংল্যান্ডে এফ. আর. সি. এস. পড়ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস. পাশ করে বিলেতে চার বছর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর যখন এফ. আর. সি. এস. পরীক্ষা মাত্র এক সপ্তাহ পরে, তখনই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু। ছেলে দুটি পরীক্ষা বাদ দিয়ে বাংলাদেশ আন্দোলনে অংশ নিল, পাকিস্তানি নাগরিকত্ব বর্জন করল, ভারতীয় ট্রাভেল পারমিট যোগাড় করে দিল্লিগামী প্লেনে চড়ে বসল। উদ্দেশ্য ওখান থেকে কলকাতা হয়ে রণাঙ্গনে যাওয়া। প্লেনটা ছিল সিরিয়ান এয়ারলাইনস-এর। দামাস্কাসে পাঁচ ঘণ্টা প্লেন লেট, সব যাত্রী নেমেছে। ওরা দুজন আর প্লেন থেকে নামে না। ভাগ্যিস নামেনি। এয়ারপোর্টে এক পাকিস্তানি কর্নেল উপস্থিত ছিল ঐ দু'জন পলাতক পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেপ্তার করার জন্য। প্লেনের কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না, কারণ প্লেন হলো ইন্টারন্যাশনাল জোন। দামাস্কাসে সিরিয়ান এয়ারপোর্ট কর্মকর্তা ওদের দুজনকে জানিয়েছিল– ওদের জন্যই প্লেন পাঁচ ঘণ্টা লেট। এমনিভাবে ওরা বিপদের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত মে মাসের শেষাশেষি সেক্টর টু রণাঙ্গনে গিয়ে হাজির হয়েছে।' দেখুন, জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, সন্ধানী প্রকাশ, ১৯৮৬, পৃ. ১৬১-৬২।

২০৪. সারওয়ার আলী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮।

২০৫. *ঐ*, পৃ. ১৪৬।

২০৬. 'আর পঁচিশে মার্চের দিন কয়েক ঘন্টা পর পাক-অপারেশনে বহুসংখ্যক আহতের শল্যচিকিৎসায় নির্ঘুম দিনরাত কাটানোটা তো ছিল চিকিৎসক হিসেবে দায়। তবে গোটা সময়টা মিটফোর্ডে ও অন্যত্র মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও অর্থসাহায্য করাটা ছিল স্বাদেশিকতার দায়। দুঃখের বিষয় ঐ পরিচিত গ্রুপের একজনও বেঁচে থাকেনি। মিটফোর্ড হাসপাতালের সার্জারি ও এসব কাজে ডা. মাওলার সহযোগী চিকিৎসকদের মধ্যে ছিলেন সুলতানা আহমেদ, মুরিদ আলী, সিতারা মির্জা, আশীষ প্রমুখ।' দেখুন, আহমদ রফিক, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৬।

২০৭. তসলিমা কবির ও এম. আর. মাহবুব (সম্পাদিত), *শল্য চিকিৎসক ও ভাষা সৈনিক অধ্যাপক এম কবির উদ্দিন আহমেদ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ৪৩।

২০৮. প্রকৌশলী ইফতিখার কাজল (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ০৯।

২০৯. *ঐ*

২১০. *ঐ*, পৃ. ১৯।

২১১. *ঐ*, পৃ. ৫১।

২১২. *ঐ*, পৃ. ২৩।

২১৩. *ঐ*, পৃ. ৩৭।

উপসংহার

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতের ঔপনিবেশিকতার প্রথম দিকে ইংরেজ শাসকগণ প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থায় কোনো হস্তক্ষেপ করেনি, বরং ইংরেজ চিকিৎসকগণের সহকারী হিসেবে দক্ষ দেশীয় চিকিৎসকদের সামরিক ও বেসামরিক কাজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১) ও কলকাতা সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪) প্রতিষ্ঠিত হলে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষার সাথে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির ক্লাস শুরু হয়। ১৮৩৫ সালে কলকাতা মাদ্রাসা ও কলকাতা সংস্কৃত কলেজের চিকিৎসাশিক্ষার ক্লাস বন্ধ করে দিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার অবনতি শুরু হয়। দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা সরকারি পৃষ্ঠপোষকহীনভাবে চলছিল। এটা কবিরাজদের নিজ উদ্যোগে চলতে থাকে। এরপর (১৮৩৫) থেকে ব্রিটিশ সরকারের একটি সুনির্দিষ্টনীতি অনুসারে ভারতে দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার কোনো স্থান ছিল না, ছিল শুধু পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবস্থা। ব্রিটিশ শাসকদের লক্ষ্য হলো পাশ্চাত্য জ্ঞান ক্রমান্বয়ে ভারতীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। তাদের এই নীতি সাধারণ শিক্ষা থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষা পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করে। এটা ছিল ব্রিটিশদের ক্ষমতা ও জ্ঞানের আধিপত্য, কারণ তাদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষা প্রচলন করা সম্ভব হয়। এই আধিপত্যের প্রভাব কেবল কলকাতা নয় পূর্ববাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ববাংলার প্রথম পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষার কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের জ্ঞানের আধিপত্য আরো বিস্তার লাভ করে। এই মেডিকেল কলেজ পাশ্চাত্য জ্ঞানের আধিপত্যের ফসল হলেও পূর্ববাংলার সুশীল সমাজ, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদসহ সর্বসস্তরের জনসাধারণ পাশ্চাত্যের উঁচুস্তরের এই চিকিৎসাশিক্ষাকে স্বাগত জানায়। কারণ তাঁরা ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তৎকালীন ভারত সরকারের কাছে দাবি জানায়।

ইতিমধ্যে এই অঞ্চলের জনগণ পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবস্থার ইতিবাচক দিক ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অবগত হয়। তারা পূর্ববাংলার ঢাকায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়। অর্থনৈতিক কারণে এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হতে থাকলে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি তথা জগমোহন পাল এর অনুদানের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে।। ব্যক্তি উদ্যোগের প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করেই সরকারি পর্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতা শুরু হয়। অর্থ্যাৎ ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় সরকারি বেসরকারি উভয় দিক থেকে সহায়তা করা হয়, তবে ব্যক্তি প্রচেষ্টার পরিমাণ সামান্য হলেও সরকারি পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সহায়তা করা হয়। সরকারি বেসরকারি উভয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে পূর্ববাংলার প্রথম মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে এই অঞ্চলের জনগণের চাওয়া পাওয়া পূরণ হয়। এর ফলে একদিকে যেমন উন্নত চিকিৎসক শ্রেনি তৈরির পথ সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে পূর্ববাংলার সর্বসাধারণ এই চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত ছিল।

পূর্ববাংলার প্রথম মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজের মান যাতে বিশ্বমানসম্মত হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। এজন্য কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুতে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাবী এবং কম মেধাবী ছাত্রদের প্রাক-মেডিকেল পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়। এ ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণকে উপেক্ষা করা হয় বরং মেধাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের (হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, তপশিলি) জন্য সুনির্দিষ্ট আসন বরাদ্দ থাকলেও যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে তা অন্য সম্প্রদায়ের যোগ্য প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা হয়। উপরন্তু ভর্তির ক্ষেত্রে এই মেডিকেল কলেজ অসাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দেয়। পূর্ববাংলা মুসলমান অধুষ্যিত

অঞ্চল হলেও মেডিকেল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বিপুল সংখ্যক হিন্দু শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ভর্তি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা যেন না হয়, এই ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ পূর্ব থেকেই সজাগ ছিলেন। তৎকালীন সময়ে নারী শিক্ষার হার কম হওয়ায় এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার বেশি হওয়ায় নারীরা যাতে চিকিৎসক হয়ে এই অঞ্চলের মা ও শিশুর সুচিকিৎসা দিতে পারে, সেজন্য নারীদের জন্য কিছু আসন (১০টি) সংরক্ষণ করা হয়। প্রথম ব্যাচে দুইজন ছাত্রী ভর্তি হলেও পূর্ববাংলার কোনো নারী শিক্ষার্থী পাওয়া যায়নি। ভর্তি প্রক্রিয়াকে যথেষ্ঠ যাচাই বাছাই করে সম্পন্ন করা হয়। কখনও কখনও জেনারেল কমিটির চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। জেনারেল কমিটি কর্তৃক অযোগ্য ছাত্রকে ভর্তির জন্য সুপারিশ করা হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি তা নাকচ করে দেয়।

মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম এক (১) বছরের মধ্যে দেশ বিভাগ হলে কলেজে পুনরায় ভাঙ্গা গড়া প্রক্রিয়া শুরু হয়। কলেজের অধিকাংশ হিন্দু শিক্ষক, ছাত্র কলকাতা মেডিকেল কলেজে চলে যায় এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজের পূর্ববাংলার ছাত্ররা ঢাকা মেডিকেল কলেজে চলে আসে। শুরুতে এই মেডিকেল কলেজের সাজসরঞ্জামাদি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, অবকাঠামোগত অভাব বিদ্যমান ছিল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রথম দশ (১০) বছরের মধ্যে এই মেডিকেল কলেজ পরিপূর্ণতা লাভ করে। মেডিকেল কলেজের মান বিশ্বমানসম্মত করার জন্য দক্ষ দেশি বিদেশি শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এই দক্ষ শিক্ষকগণ কলকাতা মেডিকেল কলেজের ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতা নিয়ে পূর্ববাংলায় আসে। এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই মেডিকেল কলেজের শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে। ফলে সদ্য প্রতিষ্ঠিত নতুন রাষ্ট্রের নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের অগ্রগতি আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ঘাটতি পূরণের জন্য দেশ বিভাগের কারণে উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্ববাংলার যে অংশ প্রাপ্য ছিল তা পশ্চিম বাংলার সাথে ভাগাভাগি করার প্রস্তাব করা হয়। এ ছাড়া বিপুল পরিমাণে যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে ক্রয় করা হয়। দেশ বিভাগের পরপরই ঢাকা মেডিকেল কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। এই উন্নয়ন সময়ের প্রয়োজনের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। যে কারণে মেডিকেল কলেজ ভবনকে কখনও সংযোজন ও পরিবর্তন করা হয়। এই উন্নয়নের ধারা চলমান ছিল এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন ও সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

শুরুতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের নানা রকম সমস্যা থাকলেও শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান অব্যাহত ছিল, কেননা কলেজে কিছু বিভাগ (গাইনোকোলজি, সংক্রামক রোগ, নাক, কান, গলা ও দন্ত) ভালোভাবে সুসজ্জিত না হওয়ায় মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুলে পাঠদান সম্পন্ন হতো। চিকিৎসাশিক্ষার অন্যতম একটি বিষয় হলো এনাটমি। শুরুতে এই কলেজে ডাইসেকশন হল না থাকায় প্রথম তিনমাস ডাইসেকশন ক্লাস মিটফোর্ড হাসপাতালে নেওয়া হতো। পরবর্তীতে দেশ বিভাগের কারণে এনাটমির ক্লাস বন্ধ থাকেনি। পুরাতন শিক্ষক চলে গেলেও নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠার শুরুর দিক এবং দেশ বিভাগের কারণে সাময়িক সমস্যা হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, বরং দেশ বিভাগের পর মেডিকেল কলেজের উন্নয়ন দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়। এই উন্নয়নের ওপর কলেজের স্বীকৃতির ব্যাপারটি জড়িত ছিল। স্বীকৃতির দ্বারা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাশিক্ষার মান বিশ্বমানসম্মত কিনা তা নির্দেশ করে। পাকিস্তান শাসন আমলের শুরুতে স্বীকৃতির ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষের রক্ষণশীল মনোভাব ও উদাসীনতা থাকলেও ছাত্রছাত্রীর দাবির কাছে এবং পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক কলেজে ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করায়

স্বীকৃতির ব্যাপারটি গুরুত্ব পায়। তাই কলেজ কর্তৃপক্ষ স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কলেজের উন্নয়নের ব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। এই উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল এবং ১৯৫৭ সালে ব্রিটিশ জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল ঢাকা মেডিকেল কলেজকে স্বীকৃতি দেয়। ব্রিটিশ জেনারেল মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপরটি ছিল এই কলেজের জন্য বিরাট সফলতা। এর দ্বারা ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসাশিক্ষার পঠন পাঠন, সিলেবাস, শিক্ষক, চিকিৎসাশিক্ষা পদ্ধতি তথা কলেজের সামগ্রিক চিকিৎসাশিক্ষার ব্যবস্থা যে বিশ্বমানের, তা নিদের্শ করে। এই কারণে ঢাকা মেডিকেল কলেজকে 'এডিনবার্গ অব দি ইস্ট' বলা হয়। এই ব্যাপারে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা বাষির্কীতে উল্লেখ করা হয় যে,

> এডিনবার্গ অব দি ইস্ট বলার পেছনে কারণ ছিল সর্বোচ্চ মানের শিক্ষক মন্ডলী শিক্ষা পদ্ধতি সহ দেশের সবচেয়ে বড় মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর পাশাপাশি মেধাবী ছাত্রদের সমাগম।[১]

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে ভারত উপমহাদেশে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষা প্রবর্তনে বাধার সম্মুখীন হলেও পূর্ববাংলা কোনো বাধার সম্মুখীন হয়নি। ব্রিটিশ শাসন আমলের সমাপ্তির পরে পাকিস্তান শাসন আমলে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য ব্যাপক আন্দোলন করতে হয়। এ ছাড়া কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসকগণ পেশাগত মর্যাদা, উচুঁস্তরের বেতনভাতার জন্য আন্দোলন করে। তাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৮ সালে সরকারি চাকুরিরত চিকিৎসকদের প্রথম শ্রেনির কর্মকর্তার দাবি এবং ১৯৭০ সালে সদ্য পাশ করা চিকিৎসকদের ইন্টার্নিশিপ ব্যবস্থার দাবি মেনে নেয়। পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ অন্যান্য মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলেও চিকিৎসকের স্বল্পতা ছিল। এর অন্যতম কারণ ছিল জনসংখ্যা অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা কম। পাশ করা চিকিৎসকদের বেশিরভাগ উল্লিখিত উপযুক্ত সুযোগসুবিধা না পাওয়ায় বিদেশ গমন করে। ১৯৫৯ সালে করাচিতে বিজ্ঞান মেডিকেল ইনস্টিটিউট উদ্বোধনের সময় প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান বলেন,

> উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তারের অভাব দেশের একটি প্রাথমিক সমস্যা ছিল। তবে কতিপয় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করায় এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়। কিন্তু এখনও যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তারের অভাব রয়েছে।[২]

১৯৬০ এর দশকের শুরু পর্যন্ত পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে শুধুমাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্ররা বের হতো। একটি মাত্র মেডিকেল কলেজের পাশ করা ছাত্রদের দ্বারা সমগ্র দেশের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এই মেডিকেল কলেজের অধিকাংশ ছাত্র চাকুরি ও উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে চলে যেত। এর ফলে চিকিৎসকদের ঘাটতি বরাবরই বিদ্যমান ছিল। ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারি চিকিৎসক সমিতির অনুষ্ঠিত এক বার্ষিক সাধারণ সভায় সার্বজনীন চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এবং সকলের ঘরে সমানভাবে চিকিৎসার সুযোগসুবিধা পৌছে দেওয়ার জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের দাবি জানানো হয়।[৩] এ ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মতো চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে আনার প্রস্তাব করা হয়। এজন্য উপযুক্ত চিকিৎসকগণকে যথাযথ বেতন ও ভাতা দিয়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল ও বিভিন্ন হাসপাতালে নিযুক্ত করার দাবি জানানো হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশ করা চিকিৎসকগণ বেশিরভাগ রাজধানী ঢাকাসহ, জেলা শহর হাসপাতালগুলোতে চাকুরি করত। মফস্বলে তাঁরা চাকুরি করত না। তৎকালীন সময়ে এই মেডিকেল কলেজের পাশ করা চিকিৎসকগণ সরকারি চাকুরিতে সুযোগসুবিধা কম থাকায় ৮০% বিদেশে চলে যেতেন। ফলশ্রুতিতে দেশে

উপযুক্ত, দক্ষ, চিকিৎসকের ঘাটতি ছিল। এ ব্যাপারে ১৯৬৯ সালের *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকা থেকে জানা যায় যে

> দেশে ডাক্তারের সংখ্যাসল্পতার কথাও এ প্রসঙ্গে আসিয়া পড়ে। ডাক্তারি পাশ করার পর থেকেই গ্রামে যেতে চান না কিংবা সুযোগ পাইলে বিদেশে গিয়া দেশের কথা ভুলিয়া যান।[৪]

তৎকালীন সময়ে চিকিৎসকদের এই সুযোগসুবিধা কম থাকার জন্য পাকিস্তান শাসক শ্রেনি দায়ী ছিল। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের চিকিৎসকদের সবধরনের সুযোগসুবিধা দিলেও পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসকগণের সুযোগসুবিধা দিতে অনীহা প্রকাশ করে। পাকিস্তান শাসন আমলে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈষম্যসহ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চরম বৈষম্য দূর করার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। তারাই স্বাস্থ্যখ্যাতের এই বৈষম্য দূরীকরণের নেতৃত্ব দেয়। যা পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সকল চিকিৎসক তাদের প্রাপ্য মর্যাদা পেতে সক্ষম হন। এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগের সাথে পাকিস্তান ঔপনিবেশিক যুগের পার্থক্য ছিল। ব্রিটিশ শাসকবর্গের ঔপনিবেশিক ভারতে রাজনৈতিক, খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তকরণ, সামরিক, সাম্রাজ্যিক আধিপত্য স্থাপনে মুখ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হলেও পাশ্চত্য জ্ঞানের আধিপত্য দ্বারা এই দেশের সমাজে যেসব কুসংস্কার ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় অবৈজ্ঞানিক চর্চা রয়েছে, তা দূর করা তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে যুগান্তরী ভূমিকা পালন করে। যার সুফল সমগ্র ভারতবর্ষের জনগণ আজও ভোগ করছে। পাকিস্তানি শাসকবর্গ ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজের উন্নয়নে তেমন কোনো আগ্রহ দেখাননি। উপরন্তু এই দেশীয় কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পাকিস্তানি শাসকবর্গের সামনে উপস্থাপন করেননি। ফলে কলেজের উন্নয়নসহ জনস্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। এসব বৈষম্য চিহ্নিতকরণ ও দূরীকরণে এই মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের আরেকটি লক্ষনীয় দিক হলো কোনোরকম সামাজিক বিধি নিষেধ ও কলেজ কর্তৃপক্ষের বাধা ছাড়াই এই অঞ্চলের নারী শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়। সামাজিক প্রতিবন্ধকতা তেমন না থাকায় চল্লিশের দশকের চেয়ে পঞ্চাশের দশক থেকে বিপুল সংখ্যক ছাত্রী মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কলেজে ভর্তি হয়। এসব পাশ করা ছাত্রীরা পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের নারীদের চিকিৎসাসহ সমগ্র জনগণের চিকিৎসা সেবায় গুরত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছে। তাদের চিকিৎসায় বহু মা ও শিশু সুস্থ হয়েছে। পূর্বে যেখানে সন্তান জন্মদানের সময়ে মাতৃমৃত্যু স্বাভাবিক ছিল, বর্তমান সময়ে এটা কল্পনাও করা যায় না। ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে অনেক জটিল অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান জন্মদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই কলেজের ছাত্রীদের দক্ষ হাতে প্রতিবছর স্বাভাবিক ও সিজারের মাধ্যমে সন্তান ভূমিষ্ঠ লাভ করছে। ফলে অনেক মা ও শিশু প্রসবকালীন জটিলতা ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। মেডিকেল কলেজের অনেক কৃর্তী ছাত্রী স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি এবং শিশু রোগের ওপর বিশেষজ্ঞ হয়ে বাংলাদেশের মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষায় নেতৃত্ব দিচ্ছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের সব ছাত্রীই স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হননি। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের চেয়ে অন্যান্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বেশি। কেউ কেউ রেডিওলজিস্ট, কেউ অ্যানাসথিসিস্ট, কেউ মেডিসিন প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ হন। সে সময় নারী চিকিৎসকদের অধিকাংশ সরকারি চাকুরির চেয়ে প্রাইভেট প্রাকটিস করতেন। তবে নারীদের চেয়ে সে সময় পুরুষ গাইনোকোলজিস্টদের সংখ্যাই বেশি ছিল। এটা শুধু পূর্ব পাকিস্তান নয়, বিদেশেও

(ইংল্যান্ড) একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। এর প্রধান কারণ অন্যান্য বিশেষজ্ঞের চেয়ে একজন গাইনোকোলজিস্টদের কষ্ট ও পরিশ্রম বেশি। তবে পুরুষ গাইনোকোলজিস্টের চেয়ে নারী গাইনোকোলজিস্ট বেশি দক্ষ এবং অভিজ্ঞ দক্ষ হয়ে থাকেন। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে একজন নারী চিকিৎসক যত সহজে একজন নারী রোগীকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, তা পুরুষ চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ একজন নারী রোগী পুরুষ গাইনোকোলজিস্টের কাছে সবকিছু খোলামেলা বলতে অপারগ ছিলেন। যে কারণে নারী গাইনোকোলজিস্ট বেশি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্রীরা গাইনোকোলজিস্ট হয়ে দেশ বিদেশে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন। তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার কাছে বিদেশি চিকিৎসকগণও হার মানেন। আবার এই মেডিকেল কলেজে পাশ করা ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষা নিয়ে তাদের অর্জিত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন এবং নতুন চিকিৎসক তৈরিতে ভূমিকা রাখেন। তাদের অনুসরণ করে প্রতি বছর দক্ষ, যোগ্য চিকিৎসক কলেজ থেকে বের হয় এবং তারা দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করছেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ ও জনজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। পূর্বে এই অঞ্চলের জনগণকে উন্নত চিকিৎসা সেবা নেওয়ার জন্য কলকাতা অথবা লন্ডনে যেতে হতো। পূর্ববাংলার অধিকাংশ জনগোষ্ঠী দরিদ্র হওয়ায় সবার পক্ষে উন্নত চিকিৎসা নেওয়ার জন্য কলকাতা বা লন্ডনে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া পূর্ববাংলা থেকে কলকাতায় গিয়ে উন্নত চিকিৎসা সেবা নেওয়া কষ্টকর ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা সেবা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই মেডিকেল কলেজকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে উচুঁ স্তরের চিকিৎসক শ্রেনি তৈরির সূচনা হয়। পূর্বে কবিরাজ, বৈদ্য এবং পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেল স্কুল থেকে এল.এম.এফ. ডিগ্রি অর্জনকারী নিচু স্তরের চিকিৎসক শ্রেনি ছিল। ফলে সমাজে উচুঁ স্তরের পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষায় পারদর্শী একটি নতুন চিকিৎসক শ্রেনির সৃষ্টি হয়। এই শ্রেনি পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের বা বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ ও জনস্বাস্থ্যক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। তারা শুধু চিকিৎসাসেবা দিয়েই নয়, নানা রকম জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে যুক্ত থেকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাদের অর্জিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান বর্তমান বাংলাদেশের চিকিৎসা সেবাকে আধুনিক থেকে আরো আধুনিক, যুগোপযোগী করে তুলছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা চিকিৎসাশিক্ষার কঠিন ও জটিল অধ্যয়নের পাশাপাশি খেলাধুলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে তারা ছিলেন ব্যতিক্রম চরিত্রের। তারা সংগীত, নাটক, নৃত্য, অঙ্কন, সাহিত্য প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে শুধু কলেজেই নয়, সমগ্র দেশে খ্যাতি অর্জন করেন। কলেজের কেউ কেউ চিকিৎসাশিক্ষার চেয়ে সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতি বেশি মনোযোগী ছিলেন। আবার কেউ কেউ মেডিকেল কলেজ ছেড়ে সাংস্কৃতিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তবে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ছাত্রজীবন শেষে সংস্কৃতি চর্চা অব্যাহত রাখেননি। পেশাগত ব্যস্ততার কারণে, তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মেডিকেল কলেজের বর্তমান সময়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে কোনো ছাত্রসংগঠন ছিল না। ১৯৪৯-৫০ সালে প্রথম নির্বাচনের মাধ্যমে কলেজ ছাত্র ইউনিয়ন (বর্তমান নাম ছাত্র সংসদ) গঠিত হয়। কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচিত সদস্যরা শুরু থেকে জাতীয় ও স্থানীয় সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তারা তৎকালীন মুসলিম

লীগ সরকারের বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ১৯৫২ সালের একুশের আন্দোলনে এই ইউনিয়নই নেতৃত্ব দেয়। উক্ত ইউনিয়নের সহ-সভাপতি গোলাম মাওলা ও সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিন আহমদ অবিস্মরনীয় ভূমিকা পালন করেন। গোলাম মাওলার নেতৃত্বেই এবং বদরুল আলম এর নকশা অনুযায়ী সম্মীলিত সবার প্রচেষ্টায় 'প্রথম শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ' নির্মাণ করা হয়। এটা মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের অমূল্য কীর্তি। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৪৯ ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র আহমদ রফিক যথাযথই বলেন,

> শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ অর্থ্যাৎ প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ, পরিকল্পনা, স্থান, নির্বাচন এবং প্রাথমিক উদ্যোগ পুরোটাই মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সমন্বিত প্রয়াস। এটা ব্যারাকের রাজনীতি সচেতন কয়েকজন ছাত্রের স্বতঃস্ফূর্ত ও তাৎক্ষনিক বা আকস্মিক চিন্তার সমষ্টির ফসল।[৫]

প্রথম শহীদ মিনারের উত্তরসুরি আজকের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। আজ তা বাঙালি জাতির ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এর মাধ্যমে বাঙালি জাতির সংগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা বিশ্ব দরবারে উপস্থাপিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির এই দিনটিকে 'বিশ্ব মাতৃভাষা' দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তা উদযাপন করছে। এই ইতিহাস সৃষ্টির পেছনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের ভূমিকা ছিল অন্যতম।

তৎকালীন সময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো মেডিকেল ব্যারাক নির্ভর রাজনীতি। মেডিকেল ব্যারক ছিল ছাত্ররাজনীতির নিরাপদ আশ্রয় স্থান। এই ব্যারাকে মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাই নন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্র নেতারা পুলিশি দমন পীড়ন থেকে রক্ষা পাবার জন্য আশ্রয় নিতেন। মেডিকেল ব্যারাকে বিভিন্ন মতাদর্শের (ডানপন্থী, বামপন্থী, উদারপন্থী, ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন) ছাত্র ছিল। ব্যারাকে বামপন্থীদের প্রাধান্য থাকলেও বেশিরভাগ ছিল মধ্যপন্থী। বিভিন্ন মতাদর্শের হলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে এসব ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ ছিল। ছাত্রদের মধ্যে মতাদর্শের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্য, শৃঙ্খলা ও শান্তির স্বার্থে পরস্পর হানাহানি দ্বন্দ্ব সংঘাত থেকে বিরত ছিল। সে সময় মেডিকেল কলেজের রাজনীতির পরিবেশ ছিল সুষ্ঠু, সুন্দর ও উন্মুক্ত।

জাতীয় সংকটে ঐক্যবদ্ধ থাকায় ১৯৬২'র ছাত্র আন্দোলন, হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন এবং উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে এই মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশাত্মবোধ থেকে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে এই কলেজ ও হাসপাতালের ছাত্র, শিক্ষক ও চিকিৎসকগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। এদের কেউ অস্ত্র হাতে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, আবার কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা, অর্থ ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশের শহীদ চিকিৎসকদের সংখ্যার মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের পাশ করা চিকিৎসকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এভাবেই ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা চিকিৎসা সেবা দিয়ে মানুষের জীবন রক্ষা করেন, অন্যদিকে জীবন দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা শুধু চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেননি, রাজনীতিবিদ, দক্ষ সংগঠক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন।

তথ্যনির্দেশ

১. *বার্ষিকী*, ২০০৬, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, পৃ. ৭৫।

২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১২ এপ্রিল, ১৯৫৯, পৃ. ৩।

৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ শে আশ্বিন ১৩৭৬ (১৯৬৯), পৃ. ৪।

৪. *ঐ*

৫. ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম.আর মাহবুব, *ঢাকা মেডিকেল কলেজ: সেবা সংগ্রাম ঐতিহ্য*, গৌরব প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৯৮।

পরিশিষ্ট-১

CHAPTER XXI.

Medicine.

The sub-committee appointed to consider the subject of medical studies advised that arrangements should be made in the Dacca University for preliminary scientific and professional instruction for the medical profession, up to the standard of the first M.B. of the Calcutta University. They recommended that the Dacca University should examine its own medical students, that the Calcutta University should be invited to recognize the final examination at Dacca as equivalent to its first M.B., and that the Calcutta Medical College should receive the passed Dacca students for the second M.B. course. This arrangement should in due time be replaced by a full medical course at Dacca.

We are in accord with the unanimous opinion of the sub-committee in favour of a medical department teaching up to the first M.B., and ultimately to be developed into a full medical college; we also accept the scheme which they have framed, and have embodied it in the following paragraphs.

Admission of Students.

2. Students may be admitted to the Department of Medicine on the same conditions as to the Departments of Arts and Science, and the entrance qualification should be the matriculation examination of the Calcutta University. There will be no separate medical college; students of medicine, like students of other scientific subjects, will be received into the various colleges and taught by the University. The number to be admitted each year will depend upon the demand for training and the capacity of the Calcutta Medical College to receive those students who have completed their course at Dacca. The sub-committee consider that arrangements should be made to admit 50 students a year, but that this number is likely soon to be exceeded. All students who pass the first M. B. at Dacca should be entitled to admission to the Calcutta college for the completion of their course.

Course of Studies.

3. The course should cover four years—two years leading up to a special intermediate examination in science, followed by two years of professional study.

The special I.Sc. course has been described in the chapters on Arts and Science. A student may also be admitted to the professional course after taking the ordinary I.Sc., provided that he undergoes a further course of one year in botany and zoology, and passes in those subjects, before proceeding to his professional studies. Similar arrangements may be made in the case of Calcutta students, provided that they pass a practical test in all the prescribed science subjects. Students who propose to study in the British Isles may wish to obtain a certificate that they have passed in a classical language: Sanskrit (or Latin, if instruction be provided) may therefore be offered as an optional subject, but it will not count in the examination.

The professional course should be divided into two parts, a University examination being held at the end of each year. This arrangement will induce students to work steadily throughout the course, a matter of particular importance in their case in view of the great difficulty which they experience in qualifying themselves for a medical degree.

The subjects for the third and fourth years will be—

3rd year.—Physiology, Anatomy and Organic Chemistry.

4th year.—Physiology, Anatomy and Materia Medica and Pharmacy.

The course in physiology should be the "principal" pass course. The subsidiary course will be studied in the first year, and the advanced course in the second year, according to the general arrangements for the B.Sc. The courses in anatomy, organic chemistry and materia medica should be the same as for the Calcutta first M.B.

Examinations.

4. The examination for the medical I.Sc. has been explained in the chapters on Arts and Science. The two examinations of the professional course may be styled "first professional" and "second professional" respectively. The former will include the "subsidiary" examination in physiology for the B.Sc., osteology and elementary anatomy, and organic chemistry. The latter will comprise the "advanced" pass examination in physiology, more advanced anatomy, and materia medica and pharmacy.

A student who does well in any subject in the second professional examination may be permitted to present himself for a further examination for honours in that subject. Honours students should be arranged in order of merit; other students in alphabetical order. Inasmuch as the second professional examination merely marks the end of a preliminary stage of the medical course, no diploma should be granted to successful candidates.

Staff.

5. The Senior University Professor of Physiology (who will be a medical man) should supervise instruction in his own and other medical subjects, and should have general control of medical studies. The staff for physiology has been included in the Science Department. For anatomy the following will be required :—

1 Professor at Rs. 600.
1 Senior Demonstrator at Rs. 200—300.
1 Junior Demonstrator at Rs. 100—200.

An allowance of Rs. 100 a month for giving instruction in materia medica should be made to one of the Assistant Surgeons on the University staff. Students will attend the Mitford Hospital for practical instruction in pharmacy; the course is a short one, and a fee of Rs. 300 a year may be paid to the hospital staff for the work and materials involved.

Accommodation and Equipment.

6. For anatomical studies a lecture theatre, a dissecting-room, a prosector's room, a museum with library and reading-room, a professors' room and a preparation-room will be required. There must also be a small museum for materia medica, and the University professor in charge of medical studies will need a room and a small office. The dissecting-room should be some way from the laboratories and other University buildings, and the whole medical accommodation may be provided in the site numbered 15 in the general plan; it is conveniently situated and at the same time lies apart from other buildings.

The sub-committee estimate the capital cost of equipment for anatomy, including the museum, at Rs. 50,000, and for materia medica at Rs. 5,000. Details of the capital and recurring charges for medical studies are shown in Appendices IX and X.

Fees and Scholarships.

7. Medical students should pay the ordinary college fees and, in addition, a University fee of Rs. 2 during the intermediate, and Rs. 5 during the professional, courses.

On the result of the second professional examination two scholarships should be awarded to the honours students who stand highest in physiology and anatomy respectively. These scholarships should be of the value of Rs. 20 each, and should be tenable during the three years of the second M.B. course.

উৎস: *Report of the Dacca University Committee (1912)*, The Bengal Secretariate Book Depot, 1912, pp-118-120.

পরিশিষ্ট-২

Government of Bengal

The Report of the Expert Committee for the conversion of the Dacca Medical School into a Medical College under the University of Dacca

Dacca, 10th July 1940

Superintendent, Government Printing
Bengal Government Press, Alipore, Bengal
1941

The Report of the Representative and Expert Committee appointed by the Government of Bengal, Education Department, in their Resolution No. 4756 Edn., dated Calcutta, the 16th August 1938, to investigate and report upon the scheme prepared by the University of Dacca for the conversion of the existing Medical School in Dacca into a Medical College under the University (dated Dacca, the 10th July 1940).

This Report is signed by the Members of the Committee whose names are as follows:—

(1) Major-General P. S. Mills, C.I.E., K.H.P., I.M.S., Surgeon-General, Bengal—*President of the Committee.*

(2) Dr. R. C. Majumdar, PH.D., Vice-Chancellor, Dacca University.

(3) Dr. M. N. Bose, M.B., CH.B., Principal, Carmichael Medical College.

(4) Lieutenant-Colonel B. G. Mallya, I.M.S., Superintendent, Campbell Medical School and Hospital.

(5) Dr. J. C. Ghosh, D.SC., Indian Institute of Science, Bangalore.

(6) Lieutenant-Colonel J. C. De, I.M.S., Principal, Medical College, Calcutta.

(7) Major R. Linton, I.M.S., Civil Surgeon, Dacca.

(8) Captain P. De, M.R.C.P. (EDIN.), Professor of Physiology, Medical College, Calcutta.

(9) Khan Sahib Dr. M. M. Khan, Deputy Superintendent, Dacca Medical School.

(10) Mr. K. Shahabuddin, C.B.E., M.L.A.

(11) Mr. Jogendra Nath Sen, M.A., B.L., an Executor of the Estate of the Donor.

(12) Mr. K. S. Mitra, M.B.E., Secretary, Medical College Hospitals, Calcutta—*Secretary of the Committee.*

উৎস: *The Report of the Expert Committee for the conversion of the Dacca Medical School into a Medical College under the Univeristy of Dacca*, Government of Bengal, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941, p. Fornt page.

APPENDIX B.

Professional Education.

Recommendations of the Medical Council of India.

ADOPTED BY THE MEDICAL COUNCIL OF INDIA ON 12TH FEBRUARY, 1937.

(To come into operation with effect from the commencement of the academic year [1940]).*

I.—GENERAL.

No candidate should be allowed to begin the medical curriculum proper until—

(*i*) He has attained the age of 17 years, or will attain that age during the first term of the curriculum.

†(*ii*) He has passed—

(*a*) The Intermediate Examination in the Medical group of a British Indian University which includes a practical test.

(*b*) The Intermediate Examination in Arts or Science of a British Indian University with Physics, Chemistry and Biology and which shall include a practical test in each of these subjects.

(*c*) B.Sc. examination with Chemistry of a British Indian University if Physics and Biology have been taken in the Intermediate examination with a practical test in those subjects.

(*d*) The Intermediate examination held by the following Boards of High School and Intermediate Education with Physics, Chemistry and Biology which includes a practical test in each of these subjects:—

(1) Rajputana, Central India and Gwalior.

(2) United Provinces.

(*e*) Any other examination which in scope and standard is found equivalent to the Intermediate Science Examination of an Indian University taking Physics, Chemistry and Biology including a practical test in each of these subjects.

II.—THE MEDICAL CURRICULUM.

With regard to the course of study and the examinations which persons desirous of qualifying for the medical profession shall go through in order that they may become possessed of the knowledge and

---

*Substituted for "1939" by the Medical Council of India at their meeting on 23rd February 1938.

†Substituted for (*ii*) and (*iii*) by the Medical Council of India at their meeting on 25th October 1938.

skill requisite for the efficient practice of medicine, surgery, and midwifery, the Council recommends as follows:—

(1) That every student should undergo a period of certified study extending over not less than five academic years between the date of commencement of his study of the subjects comprising the medical curriculum and the date of his final qualifying examination; provided that the last three years of the period must have been spent in the continuous study of the clinical group of subjects.

(2) That the first two years should be occupied in the study of the professional scientific subjects with an introduction to clinical methods, and that no student should be certified as attending classes in the clinical group of subjects until he has satisfied the Examiners that he has a competent knowledge of the subjects of these two years. This examination need not include clinical methods.

(3) That throughout the whole period of study the attention of the student should be directed by his teachers to the importance of the preventive aspects of medicine, and of measures for the assessment and maintenance of normal health.

In every course of professional study, and in the examinations, the following subjects should be included:—

III.—PERIOD OF STUDY OF THE PROFESSIONAL SCIENTIFIC SUBJECTS (FIRST TWO YEARS).

1. *Human Anatomy and Physiology.*—These courses should include:—

(*a*) Dissection of the entire body.
(*b*) Histology.
(*c*) Elements of human embryology.
(*d*) The principles of general physiology, including Bio-chemistry and Bio-physics, and, in the case of those Universities in which no provision has been made for teaching the subject in the pre-medical course, Organic Chemistry.
(*e*) Elements of genetics.

(*N. B.*—This subject may be taken with Biology.)

(*f*) Elementary normal psychology.
(*g*) The normal reactions of the body to injury and infection, as an introduction to general pathology and bacteriology.
(*h*) Elements of the methods of clinical examination, including the use of the common instruments and the examination of body fluids, with demonstrations on both normal and abnormal living subjects.
(*i*) An introduction to pharmacology.

NOTE.—Instruction under the last three headings above should be given during the second year, by arrangement between the teachers of anatomy, physiology, and pharmacology, and of the clinical subjects oncerned.

The amount of time allotted to these subjects should not be more than one-third of the total time available in that year.

The demonstration of structure and function in the teaching of anatomy and physiology should be done as far as possible on the living human subject, and should include the information to be obtained from radiology.

IV.—PERIOD OF CLINICAL STUDIES (THIRD, FOURTH AND FIFTH YEARS).

2. *Pathology and Bacteriology.*—Courses of instruction throughout the period of clinical studies, to include:—

(*a*) General and special pathology and morbid anatomy.

(*b*) Clinical and chemical pathology.

(*c*) Elementary general bacteriology and parasitology.

(*d*) Clinical bacteriology and parasitology.

(*e*) Immunology and immunization.

Each student should be required to have received practical instruction in the conduct of autopsies, and to have acted as a *post-mortem* clerk in at least ten cases.

3. *Pharmacology and Materia Medica*, including elementary pharmacological chemistry, and practical pharmacy. A course, including practical work, should be taken concurrently with courses of clinical instruction.

4. *Forensic Medicine, Hygiene and Public Health.*—Courses of instruction in these subjects should be given not earlier than the fourth year. These should include instruction in the duties which devolve upon practitioners in their relation to the State, and on the generally recognised rules of medical ethics.

5. *Medicine*, including—

(*a*) A course of systematic instruction in the principles and practice of Medicine.

(*b*) A medical clinical clerkship for a period of nine months, of which six months must be spent in the hospital wards and three months in the outpatient department.

NOTE.—Each student during his period of clinical clerkship in the wards should have continuously in his sole charge as clerk not less than five beds.

(*c*) A clinical clerkship for not less than one month in a children's ward or hospital, or in a children's outpatient department.

(*d*) During the period of medical ward clerking a continuous period of one month as an intern clerk, during which the student is in residence in hospital or close by.

(*e*) Lectures or demonstrations in Clinical medicine and attendance on general inpatient and outpatient practice during at least two years, which may run concurrently with the surgical practice under 6(*d*).

(*f*) Instruction in Therapeutics and prescribing, including (*i*) pharmacological therapeutics, (*ii*) the methods of treatment by vaccines and sera, (*iii*) physiotherapy, (*iv*) dietetics, and (*v*) the principles of nursing.

(*g*) Instruction in Applied anatomy and physiology throughout the period of clinical studies, to be arranged between the teachers of anatomy and physiology and of the clinical subjects.

(*h*) Instruction throughout the periods of medical clerkship in Clinical pathology, to be arranged by the teacher of pathology and of the clinical subjects.

(*i*) Instruction in the following subjects:—

(1) Diseases of infancy and childhood.

(2) Acute infectious diseases.

(3) Tuberculosis.

(4) Psychopathology and mental diseases.

(5) Diseases of the skin, including Leprosy.

(6) Theory and practice of vaccination.

(7) Radiology and electro-therapeutics in their application to medicine.

Throughout the whole period of study the attention of the student should be directed by the teachers of this subject to the importance of its preventive aspects.

6. *Surgery*, including—

(*a*) A course of systematic instruction in the principles and practice of Surgery.

(*b*) A Surgical dressership for a period of nine months, of which six months must be spent in the hospital wards and three months in the outpatient department.

NOTE.—Each student during his period of Surgical dressership in the wards should have continuously in his sole charge as dresser not less than five beds.

(*c*) During the period of surgical ward dressing a continuous period of one month as intern clerk, during which the student is in residence in hospital or close by.

(*d*) Lectures or demonstrations in clinical surgery and attendance on general inpatient and outpatient practice during at least two years, which may run concurrently with the medical practice under 5(*e*).

(*e*) Practical instruction in surgical methods including physiotherapy.

(*f*) Practical instruction in minor surgery on the living.

(*g*) Instruction in the administration of anaesthetics.

(*h*) A course of instruction in operative surgery.

(*i*) Instruction in applied anatomy and physiology throughout the period of clinical studies to be arranged between the teachers of anatomy and physiology and of the clinical subjects.

(*j*) Instruction, throughout the periods of surgical dressership, in Clinical pathology, to be arranged by the teachers of pathology and of the clinical subjects.

(*k*) Instruction in the following subjects:—

(1) Ophthalmology, including refraction and the use of the ophthalmoscope; with hospital attendance for a period of three months.

(2) Diseases of the ear, nose, and throat, including the use of the otoscope, laryngoscope and rhinoscope.

(3) Radiology and electro-therapeutics in their application to surgery.

(4) Venereal diseases.

(5) Orthopaedics.

(6) Dental diseases.

(7) Surgical diseases of infancy and childhood.

Throughout the whole period of study the attention of the student should be directed by the teachers of this subject to the importance of its preventive aspects.

7. Midwifery, Diseases of women, and Infant Hygiene including:—

(*a*) Courses of systematic instruction in the principles and practice of Midwifery, Gynaecology, and Infant Hygiene, including the applied anatomy and physiology of pregnancy and labour.

(*b*) Lectures and demonstrations in clinical Midwifery, Gynaecology, and Infant hygiene and attendance on the practice of a maternity hospital or the maternity wards of a general hospital, including (*a*) ante-natal care and (*b*) the management of the puerperium, and on inpatient and outpatient gynaecological practice for a period of at least three months.

This period should be devoted exclusively to instruction in these subjects, and should be subsequent to the medical clinical clerkship [section 5(*b*)] and the surgical dressership [section 6(*b*)]. Not less than two-thirds of the hours of clinical instruction should be given to midwifery, including ante-natal care and infant hygiene.

(*c*) Of this period of clinical instruction not less than one month should be spent as a resident pupil either in a maternity hospital or in a hostel attached to a maternity hospital or to the maternity wards of a general hospital.

The student should during this month attend at least twenty cases of labour under adequate supervision. Should the number of cases attended during this month be less than twenty, the remainder must be attended as soon as possible thereafter.

A certificate showing the number of cases of labour attended by the student, in the maternity hospital and in the patients' homes respectively, should be signed by a responsible medical officer on the staff of the hospital, and should state:—

(*i*) That the student has personally attended each case during the course of labour, making the necessary abdominal and other examinations under the supervision of the certifying officer, who should describe his official position;

(*ii*) That satisfactory written histories of the cases attended, including when possible ante-natal and post-natal observations, were presented by the student and initialled by the supervising officer.

উৎস: *The Report of the Expert Committee for the conversion of the Dacca Medical School into a Medical College under the Univeristy of Dacca*, Government of Bengal, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941, pp. 78-82.

পরিশিষ্ট-৪

APPENDIX C.

No. F. 181-A/39, dated Simla, the 20th September, 1939.

From—The Secretary to His Excellency the Crown Representative,

To—The Secretary to His Excellency the Governor of Bengal.

With the outbreak of war, it is only to be expected that, as time goes on, increasing difficulty will be experienced in obtaining imports from abroad of stores which cannot be produced in India and of non-indigenous raw materials required for the manufacture of stores in India. In some cases, the sources of supply may dry up completely, while in others deliveries are likely to be subject to serious delays and progressive increases in prices. It would, therefore, seem to be no more than prudent to take action now to prevent the early dissipation of existing stocks of imported stores and of stores manufactured in this country wholly or partly from imported raw materials, and to conserve them for use to the best advantage over as long a period as they can be made to last.

2. To this end I am to request that a review may immediately be undertaken of all programmes of works of the Crown Representative including maintenance works, with a view to curtailing them if and to the extent possible so far as works are concerned, which involve the use of stores of the nature referred to in paragraph 1 above, and a report furnished to the Political Department as early as possible.

3. Pending completion of the review, the Crown Representative has been pleased to issue the following provisional orders:—

(*i*) No new work involving the use of such stores should be commenced, unless it is considered essential having regard to the service to be provided by the work.

(*ii*) New works in progress in respect of which heavy commitments have not yet been entered into should be slowed down until the results of the review are known, so as to facilitate postponement or discontinuance of their execution in the event of that being eventually ordered.

(*iii*) Maintenance and repair works involving the use of this class of stores should be slowed down so far as may be compatible with safety or other relevant considerations.

4. The attention of local bodies might with advantage be drawn to these same considerations, with an invitation to take action on similar lines; especially so in the case of local bodies administered by officers under the Crown Representative where it is possible for him to prescribe the action to be taken.

5. I am also to request that an early examination may kindly be undertaken simultaneously of the extent to which such stores now used either for works or for other purposes would be capable of substitution by indigenous stores and a report furnished to the Political Department as early as possible.

উৎস: *The Report of the Expert Committee for the conversion of the Dacca Medical School into a Medical College under the Univeristy of Dacca*, Government of Bengal, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941, p. 83.

পরিশিষ্ট-৫

61

Note of Dissent.

I agree with the report, subject to the following note of dissent:—

I am unable to accept the fundamental proposition that the Medical Faculty should be located in the Mitford School site. I agreed to these arrangements at the first meetings of the Committee held in February 1939 on the impression that the total capital cost of the scheme would not exceed seven lakhs of rupees. Now that it appears that the minimum capital expenditure for land acquisition, building and equipment will be in the neighbourhood of Rs. 14 lakhs, it would be, in my opinion, unwise to sink all that large sum of money mostly in modification of existing buildings in the present Medical School compound which will never give us a really up-to-date hospital.

In other parts of India 400 beds are now being accommodated in one building planned and fitted up on most up-to-date lines at an expense of the order of 12 lakhs of rupees. Such large hospitals are not only very efficient, but they also are economical in running expenses. I, therefore, strongly urge that (1) the Hospital of the Medical Faculty and the Institutes of Pathology, Physiology, Anatomy, etc., should all be built in the University area, utilising as far as practicable the equipment and the materials of the existing buildings in the Mitford School site; and (2) that the site be sold off, if necessary, in small plots. We have got to look ahead; there is no reason why the Dacca University Medical Faculty should not one day be the very best of its kind in India. Let it not be said by those that come after us, that the authors of the report had no vision of the future, and that they planned the establishment of a rapidly growing institution in a congested locality by a dying river and admitting even of limited expansion only with the greatest difficulty.

J. C. GHOSH.

উৎস: *The Report of the Expert Committee for the conversion of the Dacca Medical School into a Medical College under the Univeristy of Dacca*, Government of Bengal, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941, p. 61.

পরিশিষ্ট-৬

No. 162-Medl., dated the 27th January 1940.

Memo. by—Rai H. L. Mukharji Bahadur, Additional Deputy Secretary to the Government of Bengal, Local Self-Government Department.

Copy forwarded to the Surgeon-General with the Government of Bengal for information and guidance.

APPENDIX D.

(E. C. M. 26 of 17th September 1937.)

Scheme for the conversion of the Dacca Medical School into a College teaching up to the M. B. Standard.

It will be necessary to reorganise the teaching staff and enlarge the hospital accommodation considerably in order that the degrees awarded to students trained in this institution may receive the recognition of the Indian Medical Council.

Qualification for admission.

The scheme given below is based on the assumption that 75 students will be admitted every year and that the minimum qualification for admission will be the passing of the special Intermediate Science Examination with Physics, Chemistry, Mathematics and Biology in accordance with the revised syllabus of the Calcutta University. The Intermediate Colleges at Dacca are being equipped for undertaking this additional teaching work, and we do not anticipate much difficulty in making suitable provision for this special I.Sc. course within the area controlled by the Dacca Board of Intermediate Education.

Preclinical course of two years.

Teaching will have to be provided in the following subjects:—

(*a*) Organic Chemistry, (*b*) Biochemistry, (*c*) Physiology, (*d*) Materia Medica and Pharmacology, (*e*) Anatomy, and (*f*) Pathology.

Organic Chemistry.

(*a*) Laboratory accommodation for teaching Organic Chemistry already exists in the University. The staff in the Department of Chemistry will have to be strengthened by the addition of a lecturer in the grade of Rs. 250—25/2—400.

Bio-Chemistry.

(*b*) Biochemistry is already taught in the University up to the Honours B.Sc. and M.Sc. Standard. The staff will have to be strengthened by the addition of a lecturer on Rs. 250—25/2—400.

উৎস: *The Report of the Expert Committee for the conversion of the Dacca Medical School into a Medical College under the Univeristy of Dacca*, Government of Bengal, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941, p. 84

পরিশিষ্ট-৭

HEALTH SURVEY AND DEVELOPMENT COMMITTEE

Chairman

Sir JOSEPH BHORE, K.C.S.I., K.C.I.E., C.B.E.

Members

Dr. R. A. AMESUR, President, Indian Medical Association.

Rai Bahadur Dr. A. C. BANERJEA, C.I.E., Director of Public Health, United Provinces.

Khan Bahadur Dr. A. H. BUTT, Director of Public Health, Punjab.

Dr. R. B. CHANDRACHUD, F.R.C.S., Chief Medical Officer, Baroda State.

Colonel E. COTTER, C.I.E., I.M.S., Public Health Commissioner with the Government of India.

Dr. (Mrs.) D. J. R. DADABHOY, M.D., M.R.C.P. (Lond.), ex-President of the All-India Association of Medical Women, Bombay.

Dr. J. B. GRANT, C.B.E., M.D., Director, All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, (1939-45).

Khan Bahadur Dr. M. A. HAMEED, M.D., M.R.C.P., Member, Medical Council of India, Professor of Pathology, Lucknow University.

Lt.-Genl. Sir BENNET HANCE, K.C.I.E., C.I.E., O.B.E., I.M.S., Director General, Indian Medical Service.

Sir HENRY HOLLAND, C.I.E., F.R.C.S., C.M.S. Hospital, Quetta.

Sir FREDERICK JAMES, O.B.E., M.L.A., Member, Central Advisory Board of Health.

N. M. JOSHI, Esquire, M.L.A.

Lt.-Col. (Miss) H. M. LAZARUS, F.R.C.S., I.M.S., Chief Medical Officer, Women's Medical Service.

Pandit L. K. MAITRA, M.L.A., Member, Central Advisory Board of Health.

Diwan Bahadur Dr. Sir LAKSHMANASWAMI MUDALIAR, M.D., Vice-Chancellor, Madras University.

Dr. U. B. NARAYANRAO, President, All-India Medical Licentiates Association (1939-45).

Dr. VISHWA NATH, M.A., M.D., F.R.C.P., Member, Medical Council of India.

Major-General W. C. PATON, C.I.E., M.C., K.H.P., I.M.S., Surgeon General with the Government of Bengal, (1941-45).

Dr. B. C. ROY, M.R.C.P., F.R.C.S., President, Medical Council of India. (1939-45).

The Hon'ble Mr. P. N. SAPRU, Member, Council of State, and Member, Central Advisory Board of Health.

Lt.-Col B. Z. SHAH, M.R.C.S., L.R.C.P., I.M.S., (Retd.), Superintendent, Mental Hospital, Poona.

B. SHIVA RAO, Esquire.

Mrs. K. SHUFFI TYABJI, J.P., K.I.H.

Dr. H. R. WADHWANI, K.I.H., J.P., Minister for Public Health, Sind, till April 1945.

Secretary

Rao Bahadur Dr. K.C.K.E. RAJA.

Joint Secretaries

Dr. M. AHMED.

Captain A. BANERJI.

Dr. K. T. JUNGALWALLA.

Rai Bahadur MAN MOHAN.

Rao Bahadur Dr. S RAMAKRISHNAN.

উৎস: *Report of the Health Survey and Development Committee*, *Summary*, Vol.IV, The Manager of Government of India Press, New Delhi, 1946

পরিশিষ্ট-৮

2607. 13th September, 1946.

Major W.J. Virgin,
Head of the Department of Medical Science.

Dear Sir,

I beg to communicate to you the following resolution of the Executive Council adopted at their meeting held on 3rd August, 1946:-

"That Major W.J. Virgin, Head of the Department of Medical Science, be given the status of a Professor".

Yours faithfully,

Registrar.

A/n.

UNIVERSITY OF DACCA

Extract from the Minutes of the Executive Council held on the 3rd August, 1946.

In accordance with the recommendation of the Academic Council (27. 7. 46) RESOLVED: That Major W. J. Virgin, Head of the Department of Medical Sciences, be given the status of a Professor.

Memo No........ Ramna, Dacca, dated the August, 1946.

Copy forwarded to for information.

Registrar.

উৎস: *ডি গ্রুপ*, ৩৫২৮/১৯৪৬-৪৭, বান্ডেল নং-৯, ক্রমিক নং- ২৩৩, Sub: Recognition of teachers of Dacca Medical College, University of Dacca, 1946-47.

পরিশিষ্ট-৯

REVIEW OF PROBLEMS ARISING DURING THE FIRST MONTH OF THE DACCA MEDICAL CO... I

SESSION 1946-47.

...

1. Student Admission to the College Course.

(a) By the Selection Committee : The Selection Committee met on four occasions - on the 3rd, 4th, 5th and again on the 16th of July '46. 345 students had applied for admission and those who were prima facie eligible were interviewed and divided into four groups. Those who were suitable were labelled "S", those with additional qualifications "S-plus", those who were suitable but of a somewhat lower standard "S-minus" and those who were unsuitable "U". This classification was used as the basis of selection. The Committee then selected from the candidates so classified, candidates as follows :-

Muslim ...	43
General ...	38
Scheduled Caste ..	5
Female ...	2
Total:	88

The increase in Muslim seats was due to the absence of suitable female candidates. The 8 vacant female seats were allotted to 5 Muslims, and 3 general candidates, but there were only 43 qualified Muslim candidates available.
The Selection Committee did not know what to do about the ten seats reserved for Govt. nominations.

(b) Government Nominations: As the Selection Committee anticipated that there would be a great deal of delay in filling the Govt. seats, certain students with special claims for consideration, but who were slightly below the educational requirement were recommended for these vacancies or the recommendations. As the College has now been running two weeks, students appearing later than this will be seriously handicapped in their studies and cannot be expected to make good progress this year. These so recommended have been allowed to attend classes in anticipation of sanction.

(c) School Students: Nine students of the 1st and 2nd years of the Dacca Medical School applied for admission to the College course. Three of these were rejected as they were only 3rd Divn. I.Sc standard. The remainder were either accepted on the basis of their standing in the I.Sc examination or they were recommended for a Govt. nomination. The 3rd Divn. students were refused as the University does not accept any 3rd Divn. students. This was the only case in which the University Selection Committee differed from the General Selection Committee.

2. Quality of the Students:

(a) Muslim students: 39 Muslim students have registered in the College Course, of which 14 were I.Sc. 1st Divn. or better, and the remainder were 2nd Divn. There is still one vacancy reserved for Muslims. These students, on the whole, appear hard working and anxious to succeed in the Medical Course. It is felt that the majority of them will do very well.

(b) General students: 47 General students have registered in the course. This includes 3 Burmese evacuees for which special arrangements were requested and one Christian. The latter was strongly recommended by a local gentleman and is highly qualified. This group of students appear to be very satisfactory indeed. They are working well and are taking a keen interest in the subjects of the 1st year.

(c) Scheduled & Depressed Classes: Four Scheduled Caste candidates have been admitted and one candidate of a Depressed Class. Five Scheduled Caste candidates were selected originally, but one of these failed to register.

A p/t/2

held (the 4th meeting). After that, certain members left Dacca to attend to Political business so that it was not possible to get them together again conveniently, as the vacancies occurred at scattered intervals. It would have been very difficult to arrange meetings with the Committee on the 22nd July, and 31st July for the purpose of interviewing two candidates. The Committee had already interviewed all the candidates with the exception of two.

A The practice of the University of Dacca in these cases is to instruct the Principal of the College concerned to fill the vacancies at his discretion. Govt. may be requested to approve the University of Dacca practice in this respect, as it appears to be the most reasonable method of filling such vacancies.

5. Training in Biology :

Of the students admitted, 22 had neither Botany nor Zoology and 34 students had studied only Botany. It has turned out to be extremely difficult to arrange instruction in these subjects for these students. The Medical Course is already exacting, and the addition of Biology means that the students have to work from 7-30 a.m. to 4 p.m. Without Biology they are not in a position to understand the elements of ANATOMY & PHYSIOLOGY.

Efforts to standardise the medical group of subjects in all Intermediate Colleges so as to include Biology as a compulsory subject are urgently required. This difficulty will then be overcome. Alternatively Biology, Advanced Physics and Organic Chemistry could be taught in Medical Colleges in Bengal by increasing the course by one year.

Major, I.M.S.,
Principal, DACCA MEDICAL COLLEGE.

S.Moulik/5.8.

উৎস: *B Proceedings*, B No. 100, SL No. 74, List No. 109, *Health & Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of Bengal*, 1946.

পরিশিষ্ট-১০

-/True copy/-

CONFIDENTIAL

Major W.J.Virgin, I.M.S.,
Principal, Dacca Medical College.

D.O. No. /DMC-XII dated the 5th Aug. '46.

Dear Col. Pasricha,

I am sending herewith a report on the admission of students to the 1st year of the College. Two complaints have been received, so far, regarding the admission of students, one from a local newspaper on behalf of the Hindu community of which I am sending the cutting, and one from the Minister based on a report from Mrs. Khatoon, M.L.A. This report will give you an idea of the general situation and some recommendations which I have made. I will send a copy direct to the Secretary of the Dept. for the attention of the Honourable Minister. If necessary, I will see the Hon. Minister when attending the meeting of the Faculty this month.

We are feeling the lack of staff very keenly. If you can do anything about Demonstrators, it will save a serious situation.

Yours sincerely,

Sd. W.J.Virgin,

To

Lt.Col. C.L.Pasricha, I.M.S.,
Surgeon-General with the Govt. of Bengal,
Writers' Buildings, Calcutta.

Memo. No. 6/DMC-XII

Copy with a copy of the report forwarded to the Secretary, Public Health & Local-Self Government, Medical Branch, Writers' Buildings, Calcutta, for information.

ENCL: 1

Major, I.M.S.,
Principal, Dacca Medical College.

Dated, Dacca,
5th August, 1946.

উৎস: *B Proceedings*, B No. 100, SL No. 74, List No. 109, *Health & Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of Bengal*, 1946.

পরিশিষ্ট-১১

No. 56/DMC - XVII dated the 4th August, 1946.

The Principal,
Dacca Medical College,

To - The Dy. Surgeon-General with the
Government of Bengal, CALCUTTA.

Sir,

Reference your Memo. No.1D/A(2)/ dated 30.7.46.

The member of the Selection Committee noted in your memo, under reference may be requested to substantiate her statements with the facts reported to her. The Principal will then be pleased to confirm or correct the statements submitted by petitioners.

As far as is known only eight vacancies occurred - one Scheduled Caste filled by a nominee of Mrs. Khatoon. Three General vacancies filled from the waiting list except for one candidate of specially high qualifications who had been put on the waiting list on the recommendation of a local gentleman. Four Muslim vacancies occurred of which three were filled from Muslim candidates who applied after the Selection Committee meeting. These were well qualified. No other Muslim candidates were available who were qualified. Hence a reference was not made in these three cases to the Selection Committee. There is still one Muslim vacancy remaining today for which no suitable muslim candidate is available.

A full list of all selected candidates was sent to the Surgeon-Genl. vide our letter No.20/DMC-X dated 11.7.46.

B Genl(4)
100.177.

Major, I.M.S.,
Principal, Dacca Medical College.

S/MJV:-4.8.

উৎস: *B Proceedings*, B No. 100, SL No. 74, List No. 109, *Health & Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of Bengal*, 1946.

পরিশিষ্ট-১২

17

MEDICAL DIRECTORATE BENGAL, 11 NOV 1946, Writers' Buildings, Calcutta.

OFFICE OF THE PRINCIPAL, DACCA MEDICAL COLLEGE.

NO. 3 /DMC- XVII, dated Dacca, 2.11.46

To

The Surgeon-General with the Government
of Bengal, Calcutta.

(Deputy Surgeon-General, Civil.)

B June '47
No. 185.

Ref:- His No.MD/A2-Medl.3M-9-46 dated the 19th/22nd october, 1946.

Sub:- Admission of students into the Dacca Medical College.

....

The information asked for are furnished below:-

1) Waiting list for the Hindu was prepared and only one Muslim candidate was kept in the Waiting list as there were no others at that time.

2) Four Muslim students were selected for admission in the casual vacancies from Muslim of whom one was kept in the Waiting list as noted above and the remaining three who were well qualified, applied after the Selection Committee Meeting.

Put up with relevant papers.
11.11.46

Major, I.M.S.,
Principal, Dacca Medical College.

MD/A(2)/155 তারিখ 13/11/46

উৎস: *B Proceedings*, B No. 100, SL No. 74, List No. 109, *Health & Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of Bengal*, 1946.

পরিশিষ্ট-১৩

১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা

[illegible] ...owing candidates have been selected for admission in the [illegible] Class of the Dacca Medical College, 1946-47. They are [illegible]ed to appear before the Medical Board on Monday, the 15th [illegible] 1946 at 9 A.M. in the Office of the Superintendent, Dacca [illegible]al School for Medical examination. They must pay the following [illegible] on the same day at 10 A.M, failing which their names will be [illegible] struck off list of candidates.

		Rs.
Admission fee	.. ..	.. 25/-
Tuition fee (for the summer term) ..		.. 100/-
Students' Union Fee ..	..	.. 6/-
Caution money for laboratory practice		.. 10/-
		Total-141/-

MUSLIMS.

Regd.No.	Serial No.	Name
2	1.	A.K.M. Nurul Islam
3	2.	Md. Lutfar Rahman
1	3.	Shamsuddin Ahmed
1	4.	Kazi Motior Rahman
2	5.	Md.Abu Taher Choudhury
6	6.	Abdul Mannan
10	7.	A.K.Md. Kafiluddin
17	8.	Ahamed Hossain
18	9.	Abu Siddique Meah
8	10.	A.F.M.Shamsul Islam
14	11.	A.L.M. Abdul Maquit
16	12.	Md.A.Mannan
6	13.	Abdus Sobhan
9	14.	Abu Ahmed Choudhury
10	15.	Md.Shajeuddin Sarker
14	16.	Tafayal uddin Ahmed
15	17.	Habibur Rahman
38	18.	Azizulla
39	19.	Md.Sujauddulla
47	20.	Md.Abdul Hoque
49	21.	Afsaruddin Ahmed
50	22.	A.H.Shajedur Rahman
51	23.	Ataur Rahman Khan
[illegible]	24.	Md. Abdul Halim
	25.	Nazir Mahmud
	26.	Asimuddin Ahmed
[illegible]	27.	Abdul Hoque
[illegible]	28.	Md.Mansur Hossain
[illegible]	29.	Md.Abdul Goffur Talukder
[illegible]	30.	Md. Nurul Alam Khan
[illegible]	31.	Mirza Mazharul Islam
[illegible]	32.	Md.Abdul Mottalib
[illegible]	33.	Abu Md.Badurl Alam
[illegible]	34.	Asekur Rahman Khan
[illegible]	35.	Md.Horisur Rahman
[illegible]	36.	Md.Akhtaruzzaman
31	37.	A.T.M.Abdur Razzak
36	38.	Md.Goffur Meah
53	39.	S. Islam
[illegible]	40.	Shaikh Shadrul Hoq
62	41.	Md.A.Hamid Sarker

SCHEDULED CASTE AND OTHERS

Regd.No.	Sl.No.	Name
161	1.	Santimoy Roy
308	2.	Satish Ch.Sarker
324	3.	Ramlal Mallick
341	4.	Dhirendra Kr. Das
42	5.	Sarada Pr. Ghose

FEMALE

1. Miss Gouri Bhattacharj
2. Miss Sheila Mehra

[signature]

Principal,
Dacca Medical College.

The following candidates have been selected for admission in the 1st Year Class of the Dacca Medical College, 1946-47. They are directed to appear before the Medical Board on ~~Monday~~ the 16th(Tuesday) July, 1946 at 9 A.M. in the Office of the Superintendent, Dacca Medical School for medical examination. They must pay the following fees on the same day at 10 A.M. failing which their names will be struck off the list of candidates.

			Rs.
Admission Fee ..	..	..	25/-
Tuition fee (for the summer term)	--	..	100/-
Students' Union Fee --	..	..	6/-
Caution money for laboratory practice..		..	10/-
		Total -	141/-

HINDUS.

Regd.No.	Serial No.	Name
2	1.	Shamal Krishna Sen
40	2.	Pran Gopal Datta
7	3.	Shibdas Bandupadya
140	4.	Jiban Kumar Sen Gupta
2	5.	Khitish Chandra Ghose
13	6.	Somesh Ch. Bhattacherjee
25	7.	Sudhir Ranjan Choudhury
36	8.	Arup Kumar Das
39	9.	Sukhendu Bikash Roy Choudhury
44	10.	Sunil Kanti Sen
52	11.	Kali Pada Danda
53	12.	Ashutosh Bhattacherjee
63	13.	Nirmal Chandra Choudhury
45	14.	Krishna Chandra Das
1	15.	Chittaranjan Sen
4	16.	Ajit Kumar Datta
14	17.	Barindra Lal Guha Roy
15	18.	Satya Ranjan Roy
20	19.	Subir Kanta Das Gupta
23	20.	Amal Kanti Dar Bhowmick
26	21.	Debi Prasad Roy
31	22.	Arun Kumar Chatterjee
37	23.	Subir Ranjan Chakraverty
40	24.	Pradip Mojumder
47	25.	Samarendra Ch. Sen Sarma
48	26.	Dharani Kanta Chakraverty
50	27.	Rati Ballav Goswami
54	28.	Sunil Chandra Banerjee
55	29.	Nilmani Das
56	30.	Amarendra Nath Datta
57	31.	Haradan Roy
60	32.	Rabindra N. Basu
68	33.	Kalyan Kumar Ghose
8	34.	Hari Har Das
58	35.	Dhirendra Narayan Mitra
10	36.	Purnendu Kumar Addya.

Principal,
Dacca Medical College

উৎস: *B Proceedings*, B No. 100, SL No. 74, List No. 109, *Health & Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of Bengal*, 1946.

পরিশিষ্ট-১৪

Enc: No.2(a)

Office of the Principal, Dacca Medical College.

No.139/DMC-XV dated, Ramna(Dacca) the 16th.November, 1946.

From - The Principal, Dacca Medical College &
Dean of the Faculty of Medicine, Dacca University.

To - The Registrar, Medical Council of India,
C/o, Director General, Indian Medical Service,
New Delhi.

Subject: Est blishment of Medical College at Dacca.

Government of Bengal have opened a new Medical College at Dacca with effect from July, the Ist., 1946. The College is located in the Ramna area of Dacca in the Old Secretariat Building. It is designed to take one hundred students per year. The laboratories, lecture theatre and other DESIDERATA are being arranged in accordance with a standard designed for Medical College put out by the Surgeon General with the Govt. of Bengal.

The hospital facilities being prepared consist of three hundred and twenty (320) beds in the Mitford Hospital plus five hundred (500) beds in the new College Hospital, the latter will be expanded eventually to sox hundred and eighty(680), making a total of thousand (1000) beds for the College Hospital. The arrangement of the Hospital departments is that suggested by -

(a) The Bher Committee report &
(b) The standard plan of the Surgeon General with the Govt./Bengal.

Will you kindly inform this office as to the steps which should be taken to have the College recognised in the laid down by the Medical Council of India. The degree (M.B.B.S.) will be conferred by the University of Dacca. A course at present is modelled on that of the University of Calcutta with certain additions taken from the regulations of the British Liensing Board.

Sd/- W.J.Virjin,
Major, I.M.S.
Principal, Dacca Medical College &
Dean of the Faculty of Medicine,
Dacca University.

Memo. No.139/2/DMC-XV dt/- 16.11.46. Copy forwarded to The Registrar, Dacca Universi for information, & (2) The Surgeon General, Govt. of Bengal, for information.

Sd/- W.J.Virgin,
Major, I.M.S.
Principal, Dacca Medical College &
Dean of the Faculty of Medicine,
Dacca Univerisyt.

উৎস: *ডি গ্রুপ*, ২২৭২/১৯৫০-৫৩, বিষয়: Pakistan Medical Research Council, University of Dacca, 1950-53.

Office of the Principal, Medical College, Dacca.

No.21/DMC/37 dated 4.6.47.
To

The Registrar,
Medical Council of India,
C/o. Director General, Indian Medical Service, New Delhi.

Reference- This office letter No.139/DMC-XV, dated 16th/18th Novr.1946 copy attached for ready reference.

Subject:- Establishment of Medical College at Dacca.

Kindly inform this office as to the steps which should be taken to have the College recognised in the first schedule laid down by the Medical Council of India.

Please treat this as extremely urgent.

Sd/- W. J. Virgin,
Major, I.M.S.
Principal,
Medical College, Dacca.

The University ... proper time under section 11(2) of the Indian Medical Council Act, 1933 for inclusion of the degrees in the First Schedule to the Act.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,

Sd/- A.R.Dutt,
Secretary,
Medical Council of India.

উৎস: *ডি গ্রুপ*, ২২৭২/১৯৫০-৫৩, বিষয়: Pakistan Medical Research Council, University of Dacca, 1950-53.

From

Khan Bahadur Dr.A.H.Butt, M.B., D.P.H.,
Secretary, Medical Council of India,
Regal Buildings, Connaught Place,

To

The Principal,
Dacca Medical College,
Romna, (Dacca.)

New Delhi, the 7th. December, 1946.

Sub: Establishment of Medical College At Dacca.

Sir,

With reference to your letter No.139/DMC-XV, dated the 16th. 18th. November, 1946, on the subject cited above, I have the honour to state that the courses of Instruction and the facilities for teaching as also the Examinations etc. of the proposed College shall have to be inspected on behalf of th Medical Council of India at various stages of the development of the College. It is only then that any steps regarding the recognition of the degree granted by the College can be taken. The University should apply to the Central Government in proper time under section 11(2) of the Indian Medical Council Act, 1933 for inclusion of the degrees in the First Schedule to the Act.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,

Sd/- A.H.Butt,
Secretary,
Medical Council of India.

উৎস: *ডি গ্রুপ*, ২২৭২/১৯৫০-৫৩, বিষয়: Pakistan Medical Research Council, University of Dacca, 1950-53.

পরিশিষ্ট-১৫

ALUMNI DIRECTORY

Batches of Dhaka Medical College(K-01-51)

Adm. Year	1st. Year Session	Batch	Adm. Year	1st. Year Session	Batch
July, 1946--	5th, 4th, 3rd, 2nd Yr.	K-01- K-04	July 1969	1969-70	K-28
July, 1946	1946-47	K-05	Oct. 1970	1970-71	K-29
Oct . 1947	1947-48	K-06	Dec. 1972	1971-72	K-30
Dec .1948	1948-49	K-07	Oct. 1973	1972-73	K-31
Nov .1949	1949-50	K-08	Dec. 1974	1973-74	K-32
Nov. 1950	1950-51	K-09	Dec. 1975	1974-75	K-33
Sept. 1951	1951-52	K-10	Sept. 1976	1975-76	K-34
Sept. 1952	1952-53	K-11	Jan. 1978	1976-77-78	K-35
Aug. 1953	1953-54	K-12	Jan. 1979	1978-79	K-36
July 1954	1954-55	K-13	Dec. 19 79	1979-80	K-37
July 1955	1955-56	K-14	Feb. 1981	1980-8	K-38
Aug. 1956	1956-57	K-15	Feb. 1982	1981-82	K-39
July 1957	1957-58	K-16	Mar. 1983	1982-83	K-40
July 1958	1958-59	K-17	Dec. 1983	1983-84	K-41
July 1959	1959-60	K-18	Jan. 1985	1984-85	K-42
July 1960	1960-61	K-19	Jan. 1986	1985-86	K-43
July 1961	1961-62	K-20	Feb. 1987	1986-87	K-44
Aug. 1962	1962-63	K-21	Apr. 1988	1987-88	K-45
Aug. 1963	1963-64	K- 22	Feb. 1989	1988-89	K-46
Aug. 1964	1964-65	K-23	Feb. 1990	1989-90	K-47
Sept. 1965	1965-66	K-24	April.1991	1990-91	K-48
Sept. 1966	1966-67	K-25	July. 1992	1991-92	K-49
Sept. 1967	1967-68	K-26	July 1993	1992-93	K-50
Sept. 1968	1968-69	K-27	Jan. 1994	1993-94	K-51

উৎস: *Alumni Directory*, *Dhaka Medical College*, Dhaka Medical College Alumni Trust, 2002, p. 13

পরিশিষ্ট-১৬

Medical Planning Officer, Bengal.
Directorate of Medicine.
Writers' Buildings.
Calcutta.

(Copy).

Government of Bengal.
Department of Health and Local Self-Government.
Medical Branch.

...

From - The Deputy Secretary to the Government of Bengal.

To - The Surgeon General with the Government of Bengal.

Memo.No. Medl.8S-64/46 dated Calcutta, the 17th June 1946.

The undersigned is directed to say that Government are pleased to fix the number of seats available for Civil students for admission into the Medical College, Dacca, at 100 for the Session 1946-47 and to distribute the same as below:-

(i)	Muslim.	...	40
(ii)	Scheduled Caste.	...	5
(iii)	General.	...	35
(iv)	Women.	...	10
(v)	Candidates nominated by Government.	...	10
		Total	100

Of the ten seats reserved for women, five should be earmarked for Muslim women and one for Scheduled Caste. Of the ten seats reserved for Government nomination the same proportion as for women should apply.

2. In regards to items (i) to (iv) the selection will be made by an Admission Committee to be appointed by Government for the purpose out of the candidates found to be qualified under the rules prescribed in the Prospectus. If the number of candidates of a particular community or class falls short of the number of seats reserved for it, the remaining seat or seats may be filled up by the selection of candidates of any other community or class.

Sd. M.S.Khan.
Deputy Secretary to the Government of Bengal.

উৎস: *B Proceedings,* B No. 100, SL No. 74, List No. 109, *Health & Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of Bengal,* 1946.

পরিশিষ্ট-১৭

TRUE COPY.

HEADQUARTERS
BASE SECTION
OFFICE OF THE SURGEON
MEDICAL SUPPLY

A.P.O. 465

CERTIFICATE

Place : KANCHRAPARA
BENGAL

Date : 19 March 1946.

The undersigned hereby certify the following Engineer Equipment was excluded from the original inventory of the 371st Station Hospital, A.P.O. 494. The Government of India hereby accepts the following as being part of this installation:

1. Seven (7) Heaters, hot water, Type A with 300 gallon storage tanks.

2. Two (2) Heaters, hot water, Type B with 100 gallon storage tanks.

UNITED STATES GOVERNMENT

By : S/D. Joseph R. Longacre
1st Lt. Mac
Asn 0889386

GOVERNMENT OF INDIA

By : S/D. B. Chatterjee
Special Officer
Government of Bengal.

Certified true copy.

Sd/- B. Chatterjee
Special Officer.
9.7.46

Counter signed.

Sd/- S.K. Ganguli
Superintendent, 10.?.4

Medical Directorate,
Government of East Bengal.
Dacca.

MD-1280

No.

Dated the 19th March, 1948.

The attached is a copy of the equipment taken over by Government of India from the American Hospital at Kanchrapara.

A certified true copy of the original signed by Mr. B. Chatterjee, Special Officer, Government of Bengal and counter signed by Dr. S. K. Ganguli, Superintendent, Kanchrapara T.B. Hospital is in my possession.

In the copy submitted the number of articles which should be demanded as our share is noted. These articles can easily be divided. Other articles are single and cannot be divided. It is suggested that these should be drawn for by lottery. Such articles are indicated by the letter'L' in the list.

[signature]

Surgeon-General with the Govt. of East Bengal.

HAS/19.3.48.

Inventory list of equipment taken over from 371st American Station Hospital, Kanchrapara, showing amount claimed by East Bengal.

Name of article	No. taken over from 371st Station Hospital	No. claimed by East Bengal.
Heaters, hot water, Type A with 300 gallon storage tanks.	Ea 7	2 1 Lottery.
Heaters, hot water, Type B with 100 gallon storage tanks.	– 2	1
Scoop, Gall-stone	– 2	1
Screw driver, Bone	– 2	1
Shears, Plaster of Paris	– 2	1
Shears rib. 15½"	– 1	L.
Skid, bone (lever)	– 1	L.
Snare, Nasal 6½"	– 2	1
Snare, Tonsils	– 1	L.
Sound 18 F.	– 2	1
Sound 20 F.	– 2	1
Sound 22 F.	– 2	1
Sound 24 F.	– 2	1
Sound 28 F.	– 1	L.
Sound 30 F.	– 2	1
Spatula Eye 5 3/4"	– 1	L.
Speculum Ear	– 1	L.
Speculum Eye, Non-magnetic	– 1	L.
Speculum Eye	– 1	L.
Speculum Nasal	– 12	6
Speculum Nasal Kilian	– 1	L.
Speculum Vaginal, Bi-valve	– 1	L.
Spoon, Lens, Daviel.	– 1	L.
Spoon, Lens, Wire-loop	– 1	L.
Spud. Eye.	– 1	L.
Tongs, Skull traction	– 1	L.
Trocar, Antrum	– 1	L.
Tube, breathing Large	– 7	4
Tube, Duodenal, Double lumen.	– 4	2
Tube, Tracheal. Size 2	– 2	1
Tube Trachea Size 4	– 4	2
Tube Trachea Size 5	– 2	1
Tube Trachea Size 6	– 2	1
Anaesthesia Apparatus Complete	– 1	L.
Anaesthesia Apperatus	– 1	L.
Atomizer Set of 4	– 2	1
Balkan Frame Complete	– 12	6
Cabinet, Spec, EENT, Suction & Pressure, 110 Volt. 60 Cycle.	– 1	L.
Lens Spectacle, fitting & Repair	– 1	L.
Battery Transformer, Hospital size, 110 Volts, 60 Cycle.	– 1	L.
Retractor, Abdominal Flexible	– 2	1
Retractor, Abdominal Self-Retaining	– 3	3
Retractor, Abdominal, Single-ended (2 X 12½)	– 2	
Retractor, Abdominal, Supra-pubic	– 2	1
Retractor Brain	– 1	L.
Retractor, Brain, Frazier. Set of 3	– 1	L.
Retractor, Brain, Self-Retaining	– 1	L.
Retractor, [illegible] Eye	– 3	2
Retractor, Eye, Fisher	– 1	L.
Retractor, Mastoid	– 2	1
Retractor, Muscle	– 0	0
Retractor, Tibial, Large	– 1	L.
Retractor, Tissue, 4 sharp prongs.	– 6	3
Retractor, Tissue, Nested	– 5	1
Retractor, Tonsil	– 2	1

Name of article	No. taken over from 371st Station Hospital	No. claimed by East Bengal.
Retractor, Trachea, 3 Prongs	2	1
Retractor, Vein.	4	2
Saw Amputating. 8" blade	1	L.
Saw. Metacarpal.	1	L.
Saw. Plaster	1	L.
Scissors, Bandage	50	25
Scissors, Dissecting, Curve, 5½"	4	2
Scissors, Dissecting Curve, 6½"	43	21
Scissors, Dissecting Curved, 9"	2	1
Scissors Dissecting Straight, 6 3/4"	45	22
Scissors Double blunt, 5½"	4	2
Scissors, Operating 7" straight	1	L.
Scissors, Straight 5½"	2	2
Scissors 1 point Sharp 4½"	2	1
Scissors 1 point sharp 5½"	31	15
Scissors Enucleation 5"	2	1
Scissors, Iris, Angular,	1	L.
Scissors, Iris, Full-Curved.	1	L.
Scissors, Nasal, Angular	1	L.
Scissors, Surgical, Dean.	1	L.
Scissors, Tenotomy	1	L.
Scissors, Tonsils.	2	1
Scissors, Uterine 7 3/4"	2	1
Arch Support, Planter (longitudinal) Male Size	9 - 4	2
Do " " " "	10 - 6	3
Do " " " "	11 - 4	2
Do " " " "	12 - 4	2
Do Combination, Transverse & Longitudinal. Male Size	6 - 1	
Do " "	7 - 3	1
Do " "	8 - 4	2
Do " "	9 - 2	1
Do " "	10 - 6	3
Do " "	11 - 5	2
Do " "	12 - 7	3
Balkan Frame Rope	127 Yds.	63 Yds.
Cardiographspaper	116 Rolls.	58 Rolls.
Cautery Cord Heavy	1	L.
Knife, Nasal, Septum, Swivel Small	1	L.
Knife Operating Handle #3	30	15
Knife operating Handle #4	25	12
Laryngoscope, Adult	1	L.
Mallet, Hard wood	2	1
Mirror, Laryngeal	1	L.
Needle, Aneurism Cooper 6½	5	2
Needle Spinal puncture. 20 gage	13	6
Needle Spinal Puncture 22	10	5
Ophthalmoscope Electric	1	L.
Otoscope Electric	1	L.
Otoscope & Ophthalmoscope Comb Electric	1	L.
Probe. Lachrymal	1	L.
Procto-sigmoidoscope Electric	5	2
Rasp. Antrum Cutting	1	L.
Rasp. Frontal Sinus	1	L.
Raspatory Rib Left.	1	L.
Do " Right	1	L.
Repositor. Iris.	1	L.
Repositor & Probe Iris.	1	L.
Retinoscope Electric	1	L.
Retractor. Abdominal Double ended.	4	2
Procto-Sigmoidoscope. Lamp. Bulb. Lynch #4.	10	5
Screw, Bone. 1 1/8" Molybdenum.	4	2
Screw bone. 1½" Do	8	4
Screw 1 3/4"	2	1
Snare Wire. 28 gage.	1	L.

Name of article	No. taken over from 371st Station Hospital	No. claimed by East Bengal.
Almirah Large with shelves	27	13
Almirah Medium with shelves	35	18
Almirah Mess Utensil	24	12
Almirah Large ½ & ½	66	33
Almirah Food	1	Lottery.
Almirah Small	12	6
Book, case small Glass Door	20	10
Chair Easy Non-Folding Small	243	122
Chair Easy Non-Folding large	3	1
Chair Cushioned Easy	17	8
Chair Barrack	183	91
Chair Cane bottomed	130	65
Cots Newar	303	151
Chair Easy canvas Folding	10	5
Chest of Drawers	42	21
Cabinets filing four drawers	6	3
Foot boards	37	18
Hot case large	4	2
Rack Towel	88	44
Rack Stationery	1	L.
Receptacles Large	49	24
Receptacles Small	16	8
Screens Movable	96	48
Stands Wash hands	171	85
Stools 2' high	142	71
Safe meat and Milk	3	1
Table Officers	14	7
Table 5' X 2'-10"	13	6
Table type writing	19	10
Table writing with cloth top	28	14
Table writing Plain top	44	22
Table wooden Folding	54	27
Table typing	4	2
Table Cook house large	6	3
Table Dressing with mirror	47	22
Table Dressing without Mirror	6	3
Tavle 3' x 3'	10	5
Table Invalid	16	8
Table 8' x 4'	10	5
Table 6' x 3½'	1	L.
Teapoy	112	56
Table Bed side	756	378
Table Card	3	1
Forms W/O Back	148	74
Forms W/Back	94	47
Head rests	10	5
Peg set of six	16	8
Almirah large with shelves	4	2
Almirah Medium with shelves	7	3
Almirah Mess Utensils	8	4
Almirah large ½ & ½	4	2
Book case small - glass doors	7	3
Chair easy Non-folding small	22	11
Chair Barrack	15	7
Chair Canebottomed	9	5
Cot Newar	13	6
Chair easy Canvas folding	3	1
Chest of Drawers	2	1
Dinner Wagon	1	L.
Foot Boards	12	6
Hot case large	3	1
Receptacles large	6	3
Receptacles small	59	30
Screen movable w/cloths	39	19
Stands Wash hands	5	2
Stools 2' high	7	4
Safe meat and Milk	1	L.

উৎস: *B. Proceedings* B No. 107, List No. 109, *Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1949, pp, 1-39.

পরিশিষ্ট-১৮

6

STAFF OF THE DACCA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

1947-48.

Lt.-Col. E. G. Montgomery, M.B.B.S., Ch.B., I.M.S. (Retd.)— *Principal-cum-Superintende*

Anatomy ..	Professor ..	.. Dr. M. A. Rahman, M.B. (Cal.).
	Assistant Professor	.. Vacant
	Demonstrators	.. Dr. A. Sayeed, M.B. Dr. A. R. Khan, M.B. Dr. K. S. Haque, M.B. Dr. S. Abedin, M.B. Dr. B. K. Paul. Dr. M. A. Fatah, M.B.B.S. Dr. S. Azam, M.B. Dr. S. A. Khan, M.B.
Physiology ..	Professor ..	.. Dr. Md. Abdul Karim, M.B.
	Assistant Professor	.. Vacant
	Demonstrators	.. Dr. Q. A. Khaleque, M.B. Dr. A. F. M. Abdul Majid, M.B. Dr. Madan Gopal Basak, M.B.
Pharmacology ..	Professor ..	.. Dr. Altafuddin Ahmed, M.B., D.T.M.
	Assistant Professor	.. Dr. Mir Mansur Ally, M.B., D.P.H.
	Clinical Pharmacologist	Vacant.
	Demonstrator (S.D.P.P.).	Dr. S. H. Ahmed, M.B.
Chemistry ..	Professor ..	.. Mr. S. A. Khan, M.Sc.
	Assistant Professor	.. Vacant
	Demonstrator	.. Mr. Motaharuddin, M.Sc. Mr. Md. Shamsur Rahman, M.Sc. Mr. Md. Ismat Ali, M.Sc.
Pathology ..	Professor ..	.. Dr. Anwar Ali, B.Sc., M.B., D.T.M.
	Demonstrators	.. Dr. A. K. M. A. Quader, M.B. (Cal.) Dr. M. Quadratullah, M.B. (Cal.). Dr. G. Mostafa, M.B. (Cal.).
Medicine ..	Professor ..	.. Dr. A. K. M. Abdul Wahed, B.Sc.,M.I M.R.C.P. (Edin.), F.R.F.P. & S. (Gla
	Resident Physician	.. Dr. T. Basunia, M.B.
	House Physicians	.. Dr. Syed Wakil Ahmed, M.B.B.S. Dr. A. K. M. Abdur Rouf, M.B.
	Registrar ..	.. Dr. Nawab Ali, M.B.
Clinical Medicine ..	Professor ..	.. Dr. Nawab Ali, M.B., D.T.M. (Cal.), M.R.C.P. (Edin.).
	Resident Physician	.. Dr. T. Basunia, M.B.
	Registrar ..	.. Dr. Nawab Ali, M.B.
	House Physician	.. Dr. K. S. Hossain, M.B.
Surgery ..	Professor ..	.. Major F. W. Allinson, M.B., F.R.C.S. (R
	Resident Surgeon	.. Dr. G. Kibria, M.B.
	House Surgeon	.. Dr. A. H. Hydery, M.B.B.S. (Mad.)
Clinical Surgery ..	Professor ..	.. Dr. G. Ahmed, M.B., (Cal.).
	House Surgeon	.. Dr. A. Majid, M.B.

MR. A. RASHID, M.A.—*Secretary, Dacca Medical College Hos*

MR. R. I. CHOUDHURY, M.A.—*Secretary, Dacca Medical Co*

SANCTIONED STAFF OF THE DACCA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

1947-48

Department of Anatomy.

Professor	1
Assistant Professor	1
Demonstrators	3
Technicians	2

Department of Physiology.

Professor	1
Assistant Professor	1
Demonstrators	3

Department of Pharmacology.

Professor	1
Assistant Professor	1
Demonstrators	4
Technicians	3

Department of Pathology.

Professor	1
Assistant Professor	1
Demonstrators	3
Clinical Pathologists	7
Technicians	6

Department of Chemistry.

Professor	1
Demonstrators	3
Technicians	2

Department of Medicine.

Professors	2
Additional Physician	1
Resident Physician	1
Registrar	1
House Physicians	9

Department of Surgery.

Professors	2
Additional Surgeon	1
Resident Surgeon	1
Registrar	1
House Surgeons	10

Department of Midwifery.

Professor	1
Resident Surgeon	1
Registrar	1
House Surgeon	1

Department of Ophthalmology.

Professor	1
Resident Surgeon	1
Registrar	1
House Surgeons	3

Department of Radiology.

Radiologist	1
Assistant Radiologist	1
Technicians	2

উৎস: *Annual Report of the Dacca Medical College & Hospital for the year* 1947-48, pp. 6-7.

পরিশিষ্ট-১৯

Staff of the Dacca Medical College and Hospital, 1948-49.

Lt.-Col. E. G. Montgomery, M.B.B.S., Ch.B., I.M.S. (Retd.).—*Principal-Cum-Superintend*

Mr. T. Ahmed, M.B., D. O.M.S. (Lond.), F.R.C.S. (Edin.), (Took over charge from Lt.-Col. E. G. Montgomery on 19th July, 1948).

Anatomy ..	Professor ..	.. Dr. M. A. Rahman, M.B. (Cal.).
	Demonstrators	.. Dr. A. R. Khan, M.B.
		Dr. B. K. Paul, M.B.
		Dr. M. A. Fatah, M.B.B.S.
		Dr. S. A. Khan, M.B.
		Dr. S. Azam, M.B.
Physiology ..	Professor ..	.. Dr. Md. Abdul Karim, M.B.(Cal.).
	Demonstrators	.. Capt. Q. A. Khaleque, M.B.
		Dr. A. F. M. Abdul Majid, M.B.
		Dr. M. G. Basak, M. B.
		Dr. W. C. Deb, M.B.
Pharmacology ..	Professor ..	.. Dr. Altafuddin Ahmed, M.B., D.T.M.(C
	Assistant Professor	.. Dr. Mir Mansur Ally, M.B., D.P.H.(Cal.
	Clinical-Pharmacologist	Nil.
	Demonstrator	.. Dr. M. Usuf Ali, M. B.
	Senior Demonstrator in Practical Pharmacy.	Dr. S. H. Ahmed, M.B.(Cal.).
Chemistry ..	Professor ..	.. Mr. S. A. Khan, M.Sc.
	Demonstrators	.. Mr. Motaharuddin, M.Sc.
		Mr. Md. Shamsur Rahman, M.Sc.
		Mr. Md. Ismat Ali, M.Sc.
Pathology ..	Professor	.. Dr. Anwar Ali, B.Sc., M.B., D.T·M. (Cal.
	Demonstrators	.. Dr. Qudrutullah, M.B. (Cai.).
		Dr. Q. A. Khaleque, M. B. (Cal.).
		Dr. A Wadood, M.B. (Cal.).
Jurisprudence ..	Professor ..	.. Dr. Mohammed Hossain, M.B.
Hygiene ..	Professor ..	.. Col. F. M. Khan, P.M.S.
Medicine ..	Professor ..	.. Dr. A. K. M. Abdul Wahed, B.Sc.,M.B.(C M.R.C.P.(Edin), F.R.F.P. & S.(Glas.).
	Resident Physician	.. Dr. T. Basunia, M.B.
	Registrar ..	.. Dr. Nawab Ali, M.B.
	House Physician	.. Dr. Syed Wakil Ahmed, M.B.B.S.
Clinical Medicine ..	Professor ..	.. Dr. Nawab Ali, M.B. D.T.M.(Cal.), M.R.C.P.(Edin.).
	Resident Physician	.. Dr. T. Basunia, M.B.(Cal.).
	Registrar ..	.. Dr. Nawab Ali, M.B.(Cal.).
	House Physician	.. Dr. Khandker Siddique Hossain,M.B.(Ca
Surgery ..	Professor ..	.. Major F. W. Allinsons, M.B.,F.R.C.S.
	Resident Surgeon	.. Dr. G. Kibria, M.B.
	Registrar ..	.. Vacant
	House Surgeon	Dr. A. H. Hydery, M.B.B.S.
Clinical Surgery ..	Professor ..	.. Dr. G. Ahmed, M.B. (Cal.).
	Resident Surgeon	.. Dr. G. Kibria, M.B.
	Registrar ..	.. Vacant
	House Surgeon	.. Dr. Lutfor Rahman.
Additional Surgeon' Ward.	Additional Surgeon	.. Dr. A. K. M. Hafizur Rahman,M.B.
	Resident Surgeon	.. Dr. G. Kibria,M.B.(Cal.).
		Dr. Hydery, M.B.(Cal.).
	Registrar ..	.. Nil.
	House Surgeon	.. Dr. E. Huq,M.B.
Obstetric & Gynaeco-logy.	Professor ..	.. Dr. H. Ahmed, M.B. D.G.O.(Dub.), F.R.C (Edin.),F.R.F.P.S.(Glas.).
	House Surgeon	..

Mr. A. Rashid. M.A.—*Secretary, Medical College Hospital.*

Mr. R.I. Chodhary, M.A.—*Secretary, Dacca Medical College.*

Sanctioned Staff of the Dacca Medical College and Hospital, 1948-49.*

Department of Anatomy.

Professor	1
Assistant Professor	1
Demonstrators	6
Technician	2

Department of Physiology.

Professor	1
Assistant Professor	1
Demonstrators	3

Department of Pharmacology.

Professor	1
Assistant Professor	1
Demonstrators	4
Technicians	3

Department of Pathology.

Professor	1
Assistant Professor	1
Demonstrators	3
Clinical Pathologist	7
Curator	1
Bio-chemist	Nil
Technicians	6

Department of Chemistry.

Professor	1
Demonstrators	3
Technicians	2

Department of Medicine.

Professor	2
Additional Physician	1
Resident Physician	1

Department of Medicine (Contd.)

Registrar	1
House Physicians	9
Cardiologist	1

Department of Surgery.

Professors	2
Additional Surgeon	1
Resident Surgeon	1
Registrar	1
House Surgeons	10

Department of Midwifery.

Professor	1
Resident Surgeon	1
Registrar	1
House Surgeons	3

Department of Ophthalmology.

Professor	1
Resident Surgeon	1
Registrar	1
House Surgeon	3

Department of Ear, Nose and Throat.

Professor	1
House Surgeon	2

Department of Radiology.

Radiologist	1
Assistant Radiologist	1
Technicians	2

Department of Anaesthesia.

Nil

5

উৎস: *Annual Report of the Dacca Medical College & Hospital for the year* 1948-49, pp. 32-33.

পরিশিষ্ট-২০

62

Staff of the Medical College and Hospital, Dacca.

1949-50.

Principal-cum-Superintendent.

Mr. T. Ahmed, M. B., D. O. M. S. (Lond.), F. R. C. S. (Edin.).

Dr. W. Mahmud, M. B.—(from 21-9-1949 to 23-9-1949).

Dr. A. K. M. Abdul Wahed, B. Sc.,M. B., M. R. C. P. (Edin.), F. R. F. P. & S. (Glas.)—from 23-9-1949 to 28-9-1949.

Col. F. M. Khan, I. M. S. (Re:d.)—from 29-9-1949 to 28-10-1949.

Mr. T. Ahmed, M. B.,D.O.M.S (Lond.), F. R. C. S. (Edin.)—from 29-10-1949.

Anatomy ..	Professor ..	Dr. M. A. Rahaman, M. B. (Cal.)
	Assistant Professor ..	Dr. S. I. M. Golam Mannan, M. B. (Cal.)
	Demonstrators ..	Dr. B. K. Paul, M. B. (Cal.)
		Dr. S. Azam, M. B. (Cal.)
		Dr. S. A. Khan, M. B. (Cal.)
		Dr. A. Wahed, M. B. B. S.
		Dr. S. A. Shakur, M. B. (Cal.)
		Dr. N. H. Sarker, M. B.
		Dr. A. Quasem, M. B.
		Dr. A Samad, M. B.
		Dr. M. Sikder, M. B.
		Dr. A. Khan, M. B.
Physiology ..	Professor ..	Dr. Md. Abdul Karim, M. B. (Cal.
	Assistant Professor ..	Dr. Md. Ayub Ali, M. B. (Cal.)
	Demonstrators ..	Dr. A. F. M. Abdul Majid, M. B.
		Dr. M. G. Basak, M. B.
		Dr. W. C. Deb, M. B.
		Dr. Tafazzal Hossain Khan, M. B.
		Dr. Md. Abdul Kalam, M. B.
		Dr. Golam Hossain Talukder, M. B.
		Dr. Md. Tazul Hossain, M. B.
Pharmacology ..	Professor ..	Dr. Altafuddin Ahmed, M. B., D. T. M.
		Dr. A. K. S. Ahmed, M. B., M. R. C. P. (Lond.)—from 15-7-1949.
	Assistant Professor ..	Nil.
	Clinical Pharmacologist	Dr. A. Basit, M. B. B. S.
	Demonstrator ..	Dr. S. Zoha, M. B.
	Senior Demonstrator in Practical Pharmacy.	Dr. S. Hossain, M. B.
Chemistry ..	Professor ..	Mr. S A. Khan, M. Sc.
	Assistant Professor ..	Mr. Motaheruddin, M. Sc.—from 15-9-1950.
	Demonstrator ..	Mr. Md. Shamsur Rahman, M. Sc.
		Mr. Md. Ruhul Amin, M. Sc.
Pathology ..	Professor ..	Dr. Anwar Ali, M. B., D. T. M.
	Assistant Professor ..	Dr. Z. Ahmed, M. B., D. P. H.
	Demonstrator ..	Dr. A. Wadood, M. B.
		Dr. A. Jalil, M. B.
		Dr. M. Hassan, M. B.
	Curator ..	Dr. Syed Mozaffar Hasan, M. B. B. S.
Jurisprudence ..	Professor ..	Dr. A. Ahad, M. B.
Hygiene ..		Dr. Ali Nowab Khan, M. B., D. P. H. M. P. H. (Harvard).

Staff of the Medical College and Hospital, Dacca,—*Contd.*

1949-50.

Medicine ..	Professor ..	Dr. A. K. M. Abdul Wahed, B. Sc., M. B., M.R.C.P. (Edin.), F. R. F. P & S. (Glas.).
	Resident Physician ..	Dr. T. Basunia, M. B.
	Registrar ..	Dr. Nowab Ali, M. B.
	House Physician ..	Dr. Syed Wakil Ahmed, M. B. B. S.
Clinical Medicine ..	Professor ..	Dr. Nowab Ali, M. B., D. T. M., (Cal.), M. R. C. P. (Edin.).
	Resident Physician ..	Dr. T. Basunia, M. B. (Cal.)
	Registrar ..	Dr. Nawab Ali, M. B. (Cal.)
	House Physician ..	Dr. Khandker Siddique Hossain, M.B. (Cal.)
		Dr. Z. Yusuf, M. B. B. S. (Pat.).
Surgery ..	Professor ..	Major F. W. Allinson, M. B. B. S. (Lond.), F. R. C. S., I. M. S. (Retd.).
	Resident Surgeon ..	Dr. L. Rahman, M. B.
		Dr. S. N. Ahmed, M. B.
	Registrar ..	Dr. Yusuf Ali, M. B.
	House Surgeon ..	Dr. Enamul Huq.
	...	Dr. Mufazzil Ali.
Clinical Surgery ..	Professor ..	Dr. E. V. Novak.
	Resident Surgeon ..	Dr. A. H. Hyder, M. B.
		Dr. L. Rahman, M. B.
		Dr. M. Rahman, M. B.
	Registrar ..	Dr. Enamul Huq, M. B.
	House Surgeon ..	Dr. M. Rahman,
		Dr. W. A. Ansari.
Additional Surgeon's Ward.	Additional Surgeon ..	Dr. G. Ahmed, M. B. (Cal.)
	Resident Surgeon ..	Dr. L. Rahman, M. B.
		Dr. S. N. Ahmed, M. B.
	Registrar ..	Dr. Enamul Huque, M. B.
	House Surgeon ..	Dr. S. Ahmed, M. B. B. S.
		Dr. Ali Ahmed Choudhury, M. B.
Obstetrics and Gynaecology.	Professor ..	Dr. H. Ahmed, M. B., D. G. O., F. R. C. S. (Edin.), F.R.F.P.S. (Glas.), L.M. (Rotunda), F. S. M. F. (Bengal), F. I. C. S.
	Resident Surgeon ..	Dr. Z. B. Kazi, M. B. B. S.
	House Surgeon ..	Dr. Mukhlesur Rahman.
Clinical Obstetrics & Gynaecology.	Professor ..	Dr. Miss. H. Syeed, M.B. B.S. (Mad.), M. D (Mad.), D. G. O., F. R. C. S. (Edin.), M.R C. O. G. (Lond.), F. I. C. S.
	Resident Surgeon ..	Dr. Z. B. Kazi, M. B.,
	House Surgeon ..	Dr. Moinuddin Ahmed, M. B.
		Dr. Nawab Ali Ahmed, M. B.
Ophthalmology ..	Professor ..	Dr. Md. Refatullah, M. B. (Cal.)
	Resident Surgeon ..	Dr. Shamsuddin Ahmed, M. B.
	House Surgeon ..	Dr. M. A. Jalil, M. B.

Mr. A. Rashid, M.A.,—Secreatary, Dacca Medical College Hospital.
Mr. R. I. Choudhury, M.A.,—Secreatary, Dacca Medical College.

Sanctioned Staff of the Dacca Medical College and Hospital. 1949-50.

Department of Anatomy.

Professor	1
Assistant. Professor	1
Demonstrators	6
Technician	3

Department of Physiology.

Professor	1
Asstt. Professor	1
Demonstrators	3

Department of Pharmacology.

Professor	1
Asstt. Professor	1
Demonstrators	4
Technician	3

Department of Pathology.

Professor	1
Asstt. Professor	1
Demonstrators	3
Clinical Pathologist	7
Curator	1
Technician	6

Department of Chemistry.

Professor	1
Demonstrator	3
Technician	2

Department of Medical Jurisprudence.

Professor	1

Department of Hygiene.

Professor	1

Department of Medicine.

Professors	2
Additional Physician	1
Resident Physician	1
Registrar	1
House Physician	9
Cardiologist	1

Department of Surgery.

Professors	2
Additional Surgeon	1
Resident Surgeon	1
Registrar	1
House Surgeons	10

Department of Midwifery.

Professor	2
Resident Surgeon	1
Registrar	1
House Surgeon	3

Department of Ophthalmology.

Professor	1
Resident Surgeon	1
Registrar	1
House Surgeons	3

Department of Ear, Nose and Throat.

Professor	1
House Surgeons	2

Department of Radiology.

Radiologist	1
Asstt. Radiologist	1
Technicians	2

উৎস: *Annual Report of the Dacca Medical College & Hospital for the year* 1949-50, pp. 62-64.

Staff of the Dacca Medical College and Hospital, 1950-51.

Principal-cum-Superintendent.

Mr. T. Ahmed, M. B. (Cal.), D. O. M. S. (Lond.), F.R.C.S. (Edin.)

Anatomy	Professor ..	Dr M. A. Rahman, M.B. (Cal.)
	Assistant Professors ..	Dr. S. I. M. Golam Mannan, M.B. (Cal.)
		Dr. A. Hossain, M.B. (Cal.)—Joined i October 1950 and left in February, 1951.
		Dr. S. A. Shakur, M. B. (Cal.)—Worked i addition to his own as Demonstrator.
	Demonstrators ..	Dr. S. Azam, M. B. (Cal.)—Left in Aug 1950.
		Dr. N. H. Sarker, M.B. (Cal.)—Left in Sep ember 1950.
		Dr. A. Samad, M.B. (Cal.)
		Dr. M. Shikder, M. B. (Cal.)
		Dr. S. F. Huq, M.B. (Cal.)—Joined in Fe ruary 1951.
		Dr. M. R. Choudhury, M.B. (Cal.)—Joined March 1951.
		Dr. N. Ahmed, M. B. (Cal.)—Joined in Ma 1951.
		Dr. M. G. Moazzam, M.B.B.S—Left in Ap 1951.
		Dr. M. Y. Dewan, M.B.—Joined in Ap 1951.
		Dr. Md. Maniruzzaman, M.B.B.S. Joined April 1951.
		Dr. M. Q. Huque, M.B.B.S. Joined in Ap 1951.
		Dr. S. A. Sobhan, M.B.—Joined in Ap 1951.
		Dr. S A. Khan, M.B. (Cal.)—Left in Febr ary 1951.
Physiology ..	Professor ..	Dr. Md. Abdul Karim, M.B. (Cal.)
	Assistant Professor ..	Dr. Md. Ayub Ali, M.B. (Cal.)
	Demonstrators ..	Dr. Md. Tajul Hossain, M.B. (Cal.)
		Dr. Md. Tofazzul Hossain Khan, M.B. (Ca
		Dr. Md. Abul Kalam, M. B. (Cal.)
		Dr. Md. Ghulam Hossain Talukder, M (Cal.)
		Dr. Md. Mohibur Rahman Choudhury, M (Cal.)
		Dr. Md. Nayeb Ali, M. B. (Cal.)
Pharmacology ..	Professor ..	Dr. A. K. S. Ahmed, M. B. (Cal.), M.R. (Lond.), M. R. C. P. (Edin.) F.R. (Lond.)
	Assistant Professor ..	Vacant.
	Clinical Pharmacologist	Dr. A. Basit, M.B.B.S. (Dac.)
	Demonstrator ..	Dr. S. Zoha, M.B. (Cal.)
	Senior Demonstrator of Practical Pharmacy.	Dr. S. Hossain, M.B. (Cal.)
Chemistry ..	Professor-in-charge ..	Mr. Motaharuddin, M. Sc.—in additio the duties of Assistant Professor.
	Assistant Professor ..	Mr. Motaharuddin, M. Sc.
	Demonstrators ..	Mr. Md. Shamsur Rahman, M. Sc.
		Mr. Md. Ruhul Amin, M. Sc.
Pathology ..	Professor ..	Dr. Anwar Ali, B.Sc., M.B.,D.T. M. (Ca
	Assistant Professor ..	Dr. Z. Ahmed, M.B., D.P.H. (Cal.)
	Curator ..	Dr. Syed Mozaffar Hossain, M.B.B.S. (Os nia).
	Demonstrators ..	Dr. A. K. Khan, M. B. (Cal.)
		Dr. K. Barkatullah, M. B. B. S.(Pat.)
	Clinical Pathologists ..	Dr. H. Rahman, M. B. (Cal.)
		Dr. R. P. Roy, L. M. F., D.T. M. (Cal.)

Staff of the Dacca Medical College and Hospital—(*concld.*)

...prudence ..	Professor ..	Dr. A. Ahad, M. B. (Cal.)
...ene ..	Professor ..	Dr. Ali Nawab Khan M.B., D.P.H—., M. P. H. (Harvard).,
...ical Unit ..	Professor of Medicine ..	Dr A. K. M. Abdul Wahed, B. Sc., M.B. (Cal.) M. R. C. P. (Edin.),F. R. F. P. & S. (Glas.)
	Professor of Clinical Medicine ..	Dr. Nawab Ali, M. B., D. T. M. (Cal.), M. R. C. P. (Edin.)
	Additional Physician ..	Dr. Md. Ibrahim, M. B. (Cal.), M. R. C. P. (Lond.)
	Resident Physician ..	Dr, Syed Hafizuddin Ahmed, M. B. (Cal.)
	Registrar ..	Dr. Sajid Ali Bar Bhuyan, M. B. (Cal.)
	Senior House Physicians	Dr. Syed Wakil Ahmed, M. B. B. S. (Pat.) Dr. A R. Khan, M. B. (Cal.) Dr. G. Mohiuddin, M. B. (Pat.)
	Junior House Physicians	Dr. A. K. M. Yunus, M. B. (Cal) Dr. Z. Yusuf, M. B. B. S. (Pat.) Dr. Md. Shamsul Haque, M. B. (Cal.), Dr. Sirajul Islam, M. B. (Cal.)
...ical Outpatient ..	House Officers ..	Dr. Syed Mohiuddin Ahmed, M. B. B. S. Dr. Bazlul Karim, M. B. B. S.
...gical Unit ..	Professor of Surgery ..	Major F. W. Allinson, M. B. B. S. (Lond.), F. R. C. S. (Eng.)
	Professor of Clinical Surgery.	Dr. E. V. Novak.
	Additional Surgeon ..	Dr. G. Ahmed, M. B. (Cal.)
	Resident Surgeon ..	Dr. Momtazur Rahman, M. B. (Cal.)
	Registarar ..	Dr. Enamul Huq, M. B. (Cal.) Dr. Shamsuddin Ahmed, M. B. (Cal.) Dr. W. A. Ansari, M. B.
	House Surgeons ..	Dr. Enamul Huq, M. B. (Cal.) Dr. Mufazzal Ali, M. B. (Cal.) Dr. Mamtazur Rahman, M. B. Dr. W. A. Ansari, M. B. B. S. Dr. Kamruzzaman, M. B. B. S. Dr. Shamsuddin Ahmed. M. B. Dr. Syed Anwar Ali, M. B.
...thalmology ..	Professor ..	Dr Md. Refatullah, M. B. (Cal.)
	Resident Surgeon ..	Dr. Shamsuddin Ahmed, M. B. (Cal.)
	House Surgeon ..	Dr. M. A. Jalil, M. B. (Cal.)
...etrical & Gynaeco-...ogical Unit.	Professor of Midwifery	Dr H. Ahmed, M. B., D. G. O., F. R. C. S. (Edin.) F.R.F.P.S. (Glas.), L.M. (Rotunda) F. S. M. F. (Bengal), F. I. C. S.
	Professor of Clinical Midwifery.	Dr. Miss H. Sayeed, M.B. B.S. (Mad.), M. D. (Mad.), D.G.O., F.R.C.S. (Edin.), M. R. C. O. G. (Lond.), F. I. C. S.
	Resident Surgeon ..	Dr. Z. B. Kazi, M. B. B. S. Dr. Mrs. H. Halim, M. B. .B S.
	Registrar ..	Dr Moinuddin Ahmed, M. B. (Cal.)
	House Surgeon ..	Dr. Muklesur Rahman, M. B. (Cal.) Dr. Nawab Ali Ahmed, M. B. (Cal.)
...Ray Department ..	Radiologist ..	Dr. E. Forfota.
	Assistant Radiologist ..	Dr. Md. Ibrahim, M.R.C.P. (Lond.).
	Assistant Surgeon ..	Dr. A. K. M. Taherul Islam.
	Electrotherapeutist ...	Dr. Ahmed Hossain, M.B. (Cal.)

Mr. A. Rashid, M.A.—Secretary, Medical College Hospital, Dacca.

Mr. R. I. Choudhury, M.A.—Secretary, Medical College, Dacca.

Sanctioned Staff of the Dacca Medical College and Hospital, 1950-51.

Department of Anatomy.

Professor	1
Assistant Professor	1
Demonstrators	6
Technician	3

Department of Physiology.

Professor	1
Assistant Professor	1
Demonstrators .. :	4

Department of Pharmacology.

Professor	1
Assistant Professor	1
Demonstrators	4
Technician	3

Department of Pathology.

Professor	1
Assistant Professor	1
Demonstrators	3
Clinical Pathologist	7
Curator	1
Technician	6

Department of Chemistry.

Professor	Nil
Assistant Professor	1
Demonstrators	3
Technician	2

Department of Medical Jurisprudence.

Professor	1

Department of Hygiene.

Professor	1

Department of Medicine.

Professors .. ..
Additional Physician ..
Assistant Professor .. ..
Resident Physician .. ..
Registrar .. ..
House Physicians .. ..
Cardiologist .. ..

Department of Surgery.

Professors .. ..
Additional Surgeon .. ..
Resident Surgeon .. ..
Registrar .. ..
House Surgeons .. ..

Department of Midwifery.

Professors ..
Resident Surgeon .. ..
Registrar .. ..
House Surgeons .. ..

Department of Opthalmology.

Professors .. ..
Resident Surgeon .. ..
Registrar .. ..
House Surgeons .. ..

Department of Ear, Nose and Throat.

Professors .. ..
House Surgeons .. ..

Department of Radiology.

Radiologist .. ..
Assistant Radiologist ..
Technician .. ..

Department of Electrotherapeutics.

Electrotherapeutist .. ..

Department of Dentistry.

Professor .. ..

উৎস: *Annual Report of the Dacca Medical College & Hospital for the year* 1950-51, pp. 98-100.

STAFF OF DACCA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL.

19

Principal-cum-Superintendent,

Mr. T. Ahmed, M.B., D.O.M.S.,—(Lond.), F.R.C.S.,—(Edin).

Col. M.K. Afridi, P.M.S. (Took over charge from Mr. T. Ahmed on 1st January, 1952.

Dr. A. K. M. Abdul Wahed. as Vice-Principal (1. 1. 52 to 20. 1. 52) and Dr. Nawab Ali as Vice-Superintendant (1. 1. 52 to 20. 1. 52)

Dr. Nawab Ali, M.B., D.T.M. (Cal.), M.R.C.P. (Edin.) (Took over charge from Col. M. K Afridi on 21-3-52).

Anatomy	Professor	Dr. M. A. Rahman, M.B.
	Assistant Professor	Dr. S. A. Shakur, M.B.
	Demonstrators	Dr. A. Samad, M.B. Dr. M. A. Shikdar, M.B. Dr. S. F. Huq, M.B. Dr. N. Ahmed, M.B. Dr. Yunus Dewan, M.B. Dr. M. Zaman, M.B.B.S. Dr. S. A. Sobhan, M.B. Dr. M. Q. Haque, M.B.B.S. Dr. M. R. Choudhury, M.B.
Physiology	Professor	Dr. Md. Abdul Karim, M.B. (left for U. S. A. Under Point IV Program on 21-3-52) Dr. Md. Abdur Rahman, M.A., M.B., (Cal.) D.T.M. and H. (Liverpool). from 12-4-51
	Assistant Professor	Dr. Md. Ayub Ali, M.B.
	Demonstrators	Dr. Md. Abul Kalam, M.B. Dr. Md. Gholam Hossain Talukdar, M.B. Dr. Md. Mohibur Rahman Choudhury, M.B.
Pharmacology	Professor	Dr. A. K. S. Ahmed, M.B., M.R.C.P. (Lond), M.R.C.P. (Edin), F.R.S.M. (Lond) up to 19th March, 1952. Dr. Mir Mansur Ally, M.B., D.P.H. (from 20th March, 1952.).
	Assistant Professor	Dr. Mir Mansur Ally, M.B., D.P.H. (from 14-12-5[illegible] to 19-3-52).
	Clinical Pharmacologist	Dr. A. Basit, M.B.B.S.
	Senior Demonstrator of Practical Pharmacy.	Dr. S. Hossain, M.B. Dr. S. Ali, M.B.
	Demonstrator	Dr. S. Zoha (up to 15th April, 1952). Dr. Md. H. Rahman (from 21st April 1952). Dr. Kamaluddin Ahmed, M.B.B.S.
Chemistry	Offig. Professor	Mr. Motaharuddin, M.Sc., E.P.G.S.
	Demonstrators	Mr. Md. Shamsur Rahman, M.Sc., E.P.G.S. Mr. Md. Ruhul Amin, M.Sc., E.P.G.S. Vacant.
Pathology	Professor	Dr. Anwar Ali, B.Sc., M.B., D.T.M. (Cal.) (left for U S A under Point IV Program on 21-3-52)
	Offg. Professor	Dr. Q. A. Khaleque (from 21-3-52)
	Assistant Professor	Dr. Q. A. Khaleque, M.B. (Cal), D.B. (Eng).
	Curator, Path. Museum	Dr. Syed Muzaffor Hassan, M.B.B.S. (Osmania)
	Demonstrators	Dr. A. K. Khan, M.B.B.S. (Cal). Dr. K. Barkatullah, M.B.B.S. (Pat).

STAFF OF DACCA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL—*contd.*

...ogy—*Contd.*	Clinical Pathologists	Dr. R. P. Roy, L.M.F., D.T.M. Dr. Hammadur Rahman, M.B. (Cal). Dr. Syed Wakil Ahmed, M.B.B.S. (Pat). Dr. Serajuddin, M.B.B.S. (Dac). Dr. Raisuddin, M.B.B.S. (Cal). Dr. Habibuzzaman, M.B.B.S. (Dac).
... Jurisprudence	Professor ..	Dr. A. Ahad, M.B. (Cal.)
...ene ..	Professor ..	Dr. Nasiruddin, M.B., D.P.H. (Cal.)
...icine ..	Professor ..	Dr. A. K. M. Abdul Wahed, B.Sc., M.B. (Cal) M.R.C.P. (Edin), F.R.F.P.& S. (Glas). left for U.S.A. on 21.3.52.
	Offg. Professor ..	Dr. A. K. S. Ahmed, M.B., M.R.C.P. (Edin) M.R.C.P, (Lond.).
	Resident Physician ..	Dr. Sajid Ali Bar Bhuiyan, M.B.
	Registrar ..	Dr. Mohiuddin, M.B.B.S.
	Sr. House Physician	Dr. Yousuff Ali, M.B.
	Jr. House Physician ..	Dr. A. K. M. Yunus. M.B.
...Medicine ..	Professor ..	Dr. Nawab Ali, M.B., D.T.M. (Cal), M.R.C.P (Edin).
	Resident Physician ..	Dr. Sajid Ali Bar Bhujyan, M.B.
	Registrar ..	Dr. Syed Mohiuddin Ahmed, M.B.B.S.
	Sr. House Physician	Dr. Serajul Islam, M.B.
	Jr. House Physician ..	Dr. Nurul Absar, M.B.
... Physician ..	Addl. Physician ..	Dr. Mohd. Ibrahim, M.B. (Cal), M.R.C.P. (Lond).
	Sr. House Physician	Dr. Syed G. Mohiuddin, M.B.B.S.
	Jr. House Physician ..	Dr. Mohd. Shamsul Haque, M.B. Dr. Mrs. Z. B. Kazi, M.B.B.S.
...d of the Cardio-...y Dept.	Cardiologist ..	Dr. A. K. Shamsuddin Ahmed, M.B. (Cal), M.R.C.P. (Lond), M.R.C.P. (Edin), F.R.S.M.(Lond)
...t Department	Chest Specialist ..	Dr. Md. Lutfor Rahman, M.B. (Cal), D.T.M.(Cal), T.D.D. (Wales).
	Sr. House Physician	Dr. Abdul Mannan, M.B.B.S.
	Jr. House Physician ..	Dr. Nurul Islam, M.B.B.S. Dr. Mansur Alam, M.B.B.S. Dr. Khondker Ahsan Ahmed, M.B.B.S.
...atients' Depart-... (Medical Unit)	Resident Physician .. House Officer ..	Dr. Syed Hafizuddin, M.B. Dr. Bazlur Karim, M.B. Dr. Z. Yousuf, M.B.B.S. (Pat). Dr. Zyaul Hasan Khan, M.B.
...ry ..	Professor ..	Major F. W. Allinson, M.B.B.S. (Lond), F.R.C.S., (Eng).
	Assistant Professor ..	Dr. K. S. Alam, M.B., (Cal.) F.R.C.S. (Edin).
	Resident Surgeon ..	Dr. Enamul Huq, M.B. (Cal).
	Registrars ..	Dr. Wasi Ahmed Ansari, M.B. Dr. K. Zaman, M.B. Dr. Nawab Ali Ahmed, M.B.

STAFF OF DACCA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL—*concld.*

Surgery—contd.	House Surgeons	Dr. Mufazzil Ali, M. B. Dr. Nawab Ali Ahmed, M. B. Dr. Abul Kasem, M. B.
Clnical Surgery	Professor	Dr. E. V. Novak, M. D.,
	Resident Surgeon	Dr. Enamul Hoq, M. B.
	Registrar	Dr. Wasi Ahmed Ansari, M.B. Dr. K. Zaman, M. B. Dr. Nawab Ali Ahmed, M.B.
	House Surgeons	Dr. A. K. M. Salahuddin, M. B. Dr. Wasi Ahmed Ansari, M. B. Dr. K Zaman, M. B. (Cal).
Additional Surgeons' Ward	Addl. Surgeon	Dr. G. Ahmed, M. B.
	Resident Surgeon	Dr. Enamul Hoq, M. B.
	Registrar	Dr. Wasi Ahmed Ansari, M. B. Dr. K. Zaman, M. B. Dr. Nawab Ali Ahmed, M. B.
Ophthalmology	Professor	Dr. Md. Refatullah, M. B. (Cal.)
	Assisiant Professor	Capt. S.A. Lashkor, M.B., D.T.M., D.O.M.S., (Lond), I. M.S. (R).
	Resident Surgeon	Dr. Shamsuddin Ahmed, M. B.
	House Staff	Dr. M. A. Jalil, M.B. Dr. T. H. Khan, M. B. Dr. M. A. Quader, M.B.
Obstetrics and Gynaecological Unit.	Professor	Dr. H. Ahmed, M.B., (Cal.) D.G.O., (Dub), F.R.C.S., (Edin, F.R.F.P.S. (Glas), L. M. (Rot), F. S. M. F. (Bengal), F. I. G. S.
	Resident Surgeon	Dr. Mrs. Z. B. Kazi, M.B.B.S. Dr. Mrs. Hamida Malik, M.B. B.S. Dr. Mukhlesur Rahman, M.B. B.S.
	Registrar	Dr. Mukhlesur Rahman, M.B.
	House Surgeon	Dr. Mukhlesur Rahman, M.B. Dr. Syed Ershad Ali, M. B. B. S. Dr Miss. Meherunnessa, M. B. B. S.
Clnical Obstetrics and Gynaecology.	Professor	Dr. Miss H. Sayeed, M.B.B.S. (Mad), M.D. (Mad), D. G. O., F. R. C. S. (Edin), M.R.C.O.G. (Lond), F.I.C.S.
	Resident Surgeon	Dr. Mrs. Z. B. Kazi, M. B. B. S. Dr. Mrs. Hamidia Malik, M. B. B. S. Dr. Mukhlesur Rahman, M. B.
	Registrar	Dr. Mukhlesur Rahman, M. B.
	House Surgeon	Dr. Mashiur Rahman, M. B. B. S. Dr. A. H. Azami, M. B. B. S. Dr. Miss Shamsunnahar, M. B. B. S.

Mr. A. Rashid, M.A.—Secretary, Medical College Hospital, Dacca.

Mr. R. I. Choudhury, M.A., Secretary, Medical College, Dacca.

SANCTIONED STAFF OF DACCA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL

Department.	1946-47.	1947-48.	1948-49.	1949-50.	1950-51.	1951-52.
Anatomy—						
Professor	1	1	1	1	1	1
Assistant Professor ..	1	1	1	1	1	1
Demonstrators ..	3	3	6	6	6	9
Technicians ..	2	2	3	3	3	3
Physiology—						
Professor	1	1	1	1	1	1
Assistant Professors ..	1	1	1	1	1	1
Demonstrators ..	3	3	3	3	4	4
Pharmacology—						
Professor	Nil	1	1	1	1	1
Assistant Professor ..	Nil	1	1	1	1	1
Demonstrators ..	Nil	4	4	4	4	4
Technician ..	Nil	3	3	3	3	3
Pathology—						
Professor	Nil	1	1	1	1	1
Assistant Professor ..	Nil	1	1	1	1	1
Demonstrators ..	Nil	3	3	3	3	3
Clinical Pathologist ..	Nil	7	7	7	7	10
Curator	Nil	Nil	1	1	1	1
Biochemist ..	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	1
Technician ..	Nil	6	6	6	6	8
Chemistry—						
Professor	1	1	1	1	Nil	Nil
Assistant Professor ..	Nil	Nil	Nil	Nil	1	1
Demonstrators— ..	3	3	3	3	3	3
Technicians ..	2	2	2	2	2	2
Jurisprudence—						
Professor	Nil	Nil	Nil	1	1	1
Assistant Professor, Demonstrator, Technician	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Hygiene—						
Professor	Nil	Nil	Nil	1	1	1
Assistant Professor, Demonstrator, Technician.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

SANCTIONED STAFF OF DACCA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL—*contd.*

Department.	1946-.47	1947-48.	1948-49.	1949-50.	1950-51.	195[illegible]
Medicine—						
Professors	Nil	2	2	2	2	
Additional Physician	Nil	1	1	1	1	
Assistant Professor ..	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
Resident Physician ..	Nil	1	1	1	1	
Registrar	Nil	1	1	1	1	
House Physicians ..	Nil	9	9	9	9	
Honorary House Physicians.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
Cardiologist ..	Nil	Nil	1	1	1	
Surgery—						
Professors.. ..	Nil	2	2	2	2	
Additional Surgeon ..	Nil	1	1	1	1	
Assistant Professor ..	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
Resident Surgeon ..	Nil	1	1	1	1	
Registrar	Nil	1	1	1	1	
House Surgeons ..	Nil	10	10	10	10	
Honorary House Surgeons.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
Midwifery—						
Professors.. ..	Nil	1	1	2	2	
Resident Surgeon ..	Nil	1	1	1	1	
Registrar	Nil	1	1	1	1	
House Surgeons ..	Nil	3	3	3	3	
M.O. Ante-natal Clinic	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
Honorary House Surgeon.s	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
Ophthalmology—						
Professor	Nil	1	1	1	1	
Assistant Professor ..	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
Resident Surgeon ..	Nil	1	1	1	1	
Registrar	Nil	1	1	1	1	
House Surgeons ..	Nil	3	3	3	3	
Honorary House Surgeons.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
Ear, Nose and Throat—						
Professor	Nil	Nil	1	1	1	
House Surgeons ..	Nil	Nil	2	2	2	
Honorary House Surgeons.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	

SANCTIONED STAFF OF DACCA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL—*concld.*

Department.	1946-47.	1947-48.	1948-49.	1949-50.	1950-51.	1951-52.
adiology—						
Radiologist ..	Nil	1	1	1	1	1
Assistant Radiologist	Nil	1	1	1	1	1
Technicians ..	Nil	2	2	2	2	2
naesthesia—						
Lecturer of Anaesthesia.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Anaesthetists ..	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
ectrotherapeutic.						
Electrotherapist. ..	Nil	Nil	Nil	Nil	1	1
. D. and Skin—						
Skin and V. D. Specialist.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	1
House Physician ..	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	3
entistry—						
Professor	Nil	Nil	Nil	Nil	1	1
ediatric Department—						
Specialist in Children Diseases.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
House Physicians ..	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
Honorary House Physician.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	1
lood Bank—						
Blood Transfusion Officer.	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	1
Clinical Pathologists	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	1
. B. Department—						
T. B. Specialist ..	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	1
House Physicians ..	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	3

উৎস: *Annual Report of the Dacca Medical College & Hospital for the year* 1951-52, pp. 140-145.

পরিশিষ্ট-২৩

To

The Surgeon-General with the
Government of East Bengal,
Eden Buildings, Dacca.

Sir,

I have the honour to inform you that I wrote a Practical note Book in Chemical Physiology for the students of the Dacca Medical College in 1948, when I was posted as Demonstrator in the Physiology Department of the same institution. The Book was printed in October'48 but as I had to go away to the U.K. in November, 1948, I could not take any permission from you to publish the same and introduce it to the students. I would be highly obliged if you please permit me to publish the Book now and introduce it to the students of the Dacca Medical College. I attach a copy of the Book herewith.

E.N.T. Department,
Mitford Hospital, Dacca.
24th July'53.

Yours obediently,

Sd/- Dr. A.F.M. Abdul Majid,
M.B., E.P.M.S.,

....

Memo. No. MD/A(1)-1M-7/53//3205 Dated Dacca, the 6 August'53.

Copy with one copy of the Book, submitted to the Secretary to the Government of East Bengal for favour of permitting Dr. Majid to publish the Book.

Deputy Surgeon-General, East Bengal.

Aftab. 4/8.

উৎস: *B Proceedings*, B No. 126, SL No. 100, List No. 109, *Health and Local Self - Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953.

৳ 3/

PRACTICAL

PHYSIOLOGICAL CHEMISTRY

BY

M. A. MAJID, M. B.

Physiology Dept. Medical College

DACCA.

1948

COPY RIGHT RESERVED

FORWARD.

This Practical Physiological Chemistry will be the best guidance for the students in their practical classes. It contains various important hints for the conduction of practical Bio-Chemical Works in the laboratory.

MEDICAL COLLEGE, DACCA.
30. 3. 48

A. Karim
Professor of Physiology.

This book belongs to ______________________

Roll No ______________ Year ______________

First M. B. B. S. Examination ______________ 19 ______

Roll No ______________ Registration No ______

Signature of Examiners ______________

Scanned by CamScanner

উৎস: *B Proceedings*, B No. 126, SL No. 100, List No. 109, *Health and Local Self - Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953.

পরিশিষ্ট-২৪

দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (নিয়মিত) শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ১১৭ জন লেকচার সংখ্যা - ৪৯টি ব্যবহারিক ক্লাশের সংখ্যা - ৪০টি ডেমনস্ট্রেশনের সংখ্যা- ২০টি	তৃতীয় বর্ষ ক্লাশ (নিয়মিত) শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৫০ জন লেকচার সংখ্যা - ২৭টি ডেমনস্ট্রেশনের সংখ্যা - ১৩টি
দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (নভেম্বর) শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৬৩ জন লেকচার সংখ্যা - ১৪টি	তৃতীয় বর্ষ ক্লাশ এম. এম. এফ (নিয়মিত) শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৫ জন লেকচার সংখ্যা - ২৭টি
চতুর্থ বর্ষ ক্লাশ (পুনঃপরীক্ষার্থী) শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ২৯ জন লেকচার সংখ্যা - ১৫টি ডেমনস্ট্রেশনের সংখ্যা- ১৩টি	দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (অকৃতকার্য) শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৫২ জন লেকচার সংখ্যা - ১৪টি
তৃতীয় বর্ষ ক্লাশ (নভেম্বর) শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৪৪ জন লেকচার সংখ্যা - ৩১টি	চতুর্থ বর্ষ ক্লাশ (নভেম্বর) শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৩৮ জন লেকচার সংখ্যা - ২৯ টি
দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (পুরাতন পুনঃপরীক্ষা) শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৭৫ জন লেকচার সংখ্যা - ২৩ জন	তৃতীয় বর্ষ ক্লাশ (নভেম্বর) শিক্ষার্থীর সংখ্যা -২৭ জন লেকচার সংখ্যা -১৫টি ডেমনস্ট্রেশনের সংখ্যা- ৭টি
চতুর্থ বর্ষ ক্লাশ (পুনঃপরীক্ষা) শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ২৭ জন লেকচার সংখ্যা - ১৫ ডেমনস্ট্রেশনের সংখ্যা - ৩টি	তৃতীয় বর্ষ ক্লাশ (এম. এম. এফ নভেম্বর) শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৫ জন লেকচার সংখ্যা - ২০টি

উৎস: *Annual Report of the Dacca Medical College & Hospital for the year* 1950-51, pp. 108-109.

পরিশিষ্ট-২৫

<u>দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (নিয়মিত)</u> শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ১৩১ জন লেকচার সংখ্যা - ৫৪টি ডেমনস্ট্রেশন সংখ্যা - ৮০টি ব্যবহারিক ক্লাশ - ৪০টি	<u>তৃতীয় বর্ষ ক্লাস এম. এম. এফ. (নভেম্বর)</u> শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৫ জন লেকচার সংখ্যা - ২০টি ডেমনস্ট্রেশন সংখ্যা - ১৩টি
<u>দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (বিলম্বিত)</u> শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৩০ জন লেকচার সংখ্যা - ২৫টি	<u>সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. (প্রি-ক্লিনিক্যাল)</u> শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৩০ জন লেকচার সংখ্যা - ৮টি ব্যবহারিক ক্লাশ - ২০টি
<u>দ্বিতীয় বর্ষ (পুনঃ পরীক্ষার্থী)</u> শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৫১ জন লেকচার সংখ্যা - ২৩টি	<u>চতুর্থ বর্ষ ক্লাশ (নিয়মিত)</u> শিক্ষার্থীর সংখ্যা- ৫০ জন লেকচার সংখ্যা- ৩১টি
<u>দ্বিতীয় বর্ষ (পুনঃ পরীক্ষার্থী)</u> শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ১১ জন লেকচার সংখ্যা - ৭টি	<u>চতুর্থ বর্ষ এম.এম.এফ (নিয়মিত)</u> শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৫ জন লেকচার সংখ্যা - ১৭টি ডেমনস্ট্রেশনের সংখ্যা - ৫টি
<u>তৃতীয় বর্ষ ক্লাশ (নিয়মিত)</u> শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৭৯ জন লেকচার সংখ্যা - ২৮টি ডেমনস্ট্রেশনের সংখ্যা - ২০টি	<u>চতুর্থ বর্ষ (নভেম্বর)</u> শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৪৬ জন লেকচার সংখ্যা - ১৩টি
<u>দ্বিতীয় বর্ষ ক্লাশ (নভেম্বর)</u> শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৪২ জন লেকচার সংখ্যা - ২০টি	<u>চতুর্থ বর্ষ ক্লাশ (পুনঃপরীক্ষার্থী)</u> শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ২৩ জন লেকচার সংখ্যা - ৮টি ডেমনস্ট্রেটশন -৭
<u>চতুর্থ বর্ষ ক্লাশ এম. এম. এফ (নভেম্বর)</u> শিক্ষার্থীর সংখ্যা -৫ জন লেকচার সংখ্যা -৭টি	

উৎস: *Annual Report of the Dacca Medical College & Hospital for the year* 1951-52, p. 156.

পরিশিষ্ট-২৬

CHAPTER XXX

Ordinances.

Faculty of Medicine

ORDINANCES & REGULATIONS

Part I—General

1. The Faculty of Medicine shall comprise the following Medical Colleges :

(*a*) Dacca Medical College, Dacca.
(*b*) Sir Salimullah Medical College, Dacca.
(c) Chittagong Medical College, Chittagong.
(*d*) Mymensingh Medical College, Mymensingh.
(e) Sylhet Medical College, Sylhet.
(*f*) Any other Medical College that may hereinafter be established and recognised by the University.

2. Each of the Medical Colleges as specified under Section I above, shall be deemed to be department of the Faculty of Medicine. The Principal of each of these Colleges shall be Head of the Department.

3. Each Department shall comprise the following branches of studies :

(*a*) Medicine,
(*b*) Clinical Medicine,
(c) Surgery,
(*d*) Clinical Surgery,
(e) Obstetrics & Gynaecology,
(*f*) Clinical Obstetrics & Gynaecology,
(*g*) Ophthalmology,
(*h*) Ear, Nose and Throat Diseases,
(*i*) Anatomy,
(*j*) Physiology,

Ordinances.

(*k*) Pharmacology,
(*l*) Pathology,
(*m*) Hygiene and Public Health,
(*n*) Forensic Medicine.

4. The Degrees and Diplomas in this Faculty shall be :—

(*a*) Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B.B.S.),
(*b*) Master of Surgery (M.S.),
(*c*) Doctor of Medicine (M.D.),
(*d*) Master of Obstetrics & Gynaecology (M.O.),
(*e*) Diploma in Medical Radiodiagnosis (D.M. R.D.),
(*f*) Diploma in Medical Radiotherapy(D.M.R.T.),
(*g*) Diploma in Ophthalmology (D.O.),
(*h*) Diploma in Chest & Tuberculous Diseases (D.C.T.D.),
(*i*) Diploma in Tropical Medicine & Hygiene (D. T. M. & H.),
(*j*) Diploma in Clinical Pathology (D.C.P.),
(*k*) Diploma in Child Health (D.C.H.),
(*l*) Diploma in Dermatology (D. D.),
(*m*) Diploma in Laryngology & Otology (D.L.O.),
(*n*) Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.).

5. The University Examinations will be held twice in each year—Annual and Supplementary. The Annual Examination may ordinarily be held in the month of May and the Supplementary Examination within three months of the publication of the results of Annual Examination.

6. A candidate shall not be admitted to any of the University Examinations for any of the above Degrees or Diplomas unless he has—

(*a*) fulfilled the conditions as laid down in the Ordinances & Regulations of the respective Degrees or Diplomas,

Ordinances.

(*b*) furnished a certificate from the Principal of a Medical College :

(*i*) of good conduct,

(*ii*) of having fulfilled the conditions for attendance,

(*iii*) of having satisfactorily completed all appropriate College Examinations and Sessional work,

(c) paid the examination fees to the Controller of Examinations.

7. The academic year would be, normally, from July to June each year.

Part II—Degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

1. Courses of study for the Degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery shall extend over five academic years and shall comprise subjects of medical curriculum as specified in the syllabus laid down from time to time.

2. *There shall be four examinations* :—(1) First Professional M.B.B.S.—Part I; (2) First Professional M.B.B.S.—Part II; (3) Second Professional M.B.B.S. and (4) Final Professional M. B. B. S.

Qualifications for admission into the First Year of the M.B.B.S. Course

3. Candidates must have attained the age of 16 years and six months on or before 1st July of the year of admission to the College and have passed any of the following examinations :

(*i*) Intermediate Examination in Science with Physics, Chemistry and Biology from the Dacca University or Higher Secondary Certificate Examination in Science (Medical Group *i.e.* with Physics, Chemistry and Biology) from any Board of Intermediate and Secondary Education of East Pakistan,

উৎস: *The Calendar, University of Dacca*, The University of Dacca Press, 1969. pp. 336-338.

Professional M.B.B.S. Examination—Part I provided that he has passed the Supplementary College Test Examination prior to Supplementary Examination and has fulfilled all other conditions.

11. A candidate who is eligible for Supplementary Examination may be provisionally admitted to the next higher M.B.B.S. class of a Medical College. In case he fails to pass or fails to appear in the Supplementary Examination he will be transferred back to 1st year M.B.B.S. class and will be required to repeat the course and attend 75% of the numbers of lectures, and practical and demonstration classes held in the subject between the publication of the results of the Supplementary Examination and holding of the next Annual Examination in order to be eligible to reappear in the next Annual Examination. If he fails in this Examination, he will not be allowed to continue the course or to appear in any other Examination.

12. A candidate who will obtain the minimum pass mark in the subject as mentioned under Section 6 and as required under Section 8 above will be declared to have passed the First Professional M.B.B.S. Examination —Part I.

First Professional M.B.B.S. Examination—Part II

13. The subjects for the First Professional M.B.B.S. Examination—Part II shall be (1) Physiology with Biochemistry and (2) Pharmacology.

14. A candidate shall be eligible to appear in the First Professional M.B.B.S. Examination—Part II, if he has fulfilled the following conditions :

(*a*) has passed the First Professional M.B.B.S. Examination—Part I,

(*b*) has undergone for one academic year the following courses in any Medical College under Dacca University or that of a Medical College of a Pakistani University,

Ordinances.

I. Physiology with Biochemistry :

(i) Principlesr of human Physiology including Biochemisy and Bio-physics,

(ii) Practical course in Experimental Physiology, and Chemical Physiology including Biochemistry,

(iii) Elements of the methods of clinical Examination, including use of the common instruments and the Examination of body fluids, demonstrations on both normal and abnormal living subjects.

II. Elementary Bacteriology and Pathology.

III. Elementary Pharmacology.

(c) has attended not less than 75% of the minimum prescribed number of lectures and practical and demonstration classes separately in each of the above subjects and to the satisfaction of the Principal of a Medical College,

(d) has passed the College Test Examination,

(e) has paid an examination fee of Rs.30.00 (Rupees thirty only).

15. The Examination in Physiology with Biochemistry shall consist of :

		Marks
(i)	Two theoretical papers	200
(ii)	An Oral Examination	100
(iii)	A Practical Examination (including Experimental Physiology and Biochemistry)	100
(iv)	Sessional Work—Theoretical	50
	Practical	50
	Total	500

উৎস: *The Calendar*, University of Dacca, The University of Dacca Press, 1969. pp. 341-342.

পরিশিষ্ট-২৮

UNIVERSITY OF DACCA

Syllabuses

for the

Faculty of Medicine

SESSION 1962-63 and after

Containing Syllabuses in :

D.O., D.C.T.D., D.T.M. & H., D.C.P., M.O., D.C.H., D.D., D.L.O., D.M.R.D., D.M.R.T., B.D.S.

Published by
THE UNIVERSITY OF DACCA
EAST PAKISTAN
1963

Price 0·75 ps.
(Seventy five Paisa) only

CONTENTS

No.	Courses of Studies.	Pages.
1.	Diploma in Ophthalmology ...	... 1
2.	Diploma in chest & Tuberculosis Diseases	... 3
3.	Diploma in Tropical Medicine & Hygiene	... 5
4.	Diploma in Clinical Pathology ...	... 14
5.	Master of Obstetrics ...	... 22
6.	Diploma in Child Health ...	... 24
7.	Diploma in Dermatology ...	... 27
8.	Diploma in Laryngology & Otology	... 30
9.	Diploma in Medical Radio-Diagnonis	... 31
10.	Diploma in Medical Radio-Theropy	... 33
11.	Bachelor of Dental Surgery ...	... 35

উৎস: ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল রেকর্ড রুম।

পরিশিষ্ট-২৯

No. 747

To
The Surgeon general, with the Govt. of East Bengal.
Through
The Principal. Dacca Medical College.

Dated, Dacca the 20th September '47.

Sir,

We the students coming from Cal Medical College [have] the honour to state that according to the information gathered [fro]m the office of the Dacca Medical College, we are to pay Rs 41/- to get [our]selves admitted here. We are charged with Rs 15/- as caution [mon]ey, Rs 6/- as union fee and Rs 20/- as admission fee. We are [prep]ared to pay the union fee & caution money. We pray that the [ad]mission fee be exempted because we had already been admitted in [C]al. Medical College and our migration to this college is purely an [ab]normal one. Besides we had to undergo great [un]necessary [diffic]ulties in connection with the migration.

So, we pray that your honour would be kind enough [to] exempt us from paying the admission fee of Rs. 25/- considering [the] above circumstances.

We have the honour to be,
Sir,
yours most obedient pupils.

1. Mazhar Ali Quadri.
2. A.K. M. Nazim-uddowla Chowdhury
3. Mir Mohiuddin.

4. Md Abdul Quader.
5. Tofayel uddin Ahmed
6. Syed A.K. Md. Israil
7. Abdur Rashid.
8. Obaidul Haq.
9. Md. Reazul Islam
10. Md. Hares Dewan.
11. Md Ali Ajmal
12. A.K.M. Aminuddin.
13. Nurul Haq.
14. Anwar Chowdhury
15. Md. Mozammel Hoque.
16. A. T. M. [illegible].
17. Md. Giasuddin
18. Habibur Rahman
19. Sadat Ali Mian.
20. S.A. Wadud.
21. Md Manzur Hossain
22. Rafiquddin Ahmed.
23. Md. Shamsul Huda.
24. Md. Yeahea.
25. Md. Ehsan
26. Mominul Haq.
27. A.T.M. Saifuddowlah.
28. Azizur Rahman.

উৎস: *B Proceedings*, B No. 120, SL No. 94, List No. 109, *Health and Local Self - Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1947.

পরিশিষ্ট-৩০

১৯৫১-৫২		**১৯৫২-৫৩**	
১ম বর্ষ-	১২২ জন	১ম বর্ষ-	১২৫ জন
২য় বর্ষ-	১৯২ জন	২য় বর্ষ-	১৯৪ জন
৩য় বর্ষ-	৯৭ জন	৩য় বর্ষ-	৮৫ জন
৪র্থ বর্ষ-	১২৫ জন	৪র্থ বর্ষ-	১২৫ জন
৫ম বর্ষ-	৮০ জন	৫ম বর্ষ-	১২৯ জন
সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি. এস-	৩০ জন	সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি. এস-	৫৭ জন
এম. এম. এফ-	১০ জন	এম. এম. এফ-	৩২ জন
মোট—	৬৪৬ জন	মোট—	৭৪৮ জন
১৯৫৩-৫৪		**১৯৫৪-৫৫**	
১ম বর্ষ-	১২১ জন	১ম বর্ষ-	১০৯ জন
২য় বর্ষ-	২৪০ জন	২য় বর্ষ-	১৮৯ জন
৩য় বর্ষ-	১০৫ জন	৩য় বর্ষ-	১০৪ জন
৪র্থ বর্ষ-	১৫৭ জন	৪র্থ বর্ষ-	১৮৬ জন
৫ম বর্ষ-	৬৭ জন	৫ম বর্ষ-	১৬৭ জন
সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স-	৬৭ জন	সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স-	৭০ জন
এম. এম. এফ-	৩৮ জন	এম. এম. এফ-	৪০ জন
মোট -	৮০০ জন	মোট -	৮৬৫ জন
১৯৫৫-৫৬		**১৯৫৬-৫৭**	
১ম বর্ষ-	১১৮ জন	১ম বর্ষ-	১২১ জন
২য় বর্ষ-	২০২ জন	২য় বর্ষ-	১৬২ জন
৩য় বর্ষ-	১০২ জন	৩য় বর্ষ-	৯৯ জন
৪র্থ বর্ষ-	১৮১ জন	৪র্থ বর্ষ-	১৭১ জন
সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স-	৭৫ জন	৫ম বর্ষ-	২২২ জন
এম. এম. এফ-	৩৪ জন	সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স-	৮৮ জন
মোট -	৮৯২ জন	এম. এম. এফ-	২৪ জন
		মোট -	৮৮৭ জন।
১৯৫৭-৫৮		**১৯৫৮-৫৯**	
১ম বর্ষ-	১০৩ জন	১ম বর্ষ-	১৩১ জন
২য় বর্ষ-	১৪৫ জন	২য় বর্ষ-	১৪১ জন
৩য় বর্ষ-	১০৫ জন	৩য় বর্ষ-	১১০ জন
৪র্থ বর্ষ-	১৪৭ জন	৪র্থ বর্ষ-	১৬০ জন
৫ম বর্ষ-	২৭৯ জন	৫ম বর্ষ-	২০৮ জন
সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স-	৮৪ জন	সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. কোর্স-	১৫২ জন
এম. এম. এফ-	২২ জন	মোট -	৯০২ জন
মোট -	৯১২ জন		
১৯৫৯-৬০		**১৯৬০-৬১**	
১ম বর্ষ-	১০৮ জন	১ম বর্ষ-	১০২ জন
২য় বর্ষ-	১৫২ জন	২য় বর্ষ-	১৭৯ জন
৩য় বর্ষ-	১১০ জন	৩য় বর্ষ-	১২৫ জন
৪র্থ বর্ষ-	১৫৩ জন	৪র্থ বর্ষ-	১৪২ জন
৫ম বর্ষ-	১৮৮ জন	৫ম বর্ষ-	১৯১ জন
সংক্ষিপ্ত কোর্স এম.বি.বি এস-	১১১ জন	সংক্ষিপ্ত কোর্স এম.বি.বি এস-	৯৫ জন
মোট -	**৮২২ জন**	**মোট -**	**৮৩৪ জন**
১৯৬১-৬২		**১৯৬২-৬৩**	
১ম বর্ষ-	১২৪ জন	১ম বর্ষ-	১৪৫ জন
২য় বর্ষ-	১০৪ জন	২য় বর্ষ-	১৩১ জন
৩য় বর্ষ-	১১২ জন	৩য় বর্ষ-	৯৭ জন
৪র্থ বর্ষ-	১৪৬ জন	৪র্থ বর্ষ-	১৫৭ জন
৫ম বর্ষ-	১৬৩ জন	৫ম বর্ষ-	১৫১ জন

সংক্ষিপ্ত কোর্স এম.বি.বি.এস.-	৪৬ জন
মোট -	**৭০১ জন**

সংক্ষিপ্ত কোর্স এম.বি.বি এস-	৬২ জন
বি.ডি.এস.	১৪ জন
মোট-	**৭৫৭ জন**

১৯৬৩-৬৪

১ম বর্ষ-	১৪৫ জন
২য় বর্ষ-	১৮১ জন
৩য় বর্ষ-	১১৯ জন
৪র্থ বর্ষ-	১২৩ জন
৫ম বর্ষ-	১৭৪ জন
সংক্ষিপ্ত কোর্স এম.বি.বি.এস.-	৪৬ জন
মোট -	**৭৮৮ জন**

বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা

দক্ষিণ আফ্রিকান	১ জন
বার্মিজ	৬ জন
মালয়েশিয়ান	৪ জন
নেপালি	৩ জন
সিলন	১ জন
উগান্ডা	১ জন
টাঙ্গানিকা	১ জন
মোট -	**১৭ জন।**

১৯৬৪-৬৫

১ম বর্ষ-	১৫৩ জন
২য় বর্ষ-	১২৬ জন
৩য় বর্ষ-	১৩১ জন
৪র্থ বর্ষ-	১৩১ জন
চূড়ান্ত বর্ষ-	১৩৩ জন
সি.সি-	০৮ জন
মোট	**৬৮২ জন**

বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা—

দক্ষিণ আফ্রিকান-	১ জন
বার্মিজ-	২ জন
নেপালি-	৪ জন
সিলন-	১ জন
মালয়শিয়ান-	৭ জন
উগান্ডা-	১ জন
তানজেনিয়ান-	১ জন
পেলেস্টাইন-	১ জন
ইউ.এস.এ-	১ জন
মোট-	**১৯ জন।**

১৯৬৫-৬৬

১ম বর্ষ-	১৫৫ জন
২য় বর্ষ-	১৪৩ জন
৩য় বর্ষ-	১১৮ জন
৪র্থ বর্ষ-	১৩৯ জন
৫ম বর্ষ-	১৫১ জন
সি.সি-	০১ জন
মোট -	**৭০৭ জন**

বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা

দক্ষিণ আফ্রিকান-	১ জন
বার্মিজ-	১ জন
নেপালি-	৪ জন
সিলন-	১ জন
মালয়শিয়ান-	৬ জন
সিঙ্গাপুর-	১ জন
ইউ.এস.এ-	১ জন
মালায়ান-	১ জন
উগান্ডা-	১ জন
তানজেনিয়ান-	১ জন
পেলেস্টাইন-	১ জন
সুদানিস-	১ জন
কেনিয়ান-	১ জন
মোট -	**২১ জন।**

১৯৬৬-৬৭

১ম বর্ষ-	১১৬ জন
২য় বর্ষ-	৮৮ জন
৩য় বর্ষ-	১১০ জন
৪র্থ বর্ষ-	১১৪ জন
৫ম বর্ষ-	১৬২ জন
সংক্ষিপ্ত কোর্স এম.বি.বি.এস.-	১ জন
মোট -	৭৮৫ জন

বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা (জাতীয়তা অনুসারে)

বার্মিজ	১ জন
নেপালি	৭ জন
সিলনিস	১ জন
মালয়শিয়ান	৬ জন
সিঙ্গাপুর	২ জন
ইউ.এস.এ	১ জন
ইরাকি	১ জন
মালায়ান	১ জন
উগান্ডা	১ জন
তানজেনিয়ান	১ জন
জর্ডান	১ জন
সুদানিস	১ জন
কেনিয়ন	১ জন
ফিলিপিনো	১ জন
মোট =	২৬ জন

১৯৬৭-৬৮

১ম বর্ষ-	১৫১ জন
২য় বর্ষ-	১৪৮ জন
৩য় বর্ষ-	১৩১ জন
৪র্থ বর্ষ-	১৬৪ জন
৫ম বর্ষ-	১৭৬ জন
মোট -	**৭৭০ জন**

১৯৬৯-১৯৭০

১ম বর্ষ	
ছাত্র	১৫৩ জন
ছাত্রী	৪৭ জন
২য় বর্ষ	
ছাত্র	৯৭ জন
ছাত্রী	৪০ জন

বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা (জাতীয়তা অনুসারে)	
ইরাকি	১ জন
জর্ডানিয়ান	১ জন
সুদানিস	১ জন
নেপালি	৭ জন
সিঙ্গাপুরিয়ান	১ জন
ফিলিপিনো	১ জন
মালায়ান	১ জন
কেনিয়ান	১ জন
মালয়শিয়ান	১ জন
আমেরিকান (ইউ.এস.এস)	১ জন
সিনহালিস জন	১
মোট -	১৭ জন

৩য় বর্ষ	
ছাত্র	১২৫ জন
ছাত্রী	২৩ জন
৪র্থ বর্ষ	
ছাত্র	১০৫ জন
ছাত্রী	৩৫ জন
৫ম বর্ষ	
ছাত্র	১০৮ জন
ছাত্রী	৫৯ জন
মোট ছাত্র	৫৮৮ জন
মোট ছাত্রী	২০৪ জন
মোট	৭৯২ জন

বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নরূপ—

দেশ	ছাত্র	ছাত্রী
মালদীপ	১	
পেলেস্টাইন	৩	
জর্ডান	৫	
সিঙ্গাপুর	২	
নেপাল	৭	১
ইরান	১	
সিরিয়া	৩	
মালয়েশিয়া	২	
ইরাক	১	
ফিলিপাইন	-	১
মালায়ী	১	
কেনিয়া	-	১
সুদান	১	
মোট-	২৭ জন	৩ জন

১৯৬৮-৬৯

১ম বর্ষ	২য় বর্ষ	৩য় বর্ষ	৪র্থ বর্ষ	৫ম বর্ষ	মোট	
ছাত্র	১০৯	১২৭	১০৬	৭৮	১০৪	৫২৪
ছাত্রী	৪২	২৪	৩৫	৪৬	৪৪	১৯১
মোট	১৫১	১৫১	১৪১	১২৪	১৪৮	৭১৫ জন

জুলাই ১৯৬৮-জুন ১৯৬৯ সালে অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরীক্ষায় পাকসকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা

ছাত্র	১০৮ জন
ছাত্রী	২৩ জন
মোট	১৩১ জন

বিদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা

	নেপাল	মালয়শিয়া	সিরিয়া	ইরাক	জর্ডান	সুদান	ইরান	মালভী	কেনিয়া	সিলন	সিঙ্গাপুর	ফিলিপাইন	ইউ.এস.এ
ছাত্র	৭	৪	৩	১	৩	১	১	১	-	১	২	-	-
ছাত্রী	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	১

মোট ছাত্র -	২৪ জন
মোট ছাত্রী-	০৪ জন
মোট-	**২৮ জন।**

উৎস : *Annual Report from* 1951-52 to 1968-69*, University of Dacca.*

পরিশিষ্ট-৩১

ক্রমিক নং	ছাত্রছাত্রীর নাম	যোগ্যতা
১	২	৩
১	আবদুল মান্নান ভূঁইয়া	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
২	নুরান নাসিম মোহাম্মদ একরামুল	ঐ
৩	মোসা: শামসুন নাহার বেগম	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৪	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৫	মোঃ নুরুল আলম	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৬	মোঃ রুহুল আমিন	ঐ
৭	আমিনুর রহমান	ঐ
৮	মোঃ মুজিবুল হক	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৯	মোঃ আজহারুল ইসলাম	ঐ
১০	রতন লাল বিশ্বাস	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
১১	রবিন দত্ত	ঐ
১২	আবদুর রহমান	ঐ
১৩	মোঃ মাসুদুল হক	ঐ
১৪	মিসেস কানিজ মাওলা	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
১৫	মিসেস সাইদা বোকতেরা জাহান	ঐ
১৬	আবু শহীদ আবুল কাদের মাহমুদ	ঐ
১৭	মোঃ মাহফুজুল হক খান	ঐ
১৮	মিস সেলিমা খাতুন	ঐ
১৯	মিস রেবা বিশ্বাস	ঐ
২০	মিস নার্গিস জাহান	ঐ
২১	মিস নার্গিস আরা বেগম	ঐ
২২	মিস ফরিদা খানম	ঐ
২৩	মোহাম্মদ আবদুর রইস খান	ঐ
২৪	মোহাম্মদ শহীদুর রহমান	ঐ
২৫	হরিপদ ঘোষ	ঐ
২৬	শামসুস সালেহীন	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
২৭	এ.কে.এম শামসুদ্দীন	ঐ
২৮	আবদুল হালিম ভূঁইয়া	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
২৯	হাবিবুর রহমান	ঐ
৩০	মোহাম্মদ জাহিদ হোসাইন	ঐ
৩১	সৈয়দ মোহাম্মদ খোয়াজ খিজির	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৩২	মিস নেহেরুন নেসা বেগম	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৩৩	মিস গুলসান-আরা-বেগম	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৩৪	মোঃ রফিকুল হাসান খান	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৩৫	হরিদাস বিশ্বাস	ঐ
৩৬	মিস মরিয়ম নেসা	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৩৭	মোঃ কলমধর মিয়া	ঐ
৩৮	এ.এন.মোঃ আমিনুজ্জামান	ঐ
৩৯	মিস হাসনা বেগম	ঐ
৪০	এ.বি.এম হুমায়ূন কবির	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৪১	মিস ফৌজিয়া আকতার বানু	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৪২	বার্টিন গুদা (Bertin Guda)	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৪৩	বানিফেস সন্তোস কোস্তা (Baniface Sontosh Costa)	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৪৪	মিস হোসনে আরা বেগম	ঐ
৪৫	মোঃ মুজিবুর রহমান	ঐ
৪৬	মোঃ আবদুর রহমান খান	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৪৭	সফিউল হাসান	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ

৪৮	কমল কৃষ্ণ দেবনাথ	ঐ
৪৯	সৈয়দ মঈনুল হক	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৫০	এহসানুর রহমান	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৫১	আফজাল আহমেদ খান	ঐ
৫২	কে তাসনিম সদরউদ্দিন	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৫৩	মোঃ মহসিন	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৫৪	আনোয়ারুল করিম	ঐ
৫৫	জগদীশ চন্দ্র হালদার	ঐ
৫৬	মোঃ সিদ্দিকুল হক	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৫৭	মি. মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৫৮	শাহ ফতেহ আলী মিয়া	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৫৯	মিস সাইদা শেহনাজ ফাতিমা	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৬০	মিস জিনাত ইয়াসমিন	ঐ
৬১	মিস আমিনা হক	ঐ
৬২	মিস ফারজানা শেখ	ঐ
৬৩	মিস পারভীন রহমান	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৬৪	মিস কুলসুন আবদুল্লাহ্	ঐ
৬৫	করম আলী আবদুল সুলতান	ঐ
৬৬	এফ.এম মিজামির রহমান	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৬৭	আসরার আহমেদ (Asrar Ahmed)	ঐ
৬৮	মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ	ঐ
৬৯	আবুল কাশেম মুজিরুদ্দিন মাহমুদ	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৭০	মিস শিরিন মুমতাজ	ঐ
৭১	মিস সেরিনা বেগম	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৭২	শামসুদ্দিন আহমেদ	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৭৩	সৈয়দ মিজানুর রহমান	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৭৪	মিস আজিজা খানম চৌধুরী	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৭৫	মোঃ ইউসূফ আলী	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৭৬	মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ূম	ঐ
৭৭	রতন কৃষ্ণ দাস	ঐ
৭৮	মিস রওশন আকতার বেগম	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৭৯	মোঃ জয়নুল আবেদীন খান	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৮০	আমিন মোহাম্মদ আলী	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৮১	মিস ফাতেমা বেগম	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৮২	আমিনূল হাসান	ঐ
৮৩	মোঃ রফিক	ঐ
৮৪	মিস রোকেয়া পারভীন	ঐ
৮৫	মোঃ গোলাম সাত্তার রহমান	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৮৬	সৈয়দ মোকারম আলী	ঐ
৮৭	এস.এম. সামিরুল হক সিরাজ	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ
৮৮	থমাজ জুডি চিয়াং (Thomas Jude Chiang)	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৮৯	মাইকেল পেরিস	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ
৯০	মোঃ লূৎফর রহমান	ঐ
৯১	মিস. মুরশিদা বেগম	ঐ
৯২	গিয়াসউদ্দিন	ঐ
৯৩	মামুনূর রহমান চৌধুরী	ঐ
৯৪	মুকতাদির হুসাইন চৌধুরী	ঐ
৯৫	মোঃ আতাউর রহমান	ঐ
৯৬	মিস ফেরদৌস বানু	ঐ
৯৭	সচীন্দ্র নাথ দাস	ঐ
৯৮	সিরাজুল ইসলাম	ঐ
৯৯	মিস. গুসজার বানু	ঐ
১০০	গাজী শামসুল হুদা	ঐ

১০১	মোঃ শফিকুর রহমান	ঐ
১০২	এ.কে.এম. মাজহারুল করিম	ঐ
১০৩	মিস রওশন আরা বেগম	ঐ
১০৪	মিস শাহানা বেগম	ঐ
১০৫	মিস আমিনা বেগম	ঐ
১০৬	মিস রেহানা জাহান	ঐ
১০৭	মিস মমতাজ বেগম	ঐ
১০৮	মিস তাহমিদা বেগম	ঐ
১০৯	মিস ইফাত আরা বেগম	ঐ
১১০	মিস মাসুদা রুখসানা	ঐ
১১১	মিস মাহবুব আরা উম্মেহ জোহরা	ঐ
১১২	মোঃ মতিউর রহমান	ঐ
১১৩	মিস. হোসনে আরা বেগম	ঐ
১১৪	মিস. সাবিতা মন্ডল	ঐ
১১৫	এস.এম. শাহাদাৎ হোসাইন	ঐ

১৯৬৫-৬৬ শিক্ষাবর্ষে সরকার কর্তৃক মনোনয়নকৃত ৩১ জন শিক্ষার্থীদের নাম ও যোগ্যতা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	ছাত্রছাত্রীর নাম	যোগ্যতা	ঠিকানা	মনোনয়ন
১	২	৩	৪	৫
১	আবদুল মাজেদ	এইচ.এস.সি-২য় বিভাগ	পোঃ এবং গ্রামঃ দিরকট পিঃএসঃ দিরকট, জেলাঃ পুনচ, আজাদ কাশ্মীর	পাকিস্তান সরকার মিনিস্টিরি অব কাশ্মীর এফেয়ার
২	মোহাম্মদ সিদ্দিকুর আনসারী	ঐ	পোঃ এবং গ্রামঃ Chawnca, পুলিশ স্টেশন, ফালোয়া, জেলাঃ শিয়ালকোর্ট, পশ্চিম পাকিস্তান।	ঐ
৩	হুমায়ূন ফারুক আহমেদ	এইচ.এস.সি-তৃতীয় বিভাগ	মিরপুর সিটি, আজাদ কাশ্মির, পশ্চিম পাকিস্তান	ঐ
৪	মিস মাহমুদা	ঐ	কাশ্মির প্যালেস, স্যাটেলাইট টাউন, ব্লক নং ই/৩৫, গুজরানওয়ালা (Guzranwala) পশ্চিম পাকিস্তান	ঐ
৫	Geoffcey Wilson Lungu	এইচ.এস.সি-প্রথম বিভাগ	গ্রামঃ ইয়েরেজ জুংগু, এন.এ মাজুকুজুকু, পোঃ অফিস. Embangwebi জেলাঃ মাজিমবা মালওয়ী, কেন্দ্রীয় আফ্রিকান,	Government of Pakistan Ministry of Foreign affairs
৬	মিস সেলিম আকতার খান	F.S.C এফ.এস.সি-প্রথম বিভাগ	পো. অফিস বক্স নং ১৬১১৫ নাইরোবি, কেনিয়া, পূর্ব আফ্রিকা	ঐ
৭	সালাউদ্দিন মোহাম্মদ Zeincla Bedeen	F.S.C এফ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ	পো. অফিস বক্স নং ৩৫, umrualea, সুদান	ঐ
৮	মিস. নাসিম কানসার (kansar)	এফ.এস.সি-প্রথম বিভাগ	বাড়ী নং ৫২, স্ট্রীট নং ৪০, গাওয়ালমাণ্ডী, লাহোর	গর্ভনমেন্ট অফ ওয়েস্ট পাকিস্তান বা প. পাঃ সরকার

৯	মির আহমেদ খান	ঐ	গ্রাম এবং পো: অফিস নওশেরী কালান, জেলা পেশওয়ার, প: পাকিস্তান	ঐ
১০	সালাউদ্দিন আহমেদ সিদ্দিক	এফ.এস.সি-প্রথম বিভাগ	৬৬৪-সি, গুলাস হাট কলোনি, প: পাকিস্তান	ঐ
১১	মুহাম্মদ ইকবাল	ঐ	গ্রাম: হালা নতুন পো: অফিস এফ পুলিশ স্টেশন: হালা নতুন, জেলা: হায়রাবাদ, প: পাকিস্তান	ঐ
১২	মিস আমিনা বানু	এইচ.এস.সি	গ্রাম: খাগা খরি বাড়ি পো: অফিস: ডাবুঃ, পুলিশ স্টেশন, ডিমলা, জেলা: রংপুর	পূর্ব পাকিস্তান সরকার
১৩	মিস মমতাজ বেগম	এইচ.এস.সি (পাশ)	গ্রাম: দিয়ারাজ, পো: অফিস: বেলকুলিয়া, পুলিশ স্টেশন, এবং জেলা: খুলনা।	ঐ
১৪	এস.এম. আমির আলী	ঐ	গ্রাম: শাকদাহা, পো: অফিস: চন্দনবইসা, পুলিশ স্টেশন, সারিয়া কান্দি, বগুড়া	ঐ
১৫	মিস ইসমাত বানু	এইচ.এস.সি-দ্বিতীয় বিভাগ	লালমোহন, সাহা স্ট্রিট নারিন্দা, ঢাকা	পূর্ব পাকিস্তান সরকার
১৬	মিস রিজিয়া বানু	এইচ.এস.সি (পাশ)	গ্রাম: মেহেদীপুর, পো: অ: শিবগঞ্জ, জেলা: রাজশাহী	ঐ
১৭	আবুল কালাম আজাদ	এইচ.এস.সি-২য় বিভাগ	পো: অ: এবং গ্রাম কাওরিখারা, পুলিশ স্টেশন, সরুপকাঠি, বরিশাল	ঐ
১৮	মোঃ মুকতার আলী	ঐ	গ্রাম: বেন্নাল, পো: অ: বেরোশ, পু: স্টে: ধামরাই, ঢাকা	ঐ
১৯	খন্দকার হামিদুল হক	এইচ.এস.সি (পাশ)	গ্রাম: শেখহাট, পো: অ: শেরপুর টাউন, ময়মনসিংহ	ঐ
২০	নুরুন নবী	ঐ	নতুন কলেজ রোড, বরিশাল টাউন, জেলা: খুলনা	ঐ
২১	বদরুদ্দিন সৈয়দ ফারুক আহমেদ	ঐ	গ্রাম: আট্রাকা, পো: অ: ফকির হাট, পুলিশ স্টেশন, ফকির হাট, জেলা: খুলনা	ঐ
২২	মির্জা আবু সৈয়দ মোঃ মাজহারুল হক	ঐ	১২, বড়বাসা, সি,কে ঘোষ রোড, ময়মনসিংহ রোড, ময়মনসিংহ	ঐ
২৩	মিস সুরাইয়া আবদুল আজিজ	আই.এস.সি (পাস)	৮১ বায়তুল মোকারম ঢাকা-২	ঐ
২৪	মোঃ আনিসুর রহমান	এইচ.এস.সি (পাস)	পো: অ: এবং গ্রাম হাটুরিয়া, পু: স্টেশন গোসাইরহাট, জেলা: ফরিদপুর	ঐ
২৫	মোঃ আলী হাফিজ	ঐ	গ্রাম: মৌখালী, পো: অফিস: চাঁদখেলী, পু: স্টেশন, পাইকগাছা জেলা: খুলনা	ঐ
২৬	মিস. ফেরদৌস আমির	আই.এস.সি-৩য় বিভাগ	প্রযত্নে মি.এম আলম, পি,এফ এস পরিচালক মিনিস্ট্রি অফ ফরেন এ্যাফেয়ার্স, লাইসন অফিস, আবাসিক: ২৩০, ধানমন্ডি, আর.এ. রোড নং ১৫, ঢাকা	ঐ

২৭	মিস বেগম কাওসার আরা	এইচ.এস.সি (পাস)	গ্রাম: চরহোগলা, পো: অ: মেহেন্দীগঞ্জ, জেলা: বরিশাল।	ঐ
২৮	মিস জাহানারা বেগম	ঐ	গ্রাম: ভূয়ানিপুর, পো: অফিস: জুগীর কান্দা, পো: স্টেশন, উজিরপুর, জেলা: বাকেরগঞ্জ	ঐ
২৯	মোঃ শাহ আলম	আই.এস.সি-৩য় বিভাগ	গ্রাম: কামারগাঁও, পো: অফিস: কাটিয়াপারা, পু: স্টেশন, শ্রীনগর, জেলা: ঢাকা	
৩০	এ.কে.এস. আবদুল হামিদ	এইচ.এস.সি (পাস)	গ্রাম: ছোট কিপট, পো: অ: নওবেনকি, পু: স্টেশন, শ্যামনগর, জেলা: খুলনা	ঐ
৩১	মিস সাঈদা নাসরিন রহমান	এইচ.এস.সি (compt)	গ্রাম: সাটুরি (sautore) পো: অ: দৌলিয়াঘাট, পু: স্টে: বোয়ালমারী, জেলা: ফরিদপুর	ঐ

উৎস: *East Pakistan Provincial Assembly*, First Session 1967, The 3rd January-9th January 1967, East Pakistan Government Press, Dacca 1967, pp 191-197.

পরিশিষ্ট-৩২

ধর্মের ভিত্তিতে বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবিন্যাস করে নিম্নে দেখানো হলো–

শ্রেনিবিন্যাস	মোট শিক্ষাদানকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা		চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. পরক্ষির উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা		চূড়ান্ত মেম্বারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	
১৯৪৭-৪৮	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী
ইউরোপিয়ান এবং এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই
ভারতীয় খ্রিস্টান	১	,,	,,	,,	,,	,,
হিন্দু	৬৮	,,	,,	,,	,,	,,
মুসলমান	২৪০	১	,,	,,	,,	,,
অন্যান্য	নাই	নাই	,,	,,	,,	,,
মোট	৩০৯	১	,,	,,	,,	,,

১৯৪৮-৪৯	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী
ইউরোপিয়ান এবং এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই
ভারতীয় খ্রিস্টান	১	,,	,,	,,	,,	,,
হিন্দু	২	১	,,	,,	,,	,,
মুসলমান	৩৯৯	৭	১২	,,	,,	,,
অন্যান্য	নাই	নাই	নাই	,,	,,	,,
মোট	৪০২	৮	১২	,,	,,	,,

১৯৪৯-৫০	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী
ইউরোপিয়ান এবং এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই
ভারতীয় খ্রিস্টান	১	,,	,,	,,	,,	,,
হিন্দু	২	১	,,	,,	,,	,,
মুসলমান	৪৮৭	৮	২০	,,	,,	,,
অন্যান্য	নাই	নাই	নাই	,,	,,	,,
মোট	৪৯০	৯	২০	,,	,,	,,

১৯৫০-৫১	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী
ইউরোপিয়ান এবং এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই
ভারতীয় খ্রিস্টান	১	,,	,,	,,	,,	,,
হিন্দু	৫	১	,,	,,	,,	,,
মুসলমান	৫৭২	১৫	১৬	১	,,	,,
অন্যান্য	নাই	নাই	নাই	নাই	,,	,,
মোট	৫৭৮	১৬	১৬	১		

১৯৫১-৫২	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী
ইউরোপিয়ান এবং এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই
ভারতীয় খ্রিস্টান	১	,,	,,	,,	,,	,,
হিন্দু	৭	১	,,	,,	,,	,,
মুসলমান	৬৭২	১৮	৩২	,,	,,	,,
অন্যান্য	নাই	নাই	নাই	,,	,,	,,
মোট	৬৮০	১৯	৩২	,,	,,	,,

উৎস : *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year* 1946-52, p. 148.

পরিশিষ্ট-৩৩

১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক বিবরণী* থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিম্নের তালিকায় পাওয়া যায়।

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা
প্রথম এম.বি.বি.এস.		
মার্চ ১৯৫০	৯৭ জন	৪৪ জন
আগস্ট ১৯৫০	১২০ জন	৪৯ জন
দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস.		
জানুয়ারি ১৯৫০	২৪ জন	২৪ জন
আগস্ট ১৯৫০	৪০ জন	২২ জন
চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস.		
জানুয়ারি ১৯৫০	৮জন	৫ জন
আগস্ট ১৯৫০	১৪ জন	৩ জন

উৎস : *Annual Report for 1950-51, University of Dacca*, p. 21.

১৯৫১-৫২

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা
প্রথম এম.বি.বি.এস.		
জানুয়ারি ১৯৫১	৯৫ জন	৪১ জন
জুলাই ১৯৫১	১৫৪ জন	৭২ জন
দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস.		
জানুয়ারি ১৯৫১	৫৫ জন	২৬ জন
জুলাই ১৯৫১	৬৪ জন	৪৩ জন
চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস.		
ফেব্রুয়ারি ১৯৫১	২৬ জন	১৪ জন
জুলাই ১৯৫১	২৭ জন	১২ জন

উৎস : *Annual Report for 1951-52, University of Dacca*, p.27.

১৯৫২-৫৩

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা
প্রথম এম.বি.বি.এস.		
জানুয়ারি ১৯৫২	৬১ জন	৪১ জন
জুলাই ১৯৫২	১৭৯ জন	৩৩ জন
দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস.		
জানুয়ারি ১৯৫২	৬৩ জন	২৩ জন
জুলাই ১৯৫২	৯২ জন	৪৩ জন
চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস.		
জানুয়ারি ১৯৫২	৪৩ জন	২০ জন
জুলাই ১৯৫২	৫৭ জন	২০ জন

উৎস : *Annual Report for 1952-53, University of Dacca*, p. 19.

১৯৫৩-৫৪

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা
প্রথম এম.বি.বি.এস.	২৭৮ জন	১০৫ জন
দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস.	১৮৬ জন	৮৬ জন
চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস.	১২৬ জন	৫৮ জন

উৎস : *Annual Report for 1953-54, University of Dacca*, p. 28.

১৯৫৪-৫৫

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের হার
প্রথম এম.বি.বি.এস.	২৩৯ জন	১০২ জন	৪২.৬৭%
দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস.	১৭৭ জন	৫১ জন	২১.৮১%
চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস.	১৫২ জন	৩৭ জন	২৪.৩৪%

উৎস : *Annual Report for 1954-55, University of Dacca*, p. 41.

১৯৫৬-৫৭

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের হার
প্রথম এম.বি.বি.এস. ১৯৫৬ জুলাই ১৯৫৬ ডিসেম্বর	 ২৩৯ জন ৫৮ জন	 ৫৩ জন ৪৫ জন	 ৪৮.৬% ৫৩%
দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস. ১৯৫৬ জুলাই ১৯৫৬ ডিসেম্বর	 ১২৯ জন ১০০ জন	 ৬৫ জন ৬০ জন	 ৫০% ৬০%
চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. ১৯৫৬ জুলাই ১৯৫৬ ডিসেম্বর	 ১০১ জন ১৬২ জন	 ২৭ জন ৩৯ জন	 ২৭% ২৪%
সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. ১৯৫৬ জুলাই ১৯৫৬ ডিসেম্বর	 ২৮ জন ২৮ জন	 ৫ জন ৪ জন	 ১৭% ১৪.৭%

উৎস : *Annual Report for 1956-57, University of Dacca*, p. XI-XII.

১৯৫৭-৫৮

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের হার
প্রথম এম.বি.বি.এস. ১৯৫৭ এপ্রিল, অনুষ্ঠিত আগস্ট ১৯৫৭ নভেম্বর, অনুষ্ঠিত জানুয়ারি ১৯৫৮	 ১০৮ জন ৭০ জন	 ৫৭ জন ৪৫ জন	 ৫২.৭% ৬৪.৩%
দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস. ১৯৫৭ এপ্রিল, অনুষ্ঠিত আগস্ট ১৯৫৭ নভেম্বর, অনুষ্ঠিত জানুয়ারি ১৯৫৮	 ১০৩ জন ১১০ জন	 ৫৪ জন ৬৩ জন	 ৫২.৪% ৫৭.২%
চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. ১৯৫৭ এপ্রিল, অনুষ্ঠিত আগস্ট ১৯৫৭ নভেম্বর, অনুষ্ঠিত জানুয়ারি ১৯৫৮	 ১৯৫ জন ১৮৯ জন	 ৪০ জন ৬২ জন	 ২০.৫% ৩২.৮%
সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. ১৯৫৭ এপ্রিল, অনুষ্ঠিত আগস্ট ১৯৫৭ নভেম্বর, অনুষ্ঠিত জানুয়ারি ১৯৫৮	 ৪৭ জন ৩৬ জন	 ৮ জন ১৩ জন	 ১৭% ৩৬%

উৎস : *Annual Report for 1957-58, University of Dacca*, p. XI.

১৯৫৯-৬০

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের হার
প্রথম এম.বি.বি.এস. ১৯৫৯ মে ১৯৫৯ নভেম্বর	 ১৪৬ জন ১২১ জন	 ৬৪ জন ৭০ জন	 ৪৩.৮% ৫৭.৮%
দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস. ১৯৫৯ মে ১৯৫৯ নভেম্বর	 ৯৮ জন ১০৪ জন	 ৪৮ জন ৬১ জন	 ৪৯% ৫৮.৬%
চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. ১৯৫৯ মে ১৯৫৯ নভেম্বর	 ১৬৬ জন ১৬১ জন	 ৪৪ জন ৬৬ জন	 ২৬.৫% ৪০.৯%
সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. ১৯৫৯ মে ১৯৫৯ নভেম্বর	 ৫২ জন ৪৭ জন	 ৮ জন ১৪ জন	 ১৫.৩% ২৯.৮%

উৎস : *Annual Report for 1959-60, University of Dacca*, p. Appendix-C.

১৯৬০-৬১

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের হার
প্রথম এম.বি.বি.এস. ১৯৬০ এপ্রিল ১৯৬০ নভেম্বর ১৯৬১ এপ্রিল	 ১৬৬ জন ১২৫ জন ১৮৭ জন	 ৯৫ জন ৭৭ জন ১১৩ জন	 ৫৭.২% ৬১.৬% ৬০%
দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস. ১৯৬০ এপ্রিল ১৯৬০ নভেম্বর ১৯৬১ এপ্রিল	 ১০৬ জন ৮৪ জন ৯০ জন	 ৬০ জন ৫৪ জন ৫৩ জন	 ৫৬.৬% ৬৪.৩% ৫৯%
চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. ১৯৬০ এপ্রিল ১৯৬০ নভেম্বর ১৯৬১ এপ্রিল	 ১৪৫ জন ১৪০ জন ১৭০ জন	 ৫৭ জন ৪৯ জন ৬৬ জন	 ৩৯.৩% ৩৫% ৩৮.৮%
সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. ১৯৬০ এপ্রিল ১৯৬০ নভেম্বর ১৯৬১ এপ্রিল	 ৯০ জন ৮৮ জন ৬২ জন	 ১৫ জন ২৭ জন ২৮ জন	 ৩০% ৩০% ৪৫%

উৎস : *Annual Report for 1960-61, University of Dacca*, p.

১৯৬১-৬২

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের হার
প্রথম এম.বি.বি.এস. ১৯৬১ নভেম্বর	৮৯ জন	৬৮ জন	৭৬%
দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস. ১৯৬১ নভেম্বর	১০৩ জন	৭৯ জন	৭৭%
চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. ১৯৬১ নভেম্বর	১৪৩ জন	৭৪ জন	৫২%
সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. ১৯৬১ নভেম্বর	৩৩ জন	১২ জন	৩৬%

উৎস : *Annual Report for 1961-62, University of Dacca*, p. Appendix-C.

১৯৬২-৬৩

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের হার
প্রথম এম.বি.বি.এস.			
১৯৬২ জুন	১৫৫ জন	১০০ জন	৬৪%
১৯৬২ ডিসেম্বর	৮৭ জন	৫২ জন	৫৯%
দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস.			
১৯৬২ জুন	১২৬ জন	৬০ জন	৪৭%
১৯৬২ ডিসেম্বর	১৩৮ জন	৭৩ জন	৫২%
চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস.			
১৯৬২ ডিসেম্বর	১৩২ জন	৪৮ জন	৩৬%
সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস.			
১৯৬২ জুন	৫২ জন	৩০ জন	৫৭%
১৯৬২ ডিসেম্বর	১৫ জন	৫ জন	৩৩%

উৎস : *Annual Report for 1962-63, University of Dacca*, p. Appendix-C.

১৯৬৩-৬৪

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের হার
প্রথম এম.বি.বি.এস.			
১৯৬৩ নভেম্বর	৫৭ জন	৩৭ জন	৬৫%
১৯৬৩ মে	১৭২ জন	১১৯ জন	৬৮.৯%
দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস.			
১৯৬৩ নভেম্বর	১১৩ জন	৮৩ জন	৭৩%
১৯৬৩ মে	১৮৬ জন	১৩৪ জন	৭২%
চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস.			
১৯৬৩ নভেম্বর	১৫০ জন	৭১ জন	৪৭%
১৯৬৩ মে	১৭১ জন	১০১ জন	৫৯%
সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস.			
১৯৬৩ নভেম্বর	১৪৭ জন	৯৮ জন	৬৬.৬%
১৯৬৩ মে	৮১ জন	৫৩ জন	৬৫%
প্রথম বি.ডি.এস. ১৯৬২	৬ জন	৫ জন	৮৩%
প্রথম ১৯৬২ জুন	৬ জন	৫ জন	৮৩%
প্রথম ১৯৬৩ জুন	২ জন	২ জন	১০০%
দ্বিতীয় ১৯৬৩ জুন	৫ জন	৫ জন	১০০%

উৎস : *Annual Report for 1963-64, University of Dacca*, p. Appendix-C.

১৯৬৫-৬৬

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের হার
প্রথম প্রফেশনাল এম.বি.বি.এস.			
পার্ট-১, নভেম্বর ১৯৬৫	৩২৯ জন	২৫৮ জন	৭৮.৪%
পার্ট-২, নভেম্বর ১৯৬৫	১৯০ জন	১২৬ জন	৬৬.৩%
পার্ট-১, এপ্রিল ১৯৬৬	৮২ জন	৬৮ জন	৮২.৯%
পার্ট-২, এপ্রিল ১৯৬৬	৭২ জন	৫৪ জন	৭৫%
প্রথম এম.বি.বি.এস.			
নভেম্বর ১৯৬৫	৩৬ জন	২১ জন	৫৮%
এপ্রিল ১৯৬৬	১৯ জন	১১ জন	৫৭.৮%
দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস.			
নভেম্বর ১৯৬৫	৩৬ জন	২১ জন	৫৮%
এপ্রিল ১৯৬৬	৪৯ জন	৪৪ জন	৪৯.৭%
চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস.			
নভেম্বর ১৯৬৫	১৮৮ জন	৯২ জন	৪৮.৯%
এপ্রিল ১৯৬৬	১২৭ জন	৭০ জন	৫৫%

সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. নভেম্বর ১৯৬৫ এপ্রিল ১৯৬৬	২৮৫ জন ১০৮ জন	১৭৬ জন ৭৫ জন	৬১.৭৫% ৬৯.৫%
প্রথম প্রফেশনাল বি.ডি.এস. নভেম্বর ১৯৬৫	১০ জন	৭ জন	৭০%
দ্বিতীয় প্রফেশনাল বি.ডি.এস. নভেম্বর ১৯৬৫	৪ জন	৩ জন	৭৫%
তৃতীয় প্রফেশনাল বি.ডি.এস. নভেম্বর ১৯৬৫	২ জন	২ জন	১০০%
চূড়ান্ত প্রফেশনাল বি.ডি.এস. নভেম্বর ১৯৬৫	৫ জন	৫ জন	১০০%
সাপ্লিমেন্টারি প্রথম প্রফেশনাল বি.ডি.এস. মার্চ ১৯৬৬	৩ জন	৩ জন	১০০%
সাপ্লিমেন্টারি দ্বিতীয় প্রফেশনাল বি.ডি.এস. মার্চ ১৯৬৬	১ জন	১ জন	১০০%

উৎস: *Annual Report for 1965-66, University of Dacca*, p. Appendix-C.

১৯৬৭-৬৮

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের হার
প্রথম প্রফেশনাল এম.বি.বি.এস. পার্ট-১, নভেম্বর ১৯৬৭	৩৪১ জন	২৬৩ জন	৭৭.১%
প্রথম প্রফেশনাল এম.বি.বি.এস. পার্ট-২, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮	৩০৩ জন	১৭৪ জন	৫৭.৪%
দ্বিতীয় এম.বি.বি.এস. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮	৩২৫ জন	১৯৪ জন	৫৯.৭%
দ্বিতীয় প্রফেশনাল এম.বি.বি.এস. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮	৩৯ জন	১৭ জন	৪৩.৫৮%
চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮	৪০২ জন	২২৮ জন	৫৬.৬%
দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস. ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮	১২১ জন	১১৩ জন	৯০.৩ %
প্রথম প্রফেশনাল বি.ডি.এস. জানুয়ারি ১৯৬৮	১৮ জন	১৪ জন	৭৮%
দ্বিতীয় প্রফেশনাল বি.ডি.এস. জানুয়ারি ১৯৬৮	৮ জন	৪ জন	৫০%
তৃতীয় প্রফেশনাল বি.ডি.এস. জানুয়ারি ১৯৬৮	১০ জন	৬ জন	৬০%
চূড়ান্ত প্রফেশনাল বি.ডি.এস. জানুয়ারি ১৯৬৮	৫ জন	৫ জন	১০০%
সাপ্লিমেন্টারি প্রথম প্রফেশনাল এম.বি.বি.এস. পার্ট-১, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮	৮৮ জন	৫৩ জন	৬০.২%
সাপ্লিমেন্টারি প্রথম প্রফেশনাল এম.বি.বি.এস. পার্ট-২, জুন ১৯৬৮	১২৭ জন	৯৬ জন	৭৭%
সাপ্লিমেন্টারি দ্বিতীয় প্রফেশনাল এম.বি.বি.এস. জুন ১৯৬৮	১৩০ জন	১২০ জন	৯২.৩%
সাপ্লিমেন্টারি দ্বিতীয় প্রফেশনাল এম.বি.বি.এস. জুন ১৯৬৮	৪৩ জন	২৮ জন	৬৪.৯%
সাপ্লিমেন্টারি চূড়ান্ত এম.বি.বি.এস. জুন ১৯৬৮	১৭০ জন	১৩৪ জন	৭৯%

উৎস : *Annual Report for 1967-68, University of Dacca*, p. Appendix-VIII.

পরিশিষ্ট ৩৪

১৯৭০-৭১

পরীক্ষার নাম	অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাসের হার
ডি.এম.আর.ভি. পার্ট-১, জুলাই ১৯৭১	১ জন	১ জন	১০০%
ডি.এম.আর.ভি. পার্ট-২, জুলাই ১৯৭১	৫ জন	৩ জন	৬০%
ডি.এম.আর.টি. পার্ট-১, জুলাই ১৯৭১	১ জন	১ জন	১০০%
ডি.এম.আর.টি. পার্ট-২, জুলাই ১৯৭১	৫ জন	৩ জন	৬০%
ডি.এল.ও. পার্ট-১, জুলাই ১৯৭১	১ জন	১ জন	১০০%
ডি.এল.ও. পার্ট-২, জুলাই ১৯৭১	১জন	১জন	১০০%
ডি.ডি. জুলাই ১৯৭১	২ জন	২ জন	১০০%
চূড়ান্ত এম.ফিল. (মেডিকেল) জুলাই ১৯৭১	৪ জন	৪ জন	১০০%
প্রিলিমিনারি এম.ফিল. (মেডিকেল) জুলাই ১৯৭১	পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি		

উৎস : *Annual Report for* 1970-71, *University of Dacca*, p. Appendix-C (XI).

পরিশিষ্ট-৩৫

ক্রমিক	পদ		বেতন স্কেল	
			সার্ভিস অফিসার	সরাসরি নিয়োগ
১.	অধ্যাপক	সার্জারি	৫৫০রুপি-৭৫/২-১০০০/-	রুপি ৬৫০-৫০/২-৭৫০-৭৫/২-১২০০/-
২.	অধ্যাপক	ক্লিনিক্যাল সার্জারি	৫৫০রুপি-৭৫/২-১০০০/-	রুপি ৬৫০-৫০/২-৭৫০-৭৫/২-১২০০/-
৩.	অধ্যাপক	মেডিসিন	৫৫০রুপি-৭৫/২-১০০০/-	রুপি ৬৫০-৫০/২-৭৫০-৭৫/২-১২০০/-
৪.	অধ্যাপক	ক্লিনিক্যাল মেডিসিন	৫৫০রুপি-৭৫/২-১০০০/-	রুপি ৬৫০-৫০/২-৭৫০-৭৫/২-১২০০/-
৫.	অধ্যাপক	মিডওয়াইফারি	৫৫০রুপি-৭৫/২-১০০০/-	রুপি ৬৫০-৫০/২-৭৫০-৭৫/২-১২০০/-
৬.	অধ্যাপক	ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারি	৫৫০রুপি-৭৫/২-১০০০/-	রুপি ৬৫০-৫০/২-৭৫০-৭৫/২-১২০০/-
৭.	অধ্যাপক	অপথালমোলজি	৫৫০রুপি-৭৫/২-১০০০/-	রুপি ৬৫০-৫০/২-৭৫০-৭৫/২-১২০০/-
৮.	অধ্যাপক	প্যাথলজি	৫৫০রুপি-৭৫/২-১০০০/-	রুপি ৬৫০-৫০/২-৭৫০-৭৫/২-১২০০/-
৯.	অধ্যাপক	ফার্মাকোলজি	৫৫০রুপি-৭৫/২-১০০০/-	রুপি ৬৫০-৫০/২-৭৫০-৭৫/২-১২০০/-
১০.	অধ্যাপক	এনাটমি	৫৫০রুপি-৭৫/২-১০০০/-	রুপি ৬৫০-৫০/২-৭৫০-৭৫/২-১২০০/-
১১.	অধ্যাপক	ফিজিওলজি	৫৫০রুপি-৭৫/২-১০০০/-	রুপি ৬৫০-৫০/২-৭৫০-৭৫/২-১২০০/-
১২.	অধ্যাপক	মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স	সিভিল সার্জনের বেতন স্কেল, যেমন ৫০০-৫০-৯০০ রুপি (অসংশোধিত) অথবা ৪৫০-৭৫/২-৭৫০ (সংশোধিত) প্রতিমাসে নন প্রাকটিস ভাতা ১৫০% রুপি	

উৎস: *B Proceedings*, B No. 106, SL No. 80, List No. 109, *Health and Local Self - Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1951.

পরিশিষ্ট-৩৬ (ক)

ক্রমিক	নাম ও পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বেতন (রুপি)
১.	টি. আহমেদ প্রিন্সিপাল	এম. বি. ডি. ও. এম. এস., ডি. ও. এম. এস. এফ. আর. সি. এস.	২০০০/- পি,এম
২.	ডাক্তার এ. কে. এম. আবদুল ওয়াহেদ অধ্যাপক, মেডিসিন	এম. বি. এফ., এম. আর. সি. পি, এফ. আর. এফ. পি. এস	৫০/- পি. এম. ৭৫/২-১০০০/-
৩.	ডাক্তার নওয়াব আলী অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল মেডিসিন	এম.বি, ডি.টি. এম, এম. আর. সি. পি.	৫৫০/-ঐ
৪.	মেজর এফ. ডব্লিউ এলিনসন অধ্যাপক, সার্জারি	এম. বি., বি. এস., এল. আর. সি. পি., এফ. আর. সি. এস.	২৫০০/- পি. এম ১০০-২৮০০/-
৫.	লে. কর্ণেল গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ক্লিনিক্যাল সার্জারি	এম. বি.	৫৫০/পি. এম. ৭৫/১০০০
৬.	ডাক্তার হাবিব উদ্দিন আহমেদ অধ্যাপক, মিডওয়াইফারি	এম. বি., ডি. জি. ও, এল. এম., এফ. আর. এফ. পি. এবং এস. এম. আর. সি. পি.	৫৫০/পি. এম. ঐ
৭.	ডাক্তার আনোয়ার আলী অধ্যাপক, ফার্মাকোলজি	বি. এসসি, এম.বি, ডি.টি.এম	৫৫০/পি. এম ঐ
৮.	ডাক্তার আলতাফ উদ্দিন আহমেদ অধ্যাপক, ফার্মাকোলজি	এম. বি., ডি.টি.এম	৫৫০/পি. এম ঐ
৯.	ডাক্তার এম. আব্দুর রহমান অধ্যাপক, এনাটমি	এম. বি	৫৫০/পি. এম ঐ
১০.	ডাক্তার মো. এ করিম অধ্যাপক, ফিজিওলজি	এম. বি	৫৫০/পি. এম ঐ
১১.	ডাক্তার মো. রেফাতউল্লাহ অধ্যাপক, অপথালমোলজি	এম. বি.	৫৫০/পি. এম ঐ
১২.	ডাক্তার সুরত আলী খান অধ্যাপক, কেমিস্ট্রি	এম. এসসি	৩০০/পি. এম. ৫০/২ ৭০০- ৭৫/২-১০০০

উৎস: *ডি গ্রুপ*, ৩৫২৮/১৯৪৬-৪৭, বান্ডেল নং- ৯, ক্রমিক নং-২৩৩, Sub: Recognition of Teachers of Dacca Medical College, University of Dacca.

পরিশিষ্ট-৩৬ (খ)

List of the teaching staff of the Dacca Medical College.

Name:	Academic qualifications:	Salary drawn.	Local Addre[ss]
1. Mr. T. Ahmed, Principal, Dacca Medical College.	M.B., D.O.M.S. (Lond) F.R.C.S. (Edin).	Rs. 2000/- per month	Baptist Missio[n] Sadarghat, Dac[ca]
2. Major F.W. Allinson, Prof. of Surgery.	M.B.B.S. (Lond)., F.R.C.S. (Eng).	Rs. 2500/- per month	71, Secretariat Dacca.
3. Dr. E. V. Novak, Prof. of Cl. Surgery.	M.D. M.Ch.	Rs. 1500/- per month Rs. 150/- as allowance	-do-
4. Dr. A.K.M. Abdul Wahed, Prof. of Medicine.	B.Sc. (Cal), M.M.F. (Beng), M.B. (Cal.), F.R.F.P. & S (Glas), M.R.C.P. (Edin.)	Rs. 550/- per month plus D.A.	11, Purana P[altan] Dacca.
5. Dr. Nawab Ali, Prof. of Clinical Medicine.	M.B., D.T.M. (Cal), M.R.C.P. (Edin).	Rs. 550/- per month plus D.A.	7, Bakshibazar Dacca.
6. Dr. Habiburddin Ahmed, Prof. of Midwifery,	M.B., F.R.C.S. (Edin), F.R.F.P.S. (Glas), D.G.O. (Dub), L.M. (Rot) F.S.M.F. (Bengal).	Rs. 625/- per month plus D.A.	15, Purana Palt[an] Dacca.
7. Dr. Anwar Ali, Prof. of Pathology.	B.Sc. M.B., D.T.M. (Cal)	Rs. 500/- per month plus D.A.	10, Purana Palt[an] Dacca.
8. Dr. A.K.S. Ahmed, Prof. of Pharmacology,	M.B., M.R.C.P. (LOND), M.R.C.P. (EDIN), F.R.S.M. (LOND).	Rs. 550/- per month plus D.A.	46, Purana Pa[ltan] Dacca.
9. Dr. Md. Rafatullah, Prof. of Ophthalmic Surgery.	M.B.	Rs. 700/- per month plus D.A.	52, Purana Palta[n] Dacca.
10. Dr. Md. Abdur Rahman, Prof. of Anatomy,	M.B.	Rs. 550/- per month plus D.A.	11 Purana Paltan, Dacca.
11. Dr. Md. Abdul Karim, Prof. of Physiology.	M.B.	Rs. 526/8/- per month plus D.A.	76, Kazi Alauddi[n] Dacca.
12. Mr. Surat Ali Khan, Prof. of Chemistry.	M.Sc. 1st Class	Rs. 380/- per month plus D.A.	31, Agamashi Lane Dacca.
13. Dr. Z. Ahmed, Asstt. Prof. of Pathology.	M.B., D.P.H.	Rs. 320/- per month plus D.A.	26, Madan Mohan B[asak] Road, Wari, Dacca

উৎস: *ডি গ্রুপ*, ৩৫২৮/১৯৪৬-৪৭, বান্ডেল নং- ৯, ক্রমিক নং-২৩৩, Sub: Recognition of Teachers of Dacca Medical College, University of Dacca.

পরিশিষ্ট ৩৭

ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের অনুমোদিত শিক্ষকদের তালিকা নিম্নে দেখানো হলে,

মেডিকেল ইউনিট

ক্রমিক	পদ	সংখ্যা
১.	অধ্যাপক, মেডিসিন	১
২.	অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল মেডিসিন	১
৩.	অতিরিক্ত ফিজিশিয়ান	১
৪.	আবাসিক ফিজিশিয়ান	১
৫.	সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর (ব্যবহারিক ফার্মাসি)	১
৬.	রেজিস্ট্রার (সাময়িক)	১

সার্জিকাল ইউনিট

ক্রমিক	পদ	সংখ্যা
১.	অধ্যাপক, সার্জারি	১
২.	অধ্যাপক, সার্জারি	১
৩.	অতিরিক্ত, সার্জন	১
৪.	রেজিস্ট্রার (সাময়িক)	১
৫.	রেসিডেন্ট সার্জন	১

গাইনোকোলজিকাল ইউনিট

ক্রমিক	পদ	সংখ্যা
১.	অধ্যাপক, মিডওয়াইফারি	১
২.	অধ্যাপক, ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারি	১
৩.	আবাসিক সার্জন	১
৪.	রেজিস্ট্রার (সাময়িক)	১

অফথালমোলজি বিভাগ

ক্রমিক	পদ	সংখ্যা
১.	অধ্যাপক, অফথালমোলজি	১
২.	আবাসিক সার্জন	১
৩.	রেজিস্ট্রার	১

প্যাথলজি বিভাগ

ক্রমিক	পদ	সংখ্যা
১.	অধ্যাপক, প্যাথলজি	১
২.	সহকারী অধ্যাপক, প্যাথলজি	১
৩.	ডেমনস্ট্রেটর	১
৪.	কিউরেটর	১

ফার্মাকোলজি বিভাগ

ক্রমিক	পদ	সংখ্যা
১.	অধ্যাপক, ফার্মাকোলজি	১
২.	ডেমনস্ট্রেটর	৩

এনাটমি বিভাগ

ক্রমিক	পদ	সংখ্যা
১.	অধ্যাপক, এনাটমি	১
২.	সহকারী অধ্যাপক, এনাটমি	১
২.	ডেমনস্ট্রেটর	৬

কেমিস্ট্রি বিভাগ

ক্রমিক	পদ	সংখ্যা
১.	রাসায়নিক পরীক্ষক এবং অধ্যাপক, কেমিস্ট্রি	১
২.	সহকারী অধ্যাপক	১
৩.	ডেমনস্ট্রেটর	৩

ফিজিওলজি বিভাগ

ক্রমিক	পদ	সংখ্যা
১.	অধ্যাপক, ফিজিওলজি	১
২.	সহকারী অধ্যাপক, ফিজিওলজি	১
৩.	ডেমনস্ট্রেটর	৩

হাইজিন বিভাগ

ক্রমিক	পদ	সংখ্যা
১.	অধ্যাপক, হাইজিন (খণ্ডকালীন)	১

মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স বিভাগ

ক্রমিক	পদ	সংখ্যা
১.	অধ্যাপক, মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স	১

রেডিওলজি বিভাগ

ক্রমিক	পদ	সংখ্যা
১.	রেডিওলজিস্ট	১

ডেন্টিস্টি বিভাগ

ক্রমিক	পদ	সংখ্যা
১.	অধ্যাপক, ডেন্টিস্টি	১

নাক, কান, গলা বিভাগ

ক্রমিক	পদ	সংখ্যা
১.	সার্জন	১

উৎস: *B Proceedings*, B No. 106, SL No. 80, List No. 109, *Health and Local Self - Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1951.

পরিশিষ্ট-৩৮

UNIVERSITY OF LONDON

SENATE HOUSE

TELEGRAMS: UNIVERSITY, LONDON

TELEPHONE: MUSEUM 8000

LONDON, W.C

REGISTRAR ... UNIVERSITY

JH/BB

2 March, 1950

Dear Registrar,

I thank you for your letter of 5 February which refers to a letter of 30th November, 1949, which does not seem to have reached me. I have noted that you require to know the qualifications expected in this University for giving teachers of Engineering and Medicine the status of Professors, Readers and Lecturers. As you probably know the University of London has a large number of constituent colleges and the staff of the Colleges may be Appointed Teachers of the University, Recognised Teachers of the University or College Lecturers, Assistant Lecturers and Demonstrators. The Colleges are entirely responsible for the appointment of grades from Assistant Lecturer up to Senior Lecturer but the University takes part in the appointment of Professors and Readers. I enclose a copy of the Regulations on University Titles and this will give you an idea of the distinction expected by the University of its Professors and Readers. There is another interesting point which I ought to mention - the Colleges may apply on behalf of individual Assistant Lecturers, Lecturers or Senior Lecturers for the status of Recognised Teacher of the University. I enclose for your information a copy of the Regulations dealing with the recognition of teachers. In the case of appointments in which the University takes part a good deal of emphasis is laid on research as shown by published work. For recognition by the University a college teacher must have a certain amount of teaching experience together with some indication that he is interested in and is carrying out research. For the appointment of a Reader we may say that the Board of Advisors lay more emphasis on the research side and try to weigh up the quality of the candidate from the point of view of his being a potential Professor. For the appointment of Professors the University expects real distinction on the research side.

Yours sincerely,

James Henderson

Academic Registrar

The Registrar,
University of Dacca,
Ramna, DACCA.

উৎস: *ডি গ্রুপ*, ৩৫২৮/১৯৪৬-৪৭, বান্ডেল নং- ৯, ক্রমিক নং-২৩৩, Sub: Recognition of Teachers of Dacca Medical College, University of Dacca.

পরিশিষ্ট-৩৯

১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষকবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	পদের নাম	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০
১.	অধ্যাপক	১২	১৫	১৫	১৫	১৫	১৭	১৭
২.	সহযোগী অধ্যাপক	১৫	১৪	১৫	১৫	১৫	১৯	১৬
৩.	সহকারী অধ্যাপক	-	-	-	১	১	৬	৭
৪.	অবৈতনিক অধ্যাপক	২	২	-	-	-	-	-
৫.	প্রভাষক	৬	৫	১	১	১	১	১
৬.	সিনিয়র ডেমনস্ট্রেটর	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৭.	কিউরেটর	২	২	২	২	২	২	২
৮.	ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিস্ট	২	২	২	২	২	২	২
৯.	ডেমনস্ট্রেটর	২১	২৭	১৬	১৬	১৬	২৩	২৩
১০.	বায়োকেমিস্ট	১	১	-	-	-	-	১ খালি
১১.	ফার্মাসিস্ট	-	-	-	-	-	-	১ খালি
১২.	সেক্রেটারি	১	১	১ আনিস আহমেদ এম.এ.,বি.টি, ই.পি.জি.এস	১	আনিস আহমেদ	আনিস আহমেদ	১ খালি

উৎস : *Annual Report from* 1962-63 to 1969-70, *University of Dacca*. p. 90, p. 110, p. 97, p. 107, p. 117, p. 117, p. 101, p. 137.

<u>পরিশিষ্ট-৪০</u>

১৯৪৬-১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালবৃন্দের নামের তালিকা,

১.ডাক্তার মেজর ডব্লিউ জে. ভারজিন– ১/৭/১৯৪৬-১২/৪/১৯৪৭

২. ডাক্তার মোঃ রেফাতউল্লাহ (সাময়িক)– ১৩/৪/১৯৪৭-১/৭/১৯৪৭

৩. কর্ণেল ই.জি. মন্টেগোমারি–১৫/৭/১৯৪৭-১৩/৭/১৯৪৮

৪. অধ্যাপক টি. আহমেদ– ১৩/৭/১৯৪৮-১/৩/১৯৫২

৫. ডাক্তার কর্ণেল এম. কে. আফ্রিদি– ০২/৩/১৯৫২-২০/৮/১৯৫৩

৬. অধ্যাপক নওয়াব আলী– ২১/৮/১৯৫৩-১০/৪/১৯৫৪

৭. অধ্যাপক এ. কে. এম. এ. ওয়াহেদ– ১১/৪/১৯৫৪-২০/১/১৯৫৫

৮. অধ্যাপক নওয়াব আলী– ২১/১/১৯৫৫-১/২/১৯৫৭

৯. অধ্যাপক মোঃ রেফাতউল্লাহ্– ১/২/১৯৫৭-১/৯/১৯৫৮

১০. অধ্যাপক হাবিব উদ্দিন আহমেদ– ২/৯/১৯৫৮-৪/১/১৯৫৯

১১. অধ্যাপক লে. কর্ণেল এম. এম. হক– ৪/১/১৯৫৯-১১/৯/১৯৬৩

১২. অধ্যাপক এ. কে. এস আহমেদ– ১১/৯/১৯৬৩-২৪/১২/১৯৬৩

১৩. ডাক্তার জি. কিবরিয়া– ২৪/১২/১৯৬৩-৪/২/১৯৬৪

১৪. ডাক্তার লে. কর্ণেল বোরহানউদ্দিন– ৪/২/১৯৬৪-২৭/১/১৯৬৯

১৫. অধ্যাপক কাজী আব্দুল খালেক ২৭/১/১৯৬৯-৩০/১২/১৯৭০

১৬. ডা. শফিউল্লাহ্– ১/১/১৯৭১-২৫/১/১৯৭১

১৭. অধ্যাপক এম. আর চৌধুরী– ২৫/১/১৯৭১-৩/৭/১৯৭২

উৎস: অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম.আর.মাহবুব, *ঢাকা মেডিকেল কলেজ: সেবা সংগ্রাম ঐতিহ্য*, *পৃ:* ২৬ এবং *Annual Report for* 1956-57, *University of Dacca,* The Dacca University Press, Ramna, Dacca, p. 63

পরিশিষ্ট-৪১

ORDINANCES.

Chapter XXVII—B.

Part I General.

Faculty of Medicine.

1. The Department of Medical Science shall be the only department in this Faculty.

2. The degrees in this Faculty shall be :—

(i) Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M. B., B. S.)
(ii) Master of Surgery (M.S.)
(iii) Doctor of Medicine (M. D.)
(iv) Master of Obstectrics & Gynaecology (M. O.).

(v) The Diploma of the Faculty shall be
Diploma in Public Health -D.P.H.
Diploma in Tropical Medicine -D.T.M.

3. The Dacca Medical College shall be deemed to be a constituent college of the University of Dacca.

4. A candidate shall not be admitted to any University Examination for any of the adove degrees, unless he has,

(i) fulfilled the conditions of attendance and residence of students reading for the degree;

(ii) furnished a certificate from the Principal of the Dacca Medical College, testifying that he is fitted to appear at the Examination and
(iii) paid the examination fee to the Registrar.

5. Requirements in regard to practical work shall be defined by Regulations.

Part II—Degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery.

1. Courses of study for the degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B., B.S) shall extend over five academic years and there shall be three examinations - The Pre-Clinical or 1st Medical, 2nd Medical and Final.

Students must complete the examination for the clinical or Final M. B., B, S. degrees by the end of the 9th academic year after being admitted as a student of the Faculty of Medicine.

Pre-Clinical or First Medical Examination.

2. Qualifications of candidates for admission :—The minimum qualification for admission to the course shall ordinarily be first division I. Sc. with Mathematics, Physics, Chemistry and Biology from the Dacca University. or an equivalent examination of some other approved University or Board. But the admission committee may accept for admission, - candidates who have passed the I. Sc. Examination with the same group in the Second Division. In no case, a candidate who has passed in the third division shall be admitted.

Candidates who have not passed in Biology, if otherwise found suitable may be admitted only on the understanding that they will make their own arrangement for attending a college recognised in Biology by the Dacca Uniuersity, simultaneously with

their Medical Course for a pass certificate in that subject up to the Intermediate Standard.

3. The course of studies leading up to the Pre-Clinical examination covers a period of two years. Students who do not attend 70% of all lectures and classes including laboratory classes shall not be eligible to sit for this examination.

4. A candidate may be admitted to the Pre-Clinical Examination if he has fulfilled the following conditions :—

(i) That he has attended a regular course of study, Theoretical and Practical in the subjects of the Examination for not less than two years (i. e. for six terms, each year consisting of 3 terms) at the Dacca Medical College.

(ii) Has passed the College Test Examination. Those who fail to pass the College Test Examination are not promoted but are detained for further six months.

The University Examination will normally be held twice in each year ordinarily in April and November after the College Test Examination.

5. A student who fails in one or two papers only, is required to pursue a further course of study for six months and is permitted to appear in the ensuing Examination in those subjects only.

A student who fails in more than two papers shall be required to pursue a further course of study for six months and sit for the whole Examination. Every candidate for admission to the Examination shall be required to pay an examination fee of Rs. 50/-. A candidate who fails to pass or present himself for examination shall be entitled to claim refund of the fee. A candidate may be admitted to one or more subsequent Examinations on payment of a like fee (Rs. 50/-) on each occasion on producing a certificate that he has since the date of last examination and within the six months preceding his re-examination, attended to the satisfaction of the Prnicipal of his College, a further course of study in all the subjects for that examination.

If a student fails in the 3rd Examination he shall be debarred from proceeding with the course.

6. The Examination in Organic and Physical Chemistry shall consist of :—

(a) One theoretical paper.
(b) a practical examination and
(c) an oral examination.

The Examination in Physiology shall consist of :—

(a) Two theoretical papers,
(b) a practical examination and
(c) an oral examination.

The Examination in Anatomy shall consist of :—

(a) Two theoretical papers,
(b) a practical examination and
(c) an oral examination.

The Examination in Pharmacology shall consist of :—

(a) One theoretical paper in Pharmacology,
(b) a practical examination in practical Pharmacy and
(c) an oral examination.

7. The full marks for each subject and the minimum marks required for passing shall be as follows :—

Subject	*Written*	*Oral*	*Practical*
Organic and Physical Chemistry ...	100	50	50
Anatomy	200	100	100
Physiology, including Histology, Chemical Physiology, Bio-Chemistry & Experimental Physiology	200	100	100
Pharmacology (Materia Medica, Practical Pharmacy and Toxicology ...	100	50	50

Pass marks in each subject are 50% in the aggregate, 50% in the Practical, 40% in the theoretical and 40% in the oral.

2nd Medbcal Examination.

8. The normal time for passing this examination will be the end of the 4th Medical year. Students who do not attend 70% of all lectures and Laboratory classes of this Course shall not be eligible to sit for this Examination.

9. A candidate may be admitted to this examination if he fulfils the following conditions :—

(a) That he has passed the Pre-Clinical examination at least two years previously.

(b) That he has completed the course of study, theoretical and practical in the subjects of the examination extending over a period of at least two years, subsequent to his passing the Pre-Clinical examination in the Dacca Medical College.

10. Every candidate shall be examined in the following subjects :—

1. Pathology and Bacteriology.
2. Applied Pharmacology and Therapeutics.
3. Public Health and Hygiene.
4. Forensic and State Medicine.

The examination shall be written, oral and practical, three hours being allowed for each paper. In assessing marks etc.,

the Examination in Pathology and Bacteriology shall consist of :—

(a) One theoretical paper,
(b) a practical examination and
(c) an oral examination.

the Examination in Applied Pharmacology and Therapeutics shall consist of :—

(a) One theoretical paper,
(b) an oral examination.

the Examination in Public Health and Hygiene shall consist of :—

(a) One Theoretical paper.
(b) an oral examination.

the Examination in Forensic and State Medicine shall consist of :—

(a) One Theoretical paper,

(b) an oral examination.

An average of at least half hour shall be allowed to answer each question set in the Theoretical papers.

The full marks for each subject and the minimum marks required for passing are as follows :—

	WRITTEN.	ORAL.	PRACTICAL.
Pathology and Bacteriology ...	200	100	100
Applied Pharmacology and Therapeutics ...	100	100	—
Public Health and Hygiene	100	100	—
Forensic and State Medicine	100	100	—

Pass marks in each subject are 50% in the aggregate and 50% in the practical, 40% in the written and 40% in the Oral.

Final M B., B. S. Examination.

The normal time for passing this examination will be the end of the fifth Medical year. Students who do not attend 70% of all Lectures and Laboratory classes of the course shall not be eligible to sit for this examination.

A candidate may be admitted to this examination if he fulfils the following conditions :—

(a) That he has passed the 2nd Medical examination at least 1 year previously.

(b) That he has completed the course of study, theoretical and practical in the subjects of the examination extending over a period of at least 1 year subsequent to passing the 2nd Medical examination in the Dacca Medical College Hospital.

Every candidate shall be examined in the following subjects :—

(1) Medicine.

(2) Surgery and Opthalmic Surgery.

(3) Gynæcology and Midwifery including Infant Hygiene.

The Examination in Medicine shall consist of :—

(a) Two theoretical papers. An average of at least half an hour shall be allowed to answer each question.

(b) An oral examination.

(c) A practical examination including an examination on Pathological specimens, secretion, interpretation of X-Ray records, testing of Urine, Clinical microscopy and prescription writing.

(d) A clinical examination at least 1 hour being allowed to the candidate for the examination of, and report on his principal case. The examination of secretations, testing of Urine clinical microscopy and prescription writing shonld form a part of this examination.

The Examination in Surgery and Opthalmic Surgery shall consist of :—

(a) Two theoretical papers. In one of these two questions in Opthalmic Surgery shall be set. An average of at least half an hour shall be allowed to answer each question.

(b) A clinical examination in Surgery aud Opthalmic Surgery at least 1 hour being allowed to the candidate for examination and report of his principal case.

(c) An oral examination in Surgery and Opthalmic Surgery.

(d) A practical examination in Surgery in which questions on the use of surgical instruments and appliances, application of splints and bandages, Surgical Pathology, interpretation of X-Ray records and Pathological slides shall form a part.

The Examination in Gynaecology and Midwifery including Infant Hygiene shall consist of :—

(a) Two theoretical papers. An average of at least half an hour shall be allowed to answer each question.

(b) an oral examination.

(c) an oral practical examination on Obstetrics and Gynaecological operations aud questions on specimens, models, instruments and appliances, X-Ray Records.

(d) a clinical examination including Infant Hygiene.

N. B.—In Midwifery the duly attended records of the work done by the candidates in clinical midwifery must be presented to the examiners for assessment.

The full marks of each subject and minimum marks required for passing are as follows :—

	Written	*Oral*	*Practical*	*Clinical*
Medicine	500	200	150	150
Surgery & Opthalmic Surgery...	500	200	150	150
Gynaecology & Midwifery including Infant Hygiene	500	200	150	150

Pass marks in each subject are 50% in the aggregate and 50% in the practical, 50% in the Clinical, 40% in the Written, 40% in the Oral.

As soon as possible after the examination, the Executive Council shall publish a list of candidates who have passed, arranged in alphabetical order. Candidates who obtain at least 75% of marks in any subject shall be deemed to have passed with Honours in that subject provided that the candidate passed in all the subjects of that part taken together in his attempt.

On the recommendation of the examiners in a particular subject, a gold medal may be awarded to the candidate who has particularly distinguished himself in Houours in that subject for that examination.

Residence of Students.

A resident student must be in residences for a total of 160 days during each year of the course.

An attached student shall reside with his parents or legal guardian or with a person authorised by the parents or legal guardian and approved by the Principal of the Medical College.

উৎস: *ডি গ্রুপ*, ২২৭২/ ১৯৫০-৫৩, বিষয়: Pakistan Medical Research Coucnil, University of Dacca, 1950-53.

পরিশিষ্ট-৪২

Through the Principal.

To

The Surgeon-General,
Dacca Medical College, Dacca.

Sir,

We the lady students of Dacca Medical College beg to draw your attention to the following fact.

We are sorry to inform you that we have not got any arrangement within our hospital for the sick lady students So whenever any one of us unluckily become sick we have to face lot of troubles before getting admission in the hospital. By this time the patient has to suffer a lot for want of proper treatment.

May we hope that you will be kind enough to give us a permanent, well furnished, with attached bathroom at least a two seated cabin in the hospital. We will be obliged if we may get such cabin on the second floor of our hospital.

Thanking you in anticipation.

Your obedient pupil,

Dacca,
the 25th October,
1951.

Sd/- 1. Zubeida Khatun.
2. Halima Khatoon.
3. Sofia Khatun.
4. Munawara Prath Rahman. etc.
5. .... 19.

No.4/MC/100 dt.27.10.51.

Forwarded. When the new cabins are opened a double seated room may be kept for them ~~either~~ in the 1st floor or 2nd floor if Govt. approves the (latter) suggestion.

Sd/- T. Ahmed.
Principal,
Dacca Medical College.

উৎস: *B Proceedings*, B No. 126, SL No. 100, List No. 109, *Health and Local Self - Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953.

intendent,
College Hospital,Dacca.

Government of East Bengal.
~~Maitaxx~~ Office of the Principal, Medical College,

Memo No. 7/DMC/100 dated Dacca the 24/27.5.1952.

To - The Surgeon-General with the Govt. of East Bengal,
Eden Buildings, Ramna, Dacca.

Ref:-His memo No. MD/D(1)-3D-47/51/11056, dated ...52.

Sub:-Cabin accommodation for sick lady students of the Dacca Medical College.

The practice followed in the Calcutta Medical College Hospital in respect of the treatment of the sick lady student of the Calcutta Medical College, is not known to this office.

There are at present 18(eighteen) lady students in the Dacca Medical College.

Sd/- F.W. Allinson.
Principal,
Medical College, Dacca.

No. MD/D(1)-3D-47/51/ 13442

Copy submitted to the Assistant Secretary to the Govt. of East Bengal, Health and Local Self-Government Deptt.(Medl. Branch),Dacca for information and favour of necessary action in continuation of this office U/O note, dated 17.5.52 in the Secretariat file No.Medl. 2H-2/52.

16.6.52.

for Surgeon-General, East Bengal.

Dacca,

The 18th June, 1952.
A.Khan.
13/6/52.

উৎস: *B Proceedings*, B No. 126, SL No. 100, List No. 109, *Health and Local Self - Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953.

Government of East Bengal.
Office of the Superintendent, Medical College Hospital, Dacca.

No.870. dated 6-4-53.

From - The Superintendent,
Medical College Hospital, Dacca.

To - The Surgeon-General with the
Government of East Bengal.
Eden Buildings, Ramna, Dacca.

Subj:- Cabin accommodation for sick lady students of the Dacca Medical College, Dacca.

With reference to your Memo.No.MD/D(1)-3D-(1)-47/51-2876 dated 18th February'53 addressed to the Principal, Medical College, Dacca on the above subject. I have to inform you that there is no space for room available at present to convert into a two seated room for sick lady students of the Dacca Medical College unless one of the cabins on the ground floor or second floor is sacrificed for this purpose. The demand for cabins is very heavy through out the year and the conversion of cabin into a sick room for lady students is likely to increased the deficulty in meeting this demand all the more. The financial implication is given below seperately for each type of cabin.

Second floor Cabin.	Ground floor Cabin.
Cabin rent including diet charges @ Rs.12/- per diem- 12 x 12 = Rs.4320/- p.a.	Cabin rent including diet charges @ Rs.8/-per diem = 8 x 12 x 30 - Rs.2880/- p.a.

No paper is available in this office relating to the allotment of a seperate room for the sick male students. This was arranged by the Ex-Superintendent probably in consultation with the Surgeon-General with the Government of East Bengal.

The lady students of the Medical College do not like that they should be admitted along with out-siders in the General wards, which are frequently over crowded. Last year one fairly large room eposite the Operation Theatre in the 1st floor was allotted for sick nurses and one or two sick lady students may easily be accommodated there. But they do not like to be in the same room with the nurses too.

Sd/- N. Ali.
6/4/53.
Superintendent,
Medical College Hospital, Dacca.

Aftab.17/4.

উৎস: *B Proceedings*, B No. 126, SL No. 100, List No. 109, *Health and Local Self - Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal*, 1953.

পরিশিষ্ট-৪৩

১৯৫২-৫৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষের নারী শিক্ষার্থীর নামের তালিকা–

১৯৫২-৫৩ কে (K)-১১ ১. ডাক্তার সুরাইয়া সাবিন (মৃত) দিনাজপুর ২. ডাক্তার জাহানারা বেগম ইউ.কে (বর্তমান) ৩. ডা. আয়শা আজিজ (মৃত) ঢাকা ৪. ডা. শায়লা মোং (Mong.) চৌধুরী চট্টগ্রাম মিশনারী হাসপাতাল	৫. ডাক্তার আনোয়ারা প্রধান ঢাকা ৬. ডাক্তার রওশন আরা হক ইউ.কে (বর্তমান) ৭. ডাক্তার পারভীন ইস্পাহানি ইউ.কে (বর্তমান)
১৯৫৩-৫৪ কে (K)-১২ ১. ডা. জাহেদা ফাহিম ২. ডা. বদরুন্নেসা আহমেদ ৩. ডা. ফরিদা খাতুন ৪. ডা. সুলতানা বেগম ৫. ডা. সোফিয়া খানম	৬. ডা. কাজী হাসনা হেনা বেগম ৭. ডা. রুকাইয়া আহাদ ৮. ডা. আনঞ্জুম উসমান ৯. ডা. রমা নাথ বিশ্বাস ১০. ডা. সালেহা খাতুন
১৯৫৪-৫৫ কে (K)-১৩ ১. ডা. বেগম নিলুফার আফতাবি অধ্যাপক (অবসর) ডি. অবস, আরসিওজি, এমআরসিওজি এবং এফআবসিওজি (লন্ডন) স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ ২. ডা. রিজিয়া লায়লা (মৃত) এম.পিএইচ কো অর্ডিনেটর অব এডুকেশন, আইসিডিডিআরবি ৩. ডা. মারিয়ানা পন্নী জেনারেল প্রাকটিশনার রিয়াদ (বর্তমান) কে.এস.এ	৪. ডা. মোসা: আসিয়া খাতুন কনসালটেন্ট এ্যানেসথেটিকস (অবসর), ইউ.কে (বর্তমান) ৫. ডা. জাকিয়া বেগম সরকারি চাকুরিজীবী (অবসর) বনানী, ঢাকা ৬. ডা. কমর (Qumar) সুলতানা ৭. ডা. নুরজাহান বেগম ৮. ডা. রুকাইয়া খাতুন (মৃত) ৯. ডা. শামসী আবরোজ রোজাই ইউসুফ
১৯৫৫-৫৬ কে (K)-১৪ ১. ডা. শাহিলা আশফাক ২. ডা. শামসুন নাহার ৩. ডা. আসিয়া রহমান ৪. ডা. রওনক আফরোজ	৫. ডা. নুরজাহান বেগম ৬. ডা. কামরুন নাহার ৭. ডা. আবেদা বেগম ৮. ডা. সায়েদুন নেসা ৯. ডা. জাহান আরা রহমান
১৯৫৬-৫৭ কে (K)-১৫ ১. ডা. শাহলা খাতুন জাতীয় অধ্যাপক এমআরসিওজি, এফআরসিওজি, এফসিপিএস স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববিদ্যালয় শাহবাগ, ঢাকা ২. ডা. আনোয়ারা খাতুন অনা: মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ইএনটি বিশেষজ্ঞ, হসপিটাল অব সাহিক (SAHIC) বারিধারা, ঢাকা	৩. ডা. ফরিদা খাতুন স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ কনসালটেন্ট, প্রাইভেট প্রাকটিস শান্তিনগর, ঢাকা ৪. ডা. শেরবানু প্রেমজি (অ-বাঙালি পাকিস্তানি) স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ গাইনোকোলজিস্ট, ইউ.এস.এ ৫. ডা. রোকেয়া মাসুদ (ভারতীয়, পাকিস্তানি) জেনারেল প্রাকটিশনার, পাকিস্তান করাচি, পাকিস্তান

৬. ডা. জেবুন্নেসা বেগম, সহকারী অধ্যাপক ফিজিওলজি (অবসর) ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ৭. ডা. আয়েশা কাসিম জেনারেল প্রাকটিশনার, ইউ.কে. ৮. ডা. ফিরোজা বেগম স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ, নিউইর্য়ক ৯. ডা. মোহিনী মোহন ভৌমিক জেনারেল প্রাকটিশনার ইউ.কে.	১০. ডা. শামসুন নাহার করিম জেনারেল প্রাকটিশনার চট্টগ্রাম ১১. ডা. তাসমিন মতিন প্রিন্সিপাল, মেডিকেল কলেজ সিরাজগঞ্জ ১২. ডা. সাঈদা নুরজাহান ভূইয়া প্রিন্সিপাল এবং অধ্যাপক চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম
১৯৫৭-৫৮ কে (K)-১৬ ১. ডা. ফাইজা বারি মল্লিক জেনারেল প্রাকটিশনার, লন্ডন, ইউ.কে. ২. ডাক্তার জাহান আরা বেগম এম.আরসিওজি (লন্ডন), সিএবিই (ইংল্যান্ড) স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদপুর, ঢাকা ৩. ডা. সুলতানা আহমেদ ৪. ডা. নিলুফার ইমাম ৫. ডা. হামিদা বেগম ৬. ডা. হালিদা খানম ৭. ডা. সোফিয়া খাতুন ৮. ডা. মোসা. খোদেজা বেগম	৯. ডা. রওশন আরা খানম ১০. ডা. সরদার হামিদা আকতার ১১. ডা. হোসনে আরা খান ১২. ডা. বিলকিস আরা বেগম ১৩. ডা. রওশন ইসলাম ১৪. ডা. মোমেনা আকতার খানম ১৫. ডা. মোসাঃ আসিফা বেগম ১৬. ডা. ইফফাত আরা আহমেদ ১৭. Dr. Perwiz Jamal Khatoon ১৮. ডা. ফাহিমা বানু এস ইসলাম ১৯. ডা. জেবুন্নেসা ২০. ডা. কমর জাহান নাহার
১৯৫৮-৫৯ কে (K)-১৭ ১. ডা. খালেদা বানু ডিসিএইচ (লন্ডন), এফআইসিপি শিশুবিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক (নিউনেফ্রোলজি) (অবসর), উত্তরা, ঢাকা ২. ডা. আনোয়ারা আরা বেগম ফরেনসিক মেডিডিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক (ফরেনসিক মেডিসিন), অবসর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ চট্টগ্রাম ৩. ডাক্তার হোসনে আরা বেগম ডিজিও (ডাবলিন) এলএম (ডাবলিন) স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ দুবাই (বর্তমান)	৪. ডা. জিনাত আবেদীন (মৃত) প্রভাষক (ফিজিওলজি) ৫. ডা. দিলারা বেগম ইউ.কে. (বর্তমান) ৬. ডা. রোকেয়া বেগম ৭. ডা. বেগম হাসনা হেনা ৮. ডা. নলিনী কান্ত বিশ্বাস ৯. ডা. নুরজাহান বেগম ১০. ডা. রোকেয়া খাতুন ১১. ডা. প্রিয়া গোপাল সেনগুপ্ত ১২. ডা. রাধা রমন বৈষ্ণব
১৯৫৯-৬০ কে (K)-১৮ ১. ডা. অধ্যাপক ফরিদা হক এম.ফিল, পিএইচ.ডি. এফ.সি.পি এস মাইক্রোবায়োলজি কনসালটেন্ট, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ বারডেম, শাহবাগ, ঢাকা। ২. ডা. মমতাজ মোস্তফা ডিও, আরসিজি (ইংল্যান্ড) স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ কনসালটেন্ট, গনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ঢাকা। ৩. ডা. সালিমা খাতুন এনাসথেসিওলজিস্ট ৪. ডা. হাসিনা বেগম ইউ.কে.	৫. ডা. আনোয়ারা বেগম অধ্যাপক (সাইকিয়াট্রি) অবসর ৬. ডা. মনোয়ারা জামান ইউ. কে (বর্তমান) ৭. ডা. জাকিরা হামিদ পাকিস্তান (বর্তমান) ৮. ডা. শালী আম জী ইউ. কে (বর্তমান) ৯. ডা. হাজেরা মাহতাব ১০. ডা. লক্ষ্মী নারায়ণ সাহা ১১. ডা. মিলি রোকেয়া ইউসুফ ১২. ডা. ইফফাত আরা আহমেদ

১৯৬০-৬১ কে (K)-১৯

১. ডা. রওশন আরা বেগম
স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ
ঢাকা
২. ডা. নীনা রহমান জামালি
এমসিপিএস
কনসালটেন্ট, এনাসথেসিওলজি
মালয়েশিয়া
৩. ডা. রেজিনা রহমান
মেডিকেল অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হসপিটাল
৪. ডা. বেগম রওশন আকতার
জেনারেল প্রাকটিশনার (ইউ.কে.)
৫. ডা. মাসুমা হুদা
জেনারেল প্রাকটিশনার, ইউ.কে.
৬. ডা. নুর জাহান সুলতানা
হাটখোলা, ঢাকা
৭. ডা. শাহনাজ নুর
ইসলামাবাদ, পাকিস্তান
৮. ডা. নার্গিস খানম
মেডিকেল অফিসার (অবসর)
৯. ডা. সাইদা উম্মে আমর এলিয়াস মোহিনুর বেগম
রামপুরা, ঢাকা
১০. ডা. নুরুন নাহার
ইউএসএ
১১. ডা. শামসুন নাহার
ডি.এ. কনসালটেন্ট
এনাসথিসিওলজিস্ট
ম্যানচেস্টার, ইউ.কে
১২. ডা. চৌধুরী রওশন আকতার
মালয়েশিয়া
১৩. ডা. কানিজ মোস্তফা
জেনালের প্রাকটিশনার
ইউ.কে
১৪. ডা. লুৎফা বানু (মৃত)
১৫. ডা. খোদেজা বেগম (মৃত)

১৯৬১-৬২ কে (K)-২০

১. ডা. আলিয়া বানু
এম.ফিল
অধ্যাপক (ফিজিওলজি)
২. ডা. শাহিদা বানু
৩. ডা. ফরিদা হোসেন
৪. ডা. হাসিনা আকতার বেগম
৫. ডা. মাতাহা বেগম
৬. ডা. নলিনী রঞ্জন দত্ত
৭. ডা. সখিনা আকতার বানু
৮. ডা. লুৎফা আকতার খন্দকার
৯. ডা. নুরুন নাহার হোসেন
১০. ডা. নাজমী আকতার
১১. ডা. লায়লা রহমান
১২. ডা. জুবায়দা খাতুন
১৩. ডা. আমিনা নুর
১৪. ডা. ফেরদৌস ফাতিমা

১৯৬২-৬৩ কে (K)-২১

১. ডা. মাখদুমা নার্গিস
এমসিপিএস (মেডিসিন)
Speciality: Internal Medicine
যুগ্ম সচিব, এমওএইচএফডব্লিউ
বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট, ঢাকা
২. ডা. লতিফা শামসুন
এফসিপিএস (বিডি)
স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক, চেয়ারম্যান এবং স্ত্রীরোগ ও
প্রসুতি বিভাগের প্রধান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
শাহবাগ, ঢাকা
৩. ডা. এ. জে. ই. নাহার রহমান
এম.ফিল, প্যাথলজি বিশেষজ্ঞ
চেয়ারম্যান, প্যাথলজি বিভাগ
ডিন, ফ্যাকাল্টি অব বেসিক
মেডিকেল সায়েন্স
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
শাহবাগ, ঢাকা
৪. ডা. সাবেরা আলী
ডি. অবস, আর. সি. ও. জি (লন্ডন)
স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ
কনসালটেন্ট, এমসিএইচটিআই, আজিমপুর, ঢাকা
৫. ডা. হালিদা হনুম আকতার
এম.বি.বি.এস., এমসিপিএস, (অবস/গাইনো),
এম.পি.এইচ,
ডি.পি.এইচ. (জেএইচইউ)
ডিরেক্টর, হেলথ প্রোমোশন লি:
৬. ডা. ফজিলাতুন্নেসা বকুল
জেনারেল প্রাকটিশনার
৭. ডা. ফেরদৌস আরা জে জাহান
অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগের প্রধান
ঢাকা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল
৮. ডা. রহিমা আলী
৯. ডা. জরিনা বেগম
ইউ. কে (বর্তমান)
১০. ডা. রওশন আকতার
জেনারেল প্রাকটিশনার, গুলশান
১১. ডা. মনোয়ারা আমিনা বেগম
স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি
বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ
১২. ডা. মমতাজ বেগম
ইউ. কে (বর্তমান)
১৩. ডা. ফরিদা বেগম
লন্ডন (ইউ. কে)

১৪. ডা. নুরুন নাহার কনসালটেন্ট প্যাথলজি কে.এফ. হাসপাতাল, কে.এস.এ ১৫. ডা. হাসিনা আকতার ইউ. কে (বর্তমান) ১৬. ডা. মোসাম্মাত সুলতানা জাহান স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ ঢাকা মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল ঢাকা ১৭. ডা. সুলতানা খানম আঞ্চলিক পরিচালক সেফ দ্যা চিলড্রেন, সাউথ ইস্ট এশিয়া ১৮. ডা. আজিজা সিদ্দিক পাকিস্তান (বর্তমান) ১৯. ডা. হোসনে আরা আলী ডেপুটি ডিরেক্টর, এমএফএসটিসি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ২০. ডা. সেতারা মীর্জা ইউ.কে. (বর্তমান)	২১. ডা. শাহীদা আকতার বানু জেনারেল সার্জারি, প্রাইভেট প্রাকটিশনারস এসোসিয়েশন ২২. ডা. জহুরা আকতার খানম (পারুল) মালিবাগ, ঢাকা ২৩. ডা. দিল আফরোজ রহমান মহাখালী, ঢাকা ২৪. ডা. রওশন আরা বেগম প্রাইভেট প্রাকটিস, গুলশান, ঢাকা ২৫. ডা. আনোয়ারা বেগম মহাখালী, ঢাকা ২৬. ডা. নাজমা আরা ইউ. কে (বর্তমান) ২৭. ডা. হোসনে আরা বেগম ইউ. কে (বর্তমান) ২৮. ডা. রাশেদা আকতার (মৃত) ২৯. ডা. শামসুন নাহার ৩০. ডা. জরিণী কান্তা মণ্ডল ৩১. ডা. প্রীতি ভূষন বড়ুয়া
১৯৬৩-৬৪ কে (K)-২২ ১. ডা. শাখওয়াত আরা বেগম জেনারেল ফিজিশিয়ান চীফ সায়েন্টিফিক অফিসার (ইপিডিমায়োলজি), পরিচালক আই.ই.ডি.সি.আর, মহাখালী, ঢাকা ২. ডা. মাহবুবা বেগম চীফ সায়েন্টিফিক অফিসার (ভাইরোলজি বিভাগ) আইইডিসি এন্ড আর, মহাখালী, ঢাকা ৩. ডা. ফকরুন নেসা ডি.এ. এফসিপিএস এনেসথেসিওলজি অধ্যাপক, এনেসথেসিওলজি এনআইসিডিডি, শেরে বাংলা ৪. ডা. সিতারা চৌধুরী স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি ইউ. এস. এ ৫. ডা. ডালিয়া নিলুফার জেনারেল প্রাকটিশনার অস্ট্রেলিয়া ৬. ডা. সোফিয়া এম স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি ইউ. এস. এ ৭. ডা. শেফালি পাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ৮. ডা. সিতারা বেগম ইউ. এস. এ ৯. ডা. নাসিমা আকতার এমআরসিওজি জেনারেল প্রাকটিশনার, ইউ. কে	১০. ডা. কাজী নাজমা মনসুর প্যাথলজি, ইউ.কে. ১১. ডা. বদ্রা জেহান হাসিনা ইউ. এ. ই ১২. ডা. মিনাজ ন্যান্সি এমআরসিওজি স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি, ইউ.কে. ১৩. ডা. আমিনা হোসেন জেনারেল প্রাকটিশনার, পাকিস্তান ১৪. ডা. জাহান আরা মুরশিদ কামাল এম.ফিল বায়ো-কেমিস্ট্রি বরিশাল মেডিকেল কলেজ ১৫. ডা. সুরাইয়া বেগম (মৃত) ১৬. ডা. হামিদা বেগম এম.ফিল, প্যাথলজি, ঢাকা ১৭. ডা. মোসাম্মত তাহমিনা বেগম অস্ট্রেলিয়া ১৮. ডা. রওশন আরা বেগম চৌধুরী মেডিকেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (অবসর) ১৯. ডা. আনঞ্জুম ইকরাম খান (মৃত) ২০. ডা. মনি মোহন বিশ্বাস ২১. ডা. আজিমুন নেসা (মৃত) ২২. ডা. জোহরা বেগম

১৯৬৪-৬৫ কে (K)-২৩

১. ডা. জাহানারা বেগম
ডিরেক্টর
ডিরেক্টর জেনারেল অব হেলথ সার্ভিস
মহাখালী, ঢাকা

২. ডা. মাজিদা বেগম
ডিরেক্টর (ফিনান্স)
ডি.জি.এইচ.এস, মহাখালী ঢাকা

৩. ডা. কাজী মিসবাহুন নাহার (তামান্না)
চীফ মেডিকেল অফিসার
বাংলাদেশ কেমিক্যাল কর্পোরেশন
ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি:

৪. ডা. ফৌজিয়া মোসলেম
ডিপ্লোমা ইন আল্ট্রাসাউন্ড
নিউক্লিয়ার মেডিসিন
চীফ মেডিকেল অফিসার
বাংলাদেশ অটোমিক এনার্জি কমিশন

৫. ডা. জাহেদা আলম
সাইকিয়াট্রি
ফিজিশিয়ান, জামানস ক্লিনিক

৬. ডা. সুলতানা আর গজনব
এম.ডি.
পেডিয়াট্রিক, ইউ.এস.এ

৭. ডা. নাদিরা আনসারি
ইউ.কে.

৮. ডা. সেলিমা বানু
ভার্জিনিয়া, ইউ.এস.এ.

৯. ডা. রেহানা চৌধুরী
ইসলামাবাদ, পাকিস্তান

১০. ডা. রুমানা হুদা
ইউ.এস.এ

১১. ডা. ফরিদা জামাল
মালয়শিয়া

১২. ডা. স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
ইউ.কে.

১৩. ডা. দেবযান নন্দী
১৪. ডা. সোফিয়া হক
১৫. ডা. রাশিদা খানম
১৬. ডা. জাহান আরা বেগম
১৭. ডা. হোসনে আরা বেগম
১৮. ডা. আম্বিয়া খাতুন
১৯. ডা. সাঈদা খানম কোরেশী
২০. ডা. আমিনা নবাব
২১. ডা. মাজিদা শামসুন নাহার
২২. ডা. আসিয়া আকতার খাতুন
২৩. ডা. জাহসিনা রহিম
২৪. ডা. আমিনা মনসুর
২৫. ডা. নাসিহা খাতুন
২৬. ডা. নাজলিন নাজেরালি (মৃত)
২৭. ডা. জহিরা সিদ্দিক
২৮. ডা. মাহমুদা খানম
২৯. ডা. দারুদাস শাহ বেগম
৩০. ডা. সালমা মাওয়া
৩১. ডা. জেবুন্নেসা আলী
৩২. ডা. আঞ্জুমান আরা বেগম
৩৩. ডা. রাশিদা আজমী
৩৪. ডা. অরুন জয়তী চাকমা
৩৫. ডা. জাহেদা নাসরিন মোবিন
৩৬. ডা. মাহমুদা খাতুন
৩৭. ডা. গুল বাহার
৩৮. ডা. মেহের বানু মনসুর আলী
৩৯. ডা. সিস্টার এম রোজিনা বিয়ার
৪০. ডা.হাসনা হেনা
৪১. ডা. গুলহান আরা
৪২. ডা. হোসাইন বেগম
৪৩. ডা. হামিদা খাতুন

৪৪. ডা. নাজমুন নাহার
এফ.সি.পি.এস., এফ.আর.সি.পি
পেডিয়াট্রিক, অধ্যাপক
ঢাকা মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল
ঢাকা

৪৫. ডা. মোনোয়ার সুলতানা

১৯৬৫-৬৬ কে (K)-২৪

১. ডা. কানিজ মওলা
এফ.সি.পি.এস (ইউ. কে)
ইন্টারনাল মেডিসিন,
মেডিসিন বিভাগের প্রধান
হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হসপিটাল
ঢাকা

২. ডা. শামসুন নাহার
এফ.সি.পি.এস (বিডি)
স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ
অধ্যাপক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ঢাকা

৩. ডা. ইসমাত বানু
এম.সি.পি.এস (অবস, গাইনো)
স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি, সিনিয়র কনসালটেন্ট
(অবস গাইনো)
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ঢাকা

৪. ডা. সাঈদা নাসরিন হাফিজ, সাইকিয়াট্রি, ইউ.এস.এ
৫. ডা. সেলিনা হক ডলি, গুলশান, ঢাকা
৬. ডা. মেহরুন্নেসা বেগম, তেজগাঁও, ঢাকা
৭. ডা. ফৌজিয়া আকতার বানু, ধানমন্ডি, ঢাকা
৮. ডা. রোকেয়া পারভীন, উত্তরা, ঢাকা

৯. ডা. ইফফাত আরা জলি
নিউজিল্যান্ড

১০. ডা. মাহবুব-আরা-উম্মে জোহরা (ঝরনা)
কলাবাগান, ঢাকা

১১. ডা. হোসনে আরা
ইউ.কে.

১২. ডা. সাঈদা বখতিয়ার জাহান
১৩. ডা. রোবা বিশ্বাস
১৪. ডা. নার্গিস জাহান
১৫. ডা. নার্গিস আরা বেগম

<table>
<tr><td>১৬. ডা. ফরিদা খানম
১৭. ডা. গুলশান আরা বেগম
১৮. ডা. মরিয়ম নেসা
১৯. ডা. হুসনা বানু
২০. ডা. হোসনে আরা বেগম
২১. ডা. সাঈদা শাহনাজ ফাতেমা
২২. ডা. জিনাত ইয়াসমীন চৌধুরী
২৩. ডা. আমিনা হক
২৪. ডা. ফারজানা শাইখ
২৫. ডা. পারভীন রহমান
২৬. ডা. কুলসুম আব্দুল্লাহ
২৭. ডা. শোরিন মমতাজ
(Shoreen Mamtaz)
২৮. ডা. সেরিনা বেগম
২৯. ডা. আজিজা খানম চৌধুরী
৩০. ডা. রওশন আকতার বেগম
৩১. ডা. ফাতিমা বেগম
৩২. ডা. মুরশিদা বেগম
৩৩. ডা. ফেরদৌস বানু</td><td>৩৪. ডা. গুলজার বানু
৩৫. ডা. রওশন আরা বেগম
৩৬. ডা. শাহানা বেগম
৩৭. ডা. আমিনা বেগম
৩৮. ডা. রেহানা জাহান
৩৯. ডা. মমতাজ বেগম
৪০. ডা. তাহমিদা বেগম
৪১. ডা. মাসুদা রুকসানা
৪২. ডা. মাহমুদা
৪৩. ডা. সবিতা মন্ডল
৪৪. ডা. আমিনা বানু
৪৫. ডা. মমতাজ বেগম
৪৬. ডা. রিজিয়া বানু
৪৭. ডা. সুরাইয়া আজিজ
৪৮. ডা. বেগম কাওছার আরা
৪৯. ডা. জাহানারা বেগম
৫০. ডা. সেলিনা আকতার</td></tr>
<tr><td>১৯৬৬-৬৭ কে (K)-২৫
১. ডা. শারিফুন নাহার
ডি.এম.আর.ডি (ডি.ইউ)
রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং
ওএসডি (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার), বাংলাদেশ
২. ডা. সুফিয়া খানম
ডিজিও, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি
কনসালটেন্ট, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি
হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হসপিটাল
উত্তরা, ঢাকা
৩. ডা. জামাল আরা বেগম
এমসিপিএস, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি
কনসালটেন্ট, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি
হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হসপিটাল,ঢাকা
৪. ডা. আলিয়া আকতার বানু
প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার
ভাইরোলজি বিভাগ
আই.ই. ডি.সি.আর. মহাখালী, ঢাকা
৫. ডা. খোরশেদা জাফর
ঢাকা
৬. ডা. কানিজ ফাতিমা
ডেপুটি ডিরেক্টর
মহাখালী, ঢাকা
৭. ডা. মমতাজ জাহান (রোজি)
ইউ.এস.এ
৮. ডা. রত্না রানী পাল (বনিক)
ইউ.এস.এ
৯. ডা. সুলতানা সিরাজ
ইউ.এস.এ
১০. ডা. আয়েশা খানম
সিনিয়র মেডিকেল অফিসার
শাহবাগ, ঢাকা</td><td>১১. ডা. ফকির আনজুমান আরা
আই.ই. ডি.সি.আর.বি, ঢাকা
১২. ডা. সুরাইয়া পারভীন তালুকদার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা
১৩. ডা. নার্গিস হাশেম
ইউ.এস.এ
১৪. ডা. রিতা হক
ইউ.এস.এ
১৫. ডা. শাহনাজ মনসুর
১৬. ডা. নিলুফার রহমান
১৭. ডা. তাহমিনা আজিজ
ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অপথালমোলজি
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
১৮. ডা. সাঈদা বদরুন নাহার
এমসিপিএস, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল
১৯. ডা. ফিরোজা আরী
২০. ডা. রাকিবা চৌধুরী ঝুমা
অস্ট্রেলিয়া
২১. ডা. রাহিদা বাট
পাকিস্তান
২২. ডা. পারভীন হোসেন
অধ্যাপক, এনেসথেসিয়া
চেস্ট হসপিটাল, বাংলাদেশ
২৩. ডা. শের বানু
২৪. ডা. স্নেহা প্রভা চাকমা
২৫. ডা. পিয়াসী আহমেদ
২৬. ডা. হামিদা জাহান আরা
২৭. ডা. শিরিন কাউয়ূস
২৮. ডা. সিতারা বেগম
২৯. ডা. খুরশিদা জাফর</td></tr>
</table>

৩০. ডা. সাফিয়া বেগম ৩১. ডা. নাজনী আকিদ ৩২. ডা. শাহনাজ রোকসানা ওয়াসিম ৩৩. ডা. সুরাইয়া জাবিন	৩৪. ডা. সাবিহা মির্জা ৩৫. ডা. ফজিলাতুন নেসা ৩৬. ডা. জারতাজ বিনতে ইয়াকুলি ৩৭. ডা. ফরিদা নুর মোহাম্মদ ৩৮. ডা. শহিদা কাইয়ূম
১৯৬৭-৬৮ কে (K)-২৬ ১. ডা. রানা বেগম ডেপুটি সেক্রেটারি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ ২. ডা. দিলরুবা নিলুফার ডিজিও, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ কনসালটেন্ট, ঢাকা মহানগর হসপিটাল নয়া বাজার, ঢাকা ৩. ডা. রুকাইয়া খাতুন ডেপুটি ডিরেক্টর (পিএইচসি) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ময়মনসিংহ ৪. ডা. জুলফে আরা হায়দার ডিজিও, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, ঢাকা ৫. ডা. নিলুফার সুলতানা এনাটমি বিভাগ বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ৬. ডা. গাজালা পারভীন পাকিস্তান ৭. ডা. আনজুমান আরা নওসার পাকিস্তান ৮. ডা. সুরাইয়া বেগম আইসিডিডিআরবি, মহাখালী, ঢাকা ৯. ডা. সুলতানা বেগম বাংলাদেশ ব্যাংক	১০. ডা. রেহানা আকতার অধ্যাপক, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি এমএসএমসি, মিটফোর্ড হসপিটাল, ঢাকা ১১. ডা. নাঈমা আকতার এইচ.আফ.আর.সি হসপিটাল, ঢাকা ১২. ডা. ডালিয়া সালাউদ্দিন ইউ.এস.এ ১৩. ডা. শবনম করিম ইউ.কে. ১৪. ডা. জুলফা আরা কনসালটেন্ট, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ঢাকা ১৫. ডা. মাসুদা গনি লে. কর্নেল, সি.এম.এইচ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা ১৬. ডা. শাহনাজ আমিন পাকিস্তান ১৭. ডা. আসমা আব্দুল জব্বার পাকিস্তান ১৮. ডা. মমতাজ আকতার বানু কানাডা ১৯. ডা. সাদেকা আকতার বানু অর্ণিবান ক্লিনিক, Med. Proc. ২০. ডা. শামুসন নাহার ২১. ডা. মোসাম্মাত মাহমুদা খাতুন ২২. ডা. রওশন আরা বেগম (মৃত) ২৩. ডা. সামিনা আকতার ২৪. ডা. মোলালিসা আরজু ২৫. ডা. খুরশিদ বেগম ২৬. ডা. নায়লী চৌধুরী, জয়দেবপুর
১৯৬৮-৬৯ কে (K)-২৭ ১. ডা. আনোয়ারা বেগম এফসিপিএস স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি অধ্যাপক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, ঢাকা ২. ডা. নীনা হুমায়রা নাজনীন Dip in Maternal and Child Health মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা ৩. ডা. দিলরুবা খানম ডিজিও, এফএএমএস স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ প্রাইভেট প্রাকটিস, গ্রিন ল্যান্ড হসপিটাল উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা	৪. ডা. সামিনা চৌধুরী এম.সি.পি.এস, এফ.আই.সি.এস, ডিআরএইচ (ইউ. কে) স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিশেষজ্ঞ সহযোগী অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড এন্ড মাদার হেলথ, মাতুয়াইল, ঢাকা ৫. ডা. মমতাজ খানম পিজিটি ইন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি (ভিএমইউ) সোনোলজি, কনসালট্যান্ট কমফোর্ট ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স লি. ঢাকা, সিদ্ধেশ্বরী লেন, ঢাকা ৬. ডা. কামরুন নেসা ৭. ডা. শুক্লা পাফশিট ৮. ডা. খালেদা আহমেদ ৯. ডা. নাসরিন আসিরুদ্দিন ১০. ডা. সুরাইয়া বেগম ১১. ডা. রোজানা রব ১২. ডা. শেফালি কুন্ড

১৩. ডা. রোকেয়া সুলতানা ১৪. ডা. মাহফিল আকতার কানম ১৫. ডা. নার্গিস ফিরোজা বেগম ১৬. ডা. মেহরুন নাহার ১৭. ডা. সুফিয়া বেগম ১৮. ডা. ফিরোজা বেগম ১৯. ডা. নুজহাত হাসিব ২০. ডা. বেগম মমতাজ মহল ২১. ডা. মোসাম্মত লুৎফান নাহার ২২. ডা. রুকসানা মোনোয়ার ২৩. ডা. লায়লা বেগম ২৪. ডা. সুরাইয়া চৌধুরী ২৫. ডা. রুকসানা আলম ২৬. ডা. সাদিয়া আফরোজ আলী ২৭. ডা. নুর বানু ২৮. ডা. নুজহাত জবানী	২৯. ডা. মোসা: হাওয়া বেগম ৩০. ডা. শিরিন সুলতানা বেগম ৩১. ডা. গুল বানু ৩২. ডা. রিজিয়া সুলতানা ৩৩. ডা. তালাত পারভীন ৩৪. ডা. কুর্গা (Devi Shakya) দেবী সাকয়া ৩৫. ডা. হাসিনা খান ৩৬. ডা. শাহনাজ আহমেদ চাহান(Chahan) ৩৭. ডা. সুরাইয়া খালিদ ৩৮. ডা. মুস্তারি খালিদ ৩৯. ডা. নুর বানু ৪০. ডা. শামুসন নাহার ৪১. ডা. মালবিকা কর ৪২. ডা. ফাতিমা কর ৪৩. ডা. ফাতিমা বেগম ৪৪. ডা. শাহনাজ চৌধুরী
১৯৬৯-৭০ কে (K)-২৮ ১. ডা : নার্গিস আকতার এম. ফিল (মেডিসিন), এম.এসসি (ইউ.কে), অধ্যাপক (ফার্মাকোলজি) স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ এন্ড মিটফোর্ড হসপিটাল (এসএসএমসসি), ঢাকা ২. ডা. হোসনে আরা তাহমিন (চারু) এম. ফিল (ঢা:বি:) এম. এসসি (লন্ডন) এম. ফিল (লন্ডন), অধ্যাপক, (এনাটমি) ভাইস প্রিন্সিপাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ৩. ডা. ইকলিমা খাতুন এফসিপিএস পেডিয়াট্রিক, প্রাইভেট প্রাকটিশনার, উত্তরা, ঢাকা ৪. ডা. হোসনে আরা এফসিপিএস পেডিয়াট্রিক সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল ৫. ডা. ফরিদা আকতার সিনিয়র ক্লিনিকাল প্যাথলজিস্ট স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এন্ড মিটফোর্ড হসপিটাল, ঢাকা ৬. ডা. নাজমা বেগম আল্ট্রাসোনোগ্রাম হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হসপিটাল, ঢাকা ৭. ডা. খুরশিদ আরা বেগম এম. এসসি (নিউট্রিশন), এম. ফিল (বায়োকেমিস্ট্রি) সহকারী অধ্যাপক (বায়োকেমিস্ট্রি) বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা ৮. ডা. খুরশিদ জাহান এম.পি.এইচ, পিএইচ.ডি ক্লিনিকাল নিউট্রিশন অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব নিউট্রিশন এন্ড ফুড সায়েন্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৯. ডা. সায়েদা আকতার এম.সি.পি.এস (অবস এন্ড গাইনোকোলজি), Dipinobs & Gynae সিনিয়র, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি শহীদ সোহরাওয়ার্দী হসপিটাল, ঢাকা ১০. ডা. শামসাদ কবির রেসিডেন্ট, বিএসএম মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, শাহবাগ, ঢাকা ১১. ডা. মাসুদা খানম সাইকিয়াট্রি সহযোগী অধ্যাপক বিএসএম মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, শাহবাগ, ঢাকা ১২. ডা. মেহরোজ আলম চৌধুরী এম.সি.পি.এস (অবস এন্ড গাইনো) সিনিয়র, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হসপিটাল ১৩. ডা. সাদেকা আহমেদ ১৪. ডা. ফেরদৌস আকতার চৌধুরী সিনিয়র মেডিকেল অফিসার হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হসপিটাল, ঢাকা ১৫. ডা. শওকত জাহান হক ইউ.কে ১৬. ডা. সুফিয়া খাতুন আদমজী জুট মিলস লি. (নারায়ণগঞ্জ) ১৭. ডা. পিয়ারা ইসলাম এম.পি.এইচ. সহকারী অধ্যাপক, বগুড়া মেডিকেল কলেজ, বগুড়া ১৮. ডা. রিজিয়া বেগম জেনারেল প্রাকটিশনার ১৯. ডা. হোসনে আরা বেগম এফ.সি.পি.এস. স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি সহযোগী অধ্যাপক, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি ঢাকা মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, ঢাকা

২০. ডা. আমিনা মজিদ
স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি
সহযোগী অধ্যাপক, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি বিভাগের প্রধান
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, ঢাকা
২১. ডা. মরিয়াম জামানী বেগম
ধানমন্ডি, ঢাকা
২২. ডা. ফরিদা জোহরা আহমেদ
ইউ.এস.এ
২৩. ডা. জাকিয়া খানম
ইউ.এস.এ
২৪. ডা. মিমি জলিল
২৫. ডা. নন্দিতা মুৎসুদ্দি, চট্টগ্রাম
২৬. সুরাইয়া নুর কাজল
ডিসিএইচ, কে.এস.এ
২৭. ডা. রেহানা তালিবি, পাকিস্তান
২৮. ডা. মোসাম্মত পিয়ালী বেগম পিয়ার,
গাইনোকোলজিস্ট, বগুড়া
২৯. ডা. কামরুন নেসা
৩০. ডা. মেরি-আম-রোজারিও
৩১. ডা. সেলিনা জাহান
ফাতেমা নাসিং হোম, ঢাকা
৩২. ডা. তাহমিনা খানম, ইউ.এস.এ
৩৩. ডা. রুকসানা সুলতানা, কানাডা

৩৪. ডা. আনিসা বাতুল
৩৫. ডা. আজরা সাত্তার
৩৬. ডা. লুৎফা আহমেদ
৩৭. ডা. আয়েশা বেগম
৩৮. ডা. খায়রুন নেসা
৩৯. ডা. হোসনে আরা বেগম
৪০. ডা. নীপা লাহেরী
৪১. ডা. লায়লা আরজুমন্দ বানু
৪২. ডা. সুমাইয়া জোহরা রিজভী
৪৩. ডা. রোজানা ফেরদৌস
৪৪. ডা. তাহিরা জোহরা শাহ
৪৫. ডা. জয়ন্তী শাহা
৪৬. ডা. নাহিদ রশিদ
৪৭. ডা. জাহান আরা বেগম
৪৮. ডা. মেরিলা খানম
৪৯. ডা. লুৎফুন নেসা
৫০. ডা. নাসরিন বেগম
৫১. ডা. সুরাইয়া বেগম
৫২. ডা. হোসনে আরা বেগম
৫৩. ডা. শাহনাজ ইফফাত
৫৪. ডা. হাসিনা আকতার

১৯৭০-৭১ কে (K)-২৯

১. ডা. পারভীন সুলতানা
ডেপুটি প্রো. ম্যানেজার (সিসিডি)
ডাইরেক্টোরেট জেনারেল হেলথ সার্ভিস, ইপিআই ভবন
মহাখালী, ঢাকা
২. ডা. কামরুন নাহার
এফসিপিএস, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি
সহযোগী অধ্যাপক (স্ত্রীরোগ ও প্রসুতি)
ময়নমনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ
৩. ডা. লুৎফন্নেসা
এস.এম.ও.
বারডেম হসপিটাল, শাহবাগ, ঢাকা
৪. ডা. সাঈদা নিলুফার সুলতানা
জেনারেল প্রাকটিশনার
৫. ডা. ভিকারুন নিসা
মেডিকেল অফিসার
হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হসপিটাল, ঢাকা
৬. ডা. সালমা জাহান খান
জেনারেল প্রাকটিশনার
৭. ডা. মধু সুদন মালা
অস্ট্রেলিয়া
৮. ডা. সাওটানা বানু (Sautana Banu)
জেনারেল প্রাকটিশনার
৯. ডা. জেরিনা বেগম
১০. ডা. দিলরুবা এম খুদা
ইউ.এস.এ

১১. ডা. লাবন্য রাখা লালগির
প্রভাষক, এনাটমি
১২. ডা. নাজমা হালিম
জেনারেল প্রাকটিশনার
১৩. ডা. নাহিলা জামান
পেডিয়াট্রিক শিশু হসপিটাল
১৪. ডা. জাকির মাহফুজা জাকারিয়া
ডিডিভি,ডাইরেক্টরেট, আল-বেরুনি হসপিটাল
১৫. ডা. শুভা চন্দ্র দাস
১৬. ডা. জুয়েলা নাইরুন
১৭. ডা. ফাতেমা খাতুন
১৮. ডা. শাহানারা বেগম
১৯. ডা. হোসনা জাহান
২০. ডা. সপ্না রাকাহির
২১. ডা. সোহেলা আহমেদ
২২. ডা. নাসরিন সাহান মিল্কী
২৩. ডা. রাধা সাইয়ো বিশ্বাস
২৪. ডা. তাফাতুন নাহার
২৫. ডা. নিলুফার বেগম
২৬. ডা. সাঈদা আকতার জাহান
২৭. ডা. আনোয়ারা বেগম
২৮. ডা. মর্জিনা খানম
২৯. ডা. নিলুফার
৩০. ডা. শারমিন ফেরদৌস
৩১. ডা. নাজনীন আনোয়ার
৩২. ডা. রহিকা বিকি

৩৩. ডা. শাহিদা পারভীন ৩৪. ডা. রমা রানী সাহা ৩৫. ডা. সাঈদা জিনাত আরা বেগম ৩৬. ডা. মাহমুদ রীফা ৩৭. ডা. মমতাজ বেগম ৩৮. ডা. ফাতেমা খাতুন ৩৯. ডা. মুকুল জয়তী চাকমা ৪০. ডা. মোনোয়ারা সুলতান ৪১. ডা. মনসুরা বেগম ৪২. ডা. নাসরিন বেগম	৪৩. ডা. শাগুফতা নাসরিন আইনী ৪৪. ডা. ভারতী ৪৫. ডা. মরিয়াম বেগম ৪৬. ডা. দুকস্মদ্র বানু (Dukshamdra Banu) ৪৭. ডা. নাসরীন রশীদ ৪৮. ডা. রেহানা বেগম ৪৯. ডা. খালেদা নাসরীন ৫০. ডা. মোনোয়ারা সুলতানা (মৃত) ৫১. ডা. বেগম সাহা ৫২. ডা. সালেহা বেগম ৫৩. ডা. ফারহানা আহমেদ
১৯৭১-৭২ কে (K)-৩০ ১. ডা. হাসরাত আরা বেগম ডিপ্লোমা-ইন-এসটিডি এন্ড এইডস (ব্যাংকক রিপ্রোডাকটিভ হেলথ) প্রজেক্ট ম্যানেজার (ইউপিএইচসিপি), ম্যারিস্টপস ক্লিনিক ২. ডা. রেজিনা রাজ্জাক রেসিডেন্সি ইন পেডিয়াট্রিক অপারেশনস রিসার্জড ওআরপি, আইসিডিডিআরবি, মহাখালী, ঢাকা ৩. ডা. জেবুন নেসা নুরি ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল আল্ট্রাসাউন্ড (সোনোলজি) কনসালটেন্ট সোনোলজিস্ট ৪. ডা. নুরুন নাহার বেগম, এমডি (জার্মান) অবস গাইনো এন্ড ব্রেস্ট ডিজিজ সরকারি কর্মচারি হসপিটাল, ঢাকা ৫. ডা. রাজিয়া সুলতানা মাহমুদ সহযোগী অধ্যাপক, কার্ডিওলজি ঢাকা মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, ঢাকা ৬. ডা. সুলতানা আফরোজা	৭. ডা. শিরিন আকতার ৮. ডা. ফেরদৌস আরা ৯. ডা. মোঃ রওশন ইশানদি ১০. ডা. শিরিন আকতার ১১. ডা. সুফিয়া খাতুন ১২. ডা. সোহেলা আকতার ১৩. ডা. সালমা হালিম ১৪. ডা. নাসিম সুলতানা ১৫. ডা. তাহমিনা আকতার ১৬. ডা. রেহানা আকতার চৌধুরী ১৭. ডা. সাজেদা চৌধুরী ১৮. ডা. মাজেদা বেগম ১৯. ডা. সালেহা বেগম ২০. ডা. দিলারা রহমান ২১. ডা. রুবাবা আকন্দ ২২. ডা. বেগম রোকেয়া নুর ২৩. ডা. বিলকিস বানু ২৪. ডা. নুসরাত জাহান মির্জা ২৫. ডা. নাজনীন ইসহাক ২৬. ডা. সালিমা হক ২৭. ডা. খুরশিদ জাহান ২৮. ডা. মোসাম্মত ফাতিমা খাতুন

উৎস: *Alumni Directory, Dhaka Medical College*, Dhaka Medical College Alumni Trust, 2002, pp. 39-124.

পরিশিষ্ট-৪৪

সংলগ্ন-৬

GOVERNMENT OF THE PEOPLES' REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE
MUJIBNAGAR.

Dated, 21-10-71.

Appointment.

Kazi Misbahun Nahar, M.B.B.S. is appointed as a Medical Officer incharge to the Head Quarter to look after the injured Freedom Fighters being treated in different hospitals. She will receive a monthly pay of Rs.350/- (Three hundred and fifty only) and fixed Travelling Allowance of Rs. 150/= (One Hundred and fifty only) from the date she joins the service. The salary will be paid from the Health Department.

The appointment is made in the public interest with the approval of the Prime Minister.

Sd/- Dr. T. Hossain
21.10.71.
Secretary
Ministry of National Health
& Welfare.

Memo. No. HS/230/1(18)

dated. 21.10.71.

Copy forwarded to :-

1) Dr. Kazi Misbahun Nahar, M.B.B.S.
2) Head of the Bangladesh Mission, Calcutta.
3) Secretaty, Foreign Affairs.
4) Secretary, General Administration.
5) Secretary, Finance.
6) Secretary, Defence.
7) Secretary, Cabinet Division.
8) Secretary, Home Department.
9) Chief Engineer.
10) Relief Commissioner.
11) Director, H.Q., Youth Camp.
12) Officer-on-Special Duty, Law and Parliamentary Affairs.
13) Private Secretary to the President.
14) Private Secretary to the Prime Minister.
15) Private Secretary to the Finance Minister.
16) Private Secretary to the Foreign Minister.
17) Private Secretary to the Home Minister.
18) A.D.C. to C-in-C.

Sd/-
(Dr. A. Ali)
Dy. Secr...
Ministry of ... Health

ACN/

উৎস: সাক্ষাৎকার, ডা. কাজী মিসবাহুন নাহার তামান্না, বয়স ৭৩ (১৯৪৭), ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তন ছাত্রী, মুজিবনগর সরকারের প্রথম নারী মেডিকেল অফিসার, মেহের টাওয়ার, ১৬৪ বীর উত্তম সিআর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫, তারিখ: ২৪/১২/২০২০।

GOVERNMENT OF THE PEOPLES' REPUBLIC OF BANGLADESH
MINISTRY OF NATIONAL HEALTH AND WELFARE
MUJIBNAGAR.

Dated, 25. 10. 71.

To:
Secretary,
Ministry of National Health & Welfare
Govt. of the Peoples' Republic Of Bangladesh
Mujibnagar.

Sub: Joining Report.

Sir,

With reference to the Memo. No. MS/230/1(18) dated 21. 10. 71, I have the honour to join my duties of Medical Officer on the fore-noon of 21st. October 1971.

Obediently Yours,

Kazi Misbahun Nahar
(Kazi Misbahun Nahar)
25.10.71

Copy forwarded, for favour of information, to:
i) Secretary, Finance.
ii) Secretary, General Administration.

উৎস: সাক্ষাৎকার, ডা. কাজী মিসবাহুন নাহার তামান্না, বয়স ৭৩, (১৯৪৭), ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তন ছাত্রী, মুজিবনগর সরকারের প্রথম নারী মেডিকেল অফিসার, মেহের টাওয়ার, ১৬৪ বীর উত্তম সিআর দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫, তারিখ: ২৪/১২/২০২০।

BANGLADESH MEDICAL ASSOCIATION

FORMERLY

Pakistan Medical Association : East Zone

Calcutta Camp
11B, Indian Mirror Street
Calcutta–13
Phone : 24–3998

Dear Sir,

A team of physicians and surgeons of Bangladesh is organised by our Association to work, on a voluntary basis, among our countrymen now in India. Our doctors are already working in the different camps of Bongaon, Hakimpur, Malda, Jalpaiguri and Agartala. Our Associaion is also trying to organise para-medical teams from among the Bangladesh youths. The problem being colossal, in spite of the generous help and aid already flowing in, we feel seriously handicapped by shortage of medicines and other equimpments necessary for mobile hospitals (including ambulance), for which we appeal to the members in medical profession, pharmaceutical industries and other individuals and organisations. We rely vitally on your support.

Yours faithfully
(Dr.) Sarwar Ali
General Secretary

An Appeal by Calcutta Doctors

We deeply appreciate the above move by the BANGLADESH MEDICAL ASSOCIATION. It is only proper that the people of Bangladesh take up the cause of their own people, who have come over here. No doubt this

will, to some extent, take the load off our own organizations such as the IMA—Bengal and Calcutta. But the problem is so enormous that our responsibilities, moral and otherwise, do not diminish to any appreciable extent. We expect our people to rise to the occasion and contribute generously.

We particularly appeal to the various pharmaceutical and surgical appliances organizations to come forward and help substantially in this mission of our brother organisation. We extend our wholehearted support and goodwill to this very bold, humanitarian and urgent move.

Dr. P. K. Raychaudhury, Ex-Mayor of Calcutta.
Dr. Nihar Kumar Munshi, MB (Cal), DOMS (Lond)
Dr. M. M. Mukherji, MS (Cal), FRCS (Edin & Eng)
Dr. A. K. Basu, MS (Cal), FRCS (Eng), FACS
Dr. Manindra Lal Biswas, MB (Cal) MRCS (Eng), MRCP (Lond), DCH (Eng)
Dr. B. C. Sinha, MB, MRCP (Lond), FACC (USA)
Dr. Muralidhar Sengupta, MB, DOMS (Lond)
Dr. M. K. Chhetri, M. D., MRCP
Dr. S. R. Konar, MB, FRCS
Dr. R. N. Chatterjee, MS
Dr. K. S. Bose, MS
Dr. Binoy Bhattacharya,MB, DTM, FRCS, TDD (Wales)
Dr. Umesh Chandra Chakravary, MB, FRCS (Eng)
Dr. B. Chakrabarty, MD, D. Phil.
Dr. Amal Kumar Sen, MB, DOMS (Lond)
Dr. Asok Bagchi, MBBS, FNS (Vienna), FACC, FICS
Dr. N. K. Pal, MS (Cal), FRCS (Eng)
Dr. A. B. Mukherjee, MD, (Cal), FRCS (Lond)
Dr. B. N. Mukherjee, MD, D. Phil.
Dr. S. M. Lahiri, FRCS (Lond)
Dr. A. M. O. Ghani
Dr. N. N. Roychowdhury MBBS, DGO, MD (Cal), MRCOG (Lond), FRCS (Edin), FACS
Dr. Samar Roychoudhury
Dr. B. Ray Chaudhury, MD, MRCP, Ph. D.
Dr. R. Ray, MS
Dr. N. N. Sen, MD, MRC Path, MAMS
Dr. S. Gupta, MS, FRCS
Dr. Amiya Kumar Bose, MB, DGO (Cal), FRCOG (Lond.), D. Phil (Cal)
Dr. P. Bhattacharya, M.B.B.S., Ph.D. (Medicine) M. A. S. M. (U.S.A.)

উৎস: আহমদ রফিক, *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩ পৃ. ২৫১-২৫২।

পরিশিষ্ট-৪৬

মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা শিক্ষক, চিকিৎসক, ছাত্রছাত্রী এবং কলেজ হাসাপাতালে কর্মরত চিকিৎসকদের তালিকা,

১. অধ্যাপক ডা. মো: ফজলে রাব্বী
২. সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো: আলীম চৌধুরী
৩. ডা. মো: সামসুদ্দিন আহমেদ
৪. ডা. আজহারুল হক
৫. ডা. হুমায়ুন কবির
৬. ডা. সোলায়মান খান
৭. ডা. মিসেস আয়েশা বেদোরা চৌধুরী
৮. ডা. কায়সার উদ্দিন তালুকদার
৯. ডা. মনসুর আলী
১০. ডা. গোলাম মর্তুজা
১১. ডা. হাফিজ উদ্দিন খান
১২. ডা. জাহাঙ্গীর
১৩. ডা. এ. জব্বার
১৪. ডা. এস. কে. লালা
১৫. ডা. হেম চন্দ্র বসাক
১৬. ডা. কাজী ওবায়দুল হক
১৭. ডা. নরেন ঘোষ
১৮. ডা. আলহাজ মমতাজ উদ্দিন
১৯. ডা. জিকরুল হক
২০. ডা. হাসিময় হাজরা
২১. ডা.শামসুল হক
২২. ডা. মফিজউদ্দিন খান
২৩. ডা. এম. রহমান
২৪. ডা. অমূল্য চন্দ্র চক্রবর্তী
২৫. ডা. এ গফুর
২৬. ডা. আতিকুর রহমান
২৭. ডা. মনসুর আলী
২৮. ডা. গোলাম সারওয়ার
২৯. ডা. রমণী দাস
৩০. ডা. আর. সি. দাস
৩১. ডা. এম. কে. সেন
৩২. ডা. রবিউল হক
৩৩. ডা. এস. কে. এম. গোলাম মোস্তফা
৩৪. ডা. মিহির কুমার সেন
৩৫. ডা. মকবুল আহমেদ
৩৬. ডা. সালেহ আহমেদ
৩৭. ডা. এনামুল হক
৩৮. ডা. অনিল কুমার সেন
৩৯. ডা. মনুসর কোনু
৪০. ডা. সুশীল চন্দ্র শর্মা
৪১. ডা. আশরাফ আলী তালুকদার

৪২. ডা. কাজল ভদ্র
৪৩. ডা. বজলুল হক
৪৪. লে. ক. জিয়াউর রহমান (এ. এম. সি)
৪৫. লে. ক. এ. এফ. এম. ফারুক (এ. এম. সি)
৪৬. লে. ক. বদিউল আলম (এ. এম. সি)
৪৭. লে. ক. জাহাঙ্গীর (এ. এম. সি)
৪৮. লে. ক. সৈয়দ আব্দুল হাই (এ. এম. সি)
৪৯. মেজর আব্দুল হক (এ. এম. সি)
৫০. মেজর রিয়াজুর রহমান (এ. এম. সি)
৫১. মেজর মুজিবুদ্দিন আহমেদ (এ. এম. সি)
৫২. মেজর নাঈমুল ইসলাম (এ. এম. সি)
৫৩. লে. নরুল ইসলাম (এ. এম. সি)
৫৪. লে. এনামুল হক (এ. এম. সি)
৫৫. ডা. মনসুর রহমান
৫৬. ডা. গোপাল চন্দ্র সাহা
৫৭. ডা. নরেন্দ্র নাথ দত্ত
৫৮. ডা. এ. বি. এম নুরুল আলম
৫৯. ডা. এ মুকতাদির
৬০. ডা. বেরতি কান্তি স্যানাল
৬১. ডা. ক্ষিতিশ চন্দ্র দে
৬২. ডা. এ. রহমান
৬৩. ডা. নওশের আলী
৬৪. ডা. সাঈদ মৌহিত ইসলাম
৬৫. মেজর আমিনুল ইসলাম (এ. এম. সি)
৬৬. লে. ক. বি. এ. চৌধুরী (এ. এম. সি)
৬৭. লে. ক. আমিনুল হক (এ. এম. সি)
৬৮. লে. খন্দকার নুরুল ইসলাম (এ. এম. সি)
৬৯. আ. বা. ম. সিরাজুল হক (৪র্থ বর্ষ ছাত্র)

উৎস: ঢাকা মেডিকেল কলেজ শহীদ স্মৃতিফলক।

গ্রন্থপঞ্জি

ক. অপ্রকাশিত উৎসসমূহ

১. সরকারি নথিপত্র

A) বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস ও জাতীয় গ্রন্থাগার, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

Government of Bengal Records- *A,B Proceedings*

A Proceedings, Municipal Department, Municipal Branch, Government of Bengal, Period: August 1905-December 1932.

A Proceedings, Medical Department, Medical Branch, Government of Bengal, Period: August 1935-1946.

A Proceedings, Public Health Department, Public Health Branch, Government of Bengal, Period : January 1933-June 1946.

A Proceedings, Public Health Department, Public Health Branch, Government of Bengal, Period : April 1868-December 1935.

B Proceedings, Public Health Department, Public Health Branch, Government of Bengal, Period : 1921-November 1953.

B Proceedings, Medical Department, Medical Branch, Government of Bengal, Period: December 1932-December 1953.

B Proceedings, Education Department, Education Branch, Government of Bengal, Period: January 1960-December 1960.

B Proceedings, Education Department, Education Branch, Government of Bengal, Period: January 1960-December 1960.

B Proceedings, Education Department, Education Branch, Government of Bengal, Period: February 1936-July 1959.

B Proceedings, Education Department, Education Branch (Miscellaneous), Government of Bengal, Period : April 1931-September 1957.

B Proceedings, Education Department, Registration Branch, Government of Bengal, Period: April 1921-July 1946.

B Proceedings, Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of Bengal, Period : January 1922-December 1943.

B Proceedings, Public Health Department, Public Health Branch, Government of Bengal, Period : February 1934-December 1953.

(B) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার অধিকার, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আরকাইভস, গর্ভনমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা

A, B Proceedings of the Government of Bengal, General Department, Education Branch, 1919-1926

A, B Proceedings of the Government of Bengal, Education Department, Education Branch, 1919-1943

A, B Proceedings of the Government of Bengal, Local-Self Department, Medical Branch, 1913-1916

B Proceedings of the Government of Bengal, Financial Department, Medical Branch, 1913

C) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড রুম, রেজিস্ট্রার ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ডি গ্রুপ, ফাইল নং : ৮৬, Sub : Establishment of Medical Research Council*,* সাল : ১৯৬৩-৬৫।

ডি গ্রুপ, ফাইল নং : ১০৭, Sub : Minute of the Faculty of Medicine, সাল : ১৯৫৯-৬০।

ডি গ্রুপ, ফাইল নং : ১১৪, Sub :Award of B.Sc Degree in Medicine, সাল : ১৯৬৫-৬৭।

ডি গ্রুপ, ফাইল নং : ১৫১, Sub : Mes. of Medical Service and Faculty, সাল : ১৯৬৯-৭০।

ডি গ্রুপ, ফাইল নং : ১৭৪, Sub : Complaint against the Dean of Faculty of Medicine, সাল : ১৯৫৮-৫৯।

ডি গ্রুপ, ফাইল নং : ১১৫৫, Sub : Medical Council Ordinance, সাল : ১৯৬১-৬২।

ডি গ্রুপ, ফাইল নং : ২০৬৭, Sub : Pakistan Medical Research Council, সাল : ১৯৫৫-৫৬।

ডি গ্রুপ, ফাইল নং : ২২৭২, Sub : Pakistan Medical Research Council*,* সাল : ১৯৫০-৫৩।

ডি গ্রুপ, ফাইল নং : ২২৭৩, Sub : Pakistan Medical Council, সাল : ১৯৫৬-৬০।

ডি গ্রুপ, ফাইল নং : ৩৩৭৪, Sub : Appointment of Teachers in DMC Hospital, সাল : ১৯৪৯-৫০।

D) ই.সি রুম, রেজিস্ট্রার ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Executive Council, University of Dacca, Session 1935-37.

Executive Council, University of Dacca, Session 1935-52.

Executive Council, University of Dacca, Session 1944-52.

খ. মুদ্রিত সরকারি উৎসসমূহ

১. সরকারি কার্যবিবরণী, রিপোর্ট ও প্রকাশনা

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Vol. LV, No. 1, Sixth Session, 27th ....30th November and 1st December, 1939, Bengal Government Press, Bengal, 1939. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Vol. LIV, No. 6-12, Fifth Session, East Bengal Government Press, Dacca, 1939. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Vol. LVI, No. 1, Seventh Session, 1940, The 15th.....16th, 21st, 22nd and 24th February 1940, Bengal Government Press, Alipore, Bengal 1940. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Vol. LVI, No. 2-3, Seventh Session, 1940, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1940. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Vol. LX, No. 1, Eleventh Session, 1941, The 28th....30th July and August 1941. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Vol. LX, No. 2, Eleventh Session, 1941, The 4th...6th August, 1941, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1942. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Eleventh Session, 1941, Vol. LX, No. 4, The 27th August, 1st...4th September 1941, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Eleventh Session, 1941, Vol. LX, No. 5, The 8th...18th November, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Thirteenth Session, 1942, Vol. LXII, No. 12, The 16th...27th February, The 9th....14th March, 1942, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1942. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Vol. LXV, Sixteenth Session, 1943, The 5th ... 14th July 1943, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1943. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Seventeenth Session, 1943, 14th...15th September, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1943. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Seventeenth Session, 1943, 20th, 21st...28th September 1943, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1943. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Vol. LXVII, No. 4, The 1st, 3rd, 4th, 6th, 18th, 19th, 20th, 21st, 24th, 25th, 26th and 27th April 1944, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1944. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Vol. LXVII-No. 6, Eighteenth Session, 1944, The 26th ... 29th, 30th and 31 May and 5th, 9th, 12th ... 21st and 23rd June 1944. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Vol. LXIX, Twentieth Session, 1945, The 16th...28th February, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1945. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Assembly,* Vol. LXIX, Twentieth Session, 1945, The 12th...29th March, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1945. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Bengal Legislative Assembly*, Third Session, 1949, Vol. III, No. 3-4, The 26th 28th to 31st March and 1st April 1949, East Bengal Government Press, Dacca, 1951. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Bengal Legislative Assembly,* Fourth Session, 1949-50, Vol. IV, No. 5-8, East Bengal Government Press, Dacca, 1952. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Bengal Legislative Assembly,* Vol. 6, The 1st.....13th March 1951, East Bengal Government Press, Dacca, 1953. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Bengal Legislative Assembly,* Fifth Session, 1951, Vol. 5, The 15th.....28th February 1951, East Bengal Government Press, Dacca, 1953. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Bengal Legislative Assembly,* Ninth Session, Vol. IX, No. 1-2, The 6th....02nd October, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 28th, 29th, 30th....31st October and 1st November 1952, East Bengal Government Press, Dacca, 1954. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Bengal Legislative Assembly,* Tenth Session, 1949-50, Vol. X, No. 1-2, The 25th...27th February, 2nd.....6th, 14th, 16th to 20th March 1953, East Bengal Government Press, Dacca, 1954. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Pakistan Assembly,* Third Session, Vol. XV, No. 1-3, The 17th to 23rd September, 24th to 27th September and 28th Sept to 2nd October 1956, East Pakistan Government Press, Dacca, 1957. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Pakistan Assembly,* Second Session, 1957, Vol. XVII, No. 1-2, The 21st-24th September1957, East Pakistan Government Press, Dacca, 1958. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Pakistan Assembly,* First Session, Vol. XVI, No. 1-6, The 11th to 13th March, 14th to 17th, 24th to 27th, 28th to 30th and 1st to 3rd April, East Pakistan Government Press, Dacca, 1957. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Pakistan Provincial Assembly,* First Session, 1958, East Pakistan Government Press, Dacca, 1958. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Pakistan Provincial Assembly,* First Session, Vol. XVIII, No. 1, The 13th to 15th March 1958, East Pakistan Government Press, Dacca, 1958. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Pakistan Provincial Assembly,* Second Session, Vol. XXIV, No. 1, The 4th....16th June 1963, East Pakistan Government Press, Dacca, 1964. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Pakistan Provincial Assembly,* Third Session, Vol. XXV, No. 3, The 3rd....8th February, East Pakistan Government Press, Dacca, 1966. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Pakistan Provincial Assembly,* Third Session, Vol. XXV, No. 1-2, The 27th, 30th, 31st December 1963, 2nd....31st January 1964, East Pakistan Government Press, Dacca, 1965. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Pakistan Provincial Assembly,* Budget Session, 1964-65, Vol. XXVVI, No. 1-3, The 25th....29th May and 1st, 2nd....17th June 1964, East Pakistan Government Press, Dacca, 1966, (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Pakistan Provincial Assembly,* Second Session, Vol. XXIX, No. 1-3, The 3rd.....8th December, 10th....13th December, 14th....17th December, East Pakistan Government Press, Dacca, 1966. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Pakistan Provincial Assembly,* Budget Session, Vol. XXX, No. 4-5, The 22nd, 23rd and 21st June and The 25th, 27th, 28th and 29th June 1966, East Pakistan Government Press, Dacca, 1967. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Pakistan Assembly,* Budget Session, Vol. XXXII, No. 1, The 2nd, 5th, 8th, 9th and 10th 1967, East Pakistan Government Press, Dacca, 1967. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Pakistan Assembly,* Budget Session, Vol. XXXII, No. 2, The 12th-13th, 15th, 19th June 1967, East Pakistan Government Press, Dacca, 1969. (DUL)

Assembly Proceedings (Official Report), *East Pakistan Provincial Assembly,* Budget Session, Vol. XXXII, No. 3-4, The 20th, 22nd and 23rd June and The 24th and 25th June 1967, East Pakistan Government Press, Dacca, 1969. (DUL)

Council Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Council,* Twenty First Session, 1926, Bengal Secretariat Book Depot, 1926. (DUL)

Council Proceedings (Official Report), *Bengal Legislative Council,* Forty Ninth Session, 9th-30th November and 1st to 4th December 1936, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1937. (DUL)

The Bengal Legislative Council Proceedings (Official Report) Eleventh Session, Vol. XI, No. 1-2, Bengal Secretariat Book Depot, 1926. (DUL)

The Legislative Assembly Debates, Vol. II, The Manager, Government of India Press, New Delhi, 1946. (DUL)

The Legislative Assembly Debates, Vol. VII, No. 1, 28th October 1946, The Manager, Government of India Press, New Delhi, 1946. (DUL)

The Legislative Assembly Debates, Vol. VII, No. 9, November 1946, The Manager, Government of India Press, New Delhi, 1946. (DUL)

Annual Report for 1936-71, University of Dacca, The Dacca University Press, Ramna, Dacca.

Annual Report of The Bengal Health Welfare Committee 1937, Indian Red Cross Society, Calcutta, 1937. (NAB)

Annual Report of The Bengal Health Welfare Committee 1938, Indian Red Cross Society, Calcutta, 1938. (NAB)

Annual Report of The Sanitary Board, Bengal for the year 1932, Bengal Government Press, Alipore, Bengal,1934. (NAB)

Annual Report of The Sanitary Board, Bengal for the year 1934, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1935. (NAB)

Annual Report of The Sanitary Board, Bengal for the year 1935, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1936. (NAB)

Annual Report of The Sanitary Board, Bengal for the year 1936, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1937. (NAB)

Annual Report of The Sanitary Board, Bengal for the year 1937, Government of Bengal, Bengal Government Press, Alipore, Bengal 1938. (NAB)

Annual Report of The Sanitary Board, Bengal for the year 1938, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1939. (NAB)

Annual Report of The Sanitary Board, Bengal, for the year 1939, Government of Bengal, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941. (NAB)

Annual Report on the Working of the Carmichael Medical College, Belgachia (Calcutta) for the year 1921-22, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1922. (DUL)

Annual Report of the Medical College, Calcutta for the year 1923-24, Bengal Secretariat Book Depot, 1925. (DUL)

Annual Report on the Working of Medical College, Calcutta for the year 1923-30, Bengal Secretariat Book Depot, 1931.

Annual Report of the Medical Schools in Bengal for the year 1929-30, Bengal Secretariat Book Depot, 1931. (DUL)

Annual Report of the Medical Schools in Bengal for the year 1930-31, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1932. (DUL)

Annual Report of the Medical Schools in Bengal for the year 1932-33, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1934. (DUL)

Annual Report of the Medical Schools in Bengal for the year 1934-35, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1936. (DUL)

Annual Report of the Medical Schools in Bengal for the year 1935-36, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1937. (DUL)

Annual Report of the Medical Schools in Bengal for the year 1938-39, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1940. (DUL)

Annual Report of the Medical Schools in Bengal for the year 1939-40, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941. (DUL)

Annual Report on the Working of the Hospitals and Dispensaries in The Province of East Bengal (for the year 1948), East Bengal Government Press, Dacca, 1954. (BFPO)

Annual Report on the working of the Hospitals and Dispensaries in The Province of East Bengal (for the year 1949), East Pakistan Government Press, Dacca, 1956. (BFPO)

Annual Report of the Medical School in East Bengal 1948-49, East Bengal Government Press, Dacca, 1956. (NAB)

Annual Report of the Medical School in East Bengal 1949-50, East Bengal Government Press, Dacca, 1956. (NAB)

Annual Report of the Medical School in East Bengal 1950-51, East Bengal Government Press, Dacca, 1956. (NAB)

Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1946-52, East Bengal Government Press, Dacca, 1954. (BFPO)

Annual Report of the Medical Schools in East Pakistan for the session 1952-53, East Pakistan Government Press, Dacca, 1959. (NAB)

Annual Report of the Government Medical Schools in East Pakistan for the session 1953-54, East Pakistan Government Press, Dacca, 1959. (NAB)

Annual Report on the Working of the Hospitals and Dispensaries in The Province of East Bengal 1954, Government of East Pakistan, East Bengal Government Press, 1964. (BFPO)

Annual Report of the National Association Supplying Medical Aid by women to the women India, 1923. (NAB)

Bengal Public Health Report for the year 1930, Bengal Secretariat Book Depot, 1932. (NAB)

Bengal Public Health Report for the year 1932, East Bengal Govt. Press, Alipore, Bengal, 1934.

Bengal Public Health Report for the year 1933, East Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1935. (NAB)

Bengal Public Health Report for the year 1934, East Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1936. (NAB)

Bengal Public Health Report for the year 1935, East Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1937. (NAB)

Bengal Public Health Report for the year 1936, East Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1938. (NAB)

Bengal Public Health Report for the year 1937, East Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1939. (NAB)

Bengal Public Health Report for the year 1938, East Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1940. (NAB)

Bengal Public Health Report for the year 1939, East Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941. (NAB)

Bengal Public Health Report for the year 1940, East Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1942. (NAB)

Bengal Public Health Report for the year 1941, East Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1943. (NAB)

East Pakistan Information, Government of East Pakistan, August 14, 1958 (DUL)

Health Schemes of East Bengal, Health and Local Self-Government Department, Government of East Bengal, East Bengal Government Press, Dacca, 1953. (NAB)

History of Services of Gazetted officers Part-II-III (Corrected up to 1st July 1959) East Pakistan Government Press, Dacca, 1963. (BFPO)

History of Services of Gazetted Officers Part-II (Corrected up to July 1968) Bangladesh Government Press, Dacca, 1975. (BFPO)

List of Hospitals and Dispensaries in East Pakistan (Corrected up to 31st December 1957) East Pakistan Government Press, Dacca, 1960. (BFPO)

List of Hospitals and Dispensaries in East Pakistan (Corrected up to 31st December 1961) Directorate of Health Services, East Pakistan Government Press, Dacca, 1963. (BFPO)

List of Hospitals and Dispensaries in East Pakistan (Corrected up to 30th June 1967) Directorate of Health Services, Government of East Pakistan, East Pakistan Government Press, Dacca, 1968. (BFPO)

Manual of Rules for the Management of Hospitals and Dispensaries under the Supervision of the Government of Bengal (Corrected up to 1946), Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1947. (BFPO)

Memorandum on Some of the Results of Indian Administration During the Past Fifty years of British Rule in India, Wyman and sons Ltd, London, 1909. (DUL)

Qualified Medical Practitioners in Bengal 1910, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1911 (National Library, Alipore, Calcutta, India)

Quantitative Estimates of the Requirement of Drugs or Medicine in Bangladesh, Government of Bangladesh, Bangladesh Government Press, 1975. (NAB)

Reorganization of Rural Public Health Services Scheme, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1941. (NAB)

Report of the Census of Bengal 1872, The Bengal Secretariat Press, Calcutta 1872 (NAB)

Report on the Administration of Bengal, 1900-1901, The Bengal Secretariat Press, 1902 (DUL)

Report of the Dacca University Committee 1912, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1912. (DUL)

Report on the Administration of Bengal 1912-1913, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1914 (DUL)

Report of the Recommendations of the Commission, Calcutta University Commission, 1917-1919, Vol. IV, V, Part-II, III, Superintendent Govt. Printing, Calcutta, India, 1919. (DUL)

Report of the Local Committee on the Dacca University Scheme, File No. 1-U-2, Serial No. 1 General Department: Education, Government of Bengal, 1920. (DUL)

Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Government of Bengal for the year 1921, The Bengal Secretariat Book Depot, 1922. (BFPO)

Report on the Administration of Bengal, 1935-1936, The Bengal Government Press, Alipore, 1937 (DUL)

Report of the Health Survey and Development Committee, Survey, Vol. I, Government of India Press, Calcutta, 1946. (Kolkata)

Report of the Committee on Indigenous System of Medicine, 1946, Ministry of Health, New Delhi, 1948 (National Library, Alipore, Calcutta, India)

Report of the Health Survey and Development Committee, Survey, Vol. III, Appendices, Government of India Press, Simla, 1946. (NAB)

Report of the Working of Municipalities in East Bengal, During the year 1948-49, Department of Health and Local Self - Government, Local Self-Government Branch, East Pakistan Government Press, Dacca, 1956. (BFPO)

Report of the Working of Municipalities in East Pakistan, During the year 1950-51, Local Self-Government Branch, East Pakistan Government Press, Dacca, 1959. (BFPO)

Report of the Educational Reforms Commission, East Pakistan, Pat-I, 1957. (DUL)

The Bengal Nurses Act 1934, Bengal Act X of 1934, Bengal Government Press, Alipore, Bengal, 1934. (NAB)

The Bangladesh Code, Vol. X, Bengal Act No. IV of 1942 to East Bengal Act, No. XXVIII of 1951, Bangladesh Forms and publications office, Tejgaon, Dhaka, 2007.

The Calendar, University of Dacca for the Session 1929-30, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-1935, Vol. I, The University of Dacca. (DUL)

The Calendar, University of Dacca for the Session 1935-36, 1936-37, 1937-38, Vol. I, The University of Dacca. (DUL)

The Calendar, University of Dacca for the Session 1938-39, 1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, Vol. I, The University of Dacca. (DUL)

The Calendar, Containing University Ordinances and Regulation, University of Dacca, Vol. I, Part: IV, The University of Dacca, 1953. (DUL)

The Calendar, University of Dacca, Vol. I, The University of Dacca, 1957. (DUL)

The Calendar, University Ordinance, Statutes and Regulation, University of Dacca, The University of Dacca, 1969. (DUL)

The Drugs Act, (XXIII of 1940), Government of India Press, New Delhi, 1940.

The Indian Medical Council ACT, 1933 (XXVII of 1933) Government of India Press, New Delhi, 1938 (National Library, Alipore, Calcutta, India)

The Pakistan Code, Vol. II, From 1872 to 1881, Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Government of Pakistan, Manager of Publications, Karachi, 1966. (IERL)

The Pakistan Code, Vol. V, From 1908 to 1910, Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Government of Pakistan, Manager of Publications, Karachi, 1966. (IERL)

The Pakistan Code, Vol.VI, From 1911 to 1919, Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Government of Pakistan, Manager of Publications, Karachi, 1966. (IERL)

The Pakistan Code, Vol. IX, From 1934 to 1939, Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Government of Pakistan, Manager of Publications, Karachi, 1966. (IERL)

The Pakistan Code, Vol. X, From 1940 to 1947, Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Government of Pakistan, Manager of Publications, Karachi, 1966. (IERL)

The Pakistan Code, Vol. XI, From 1948 to 1952, Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Government of Pakistan, Manager of Publications, Karachi, 1966. (IERL)

The Pakistan Code, Vol. XII, From 1953 to 1957, Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Government of Pakistan, Manager of Publications, Karachi, 1967. (IERL)

The Pakistan Code, Vol. XIII, From 1958 to 1960, Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Government of Pakistan, Manager of Publications, Karachi, 1967. (IERL)

The Pakistan Code, Vol. XIV, From 1961 to 1962, Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Government of Pakistan, Manager of Publications, Karachi, 1967. (IERL)

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা ১৯৬০-১৯৬৫, (বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস)।

পরিকল্পনা কমিশন, পাকিস্তান সরকার, জুন ১৯৬০। (বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস)

প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা ১৯৯৭। (BOUL)

৫২তম বার্ষিক বিবরণী ১৯৭২-৭৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড রুম)

গেজেটিয়ার

Bengal District Gazetteer, Dacca, Vol.3, Statistics, 1911-12 to 1920 to 21, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1923. (DUL)

Allen, B.C., *Eastern Bengal District Gazetteer, Dacca,* The Pioneer Press, Allahabad, 1912. (NAB)

Hunter, W.W., *A Statistical Account of Bengal, Dacca,* Vol. V, London, 1875. (DUL)

Rizvi, S.N.H., *East Pakistan District Gazetteer, Dacca,* East Pakistan Government Press, Dacca, 1969. (NAB)

বাংলাদেশ সরকার

Rizvi, S.N.H., *Bangladesh District Gazetteer, Dacca,* Bangladesh Govt. Press, Dacca, 1975. (DUL)

আলী, শেখ মাকসুদ, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, বৃহত্তর ঢাকা,* বাংলাদেশ মুদ্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৩। (NAB)

২. সংবাদপত্র, গেজেট এবং ম্যাগাজিন

ক. বাংলায় প্রকাশিত সংবাদপত্র

ঢাকা প্রকাশ ১৯০১-১৯৫৯ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

দৈনিক আজাদ ১৯৪৭-১৯৭১ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

দৈনিক ইত্তেফাক ১৯৫৬-১৯৭১ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

দৈনিক ইত্তেহাদ ১৯৫৮-১৯৬৬ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

দৈনিক পাকিস্তান ১৯৬৬-১৯৬৯ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

দৈনিক মিল্লাত ১৯৫৫-১৯৭১ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

দৈনিক সংবাদ ১৯৫৬-১৯৭১ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

দৈনিক নাযাত ১৯৫৯ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

দৈনিক জমানা ১৯৫৯-৬০, ১৯৬৮ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

দৈনিক পূর্বদেশ ১৯৬৯ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

দৈনিক লোক সেবক ১৯৫৭ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

দৈনিক পয়গাম ১৯৬৯ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

চিকিৎসা দর্পন (মাসিক) (বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি)

চিকিৎসা প্রকাশ (মাসিক) (ঐ)

জাহানে নও (সাপ্তাহিক) ১৯৬৯ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

প্রবাসী পত্রিকা (মাসিক) ১৩৪১-১৩৭৭

স্বাস্থ্য সমাচার ১৩৪৭ (মাসিক) (বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি)

বিশ্বভারতী (মাসিক) (ঐ)

বঙ্গবানী (মাসিক) (ঐ)

মাহে নও (মাসিক) ১৯৪৯-১৯৭১ (ঐ)

খ. ইংরেজি পত্রিকা

Amrita Bazar 1956-1957. (DUL)

Morning News 1955-1969. (DUL)

Pakistan Times 1969-1971. (NAB)

The Bangladesh Gazette 15 February 1973. (NAB)

The Bengal Educational Gazette January 1946-December 1946. (DUL)

The Bengal Educational Gazette July 1944-December 1944. (DUL)

The Bengal Educational Gazette July 1946-February 1947. (DUL)

The Calcutta Gazette, July-December 1945. (NAB)

The Calcutta Gazette, July-December 1946. (NAB)

The Calcutta Gazette, Part-I, 15 January 1946. (NAB)

The Calcutta Gazette, Part-I, 26 March 1946. (NAB)

The Dacca Gazette, September-December 1947. (NAB)

The Dacca Gazette, January-December 1948. (NAB)

The Dacca Gazette, June 1961. (NAB)

The Dacca Gazette, 1963. (NAB)

The Dacca Gazette, January-May 1965. (NAB)

The Dacca Gazette, July-September 1968. (NAB)

The Dacca Review, 1911-12, 1916-17, 1918, 1921. (DURS)

The Dawn 1955-1969. (NAB)

The Gazette of Pakistan, November-December 1947 to January-December 1948. (NAB)

The Pakistan Observer 1959-1971. (NAB)

The Statesman 1957-68. (DUL)

গ. বিভিন্ন ম্যাগাজিন

Alumni Directory: Dhaka Medical College, Dhaka Medical College Alumni Trust, Dhaka, 2002. (Dhaka Medical College Library)

DMC Day Celebration, 2007, 10th July, Dhaka Medical College Alumni Trust, Dhaka, 2007. (Dhaka Medical College Library)

বার্ষিকী ২০০৬: ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যালামনি ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০০৬। (ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি)

৬৩তম *প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী: পুর্নমিলনী’* ০৯, ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যালামনি ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০০৯। (ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি)

শ্রদ্ধাঞ্জলি: অধ্যাপক ডা. জোহরা বেগম কাজী’র ২য় মৃত্যুবার্ষিকী, জোহরা বেগম কাজী পরিষদ, ঢাকা, ২০০৯। (ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি)

স্মরণিকা: ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৬৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস, ঢাকা, ১০ জুলাই ২০১০। (ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি)

আমার K : ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৬৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস, ১০ জুলাই ২০১২, ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যালামনি ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০১২। (ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি)

৬৯তম *ডিএমসি দিবস*, ২০১৪, ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যালামনি ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০১৪। (ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি)

৭১ *ডিএমসি দিবস*, ২০১৬, ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যালামনি ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০১৬। (ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি)

৭২ *ডিএমসি দিবস*, ২০১৭ ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যালামনি ট্রাস্ট, ঢাকা ২০১৭। (ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি)

৭৩তম *ডিএমসি দিবস*, ২০১৮ ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যালামনি ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০১৮। (ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি)

৩. ইংরেজি গ্রন্থ

Ahmed, Kamal Uddin, *Intellectuals and the Emergence of Bangladesh* 1947-1971, University Grants Commission, Bangladesh 1982. (DUL)

Alam, Md. Jahangir, *Traditional Medicine in Bangladesh*, Asiatic Society of Bangladesh, 2007. (ASBL)

Archer, Charles, *Introductory Lecture Addressed to the Students of Calcutta Medical College: Describing the Importance of the Medical Profession*, Calcutta, 1859, (National Library, Alipore, Calcutta, India)

Arnold, David, *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth - Century* India, University of California Press, 1993.

------, *The New Cambridge History of India, Science, Technology and Medicine in Colonial India*, Part. III, Vol. 5, Cambridge University Press, 2004.

-------, *Imperial Medicine and Indigenous Society*, Manchester University Press, 1988.

Ahmed, Sharif Uddin (Edit.), *Dacca, Past, Present and Future*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2009.

--------, *Dacca-A Study in Urban History and Development*, 1840-1885, Routledge, 2018.

Bala, Poonam, *Imperialism and Medicine in Bengal: A Socio-Historical Perspective*, Sage, New Delhi, 1991. (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata)

Benlley, Chas.A., *Malaria and Agriculture in Bengal: How to Reduce Malaria in Bengal by irrigation*, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1925. (NAB)

Boserup, Ester, *Women's Role in Economic Development*, George Allen and Unwin Ltd, London, 1971. (IERL)

Bose, Dr. Debasis, Nath, Dr. Sankar Kumar, Das, Dr. Jayanta K. (ed), *175 Years of Medical College Bengal, Medical College* Ex-Students' Association, Kolkata, 2009.

Brouwer, Ruth Compton, *New Women for God: Canadian Presbyterian Women and India Missions* 1876-1914, University of Toronto Press, Canada, 1990

Chatterjee, Srilata, *Western Medicine and Colonial Society: Hospitals of Calcutta c. 1757-1860*, Primus Books, Delhi, 2017

Chaudhuri, Tapan Ray, *The Memoirs of Dr. Haimabati Sen from Child Widow to Lady Doctors,* New Delhi, 2000

Chevers, Norman, *A Manual Medical Jurisprudence*, Bengal Military Orphan Press, Calcutta, 1856, (National Library, Alipore, Calcutta, India)

Clark, George Sir, *A History of the College of Physicians,* Clarendon Press, Oxford, 1964

Clendening, Logan, M.D., *Source Book of Medical History,* Dover Publications, INC New York, 1942 (National Library, Alipore, Calcutta, India)

Cox, H.W.V, *Medico-Legal Court Companion: A Complete Vade Mecum for magistrates, Police officers, Students and Members of Legal and Medical Profession,* Easter Law House, Calcutta, 1927, (National Library, Alipore, Calcutta, India)

Cockerharn, William C., *Medical Sociology,* Prentice Hall, New Jersy, 2009. (DUL)

Crawford, Lt. Colonel D.G, *A History of the Indian Medical Service* 1600-1913, Vol. II, W. Thacker & Co., Calcutta, and Simla Thacker Spink & Co. 1914, (National Library, Alipore, Calcutta, India)

Dani, A.H., *Dacca-A Record of its Changing Fortunes*, Dacca, 1962. (DUL)

Foucault, Michel, *Power and knowledge: Selected Interviews and Other Writings*, 1972-1977, Pantheon Books, New York, 1980

Foucault, Michel, *The Birth of the Clinic: An Archaeology of medical perception* (Translated by A.M Sheidan), Rutledge, London, 2003.

Goodeve, H.H., *General Introductory Lecture addressed to the Students of the Calcutta Medical College,* Calcutta, 1848, (National Library, Alipore, Calcutta, India)

Hamilton, Capt. Alexander, *A New Account of the East Indies, Being the Observations and Remarks* 1688-1723, Vol. II, Kings Printing House, Edinburgh MDCCXXVII (1727) (eservice.nlb.gov.sg)

Harrison, Mark, *Public health in British India: Anglo Indian preventive medicine 1859-1914,* Cambridge University Press, 1994. (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata)

Harrison, Mark, Margaret Jones and Helen Sweet (ed), *From Western Medicine to Global Medicine: The Hospital Beyond the West*, Orient Blackswan, New Delhi, 2009 (National Library, Alipore, Calcutta, India) (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata)

--------, *Medicine in an Age of Commerce and Empire: Britain and its Tropical Colonies,* Oxford University Press, 2010.

--------, *Climates & Constitutions: Health, Race, Environment and British Imperialism in India*, 1600-1850, Oxford University Press, 1999, (National Library, Alipore, Calcutta, India).

Hati, Dr. Amiya Kumar, *History of Science in India, Medicine and Pharmacology*, Vol.II, NASI and RMIC, Calcatta, 2014.

Headrick, Daniel R., *The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century*, Oxford University Press, 1981, (National Library, Alipore, Calcutta, India)

Hossain, M.Z (edit) *Village Doctor's Camp,* East Pakistan Academe for Village Development, Comilla, (DUL)

Kramarae, Cheris, and Sperder, Dale (General Editors), *Routledge International Encyclopedia of Women,* Global women's Issues and Knowledge, Vol. 3, Routledge, New York, London, 2003. (BOUL)

Kumar, Deepak, *Science and the Raj*, New Delhi, Oxford University Press, New Delhi, 1995. (National Library, Alipore, Kolkata)

Literary Research Department, *Theories and Philosophies of Medicine*, Institute of History of Medicine and Medical Research, Delhi.

Lorson, M., The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis, University of California Press, Berkeley, 1977. (Amazan.com)

Lushington, Charles, *The History, Design and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions,* The Hindostanee Press, 1824. (Google Books)

Mackinnon Kenneth, *A Treatise on the Public Health, Climate, Hygiene and Prevailing Diseases of Bengal and the North West Province*, Cawnpore Press, Cawnpore, 1848

Martin, James Ranald, *Notes on the Medical Topography of Calcatta*, Bengal Military Orphan Press, Calcatta, 1837.

Maykouich, Minako K., *Medical Sociology,* Alfred Publishing Co. California, 1980 (DUL)

Mcconnel, J.F.P, *Catalogue of the pathology museum: Medical College*, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1910

Menon, IKK, *The Story of Ayurveds,* Publication Division, Ministry of Information and Broad Casting, Government of India, 2002. (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata)

Moon, Grahan Rosemary, Gillespie, *Society and Health: An Introduction to Social Science for Health Professionals,* New York, Routledge, 1995. (BOUL)

Mukherjii, Projit Bihari, *Nationalizing the Body: The Medical Market, Print and Daktari Medicine*, Anthem Press, London, 2009, (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Norman, Chevers, *A manual Medical Jurisprudence for Bengal and North-Western Province*, Bengal Military Orphan Press, 1856. (NAB)

Palit, Prof. Chittabrata, Dhar, Dr. Aparajita (ed.), *Medical History of India*: *Discipline, Disease, Death,* Kunal Books, New Delhi, India, 2019.

Park, K, *Preventive and Social Medicine*, 17 Edition M/S Banarsi Bhanot, 2003.

Pati, Biswamoy and Mark Harrison (ed.), *The Social History of Health and Medicine in Colonial India*, Routledge Studies in South Asian History, London and New York, 2009.

--------, *Health, Medicine and Empire: Perspectives on Colonial India*, Orient Longman, 2001, (National Library, Alipore, Calcutta, India)

Paton, William, *Alexander Duff, Pioneer of Missionary Education*, Student Christian Movement, London, 1923 (Missiology.org.uk)

Rahim, M.A., *The History of The University of Dacca,* Dhaka, 1980. (ASBL)

Ramana, Mridula, *Western Medicine and Public Health in Colonial Bombay*, 1845-1895, Orient Longman, New Delhi, 2002, ((General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Ray, Rames Chandra, L.M.S., *Outlines of Medical Jurisprudence with Special Treatment of Toxicology and Insanity*, Hare pharmacy, Calcatta, 1929.

Ray, Kabita, *History of Public Health: Colonial Bangal*, 1921-1947, K.P. Bagchi, Calcatta, 1998, ((General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Sherp, H, Bureau of Educations, India- Selections from Educational Records 1781-1839, Part-1, Superintendent Government Printing, Calcutta, India, 1920

Schendel, William Van, *A History of Bangladesh*, Cambridge University Press, New Delhi, 2009.

Sharma, Madhuri, *Indigenous and Western Medicine in Colonial India*, Foundation Books, New Delhi, 2012, (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Taylor, James, *A Sketch of The Topography and Statistics of Dacca*, Vol. I-II, Military Orphan Press, Calcutta, 1840. (DUL)

Tuckett, David, *An Introduction to Medical Sociology*, Tavistock Publications, Routledge, 2001. (DUL)

Taifoor, Syed Muhammed, *Glimpses of old Dhaka*, The pioneer Printing Press Ltd, Dhaka, 1956.

Twining, William, *Clinical Illustration of the more important Diseases of Bengal with the Result an Inquiry into their Pathology and Treatment*, The Baptist Mission Press, W. Thacker and Co. Calcutta, 1832, (Google Books)

Vidyanath, Dr. R & Nishterwar, Dr. K, *A Hand Book of History of Ayurveda*, Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varansi, 2004. (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Viswanathan, Gauri, *Masks of Conquest: Literary Study and British in India*, Cambridge University Press, New York, 2015

Wise, J., *Notes on the Races, Caste and Trades of Eastern Bengal*, London, 1883. (DUL)

Zastoupil, Lynn and Moir, Martin, The *Great Indian Education Debate: Documents Relating to the Orientalist- Anglicist Controversy*, Routledge, 2000. (Google Books)

৪. বাংলা গ্রন্থ

আউয়াল, ইফতিখার-উল (সম্পাদিত), *ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী : বিবর্তন ও সম্ভাবনা*, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা, ২০০৬।

আকবর, শ্যামলী, আখতার, সৈয়দা তাহমিনা, জাহান আরা, *নারী শিক্ষা : উদ্ভব ও বিকাশ*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৯৮।

আমিন, সোনিয়া নিশাত (সম্পাদিত), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩।

ঐ, *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন ১৮৭৬-১৯৩৯*, (অনুবাদ: পাপড়ীন নাহার) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২।

আফজালুন্নেসা, এম. আর. মাহবুব (সম্পাদিত), *প্রথম শহীদ মিনারে স্থপতি ডা: বদরুল আলম স্মারকগ্রন্থ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩।

আলী, সারওয়ার, *পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ*, প্রথমা, ঢাকা, ২০১০।

আহমদ, কর্ণেল (অব) এস.ডি., *ত্রিকাল ত্রিগুন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন, *মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল : ইতিহাস ও ঐতিহ্য* ১৮৫৮-১৯৪৭, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৭।

ঐ, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগরজীবন* ১৮৪০-১৯২১, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৬।

ঐ, *ঢাকা কলেজ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০২।

আহমদ, আবুসযোহা নূর, *উনিশ শতকের ঢাকার সমাজজীবন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৫।

আহমেদ, মনোয়ারা, *ঢাকার পুরোনা কথা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮।

আহাদ, অলি, *জাতীয় রাজনীতি*, ১৯৪৫-৭৫, ৪র্থ সংকলন, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি।

আলম, মোঃ ফখরুল, *আমাদের চলচ্চিত্র*, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, তথ্য মন্ত্রণালয়, ২০১১।

ইমাম, জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি*, সন্ধানী প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৬।

ইসলাম, রফিকুল, *ঢাকার কথা* ১৬১০-১৯৪৭, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ২০০১।

ইসলাম, সিরাজুল, *বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৭০৪-১৯৭১), *রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭।

কবির, তসলিমা, এম. আর, মাহবুব, *শল্যচিকিৎসক ও ভাষা সৈনিক : অধ্যাপক এম. কবির উদ্দিন আহমেদ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩।

করিম, সরদার ফজলুর ও সেনগুপ্ত, কিরণ শঙ্কর, *চল্লিশ দশকের ঢাকা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১।

করিম, সরদার ফজলুর, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩।

কাজল, প্রকৌশলী ইফতিখার, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ চিকিৎসক স্মৃতিকথা*, প্রথম খণ্ড, রক্তঋণ, ঢাকা, ১৯৯২।

কামাল, মেসবাহ (সম্পাদনা) *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: বামপন্থীদের ভূমিকা, সম্পর্ক*, ২০০০।

গুপ্ত, নির্মল, *ঢাকার কথা*, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৬০।

ঘোষ, বিনয়, *শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ*, অরুনা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০।

ঘোষ, বিনয়, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* ১৮০০-১৯০০, শেষ পঞ্চম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০০৭।

ঘোষ, বিনয়, *বাংলার নবজাগৃতি*, কলকাতা।

ঘোষ, বিনয় (সম্পাদিত), *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রচনা সংকলন ১৮৪০-১৯০৫, কলকাতা, ১৯৬৩।*

নাথ, ডা. শঙ্করকুমার, *কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা* ২০১৯।

চট্টোপাধ্যায়, কানাইলাল (সম্পাদিত), *সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র, সঞ্জীবনী,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯।

টেলর, জেমস, *কোম্পানি আমলে ঢাকা,* (মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৭৮।

পাল, ডা. নীরদ বরণ, *উনবিংশ ও বিংশ শতকে বঙ্গদেশে আয়ুর্বেদ চর্চা,* সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১১।

পাহাড়ী, সুব্রত, *আধুনিক বাংলায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা, রচয়িতা,* কলকাতা, ২০১৫।

প্যাটেল, অলকনন্দা, *পৃথিবীর পথে হেঁটে, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স,* ঢাকা ২০১৭।

পাত্র, ড. রবীন্দ্রনাথ, *প্রাচীন ভারতের বারজন চিকিৎসাসাধক,* দেশ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৬।

ফিরোজ, ড. এম. এ হান্নান (সম্পাদিত), *ঢাকার ৪০০ বছর,* ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯।

বন্দোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, *আরোগ্য নিকেতন,* করুনা প্রকাশণী, কলকাতা সেপ্টম্বর ২০১৯।

বন্দোপাধ্যায়, বজেন্দ্রনাথ, *বাংলা সাময়িকপত্র,* কলকাতা, ১৯৩৮।

বসু, স্বপন, *উনিশ শতকে বাংলায় নবচেতনা,* সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১১।

বসু বুদ্ধদেব, *দশটি উপন্যাস,* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪।

বেগম, মালেকা, *নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক,* অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০২।

বেগম, মালেকা ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী, তিনশত বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস,* ইউনিভার্সিটি প্রেস এন্ড লিমিটেড, ঢাকা।

বেগম, নাছিমা, *চিত্রশিল্পী হামিদুর রহমান,* লাবনী, ঢাকা।

ভূঁইয়া, আবুল হোসাইন আহমেদ, *সমাজচিন্তা,* একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৭।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *জীবনের স্মৃতিদ্বীপে,* জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৮।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (১৯০৫-১৯৪৭), *মুক্তি-সংগ্রাম,* জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৫।

মজিদ, মোহাম্মদ আবদুল, *স্বাস্থ্যসেবায় ষাট বছর বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি,* বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি, ঢাকা, ২০১৬।

মালিক, আব্দুল, *জাতীয় অধ্যাপক বিগ্রেডিয়ার (অব), জীবনের কিছু কথা,* সাইন্টিফিক মিডিয়া সার্ভিসেস, ঢাকা, ২০০৪।

মামুন, মুনতাসীর, *ঢাকার স্মৃতি,* ১৪, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৪।

ঐ, ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, ১ম খণ্ড, অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৮।

ঐ, ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী, ২য় খণ্ড, অনন্যা প্রকাশনী, ২০০৯।

ঐ, উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র, ১৮৪৭-১৯০৫, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮।

ঐ, ঢাকা সমগ্র-১, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫।

ঐ, ঢাকা সমগ্র-২, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬।

ঐ, *ঢাকা সমগ্র-৩*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭।

ঐ, *ঢাকা সমগ্র-৪*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

ঐ, *ঢাকা সমগ্র-৫*, অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭।

মিত্র, শান্তনু, *কলিকাতার কল-কথা*, দ্বেজ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ২০১৯।

মুকুল, এম.আর. আখতার, *বায়ান্নোর জবানবন্দী*, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৭।

মুরশিদ, গোলাম, *রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩।

মোহসীন, কে. এম., শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৪, সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭।

রফিক, আহমেদ, *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ* ১৯৪৭-১৯৭১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৩।

রহমান, হাকিম হাবিবুর, *ঢাকা পাচাশ বারাস পাহলে*, ঢাকা ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৫।

রহমান, শামসুর, *স্মৃতির শহর, ঢাকা*, ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা, ১৯৯০।

রহমান, হাকিম হাবিবুর, *আসুদেগানে, ঢাকা*, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, উর্দু সংস্করণ (১৯৪৬), বাংলা সংস্করণ, ১৯৯০।

রহমান বদিউর (সম্পাদিত), সত্যেন সেন রচনাবলী, ৩য় খণ্ড ও ৮ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪।

রহমান, এস.এম. লুৎফর, *বাংলাদেশী লোক-চিকিৎসা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০০।

রহিম, এম. এ, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২।

রহিম, এম. এ, *বাংলার মুসলমানের ইতিহাস*, ১৮৫৭-১৯৪৭, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০২।

রায়, যোতিন্দ্রনাথ ও কেদারনাথ, মজুমদার, *বৃহত্তর ঢাকা জেলার বিবরণ*, (দু'খণ্ড একত্রে), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।

লিটু, অধ্যাপক ডাঃ মনিলাল আইচ, এম. আর. মাহবুব, *ঢাকা মেডিকেল কলেজ : সেবা সংগ্রাম ঐতিহ্য, গৌরব* প্রকাশন, ২০১৮।

শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ২০১৬।

শূর, চিরঞ্জীব, *মিশেল ফুকো*, আলোচনা চক্র, কলকাতা, ২০১৬।

সামাদ, প্রফেসর ডাঃ এম. এ (সম্পাদিত), *চিকিৎসা পেশায় টাঙ্গাইলের স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা*, ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল, ২০১৬।

সেন, সত্যেন, *শহরের ইতিকথা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪।

হক, মাহমুদ শামসুল, *হাজার বছরের বাঙালি নারী*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০০।

হান্নান, ড. মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৯৯৯।

হাসান, শফিক, *চিকিৎসা সেবায় শাহলা খাতুন*, উৎস প্রকাশন, ঢঅকা, ২০১০।

হায়দার, ডা. সাঈদ, *পিছু ফিরে দেখা*, প্রকাশিকা শরিফা হায়দার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

হায়দার, ডা. সাঈদ, *লোকসমাজ চিকিৎসাবিজ্ঞান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫।*

হোসেন, নাজির, *কিংবদন্তি ঢাকা*, থ্রি-স্টার কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৫।

হোসেন, সেলিনা, মাসুদুজ্জামান, নারীর ক্ষমতায়নঃ রাজনীতি ও আন্দোলন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০।

৫. বিভিন্ন জার্নাল ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ

Ameen, Mahbubul, 'Medical Education in East Pakistan' *The Pakistan Observer,* 17 February 1958 (বাংলা একাডেমি)

Arnold, David, 'Medical Priorities and Practice in Nineteenth Century British Indian,' *South Asia Research,* Vol. 5, No. 2, November, 1985 (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Begley, Philip and Shally Sheard, 'Mckinsey and the Tripartite Monster': The Role of Management Consultants in the 1974 NHS (National Health Service) Reorganization,' *Cambridge Journal,* Cambridge University Press, 9 September, 2019 (Cambridge.org) pp. 390-410

Bhattacharya, Jayanta, 'The first dissection controversy: Introduction to anatomical education in Bengal and British India' *Current Science Association,* Vol. 101, No. 910, November 2011, pp 1227-1232 (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

--------, 'The Knowledge of Anatomy and Health in Ayurveda and Modern Medicine: Colonial Confrontation and Its Outcome', *ea,* Vol.1, No.1, August 2009, pp, 1-51 (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Bhadra, Mita, 'Indian Women in Medicine: An Enquiry Since 1880', *Indian Anthropologist,* Vol. 41, No. 1, January-June 2011, pp 17-43, (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Burton Antoniette, 'Contesting the Zenana: The Mission to Make "Lady Doctors for India" 1874-1885, *Journal of British Studies,* Vol. 35, No. 3, July 1996, pp. 368-397. (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Chatterjee, Indu Bhusan, 'Serendipity and Seminal Discoveries in Medical Science' *Journal of the Asiatic Society,* Vol.LV, Kolkata 2014. (Asiatic Society of Bangladesh Library)

Chowdhury, R.N. and Chowdhury, R.N. 'A Glimpse of Jaipur Medical College: A Century Ago', *Proceedings of the Indian History Congress,* Vol. 14, 1951, pp. 363-366. (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Fulton, John F., History of Medical Education, *British Medical Journal,* Aug. 29, 1953, p. 457-461. (NAB)

Gorman, Mel, 'Introduction of Western Science into Colonial India : Role of the Calcutta Medical College', Vol. 132, No. 3, *Proceedings of the American Philosophical Society,* 1988, pp. 276-298. (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Guha, Ambalika, 'The 'Masculine' Female: The Rise of Women Doctors in Colonial India, c. 1870-1940', *Social Scientist,* Vol. 44, No. 5/6, May-June, 2016, pp. 49-64 (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Harrison, Mark, Tropical medicine in nineteenth - century India, *The British Journal for the History of Science,* Vol. 25, 1992, pp. 299-318, (Cambridge.org)

Izgi, Mahmut Cihat, ‘A Cultural Project of Control: The Foudation of Calcutta Madrassa & the Benares Sanskrit College’ *The Journal of Social and Cultural Studies,* Vol. I, 2015.

Islam, M.M., 'Our Medical Education' *The Pakistan Observer*, 14 August 1958, P-II, XV.

Jeffery, Roger, ‘Migration of Doctors from India’ *Economic and Political Weekly*, Vol. II, No. 13, 27 March 1976, pp. 502-507 (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

------, ‘Recognizing India’s Doctors: The Institutionalization of Medical Dependency, 1918-39’, *Modern Asian Studies*, Vol. 13, No. 2, 1979, pp. 301-326, (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Lawrie, Jean E and Muriel L. Newhouse, ‘Working Women Doctors’, *The British Medical Journal*, Vol. I, No. 5433, 20 February 1965, p. 524. (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Karlekar, Malvikam, ‘Anatomy of a Change: Early Women Doctors’, *India International Centre Quarterly*, Vol. 39, No ¾, Winter 2012-Spring 2013, pp. 95-106, (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Khan, M. Siddiq, 'A Chapter in the Muslim Struggle for freedom: Establishment of Dacca University' *The Dacca University Studies*, Vol. XVI, Part : A, June 1968, University of Dacca, 1968 (Rare Section, DUL)

Khan, A.Q., 'Need for Reconstruction of Health Service', *The Bangladesh Observer*, 4 January 1972, p. 2.

Mortaza, Md., 'Medical Education in Pakistan', *The Pakistan Observer*, 12 December 1961, p. 4.

Mukherjee, Susmita, Women in the Medical Profession: In USA, *Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. 76, 2015, pp. 711-720, (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Mukherjee, Sujata, ‘Women and Medicine in Colonial India: A Case Study of Three Women Doctors’, *Proceedings of the Indian History Congress*, Vol. 60, 2005-06, pp. 1183-1193. (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Panja Ranjit, Arati Ghosh, Calcutta Medical College, *The National Medical Journal of India*, Vol. 2, No. 5, p. 244-248. (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Rahman, Mujibur, 'Medical Education in East Pakistan', *The Pakistan Observer'* 13, 16 August, 1959, p. 2. (বাংলা একাডেমি)

Sanyal, Sneha, ‘Emergence of Nursing as a Profession in Nineteenth - Century Bengal’, *Social Scientist,* Vol. 45, No. ¾, March-April 2017, pp. 69-86. (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Sehrawat, Samiksh, ‘Feminising Empire: The Association of Medical Women in India and the Campaign to Found a Women’s Medical Service’, *Social Scientist*, Vol. 41, No 5/6 May-June 2013, pp 65-81, (General Library, RKMIC, Golpark, Kolkata).

Shamshad and B.A Dabla, ‘Sociological Perspective on Kashmiri Women in Medical Profession’, *J.K. Practitioner,* Vol.14, No. 2, 2007, pp. 119-120.

আলী, এস.এম. ওয়াজেদ, ‘কলেরা ও তার প্রতিরোধ’ ‘*দৈনিক আজাদ*’ ২৭ জুন ১৯৬৪, পৃ. ৬ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

ইউনুস, মোহাম্মদ, ‘বসন্তের প্রকোপ ও তার প্রতিকার’, *দৈনিক পাকিস্তান* ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮, পৃ. ৪ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

মামুন, মুনতাসীর, ‘শহর ঢাকার বিকাশ ধারা’, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, নবম সংখ্যা, জুন ১৯৭৯ (রেয়ার সেকশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি)

অভিসন্দর্ভ

১. Supriya Guha, ‘A History of the Medicalization of Childbirth in Bengal in the late Nineteenth and Early Twentieth Centuries, *PhD Thesis*, Department of History, University of Calcutta, 1996. (Google)

৬. সাক্ষাৎকার

অধ্যাপক ডা. মীর্জা মাজহারুল ইসলাম, সার্জারি বিশেষজ্ঞ, বয়সঃ ৯৩ (১৯২৭-২০২০), ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষের ১ম ব্যাচের ছাত্র, প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, একুশে পদক প্রাপ্ত, তারিখঃ ১০/৯/২০১৮।

অধ্যাপক ডা. শাহলা খাতুন, গাইনোকোলজিস্ট, বয়সঃ ৭৮ (১৯৩৯) ডিএমসি’র ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী, জাতীয় অধ্যাপক, চেয়ারম্যান, গ্রীন লাইফ কলেজ এন্ড হাসপাতাল, তারিখঃ ৩/৮/২০১৮, ২২/০২/২০২০

অধ্যাপক ডা. নাজমুন নাহার, শিশু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, বয়সঃ ৭১ (১৯৪৭), ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী, ডাইরেক্টর জেনারেল (২০০৪-২০১৮) বারডেম, তারিখঃ ২/৭/২০১৮।

ডা. সারওয়ার আলী, বয়সঃ ৭৭ (১৯৪৩), ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৫৯-৬০ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র, চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট, বারডেম হাসপাতাল, তারিখঃ ৭/২/২০১৯।

অধ্যাপক, ডাক্তার আব্দুল হানিফ (টাবলু), ১৯৮২-৮৩, শিক্ষাবর্ষের ছাত্র, বিভাগঃ পেডিয়াট্রিক সার্জারি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল। তারিখঃ ১০/০৭/২০১৮।

ডা. সাঈদ হায়দার, বয়সঃ ৯৪ (১৯২৫-২০২০), ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, ১৯৪৭ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন, তারিখঃ ০১/১২/২০১৯।

ডা. মাখদুমা নার্গিস, বয়সঃ ৭৫ (১৯৪৫) ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৬২-৬৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী এবং প্রাক্তন এডিশনাল সেক্রেটারি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, তারিখঃ ১৯/১২/২০২০।

ডা. কাজী মিসবাহুন নাহার (তামান্না), বয়সঃ ৭৩ (১৯৪৭), ঢাকা মেডিকেল কলেজের ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষের প্রাক্তন ছাত্রী এবং ১৯৭১ সালে গঠিত মুজিব নগর সরকারের প্রথম মেডিকেল অফিসার, তারিখঃ ২০/১২/২০২০।

ডা. নাজমুন নাহার রেনু, বয়সঃ ৯১ (১৯৩০), অধ্যাপক আফজালুন্নেসা এর স্বামী বদরুল আলম এর চাচাতো বোন, তারিখঃ ১৬/০১/২০২১।

ডা. কুন্তল বিশ্বাস, শিশু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, বয়সঃ ৬৪ (১৯৫৬), রেজিস্ট্রার, কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, তারিখঃ ২০/১২/২০১৯।

ছবি

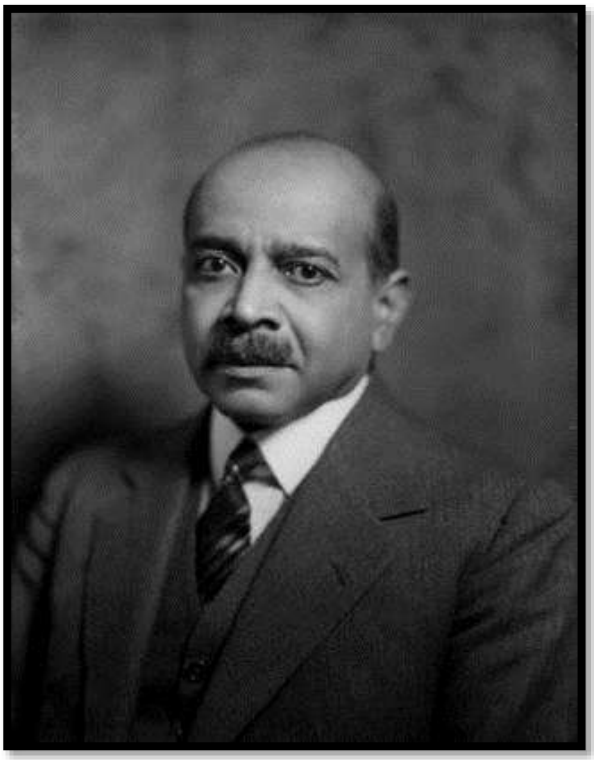

স্যার জোসেফ উইলিয়াম ভোর (১৮৭৮-১৯৬০)

উৎস: Google

প্রথম প্রিন্সিপাল মেজর ডা. ডব্লিউ. জে. ভারজিন (১৯৪৬-৪৭)

উৎস: ঢাকা মেডিকেল কলেজ।

১৯৪৬-৪৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও স্টাফ

উৎস: অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম.আর. মাহবুব, *ঢাকা মেডিকেল কলেজ : সেবা সংগ্রাম ঐতিহ্য*, গৌরব প্রকাশন, ২০১২, পৃ. ৯।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (১৯৪৬-৪৭)

উৎস: *Annual Report of the Dacca Medical College & Hospital for the year* 1946-47.

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (১৯৪৭-৪৮)

উৎসঃ *Annual Report of the Dacca Medical College & Hospital for the year* 1947-48.

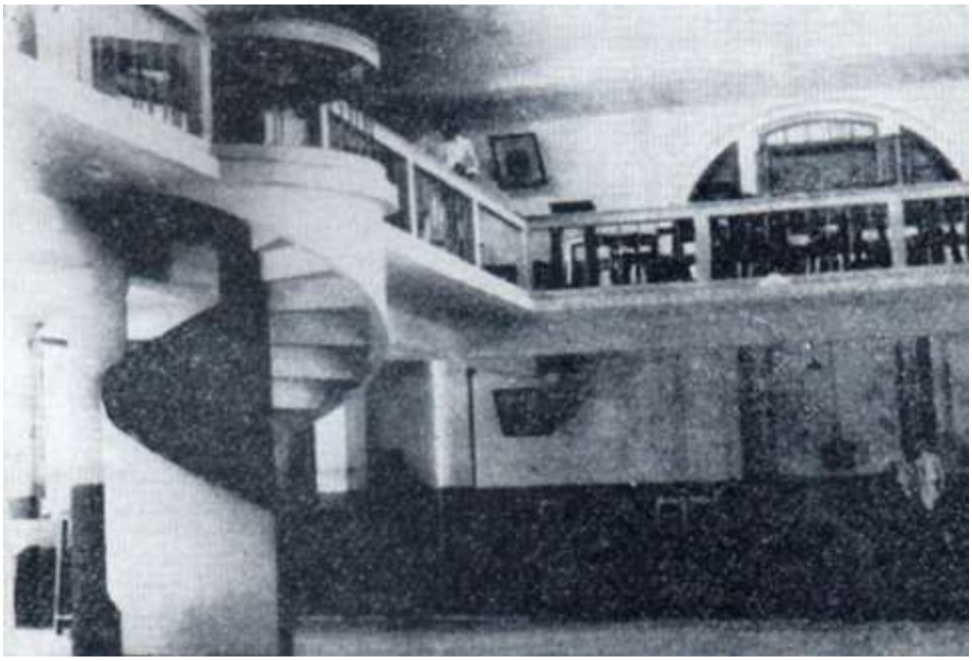

নতুন ডাইসেকশন হল (১৯৪৯-৫০)

Dhaka University Institutional Repository

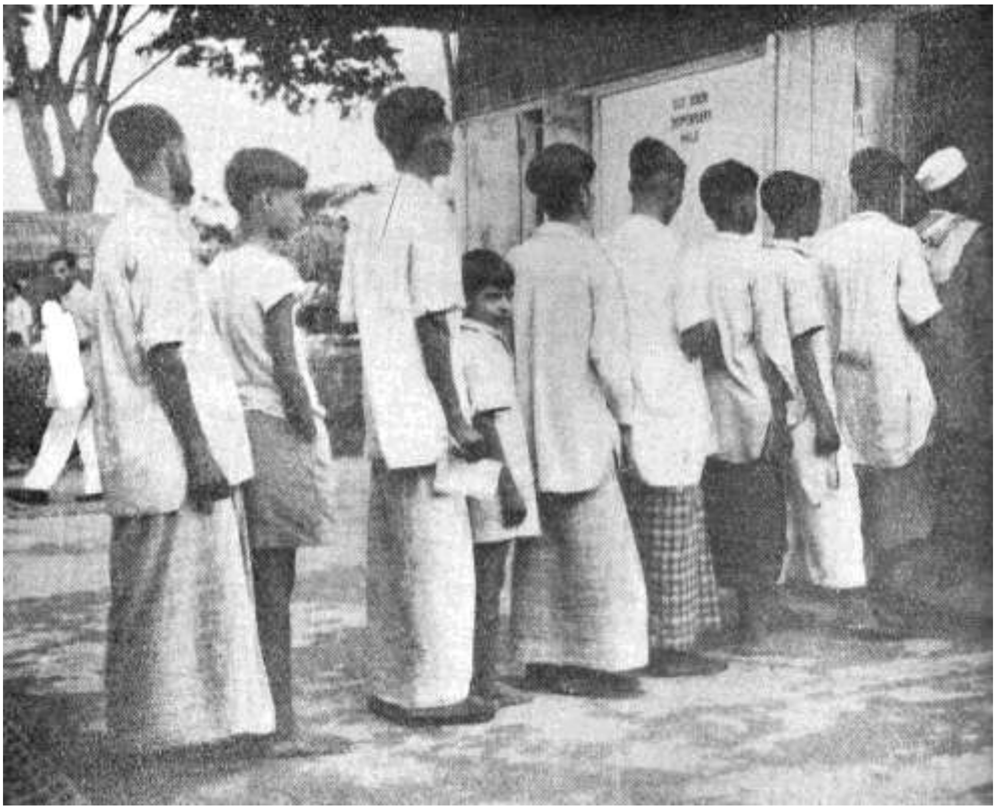

বহির্বিভাগ (১৯৪৯-৫০)

লেবার ওয়ার্ড (১৯৪৯-৫০)

Dhaka University Institutional Repository

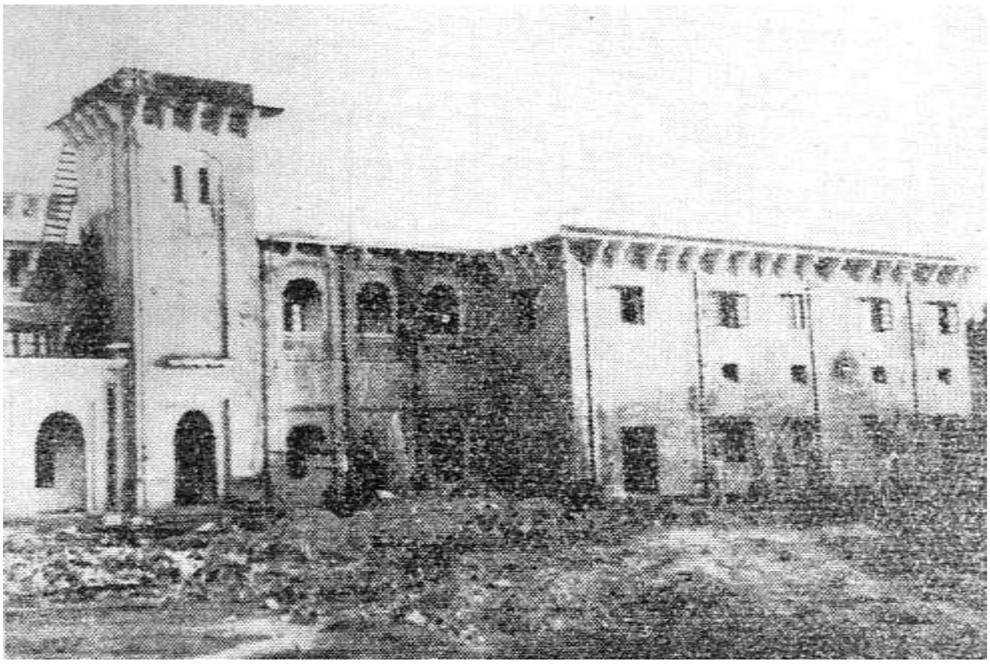

এনাটমি বিভাগ (১৯৪৯-৫০)

উৎস: *Annual Report of the Dacca Medical College & Hospital for the year* 1949-50.

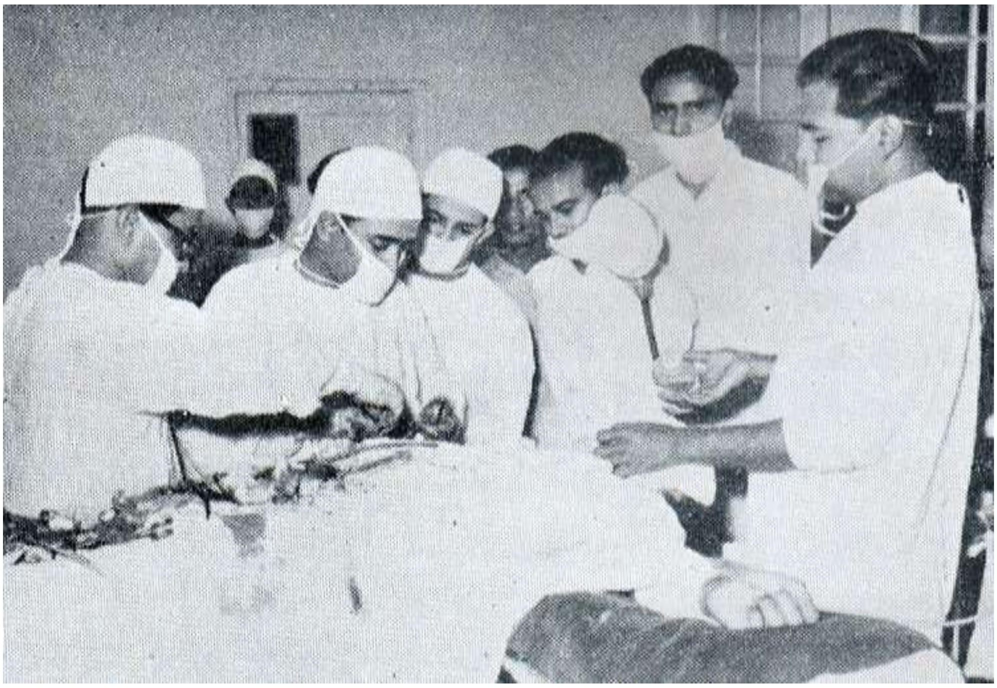

অপারেশন থিয়েটার (১৯৫০-৫১)

Dhaka University Institutional Repository

অর্গানিক কেমিস্ট্রির ব্যবহারিক ক্লাশ (১৯৫০-৫১)

ডেমনস্ট্রেশন ক্লাশ (১৯৫০-৫১)

Dhaka University Institutional Repository

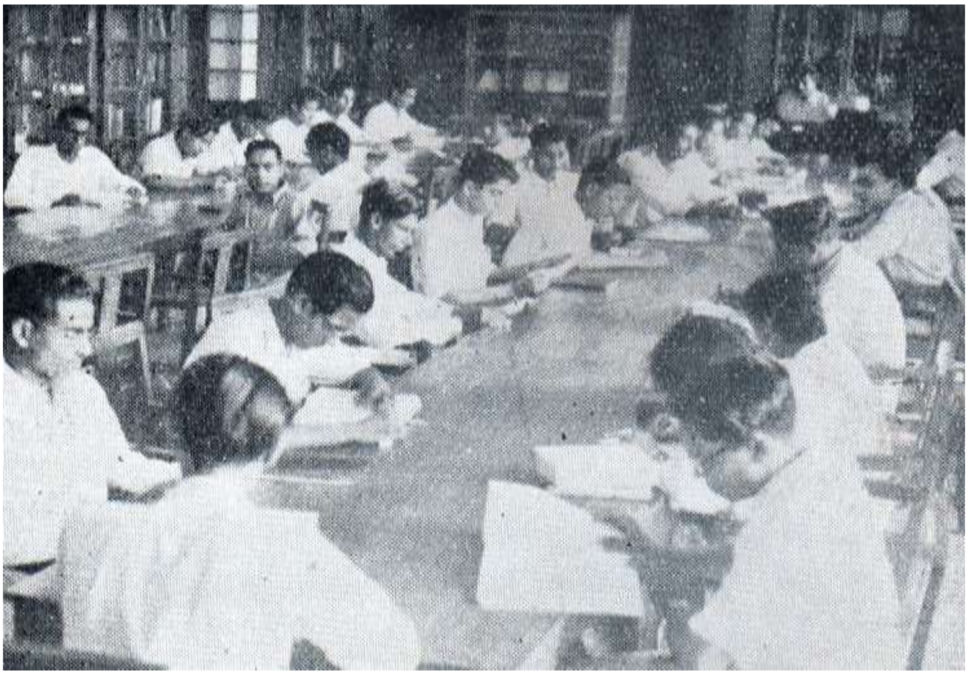

লাইব্রেরি (১৯৫০-৫১)

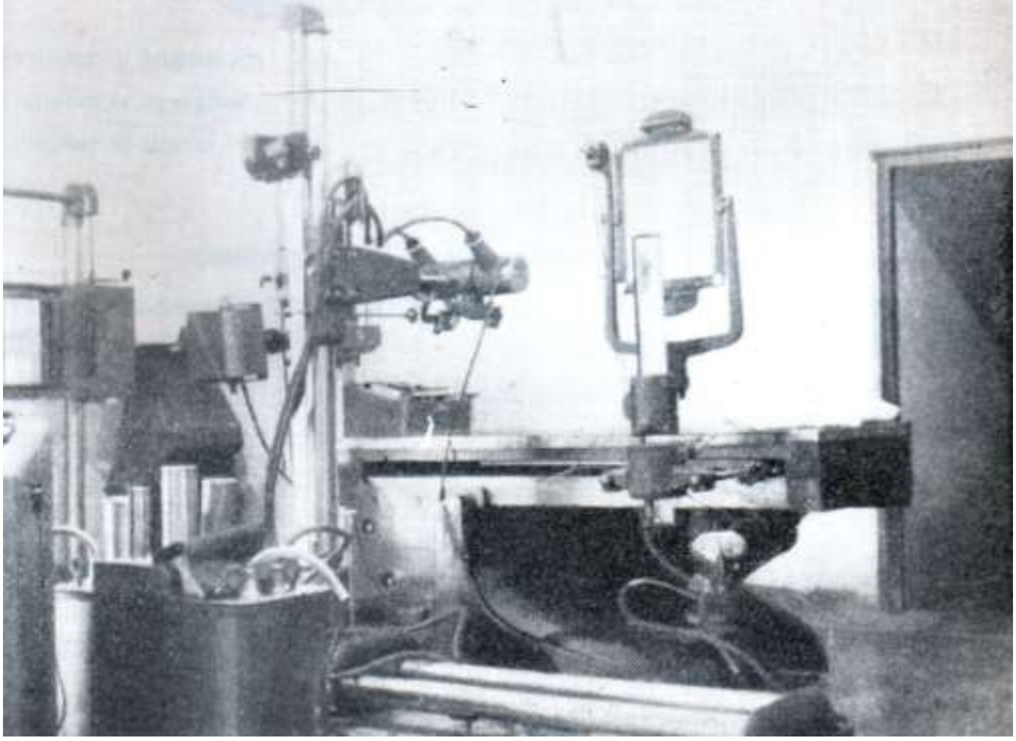

এক্স-রে বিভাগ (১৯৫০-৫১)

১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ অধিগ্রহণ (১৯৫০-৫১)

উৎসঃ *Annual Report of the Dacca Medical College & Hospital for the year* 1950-51.

রোগীর ই.সি.জি. রেকর্ড (১৯৫১-৫২)

Dhaka University Institutional Repository

বি.এম.আর. ল্যাবরেটরি (১৯৫১-৫২)

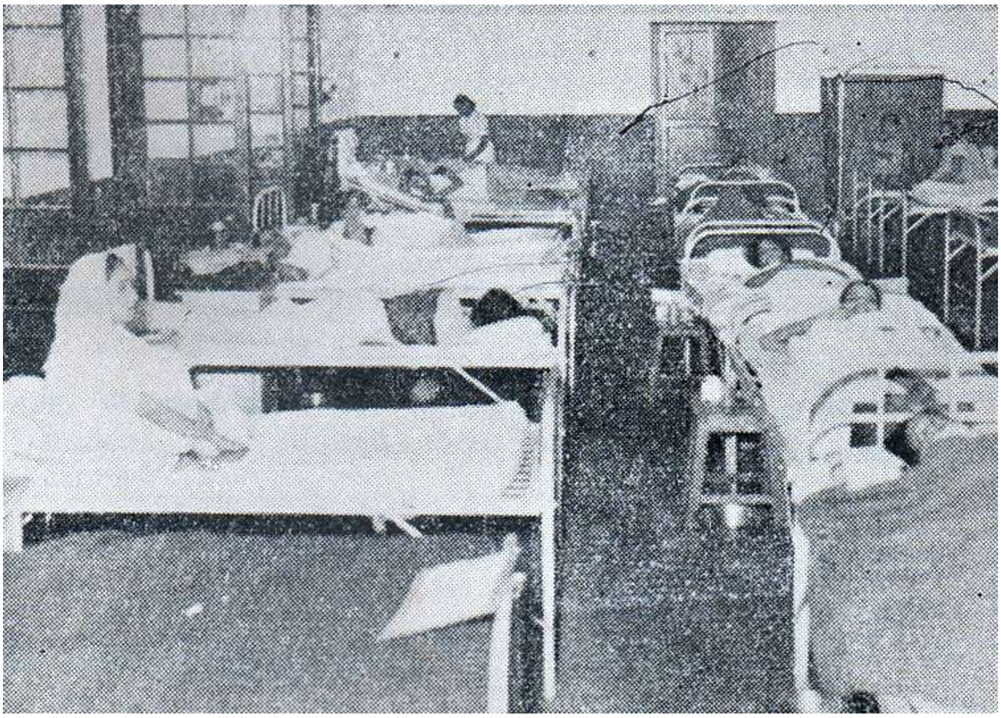

নারী ওয়ার্ড (১৯৫১-৫২)

Dhaka University Institutional Repository

সার্জিক্যাল নারী ওয়ার্ড (১৯৫১-৫২)

প্যাথলজি ল্যাবরেটরি (১৯৫১-৫২)

Dhaka University Institutional Repository

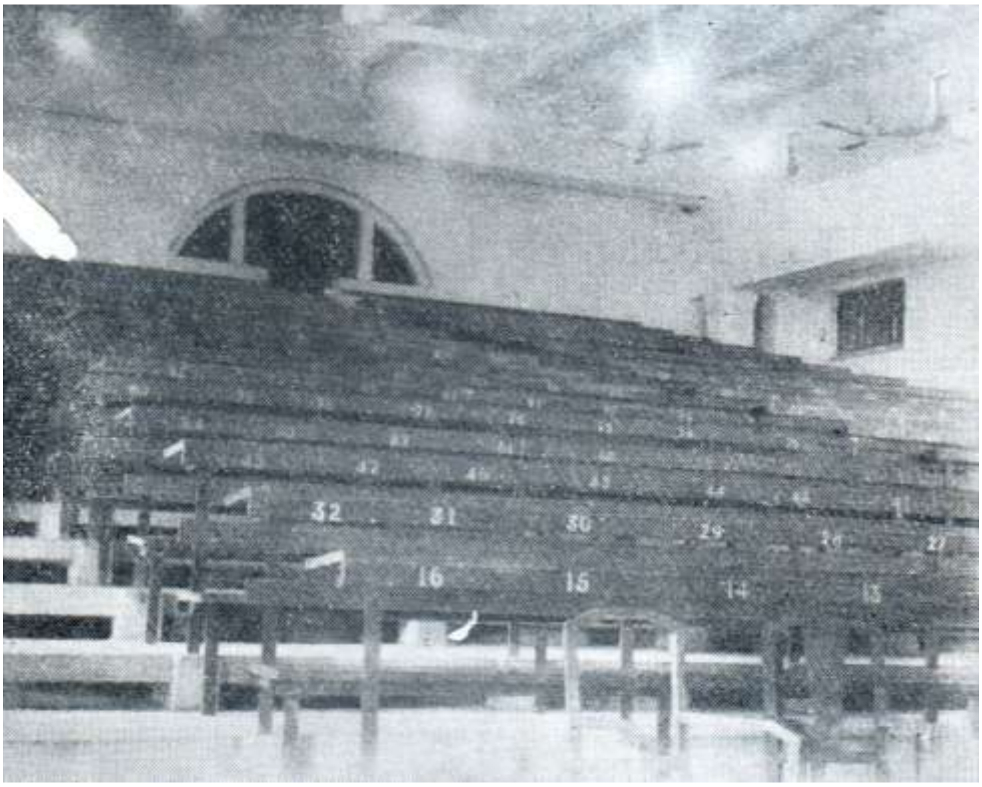

লেকচার থিয়েটার (১৯৫১-৫২)

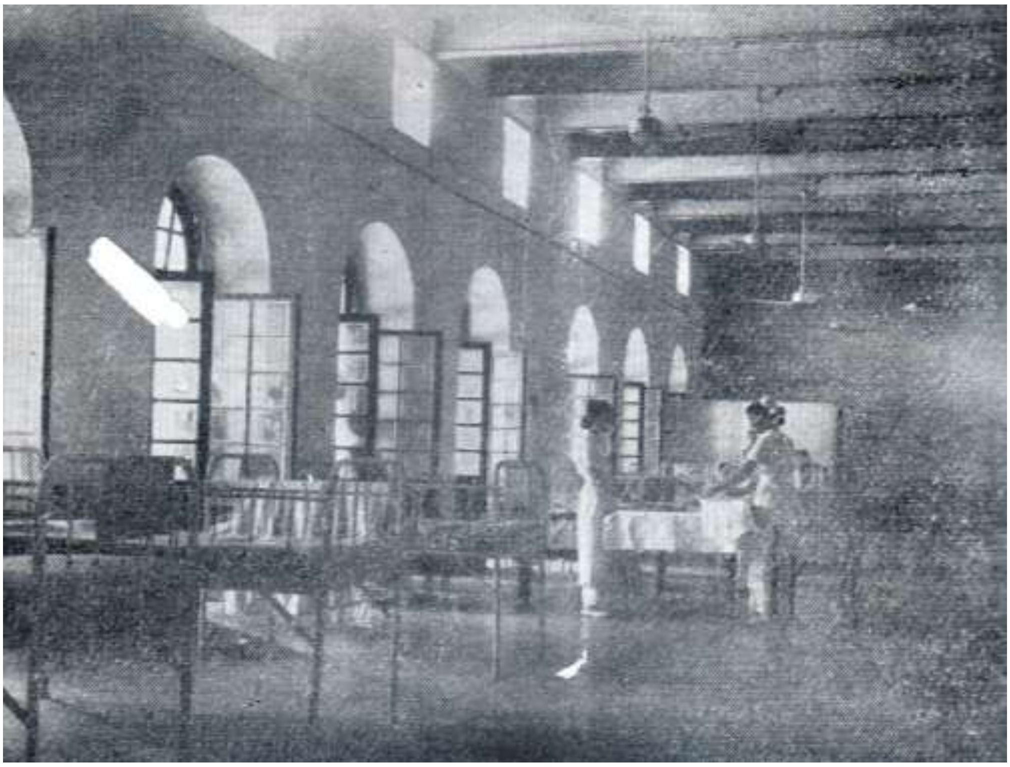

শিশু ওয়ার্ড (১৯৫১-৫২)

Dhaka University Institutional Repository

নতুন কেবিন ওয়ার্ড (১৯৫১-৫২)

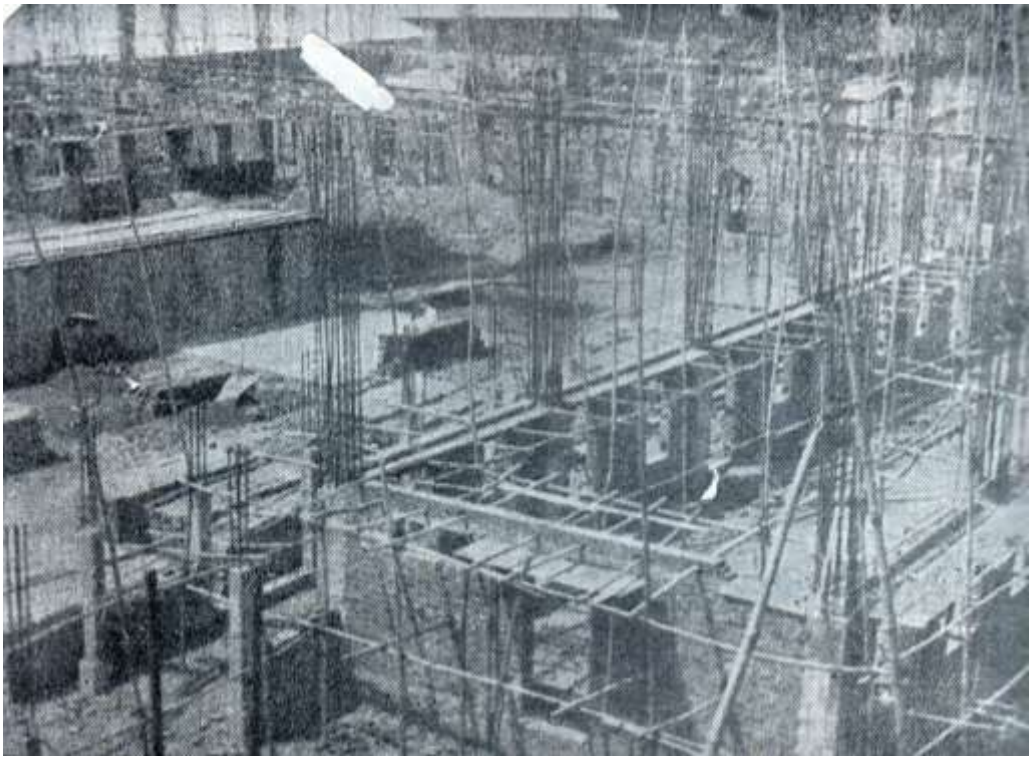

নির্মাণাধীন নতুন কলেজ ভবন (১৯৫১-৫২)

Dhaka University Institutional Repository

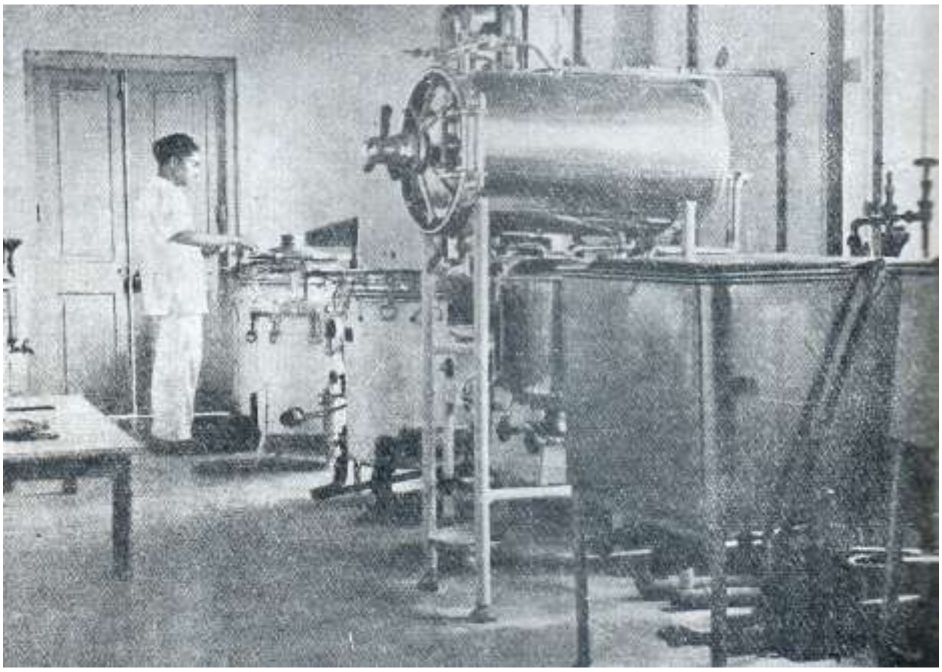

স্টেরিলাইজেশন বিভাগ (১৯৫১-৫২)

উৎসঃ *Annual Report of the Dacca Medical College & Hospital for the year* 1951-52.

প্রথম শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ (১৯৫২)

উৎসঃ অধ্যাপক আফজালুন্নেসা, এম.আর. মাহবুব (সম্পাদিত), *প্রথম শহীদ মিনারের স্থপতি ডা. বদরুল আলম স্মারক গ্রন্থ*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ১২।

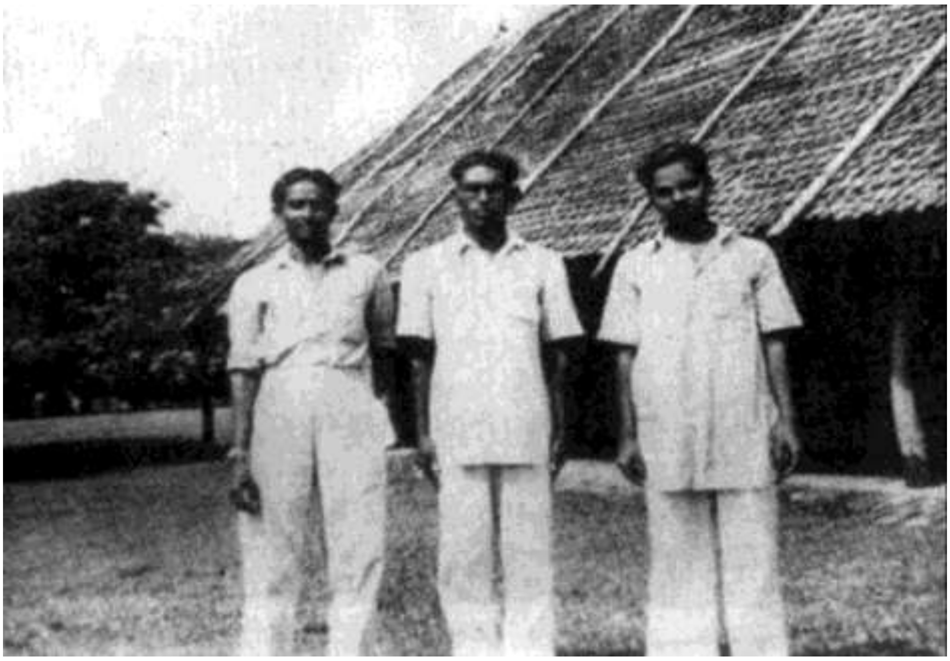

১৯৫২ সালে ব্যারাকের সামনে তিনজন ছাত্র

১৯৫২ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অনশনরত বঙ্গবন্ধু

উৎস: অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম.আর. মাহবুব, *ঢাকা মেডিকেল কলেজ : সেবা সংগ্রাম ঐতিহ্য*, গৌরব প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ৩০-১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

মেডিকেল ব্যারাক

উৎস: ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি।

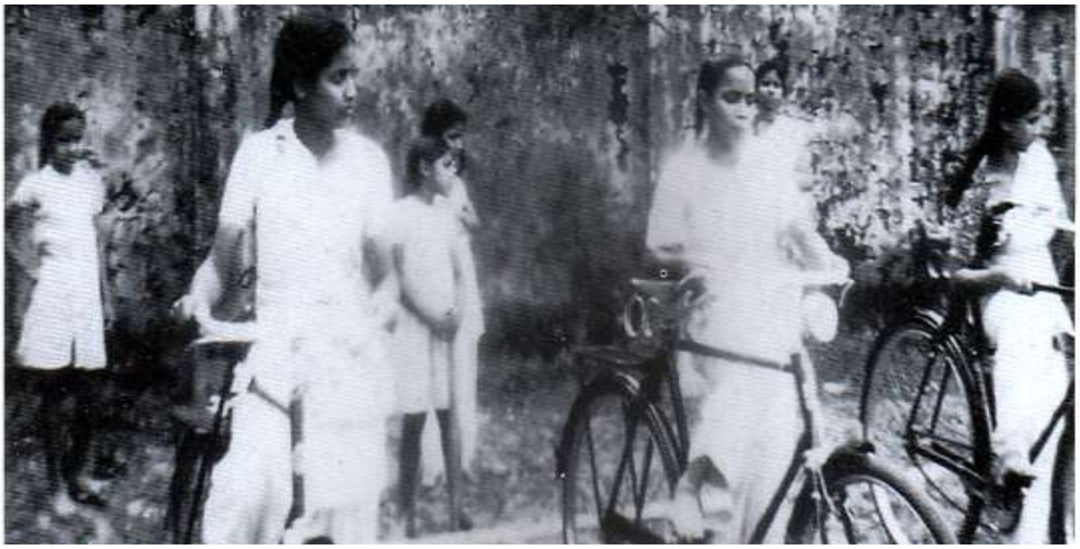

সাইকেল চালানো অবস্থায় শাহলা খাতুন, ১৯৫৩

Dhaka University Institutional Repository

এম.বি.বি.এস. গ্রাজুয়েশন ১৯৬৪ এম.আর.সি.ও.জি. ব্রিটেন, ১৯৬৮

উৎস: শফীক হাসান, *চিকিৎসা সেবায় শাহলা খাতুন*, উৎস প্রকাশন, ২০১৫।

রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে ডা. মোঃ ফজলে রাব্বির লাশ

Dhaka University Institutional Repository

রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে ডা. আলীম চৌধুরীর লাশ

শহীদ ডা. হাসিময় হাজরা

উৎস: প্রকৌশলী ইফতিখার কাজল (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ চিকিৎসক স্মৃতিকথা*, প্রথম খন্ড, রক্তঋণ, ঢাকা ১৯৯২।